রামেন্দ্র-রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

রামেন্দ্র-রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদক

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মূল্য৷

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিক
১২—২১।২।১৯৫০

ভূমিকা

'রামেন্দ্র-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের 'শব্দ-কথা', 'বিচিত্র জগৎ' ও 'যজ্ঞ-কথা' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শব্দ-কথা ঃ

গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় ইহার একটি মাত্র সংস্করণই প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল—১৩২৪ সাল (ইং ১৯১৭)। ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি প্রথমে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়—সূচী দ্রষ্টব্য।

বিচিত্র জগৎ ঃ

ইহা গ্রন্থকারের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। পুস্তকের আখ্যা-পত্রে প্রকাশকালের কোন উল্লেখ নাই; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে উহা—৮ আগষ্ট ১৯২০।

পুস্তকে সন্নিবিষ্ট নয়টি প্রবন্ধই ১৩২১-২৪ সালের " 'ভারতবর্ষ' হইতে পুনর্মুদ্রিত"—সূচী দ্রষ্টব্য। আমরা 'ভারতবর্ষে'র পাঠই গ্রহণ করিয়াছি; এই পাঠের সহিত পুস্তকের পাঠের স্থানে স্থানে সামান্য অমিল আছে। গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত পুস্তকের প্রথম দশ পৃষ্ঠা 'বিচিত্র জগৎ' পুস্তক দৃষ্টে মুদ্রিত হইয়াছিল; ফলে এই সংশোধনগুলির প্রয়োজন হইয়াছে ঃ—

			অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃ. ২০৯,	পংক্তি	১৬	কাহারও না	কাহারও কাহারও না
২১১	"	৪	মিথ্যার্থ	মিথ্যাত্ব
	"	৯	অধিকার নাই ;	অধিকার নাই ; এমন কি, অন্য নেশাখোরেরও কোন অধিকার নাই।
২১৪	"	২০	দেখাইয়াছেন।	দেখাইতেছেন।
২১৫	"	১৬	অনুমান ও	অনুমান এবং

যজ্ঞ-কথা ঃ

ইহাও গ্রন্থকারের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়; প্রকাশকাল—১৩৩৭ সাল; প্রকাশক—ঈশানচন্দ্র ঘোষ। পুস্তকে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলি প্রথমে

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার সার্‌ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর অনুরোধে লিখিত ও বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে পঠিত হইয়াছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে প্রবন্ধগুলি ১৩২৪-২৫ সালের 'সাহিত্যে' স্থানলাভ করে—সূচী দ্রষ্টব্য।

সূচী

শব্দ-কথা ঃ ১—২০৩

ধ্বনি-বিচার ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩১৪, ২য় সংখ্যা) ৭
কারক-প্রকরণ ঐ ১৩১২, ২য় „ ৬৮
না ঐ ১৩১২, ২য় „ ৯১
বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত ঐ ১৩০৮, ৪র্থ „ ৯৭
বাঙ্গালা ব্যাকরণ ঐ ১৩০৮, ৪র্থ „ ১০১
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ঐ ১৩০১, ২য় „ ১৩৬
শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা ঐ ১৩১৭, ৪র্থ „ ১৫০
বৈদ্যক পরিভাষা ঐ ১৩০৬, ৪র্থ „ ১৫৯
রাসায়নিক পরিভাষা ঐ ১৩০২, ২য় „ ১৮১
বাঙ্গালার প্রথম রসায়ন-গ্রন্থ ঐ ১৩০৫, ৪র্থ „ ১৯৬

বিচিত্র জগৎ ঃ ২০৫—৪৮২

বিজ্ঞান-বিদ্যায় বাহ্য জগৎ ('ভারতবর্ষ,' মাঘ ১৩২১) ২০৭
ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাষিক জগৎ ঐ ফাল্গুন ১৩২১ ২৩৩
বাঙ্ময় জগৎ ঐ ভাদ্র ১৩২২ ২৪৬
জড় জগৎ ঐ পৌষ ১৩২২ ২৭৭
বৈজ্ঞানিকের আকাশ ঐ চৈত্র ১৩২২ ৩১৮
প্রাণময় জগৎ ঐ ভাদ্র ১৩২৩ ৩৪৪
প্রাণের কাহিনী ঐ আষাঢ় ১৩২৪ ৩৭৫
প্রজ্ঞার জয় ঐ শ্রাবণ ১৩২৪ ৪১৯
চঞ্চল জগৎ ঐ ভাদ্র ১৩২৪ ৪৪৮

যজ্ঞ-কথা ঃ ৪৮৩—৬৩৫

যজ্ঞ—অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র ('সাহিত্য,' ফাল্গুন ১৩২৪) ৪৮৫
ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ ঐ চৈত্র ১৩২৪ ৫১৫
সোমযাগ ঐ বৈশাখ ১৩২৫ ৫৪২
খ্রীষ্ট-যাগ ঐ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ ৫৬৯
পুরুষ-যজ্ঞ ঐ ভাদ্র ১৩২৫ ৫৯৭

শব্দ-কথা

[১৯১৭ সনে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে]

মুখবন্ধ

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব এবং বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম ; প্রবন্ধগুলি এত কাল পরিষৎ-পত্রিকায় ছড়াইয়া ছিল ; শব্দ-কথা নাম দিয়া প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করিলাম। প্রায় সকল প্রবন্ধই সংশোধন করিয়াছি। ধ্বনি-বিচার নামে প্রবন্ধটির কলেবর বাড়িয়া গিয়াছে।

ধ্বনি-বিচার প্রবন্ধটির প্রতি আমার একটু মমত্ব আছে। বোধ হয়, আমি উহাতে কিছু নূতন কথা বলিয়াছি। এইরূপে বাঙ্গালা শব্দের আর কেহ আলোচনা করিয়াছেন কি না, জানি না।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত এবং সপ্তম বর্ষের চতুর্থ-সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনা পড়িয়া কয়েকটা কথা আমার মনে আসে। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তোলেন, টুক টুকে শব্দটি নিশ্চয় ধ্বন্যাত্মক শব্দ। যাহা টুক্ টুক্ ধ্বনি করে, তাহাই টুক্ টুকে। কিন্তু যে দ্রব্য রাঙা টুকটুকে, তাহা ত কোনরূপ টুক টুক শব্দ করে না ;—তবে তাহাকে টুক টুকে বিশেষণ দিই কেন ? রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "টক টক শব্দ কাঠের ন্যায় কঠিন পদার্থের শব্দ ! যে লাল অত্যন্ত কড়া লাল, সে যখন চক্ষুতে আঘাত করে, তখন সেই আঘাত-ক্রিয়ার সহিত টক টক্ শব্দ আমাদের মনে উহ্য থাকিয়া যায়।" রবীন্দ্রনাথের এই স্পষ্ট ইঙ্গিতের নিকট আমি ঋণী ;— আর কাহারই বা কাছে এমন ইঙ্গিত পাইতে পারি ? এই ইঙ্গিত না পাইলে বোধ করি, ধ্বনি-বিচার প্রবন্ধের উৎপত্তি হইত না !

ঐ ইঙ্গিত লইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিগুলিকে আমি শ্রেণিবদ্ধ করিয়া সাজাইয়াছি। দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক ধ্বনির একটা নৈসর্গিক তৎপরতা আছে—এই তৎপরতা প্রত্যেক ধ্বনির উৎপাদক বস্তুর স্বাভাবিক গুণে প্রতিষ্ঠিত। কঠিন দ্রব্যের আঘাতে ট-বর্গের ধ্বনি জন্মে ; কোমল দ্রব্যের আঘাতের সহিত ত-বর্গের ধ্বনির সম্পর্ক ; ফাঁপা জিনিসের ভিতর হইতে বায়ু নিঃসরণে প-বর্গের ধ্বনি জন্মে ; ইত্যাদি। প্রত্যেক ধ্বনি স্বভাবতঃ কাঠিন্য, তারল্য, কোমলতা, শূন্যগর্ভতা প্রভৃতি এক-একটা বস্তুধর্মের সম্পর্ক রাখে ও সহকারিতা রাখে ; এবং প্রত্যেক ধ্বনি শ্রুতিগত হইবা মাত্র ঐ ঐ ধর্ম স্মরণ করায় বা ব্যঞ্জনা করে। যাহা টুক টুকে লাল, তাহা চোখে এমন কঠোর আঘাত দেয় যে, সেই আঘাত টুক টুক ধ্বনির কানে আঘাতের কঠোরতা স্মরণ করায় ; দৃষ্টিগত আঘাতটাও যেন কঠোরতায় শ্রুতিগত আঘাতের অনুরূপ। প্রত্যেক বর্গের অন্তর্গত ধ্বনিগুলির

এইরূপ এক-একটা স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা আছে। প্রত্যেক বর্গের অন্তর্গত ধ্বনির মধ্যে আবার অল্পপ্রাণতা বা মহাপ্রাণতা, ঘোষবত্তা বা ঘোষহীনতার ভেদে সেই তাৎপর্য্যের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। প-বর্গের বর্ণমধ্যে প ও ফ উভয়েই বায়ুপূর্ণতা বা শূন্যগর্ভতা স্মরণ করায়; কিন্তু প'র চেয়ে ফ'র জোর যেন অধিক; ব'র চেয়ে ভ'র স্থূলতা যেন অধিক। এই স্থূলতার আধিক্যে যাবতীয় ভ-কারাদি শব্দ স্থূলতা মনে আনে, এবং স্থূলতার সহকারী আলস্য ঔদাস্য প্রভৃতি মানসিক ধর্ম্মও মনে আনে। মূলে যাহা ধ্বন্যাত্মক বা নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকৃতিজাত, তাহার অর্থ ও তাৎপর্য্য ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া ব্যঞ্জনার দৌড় ক্রমে বাড়িয়া যায়। বহু দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিয়া আমার বক্তব্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

আমি যে সকল দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিয়াছি, তাহাদের অনেকের হয়ত সংস্কৃত ভাষা হইতে মূল আকর্ষণ করা যাইতে পারে। ধ্বনি-বিচার প্রবন্ধ যখন লিখিয়াছিলাম, তখন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের অপূর্ব্ব শব্দকোষের রচনা আরব্ধ হয় নাই। যোগেশ বাবু সংস্কৃত মূলাকর্ষণের পক্ষপাতী; তিনি তাঁহার শব্দকোষে এই শ্রেণীর যাবতীয় শব্দের সংস্কৃত মূল আকর্ষণে চেষ্টা করিয়াছেন; আমার সহিত পত্রব্যবহারেও তিনি সেই পক্ষপাত পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই।

ইংরেজী ভাষাতত্ত্বে আমার কিছু মাত্র বিদ্যা নাই। ইংরেজী ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে কিরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহার আমি কোন খোঁজ রাখি না। সম্প্রতি হেন্‌রি ব্রাডলি-প্রণীত The Making of English (Macmillan, 1916) নামে একখানি পুস্তক হঠাৎ আমার হাতে পড়িয়াছিল; তাহাতে দেখিলাম, এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে। গ্রন্থকার Root-creation বা ধাতু-সৃষ্টি প্রকরণে ধ্বনিমূলক শব্দের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন; নিম্নের উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য।

"The sound of a word may suggest 'symbolically' a particular kind of movement or a particular shape of an object. We often feel that a word has a peculiar natural fitness for expressing its meaning, though it is not always possible to tell why we have this feeling. Quite often the sound of a word has a real intrinsic significance; for instance, a word with a long vowel, which we naturally utter slowly, suggests the idea of slow movement. A repetition of the same consonant suggests a repetition of movement. Sequences of consonants which are harsh to the ear, or involve difficult muscular effort in utterance, are felt

to be appropriate in words descriptive of harsh or violent movement." (pp. 156-57.) গ্রন্থকার অধিক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা ভাষা হইতে আমি প্রচুর দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিয়াছি। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার দৌড় বোধ করি, ইংরেজীর চেয়ে অনেক বেশী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরিভাষা-সমিতিতে কয়েক বৎসর পরিশ্রম করিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, কাগজ কলম হাতে লইয়া কোন একটা বিজ্ঞান-বিদ্যার পরিভাষা গড়িয়া তোলা বৃথা পরিশ্রম। সুচারু পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচনাকর্ত্তার এবং অনুবাদকের হাতে। তবে প্রাচীন সাহিত্যে যে সকল শব্দের প্রয়োগ আছে, অথবা আধুনিক সাহিত্যে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার তালিকা করিয়া দিলে এ-কালের লেখকদের কতকটা সাহায্য হইতে পারে। এই মনে করিয়া আমি বৈদিক সাহিত্য হইতে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের সঙ্কলন করিয়াছিলাম, এবং ব্রেটন সাহেবের ও মাক্ সাহেবের বহি হইতে যে তালিকা পাইয়াছিলাম, তাহা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করি। সাহেবদের শব্দগুলিতে কাজ যতটা না হউক, কৌতুক অনেকটা পাওয়া যাইবে। এতদর্থে আজিকার বাজারের কাগজের দাম যোগাইয়াও সেই তালিকাগুলি গ্রন্থস্থ করিলাম। রাসায়নিক পরিভাষা প্রবন্ধের শেষে রসায়ন শাস্ত্রের কতকটা পূর্ণাঙ্গ পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম; তাহা এখন প্রকাশের যোগ্য বোধ করিলাম না।

কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩২৪

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ধ্বনি-বিচার

মহাকবি কালিদাস বাক্যের সহিত অর্থের সম্পর্ক হরগৌরীর সম্পর্কের মত নিত্য জানিয়া বাগর্থপ্রতিপত্তির জন্য হরগৌরীকে বন্দনাপূর্ব্বক মহাকাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ঐ সম্পর্ক কিরূপে আসিল, তাহা পণ্ডিতেরা অদ্যাপি মাথা খুঁড়িয়াও নিরূপণ করিতে পারেন নাই। ভাষার অন্তর্গত কতকগুলি শব্দ নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষার অন্তর্গত যাবতীয় শব্দের এইরূপে উৎপত্তি বুঝা যায় না। কা কা করে বলিয়া কাকের নাম কা ক, আর কু হু কু হু করে বলিয়া কোকিলের নাম কো কি ল, ইহা বুঝা যায় ; এমন কি, কেঁ উ কেঁ উ যে করে, সে কু কু র, ইহাও অনুমান চলে। এইরূপে কতক দূর যাওয়া চলে, কিন্তু বহু দূর যাওয়া চলে না।

স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, এই মতটাকে ইংরেজীতে পণ্ডিতের ভাষায় অনোম্যাটপিক থিয়োরি বলে। বিদ্রূপ করিয়া ইহাকে bow-wow theory বা ভেউ-ভেউ-বাদ বলা হয়। বলা বাহুল্য যে, এই ভেউ-ভেউ-বাদের দৌড় খুব অধিক নহে।

আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় কিন্তু ইহার দৌড় বোধ করি, অন্য ভাষার চেয়ে অধিক। নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকরণজাত বাঙ্গালা শব্দের সম্পূর্ণ তালিকা এ পর্য্যন্ত কেহ প্রস্তুত করেন নাই। প্রচলিত বাঙ্গালা কোষগ্রন্থে এই শ্রেণীর শব্দের স্থান নাই, দয়া করিয়া দুই চারিটাকে স্থান দেওয়া হয় মাত্র ; কিন্তু চলিত মৌখিক ভাষায় ইহাদের সংখ্যার সীমা পাওয়া যায় না।

আমাদের শাব্দিক পণ্ডিতদিগের নিকট এই শ্রেণীর শব্দের আদর নাই বটে, কিন্তু আমাদের কবিগণ ইহাদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারেন নাই। প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণের মধ্যে ভাষায় অধিকারে যাঁহার তুলনা মিলে না, বাগ্‌দেবতা যাঁহার লেখনীমুখে আবির্ভূত হইয়া মধুবৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতচন্দ্র এই শ্রেণীর শব্দগুলির কেমন প্রচুর প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। শাব্দিক পণ্ডিতেরা ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির আলোচনায় অবজ্ঞা করিতে পারেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রকে অবজ্ঞা করিতে সাহসী হইবেন না। অন্নদামঙ্গলের 'দ ল ম্ম ল দ ল ম্ম ল গলে মুণ্ডমালা' এবং

'ফ না ফ ন ফ না ফ ন ফণীফন্ন গাজে' প্রভৃতি পদাবলী বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে লুপ্ত হইবে না।

এই অনুকরণজাত বাঙ্গালা শব্দগুলির বিশিষ্টতা এই যে, উহাদের অধিকাংশ শব্দই দেশজ শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় উহাদের মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দেশজ বলিয়া উহাদের গায়ে অনার্য্য গন্ধ আছে; এ দেশের শাব্দিক পণ্ডিতেরা, যাঁহারা বিশুদ্ধ আর্য্যভাষার শব্দতত্ত্ব আলোচনা করিয়া পণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই গন্ধ সহিতে পারেন না। তাঁহারা সহিতে না পারুন, কিন্তু বৃদ্ধা আর্য্যা সংস্কৃত-ভাষা ঠাকুরাণী যে কালক্রমে এই শ্রেণীর বহু শব্দকে হজম করিয়া লইয়াছেন, তাহা যে-কোন সংস্কৃত কোষগ্রন্থ খুলিলেই দেখা যাইবে এবং বৈদিক আর্ষ সংস্কৃতের সহিত আধুনিক লৌকিক সংস্কৃতের তুলনা করিলেও তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলিবে। সংস্কৃত কবিগণ যে ইহাদিগকে কাব্যের ভাষায় স্থান দিতে সঙ্কোচ করেন নাই, তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। ভারতচন্দ্রের মত বাঙ্গালী কবির এই শ্রেণীর শব্দের প্রতি একটা বিশেষ টান ছিল, তাহা ত জানাই আছে। ভারতচন্দ্র যেখানে সংস্কৃত কবিতা রচনার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেও এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার "খটমট খটমট খুরোত্থ-ধ্বনিকৃত" ইত্যাদি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাকবি ভবভূতি, বিশুদ্ধ মার্জ্জিত ভাষার প্রয়োগে যাঁহার সমকক্ষ কবি সংস্কৃত-সাহিত্যে বিরল, তিনি এই ধ্বন্যাত্মক শব্দে তাঁহার কবিতাকে সাজাইতে যেরূপ ভাল বাসিতেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার 'ভবভূতি' নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র পাঠকগণের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে।

সাহিত্যের ভাষার পক্ষে যাহাই হউক, চলিত ভাষায় এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকে বর্জ্জন করিলে বাঙ্গালীর কথা কহা একেবারে বন্ধ করিতে হয়। আমাদের কাজকর্ম্ম ঘরকরনা অচল হয়। অন্ততঃ এই জন্যও বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় এই শব্দগুলিকে বর্জ্জন করিলে চলিবে না।

কিছু দিন হইল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ সপ্তম বর্ষের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় বাহির করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির একটা বিশিষ্টতার

উল্লেখ করেন ; তৎপূর্ব্বে বোধ করি, আর কেহ সেই বিশিষ্টতাটুকু লক্ষ্য করেন নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিব। কাকে কা কা করে, আর কোকিলে কু হু কু হু করে, গাড়ী ঘ র ঘ র করিয়া চলে, আর মানুষে খু ক খু ক করিয়া কাশে ; এই সকল দৃষ্টান্তে নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকরণ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট নাই। আমরা হি হি করিয়া হাসি, আর খ ট খ ট করিয়া চলি, এখানেও স্বভাবের অনুকরণ। কিন্তু রাগে যখন গা গ শ গ শ করে, তখন কি বাস্তবিকই গা হইতে এইরূপ ধ্বনি বাহির হয় ? যখন গ ট ম ট করিয়া তাকান যায়, তখন চোখ হইতে বড়-জোর একটা জ্যোতি বাহির হয়, কোনরূপ গ ট ম ট শব্দ ত বাহির হয় না। শীতে যখন হাত পা ক ন্‌ ক ন্‌ করে, তখন মাইক্রোফন লাগাইলেও সেই ধ্বনি শোনা যায় না। বুকের ভিতরের দুর দুর নি বা ধু ক ধু ক নি ষ্টেথস্কোপ লাগাইলে কর্ণগোচর হইয়া থাকে বটে, কিন্তু রাঙা টু ক্‌ টু কে কাপড় হইতে কোনরূপ টু ক টু ক শব্দ আবিষ্কারের কোন আশা দেখি না। শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির ধারা কখন ঝি ম ঝি ম, কখন ঝ ম ঝ ম, কখন বা ঝ প ঝ প শব্দ করে, তাহা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু ঝি ক্‌ ঝি কে বেলায় যখন অস্তগামী সূর্য্যের অরুণ কিরণ তাল-গাছের মাথাকে রঞ্জিত করে, তখন কোনরূপ ঝি ক ঝি ক শব্দ শুনি নাই। আঁধার ঘরে চ ক চ ক শব্দে বিড়াল কর্ত্তৃক দুধের বাটির দুগ্ধপানবার্ত্তা ঘোষিত হয় বটে, কিন্তু চ ক চ কে দুনিয়াকে কখন চ ক চ ক শব্দ করিতে শুনি নাই। এই শব্দগুলি নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন শব্দ, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই ; কিন্তু কোনরূপ ধ্বনি ত কখনও কর্ণগোচর হয় না। আপাততঃ ঐ সকল ধ্বন্যাত্মক ও ধ্বনিজাত শব্দের কোনই সার্থকতা দেখা যায় না, অথচ উহারা কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে অর্থ ব্যঞ্জনা করে! ক ন্‌ ক নে শীত বলিলে যেমন শীতের তীব্রতা বুঝায়, চ ক্‌ চ কে দুয়ানি বলিলে যেমন দুয়ানির ঔজ্জ্বল্য বুঝায়, রাঙা-টু ক্‌ টু কে বলিলে সেই রাঙার তীক্ষ্ণতা যেমন চোখের উপর ঠিকরিয়া পড়ে, আর কোন বিশেষণ তেমন স্পষ্টভাবে সেই সেই অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না। চ ক্‌ চ কে শব্দটির অন্তর্গত তালব্যবর্ণ 'চ' আর কণ্ঠ্যবর্ণ 'ক', এই দুই বর্ণের ধ্বনিতে এমন কি আছে, যাহাতে চ ক্‌ চ কে জিনিসের চা ক চি ক্য বা উজ্জ্বলতা বুঝাইয়া দেয় ? উজ্জ্বল জিনিস হইতে যদি বস্তুতই কোনরূপে চ ক চ ক ধ্বনি বাহির হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে ঔজ্জ্বল্যের সহিত চাকচিক্যের সম্পর্ক বুঝিতাম। কিন্তু সেরূপ ত কিছুই শুনি

না। ঔজ্জ্বল্য দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়, আর চক্‌চকানি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়; উভয়ের মধ্যে এই সম্পর্ক স্থাপিত হইল কি সূত্রে? রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং এক দিক্ হইতে ঐ প্রশ্নের উত্তরও দিয়াছিলেন। অন্য দিক্ হইতে এই প্রসঙ্গের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে ধ্বনির উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই-চারিটা কথা বলা আবশ্যক।

বাঁশীতে ফুঁ দিলে তাহা হইতে ধ্বনি বাহির হয় ও সেই ধ্বনি শুনিয়া আমরা আনন্দ পাই। কোন কোন ধ্বনি শুনিলেই আনন্দ হয়। শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় বাঁশী বাজাইতেন, আর গোপীরা জ্ঞানহারা হইয়া সেই দিকে ছুটিত। ধ্বনির সহিত এই আনন্দের বা উন্মাদনার এইরূপ সম্পর্ক কিরূপে আসিল, তাহার উত্তর কোন পণ্ডিতে দিতে পারেন না। তবে কোন কোন ধ্বনির সহিত আনন্দের সম্পর্ক আছে, ইহা ঠিক। নতুবা সঙ্গীতবিদ্যাটাই অযথার্থ হইত। কেবল আনন্দের কেন, ক্লেশেরও সম্পর্ক আছে। কোন কোন ধ্বনি যেমন আনন্দ দেয়, কোন কোন ধ্বনি তেমনি ক্লেশের হেতু;—যেমন ঢাকের বাদ্য থামিলেই মিষ্ট হয়। কোন্ ধ্বনি চিত্তে কোন্ ভাব কিরূপে জাগায় বা কেন জাগায়, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাহা বলিতে পারেন না, তবে কোন্ ক্ষেত্রে ধ্বনি মধুর হইবে, আর কোন্ ক্ষেত্রে ধ্বনি কর্কশ হইবে, তাহার মোটামুটি একটা হিসাব দিতে পারেন। বাঁশী বাজাইলে বাঁশীর ভিতরে আবদ্ধ বাতাসটা কাঁপিয়া উঠে এবং ভিতরের কম্প বাহরে আসিয়া বাহিরে বায়ুরাশিতে ঢেউ জন্মায়। সেই ঢেউগুলি কানে আসিয়া ধাক্কা দেয় ও সেখানকার স্নায়ুযন্ত্রে পুনঃ পুনঃ আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধ্বনির বোধ হয়। সেকেণ্ডে কতগুলি ঢেউ আসিয়া কানে আঘাত দেয়, তাহার সংখ্যা করা চলে। সংখ্যা গণিয়া দেখা গিয়াছে, সেকেণ্ডে দু-শ পাঁচ-শ, দু-হাজার দশ হাজার বাতাসের ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দিলে ধ্বনিজ্ঞান জন্মে। সেকেণ্ডে দু-দশটা মাত্র ঢেউ কানে লাগিলে ধ্বনিজ্ঞান জন্মে না, আবার সেকেণ্ডে লাখখানেক ঢেউ লাগিলেও ধ্বনিজ্ঞান জন্মে না। ঢেউয়ের সংখ্যাভেদে ধ্বনি কোমল বা তীব্র হয়। সেকেণ্ডে পাঁচ শ ঢেউ কানে লাগিলে যে ধ্বনি শোনা যায়, হাজার ঢেউ লাগিলে ধ্বনি তার চেয়ে তীব্র হয়; স্বরটা এক গ্রাম উঁচুতে উঠে। প্রতি সেকেণ্ডে আঘাতের সংখ্যা যত বাড়ে, ধ্বনি ততই উঁচুতে—কড়িতে উঠে, আর সংখ্যা যত কমে, ততই কোমল হয়।

বাঁশীর ভিতর যে ঢেউগুলি জন্মে, উহারা কোথাও কোন বাধা না পাইয়া বাহিরে আসে ও বাহিরের বায়ুরাশিতে সংক্রান্ত হয়। যত ক্ষণ ব্যাপিয়া এই ঢেউগুলি আটক না পাইয়া বাহিরে আসিতে থাকে, তত ক্ষণ ব্যাপিয়া আমরা বংশীধ্বনি শুনিতে পাই।

তানপুরার তারে ঘা দিলেও ঐরূপ হয়; তারটা যত ক্ষণ কাঁপে, চারি দিকের বায়ুরাশিতে তত ক্ষণ ধাক্কার পর ধাক্কা লাগিয়া ঢেউ জন্মে ও তত ক্ষণ ধরিয়া আমরা ধ্বনি শুনিতে পাই। লম্বা তারে সেকেণ্ডে যতগুলি ঢেউ জন্মায়, খাট তারে তার চেয়ে অধিক জন্মায়। তন্ত্রী যত লম্বা হয়, ধ্বনি ততই নীচে নামে বা কোমল হয়।

এই সকল ধ্বনি মধুর ধ্বনি; মধুর বলিয়াই বাঁশী আর তন্ত্রী সঙ্গীতের যন্ত্রগঠনে ব্যবহৃত হয়। ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিশিয়া স্বরমাধুর্য্যের উৎকর্ষ সাধন করে। লম্বা তারে ঘা দিলে গোটা তারটাই কাঁপে; আবার গোটা তারটা আপনাকে দুই, তিন, চারি বা ততোধিক সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইয়া এক এক ভাগ পৃথক্ ভাবে কাঁপে। এক এক ভাগের কম্পে এক এক রকম ধ্বনি বাহির হয়। দুই হাত লম্বা ভাগে যে ধ্বনি বাহির হয়, এক হাত লম্বা ভাগ হইতে তার চেয়ে উচু, আধ হাত লম্বা ভাগ হইতে আরও উচু ধ্বনি বাহির হয়। এই সকল ধ্বনি একত্র মিশিয়া ধ্বনির মাধুর্য্যের ইতরবিশেষ জন্মায়। বাঁশীর ভিতরে আবদ্ধ বাতাসেও ঐরূপ ঘটে। সমস্ত বাতাসটা কাঁপে; আবার ঐ বাতাস আপনাকে দুই তিন চারি সমান স্তরে ভাগ করিয়া লইয়া এক এক ভাগ আপন আপন ধ্বনি জন্মাইয়া কাঁপে। ইহার মধ্যে কোন ধ্বনি কোমল, অন্যটা তার চেয়ে তীব্র; কোমলে তীব্রে মিশ্রিত হইয়া ধ্বনির মাধুর্য্য বাড়াইয়া দেয়, অথবা ধ্বনির প্রকৃতি বদলাইয়া দেয়।

টেবিলের উপর কাঠে ঠক্ করিয়া ঠোকর দিলে কাঠখানা কাঁপিয়া উঠে; কাষ্ঠফলকটা আপনাকে নানা ভাগে ভাগ করিয়া লয় ও প্রত্যেক ভাগ আপন আপন ধ্বনি উৎপাদন করিয়া কাঁপিতে থাকে। কিন্তু বাঁশীর ভিতরের বাতাস বা তন্ত্রীযন্ত্রের তার যেমন আপনাকে সমান সমান ভাগ করিয়া লয়, কাষ্ঠফলক তেমন করিয়া বিভক্ত হয় না। উহার ভাগগুলি এলোমেলো অনিয়ত হইয়া পড়ে এবং ঐ সকল ভাগ হইতে যে সকল ধ্বনি জন্মে, তাহারা একযোগে এমন একটা কর্কশ ধ্বনি উৎপাদন করে, যাহা

কর্ণপীড়া জন্মায়। কাঠের ঠক্‌ঠকানি কাহারও মিষ্ট লাগে না। সুখের বিষয় যে, উহার স্থিতিকাল অল্প। ঠক্ করিয়া ঠোকর দিবা মাত্র কাঠখানা এখানে ওখানে সেখানে কাঁপিয়া উঠে এবং ক্ষণেকের মধ্যে থামিয়া যায়। তাই কর্ণপীড়াটাও অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয় না।

পিতলের ঘড়িতে হাতুড়ির আঘাত দিলে ঢং করিয়া শব্দ হয়। ঐ 'ঢং' শব্দের 'ঢ'-টুকুতে কোন মাধুর্য্য নাই। কঠিন ধাতুফলকে কাঠের হাতুড়ির আঘাতে যে এলোমেলো কাঁপুনি ক্ষণেকের মত জন্মে, এই কর্ণজ্বালাকর 'ঢ'-টা তাহারই ফল। তবে এই এলোমেলো অনিয়মিত কম্প থামিয়া গেলে ধাতুফলকটা আরও কিছুক্ষণ ধরিয়া বেশ নিয়মিত ভাবে কাঁপিতে থাকে; তখন 'ঢং'-এর 'ঢ'-টুকু চলিয়া গিয়াছে, উহার 'অং'-টুকু তখনও চলিতেছে। এই ঢ-টুকু কর্কশ, কিন্তু 'অং'-টুকু বেশ মধুর।

শব্দশাস্ত্রে বলে, ঐ 'ঢং' শব্দটার মধ্যে দ্বিবিধ ধ্বনি আছে; একটা ব্যঞ্জন-বর্ণের ধ্বনি, আর একটা স্বরবর্ণের ধ্বনি। 'ঢং'-এর অন্তর্গত ক্ষণস্থায়ী 'ঢ'-টুকু ব্যঞ্জনবর্ণ, আর স্থায়ী 'অং'-টুকু স্বরবর্ণ। ঐ ব্যঞ্জনটুকু কর্কশ, আর স্বরটুকু মধুর। কঠিন দ্রব্যের আঘাতে ঐ অচিরস্থায়ী ব্যঞ্জনটার জন্ম; উহার স্থিতিকাল এত অল্প যে, পরবর্ত্তী 'অং'-টুকু উহাতে যুক্ত না হইলে উহা শুনিতে পাইতাম কি না সন্দেহ। 'ঢ' বর্ণের ধ্বনিটা ঘড়ির পিঠে হাতুড়ির স্পর্শকালে উদ্ভূত হয়; ঐ স্পর্শকালেই উহার উৎপত্তি হয়; এই জন্য উহাকে স্পর্শবর্ণের ধ্বনি বলা যাইতে পারে।

আমাদের বাগ্‌যন্ত্র অনেকটা বাঁশীর মত। ফুসফুস হইতে প্রশ্বাসের বায়ু মুখকোটরে আসিবার সময় কণ্ঠনালীর পথে অবস্থিত পেশী-নির্ম্মিত দুইটা তারে আঘাত দিয়া ঐ তার দুটাকে কাঁপাইয়া দেয় এবং সেই তারের কম্পে মুখকোটরের বায়ুমধ্যে ঢেউ জন্মে। সেই ঢেউগুলি মুখকোটর হইতে বাহিরে আসিয়া কর্ণগত হইলে ধ্বনি শোনা যায়। বাহির হইবার সময় কোথাও কোন বাধা বা আটক না পাইয়া বাহির হইলে উহা স্বরবর্ণের ধ্বনির উৎপাদন করে; আর কোন স্থানে আটক পাইলে ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনির উৎপাদন করে। মুখ ব্যাদান করিয়া, মুখকোটর 'বিবৃত' করিয়া আমরা স্বরবর্ণের উচ্চারণ করি, আর ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের সময় বহির্গমনোন্মুখ বায়ুকে, মুখকোটর হইতে বাহির হইবার সময়ে, কোন একটা স্থানে আটকাইয়া ফেলি। কণ্ঠতন্ত্রী কাঁপাইয়া কণ্ঠনালী হইতে বায়ু

মুখকোটরে আসিতেছে; এমন সময়ে ক্ষণেকের মত জিহ্বার গোড়াটাকে উপরে তুলিয়া কণ্ঠের দুয়ার আটকাইয়া দিলাম, আর ধ্বনি বাহির হইল 'ক'; উহা ব্যঞ্জনবর্ণ; জিহ্বামূলের স্পর্শকালে উহার উৎপত্তি, কাজেই উহা জিহ্বামূলীয় স্পর্শবর্ণ। জিহ্বার মধ্যভাগ তালুতে স্পর্শ করিয়া বাতাস আটকাইলাম, আর ধ্বনি বাহির হইল 'চ'; উহা তালব্য স্পর্শবর্ণ। জিহ্বার ডগাটা উলটাইয়া উপরে তুলিয়া তালুর পশ্চাতে যেখানটাকে মূর্দ্ধা বলে, সেইখানে এক ঠোকর দিলাম, আর ধ্বনি হইল 'ট'; উহা মূর্দ্ধন্য স্পর্শবর্ণ। জিহ্বার অগ্রভাগ উপর পাটির দাঁতে ঠেকাইয়া বাতাসটা আটকাইবা মাত্র, ধ্বনি জন্মিল 'ত'; উহা দন্ত্য স্পর্শবর্ণ। আর দুই ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া জোরে বাতাস ছাড়িয়া দিলাম; অমনি ধ্বনি জন্মিল 'প'; উহা ওষ্ঠ্য স্পর্শবর্ণ।

নরকণ্ঠে যে যে ধ্বনি নির্গত হয়, নরকণ্ঠ ব্যতীত অন্যত্রও তৎসদৃশ ধ্বনি জন্মিতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নরকণ্ঠ অনেকটা বাঁশীর মত; বাঁশীর ভিতর হইতে বায়ু অব্যাহত ভাবে অর্থাৎ কোথাও আটক না পাইয়া বাহির হইলে যে ধ্বনি জন্মে, উহা স্বরের ধ্বনি; এই ধ্বনিকে যত ক্ষণ ইচ্ছা রাখিতে পারা যায়। সেই বায়ুর পথ রোধ করিলে ক্ষণস্থায়ী ব্যঞ্জনের উৎপত্তি হয়। কঠিন বস্তুর পরস্পর স্পর্শ বা সংঘট্ট এই ব্যঞ্জনধ্বনির উৎপাদনের অনুকূল। যথা, কঠিন ইস্পাতে নির্ম্মিত কাঁচি দিয়া কঠিন ধাতুনির্ম্মিত তার কাটিলে শব্দ হয় 'ক ট'; কাঠে কাঠে আঘাতে শব্দ হয় 'ঠ ক'; পথের উপর পদ-শব্দ 'দ প' ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনধ্বনির বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, উহা ক্ষণস্থায়ী; এত অল্প সময় ব্যাপিয়া উহার স্থিতি যে, পূর্ব্বে বা পরে স্বরধ্বনি না থাকিলে উহার উচ্চারণ চলে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঘড়ি পিটিলে যে 'ঢং' শব্দ হয়, উহার 'ঢ'-টুকু ক্ষণস্থায়ী; ঢ'য়ের পরবর্ত্তী স্বর 'অং'-টুকু ঢ'য়ের বিরামের পর বহুক্ষণ থাকিয়া ক্রমশঃ থামিয়া যায়। আমরা কা, কি, কু, ইত্যাদি স্বরান্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণ করিতে পারি; আবার অক্, ইক্, উক্, এইরূপে আদিতে স্বর বসাইয়া ব্যঞ্জনের উচ্চারণ করিতে পারি; কিন্তু স্বরবর্জ্জিত শুদ্ধ ব্যঞ্জনটুকু উচ্চারণ করিতে পারি না। হাওয়া কণ্ঠনালী হইতে মুখকোটরে বাহির হইবার সময় যদি কোনরূপ বাধা পায়, সেই বাধার সমকালে বাহির হয় ব্যঞ্জনের ধ্বনি; বাধাটা সরিয়া গেলে যাহা বাহিরে আসে, তাহা স্বর। ব্যঞ্জনের ধ্বনি ক্ষণিক

ও কর্কশ ; স্বরের ধ্বনি স্থায়ী ও মধুর। যাবতীয় সঙ্গীতের কারবার এই স্বরের ধ্বনি লইয়া ; ব্যঞ্জন কেবল থাকিয়া থাকিয়া ঠোকর দেয় ও বিরাম দিয়া তাল রক্ষা করে।

খাঁটি স্বরের উচ্চারণে মুখ একেবারে খোলা থাকে বা 'বিবৃত' থাকে। হাওয়া অবাধে বাহির হয়। তবে মুখকোটরটার আকৃতি অনুসারে ঐ স্বরের নানারূপ বিকার উপস্থিত হয়। 'আ' উচ্চারণের সময় আমরা একেবারে বদন ব্যাদান করিয়া হাঁ করিয়া থাকি ; তখন জিহ্বাটা মুখগহ্বরের নীচে নামিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। 'ঈ' উচ্চারণের সময় জিহ্বা উপরে উঠিয়া তালুর নিকটবর্ত্তী হয়, জিহ্বার অগ্রভাগ নীচের পাটির দাঁতের পশ্চাতে আসিয়া পড়ে। মুখের কোটর তখন অনেকটা ছোট হইয়া পড়ে। 'উ' উচ্চারণের সময় মুখকোটর আরও ছোট হয় ; দুই ঠোঁট কাছাকাছি আসে ; দুই ঠোঁটের মাঝে একটি ছোট বিবর উৎপন্ন হয় ; ঐ বিবরের দুয়ার দিয়া হাওয়া বাহির হয়। মুখকোটরের আকৃতির ভেদানুসারে স্বরের এইরূপ ভেদ হয়। বাঁশীতে যেমন একটা মূল ধ্বনির সহিত অন্যান্য ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া মূল ধ্বনিকে বিকৃত করে, সেইরূপ মুখকোটরেও কণ্ঠোদ্গত মূল ধ্বনির সহকারে অন্যান্য ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া ও মিলিয়া মিশিয়া মূল ধ্বনির এইরূপ বিকার উৎপাদন করে। একই আ বিকৃত হইয়া 'ঈ'-তে বা 'উ'-তে পরিণত হয়।

প্রকৃত পক্ষে অ ই উ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বরের ধ্বনি একই মূল ধ্বনির সহিত অন্যান্য উচ্চতর ধ্বনির সংযোগে উৎপন্ন ; উহারা একই মূল ধ্বনির বিবিধ বিকার মাত্র। কোন্ কোন্ ধ্বনি মিশিয়া কি কি স্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হেলম্হোলৎজ্ প্রথমে তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন। 'অ' 'ই' 'উ' প্রভৃতি বিভিন্ন স্বরের মধ্যে কোন্টার ভিতর কি কি ধ্বনি আছে, তাহা তিনি বিশ্লেষণ দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং সেই বিশ্লেষণে যে যে ধ্বনি বাহির হইয়াছিল, সেই সেই ধ্বনি মিশাইয়া 'অ' 'ই' 'উ' প্রভৃতি নানাবিধ স্বর যন্ত্রযোগে উৎপাদন করিয়াছিলেন। এ সকল বিজ্ঞানবিদ্যার আলোচ্য। শব্দশাস্ত্রে এ সকল সূক্ষ্ম তত্ত্বের খোঁজ লওয়া দরকার হয় না। এখানে মোটা আলোচনা চলে। এই মোটা আলোচনায় দেখা যায় যে, সংস্কৃত ভাষার প্রচলিত বর্ণমালায় তিনটি স্বর আছে। 'অ' 'ই' 'উ' ; এই তিন স্বরের প্রত্যেকের আবার মাত্রাভেদে হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুত এই

তিনটি করিয়া রূপ আছে। উচ্চারণের স্থিতিকালানুসারে মাত্রার নির্ণয় হয়। কালানুসারে এক মাত্রায় হ্রস্ব, দুই মাত্রায় দীর্ঘ, তিন বা ততোধিক মাত্রায় প্লুত।

এইরূপে ঐ তিন স্বরের নয়টি রূপ; যথা—অ, আ, আ̱; ই, ঈ, ঈ̱; উ, ঊ ঊ̱। প্লুতত্ব নির্দ্দেশের জন্য আমরা নীচে একটা কষি দিলাম। এই নয় স্বরের প্রত্যেকের আবার দুইটি করিয়া ভেদ আছে; নাক দিয়া কতক হাওয়া বাহির করিয়া প্রত্যেক স্বর আমরা নাকি সুরে উচ্চারণ করিতে পারি; যথা—অঁ (অং); অথবা কণ্ঠনালী হইতে জোরের সহিত হাওয়া বাহির করিতে পারি; যথা—অঃ। এই দুই ভেদ 'অনুস্বার' ও 'বিসর্গ' এই দুই লিপিচিহ্ন দ্বারা লিখিয়া দেখান হয়। 'অনুস্বার' ও 'বিসর্গ' স্বরবর্ণ, না ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহা লইয়া একটা তর্ক আছে; উহা স্বরও নহে, ব্যঞ্জনও নহে; উহা স্বরবর্ণের বিকৃতি সাধন করে মাত্র। উল্লিখিত নয়টি স্বরের প্রত্যেকটিরই এই ত্রিবিধ বিকার হইতে পারে; যথা—অ অঁ অঃ; আ আঁ আঃ; আ̱ আঁ̱ আ̱ঃ। এইরূপে সমুদয়ে সাতাইশটি স্বর উৎপন্ন হয়। এই সাতাইশটি স্বরধ্বনি (অ, ই, উ) তিনটি মূল ধ্বনিরই রূপভেদ মাত্র।

আমরা সংস্কৃত ভাষার লিপি বাঙ্গালা ভাষার জন্য গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু বর্ণগুলির পুরাতন উচ্চারণ রক্ষা করি নাই। 'অ'কারের উচ্চারণ অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে; উহার প্রকৃত উচ্চারণ হ্রস্ব 'আ'। বাঙ্গালা দেশের বাহিরে অকারের প্রাচীন বিশুদ্ধ উচ্চারণ হয়ত এখনও আছে। একটি বিহারী পণ্ডিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠের সময় পড়িতেছিলেন 'মম'; আমার ভ্রম হইয়াছিল, তিনি যেন পড়িতেছেন 'মামা'। হয়ত আকারের এই বিকৃত উচ্চারণ বহু কাল হইতেই চলিত হইয়াছে। প্রাচীন ব্যাকরণ-গ্রন্থেও অকারের বিবৃত ও সংবৃত দ্বিবিধ উচ্চারণের কথা রহিয়াছে। সংবৃত উচ্চারণটা বোধ হয় বাঙ্গালার উচ্চারণেরই অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত বহু স্থলে আমরা অকারের উচ্চারণ হ্রস্ব 'ও'কারের মত করিয়া লইয়াছি। কথাবার্ত্তার ভাষায় আমরা কোন স্বরেরই হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ করি না; খাঁটি বাঙ্গালায় 'ঈ', 'ঊ' রাখিবার প্রয়োজন আছে কি না, সন্দেহ। আবার বাঙ্গালায় প্লুত উচ্চারণ নাই, এরূপ মনে করাও ঠিক নহে। দূর হইতে 'রাম' 'হরি' প্রভৃতির নাম ধরিয়া ডাকিবার সময় রামের 'রা'য়ের আকার ও হরির 'রি'য়ের ইকার তিন মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। এই সকল স্থলে উচ্চারণ প্লুত উচ্চারণ।

ও কর্কশ; স্বরের ধ্বনি স্থায়ী ও মধুর। যাবতীয় সঙ্গীতের কারবার এই স্বরের ধ্বনি লইয়া; ব্যঞ্জন কেবল থাকিয়া থাকিয়া ঠোকর দেয় ও বিরাম দিয়া তাল রক্ষা করে।

থাঁটি স্বরের উচ্চারণে মুখ একেবারে খোলা থাকে বা 'বিবৃত' থাকে। হাওয়া অবাধে বাহির হয়। তবে মুখকোটরটার আকৃতি অনুসারে ঐ স্বরের নানারূপ বিকার উপস্থিত হয়। 'আ' উচ্চারণের সময় আমরা একেবারে বদন ব্যাদান করিয়া হাঁ করিয়া থাকি; তখন জিহ্বাটা মুখগহ্বরের নীচে নামিয়া সঙ্গুচিত হইয়া থাকে। 'ঈ' উচ্চারণের সময় জিহ্বা উপরে উঠিয়া তালুর নিকটবর্ত্তী হয়, জিহ্বার অগ্রভাগ নীচের পাটির দাঁতের পশ্চাতে আসিয়া পড়ে। মুখের কোটর তখন অনেকটা ছোট হইয়া পড়ে। 'উ' উচ্চারণের সময় মুখকোটর আরও ছোট হয়; দুই ঠোঁট কাছাকাছি আসে; দুই ঠোঁটের মাঝে একটি ছোট বিবর উৎপন্ন হয়; ঐ বিবরের দুয়ার দিয়া হাওয়া বাহির হয়। মুখকোটরের আকৃতির ভেদানুসারে স্বরের এইরূপ ভেদ হয়। বাঁশীতে যেমন একটা মূল ধ্বনির সহিত অন্যান্য ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া মূল ধ্বনিকে বিকৃত করে, সেইরূপ মুখকোটরেও কণ্ঠোদ্গত মূল ধ্বনির সহকারে অন্যান্য ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া ও মিলিয়া মিশিয়া মূল ধ্বনির এইরূপ বিকার উৎপাদন করে। একই আ বিকৃত হইয়া 'ঈ'-তে বা 'উ'-তে পরিণত হয়।

প্রকৃত পক্ষে অ ই উ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বরের ধ্বনি একই মূল ধ্বনির সহিত অন্যান্য উচ্চতর ধ্বনির সংযোগে উৎপন্ন; উহারা একই মূল ধ্বনির বিবিধ বিকার মাত্র। কোন্ কোন্ ধ্বনি মিশিয়া কি কি স্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হেলম্‌হোলৎজ্ প্রথমে তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন। 'অ' 'ই' 'উ' প্রভৃতি বিভিন্ন স্বরের মধ্যে কোন্‌টার ভিতর কি কি ধ্বনি আছে, তাহা তিনি বিশ্লেষণ দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং সেই বিশ্লেষণে যে যে ধ্বনি বাহির হইয়াছিল, সেই সেই ধ্বনি মিশাইয়া 'অ' 'ই' 'উ' প্রভৃতি নানাবিধ স্বর যন্ত্রযোগে উৎপাদন করিয়াছিলেন। এ সকল বিজ্ঞানবিদ্যার আলোচ্য। শব্দশাস্ত্রে এ সকল সূক্ষ্ম তত্ত্বের খোঁজ লওয়া দরকার হয় না। এখানে মোটা আলোচনা চলে। এই মোটা আলোচনায় দেখা যায় যে, সংস্কৃত ভাষার প্রচলিত বর্ণমালায় তিনটি স্বর আছে। 'অ' 'ই' 'উ'; এই তিন স্বরের প্রত্যেকের আবার মাত্রাভেদে হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুত এই

তিনটি করিয়া রূপ আছে। উচ্চারণের স্থিতিকালানুসারে মাত্রার নির্ণয় হয়। কালানুসারে এক মাত্রায় হ্রস্ব, দুই মাত্রায় দীর্ঘ, তিন বা ততোধিক মাত্রায় প্লুত।

এইরূপে ঐ তিন স্বরের নয়টি রূপ ; যথা—অ, আ, আ̲ ; ই, ঈ, ঈ̲ ; উ, ঊ উ̲। প্লুতত্ব নির্দ্দেশের জন্য আমরা নীচে একটা রেখা দিলাম। এই নয় স্বরের প্রত্যেকের আবার দুইটি করিয়া ভেদ আছে : নাক দিয়া কতক হাওয়া বাহির করিয়া প্রত্যেক স্বর আমরা নাকি সুরে উচ্চারণ করিতে পারি ; যথা—অঁ (অং) ; অথবা কণ্ঠনালী হইতে জোরের সহিত হাওয়া বাহির করিতে পারি ; যথা—অঃ। এই দুই ভেদ 'অনুস্বার' ও 'বিসর্গ' এই দুই লিপিচিহ্ন দ্বারা লিখিয়া দেখান হয়। 'অনুস্বার' ও 'বিসর্গ' স্বরবর্ণ, না ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহা লইয়া একটা তর্ক আছে ; উহা স্বরও নহে, ব্যঞ্জনও নহে ; উহা স্বরবর্ণের বিকৃতি সাধন করে মাত্র। উল্লিখিত নয়টি স্বরের প্রত্যেকটিরই এই ত্রিবিধ বিকার হইতে পারে ; যথা—অ অঁ অঃ ; আ আঁ আঃ ; আ̲ আঁ̲ আঃ̲। এইরূপে সমুদয়ে সাতাইশটি স্বর উৎপন্ন হয়। এই সাতাইশটি স্বরধ্বনি (অ, ই, উ) তিনটি মূল ধ্বনিরই রূপভেদ মাত্র।

আমরা সংস্কৃত ভাষার লিপি বাঙ্গালা ভাষার জন্য গ্রহণ করিয়াছি ; কিন্তু বর্ণগুলির পুরাতন উচ্চারণ রক্ষা করি নাই। 'অ'কারের উচ্চারণ অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে ; উহার প্রকৃত উচ্চারণ হ্রস্ব 'আ'। বাঙ্গালা দেশের বাহিরে অকারের প্রাচীন বিশুদ্ধ উচ্চারণ হয়ত এখনও আছে। একটি বিহারী পণ্ডিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠের সময় পড়িতেছিলেন 'মম' ; আমার ভ্রম হইয়াছিল, তিনি যেন পড়িতেছেন 'মামা'। হয়ত আকারের এই বিকৃত উচ্চারণ বহু কাল হইতেই চলিত হইয়াছে। প্রাচীন ব্যাকরণ-গ্রন্থেও অকারের বিবৃত ও সংবৃত দ্বিবিধ উচ্চারণের কথা রহিয়াছে। সংবৃত উচ্চারণটা বোধ হয় বাঙ্গালার উচ্চারণেরই অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত বহু স্থলে আমরা অকারের উচ্চারণ হ্রস্ব 'ও'কারের মত করিয়া লইয়াছি। কথাবার্ত্তার ভাষায় আমরা কোন স্বরেরই হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ করি না ; খাঁটি বাঙ্গালায় 'ঈ', 'ঊ' রাখিবার প্রয়োজন আছে কি না, সন্দেহ। আবার বাঙ্গালায় প্লুত উচ্চারণ নাই, এরূপ মনে করাও ঠিক নহে। দূর হইতে 'রাম' 'হরি' প্রভৃতির নাম ধরিয়া ডাকিবার সময় রামের 'রা'য়ের আকার ও হরির 'রি'য়ের ইকার তিন মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। এই সকল স্থলে উচ্চারণ প্লুত উচ্চারণ।

'অ' 'ই' 'উ' ইহাদের পরস্পর সন্ধিতে সন্ধ্যক্ষর কয়টি উৎপন্ন হয়; যথা—

অ+ই=এ; অ+এ=ঐ

অ+উ=ও; অ+ও=ঔ

পদার্থবিজ্ঞানশাস্ত্র এই চারিটি বর্ণের মধ্যে 'এ' এবং 'ও'কে, অন্ততঃ তাহাদের বাঙ্গালায় প্রচলিত উচ্চারণকে, সন্ধ্যক্ষর বলিতে চাহিবেন না। শব্দশাস্ত্রে সন্ধ্যক্ষর বলিলে হানি নাই। সংস্কৃত ভাষায় এই চারিটি স্বর স্বভাবতঃ দীর্ঘ; উহাদের হ্রস্ব উচ্চারণ নাই। বাঙ্গালায় একারের এবং ওকারের হ্রস্ব উচ্চারণই প্রসিদ্ধ।

বাঙ্গালীর মুখে ইকার ও উকার অতি অল্পেই একার ও ওকারে পরিণত হয়; যথা—মিটান,—মেটান; মিশান—মেশান, শুনা—শোনা; বুঝা—বোঝা। হইবারই কথা—সংস্কৃতেও ইকারের গুণে একার এবং উকারের গুণে ওকার প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালার একারের একটা ট্যারচা উচ্চারণ আছে—উপযুক্ত চিহ্নের অভাবে তাহা লিখিয়া দেখান দুষ্কর। এইখানেই তাহার পরিচয় আছে—'একটা' ও 'ট্যারচা' এই দুই শব্দেই পরিচয় আছে। এই পরিচয় কিরূপে দেখাব না 'দ্যাখাব,' তাহা জানি না।

এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত বর্ণমালায় 'ঋ' ও 'ঌ' এই দুইটি বর্ণ স্থান পায়। উহারা স্বরবর্ণমধ্যে গণিত হইলেও খাঁটি স্বর নহে। 'ঋ' উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র প্রায় মূর্দ্ধা স্পর্শ করে; 'ঌ' উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র প্রায় উপর পাটির দাঁত স্পর্শ করে। প্রায় করে,—একটু ফাঁক থাকিয়া যায়; হাওয়া সেই ফাঁক দিয়া বাহিরে আসে। হাওয়াটা একবারে আটকায় না বলিয়া উহাদিগকে ব্যঞ্জনমধ্যে না ফেলিয়া স্বরের মধ্যে ফেলা হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় ঋকারের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় প্রয়োগই আছে; তবে দীর্ঘ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত অধিক নাই। ঌকারের দীর্ঘ প্রয়োগ দেখা যায় না। দীর্ঘ ঌকারকে কেবল symmetry রাখিবার অনুরোধে বর্ণমালায় স্থান দেওয়া হইয়াছে।

'ক' 'চ' 'ট' 'ত' 'প' এই স্পর্শবর্ণ কয়টি মুখকোটরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্পর্শের ফলে উচ্চারিত হয়, দেখা গিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের আবার রূপভেদ আছে। স্পর্শের সময় একটু বেশী চাপ দিলে হাওয়াও একটু জোরে বাহির হয়; তখন 'ক' পরিণত হয় খ'য়ে; 'চ' পরিণত হয় ছ'য়ে। ঐরূপ ট, ত এবং প যথাক্রমে ঠ, থ এবং ফ'য়ে পরিণত হয়। ক চ ট ত প—

এই পাঁচটি বর্ণ অল্পপ্রাণ ; আর খ ছ ঠ থ ফ এই পাঁচটি মহাপ্রাণ। প্রাণ শব্দের অর্থ হাওয়া ; হাওয়া জোরে বাহির হয় বলিয়া নাম হইয়াছে মহাপ্রাণ। আবার হাওয়ার পরিমাণটা বেশী হইলে, প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ আরও গম্‌গমে জম্‌জমে গম্ভীর হইয়া পড়ে ; তখন ক চ ট ত প যথাক্রমে গ জ ড দ ব'য়ে পরিণত হয়। ধ্বনির এই গাম্ভীর্য্যের পারিভাষিক নাম 'ঘোষ ; 'ক'য়ে ঘোষ নাই ; কিন্তু 'গ'য়ে ঘোষ আছে। ঐরূপ 'চ'য়ে ঘোষ নাই ; কিন্তু 'জ'য়ে ঘোষ আছে। ঐরূপ গ জ ড দ ব আবার জোরে উচ্চারণে ঘ ঝ ঢ ধ ভ এই পাঁচ বর্ণে পরিণত হয়। গ জ ড দ ব অল্পপ্রাণ ; তাহাদের তুলনায় ঘ ঝ ঢ ধ ভ মহাপ্রাণ। ক ও খ উভয়েই ঘোষহীন ; উহার মধ্যে আবার ক অল্পপ্রাণ, খ মহাপ্রাণ। গ ও ঘ ঘোষবান্ ; উহার মধ্যে গ অল্পপ্রাণ, ঘ মহাপ্রাণ। এইরূপে প্রাণের ও ঘোষের তারতম্যে ক-বর্ণ 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' এই চারি রূপ গ্রহণ করে ; আর উচ্চারণকালে নাক দিয়া কতক হাওয়া আসিলে উহার অনুনাসিক রূপ হয় ঙ। কাজেই জিহ্বামূলীয় স্পর্শবর্ণ ক-বর্গের অন্তর্গত পাঁচটি বর্ণ ক, খ, গ, ঘ, ঙ। ঐরূপ তালব্য চ-বর্গের অন্তর্গত চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ; মূর্দ্ধন্য ট-বর্গের অন্তর্গত ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ; দন্ত্য ত-বর্গের অন্তর্গত ত, থ, দ, ধ, ন। আমাদের বর্ণমালার ব্যঞ্জনবর্ণগুলি এইরূপে সাজান যাইতে পারে :—

স্পর্শবর্ণ

	ঘোষহীন		ঘোষবান্		অনুনাসিক		
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ		সন্ধ্যক্ষর	উষ্ম
জিহ্বামূলীয়	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	—	—
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	য়	শ
মূর্দ্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	র	ষ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন	ল	স
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম	ব	—

ছেলেদিগকে ক খ শেখাইবার সময় আমরা 'ঙ'কে 'উঙা' বা 'ওঙা' এবং 'ঞ'কে 'ইঞা' বলিতে শিখাই ; উহাদের উচ্চারণ কেন এরূপে বিকৃত করা

হয়, জানি না। আদিতে স্বর না বসাইয়া অন্তে অকার বসাইয়াও এই দুই বর্ণের উচ্চারণ চলে। উহাদের অকারান্ত উচ্চারণ না করিয়া আকারান্ত করিবারও প্রয়োজন দেখি না। বাঙ্গালা ভাষায় 'ণ'য়ের উচ্চারণ লোপ পাইয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু উহা সর্ব্বত্র লুপ্ত হয় নাই। 'কণ্টক' 'কণ্ঠ' 'অণ্ড' 'ঢুণ্ডি' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণের সময় ণকারের প্রকৃত মূর্দ্ধন্য উচ্চারণ আপনা হইতে আসিয়া পড়ে।

সংস্কৃত বর্ণমালার অন্তিম বর্ণ 'হ', ইহাকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলা চলে। 'অ' যেন মহাপ্রাণ হইয়া 'হ'য়ে পরিণত হয়। ইংরেজীতে hএর উচ্চারণ হ; ইংরেজী লিপি দ্বারা কোন বর্ণের মহাপ্রাণ উচ্চারণ দেখান আবশ্যক হইলে অল্পপ্রাণ বর্ণের চিহ্নে h যোগ করা বিধি আছে। যথা, k = ক, kh = খ।

'য়' (y) 'ব' (w) 'র' 'ল' এই চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণকে উল্‌টা রকমের সন্ধ্যক্ষর রূপে গণ্য করা চলিতে পারে।

য় = ই + অ	ব = উ + অ
র = ঋ + অ	ল = ৯ + অ

উহাদের উচ্চারণে মুখ সম্পূর্ণ ভাবে বিবৃতও থাকে না, আবার হাওয়া একবারে আটকানও পড়ে না। কাজেই উহারা না-স্বর, না-ব্যঞ্জন। ইংরেজীতে y ও w পদমধ্যবর্ত্তী হইলে vowel বলিয়াই গণ্য হয়।

'ড' এবং 'ঢ'য়ের বিকার 'ড়' এবং 'ঢ়'কে আমরা এই অন্তঃস্থ পর্য্যায়ে রাখিতে পারি।

সংস্কৃত অন্তঃস্থ য ও অন্তঃস্থ ব বাঙ্গালায় আসিয়া উচ্চারণে বর্গীয় জ ও বর্গীয় ব'য়ের তুল্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঐক্য বাক্য নাট্য, দ্বার দ্বারকা ত্বরা প্রভৃতি শব্দে যুক্ত বর্ণে বিশুদ্ধ অন্তঃস্থ উচ্চারণ পাওয়া যায়।

শ, ষ, স, এই তিনটি বর্ণ আছে; জিহ্বা ঘেঁষিয়া বায়ু বাহির হইবার সময় বায়ুর ঘর্ষণে এই এই ধ্বনি জন্মে; ইহাদের নাম উষ্মবর্ণ। যাঁহারা বলেন, বাঙ্গালায় তিনটি উষ্মবর্ণের প্রয়োজন নাই, এক 'শ'য়েই কাজ চলিতে পারে, তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য নহে। যুক্তাক্ষরের উচ্চারণে আমরা উষ্মবর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করিয়াছি, না রাখিয়া উপায় নাই। অবধান করিলেই বুঝা যাইবে। যথা—নিশ্চয়, পশ্চাৎ, এ স্থলে তালব্য উচ্চারণ; কষ্ট, ওষ্ঠ, এ স্থলে মূর্দ্ধন্য উচ্চারণ; হস্ত, মস্তক, এ স্থলে দন্ত্য উচ্চারণ। ইংরেজী zএর

উচ্চারণ তালব্য উষ্মবর্ণের উচ্চারণ; বাঙ্গালায় ঐ উচ্চারণ আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু উপযুক্ত চিহ্ন নাই।

নরকণ্ঠনিঃসৃত যে সকল ধ্বনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহাদের উৎপত্তি ও প্রকৃতি মোটামুটি দেখান গেল। সংস্কৃত ভাষায় যে সকল ধ্বনি আছে, অন্যান্য ভাষাতেও তাহার অনেকগুলি আছে; কোথাও গোটাকতক কম, কোথাও বা গোটাকতক বেশী আছে মাত্র। সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজান হইয়াছে, অন্য কোন ভাষার বর্ণমালা সেরূপ সাজান হয় নাই। আমরা বাঙ্গালা ভাষায় ঐ বর্ণমালাই গ্রহণ করিয়াছি, তবে সকল বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ স্থির রাখিতে পারি নাই, এবং বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত বর্ণমালার অতিরিক্ত তুই একটা ধ্বনি ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার স্থান ঐ সংস্কৃত বর্ণমালায় নাই।

নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকরণে মনুষ্যের ভাষার কিয়দংশ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য। বাঙ্গালা ভাষার নির্ম্মাণকার্য্যে এই অনুকরণ কত দূর চলিয়াছে, তাহাই এ স্থলে বিচার্য্য। কতিপয় ধ্বনির একযোগে এক একটি শব্দ গঠিত হয়। এক শব্দের উপর এক বা একাধিক অর্থ আরোপ করা হয়। সেই শব্দের সেই অর্থ কোথা হইতে আসিল? শব্দের গঠনে যে যে ধ্বনি উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই ধ্বনির সহিত সেই সেই অর্থের কোনরূপ সম্পর্ক আছে কি না, তাহা দেখান আবশ্যক; তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে, কেন ঐ শব্দ ঐরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে।

দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বলা বাহুল্য যে, অধিকাংশ স্থলেই আমাদিগকে নিরবচ্ছিন্ন অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। শব্দশাস্ত্রের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় অন্য উপায় নাই।

প্রথমে আ ই উ এই স্বরত্রয়ের ভেদ কোথায় দেখা যাউক। 'আ' উচ্চারণে আমরা বদন ব্যাদান করি; মুখকোটরের পরিসর ও বিস্তার যথাশক্তি বাড়াইয়া লই। 'ই' উচ্চারণে মুখকোটরের বিস্তার ছোট হইয়া পড়ে। 'উ' উচ্চারণে আরও ছোট হয়। আমি বলিতে চাহি যে, ঠিক এই জন্যই law of association অনুসারে 'অ' 'ই' 'উ' এই তিন স্বরের মধ্যে আ বড় বুঝায়; ই তার চেয়ে ছোট, উ আরও ছোট বুঝায়।

বাঙ্গালায় টা, টি, টু, এই তিনটি প্রত্যয় আছে। যথা—একটা, একটি, একটু। একটা বলিলে যত বড় জিনিস বুঝায়, একটি বলিলে তার চেয়ে

ছোট বুঝায়, একটু বলিলে আরও ছোট, অর্থাৎ অতিঅল্প মাত্র বুঝায়। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন না কি কোন রাজাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি রাজা-টি নও, রাজা-টা ; আমিও পণ্ডিত-টি নই, পণ্ডিত-টা।"

চ ক চ কে বলিলে উজ্জ্বল দ্রব্য বুঝায় ; চি ক্ চি কে দ্রব্যের ঔজ্জ্বল্য তার চেয়ে অল্প ; চু ক্ চু কে দ্রব্যের ঔজ্জ্বল্য বোধ করি আরও অল্প।

ক ড় ক ড়ে বলিলে কর্কশ বুঝায় ; কি ড় কি ড়ে দ্রব্যের কার্কশ্য তার চেয়ে অল্প।

রাঙা ট ক্ ট কে রঙের তীব্রতার চেয়ে রাঙা টু ক্ টু কে রঙের তীব্রতা অল্প।

প ট্ প টে দ্রব্য হাল্‌কা ও ভঙ্গপ্রবণ ; পি ট্ পি টে দ্রব্য আরও হাল্‌কা ; পু ট্ পু টে দ্রব্য এত ভঙ্গুর যে, বোধ করি, স্পর্শ সহিতে অক্ষম।

চ ন্ চ নে রৌদ্র চেয়ে চি ন্ চি নে রৌদ্রের দীপ্তি অল্প।

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া দরকার নাই। এই কয়টি দৃষ্টান্তেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হইয়াছে, আশা করি। অ, ই, উ, এই তিন স্বর একই ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইয়া কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাব জ্ঞাপন করে, তাহাই দেখান আমার উদ্দেশ্য। ঐ তিন স্বরের মধ্যে যেটির উচ্চারণ যত প্রযত্নসাপেক্ষ, যেটির উচ্চারণে মুখকোটরের পরিসর যত বড় করিতে হয়, মুখের হাঁ যত বড় করিতে হয়, সেই স্বর ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইয়া তত আধিক্য জ্ঞাপন করে। অ, ই, উ, এই তিন স্বরের এই অর্থভেদ পাঠক অনুগ্রহ-পূর্ব্বক মনে রাখিবেন।

এখন ব্যঞ্জনবর্ণগুলি লইয়া আলোচনা করিব। ক-বর্গ হইতে প-বর্গ পর্য্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জন খাঁটি স্পর্শবর্ণ। ঐগুলির আলোচনা প্রথমে করিব। একটু উলটাইয়া লইব। ক-বর্গে আরম্ভ না করিয়া প-বর্গে আরম্ভ করিব ও ক-বর্গে শেষ করিব।

প-বর্গ

প ফ ব ভ, এই চারি বর্ণের উচ্চারণে মুখকোটরের বায়ু দুই ঠোঁটের মধ্য দিয়া বাহির হয়। দুই ঠোঁট জোড়া হইয়া বায়ুর পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে ; বায়ু ঠোঁট দুইখানিকে ভিন্ন করিয়া তাহাদের মাঝে পথ করিয়া লইয়া জোরের সহিত বাহির হয়। শূন্যগর্ভ ফাঁপা দ্রব্যের কঠিন আবরণের

মধ্যে আবদ্ধ বায়ু সেই আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিলেই এই শ্রেণীর ধ্বনি জন্মে।

বাঁশী বাজাইবার সময় দুই ঠোঁটের চাপ দিয়া মুখের বায়ু বাঁশীর ভিতরে ঠেলিয়া দিতে হয়; বাঁশীতে যে ধ্বনি বাহির হয়, তাহার অনুকরণে আমরা বলি পোঁ শব্দে বাঁশী বাজিল। আগুন জ্বালিবার জন্য আমরা এইরূপে ফুঁ দিয়া থাকি। মহাদেব গাল বাজাইতেন, তাঁহার মুখের বায়ু বাহির হইবার সময় ব ম্ ব ম্ শব্দ হইত; মহাদেবের শিঙা ভ ভ ম্ভ ম্ শব্দে বাজিত। এই কয়টি দৃষ্টান্তেই দেখিতেছি যে, প-বর্গের ধ্বনির সহিত বায়ুপূর্ণ ফাঁপা দ্রব্যের স্বাভাবিক ধ্বনির সম্পর্ক রহিয়াছে। বায়ুপূর্ণ দ্রব্যের অভ্যন্তর হইতে বাতাস বাহির হওয়ার সময় এইরূপ ধ্বনির উৎপত্তি হইয়া থাকে। আরও দৃষ্টান্ত প্রত্যেক বর্ণের বিচারে পাওয়া যাইবে।

প

হাঁসে প্যাঁ ক্ প্যাঁ ক্ শব্দ করে; উহার দুই ঠোঁটের ভিতর হইতে ঐ শব্দে বাতাস বাহির হয়। পাঁক বা কর্দ্দমের ভিতর বায়ুর বুদ্বুদ আবদ্ধ থাকে; হাতে টিপিলে উহা বাহির হইয়া যায়; এই হেতু পাঁকের মত জিনিস প্যাঁ ক্ প্যাঁ ক্ করে; উহা প্যাঁ ক্ পেঁ কে। সংস্কৃত প ঙ্ক (বাঙ্গালা পাঁ ক) শব্দের সহিত এই ধ্বনির কোন সম্পর্ক আছে কি? কীটের নাম পোঁ কা হইল কেন? উহার অস্থিহীন প্যাঁকপেঁকে ফাঁপা শরীরের জন্য না কি?

হালকা ভঙ্গপ্রবণ কঠিন দ্রব্য ফাটিবার সময়ে বায়ু সেই ফাট দিয়া বাহির হইলে প ট্ শব্দ হয়; উহার রূপান্তর প টা স ও প টা ং। যাহা প ট্ করিয়া ফাটে, তাহা প ট কা; প ট কা ছোঁড়া হইতে প ট কা ন। সংস্কৃতে পি ট ক ও পে ট ক শব্দ না থাকিলে বলিতাম, পে ট, পে ট রা প্রভৃতি শব্দও শূন্যগর্ভতার জ্ঞাপক। অন্ততঃ পোঁ ট লা পুঁ টু লি র ভিতরটা ফাঁপা বটে। পুঁ টি মাছ ও পুঁ টি খুঁকি কি জন্য ঐ নাম পাইয়াছে? প প্প টী (সংস্কৃত) ও পাঁ প ড় (বাঙ্গালা) হালকা দ্রব্য। ফাটিবার শব্দ প ট্ প ট্, পি ট্ পি ট্, পু ট্ পু ট্ ইত্যাদি; হালকা ভঙ্গপ্রবণ দ্রব্যের বিশেষণ প ট প টে, পি ট পি টে, পু ট পু টে।

প'য়ের পরবর্ত্তী মূর্দ্ধন্য বর্ণ ট কাঠিন্যব্যঞ্জক [পরে দেখ]। কাপড় ছেঁড়ার শব্দ প ড় প ড়—উহা কর্কশ শব্দ; এখানে ড় কার্কশ্যবোধক।

মুখের ভিতর হইতে থুথু ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে কতকটা বাতাসও বাহির হয়; প চ্ পি চ্ পি ৎ থুথু ফেলার শব্দ। পি চ্ শব্দ সহকারে পি চ কা রি হইতে জল বাহির হয়। মুখ হইতে নিঃসৃত তাম্বূলরসের নাম পানের পি ক। থুথুর মত যাহাতে ঘৃণা জন্মায়, তাহা প চ প চ করে, পি চ পি চ করে, পি ৎ পি ৎ করে, প ল প ল, পি ল পি ল, প্যা ল প্যা ল করে। প চা জিনিস পচ পচ করে ও ঘৃণা জন্মায়; পোঁ টা, পাঁ চ ড়া ও পি চু টিও ঐরূপ ঘৃণাকর। প চ ই মদ াত প চা ই য়া প্রস্তুত হয়। প লু পোকা নিশ্চয় তাহার কোমল শরীর হইতে নাম পাইয়াছে। এই সকল শব্দে প'য়ের সহিত যুক্ত চ, ত, ল বর্ণগুলি তারল্যের ব্যঞ্জক [পরে দেখ]। প ন প নে, পি ন পি নে, প্যা ন পে নে শূন্যগর্ভ লঘুতার পরিচয় দেয়।

ফ

প'য়ের তুলনায় ফ-বর্ণ মহাপ্রাণ; ফ উচ্চারণে হাওয়া আর একটু জোরে বাহির হয়। শেয়ালে সময় অসময়ে ফে উ ডাকে; তজ্জন্যই কি শেয়ালের নাম ফে রু? আগুনে ফুঁ দেওয়া হয়; উহার সংস্কৃত নাম ফু ৎ কা র। ফাঁপা জিনিসের ভিতর হইতে বাতাস বাহির হইলেই শব্দ হয় ফ স্, ফি স্, ফু স্; ফ'য়ের পরবর্ত্তী উষ্মবর্ণ সকার বায়ুর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। সাপের মুখের ভিতর হইতে বাহির হয় ফোঁ স্। লোকে ফু স ফা স করিয়া বা ফি স ফি স করিয়া কথা কহে বা গোপনে পরামর্শ করে। গোপনভাবে কানের কাছে ফু স ফা স করিয়া কোন ব্যক্তিকে বিপথে চালাইবার চেষ্টার নাম ফু স লা ন। বুকের ভিতর যে যন্ত্র হইতে শ্বাসবায়ু বাহির হয়, তাহার নাম ফু স ফু স। যে জাদুবিদ্যা—ডাইনের বিদ্যা জানে, সে ফুসফাস মন্ত্র পড়িয়া অন্যকে বশীভূত করে—সেই জাদুকরের নাম ফো ক স।

ফি ক্ ক'রে হাসিলে মুখের কিঞ্চিৎ বাতাস বাহিরে আসে। সে হাসি হো হো হাসি নয়; উহা মৃদু হাসি, হালকা হাসি। কোন রঙ যখন

হালকা হয়, তখন তাহাকে ফিকে বলে; ফিকে রঙের গাঢ়তা নাই; অত্যন্ত ফিকে হইলে উহা প্রায় সাদাটে হইয়া ফ্যাকসাতে পরিণত হয়।

ফাঁকের ভিতর বাতাস থাকে; ঐ ফাঁক শূন্যগর্ভ স্থান মাত্র। উহার নামান্তর ফোঁক ও ফোকর বা ফুকর। যে কাজের ভিতরে কিছু নাই, তাহা ফাঁকি, বা ফক্কিকারি, বা ফক্করি, বা ফোক্কা। যাহা ফাঁকি, তাহার ভিতর শূন্য; উহা মিথ্যা জিনিস; ভট্টাচার্য্যদের ন্যায়ের ফাঁকিও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। ফাঁকি দেওয়া যাহার ব্যবসায়, সে ফিঁচেল। বন্দুকে গুলি না ভরিয়া কেবল মিথ্যা আওয়াজ করিলে উহা ফাঁকা আওয়াজ হয়। ফুঁ দিয়া কাচের যে শূন্যগর্ভ শিশি তৈয়ার হয়, তাহা ফুঁকো শিশি। ফুকরিয়া ক্রন্দন অকারণে উচ্চ শব্দে ক্রন্দন। গোয়ালার ফুঁকো দেওয়া প্রসিদ্ধ।

মুখ হইতে জল ফেলানর বা থুথু ফেলানর শব্দ ফচ্। যেখানে সেখানে মুখের জল ফেলা বা থুথু ফেলা সভ্য সমাজে গর্হিত; ঐ কার্য্য তরল চিত্তের লক্ষণ; লঘুপ্রকৃতি তরলচিত্ত লোকের চলিত বিশেষণ ফচ্কে। গাড়ীর ঘোড়া হঠাৎ ভয় পাইয়া তরল ও চঞ্চল হইয়া উঠে বা ফচ্কিয়া উঠে। যে লঘুপ্রকৃতি শিশু কথায় কথায় কাঁদে, সে ফেঁচ-কাঁদুনে।

যে সকল দ্রব্য শূন্যগর্ভ, ভিতরে বায়ুপূর্ণ, তাহা ফাঁপা; চামড়ার উপর ফোস্কা পড়িলে উহা বায়ুপূর্ণ বুদ্বুদের মত দেখায়; ছোট ফোস্কার নাম ফুস্‌কুরি বা ফুস্কুরি। যাহা ফোস্কার মত ফাঁপা, তাহা ফস্কা; উহাকে চাপিয়া ধরিতে গেলে ফসকিয়া যায়। ফুস্কুরির প্রকারভেদ ফোড়া। ভুঁই-ফোড় মানুষ সহসা সমাজ ফুড়িয়া ফাঁপিয়া উঠে ও হয়ত ফোড়ার মত যন্ত্রণা দেয়। ছুঁচে ফোড় তুলিবার সময়ও ছুঁচ হঠাৎ এ-পিঠ হইতে ও-পিঠে ফুটিয়া আসে। নিতান্ত যাহা ফাঁকি, গ্রাম্য ভাষায় তাহা ফুঁসি। ফোঁফল, ফোঁপড়া, ফ্যাঁপড়া জিনিস আকারে প্রকারে এই ফাঁপাল শ্রেণীর। প্রবল তুফানে নদীর জল ফাঁপিয়া উঠিলে হয় ফাঁপি।

ফাঁপার প্রকারভেদ ফোলা; ভিতরে বাতাস ঢুকিয়া দ্রব্যকে ফুলাইয়া রাখে। যাহাকে বাতাসে ফুলাইয়া রাখে, তাহা ফুলকো। পুষ্পকোরক ফুলিয়া উঠিয়া ফুলে পরিণত হয়। ফুলকো, ফুলকি, ফুলুরি প্রভৃতির ভিতরটা ফোলা।

কঠিন পদার্থ,—যেমন কাচ, পাতর,—ফ ট্ শব্দ করিয়া ফা টে; মূর্দ্ধন্য ট-বর্ণ কাঠিন্যবোধক। ফা টা জিনিসের মাঝে যে ফাঁক থাকে, তাহা বায়ুপূর্ণ, উহার নাম ফা ট ও ফা টা ল। ছোট ফাটের নাম ফু টা; এখানে ফা টে র আ-কার ফু টা র উ-কারে পরিণত হইয়া ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দেয়। মাটির বাসন ফু ট শব্দ করিয়া ফু টো হয়। গরম জল ফু ট ফু ট শব্দে বুদ্বুদ জন্মাইয়া ফু টি য়া থাকে। হাতের আঙুলে চাপ দিলে আঙুল ফু ট করিয়া ফো টে। দুই হাতে ফাঁক করিয়া ধরিয়া খেলিবার তাস ফাঁ টা যায়। ফু ট কলাই ও ফু টি শসার ফাট অতি স্পষ্ট। ফি ট বাবু ফু ট ফু টে গৌরবর্ণ ফি ট ফা ট বেশবিন্যাস করেন, কিন্তু তাঁহার ভিতরটা হালকা। প্রাচীরের মধ্যে বৃহৎ ফা টে র বা দুয়ারের নাম কি ফ ট ক?

জল ফু টি বা র সময় যে জলকণিকা উদ্গত হয়, তাহা জলের ফো টা; সামান্যতঃ জল-কণিকা মাত্রই জলের ফোঁটা। ভ্রাতৃললাটে ভগিনীদত্ত তিলকবিন্দু ভাই-ফোঁ টা।

এক ফোঁটা জলের ভিতর বাতাস ঢুকিয়া উহাকে ফাঁপাইয়া ফোলাইয়া তোলে; জলবিন্দু বিস্তৃতি লাভ করে; অতএব বিস্তৃত জিনিসের নাম ফ য় লা। কোন ব্যবসায় বিস্তৃতি লাভ করিলে তাহা হয় ফা লা ও কারবার। ঐরূপ কারবার অল্প স্থান হইতে অধিক স্থানে, নিকট হইতে দূরে ছড়াইয়া পড়ে। নিকট হইতে দূরে ছড়ানর নাম ফে লা। যাহার দৃষ্টি দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, অথচ তাহার ভিতরে কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, তাহা এক রকম শূন্যগর্ভ দৃষ্টি, সে ফ্যা ল ফ্যা ল করিয়া তাকায়। ফা ল্ তো জিনিস ফেলা ছড়ার জিনিস। ফো তো কাজে মিছা সময় নষ্ট হয়। ফাটার প্রকারভেদ ফাঁ সা—তেলের কলসী ফাঁ সি য়া গেলে তেল ছড়াইয়া পড়ে; তেলের সঙ্গে বায়ু মিশ্রিত হইয়া ফাঁ সা র ফ'য়ের পরবর্ত্তী উষ্মবর্ণ স ধ্বনির সৃষ্টি করে। কর্কশ কাঠকে ফা ড়ি য়া দ্বিখণ্ড করা চলে। কাপড়ের মত ফ র ফ রে বা ফু র ফু রে জিনিসকেও ফা ড়ি য়া ছিঁড়িতে হয়।

মানুষ যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়, তাহার ভিতরটা ফাঁ কা হয়; তাহার মনের ভিতর কর্ত্তব্যবুদ্ধি আসে না, ভিতরটা শূন্য হয়; তখন সে ফাঁ ফ রে পড়ে।

ফাঁদের ভিতরে পা দিলে পা আটকাইয়া যায়। ফন্দি-বাজ লোকে নানাবিধ ফাঁদ ফাঁদে।

ফষ্টি নষ্টি, ফটকি-নাটকি, ফুইফুটি প্রভৃতি গ্রাম্য শব্দ এই শ্রেণীতে আসিবে।

গুম্ফমধ্যে কেশগুলিকে বিছাইয়া ছড়ান অর্থে ফরকান। উহা একটা অহেতুক তেজস্বিতার আড়ম্বর। যাহার ভিতরে জোর নাই, যে বাহিরে ফুলিয়া তেজ দেখায়, সে ফরকায়।

হাওয়ার বেগে পাতলা কাপড় ফরফর করিয়া উড়ে; যে কাপড় যত পাতলা, বাতাসে তাহা তত ফাঁপিয়া উঠে; অধিক পাতলা হইলে সে কাপড় হয় ফুরফুরে। পাতলা কাপড় যেমন হাওয়ায় চঞ্চল, সেইরূপ চঞ্চল প্রকৃতির মানুষও ফরফরে। গণ্ডূষ-জল মাত্রেই চঞ্চল হইয়া শফরী ফরফরায়তে ইতি প্রসিদ্ধি।

জলবুদ্বুদের নামান্তর ফেনা; ফেনা শব্দটি কিন্তু সংস্কৃতমূলক। ফেনার মত যাহা দেখিতে, তাহা ফ্যানফেনে বা ফনফনে; উহার বাহিরটা জমকাল, ভিতরটা শূন্য। মিহি ধুতি যাহার বিস্তৃতি আছে, কিন্তু যাহা টান সহে না, যাহার জোর নাই, তাহা ফিন্‌ফিনে। বৃষ্টি অত্যন্ত মিহি ধারায় পড়িলে বলা যায় ফিন্ ফিন্ বা ফাঁই ফুঁই বৃষ্টি পড়িতেছে।

ফের ফের যে কর্ম্ম করা যায়, তাহার মধ্যে কালগত ব্যবধান বা ফাঁক থাকে। যাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে, তাহাও ঐরূপ একটু ফাঁক দিয়া কিছু ক্ষণ পরে আসে। ফিরি-ওয়ালা ফের ফের বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া মাথায় ফেরি লইয়া বেড়ায়। ফিরতি প্রত্যাবর্ত্তনের মত প্রত্যাদানের নাম ফেরত দেওয়া।

আগুনের হালকা কণিকার নাম ফিনকুটি। ফানুসের ভিতরটাও ফাঁপা।

দেখা গেল, এই সকল শব্দে একটা সাধারণ ভাব ব্যক্ত করে। বায়ুপূর্ণ, শূন্যগর্ভ, স্ফীতোদর, লঘু—এই ভাবটাই প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। সংস্কৃত প্র-স্ফুরিত, প্র-ফুল্ল, বি-স্ফারিত, স্ফীতি, স্ফোটন, ফণ, ফেন প্রভৃতি শব্দগুলিতেও এই ভাব আছে। উল্লিখিত বাঙ্গালা শব্দের মধ্যে কতকগুলি এই জাতীয় সংস্কৃত মূল হইতে উৎপন্ন, তাহা বলা বাহুল্য।

ব

প ও ফ'য়ে যে বায়ুর চলাচল দেখিয়াছি, ব'য়েও সেই বায়ুর চলাচল ব্যাপার আরও স্পষ্ট।

আমরা বিস্মিত হইয়া মুখের বাতাস জোরে বাহির করি ও বলি বা:; ইহার প্রকারভেদ বস্ ও বাস্; ইহা বিস্ময়সূচক ধ্বনি; বাঃ হইতে বাহবা। বাতাস যখন জোরে বহে, তখন বোঁ বোঁ শব্দ হয়; জোরে বাতাস ঠেলিয়া কোন জিনিস ঘুরিতে থাকিলে বাতাসে বন্‌বন্ শব্দ হয়, জিনিসটা বন্‌বন্ করিয়া ঘোরে। এই জন্যই কি বাতাসের নাম সংস্কৃত ভাষাতেও বায়ু? বোম আর বোমা (ইংরেজী bomb) স্পষ্টতই ধ্বনির অনুকরণজাত।

পায়রার মুখের শব্দ বক্‌বকম্। মানুষেও মুখের হাওয়া প্রচুর পরিমাণে খরচ করিয়া বক্‌বক্ করিয়া কথা কয় অর্থাৎ বকে। ইহার সংস্কৃত রূপ বচন বা বাক্য। অধিক বকিলেই বকাবকি হয়। যে বেশী বকে, সে বখা; কাজকর্ম্ম না করিয়া কেবল বাক্যবাগীশ হইলে বখিয়া যায়। যে নির্ব্বোধ, যথাসময়ে বাক্য প্রয়োগ করিতে বা বলিতে জানে না, সে বোকা। একেবারেই বকিতে না পারিলে সে হয় বোবা। অধিক কথা কহিলে বা জোরে কথা কহিলে বকা হয়; আর যেমন-তেমন কথা কহিলেই বলা হয়। যাহা বলা যায়, তাহা বোল বা বুলি; উহা কি সংস্কৃত বদ্ ধাতু হইতে আসিয়াছে? রাঢ়দেশে ধর্ম্মঠাকুরের জাগরণ উপলক্ষে বোলান গান হয়। অতি নিকট-আত্মীয় পিতা ঠাকুরকে শিশু যখন মুখ ফুটিয়া প্রথম আধস্বরে সম্ভাষণ করে, তখন তাহাকে বাবা বলিয়া ডাকাই স্বাভাবিক; বাবার প্রকারভেদ বাবু ও বাপু। ব'ক পাখীর নাম কি তাহার ডাক হইতে? বাবুই পাখীর স্বর কিরূপ? বুলবুল পাখী মিষ্ট বুলি বলে। বোলতা উড়িবার সময় বোঁ বোঁ শব্দ হয়; উহা বাতাসে ডানা সঞ্চালনের শব্দ।

বকিবার ইচ্ছা প্রবল হইলে বুকবুকনি হয়; ইহা অন্তঃকরণের একটা চাঞ্চল্য। কর্কশ বাক্য, যাহা কানে বাজে, তাহা বড়বড় বা বড়র বড়র; উহা আরও নিম্নস্বরে অস্পষ্টভাবে হইলে বিড়বিড় বা বিড়ির বিড়ির হইয়া পড়ে। ব'য়ের পরবর্ত্তী বর্ণ ড় কার্কশ্যব্যঞ্জক।

বুচকি, বোচকা, বোঁচা, বুঁচো, বচকানি প্রভৃতি শব্দ অন্য শ্রেণীতে আসিবে। সম্ভবতঃ উহারা পোঁটলা পুঁটলির মত শূন্যগর্ভতার ব্যঞ্জক।

বর্‌বটি কলাই, বোড়া কলাই, বোড়া ধান, কি তাহাদের লঘুতার সহকারী কাঠিন্য ও কার্কশ্য হইতে নাম পাইয়াছে?

মূর্দ্ধন্য বর্ণ যেমন কার্কশ্য বুঝায়, তালব্য বর্ণ তেমনই তারল্য জ্ঞাপন করে। দৃষ্টান্ত—বজবজ, বজবজে, বিজবিজ, ব্যাজবেজে ইত্যাদি। বজবঁজে বিশেষণের প্রকারভেদ বদবদে। যে খাদ্য দ্রব্য বদবদ করে, তাহারই আস্বাদন বুঝি বোদা; উহাতে কোন রসের তীব্রতা বা ঝাঁঝ নাই।

ভ

ব'য়ের মহাপ্রাণ উচ্চারণ ভ। জানোয়ারের মধ্যে ভেড়া ভ্যাভ্যা করিয়া ভ্যাবায়; কুকুরে ভেউ ভেউ করিয়া ডাকে; মাছি ভ্যান্‌ ভ্যান করে, মশা ভন্‌ভন্‌ করে; ভিমরুল ভোঁ ভোঁ শব্দে উড়ে; ভোমরা (সংস্কৃতে ভ্রমর) ভ্যানর ভ্যানর করিয়া উড়ে। যে বাদ্যযন্ত্রে ভ্যাভ্যা করে, তাহা ভেরী। ছোট বাঁশীর নাম ঐ কারণে ভেঁপু।

জলমগ্ন কলসীর বাতাস জল ভেদ করিয়া ভকভক, ভুকভাক, ভুকভুক, ভরভর, ভুরভুর শব্দে বাহির হয়। বাতাস বাহির হইবার সময় যে বুদ্বুদ জন্মে, তাহার নাম ভুড়ভুড়ি; পত্রমধ্যে আবদ্ধ বায়ু সঞ্চরণের সময় ভটভট ভুটভাট শব্দ করে।

বাতাস ভেদ করিয়া কোন জিনিস বেগে ঘুরিলে যেমন বন্‌বন্‌ বা বোঁ বোঁ শব্দ হয়, সেইরূপ বাতাস ভেদ করিয়া বেগে দৌড়িলে ভোঁ দৌড় হয়। ফ'য়ের ধ্বনি যেমন শূন্যগর্ভতা বুঝায়, ভ'য়ের ধ্বনিতেও সেইরূপ শূন্যতার বা রিক্ততার ভাব আসে, যথা মনুষ্যহীন গৃহ ভাঁ ভোঁ বা ভোঁ ভাঁ করে। যাহার ভিতরে কিছুই নাই, তাহা ভুয়া; স্থূলকায় অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি, যাহার ভিতরে পদার্থ নাই, হয়ত একটা মোটা ভুঁড়ি আছে, তাহার বিশেষণ ভোমা; অন্তঃসারশূন্য লোকের বাহিরে আড়ম্বর ভিটকেলি। উদ্দেশ্যহীন মিথ্যা অনুকরণ ভেঙান বা ভেঙচান।

অনাবশ্যক মিথ্যা দুঃখের অভিনয় ভেবি। মিথ্যা প্ররোচনা ভুচুং। শস্যের ভিতরের সার বাহির করিয়া লইলে সারহীন ত্বক্ অবশিষ্ট থাকে, উহা ভুষি। লঘু অঙ্গারকণা ভুষা। মিথ্যা প্রতারণার নাম ভাঁড়ান। অন্তঃসারহীন আড়ম্বর প্রকাশের নামান্তর ভড়ঙ; যে জিনিসের ভড়ঙ আছে, তাহা ভড়কাল; ভড়ক দেখান অর্থে ভড়কান। বহু জনতার আড়ম্বর ভিড়। ভ্রান্ত মিথ্যা দৃষ্টির নাম ভেলকি। যে মানুষটার ভিতরে বুদ্ধির তেজ নাই, সে ভকুয়া। শূন্যগর্ভ বায়ুপূর্ণ জিনিস হালকা; হালকা জিনিস জলে ভাসে; যাহা ভাসে, তাহা অস্থির এবং চঞ্চল; ভাসাভাসা কথার উপর ভর দেওয়া চলে না। হালকা জিনিস—যাহার ভিতরটা সচ্ছিদ্র ও বায়ুপূর্ণ—যেমন চিনির বাতাসা—উহা ভস্‌ভসে; উহা ভুস্‌ভুস্‌ করিয়া সহজে ভাঙিয়া যায় বা গুঁড়া হয়। ঐরূপ জিনিসই ভসকা, ভুস্‌ভুসে বা ভুরভুরে। ইক্ষুরসজাত গুড় যখন ঐরূপ হালকা গুঁড়ায় পরিণত হয়, তখন তাহা ভুরা। মনের ভিতরে স্মৃতি যখন লুপ্ত হইয়া মনকে শূন্য করিয়া ফেলে, তখন ভুল হয়। ভুল করা যাহার স্বভাব, সে ভোলা। উদাসীন মহাদেবের ভোলা-নাথ নাম সার্থক।

ভ-বর্ণ মহাপ্রাণ ও ঘোষবান্; উহাতে স্থূলতা জ্ঞাপন করে। ভোমা শব্দে এই স্থূলত্বের ভাব আসে দেখিয়াছি। ভোঁসার অর্থও মোটা অকর্ম্মণ্য মানুষ; ভাঁটা, ভোঁদা, ভ্যাদা, ভোঁদড়, ভদভদে প্রভৃতি শব্দও ঐরূপ অর্থ সূচনা করে। ভুলকো তারা উষাকালের পূর্ব্বাকাশে উদিত শুকতারার গ্রাম্য নাম, নিশ্চয় ঐ তারার স্থূলত্বের ও উজ্জ্বলতার জ্ঞাপক। হাতিয়ারের ধার মোটা হইয়া ঐ হাতিয়ার অকর্ম্মণ্য হইলে ভোঁতা হয়। ভাঙড় ভাঙের নেশায় ভোঁ হইয়া বসিয়া থাকে।

শূন্যগর্ভ দ্রব্য স্থূল দ্রব্যে পূর্ণ হইলে ভরিয়া উঠে বা ভরাট্ হয় বা ভরপূর হয়। সোনারূপার মত স্থূল ভারী জিনিস ভরির ওজনে পরিমিত হয়।

ম

প হইতে ভ পর্য্যন্ত ধ্বনিতে আমরা বাতাসের খেলা দেখিয়াছি; ওষ্ঠ্য বর্ণের বিশিষ্টতাই এই বাতাসের খেলা লইয়া। কোন স্থানে বায়ুর

নিষ্ক্রমণকালে শব্দ হইতেছে, কোথাও বাতাস ঠেলিয়া চলিতে শব্দ হইতেছে, কোথাও বা বাতাস ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়া ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া রাখিতেছে। প-বর্গের পঞ্চম বর্ণ ম'য়ের ধ্বনিতে এ ভাবটা আর তত প্রবল থাকে না; ম'য়ের অনুনাসিকত্বই প্রবল হইয়া প-বর্গের বিশিষ্ট ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অনুনাসিক বর্ণের বিশেষ লক্ষণ মৃদুতা সম্পাদন; উহা কঠোরকে মৃদু করে, কঠিনকে মোলায়েম করে।

ম-কারাদি কতিপয় শব্দ স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে জাত। যথা, বাঁশের লাঠি মচ্ করিয়া ভাঙে; মচ শব্দে বাঁকানর নাম মচকান; মচ শব্দ খাট হইয়া মুচ হয়; ছোট কঞ্চি মুচ করিয়া ভাঙে। এইরূপ জিনিস মুচমুচে। মুচ্ শব্দ করিয়া মৃদুস্বরে হাসি মুচকিয়া হাসি। মচকানর প্রকারভেদ মোচড়ান। কোন জিনিসে পাক-লাগানর নাম মোচড় দেওয়া। মোচড়ানর রূপভেদ মোশড়ান; প্রবল চাপে মুশড়িয়া দেওয়া হয়; মানুষের আত্মা পর্য্যন্ত আকস্মিক বিপদের চাপে মুশড়িয়া যায়।

বাঁশ চেয়ে কাঠ কঠিন জিনিস; বাঁশ মচ্ শব্দে মচকায়; কাঠ মট্ শব্দে মট্কায়। তালব্য চ যোগে কোমলতা বুঝায়, আর মূর্দ্ধন্য ট যোগে কাঠিন্য বুঝায়। আঙুল মট্কাইলে মট্মট্ শব্দ হয়; শব্দ তার চেয়ে মৃদু হইলে মুটমুট হয়। পুঁইশাকের ছোট ছোট ফলগুলিকে গ্রাম্য ভাষায় পুঁই-মুটমুটি বলে; উহা মুটমুট করিয়া ভাঙে। কলাইশুটির ভিতরের বীজ মটর। যাহা ভাঙিলে মট্ শব্দ হয়, অর্থাৎ যাহা ভাঙিতে জোর লাগে, তাহা মোটা অর্থাৎ স্থূল। মটকা কাপড় কি মোটা কাপড়? মটকি ঘৃত কিরূপ? মোটা কাঠ মটমট শব্দে, কখন কখন আরও কর্কশ মড়মড় শব্দে ভাঙে; হঠাৎ একটা প্রবল চাপে ভাঙিলে শব্দ হয় মটাং ও মড়াং। বশিষ্ঠ ঋষি বাল্মীকির আশ্রমের বাছুরটিকে মড়মড়ায়িত করিয়াছিলেন। মড়মড়ের চেয়ে ছোট মৃদু শব্দ মুড়মুড়; ছোট ছোট ভঙ্গপ্রবণ জিনিস মুড়মুড় করিয়া ভাঙে বলিয়া মুড়মুড়ে হয়। মুড়মুড় শব্দে যাহা চিবান যায়, তাহা মুড়ি; উহার প্রকারভেদ মুড়কি। বনমধ্যে গাছের পাতা নড়িয়া কবি-প্রিয় মর্ম্মর শব্দ জন্মায়।

ম ধ্বনির মৃদুতার পরিচয় অনেক জানোয়ারের ডাকে পাওয়া যায়; ভেড়ার ভ্যা ভ্যা শব্দ কর্কশ; ছাগলের ম্যা ম্যা শব্দ তাহা অপেক্ষা ক্ষীণ ও মৃদু ও মোলাম। বিড়ালের ছানার মিউ মিউ শব্দ বড় মৃদু; বড় বিড়ালের গম্ভীর গলায় উহা ম্যাও ম্যাও হইয়া পড়ে। যাহার স্বভাব কোমল, সে যেন বিড়ালছানার মত মিউ মিউ করে; তাহাকে বলা যায় মিউমিউয়ে বা মি-মিয়ে বা মিনমিনে। শুকনা মাটির চেয়ে ভিজা মাটি মোলাম; উহা ম্যাজ ম্যাজ করে; ভিজা মাটি ম্যাজমেজে। মৃদুস্বভাব মানুষের বিশেষণ ম্যাদা। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যখন কোমল জ্যোতি বিস্তার করে, তখন উহা মিটমিট করে; মিটমিট করিয়া তাকাইবার সময় চক্ষু হইতে মৃদু জ্যোতি বাহির হয়। নরম চামড়ার জুতা-পায়ে চলিলে মশমশ শব্দ হয়। কাপড়ের মধ্যে যাহা অত্যন্ত কোমল, তাহার নাম মলমল। এখানে তালব্য ল-কার অনুনাসিক ম-কারের মৃদুতা আরও বর্দ্ধন করিতেছে। আলো চক্ষুতে আঘাত করে; অন্ধকার কিন্তু চোখে আঘাত করে না, উহা কোমল জিনিস; আলোকহীন কৃষ্ণবর্ণ মিশমিশে কাল। মিশমিশে কৃষ্ণবর্ণের জন্য কি দাঁতের মিশি?

ত-বর্গ—ত

প-বর্গ ছাড়িয়া ত-বর্গে আসিলে অর্থের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এখানে বাতাসের কারবার নাই। কোমল দ্রব্যে কোমল দ্রব্যের আঘাতে অথবা কোমলে কঠিনে আঘাতে ত-বর্গের ধ্বনির সৃষ্টি। মানুষের কোমল করতলদ্বয়ের পরস্পর আঘাতের শব্দ তাইতাই। শিশুর কোমল চরণতলে ভূমিস্পর্শ ঘটিলে তাইতাই শব্দের তালে তালে থেই থেই নৃত্য ঘটে। ভূতের পদশব্দ বোধ করি একটু গম্ভীর;—প্রমাণ, ভারতচন্দ্রের তা ধিয়া তা ধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে। কোমল দ্রব্য উপর হইতে মাটিতে পড়িলে আঘাতের শব্দ থপ্, দপ্, ধপ্। এই কোমল ভাব ত-বর্গের ধ্বনির বিশিষ্ট ভাব। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

কোমল দন্ত্য বর্ণ ত-কারের উচ্চারণ যাহার কোমল জিহ্বায় ঠেকিয়া যায়, সে তোতলা। কোমল করতলের তালির শব্দ তাইতাই; যথা—তাই তাই তাই, মামার বাড়ী যাই। দুই অঙ্গুলির অগ্রভাগের

স্পর্শজাত শব্দ তু ড়ি। কোমল জিনিস ত ল ত লে; আরও কোমল—তু লা র মত কোমল হইলে হয় তু ল তু লে। তুলা শব্দটি খাঁটি সংস্কৃত হইতে আসিলেও উহার মত কোমল দ্রব্য নাই। তু লি র ডগাটাও তুলার মত কোমল। তরল জল কানে ঢুকিলে তা লা লাগে। কোন লঘু দ্রব্য সচ্ছিদ্র ও ভঙ্গপ্রবণ হইলে হয় তু স তু সে। কোমল দ্রব্যের চিক্কণ পৃষ্ঠদেশ ত ক্ ত কে—কোমল দ্রব্যে প্রতিফলিত হইয়া আলোটাও যেন কোমল হইয়া আসে। চিক্কণ জিনিস নির্ম্মল ও পরিচ্ছন্ন; সেই জন্য পরিচ্ছন্ন জিনিস ত র ত রে।

কোমল জিনিসের অকস্মাৎ ভূপতনের শব্দ ত ক্; তাহাতে মৃদু বিস্ময় উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তা ক্ লাগে। বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে চাহনির নাম তা কা ন। ছোটখাট মন্ত্রতন্ত্র—যাহাতে অল্পে কাজ উদ্ধার হয়, কাহারও বিশেষ ক্ষতি করে না,—তাহা তু ক্ তা ক বা তু ক্কা।

কোমল উজ্জ্বলতা হেতু ত ক ত কে জিনিস ত ক ত ক করে। উহা চ ক চ কে র সহিত তুলনীয়। উজ্জ্বল ধাতুপাত্রে রক্ষিত খাদ্য দ্রব্য ত কি য়া গেলে উহার আস্বাদন সম্ভবতঃ জিহ্বাতে ত ক্ শব্দ জন্মায়।

ধাতুনির্ম্মিত তারে কোমল অঙ্গুলিসংঘাতে তু ম্ তা ম্ তা না না না শব্দ হয়—তানা নানা সঙ্গীতের উপক্রমণিকা মাত্র, কেবল তা না না না করিয়া সারিলে ফাঁকি দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্ তাহার কোমল চরণপল্লবে ভূমিপৃষ্ঠ ঠেলিয়া এক-একটা বৃহৎ লাফ দেয়—ত ড়া ক্ ত ড়া ক্ করিয়া। কবিকঙ্কণ মুহুর্মুহুঃ বজ্রাঘাতের বর্ণনা করিয়াছেন, ব্যাঙ-ত ড় কা পড়ে বাজ। ত ড়া ক ত ড়া ক বা তাড়াতাড়ি কাজের নাম ত ড় ব ড়, তি ড় বি ড় বা তি ড়ি র বি ড়ি র বা তি ড়িং বি ড়িং কাজ। তাড়াতাড়ি লাফালাফি করিয়া জীবনের কাজ সম্পাদন করিয়া গেলে জ্ঞানী লোকের চোখে ধুলা দেওয়া যায় না; কেন না, তু ম ত ড়া ক্কা ধু ম ধ রা ক্কা সকলই হয় ফাক্কা।

থ

থ'য়েও সেই কোমলতা, তবে 'থ' মহাপ্রাণ বলিয়া ত'য়ের তুলনায় ইহার ভার কিছু অধিক। কোমল ওষ্ঠদ্বয়ের আঘাতে থু থু ফেলা হয়; উহা হইতেই থু ড়ি। বালকের কোমল পদশব্দ থ ই থ ই সহিত নাচের

কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। দাঁড়ান মানুষ হঠাৎ থপ্ করিয়া বসিয়া পড়ে; উহার প্রকারভেদ থপাস ও থপাং। মোটা মানুষই থপ্ করিয়া বসে; কাজেই মোটা অক্ষম মানুষ থপথপে। তলতলের মোটা থলথলে। তুসতুসের চেয়ে মোটা জিনিস থুসথুসে। উহা আকারে ছোট; আকারে বড় হইলে হয় থসথসে।

পৃষ্ঠদেশে থাবার বা করতলপাতের শব্দ থাবড় বা থপ্পর। থাবড় শব্দে করাঘাত থাবড়ান। মুষ্ট্যাঘাতে বা শিলাঘাতে জিনিস থেঁতলান হয়; মর্দ্দনপ্রয়োগে থাঁসা হয়।

কোমল বৃক্ষশাখা থরথর করিয়া কাঁপে; নরদেহও থরথর করিয়া বা থরহরি কাঁপিয়া থাকে। যে বৃদ্ধের শীর্ণ দেহ হাওয়ায় কাঁপে, সে থুরথুরে বুড়ো।

কাঠ পাথরের মত কঠিন জিনিস উপর হইতে বেগে মাটিতে পড়িয়া ঠক্ শব্দ করে ও পরে ঠিক্‌রিয়া অন্যত্র যায়; কিন্তু বিছানা বালিশ পুঁথিপত্রের মত নরম থপথপে জিনিস মাটিতে থপ্ করিয়া পড়িয়া থামিয়া যায় ও সেইখানেই থাকে। সংস্কৃত স্থা ধাতুর থ'য়ের সহিত এই থপ্ ধ্বনির কোন সম্পর্ক আছে কি? তাহা হইলে থাকা, থোয়া, থির, থিত, থলি, থালি, থয়লা প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক শব্দও এই শ্রেণীর মধ্যে আসিয়া পড়িবে। থামার সংস্কৃত মূল স্তম্ভ হইতে পারে, কিন্তু থম করিয়া থামে, এরূপ বর্ণনা চলিত। যাহা থামিয়া আছে, তাহা থমথমে। পুষ্করিণীর জল যখন থামিয়া থাকে, তখন উহা থমথম করে অথবা থইথই করে; বিরহী যক্ষের বাড়ীর পাশের দীঘির জল থইথই করিত। সরোবরের গভীর জলে থাই পাওয়া যায় না; উহা অ-থাই জল। থামথুম দিয়া আমরা অনেক জিনিস থামাইয়া রাখি; এবং থাপথুপ বা থুপথাপ দিয়া গোপ্য বিষয় গোপনে স্থির রাখি। কোন আকস্মিক ঘটনার আঘাতে চলন্ত ব্যক্তি থতমত হইয়া থামিয়া যায়। জঞ্জাল একত্র জড় হইয়া থক্‌থক্ করে; উহা আবর্জ্জনায় পরিণত হইলে থিক্‌থিক্ করে।

দ

ত, থ ধ্বনি ঘোষহীন, কিন্তু দ'য়ের ধ্বনিতে ঘোষ আছে; উহা গম্ভীর, জমকাল। দামামা, দগড় এবং (সংস্কৃত) দুন্দুভির বাদ্যেই

তাহার পরিচয়। দুরমুশের শব্দও বোধ করি ঐ প্রকৃতির। ধপ্ করিয়া পড়া ও থুপ করিয়া পড়া'র সহিত দপ্ করিয়া পড়া ও দুপ করিয়া পড়ার তুলনাতেই বুঝিতে পারা যাইবে। মেজের উপর যে জিনিস পড়িলে থুপ করে, ছাদের উপর তাহা পড়িলে দুপ করে; ছাদের নীচে ঘরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ বায়ুরাশি ধ্বনিত হইয়া শব্দটাকে জমকাইয়া দেয়। কাজেই ছাদের উপরে জমকাল শব্দ দুপদাপ, দুমদাম, দড়বড়, দুড়দুড়। যে ঘরের ছাদে ঐরূপ দমদম শব্দ হয়, সেই ঘরের নাম দমদমা। বন্দুকের আওয়াজ গম্ভীর দুম; পিঠে কিল পতনের শব্দও দুম।

আগুন যখন লেলিহান শিখা আন্দোলন করিয়া দাহ্য পদার্থের স্তূপ গ্রাস করিতে থাকে, তখন উহা দপদপ করিয়া বা দাউদাউ করিয়া জ্বলে। প্রদীপের ছোট শিখা দিপ দিপ করে। আগুনের মত জ্বালাকর ফোড়ার দপদপানি বা দবদবানি ভুক্তভোগীর পরিচিত; উহার জ্বালার মধ্যে অগ্নিশিখার স্পন্দন যেন প্রচ্ছন্ন থাকে। দুম্বা, দাবা, দাবনা ও দাবানর এবং দামশানর মধ্যে দ-কারের ধ্বনির ঘোষ আছে। 'দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও হে,' এখানে দড়বড় শব্দে যেন ঘোড়ার পদশব্দই শোনা যাইতেছে। দ্রুত গতিতে পথ চলার নাম দৌড়ান; সংস্কৃত দ্রু ধাতুর মূল কি এইখানে? লাঠি তুলিয়া কাহাকেও দাবড়াইলে অর্থাৎ তাড়াইলে সে দুরদার করিয়া দৌড় দেয়; আতঙ্কে হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হইলে বুক দুরদুর করে। 'ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর, উত্তর পবনে মেঘ করে দুরদুর'—এখানে মেঘ বায়ুবেগে যেন দুরদুর শব্দে দ্রুত চলিতেছে।

তলতলে, থলথলে জিনিসের সজাতীয় দলদলে। দলদলে জিনিস দল্লাইয়া (সংস্কৃতে, দলিত করিয়া) তৈয়ার করা চলে। দোলো চিনি কি ঐরূপে দল্লাইয়া প্রস্তুত হয়? গ্রাম্য ভাষায় ঐরূপ দলন-যোগ্য জিনিস দকর-কোচো।

ধ

দ'য়ের মত ধ ঘোষবান্, উপরন্তু মহাপ্রাণ। হালকা জিনিস যেখানে দপ করে, ভারী জিনিস সেখানে ধপ শব্দ করিয়া পড়ে। দপদপ,

দুপদাপ, এর চেয়ে ধপধপ, ধুপধাপ এর গুরুত্ব বেশী। থেই থেই নাচের চেয়ে ধেই ধেই নাচের গুরুত্ব বেশী। পৃষ্ঠোপরি দুমদাম কিলের চেয়ে ধমাধম বা ধপাধপ কিলের গুরুত্ব অধিক। ধুমধাম বা ধুমধরাক্কা, কর্ম্মের আড়ম্বরের গুরুত্ব প্রকাশ করে। আগুন যেমন দাউ দাউ জ্বলে, তেমনি ধুধু বা ধাঁধাঁ করিয়া জ্বলে; মহাদেবের 'ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে'। নির্ব্বাণপ্রায় বহ্নিও ধিকি ধিকি জ্বলে। স্পন্দনগতির এই ধকধকানি মৃদু হইয়া ধুকধুকনিতে পরিণত হয়; মৃত্যুর পরে হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকির সহিত 'রাত্রিদিন ধুকধুক তরঙ্গিত দুঃখ সুখ' একেবারে থামিয়া যায়। শিশুর কণ্ঠে দোদুল্যমান সোনার ধুকধুকি তাহার ছোট্ট হৃদয়ের ধুকধুকনির সহিত দুলিতে থাকে। ধপধপ শব্দে সোপানের প্রতি ধাপে পা ফেলা হয়। দড়বড় দৌড়ানির পর বুক ধসধস এবং হঠাৎ আতঙ্কে ধড়াস করে; দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে বুক ধড়ফড় করে। কাটা পাঁঠা যখন ধড়ফড় করিয়া হাত পা আছড়ায়, তখন তাহার হৃৎপিণ্ডের রক্তধারা ঝলকে ঝলকে থামিয়া থামিয়া কর্ত্তিত গ্রীবা হইতে বেগে নিঃসৃত হয়।

উপরে বলিয়াছি, ধ'য়ের ধ্বনিতে গুরুত্ব ও স্থূলত্বের অর্থ টানিয়া আনে। ধেড়ে মিন্সের স্থূলত্ব সর্ব্বজনস্বীকৃত। উহা স্ত্রীলিঙ্গে ধাড়ী— জানোয়ারের পক্ষে প্রযোজ্য। ধেড়ে মিন্সে, যার ইন্দ্রিয়গুলাও মোটা, তাহার সকল কাজই ধ্যাবড়া, সে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ধ্যাড়ায়। ধেড়ে মিন্সেকে জোরে ধাক্কা না দিলে তাহার ইন্দ্রিয় সজাগ হয় না; তাহাতেও তাহার ধোকা লাগে, অথবা ধাঁধাঁ লাগে বা ধাধস লাগে মাত্র; সে কি করিবে, ঠাহর পায় না। হেঁয়ালির ভাষায় মূর্খকে লাগে ধন্ধ; উহাই ধাঁধাঁ। ধেড়ে মিন্সের কাজ কর্ম্মের ধাকধিচ নাই; তাহার সকল কাজই এলো-ধাবড়ি গোছের। মোটা মানুষের নাচ ধিনধিনি নৃত্য। বাতাসে ধাক্কা দিয়া বেগে চলার নাম ধাঁ করিয়া চলা। ধমক দিলে এবং ধাপ্পা দিলে মনে গুরুতর ধাক্কা লাগে, সন্দেহ নাই। লোকের ধাঁইচ বুঝা তাহার চা'ল-চলনের ভঙ্গী বুঝা। চা'ল-চলনে বিসদৃশ ভঙ্গীর নাম ধাঁইচা। বৃহৎ পাহাড় ভূকম্পে ধস শব্দে ধসিয়া পড়ে।

তুলা ধুনিবার সময় ধু ন ধা ন শব্দ হয় ; যে ধোনে, তাহার উপাধি ধুনুই। ধুমুশ, ধুসো, ধুচুনি, ধুকুড়, ধামা প্রভৃতি গৃহস্থালীর ব্যবহার্য্য বস্তু টেকসই অল্প মূল্যের মোটা জিনিস। মোটা জিনিসের উপর ধ খ ল পড়ে বেশী।

ন

ত-বর্গের ধ্বনি কোমলতাব্যঞ্জক ; তাহার উপর অনুনাসিকত্ব যোগ হইলে উহা আরও কোমলের, এমন কি, একবারে কাঠিন্যবর্জ্জিতের লক্ষণ টানিয়া আনে। ন-কারাদি শব্দে আমরা তাহা স্পষ্ট দেখি। এরূপ শব্দ বড় বেশী নাই ; যাহা আছে, তাহার অধিকাংশেই ঐ ভাব প্রবল।

ন্যাচা, নোচা, ন্যাদা, নদনদে, নাদুসনুদুস, নধর, ন্যাঙা, ন্যাঙড়া ইত্যাদি শব্দ কোমলতা ও অস্থিহীনতা সূচনা করে। নচনচ, নচপচ, নেংচান, নেতার, নেঞ্জুর, নেস্তি ইত্যাদিও তুলনাযোগ্য।

যাহা কাঠিন্যবর্জ্জিত, মেরুদণ্ডহীন, তাহা নরম, তাহা নড়নড় করে, নড়বড় করে ; সহজে নড়িয়া যায় ; এমন কি, লতাইয়া গিয়া নড়্বড়র করে। যাহা একেবারে এলাইয়া লতাইয়া পড়ে, তাহা নিড়বিড়ে, নিশপিশে, নিংনিঙে। যাহা সহজে নড়ে, তাহাকে অনায়াসে নাড়া বা নেকড়ান যায়, তাহা নেকড়া। নেকড়ে বাঘ বোধ করি তাহার শিকারকে নেকড়িয়া যাতনা দিয়া বধ করে। নেকড়াকে বা কাপড় মাত্রকে অনায়াসে নিঙড়াইয়া জল বাহির করা যায়। এই শ্রেণীর জিনিস সহজেই নোঙরা হয় ; নোঙরা জিনিস দেখিলে নেকার (সংস্কৃতে ন্যক্কার) আসে। ডানি হাতের মত বাম হাত বা নেঙা হাত আমাদের বশে থাকে না ; উহা যেন নড়নড়ে ;—ন্যাঙরা লোকে কিন্তু তাহার নড়নড়ে ডানি হাতের বদলে বাম হাত ব্যবহার করে। নুলো পঞ্চাননের হাত কিরূপ ছিল ? যে আপনাকে ধরিতে ছুঁইতে দেয় না, মেরুদণ্ডহীনের মত হাত হইতে পিছলাইয়া যায়, সে ন্যাকা সাজে। কঠিন ভূমির কোমল ঘাস নাড়িয়া উপড়ানর নাম নিড়েন ; জমির ঘাসের মত মাথার চুল যার নিড়েন হইয়াছে, সেই কি নেড়া ?

ট-বর্গ—ট

ত-বর্গের ধ্বনির সহিত তারল্যের সম্পর্ক, আর ট-বর্গের সহিত সম্পর্ক কাঠিন্যের। টকটক, টুকটাক, টক্কর, ঠোকর প্রভৃতি শব্দে কঠিন দ্রব্যের সহিত কঠিন দ্রব্যের সংঘট্টের পরিচয় দেয়। সানুনাসিক টুংটাং শব্দে ধাতব তন্ত্রীর কাঠিন্য স্মরণ করায়; কলিকাতার রাস্তায় ঢন্ ঢন্ শব্দ উড়িয়্যাবাসিবাহিত কাংস্যফলকের কাঠিন্য ঘোষণা করে।

যে কোন কোষগ্রন্থ খুলিলেই দেখা যাইবে, ট-কারাদি, ঠ-কারাদি, ড-কারাদি, ঢ-কারাদি সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা অতি অল্প; যে সকল শব্দ রহিয়াছে, তাহাদেরও অনেকগুলি নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন শব্দ। অনুমান হয় যে, দেশজ শব্দ কালে সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে মাত্র। লৌকিক সংস্কৃত অপেক্ষা বৈদিক সংস্কৃতে ইহাদের সংখ্যা আরও কম। ইহাতে অনুমান হইতে পারে, প্রাচীন আর্য্যভাষায় হয়ত এককালে ট-বর্গের ধ্বনির অথবা মূর্দ্ধন্য ধ্বনির অস্তিত্ব ছিল না। ইউরোপের ভাষাগুলিও বোধ হয়, এই অনুমান সমর্থন করে।

টিঁটিঁ, টঁ্যাটঁ্যা, ইত্যাদি ট-কারাদি বহু শব্দ প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণজাত; তাহাদের উৎপত্তি বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। টিয়া পাখী ও টুনটুনি ও ট্যাসকোনা পাখী কি তাহাদের স্বর হইতে নাম পাইয়াছে? টং, টংটং, টুংটাং, টাংটুং প্রভৃতি ধ্বনি সর্ব্বজনপরিচিত; উহাদের অনুনাসিক অংশ ধাতুপদার্থে অন্য কঠিন দ্রব্যের আঘাত সূচনা করে। বৈজ্ঞানিকেরা জানেন যে, এই অনুনাসিক স্বরের উৎপাদন কঠিন ধাতুপদার্থের বিশিষ্টতা। তবে ঢাকের ট্যাং ট্যাং মধ্যেও অনুনাসিকত্ব আছে বটে। টঙস টঙস ধ্বনি স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণ মাত্র। ধনুকের ছিলাতে টং শব্দে টঙ্কার দেওয়া হয়। রৌপ্য-মুদ্রার বা রুপেয়ার বিশুদ্ধি পরীক্ষার্থ টং বা টুং শব্দে বাজাইয়া লওয়া হয়; এই জন্যই কি উহা টঙ্ক বা টাকা? সম্ভবতঃ ঐরূপ ধ্বনি হইতে সোহাগার নাম টঙ্কন। টিকটিকি সময়ে অসময়ে টিকটিক করিয়া বিরক্তি জন্মায়; কাজেই কানের কাছে টিকটিক করার অর্থ বিরক্তি উৎপাদন। কাঠের উপরে পাথরের বা ইটের আঘাতে টক শব্দ হয়, ঐ শব্দ পুনঃ পুনঃ ঘটিলে টক টক হয়; টক টক ছোট হইয়া হয় টুক টুক এবং টুকটাক। রাস্তায় ইটকাঠে পায়ের আঘাতের নাম টক্কর;

অন্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঘাতও ট ক্ক র। পৌষ মাসের প্রাতে ঠাণ্ডা জল যেন ত্বগিন্দ্রিয়ে আঘাত করিয়া হাতে টা কু ই বা টা ক রা নি ধরায়। টি ট কা রি র অন্তর্গত দুটা ট পর পর আসিয়া অন্তঃকরণে কঠিন আঘাত সূচনা করে।

কোন একটা জিনিস আমরা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাই ; তাহাতেও সন্দেহ থাকিলে একটা যষ্টির স্পর্শ দ্বারা বা আঘাতের দ্বারা দেখাইলে আর সংশয়ের সম্ভাবনা থাকে না। সেই যষ্টির আঘাতের শব্দ ট ক্ বা টা। অঙ্গুলি-নির্দ্দেশেও যখন বলি এই টা বা ঐ জিনিস টা, তখন ঐ টা প্রত্যয়ে সেই যষ্টির আঘাতের কাজ করে। বড় জিনিসের বেলায় টা, ছোট জিনিসের বেলায় টি—যথা, মহিষ-টা, আর বাছুর-টি। টি মাত্রা কমিয়া টু'তে বা টু কু' তে পরিণত হয় ; যথা, এক টু, জল টু কু, তেল টু কু। টি ও টু কু ক্ষুদ্রত্বের জ্ঞাপক—তাহা হইতে উৎপন্ন টু ক রা ও টি ক লি। কেশমধ্যে লম্বমান টি কি এবং তামাকু-সেবীর টি কা মুখ্য অর্থে উহার ক্ষুদ্রত্বের পরিচায়ক কি না বিবেচ্য। টু টি য়া যাওয়ার অর্থ ক্ষুদ্রত্ব-প্রাপ্তি। মানুষের যে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কাজ ভ্রমণ, সেই ইন্দ্রিয়ের নাম ট্যাং ; উহা লোষ্ট্র কাষ্ঠাদি সকল দ্রব্যেই সর্ব্বদা ট ক্ক র দিতেছে। কঠিন ভূপৃষ্ঠের উপর ইতস্ততঃ বিনা কাজে বেড়ানর নাম টো টো করিয়া বেড়ান। বাঁশের টা টি হালকা হইলেও কঠিন দ্রব্যের আঘাতে ট-কারের ধ্বনি আনে ; কাঁসার টা ট ও কাঠিন্যহেতুক। ফোড়ার টা টা নি কঠিন বেদনা। তীব্র অম্লরস রসনায় কঠিন আঘাত দেয়, উহাতে ট ক শব্দ না হইলেও অম্ল জিনিসটা ট ক। অথবা অম্লরসের তাড়নায় জিহ্বা অনেক সময় মূর্দ্ধা স্পর্শ করিয়া ট ক শব্দও করিয়া থাকে ; এই জন্য অম্লরস ট ক। তীব্র লোহিত বর্ণ চক্ষুতে আঘাত দেয়—যেন ট ক ট ক করিয়া আঘাত দেয়—এই জন্য উহা রাঙা ট ক ট কে ; জ্যোতি একটু মৃদু হইলে হয় রাঙা টু ক টু কে। রাঙা জিনিস চোখে আঘাত করে, আবার অনেক সময়ে সুন্দরও লাগে ; কাজেই সুন্দর গৌরবর্ণ শিশুকে টু ক টু কে ছেলে বলা যায়। কুঠারের আঘাতের শব্দ হইতে উহার নাম টা ঙি। ছোট ঘোড়ার খুরের শব্দ হইতে কি উহার নাম টা টু ? ঘোড়ার টা পে চলাও কি উহার পদশব্দ হইতে উৎপন্ন ? মাথায় যেখানে চুল থাকে না, সেখানে ট ক শব্দে আঘাত আঘাতকারীর পক্ষে আমোদজনক—সেই স্থানটা টা ক ; টে কো মাথায়

কঠিন সম্পর্কে আসিয়া কোমল করতলপ্রযুক্ত তালা ও তালি পর্য্যন্ত টালা ও টালিতে পরিণত হয়। সংস্কৃতে তর্কু শব্দ থাকিলেও, টাকুর ভূপতনশব্দ টক্। বাঁশের কিংবা বেতের তৈয়ারি টোকা ও টুকড়ি এবং তালপাতার তৈয়ারী ছোট টুকুই গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত হয়; উহাদের গায়ে টোকা মারিলে টুক শব্দ হয়। টুকনির নকার উহার ধাতুময়তা স্মরণ করাইয়া দেয় মাত্র।

ট'য়ের ধ্বনি কাঠিন্যব্যঞ্জক হইলেও তরল ও বায়বীয় পদার্থেও ঐ ধ্বনি আসে, বিশেষতঃ প-বর্গের ধ্বনির সহযোগে। টগবগ শব্দে জল ফুটে; এ স্থলে টগের পরবর্ত্তী বগটা বায়ুপূর্ণ বুদ্বুদের অস্তিত্ব জানায়। বৃষ্টি পড়ে টপটপ, টুপটাপ; পুকুরের জলের উপর বৃষ্টিপতনের শব্দ টাপুর টুপুর। এই শব্দের সহিত বাতাসের সম্পর্ক আছে, সেই জন্য ট'য়ের পর প। বৃষ্টিবিন্দু, যাহা টপ করিয়া ভূমি স্পর্শ করে, তাহার নাম টোপ; বড়শিতে বিদ্ধ মাছের টোপ ও জলে টুব শব্দ করিয়া পড়ে। গুরুভার জিনিস জলে টবাং করিয়া পড়ে। বৃষ্টির আরম্ভে মোটা জলের ফোঁটা টপটপ বা টুপটাপ করিয়া পড়ে। বৃষ্টি থামিয়া গেলেও বৃষ্টির ক্ষীণ ধারা টিপ টিপ করিয়া বা টিপির টিপির করিয়া বহু ক্ষণ পড়িতে থাকে অর্থাৎ টিপোয়। বারিবিন্দুর মত যে-কোন ছোট জিনিস টুপটাপ করিয়া পড়িতে পারে; সূর্য্যির মা বুড়ী কাঠ কুড়াইতে গিয়া কলাগাছের আড়ে উপস্থিত হইলে টুপটাপ করিয়া কলা পড়িত। ট'য়ের পর প বসিলে স্বভাবতঃ বায়ুপূর্ণতার বা শূন্যগর্ভতার ভাব টানিয়া আনে। গরুর গাড়ীর উপরের শূন্যগর্ভ আচ্ছাদনের নাম টপ্পর; বিবাহোন্মুখ বরের মাথার উপরের আচ্ছাদন টোপর; মস্তকের ছোটখাট আচ্ছাদন মাত্রের নাম টুপি। যে কার্য্যের বা বাক্যের ভিতর ফাঁপা, তাহার নাম টপ্পা। থালা ঘটি বাটি আঘাত পাইয়া টোপসা খায়, অথবা উহাতে টোল পড়ে। অধ্যাপকের টোলের সহিত ইহার কি সম্পর্ক? টোবো গালের ও টবকা লুচির ভিতরটা ফাঁপা। টোপা কুলে আঙুলের ডগা দিয়া জোরে টিপিলে বা টেপাটিপি করিলেও টোল পড়িতে পারে। লুচি রাখিবার বাঁশের ফাঁপা চুপড়িকে টালা বলে। কপালে টিপ বোধ করি টিপিয়া বসাইতে হয়। কাঁচা ফল, যাহা পাকিবার পূর্ব্বে নরম হইয়াছে মাত্র, যাহার গায়ে আঙুলের দাগে টোপসা পড়ে,

উহা গ্রাম্য ভাষায় টোসো। কপালের ঘাম টসটস বা টুসটুস করিয়া টুসিয়া পড়ে—এ স্থলে উষ্মবর্ণ স'য়ের যোগে তারল্যের ভাব আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আঁকশির ডগায় ফাঁপা টুসি লাগাইয়া ফল পাড়ে। ধোঙ্গা বা টোঙা নামক যান উহার শূন্যগর্ভতাসূচক হইলেও কঠিন কাষ্ঠে নির্ম্মিত বটে। টুঙ্গি সম্বন্ধেও ঐ কথা।

শিরার ভিতরে তরল রক্ত বেগে বহিলে উহা টিশটিশ করিয়া টিশেয় ও কঠিন যাতনা দেয়। এখানেও উষ্মবর্ণ শ তারল্যসূচক। টনটনানি যে যাতনা বুঝায়, উহা তীক্ষ্ণ যাতনা; অনুনাসিক ন-কার এই তীক্ষ্ণতা আনে। টানাটানির মধ্যে দুটা ট পর পর বসিয়া আঘাতের পর আঘাত সূচনা করে। শুকাইয়া টান সহিবার সামর্থ্য জন্মিলে হয় টনটনে। আকস্মিক তীব্র বেদনায় মাথায় টনক পড়ে। টনক বেদনা সহিবার যার ক্ষমতা আছে, সে টনকো। টিমটিমে জ্যোতির মৃদুতা অনুনাসিক ম-কারের লক্ষণযুক্ত।

টলটল, টুলটুল, টলমল করিয়া যাহা টলিয়া বেড়ায়, তাহার তারল্য ও চাঞ্চল্য ট'য়ের পর কোমল দন্ত্য বর্ণ ল'য়ের যোগে আসে। টহল দেওয়াতেও কি এইরূপ চঞ্চল গতির সূচনা করে? দ্রুত বিলম্বিত টালমাটাল শব্দে বিলম্বিত গতির চঞ্চল অনিশ্চয় সূচনা করে।

ঠ

ট'য়ের মহাপ্রাণ উচ্চারণ ঠ; উহাতে কাঠিন্য ও কঠোরতার ভাব আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ঠক, ঠক ঠক, ঠুকঠাক, ঠক্কর, ঠোকর, ঠোকরান, ঠোঁকা, ঠুকরান, ঠুক্‌রো (ভঙ্গপ্রবণ), ঠিক্‌রে প্রভৃতি শব্দে কঠিন দ্রব্যের ঠকাঠকির কথা বলে। ঠকঠকি তাঁত হইতে কাঠ-ঠোকরা পাখী পর্য্যন্ত এই আঘাতের ধ্বনি হইতে নাম পাইয়াছে। করতল কোমল হইলেও উহা যখন বেগে গণ্ডদেশে পতিত হয়, তখন চপেটাঘাতের ঠাঁ শব্দ বা ঠাঁই শব্দ কঠিনের আঘাতের শব্দের অনুকৃতি। কপালে কঠিন আঘাতের শব্দ ঠুই। ধাতুফলকে হাতুড়ি পেটার শব্দ ঠং, ঠুং, ঠাং। রামাভিষেকে মদবিহ্বলা তরুণীদিগের কক্ষচ্যুত হেমঘট সোপানে অবরোহণ করিয়া ঠননং ঠঠংঠংঠননংঠঠংঠং

শব্দ করিয়াছিল, তাহা হনুমান্ স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। ঠুনকো জিনিস ভাঙিবার সময় ঠুন শব্দ করে। কঠিন দ্রব্য কঠিন ভূমিতে আঘাত করিয়া ঠিকরিয়া পড়ে। ঠক শব্দ কঠিন আঘাতের শব্দ; ঠগ যাহাকে ঠকায়, সেও একটা কঠিন আঘাত পায়, সন্দেহ নাই। যাহা ঠুক করিয়া ভূপতনে উন্মুখ, তাহা ঠুকোর উপরে আছে; তাহাকে ঠেকা দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে হয়। ঠমকে চলা ভূপৃষ্ঠে চলারই রূপভেদ। কঠিন বাক্য অন্তরিন্দ্রিয়ে আঘাত দিলে, ঠাট্টায় পরিণত হয়। ঠাট ও ঠার এর সহিত ঠাট্টার নিকট-সম্পর্ক। স্থিরার্থক ঠার শব্দে স্থা-ধাতুর কোমল থ কাঠিন্য বুঝাইবার জন্যই ঠ হইয়াছে। ঠেলা, ঠেকা, ঠোকা, ঠাসা, ঠোসা ক্রিয়ার কর্ম্মকারকের স্থলে প্রায় গুরুভার কঠিন দ্রব্য বসিয়া থাকে। ঠেঙা কঠিন অস্ত্র; ঠেঙান কঠিন কর্ম্ম। গণ্ডদেশে কামিনীর কোমল-কর-প্রদত্ত ঠোনার ও ঠোকনার কাঠিন্যসূচনা কিন্তু ক্ষমাযোগ্য নহে। ঠনকো রোগে স্তনের গ্রন্থিগুলা কঠিন হয়। চোখের ঠুলি ঐ আচ্ছাদনের কাঠিন্যসূচক কি না, তাহা বিচার্য্য। ঠুলির রূপভেদ ঠুসি। মিষ্টান্নের ঠোলা অবশ্য ঠুলির চেয়ে আকারে বড়। ঠোলার রূপভেদ ঠোঙা। মাটির ছোট কলসীর ঠিলি নাম স্থালী হইতে আসিলেও উহার কাঠিন্য সূচনা করিতেছে। ঠেঁটা মানুষের প্রকৃতি এত কঠিন যে, উহাতে দাগ বসান শক্ত। ঠেঁটা লোক কৃপণ হয়; ঠেঁটি কাপড় তাহারই যোগ্য। অঙ্গুলির লোপে কাঠিন্যপ্রাপ্ত করতল ঠুঁটো হাত। আঁখি যখন ঠলঠল করে, তখন লকারের তারল্য ঠ'য়ের কাঠিন্যকে ঢাকিয়া ফেলে।

ড

ড ও ঢ ট-বর্গের অন্তর্গত ঘোষবান্ ধ্বনি; ঘোষবান্ ধ্বনির একটা গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব আছে, যাহা ঘোষহীন ধ্বনিতে থাকে না। বস্তুতই ড-কারের ও ঢ-কারের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য উহাদের কাঠিন্যসূচনার ভাবকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ঢাক ঢোলের মত বাদ্যযন্ত্রের চামড়ার নীচে অনেকটা বায়ু আবদ্ধ থাকে; চামড়ায় আঘাত করিলে সেই বায়ুটা ধ্বনিত হইয়া গুরুগম্ভীর আওয়াজের উৎপত্তি করে। এই আওয়াজটার নামই 'ঘোষ'। দামামা দগড় দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের দ-কারাদি নামে আওয়াজের

সেই গাম্ভীর্য্য বুঝায় দেখা গিয়াছে; ঢাকের শব্দ ড্যাং ড্যাং, ঢোলের শব্দ ডুগ ডুগ, ডগমগ প্রভৃতিতেও আওয়াজের গম্ভীরতার পরিচয় দেয়। ডিণ্ডিম, ডুগডুগি, ডুবকি, ডঙ্কা, ডম্বুর (ডমরু) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের নামেই উহাদের আওয়াজ ঘোষণা করিতেছে। বন্দুকের ডেহরের শব্দে এই গম্ভীরত্ব আছে। ডাহুক বা ডাবুক পাখীর নামের সহিত উহার ডাকের কোন সম্পর্ক আছে কি? দূর হইতে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়া কাহাকেও যখন ডাকি, তখন সেই ডাকের সহিত কণ্ঠধ্বনির গাম্ভীর্য্যের সম্পর্ক অস্বীকার করা কঠিন। ডাইন্ বা ডাকিনী এইরূপ ডাক হইতে তাহার নাম পাইয়াছে কি? বাঙ্গালার গ্রাম্য সাহিত্যে প্রসিদ্ধ ডাকের সহিত অনেকে ডাকিনীর সম্পর্ক অনুমান করেন। সে সম্পর্ক থাক বা না থাক, ডাকাইতের সহিত ডাকাডাকির সম্পর্ক থাকা অসঙ্গত নহে। ডাকাডাকিতে অন্তঃকরণে ডর উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। ডামাডোলের শব্দের গুরুত্বে কোন সন্দেহ নাই। ডাং-পিটের সঙ্গে ডাকাইতের ও ড্যাকরার ও ডাকাবুকোর চরিত্রগত অনেকটা মিল আছে।

ফাঁপা বাদ্যযন্ত্রে ডুং ডাং, ড্যাং ড্যাং শব্দ হয়; ড-কারাদি অনেকগুলি শব্দ ঘোষবত্তাহেতু এইরূপে শূন্যগর্ভতার জ্ঞাপন করে। যথা, ডাব (নারিকেল), ডাবা, ড্যাবরা, ডবডবে, ডাবর, ডিবা, ডহক, ডোল, ডুলি, ডালা, ডালি, ডোঙা, ডিঙি, ডাগর, ডাকর, ডাকরান, ডোবা (খাল অর্থে), ডুব, ডুবুরি, ডারা। ইহার মধ্যে ডোঙা ও ডিঙি সম্ভবতঃ সংস্কৃত দ্রোণ শব্দ হইতে উৎপন্ন; অন্যগুলির সংস্কৃত মূলাকর্ষণ দুঃসাধ্য।

৮

ড মহাপ্রাণ হইয়া ঢ হয়। ড'য়ের সমুদায় লক্ষণ বর্দ্ধিতবিক্রমে ঢ'য়ে বর্ত্তমান। ঢ'য়ের ধ্বনি ড'য়ের চেয়ে মোটা,—ধ' যেমন স্থূলত্বের ভাব আনে, ঢ'ও সেইরূপ স্থূলত্ব বোঝায়। ঢাক, ঢোল, ঢেঁড়রা প্রভৃতি অতি স্থূল বাদ্যযন্ত্রের নামে উহাদের গুরুগম্ভীর আওয়াজ মনে পড়ায়। ঢং ঢং শব্দ কাঁসার ঘড়ির শব্দ; ধাতুপদার্থের ধ্বনিতে অনুনাসিকত্ব বর্ত্তমান। উচ্চ যশোধ্বনিতে ঢি ঢি পড়ে আর অপমানে ঢু ঢু লাগে। ফাঁপা জিনিস

মোটা হয়; অতএব ঢেকুর উদ্গারের ধ্বনির শূন্যগর্ভ উৎপত্তিস্থান স্মরণ করায়। ঢকঢক, ঢুকঢুক, ঢুকঢাক, ঢুকুঢুকু শব্দে পানীয়বিশেষ জঠরমধ্যে ঢুকিতে থাকে। আচ্ছাদনার্থক ঢাকা আচ্ছাদনের শূন্য-গর্ভতা সূচনা করে। যদ্দ্বারা ঢাকা যায়, তাহা ঢাকনা ও ঢাকি। ঢাল, ঢিলা, ঢিপ, ঢেঁকি, ঢিবি, ঢিল, ঢেলা, ঢেঁড়ি, ঢেড়া, ঢাঁড়স, ঢেউ, ঢাপুস, ঢিপসে, ঢোপসো, ঢেপুয়া, ঢেবুয়া, এই সমুদয় শব্দ স্থূলত্ববোধক। ঢন্ঢনে মাছি মাছির মধ্যে মোটা। ঢুণ্ঢি গণেশ গণেশের মধ্যে বোধ করি সব চেয়ে মোটা। স্থূলত্বের সহিত জড়তার, নিশ্চেষ্টতার, আলস্যের ভাব জড়িত;—যথা, ঢিলা, ঢিমা, ঢোলা (তন্দ্রা), গা ঢিস ঢিস করা। ঢোঁড়া সাপ ও ঢ্যামনা সাপ মোটাসোটা বটে, অধিকন্তু নির্বিষ ও নির্বীর্য্য। ঢপ কীর্ত্তনের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু ঢপঢপে, ঢ্যাবঢেবে দ্রব্য নিস্তেজ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঢপ শব্দে প্রণাম, কিন্তু জোরে কঠিন মাটিতে মাথা ঠুকিয়া প্রণাম। ল'য়ের কোমলতা ঢ'য়ে তারল্য ভাব দেয়; ঢলঢলে জিনিস ঢালিতে পারা যায়। ঢালু জায়গায় ঢালের দিকে তরল দ্রব্য ঢলিয়া পড়ে বা ঢালা যায়। কলঙ্কের কাহিনী গাঢ় তরল রসের মত চারি দিকে ঢলাইয়া পড়িয়া ঢলানিতে পরিণত হয়। তন্দ্রাগত ব্যক্তির ঢুলুঢুলু আঁখিতে তারল্যের সহিত আলস্যের ভাব মিশ্রিত। এই জন্যই শিথিল ও তরল দ্রব্যের নামান্তর ঢিলা। কপালে ঢু দেওয়া ও ঢুসো দেওয়া তুল্যমূল্য; ঐ আঘাতও মোটা আঘাত। অকর্ম্মা লোকে যেমন মিছা কাজে টোটো করিয়া বেড়ায়, তেমনি ঢুঢু করিয়া ঢুরিয়া বেড়ায়। ঢিপেন ও ঢেকান ক্রিয়া মোটা মানুষের উপর প্রযোজ্য। ধাক্কার সঙ্গে ঢোকার বোধ হয় সম্পর্ক আছে; যেখানে ফাঁক, অবকাশ বা শূন্যতা আছে, সেইখানেই ঢুকিতে পারা যায়, এই হিসাবে ইহার সহিত শূন্যতারও সম্পর্ক আছে। চামরের দোলন কি স্থূলত্ব পাইয়া ঢোলান হয়?

চ-বর্গ—চ

রামাভিষেকে যে হেমঘট তরুণীর কক্ষচ্যুত হইয়াছিল, কেহ কেহ বলেন, উহা সোপান হইতে পড়িবার সময় ঠননং ঠঠং ঠং ঠননং ঠঠং শব্দ করিয়া

শেষে ছঃ শব্দ করিয়াছিল। এই ছঃ শব্দ হেমঘটের জলে পতনের শব্দ ; উহাতে ঘটের সহিত তরল জলের স্পর্শ-ঘটনা সূচনা করিতেছে। চ-বর্গের ধ্বনির লক্ষণই তারল্য। প-বর্গের সহিত যেমন বায়ুর, ত-বর্গের সহিত যেমন কোমলের, ট-বর্গের সহিত যেমন কঠিন পদার্থের সম্পর্ক, চ-বর্গের সহিত তেমনি তরল পদার্থের সম্পর্ক। স্বভাবজাত চিঁ চিঁ শব্দে এই তালব্য ধ্বনির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। চিঁ চিঁ হইতে চীৎকার (সংস্কৃত), চেঁচান, চেঁচামেচি প্রভৃতি আসিয়াছে। তরল জল চোঁয়ানর সময় চোঁ চোঁ শব্দ হয়। চোঁয়া ঢেকুরে বোধ করি চোঁয়ান দ্রব্যের গন্ধ থাকে। তপ্ত কটাহে গরম জল বা তেল চুঁ চুঁ করে। চিঁ চিঁ শব্দ করে বলিয়া কি পাখীর নাম চিল? উপরন্তু অল্পপ্রাণ ক্ষণস্থায়ী চ-ধ্বনি একটা ক্ষণস্থায়িত্ব ও আকস্মিকত্ব সূচনা করে। চোঁ চোঁ শব্দে একটা তীক্ষ্ণতা আছে, উহা কানে যেন আঘাত করে। অল্পপ্রাণ বর্ণে অনুনাসিক বর্ণযোগে এই তীক্ষ্ণতা আনে। চনচন, চিনচিন প্রভৃতি শব্দে সেই তীক্ষ্ণতা স্পষ্ট ; কাটা ঘায়ে নুনের ছিটায় যে বেদনা হয়, উহা চিনচিন বেদনা ; রৌদ্র যখন তীক্ষ্ণ ছুরির মত আঘাত দেয়, তখন উহাও চনচনে বা চিনচিনে হয়। চুমো (সংস্কৃত চুম্বন) কি চুঁ শব্দের অনুকৃতিজাত ? চুমোর সহিত চুমকুরির সম্পর্ক স্বীকার্য্য। মূর্দ্ধন্য বর্ণের যোগে কাঠিন্য বা কার্কশ্য পাইলে উহা চরচর, চিরচির, চুরচুর, চিড়চিড়, চিড়িরবিড়ির প্রভৃতি কঠোর বেদনাজনক শব্দে পরিণত হয়। চচ্চড়ি নামক পদার্থের রান্নার কি চরচর ধ্বনি জন্মে ?

চিমটি কাটার তীব্র বেদনা প্রসিদ্ধ। লোহার চিমটা যন্ত্র জিনিসকে চিমটিয়া ধরিবার জন্য। চপ শব্দেও এই তীব্রতা আছে ; ধারাল দায়ে চপ শব্দে আঘাতের নাম চোপান। তীব্র বাক্যের নাম চোঁপা। চাবুকের তীব্র আঘাতে চব শব্দ হয় বলিয়া কি উহা চাবুক? চপ করিয়া কোন জিনিস চাপিয়া ধরিলে উহার চাঞ্চল্য হঠাৎ স্থগিত হয় ; বাগিন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য থামাইবার জন্যও চুপ বলিতে হয়। চাঞ্চল্য থামাইয়া স্থির থাকার নাম চুপ করিয়া বা চুপচাপ করিয়া থাকা। চাপড় অর্থাৎ চপেটাঘাতের আকস্মিক তীব্রতা প্রসিদ্ধ। চপেট আঘাত দ্বারা চাপ দিয়া যাহা চ্যাপটা করা যায়, তাহাই

চিপিটক বা চিড়া। চপেটা ষষ্ঠী বা চাপড়া ষাট দেবতা ঐ বিশেষণ কেন পাইলেন? চওড়া কি চ্যাপটারই উচ্চারণ-ভেদ? কাঠ চিরিয়া চ্যাপটা তক্তা হয়। পাটের সুতায় যে চট তৈয়ারি হয়, উহাও চ্যাপটা জিনিস। তালপাতের চাটাই ঐরূপ চ্যাটলা আসন। চট ছোট হইলে চটি হয়। চটি বই আর চটি জুতা উভয়ই পাতলা চ্যাটলা জিনিস। চটেরই অল্পার্থে চিট, যথা চিট কাগজ বা কাগজের চিঠি। পাতলা লোহার চাটুর উপরে রুটি সেঁকিতে হয়। ময়দা চটকিয়া পরে চিচকি দিয়া চাটুতে রাখে। চট করিয়া কাজে যে আকস্মিকতা আছে, উহা চপ করিয়া চাপনের আকস্মিকতার অনুরূপ। চটপট কাজের আকস্মিকতা বা দ্রুততা অত্যন্ত অধিক। দ্রুতগতি অর্থে চটকিয়া চলা। চটপট বা চোটপাট করিয়া চাটবাট বা চিটবিট তুলিয়া চৌচাপটে কাজ শেষ করিলেই চটক জন্মে। চুটকি কবিতার বা গল্পের ক্ষুদ্রতা ও তীব্রতা স্পষ্ট; উহার উদ্দেশ্য চটক লাগান। চট শব্দে চোটাইলে জিনিস সহসা ফাটিয়া চটিয়া যায়; উহার গায়ে চটা উঠে। তবলার চাটিতে চট শব্দ হয়। যে ব্যক্তি চট করিয়া সহসা রাগ করে, তাহার মেজাজ চটা। চট করিয়া অকস্মাৎ আঘাতের নাম চোট; আঘাত ক্রিয়ার নাম চোটান। চটরপটর খাঁটি ধ্বনিমূলক শব্দ। বিদ্যুতের চিড়িক উহার দ্রুততার জ্ঞাপক।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে অল্পপ্রাণ ধ্বনির ক্ষণস্থায়িতা, আকস্মিকতা, তীব্রতা যত স্পষ্ট বুঝাইতেছে, চ-বর্গের তারল্যসূচনা তেমন স্পষ্টভাবে নাই। তবে তারল্যসূচক চ-কারাদি শব্দের অভাব নাই। তরল পদার্থের মধ্যে আবার দুধ, তেল, ঘি প্রভৃতি স্নেহদ্রব্যের সহিত চ'য়ের সম্পর্ক কিছু অধিক। বিড়াল চকচক শব্দে দুধের বাটিতে জিব দিয়া চাখে বা আস্বাদন লয়। ধাতুপদার্থের পিঠে তেল মাখাইয়া মসৃণ করিয়া ঐ পিঠে আঙ্গুলের ঠেলা দিলে চক শব্দ হয়। ঐরূপ জিনিসকে তেল-চকচকে বা তেল-চুকচুকে জিনিস বলা যায়। তেল মাখাইলে যখন মসৃণ হয়, তখন উহার আলোক-প্রতিফলন ক্ষমতা জন্মে। তেল-মাখান মসৃণ জিনিসে মুখ দেখা যায়, প্রতিবিম্ব পড়ে; উহা আলো ছড়ায়; কাজেই চকচকের মুখ্য অর্থ, যাহার স্পর্শে চকচক শব্দ হয়, কিন্তু গৌণ অর্থ, যাহা আলো

ছড়াইয়া উজ্জ্বল দেখায়; এই অর্থ চ ক চ কে, চু ক চু কে, চি ক চি কে, চি ক ণ, চ ক ম কে, চি ক মি কে, চ ক ম কি (পাথর—যাহা আগুন উদ্‌গিরণ করে), চা ক চি ক্য প্রভৃতিতে বর্ত্তমান। রেশমের চিক চি ক ণ দ্রব্য। চি ক পরদা কি সেকালে রেশমে প্রস্তুত হইত? চা কু ছুরির ফলক চ ক চ কে। যাহা ঔজ্জ্বল্যে চ ক ম ক করে, তাহা চ ম ক জন্মায়, তাহা চ ম ৎ কা র। চ ম ক লাগিলে লোকে চ ম কি য়া উঠে; চৈতন্য লাভে চা ঙ্গা হয়। চো কা চো কা বাণে বোধ করি, বাণের ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষা তীক্ষ্ণতা স্পষ্টতর। ফলের খোসা মসৃণতা হেতু চোঁ কা; গমের খোসা হইতে চো ক ল হয়। বাঁশের মসৃণ ত্বক্ তীক্ষ্ণ ছুরিতে চাঁ ছি য়া চাঁ ছ ও চোঁ ছ তৈয়ার হয়। তপ্ত কটাহ হইতে ক্ষীরের অবশেষ চাঁছিয়া লইলে হয় চাঁ ছি।

তরল রস গাঢ় হইলে উহা আটায় পরিণত হয়, উহাতে কঠিন দ্রব্য পরস্পর জোড়া লাগে। চ'য়ের তারল্য ও ট'য়ের কাঠিন্যসূচনা একত্র মিলাইয়া আটার মত জিনিস চ ট চ ট করে—উহা চ ট চ টে, চ্যা ট চে টে, চি ট চি টে হয়। চি টা গুড় চ ট চ টে আটার মত গাঢ়; চি টে ল মানুষ আপন কাজে আটার মত লাগিয়া থাকে, সহজে ছাড়ে না। চি ম ড়া জিনিস দাঁতে ছাড়ান যায় না। গাঢ় চ ট চ টে পানীয় দ্রব্য পান করা দুঃসাধ্য, উহা জিব দিয়া চা টি তে হয়। যাহা চা টি তে হয়, তাহা চা ট বা চা ট নি। চ্যা টাং চ্যা টাং কথা যেন গাঢ় ভাবে শ্রোতার অন্তঃকরণে সংলগ্ন হয়।

জলাশয়ের জলে ঝাঁপ দিলে চ ব শব্দ হয়; জলে চু বা ই লে চ ব শব্দ জন্মে; উহার ব-কার ধ্বনি বায়ুর আঘাতে উৎপন্ন। চ ব চ বে জিনিস আর্দ্র জিনিস; উহা জলে চ ব চ ব করে। ব্লটিং কাগজ কালিতে ভিজিয়া চ বি য়া যায়। ভিজা কাগজ কাজে লাগে না, উহা চো তা কাগজ। চো প সা কি টো প সা র প্রকারভেদ?

চ-কার তারল্যব্যঞ্জক, আর ল-কারও তারল্যব্যঞ্জক; উভয়ের যোগে অতিশয় চাঞ্চল্যের ভাব আসে। সংস্কৃত গত্যর্থক চ ল ধাতুর সহিত ইহার কিছু সম্পর্ক আছে কি? অন্ততঃ চ ঞ্চ লে র চাঞ্চল্য উপেক্ষা করিতে পারি না। সংস্কৃত চ প ল শব্দও চঞ্চলের অনুরূপ। সংস্কৃতে যাহাই হউক, বাঙ্গালায় চ ল চ ল করিয়া চলা, চু ল চু ল করা, চু ল বু ল করা,

চুলকান প্রভৃতির গত্যর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। কেশার্থক চুল শব্দটির সংস্কৃত মূল আছে কি? না থাকিলে উহার নামের সহিত চাঞ্চল্যের সম্পর্ক আনা চলে না কি? চাঁচর চুলের চঞ্চল শোভা দর্শনীয় বটে। চ্যাংড়া মানুষ কি চঞ্চলপ্রকৃতির মানুষ? চ্যাং মাছ কিরূপ?

তরল পদার্থ কখন কখন চুষিতে হয়; চোষার মূল সংস্কৃতে থাকিলেও উহাতে তরল দ্রব্যের পানক্রিয়াজাত ধ্বনির অনুকরণ জ্ঞাপন করে না কি? চাটুকারের নাম চুচকো হইল কেন?

ছ

চ'য়ের লক্ষণ ছ'য়ে বর্ত্তমান আছে, তবে চ'য়ের চেয়ে ছ'য়ের জোর বেশী, কেন না, উহা মহাপ্রাণ। কুকুর তাড়ানর সঙ্কেত ছেই। জোরে ঘৃণাপ্রকাশে মুখ হইতে শব্দ বাহির হয় ছিঃ বা ছ্যাঃ বা ছোঃ। ঘৃণার সহিত পরিত্যাজ্য ভস্মের নাম ছাই। সাপের ছোঁ অনুকরণজাত শব্দ; কাজেই সাপের কামড় ছোবল। চিলেও ছোঁ দিয়া মাছ লইয়া যায়; ছোঁ দিয়া ছুঁইয়া লয়। স্পর্শার্থক ছোয়া কি সেই ছোঁয়ার সহিত অভিন্ন?

তপ্ত কটাহে তেল ছেঁক শব্দ করে; গরম দ্রব্যই ছেঁকছেঁকে; উহা ছেঁকা দেয়। তরল পদার্থই কাপড়ে ছাঁকে; ছাঁকিবার যন্ত্র ছাঁকনা ও ছাঁকনি। ছেঁক শব্দে যাহার রান্না হয়, তাহা ছেঁচকি। রান্নার ছাঁচন কি ঐ জন্য? গরম তেলে পাঁচ ফোরণ দিয়া ছঁওকাইতে হয়। যাহার ছুতা বাই (বায়ু রোগ) আছে, সে কোন জিনিস ছুঁইতে চাহে না, আর সকল কাজে ছুত ধরে। ছুত ধরার প্রবৃত্তি হইতে ছুতো-নতা।

ছুঁ ছুঁ শব্দ করে বলিয়া জানোয়ারের নাম ছুঁচা; ছুঁচার মত ঘৃণ্য মানুষও ছুঁচো। কথায় অকথায় ছিঁচ্ করিয়া যে কাঁদে, সে ছিঁচ-কাঁদুনে।

চপ জোরাল হইলে ছপ হয়। ছপছপ, ছিপছিপ বৃষ্টিপাতের শব্দ। হালকা বেতের মত দ্রব্যের সঞ্চালনের শব্দ ছিপছিপ; ঐ জন্যই কি মাছ ধরিবার ছিপ এবং বোতল আঁটিবার ছিপি? ঐ কারণেই হালকা দ্রব্য—হালকা মানুষ পর্য্যন্ত ছিপছিপে। চাপ জোরে দিলে

ছাপ এ পরিণত হয়। ছাপা-যন্ত্র,—যাহার ইংরেজী নাম press—তাহার খাঁটি অনুবাদ চাপা যন্ত্র। দোষীর অপরাধ চাপিয়া রাখার নাম ছাপান। কাপড়ের উপর রঞ্জনার্থ তরল রঙের ছাপের নাম ছোপ; ছোপ দেওয়ার নাম ছোবান। ছাপের সঙ্গে ছাঁচের সাদৃশ্য আছে। ছপ্পর খাট ও চাল-ছপ্পর কিরূপে ঐ নাম পাইল? ফাঁপা বলিয়া নহে ত? মধ্যস্থিত জোড়া প' এ জন্য দায়ী; টপ্পরের সহিত উহা তুলনীয়। চনচনে যে তীক্ষ্ণ বেদনা বুঝায়, ছনছনেও তাহাই বুঝায়। এই তীক্ষ্ণতা ন-কারের। ছিনে জোঁক গায়ে কাটিয়া ধরে। আতঙ্কে—বিশেষতঃ ভূতের ভয়ে গা ছমছম করে।

মসৃণ ভূপৃষ্ঠের উপর গুরুভার দ্রব্য টানিয়া ছেঁচড়াইতে হয়। এক-একটা লোকের স্বভাব এমনই যে, তাহাকে ক্রমাগত নাড়া না দিলে বা না ছেঁচড়াইলে কাজ আদায় হয় না, সেইরূপ লোক ছেঁচড়। ছেকড়া গাড়ী বা ছক্কর তাহার আরোহীকে ছেঁচড়ায় বলিয়া কি নাম সার্থক করিয়াছে? ছোকরা বালকের সহিত তাহার কি সম্পর্ক?

চিমড়া জিনিসের রূপভেদ ছিবড়া। ছিবড়া জিনিস স্থূলতা পাইলে ছোবড়া হয়। ছিমরি মাছ ঐ নাম পাইল কেন? ছ'য়ে ট' যোগ করিলে ট-বর্গের কাঠিন্য আসিয়া ছ'য়ের তারল্যকে ঢাকিয়া দেয়। ইটের মত শক্ত জিনিস ছট করিয়া ছটকিয়া পড়ে। ছটকানর রূপভেদ ছিটকান। ছাঁটিবার সময় টুকরা ছাঁট সকলও দূরে ছটকিয়া পড়ে। বৃষ্টির ছাইট ঘরের ভিতরে ছটকিয়া আসে। হাত-পায়ের মাংসপেশী হঠাৎ কাঠিন্য পাইলে ছিটেশ ধরে;—উহার বেদনাও কঠিন বেদনা। এক প্রান্তে ঢিল বাঁধিয়া ঘুরাইতে থাকিলে যাহা ছট্ শব্দে পড়ে, তাহা ছিটকানিতে পরিণত হয়। ঢিল যখন ছিটকিয়া পড়ে, তখন দূরে গিয়া পড়ে। ছট্ করিয়া ছটকিয়া পড়ার প্রবৃত্তি ছটফটি বা ছটফটানি। দূরে প্রক্ষেপের নাম ছোড়া;—ছুড়িয়া ফেলায় ও ছটকিয়া পড়ায় সমান ফল। দূর দেশ লক্ষ্য করিয়া বেগে ধাবনের নাম ছোটা। ছুটি পাইলে ছেলেরা ছুট দিয়া রাস্তায় ছুটে। ছট্ করিয়া যাহা বন্দুকের ভিতর হইতে ছোড়া যায়, তাহা ছটড়া বা ছররা। কাঠিন্যহেতু উহার শব্দ কর্কশ; উহা ফেলিলে ছরছর শব্দ জন্মে। ছড়ছড় শব্দে

ফেলার নামান্তর ছড়ান। ছাড়ানও প্রায় তদ্রূপ। শস্যের বীজ জমিতে ছড়ানর নামান্তর ছিটেন্। ছেঁড়া ও ছেনার মূল সংস্কৃতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃতে ছড়ির মূল আবিষ্কার বোধ করি দুঃসাধ্য। বেতের ছড় ছোট হইয়া ছড়ি হয়। চুটকি কবিতার টুকরা, যাহা দেশমধ্যে ছড়াইয়া আছে, অথবা যাহা ছড়ির মত অন্তঃকরণে আঘাত দেয়, তাহাই কি ছড়া?

নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া ছলছল করে; এখানে ল-কার যোগে তারল্যের ভাব অতি স্পষ্ট; তারল্যের সহিত চাঞ্চল্যও একটু আছে। জলের পিঠে ঢিল ছুড়িয়া ছুলছুলি খেলা এই প্রসঙ্গে মনে আসিবে। তরল চঞ্চল হীনপ্রকৃতির লোককে ছুল্লু বলে। কঠিন দ্রব্যের কোমল ত্বক্‌কে ছাল বলে। ছাল ছোট হইলে হয় ছিলকে; উহা কি শল্কের অপভ্রংশ? ছোলার বীজের ছাল সহজে ছুলিয়া তোলা যায়। ছুরি দিয়া ছাল ছিলিতে বা ছুলিতে পারা যায়। তালব্য ছ-কারের পর দন্ত্য ল-কার বসিয়া এই তরলতা ও কোমলতা স্পষ্ট করিয়া দেয়। ছ্যাবলা ও ছিবলে মানুষের চরিত্র তরল। ছাওয়াল ও ছেলে কি তাহার কোমলতা হইতে নাম পাইয়াছে?

জ

চ' ও ছ'য়ের তুলনায় জ'য়ের জাঁক বেশী; উহা গম্ভীর ভাবের ব্যঞ্জনা করে। জাঁক শব্দটাতেই তাহার পরিচয়।

জগর্জগাতে চকচকে জিনিসের চাকচিক্য আরও জাঁকাইয়া আছে; জগজগ করা বা জুগজুগ করার অর্থ দীপ্তি বিকাশ করা। চমক চেয়ে জমক বেশী জমকাল বা জাঁকাল। জাঁকের উপর জমক বসাইলে উহা জাঁকজমকে পরিণত হয়। চমচম, ছমছম চেয়ে জমজমার গাম্ভীর্য্য বেশী। লোক জোটাইয়া বা জড় করিয়া জটলা করিলে কর্ম্মের গুরুত্ব বাড়ে বটে।

উজ্জ্বল দ্রব্যকে জলজলে বা জিলজিলে বলিয়া থাকে। এখানে মূলে হয়ত সংস্কৃত জ্বল ধাতু বর্ত্তমান। উজ্জ্বল দ্রব্যেই জেল্লা দেয়।

চবচবে জিনিস আর্দ্র বটে। স্থূলতার সহিত আর্দ্রতা মিশিলে জবজবে বা জ্যাবজেবে বলা হয়। স্থূল কাজ জোবদা।

জুজু নামক জীবের দীপ্তি আছে কি না বলা কঠিন, কিন্তু শিশুদের নিকট উহার গুরুত্বের ইয়ত্তা নাই। জ ব র জ ং শব্দের অর্থ কি?

ঝ

ঝ'য়ের ঝাঁক জ'য়ের মত; অধিকন্তু উহার বল জ'য়ের চেয়ে বেশী।

ঝিঁঝিঁ পোকা তাহার ডাক হইতে নাম পাইয়াছে; ঝ ঙ্কা রে র উৎপত্তি ধাতুনির্ম্মিত তন্ত্রীর ধ্বনি হইতে। অস্ত্রের ঝ ঞ্ঝ না কাব্যে প্রসিদ্ধ। শিশুর খেলনা ঝুমঝুমি ঝুমঝুম করিয়া বাজে। ঝু মু রে র গীত-বাদ্য কি ঐরূপ ধ্বনি হইতে? ঝন্ ঝন্ বা ঝাঁ ঝাঁ শব্দ করে বলিয়া কাংস্যময় করতালের নাম ঝাঁ ঝ। ধাতুনির্ম্মিত ঝাঁ ঝে র অনুনাসিক ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়ে বিঁধে। তীব্রধর্ম্মাত্মক অন্যান্য জিনিসেরও ঝাঁ ঝ থাকে। মধ্যাহ্নে রৌদ্রের ঝাঁ ঝ স্পর্শেন্দ্রিয়ে এবং তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত লঙ্কার ঝাঁ ঝ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে বিঁধে। ছয়টা রসের মধ্যে যে রসটা ঝাঁ ঝা ল বেশী, তাহা ঝা ল।

ঝ ঞ্ঝা বায়ু প্রবল বাত্যার ধ্বনির অনুকরণে নাম পাইয়াছে। ঝঞ্ঝার মত যাহা কষ্টে ফেলে, তাহা ঝ ঞ্ঝা ট। চিন্‌চিনের তীব্রতা ঝি ন ঝি নে আছে; পা ঝি ন ঝি ন করিলে এই বেদনা অনুভূত হয়। নারীর পায়ে মলের শব্দ ঝ ম ঝ ম বা ঝ ম র ঝ ম র এবং বৃষ্টিপাতের শব্দ ঝ ম ঝ ম, ঝ মা ঝ ম, ঝি ম ঝি ম, স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণে উৎপন্ন। ইট পুড়িয়া ঝা মা হইলে উহা আঘাতে ঝ ম ঝ ম শব্দ করে। বৃষ্টিপাতের ঝ ম র ঝ ম র শব্দ হইতে জলের ঝা ম রা ন। চ ন চ ন গুরুত্ব পাইয়া ঝ ন ঝ ন হয়। ঝ ন ঝ নে বেলায় রৌদ্র প্রখর হয়। ঝু নো নারিকেলের জলের আস্বাদন তীব্র। মানুষের স্বভাব কড়া ও তীব্র হইলে তাহাকে ঝা নু বলে।

চকচকে জিনিসই ঝ ক ঝ ক করে। ঝি ক ঝি কে বেলা ও ঝি কি মি কি রৌদ্রে আমরা চিকচিকে ও চিকিমিকির ঔজ্জ্বল্য আরও ভাল করিয়া দেখিতে পাই। ঝি নু কে র খোলার গায়েও ঐ উজ্জ্বলতা রহিয়াছে।

চ ট শব্দে যে দ্রুততা ও আকস্মিকতা আছে, ঝ ট শব্দেও তাহা বিদ্যমান। এখানে ঘোষবান্ এবং মহাপ্রাণ ঝ-কার ঘোষহীন অল্পপ্রাণ

ট-কারের ধ্বনিকে অভিভূত করিতে পারে নাই। চ ট বা চ ট প ট কাজ করা এবং ঝ ট প ট কাজ করা প্রায় তুল্যার্থক। এই ঝট্ হইতে সংস্কৃত ঝ টি তি উৎপন্ন, তাহাতে সংশয় নাই। ঝা ট শব্দের প্রয়োগও বাঙ্গালা কবিতায় পাওয়া যায়, উহার অর্থ শীঘ্র। ঝ ট অনুনাসিকত্ব পাইয়া ঝাঁ টা র শব্দে পরিণত হয়; ঝাঁ টা ন র অর্থ ঝাঁটার প্রয়োগ। ঝ ড় (সংস্কৃত ঝ টি কা) উহার বেগবত্তা বা উহার ধ্বনি হইতে নাম পাইয়াছে কি না বিচার্য্য।

ঝ প শব্দ ঊর্দ্ধ হইতে বেগে লম্ফ প্রদানের শব্দ। ঝু প ঝা প শব্দে নিম্নে অবতরণ প্রসিদ্ধ। ঝ প শব্দে লম্ফের নামান্তর ঝাঁ প বা ঝ ম্প। ঝাঁ পা নে র নৃত্য ঝম্প-বিশেষ। কর্ণভূষণ ঝাঁ পা নিম্নে ঝাঁপিয়া পড়িতে উন্মুখ। অন্নদামঙ্গলের অন্নপূর্ণার ঝাঁ পি কিরূপ? বৃষ্টিপাতেও ঝ প ঝ প শব্দ হয়; ঐরূপ ঝ প ঝ প শব্দে বেগে বৃষ্টির নাম ঝা প টা ও ঝাঁ ই টা। ঝা প টি য়া ধরা বেগে চাপিয়া ধরা। ফলাদি পতনে যখন-তখন ঝু প ঝা প শব্দ হয় বলিয়াই কি জঙ্গলের নাম ঝোঁ প? অথবা ঝু প শি আঁধার উহার ভিতর ঘনীভূত থাকে বলিয়া ঝোঁ প? ঝা প শা চোখে আঁধার দেখিতে হয়।

ঝ র ঝ র শব্দে ঝ র ণা র জল ঝ রি য়া পড়ে; সাধু ভাষায় উহা নি ঝ র। ঝা রি হইতেও জল ঝ রে। ঝি র ঝি র বা ঝু র ঝু র করিয়া বালি ঝরে; বালুকার কার্কশ্য বুঝাইতে ঝ'য়ের পরবর্ত্তী মূর্দ্ধন্য বর্ণ র' বিদ্যমান। ঝাঁ ঝ রা ও ঝাঁ ঝু রি র সহস্র ছিদ্র দিয়া ধুলাগুঁড়া ঝ রি য়া পড়ে। ঝ র ঝ র শব্দে যে সকল জিনিস ঝরিয়া পড়ে, তাহাকে বাছিয়া লইতে হইলে ঝা ড়ি তে হয়। ঝা ড়ি বা র যন্ত্রের নাম ঝা ড় ন। ঝা ড়ু-দার ধুলা ঝা ড়ি য়া ঘর-বাড়ী পরিচ্ছন্ন করে। ডালপালা ঝু রি য়া সেইরূপ বৃক্ষশাখাকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। রাগের মাথায় গালাগালি দিয়া মনের মলামাটি সাফ করার নামও ঝু রি য়া দেওয়া। ঐ কাজে একবার প্রবৃত্ত হইলে ঝো রা অনেক সময় ঝ গ ড়া য় পরিণতি পায়। ঝগড়া কর্ম্মটা ঝ ক মা রি কর্ম্ম। ডালপালার শব্দ হইতে গাছপালার ঝা ড়; গৃহসজ্জার্থ কাচের ঝা ড়ও তদ্বৎ। জঙ্গলের মধ্যে ঝা ড়ে ঝো রে শিকারী জন্তু লুকাইয়া থাকে।

জলজলের চঞ্চল দীপ্তি ঝলমলেও আছে। ঝিলমিলির কাঠের গায়ে ঢেউ খেলার চাঞ্চল্য আছে। শ্মশানের ঝিল কি চিতাগ্নির দীপ্তি মনে করায়? জলাভূমি ঝিলের অর্থ কি? ঝুলন-দড়িতে দোল খাওয়ায় বা ঝোলাতে কেবলই চাঞ্চল্য আছে। মাকড়সার জাল আপন ভারে ঝুলিয়া ঝুল হইয়া পড়ে। তারল্যবশে যাহা আপনা হইতে ঝুলিয়া পড়ে, তাহা ঝোল; তরল গাঢ় রক্ত ঝলকে ঝলকে নির্গত হয়। ধাতুময় তৈজস পাত্র রাঙের ঝাইল দিয়া ঝালান হয়; ঐ ঝাইল গাঢ় দ্রবাবস্থায় থাকে। মহাদেবের কাঁধে সিদ্ধির ঝুলি ঝুলিত। ঝালরও ঝুলিয়া থাকে, উহার উজ্জ্বলতাও আছে। ঝুমকো ফুল উজ্জ্বলও বটে, ঝুলিয়াও পড়ে। স্ত্রীলোকের চুল বেণীবদ্ধ হইয়া ঝুলিলে কি উহা ঝুঁটি হয়? ষাঁড়ের পিঠের ঝুঁটের সহিত স্ত্রীলোকের মাথার ঝুঁটির সাদৃশ্য আছে কি? ঝুরির সহিত ঝুলির অনেক বিষয়ে মিল আছে। ঝাঁকাড় দেওয়া বা ঝাঁকড়ান চঞ্চল আন্দোলনের নামান্তর; ভারী জিনিসকে ঝাঁকড়াইয়া লইতে হয়। জরতী-বেশে অন্নদার ঝাঁকড়মাকড় চুলও এখানে স্মর্ত্তব্য। ঘোষযুক্ত বর্ণ ঝ'য়ের ভার এ স্থলে ধ'য়ের ভার ও ঢ'য়ের ভার স্মরণ করাইয়া দেয়। ঝাঁ করিয়া চলা আর ধাঁ করিয়া চলা তুল্যার্থক। ঝিমান (তন্দ্রা), কার্য্যে ঢিমা অর্থাৎ আলসে মানুষের ঢুলুঢুলু আঁখি মনে আনে। ঝোঁক, ইংরেজীতে যাহাকে impulse বলা যাইতে পারে, তাহাতে বেগবত্তার ও গুরুত্বের ভাব আসে। দায়িত্বের গুরু ভাবের নাম ঝুঁকি। গুরুভার বোঝা বহিবার জন্য ঝাঁকার উৎপত্তি। পাখী যখন বৃহৎ দল বাঁধে, তখন সেই দলের বৃহত্তা বুঝাইবার জন্য বলি পাখীর ঝাঁক।

ক-বর্গ

প-বর্গ হইতে চ-বর্গ পর্য্যন্ত চারি বর্গের অন্তর্গত চারি শ্রেণীর ধ্বনি যেমন এক একটা বিশিষ্ট লক্ষণের সহিত যুক্ত, ক-বর্গের বর্ণগুলিতে সেরূপ সাধারণ লক্ষণ বাহির করা কঠিন। উহার প্রত্যেক বর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

ক

কাক, কোকিল, কুকড়া (কুক্কুট), কুকুর প্রভৃতির নাম উহাদের স্বাভাবিক ডাক হইতে আসিয়াছে। কোকিলের কূজন (সংস্কৃত) উহার কুহু ধ্বনি হইতে। কাকা, কঁ্যাকঁ্যা, কোঁকো, কেঁই-কেঁই, কেঁউ-কেঁউ, ককক কঁ্যাক কঁ্যাক প্রভৃতি স্বাভাবিক ধ্বনি নানা স্থানে আমাদের পরিচিত। সংস্কৃত কেকা, কাকু ও বাঙ্গালা কাকুতি (কাকূক্তি?) অনুকরণজাত, সন্দেহ নাই। কক্‌ কক্‌ শব্দ করার নাম ককান। কিচমিচ, কিচির কিচির, কিচির মিচির শব্দ বিবিধ জন্তুর পক্ষে প্রযোজ্য। কুকুরের বাচ্চাকে কুৎ কুৎ করিয়া ডাকিলে সে মহানন্দে লেজ নাড়িতে নাড়িতে অগ্রসর হয়; সে কিন্তু জানে না যে, কুত্তার বাচ্চা বলিলে গালি দেওয়া হয়।

কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইবার সময় জিহ্বামূল ক্ষণেকের জন্য উহার পথ রোধ করিলে ধ্বনি জন্মে ক। অল্পপ্রাণ বর্ণের মধ্যে বোধ করি ক' উচ্চারণে সময় লাগে সকলের চেয়ে কম। দ্রুততা ও আকস্মিকতা অল্পপ্রাণ বর্ণ মাত্রেরই প্রধান লক্ষণ; সর্ব্বত্র ইহার পরিচয় পাওয়া যায়; যথা—পট্‌ করে কাজ করা, চট্‌ করে চলা, চপ্‌ করে ধরা। ক-কারাদি কচ্‌, কট্‌, কপ্‌ প্রভৃতি শব্দেও ঐ দ্রুততা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়াছে।

কচ করিয়া কাটা ও কট করিয়া কাটাতে আবার অর্থের ভেদ আছে; কাগজের মত নরম জিনিস কাটিলে কচ হয়, আর তারের মত কঠিন ধাতব দ্রব্য কাটিলে কট হয়। ক'য়ের পর তালব্য বর্ণ বসিয়া কোমলতা ও মূর্দ্ধন্য বর্ণ বসিয়া কাঠিন্যের সূচনা করে।

কচ, কচকচ, কচর কচর, কুচকুচ, কুচুর কুচুর, কঁ্যাচ কঁ্যাচ প্রভৃতিতে কাগজ, কাপড়, গাছের পাতা প্রভৃতি কোমল দ্রব্য কাটার ধ্বনি আসিতেছে। অন্নপূর্ণাদত্ত পিষ্টক মহাদেব কচমচিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন, ইতি ভারতচন্দ্র। কঁ্যাচ শব্দে যে যন্ত্রে কাটা যায়, উহা কাঁচি। যাহা কাটিবার সময় কচ শব্দ হয়, তাহা কাঁচা। কাঁচকো মাটি শক্ত মাটি, উহা কঁ্যাচ করিয়া পায়ে বিঁধে। কুঁচকি কোমল অঙ্গ, সহজেই সেখানে ব্যথা হয়। ছোট নরম জিনিসকে কচি বলে; কচুর কচুত্ব এবং কচুরির কচুরিত্ব কি কোমলতা হইতে? সংস্কৃতে কুঞ্চন শব্দ থাকিলেও বলিব যে, কাপড়ের মত কোমল

জিনিসই কোঁচান যায়; বস্ত্রের যে অংশ কুঞ্চিত হয়, তাহা কোঁচা; কোঁচার এক অংশ কুঞ্চিত হইয়া কোঁচড় হয়। বেতের মত স্থিতিস্থাপক জিনিসও কোঁচকান চলে; সেই জন্যই বাঁশের শাখার নাম কঞ্চি। কচলান ক্রিয়াও কোমলতা বা তারল্যের সূচক; কঠিন দ্রব্য কচলান হয় না। কোমল কাপড়ই জলে কাচা যায়; উহা কচলানর অনুরূপ। যে মানুষকে কচলাইতে হয়, তাহার কঁ্যাচলাম বিরক্তিকর। বালি যদি খুব সরু হয় এবং ভিজা হয়, তবেই কিচকিচ করে, অন্যথা কিচিড় কিচিড় করে। কুচ কুচ করিয়া কাটিয়া যে ছোট টুকরা পাওয়া যায়, তাহাকে কুচি বা কুচো বলে, যেমন কাঠের কুচো। কুচিকুচি ক'রে কাটার অর্থ ছোট ছোট টুকরা করিয়া কাটা। কুচকুচ করিয়া কাটিয়া ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত করার নাম কুচোন। কঁুচ-এর ছোট বীজ সংস্কৃত গুঞ্জা হইতে আসিয়াছে, কি কুঁচ সংস্কৃত হইয়া গুঞ্জায় পরিণত হইয়াছে, বিচার্য্য বটে।

তালব্য চ'য়ের মত দন্ত্য বর্ণ ত'ও কোমলতাসূচক। ক'য়ের সহিত দন্ত্য বর্ণ ল' যুক্ত হইয়া কোমলতা ও তরলতার সহিত চাঞ্চল্য সূচনা করে।

হোঁদল-কুৎকুতের কুৎকুৎ শব্দ ঐ জন্তুর স্বভাব সম্বন্ধে কি পরিচয় দেয়, তাহা পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন। বগলে কুতু কুতু দিলে সর্ব্বশরীরে যে আক্ষেপ ও চঞ্চল আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। খাদ্য দ্রব্য গিলিবার কালীন কোঁত শব্দের সহিত সংস্কৃত কুন্থনের সম্পর্ক থাকিতে পারে। কোঁতকা শব্দ বোধ হয় ঐ ধাতু হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত কুর্দ্দন বা কোঁদা শব্দের সহিত ঐরূপ আক্ষেপের সম্পর্ক আছে কি?

কলকল, কুলকুল চঞ্চল জলপ্রবাহের ধ্বনি। কালিন্দী-জলের কল্লোলে যে কোলাহল উৎপন্ন হইত, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত পর্য্যন্ত কুতূহলী ছিলেন ও আছেন। সংস্কৃত নাটকের নেপথ্যে কলকল ধ্বনির সহিত বাঙ্গালা কিলকিল ও সংস্কৃত কিলকিলার সম্পর্ক আছে। কিলবিল কিলবিলেরই অনুরূপ; অধিক জনতায় কিলকিল শব্দ হয়; মানুষগুলাও সেখানে কিলবিল করে। 'কোটি কোটি কান কোটারির কিলিবিলি'—এখানে কান কোটারির বাহুল্য বুঝাইতেছে। কল ধ্বনির মাধুর্য্য কালিন্দী-জলের

কল্লোলের মধুরতার সমান। পাখীর কাকলিও ঐরূপ মধুর। কোঁকিলের কূজন ত মধুর বটেই। কুল্লো করিবার সময় মুখের ভিতর জল কুলকুল করে। চঞ্চল আন্দোলনপরতা হইতে কি শূর্পের বাঙ্গালা নাম কুলো?

অল্পপ্রাণ প-বর্ণ ক'য়ের পরে বসিয়া উহার দ্রুতগতিকে দ্রুততর করিয়া তোলে। কপ ক'রে, কপকপ ক'রে, কুপকাপ ক'রে খাওয়াতেই তাহার পরিচয়। কপ ক'রে কোপ দিয়া এক কোপে কাটার নাম কোপান।

দন্ত্য বর্ণের যোগে যেমন কোমলতা বুঝায়, মূর্দ্ধন্য যোগে তেমনই কাঠিন্য আনে। লোহার তার কট্ শব্দে ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া যায়। ইঁদুর তাহার ছোট শক্ত ধারাল দাঁতে যখন কাঠ কাটে, তখন কুটকুট, কুট-কাট, কুটুর কুটুর, কুটুর কাটুর শব্দ হয়; ধারাল দাঁতের তীক্ষ্ণতাও ঐ কুটকুট ধ্বনিতে প্রকাশ করে। পিঁপীড়ায় কুট করিয়া কামড়ায়, এখানে বস্তুতঃ কোন শব্দ হয় না; কামড়ের তীক্ষ্ণ বেদনা বুঝাইতে এখানে কুট শব্দের প্রয়োগ। গায়ে বিছুটি লাগিলে গা কুটকুট করে, উহাও সেই বেদনার তীক্ষ্ণতার পরিচয় দেয়। কুটকুট কামড়ের প্রকারভেদ কুটুশ কাটুশ কামড়। স্নায়বিক বেদনায় কটকটানি যন্ত্রণা জন্মে। কটের বিকার কটাং এবং কটাস। সরু তার দিয়া আঙ্গুল বাঁধিলে উহা কট করিয়া কাটিয়া বসিয়া কটকটানি জন্মায়; সরু অথচ কঠিন দ্রব্যকে কটকটে বলে। সংস্কৃত কটু আস্বাদের কটুত্ব কি সেইরূপ কোন বেদনাজ্ঞাপক? কঠিন ব্রত পালনের নাম কটকিনা। কোটা (কুট্টন),—যথা চিড়ে কোটা,—এই ক্রিয়ার নাম কি ঢেঁকিযন্ত্রের অবয়বের কাঠিন্যজ্ঞাপক? কাঠের (কাষ্ঠের) ঠকার উহার কাঠিন্য জ্ঞাপন করে না, তাহা কিরূপে জানিব? তাই যদি হয়, তবে কাষ্ঠ, কঠোর, কঠিন, কুঠার, কঠিনী, কটাহ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দগুলির অন্তর্গত মূর্দ্ধন্য ধ্বনি উহাদের কাঠিন্য সূচনা নিশ্চয় করিতেছে। কঠিনার্থক কড়া, কড়ি, কাঠি, কুড়ুল, কটিং প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতমূলক হইলেও এই হিসাবে কাঠিন্যব্যঞ্জক হয়। এমন কি, কূট ও কুটিল, কোটর ও ক্রূর প্রভৃতি শব্দেও সন্দেহ আসিয়া পড়ে। সংস্কৃত কৃৎ ধাতু—যাহার অর্থ কাটা এবং যাহা হইতে কর্ত্তন,

কর্ত্তরী (কাটারি) প্রভৃতি শব্দ উৎপন্ন, তাহাও বুঝি বা এই শ্রেণীতে পড়ে।

সংস্কৃত শব্দের মূল যাহাই হউক, করকর, কিরকির, কুরকুর প্রভৃতি শব্দ কঠিন কর্কশ দ্রব্যের বার্ত্তা বহন করে। কড়কড়, কিড়কিড় প্রভৃতি শব্দও উহারই রূপান্তর মাত্র। কিড়্মিড়, কিড়ির মিড়ির দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণের শব্দ। কর্কশ, কর্কর (কাঁকর), কর্কট (কাঁকড়া), কর্পট (কাপড়), কর্পর প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দেও কি সেই ভাব আসিতেছে না?

সোনার কঙ্কণ (কাঁকনি) তাহার নামের অনুনাসিক ধ্বনিতে উহা যে ধাতুনির্ম্মিত, তাহার পরিচয় দিতেছে। ধাতুনির্ম্মিত সরু তারের শব্দ কন্কন্; ঐ ধ্বনির তীব্রতা এবং ঐ তারের তীক্ষ্ণতা কনকনানি, কুনকুননি প্রভৃতি বেদনাজ্ঞাপক শব্দে বিদ্যমান। কন্কনে শীতে যে বেদনা বুঝায়, উহা সরু তারে চামড়া কাটিয়া গেলে তদুৎপন্ন বেদনার বা যাতনার অনুরূপ। কালো রঙের কিশকিশে বিশেষণ ক-কারাদি কেন?

খ

খ বর্ণ ক'য়ের মত জিহ্বামূলীয়,—উহার জোর ক'য়ের চেয়ে অধিক। খক্, খক্খক্ প্রভৃতি কাশির শব্দ কণ্ঠ হইতে জিহ্বামূল সহযোগে উৎপন্ন—কাশির নাম খকি। হাসির শব্দও জিহ্বামূলে উৎপন্ন, যথা, খিক্ খিক্, খুকখুক,—ল-কার যোগে উহা চঞ্চল হইয়া খলখল, খিলখিল ইত্যাদি হাস্যতরঙ্গে পরিণত হয়। খুকখুক হাসে বলিয়া কি শিশুর আদরের নাম খোঁকা ও খুঁকী? খেউখেউ, খেঁকখেঁক ডাক হইতে খেঁকি কুকুর ও খেঁক্-শিয়াল তাহাদের বিশেষণ পাইয়াছে। খেউ খেউ শব্দে বিরক্তিকর ও অশ্রাব্য গানের নাম কি খেউড়? না, উহা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে? খ্যাক্খেকে মানুষ সর্ব্বদাই বিরক্ত থাকিয়া যেন খেঁকখেঁক করে।

কচ্ শব্দ জোরে উচ্চারিত হইয়া খচ, খচখচ, খ্যাচ, খ্যাচ খ্যাচ প্রভৃতিতে পরিণত হয়। ছোট কাঁটা চামড়ায় প্রবেশ করিয়া খচখচ, খুচখুচ করে; উহার ফল খুচ কি নড়া। জোরে টানার

শব্দ খ্যাঁচ; খেঁচানর অর্থ জোরে টানা; দাঁত খেঁচানর অর্থ ওষ্ঠাধরের আচ্ছাদন জোরে টানিয়া লইয়া বা খেঁচিয়া দন্ত বিকাশ। ধনুষ্টঙ্কারে হাত পায়ের সবল আন্দোলন খেঁচুনি। বেত বা বাঁশ চিড়িয়া তন্নির্ম্মিত খাঁচা, খাঁচি, খুঞ্চি, ঐ ঐ স্থিতিস্থাপক পদার্থের খেঁচান জ্ঞাপক। খুচ শব্দে যে কাঁটা বিঁধিয়া যায়, তাহার নাম খোঁচান। বল্লমে বেঁধার নাম খোঁচান। গোয়াল-ঘরের আবর্জ্জনা খেঁচিয়া সরাইতে হয়, উহা খিঁচ।

কুচো, কুচি প্রভৃতি বিশেষণে খণ্ড খণ্ড জিনিসের ছোট টুকরা বুঝায়; খুচরা শব্দেও ঐ খণ্ডতার ভাব আনে।

ধুলা ও বালির কিচকিচি যেমন বিরক্তিকর, তেমনই কাজকর্ম্মে খিচখিচি, খিচিবিচি, খিচমিচি ঘটিলেও উহাও বিরক্তিকর হইয়া উঠে।

খট, খটখট, খিটখিট, খটমট, খুটখাট, খুটমুট, খুটখুট প্রভৃতি শব্দ কাঠিন্যের ব্যঞ্জক। কট্‌ ও টক্‌ এই দুই শব্দের অনুরূপ শব্দ খট্‌। শুক্‌নো জিনিস কঠিন খটখটে। খিটখিটে মানুষের মেজাজ কঠিন বা কর্কশ। খাঁটি মানুষের স্বভাব কঠিন বটে; অন্ততঃ উহা উৎকোচে নোয়ায় না। খটি বা খড়ির নামের সহিত তাহার কাঠিন্যের সম্পর্ক আছে। খাট (খট্টা) উহার কঠিন কাষ্ঠময় উপাদান হইতে নামকরণ পাইয়াছে কি না, বিবেচ্য। খাটের খুরো ত কঠিন কাষ্ঠময় বটেই। খড়ম উহার কাষ্ঠময়ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, সন্দেহ করিবার হেতু নাই। চলিতে চলিতে খট শব্দে চরণদ্বয় কঠিন বাধায় আহত হইলে থামিতে হয়; খটকা লাগার অর্থও ঐরূপে আহত হইয়া থামিয়া যাওয়া। খাট জিনিসের খর্ব্বত্বের সহিত কাঠিন্যের কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে কি? খাট্টারস ও খোট্টা মানুষ কঠিন, সে বিষয়ে সন্দেহো নাস্তি, বিশেষতঃ কাঠ-খোট্টার কাঠিন্যে। খাটুনি কঠিন কাজ বটে। খাড়া হইয়া দাঁড়ান কঠিন মেরুদণ্ডের পক্ষে সম্ভবে। খুঁটি জিনিসটাও কঠিন কাষ্ঠের উপাদানে নির্ম্মিত; উহা ছোট হইলে খুটো হয়; খুঁটো মোটা হইয়া মুদ্গরে পরিণত হইলে হয় খোঁটা। খুঁটোর রূপভেদ খুরো, যেমন খাটের খুরো। অথবা উহা সংস্কৃত খুর হইতেও আসিয়া থাকিতে পারে। ছোট ছোট খুরোর উপর যাহা বসিয়া থাকে, তাহা খোরা

ও খুরি। খুটখুট শব্দের মত বিরক্তিকর কর্ম্ম খুঁটোনি। খুঁটিনাটি কাজও তদ্রূপ। খটাং, খটাস প্রভৃতি খট শব্দেরই বিকার। কলঙ্কসূচক খোঁটা ও খিটকাল মনুষ্য-চরিত্রে খট শব্দে আঘাত দেয়। দাঁতের খামটি মুখভঙ্গীর কাঠিন্যসূচক।

খটখটের কাঠিন্য কার্কশ্যে পরিণত হইলে খরখর, খুরখুর, খটর খটর, খুরখার, খুটুর খুটুর, খুটুর মুটুর, খুটুর খাটুর, খররখরর, খুরুরখুরুর প্রভৃতি শব্দে পরিণত হইয়া থাকে। খরখরে, খরমরে জিনিসের অর্থই কর্কশপৃষ্ঠ জিনিস। এই কার্কশ্য-হেতু কি শুষ্ক তৃণের নাম খড়? খড়ের টুকরা হইতে দাঁতের খড়কে প্রস্তুত হয়। জানালার ঝিলমিলির নাম খড়খড়ি ধ্বনিজাত। অলঙ্কার খাড়ু আর খেড়ুয়া বস্ত্র কি কার্কশ্যসূচক ?

কপ্ শব্দ জোরে খপ্ হয়। খপ, খপ খপ প্রভৃতি শব্দ ক্রিয়ার দ্রুততা ও আকস্মিকতা বুঝায়। খপ্ করিয়া আমরা খাবল দিয়া খাবলাই। তাড়াতাড়ি কোন কর্ম্ম সমাপ্ত করিবার ঔৎসুক্য খপ-খপানি। খাপের ভিতর তলোয়ার হঠাৎ খপ করিয়া বসে বা খাপিয়া বসে বা খাপ খায়। খাপ্পা মানুষের ক্রোধের আকস্মিকতা খপ শব্দের দ্রুততা বুঝায়।

পোড়া মাটির শব্দ খনখন। হাঁড়ি, কলসী, মালসা প্রভৃতি পোড়া মাটির জিনিসে আঘাতের শব্দই খন্ খন্। খ'য়ের ধ্বনি ঐ সকল দ্রব্যের বিশিষ্টতা। খাপরা (খর্পর), খাপরোল, খোলা, (কপাল) খুলি, খোল (বাদ্যযন্ত্র) প্রভৃতি শব্দের আদিস্থিত খ' কি ঐ সকল দ্রব্যের মৃন্ময়ত্ব সূচনা করিতেছে? কলসীর বায়ুপূর্ণ গর্ভদেশ প্রতিধ্বনিতে খাঁ খাঁ শব্দ করে; খাঁ খাঁ ধ্বনি কি এই জন্য শূন্যতাসূচক? জনশূন্য অট্টালিকার অভ্যন্তরে রুদ্ধ বায়ু প্রতিধ্বনিতে খাঁ খাঁ করে। যাহার ভিতরটা শূন্য, তাহা খাঁকে পরিণত হয়। অঙ্গার লঘু ভস্মে পরিণত হইলে খাঁক হয়। খাঁকি রঙ কি ভস্মের বর্ণ? কুলাঙ্গারকে সেকালের কবিগণ কুলের খাঁকার বিশেষণ দিতেন। খোলের অভ্যন্তর শূন্য বটে; বিছানা বালিশের খোল খুলিতে হয়। কোন কর্ম্মের অভ্যন্তরে উপযুক্ত হেতু না থাকিলে ঐ ফাঁকা কাজটা খামখা হয়। যে খনখন

করিয়া নাকী সুরে কথা কয়, সে খোনা। খঞ্জনীর অনুনাসিকতা তাহার ধাতুময়ত্বের পরিচয় দিতেছে।

খুঁতখুঁতে, খুতমুতে লোক যেন সর্ব্বদাই খুঁতখুঁত করে, কিছুতেই তাহার তৃপ্তি নাই। খুঁত ধরার অর্থ ছল গ্রহণ। খস্ শব্দে খোসা ও খোলস খসিয়া পড়ে। খোস পাঁচড়ার ঘা শুকাইলে উহা হইতে খুসকি উঠে। খসখসে বা খোসকো জিনিসের কর্কশ পিঠ হইতে খোসা উঠে। খিসখিস শব্দ বিরক্তি-সূচক; বিরক্ত লোকের খিস হয়। খসখস শব্দ হইতে বেনা ঘাসের মূলের নাম খসখস।

গ

জ'য়ের যেমন জাঁক, গ'য়ের তেমনই গাম্ভীর্য্য। উভয়েই বর্ণের তৃতীয় বর্ণ কি না!

গোঁ গোঁ, গাঁগাঁ, গন্‌গন্, গমগম প্রভৃতি গুরুগম্ভীর শব্দ। বাঘের ডাক গাঁক্। যন্ত্রণায় নরকণ্ঠ হইতে গোঁগোঁ শব্দ বাহির হইলে গেঙানি, গোঙানি, গোঙরানি হয়। গোঁ ধরার ভাবটাই গাম্ভীর্য্যসূচক। গুম ধরাতেও ঐ ভাব আসে। পিঠে গুমাগুম কিল প্রয়োগের গুরুত্ব স্পষ্ট। গুমট, গুমর, গতর, গুমশুনি প্রভৃতি শব্দ গাম্ভীর্য্য সূচনা করে। মধুকরের গুনগুন (গুঞ্জন) শব্দে ততটা গাম্ভীর্য্য নাই; সে উ-কারের গুণে। কিন্তু মানুষ যখন রাগে গনগন করে, অথবা আগুন যখন গমগম করে, তখন উহার গাম্ভীর্য্যে সন্দেহ থাকে না। দ্বিধা-সূচক গাঁই গুঁই আচরণের গুরুত্ব-প্রকাশক। সন্দেহ জন্মে যে, গুরু, গভীর, গম্ভীর প্রভৃতি খাঁটি সংস্কৃত শব্দের আদিস্থিতি গ-কারও হয়ত ঐ ভাব আনিতেছে। গুনগুন শব্দেই যখন গানের আরম্ভ ও নরকণ্ঠের ধ্বনি যখন জিহ্বামূল স্পর্শে সহজেই গ্যাঁগোঁতে পরিণত হয়, তখন সংস্কৃত গানের মূল গৈ ধাতুর গ-কারও কি ঐ মূল হইতে আসিয়াছে? গ্রীবা, গল, গণ্ড প্রভৃতির আদিস্থিত গ-কারও সন্দেহজনক। গানের গতের গ-কার কি ঐ জন্য? গদগদ বাক্যে স্বরের গাম্ভীর্য্য আছে বটে।

গোঁ-বশতঃ যে গুরু আঘাত, তাহার নাম গুঁতা। গট হইয়া বসিয়া থাকায় একটা কঠিন অথচ গম্ভীর ভাব আছে; যে ঐ ভাবে বসে, সে যেন

আপনার দেহটাকে কাষ্ঠ-প্রতিমার মত কঠিন করে, উহাকে সহজে নোয়ান যায় না ; ঐ কাঠিন্য অবশ্য গ'য়ের পরবর্ত্তী ট' হইতে। গটগট করিয়া চলা যেন কাঠের উপর দিয়া শব্দ করিয়া দম্ভের সহিত চলা। উ-কার যোগে গটগটের ঝাঁক কমিয়া গুটগুট হয়। গুট করিয়া যাহা পতিত হয়, তাহা গুটি ; মোটা গুটি হয় গোটা। গিরগিটি জন্তু গিটগিট করিয়া চলে, না, গিটগিট করিয়া ডাকে ?

গরগর, গুরগুর প্রভৃতি শব্দ কর্কশ ; ঐ কার্কশ্যেও যেন গম্ভীর আওয়াজ আছে। জলের ভিতর দিয়া বায়ু-সঞ্চালনেও ঐ শব্দ হয় ; ধূমপানীয় গড়গড়া ও গুড়গুড়ি ঐ ধ্বনি হইতে নাম পাইয়াছে। ঐরূপ শব্দের সংস্কৃত নাম গর্জ্জন ; মেঘের গরগর, গুরগুর শব্দ মেঘগর্জ্জন। গড়গড় শব্দে গড়াৎ করিয়া গতির নাম কি গড়ান ? গড়গড় শব্দে যাহা হইতে জল পড়ে, তাহাই কি গাড়ু ? গড়গড় শব্দে কর্ণপীড়া দিয়া চলে বলিয়া কি গাড়ী ?

রাগে যেমন গা গনগন করে, তেমনই গশগশ করে, গিশ-গিশ করে। রাগে গশগশ করার নাম কি গোশা করা ? না, উহা ফার্সী শব্দ ?

খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণের শব্দ গপ বা গব ; তাড়াতাড়ি অভদ্র ভাবে খাওয়া গবগব, গবাগব করিয়া গেলা। ছোট ছোট গ্রাস গুবাগুব গেলা যায়।

ল-কার-যোগে অন্যত্র যেমন, এখানেও সেইরূপ তরল ভাব উপস্থিত হয়। গলগল, গিলগিল করিয়া তরল দ্রব্যের ধারা বহে। গলিত হওয়া সংস্কৃত শব্দ, উহার মূলও কি ঐখানে ?

কোমল তালব্য বর্ণ-যোগেও গ-কারের গাম্ভীর্য্য একবারে যায় না। গচি মাছ বোধ হয় তাহার আকৃতির তুলনায় গুরুভার মাছ। গজগজ, গজমজ, গিজগিজ, গিজগাজ, গিজমিজ, ও গুজগাজ, গুজগুজ, গুজুর গুজুর ইত্যাদি শব্দ পরামর্শের গম্ভীরতার পরিচয় দেয়। স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা গোঁজায় পরিণত হয় ; শূন্য স্থানে কোন দ্রব্য গুঁজিয়া দিলে উহার গুরুত্ব বাড়ে ; যাহা গোঁজা যায়, তাহা গোঁজ। ব্রণের উপরে গ্যাজের গুরুত্ব স্পষ্ট। খেজুর-রস গেঁজিয়া

স্ফীতি পায়। পুকুরে মাছ ঐরূপে গেঁজিয়া উঠে। গাঁজার দমে গঞ্জিকাসেবীর গম্ভীরতা বাড়ে নিশ্চয়।

দন্ত্য বর্ণ-যোগে গ-কার কোমলতা পায় বটে, কিন্তু ঐ দন্ত্য বর্ণ ঘোষবান্ দ-কার হইলে কোমলতার সহিত গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। গদ, গদ গদ, গ্যাদ গ্যাদ প্রভৃতি শব্দেই তাহার প্রচুর পরিচয়। গাদের কোমলতা ও গুরুতা উভয়ই স্পষ্ট। গাদা ক্রিয়া সম্বন্ধেও ঐ কথা। গদি কোমল বটে, গুরুভারও বটে। পালের গোদা কিন্তু গৌরবেই গুরু। বানরের পালে মোটাসোটা পুরুষগুলাকেই গেঁদা বলে। গোদা পায়ের গোদ সংস্কৃত গণ্ড হইতে আসিয়াছে, ইহা নিশ্চয় কি?

ঘ

ঘ'য়ের ধ্বনি যে গম্ভীর ও ঘোষবান্, তাহা বলাই বাহুল্য। দৃষ্টান্ত— ভারতচন্দ্রের 'ঘর্ঘর্ঘোর-নাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ'। রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষের কথা মহাকবির উক্তি। সংস্কৃত ঘন, ঘোর, ঘোষ, ঘর্ম্ম, ঘট্ট, ঘরট্ট প্রভৃতি শব্দের আদিতে ঘ-কার কেন? ঘেউ ঘেউ শব্দ খেউ খেউয়ের তুলনায় গম্ভীর। গেঙানির চেয়ে ঘেঙানি গম্ভীর। ঘ্যান ঘ্যান, ঘিনঘিন প্রভৃতিতে একটা গভীর বিরক্তির ও ঘৃণার ভাব আসে। ঘানি গাছের গুরুগম্ভীর শব্দ ঘ্যানর ঘ্যানর। বুনো শূয়োর গম্ভীর ভাবে ঘোঁতঘোঁত শব্দ করিয়া চলে। ঘুঘু পাখী ঘুঘু শব্দে ডাকে। বাঘের প্রতিদ্বন্দ্বী ঘোগের ডাক কিরূপ?

গলার ঘরঘর শব্দ দুর্ব্বল হইয়া ঘুরঘুর শব্দে দাঁড়ায়। ঘটঘট, ঘটমট, ঘুটঘাট, ঘুটঘুট, ঘুটমুট, ঘটর ঘটর, ঘটরমটর ইত্যাদি শব্দে কঠিন দ্রব্যের আঘাত সূচনা করে। চূণের মাটি কঠিন দানা বাঁধিয়া ঘুটিং হয়।

ঘণ্টা ও ঘুন্টি এবং দুই শব্দের মধ্যস্থ ন-কার ধাতুময় যন্ত্রের ধ্বনি স্মরণ করাইতেছে।

ঘুরঘুর ধ্বনির জন্য কি ঘূর্ণন গতির বাঙ্গালা ঘোরা? ঘুরঘুরে পোকা ঘুরঘুর শব্দ করে, না, ঘুরঘুর করিয়া ঘোরে? ঘুরঘুর

বা ঘু রু র ঘু রু র করিয়া ঘোরা এবং সর্ব্বদা কানের কাছে ঘু সু র ঘু সু র করা সমান বিরক্তিজনক। কানের কাছে ঘু সু র ঘু সু র করিয়া অপরের নিন্দাবাদের গ্রাম্য নাম ঘ উ চ র। ঘ ষা ঘ ষ শব্দের সহিত সংস্কৃত ঘ র্ষ ণে র (ঘ ষা র) কোন সম্পর্ক নাই, ইহা মনে করা কঠিন। কঠিন দ্রব্যের গায়ে ঘষার নাম ঘ স টা ন। গা ঘেঁ ষি য়া চলিলে গায়ে গায়ে ঘর্ষণ হয়। ঘাঁ টা আর ঘ ষা বা ঘ স টা প্রায় তুল্যার্থক। তরকারির ঘ ণ্ট কি ঘাঁ টি য়া প্রস্তুত হয়? সিদ্ধি ঘু টি বা র সময় ঘু ট ঘা ট শব্দ হয়। ঘেঁ ট পাকাইবার সময় মানুষে মানুষে কঠিন ঘর্ষণ অসম্ভব নহে। ঘ ষ ঘ ষ ছোট হইয়া ঘু ষ ঘু ষ হয়; ঘু ষ ঘু ষে জ্বর অল্প মাত্রায় জ্বর, যাহা সহজে ছাড়িতে চায় না। ঘ ষ র ঘ ষ র শব্দ বন্ধুর দ্রব্যে ঘর্ষণ বুঝায়। ঘা ঘ রা ও ঘা ঘ রি বসন ঐ নাম পাইল কেন?

খোঁ চা গুরুত্ব পাইয়া ঘোঁ চা হয়। ঘোঁ চা নি আর ঘেঁ তা নি প্রায় তুল্যার্থক।

ঘু প শি বা ঘু প চি বা ঘু র ঘু ট্টি অন্ধকার গভীর অন্ধকার। তরল দ্রব্য গ ল গ ল করিয়া পড়ে; গাঢ় হইলে উহা ঘ ল ঘ ল করিয়া পড়ে। জলে কাদা গুলিয়া উহাকে গাঢ় করিলে জল ঘো লা হয়। দুধের ঘো ল তরল গাঢ় ঘো লা জিনিস। সবল ব্যক্তি জোরে আঘাত পাইলে ঘা ল হইয়া পড়ে।

অন্তঃস্থ বর্ণ ও উষ্ম বর্ণ

য়, র, ল, ব, এই চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণের মধ্যে য় ও ব অনেক বিষয়ে স্বরের লক্ষণযুক্ত; বাঙ্গালায় ঐ দুই বর্ণ শব্দের আদিতে বসিতে চায় না। বাঙ্গালীর বাগিন্দ্রিয় শব্দের আদিতে অন্তঃস্থ য'কে বর্গীয় জ'য়ে এবং অন্তঃস্থ ব'কে বর্গীয় ব'য়ে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। ইংরেজীতেও y ও w এই দুই বর্ণ শব্দের আদিতে বসিলে ব্যঞ্জন বর্ণরূপেই গৃহীত হয়। কাজেই খাঁটি বাঙ্গালায় শব্দের আদিতে ঐ দুই বর্ণের দৃষ্টান্ত মিলিবে না। র ও ল, এই দুই বর্ণ শব্দের আদিতে প্রযুক্ত হয় বটে। র-কারাদি দৃষ্টান্তও বড় বেশী পাওয়া যাইবে না। দূর হইতে ডাকিতে হইলে আমরা রে, অ রে, ও রে বলিয়া ডাকি। র মূর্দ্ধন্য বর্ণ, অতএব উহা কঠোরতা ও কর্কশতা

সূচনা করে। ও রে বলিয়া ডাকা কর্কশ ভাবে ডাকা; দৃষ্টান্ত, ভারতচন্দ্রের 'ও রে রে ও রে দুষ্ট দে রে সতী রে'। রৈ রৈ শব্দ কর্কশ কোলাহল। রি রি শব্দেও ঐ ভাব আছে। রি নি ঝি নি, রুনু ঝুনু প্রভৃতির অনুনাসিক ধ্বনি ধাতুময় অলঙ্কার-শিঞ্জিত মনে আনে; ঐ ন-কার র-কারের কার্কশ্য নষ্ট করিয়া ধ্বনিকে মোলায়েম করে। রগ, রগরগ, রগড়, রগড়ান, রপটান প্রভৃতি কয়টি র-কারাদি কাঠিন্যসূচক শব্দ পাওয়া যায়; বড় বেশী পাওয়া যায় না।

দন্ত্য ল'য়ে কোমল ও চঞ্চল ভাব আনে। দন্ত্য বর্ণের ইহাই স্বভাব, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পুরুষ পুরুষকে ডাকে রে কিংবা ও রে বলিয়া, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোককে ডাকে লো এবং ও লো বলিয়া। বহুকাল হইতে এই রীতি বর্ত্তমান; শকুন্তলার সখীরা শকুন্তলাকে হলা শউন্তলে বলিয়া ডাকিতেন। রুটি কোমলতা পাইয়া কি লুচিতে পরিণত হইয়াছে? লক্‌লক্‌, লিক্‌লিক্‌, লিকলিকে প্রভৃতি শব্দ তরল চাঞ্চল্যের পরিচয় দেয়। সংস্কৃতে যাহাকে লোল জিহ্বা বলে, উহা লেলিহান হইয়া লক্‌লক্‌ করে, তখন উহাতে লালা (সংস্কৃত?) নিঃসৃত হয়। উপাদেয় খাদ্য দেখিলে জিহ্বায় লাল পড়ে, উহার জন্য লালানি হয়। লচপচ তারল্যের ব্যঞ্জক; লোচ্চা অতি তরলপ্রকৃতির মানুষ; সংস্কৃত লম্পট শব্দের বাঙ্গালা উহাই। 'লটপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা' এই বাক্যে মহাদেবের জটাজূটের চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। লটলট, লটাং, লটাস্‌, লটঘট প্রভৃতিও ঐরূপ ভাবের পরিচয় দেয়। লিটপিটে লোকে কাজের শেষ করিতে পারে না; একই কাজে তরল পদার্থের মত আপনাকে জড়াইয়া কাল গৌণ করে বা লিটিরপিটির করে। লড়লড়, লড়বড়, লুরলুর, লপলপ প্রভৃতি এবং লশলশে, লিংলিঙে প্রভৃতি ল-কারাদি শব্দে তারল্য, চাঞ্চল্য ও দৌর্ব্বল্যের ভাব মিশ্রিত হইয়া আছে। লেলে শব্দে কুকুর লেলান হইতে এক জন মানুষের পিছনে অন্য জনকে লেলাইয়া দেওয়া আসিয়াছে।

লাফ (লম্ফ) দেওয়া, লুফিয়া লওয়া, লুকিয়া থাকা, লুটিয়া চলা প্রভৃতির ল'য়ে ঐ ভাবের কোন সম্পর্ক আছে কি না, বিচারের বিষয়। লতার মত ও লূতার মত খাঁটি সংস্কৃত শব্দের ল-কারাদিত্বও

সন্দেহজনক। সংস্কৃতে বা বাঙ্গালায় যেখানে ল'য়ের বাহুল্য, সেইখানেই যেন আলুলায়িত কুন্তল অর্থাৎ এলো চুলের মত লটপট হইয়া এলিয়া পড়ার ভাব আসে। মধুর-রস-লোলুপ বৈষ্ণব কবিরা স্বভাবতই তাঁহাদের কবিতা-মধ্যে কোমল দন্ত্য বর্ণের, বিশেষতঃ ন-কারের আর ল-কারের ছড়াছড়ি করেন; নতুবা আমরা 'ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে,' 'কলিন্দ-নন্দিনী-তটে ননন্দ নন্দ-নন্দনঃ,' 'কালিন্দী-জল-কল্লোল-কোলাহল-কুতূহলী' ইত্যাদি কবিতা পাইতাম না। বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদাবলী-মধ্যেও ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলিবে।

বাঙ্গালায় যুক্তবর্ণ ব্যতিরেকে অন্যত্র উষ্ম বর্ণের ত্রিবিধ উচ্চারণ (শ, ষ, স) বজায় নাই; এই যুক্তবর্ণের অধিকাংশই আবার সংস্কৃত শব্দ বা সংস্কৃতমূলক শব্দ। খাঁটি বাঙ্গালায় ঐ তিন উষ্ম বর্ণের পার্থক্য রাখার বিশেষ হেতু নাই। সেকালের পুঁথিপত্র লেখাতে এক স' তিনের কাজই চালাইত। আমরা যদৃচ্ছাক্রমে স ও শ দু-ই ব্যবহার করিব।

বলা বাহুল্য যে, উষ্ম বর্ণ বিশেষতঃ বায়ুর চলাচল স্মরণ করাইয়া দেয়। বায়ুর সহিত উহার সম্পর্ক অতি নিকট। কণ্ঠনিঃসৃত বায়ু জিহ্বার পাশ কাটাইয়া, জিহ্বা ঘেঁষিয়া বাহির হইলে উষ্ম বর্ণের উচ্চারণ হয়; বর্গীয় বর্ণে যেমন বায়ুর গতি একবারে আটকাইয়া যায়, উষ্ম বর্ণে কণ্ঠাগত বায়ুর গতি তেমন করিয়া কোথাও একবারে রুদ্ধ হয় না। অন্য দ্রব্যের ঘর্ষণে উৎপন্ন বাতাসের শব্দই সাঁসাঁ, সোঁসোঁ, সনসন, সাঁইসাঁই, সর-সর, সুরসুর, সিরসির, সিটসিট, সুটসুট, সুরসার। এই শব্দগুলি ভাষায় গৃহীত হইয়া নানা অর্থ প্রকাশ করে। সাঁ করিয়া চলা দ্রুতগতিতে বায়ুর সঞ্চালন মনে করায়। শ্বাসরোগীর গলা সাঁই সুঁই করে, ঠাণ্ডা লাগিয়া গা সিটসিট করে, চুলকানির পূর্ব্বে গা সুরসুর করে ইত্যাদি। অল্পপ্রাণ ট-বর্ণ-যোগে স' আকস্মিকতা বা দ্রুততার ভাব আনে; যেমন সট ক'রে চলা, সটসট বা সটাসট বেত মারা। সট করিয়া চলা বা পলায়ন অর্থে সট্কান; নাক ঝাড়ার শব্দ হইতে নাক সিটকান। সপ, সপসপ, সপাসপ প্রভৃতি শব্দেও অল্পপ্রাণ প-যোগে এইরূপ অর্থ। শলশলে অর্থে শিথিল; এখানে সেই কোমল ল আসিয়া শ'য়ের পরে বসিয়াছে। সোঁতা, স্যাঁতসেঁতে অর্থে আর্দ্র; এই তারল্য ত-কার হইতে। শুয়া পোকার শুম গায়ে

লাগিলে গা শুম শুম করে ; এখানে অনুনাসিক ধ্বনি তীক্ষতাব্যঞ্জক। শামশুম শব্দ খাঁখাঁ এবং ভাঁ ভোঁ শব্দের মত স্তব্ধতার বা শূন্যতার শান্তিবাচক। সীস দেওয়ার সময় প্রকৃতপক্ষেই সীসী শব্দ হয়।

হ

হ বর্ণটাকে ব্যঞ্জনের মধ্যে না ফেলিয়া মহাপ্রাণ অ-কাররূপে গ্রহণ করা চলিতে পারে। ইংরেজীতে মহাপ্রাণ উচ্চারণ চলিত নাই। ক, গ, প প্রভৃতি অল্পপ্রাণ বর্ণকে খ, ঘ, ফ প্রভৃতি মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত করিতে হইলে ইংরেজী k, g, p প্রভৃতির পরে একটা h অর্থাৎ হ বসাইয়া kh, gh, ph প্রভৃতির রূপে লিখিতে হয়। মহাপ্রাণ বর্ণের বেগবত্তা, বলবত্তা, স্থূলতা, সমস্তই হ-কারাদি শব্দে বিদ্যমান। কণ্ঠস্বর জোরে বাহির হইলে হুঙ্কারে বা হাঁকারে বা হাঁকে পরিণত হয়। যাহার হাঁক ডাক বেশী, তাহাকে লোকে ভয় করে। হাঁকা নামক জীব শিশুজনের পক্ষে ভীষণ। বেদের হিঙ্কারের মায়া কাটাইতে না পারিয়া বৌদ্ধেরা তাঁহাদের মণিপদ্মে হুঁ মন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। হাঁ হুঁ শব্দ কোন বিষয়ে সম্মতি দিবার অতি সংক্ষিপ্ত উপায়। গানের মজলিশে পাখোয়াজের বাজনার সঙ্গে হাঃ হাঃ শব্দের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য শুনা যায়। দূর হইতে কাহাকে ডাকিতে হইলে ওহে, হে বলিয়া ডাকা যায়। হা, আহা, হাঃ, হায়, হুঃ, উহুঃ, অহো, হো প্রভৃতি অব্যয় বিস্ময় খেদ প্রভৃতি প্রকাশের সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপায়। আনন্দের সময় হাঃহাঃ, হিঃহিঃ, হুঃহুঃ প্রভৃতি শব্দ আপনা হইতে কণ্ঠনিঃসৃত হইলে উহাকে হাসি (হাস্য) কহে। শেয়ালের ডাক হুকিহুয়া, হুক্কা হুয়া ও হনুমানের ডাক হুপহাপ, গরুর ডাক হম্বা, উল্লুকের ডাক হুকুহুকু, হুতোম প্যাঁচার ডাক হুঁঃহুঁঃ, বমনের শব্দ হক, খাবার গেলার শব্দ হপ বা হপাহপ ইত্যাদি স্বাভাবিক ধ্বনি মাত্র। রূপকথার রাক্ষসীর ডাক হাঁউমাউ। ঝাউবনের হাউ নিশ্চয় ঐরূপ ডাকিত। হাঁসির মত হাঁচি, হেঁচকি, হিক্কা, হাঁপ, হাঁপানি প্রভৃতি শব্দও স্বাভাবিক ধ্বনির অনুকরণোৎপন্ন। কামারের হাপর হইতে জোরে মুখ ব্যাদান করিয়া বা হাঁ করিয়া হাই তুলিবার সময় কণ্ঠ হইতে বাতাসটা বাহিরে আসে ; কিন্তু কোন কণ্ঠধ্বনি হয় না। নারীকণ্ঠের হুলু

ধ্বনি হইতে ক্রুদ্ধ জনতার হল্লা পর্য্যন্ত অনুকরণোৎপন্ন। জোরে নিশ্বাস পড়িলে হাঁস ফাঁস শব্দ হয় এবং বেগে দৌড়ের পর হাঁই ফাই করিতে হয়। গাড়ীর এঞ্জিন হুসহুস, হসহস, হসমস করিয়া চলে। হনহন করিয়া চলা বেগে চলা। মূর্চ্ছিত ব্যক্তি চেতনালাভ করিলে হুস শব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে; চেতনালাভের নাম হুঁস হওয়া। কামারের হাপড় হস্ হস্ শব্দে বায়ু উদ্গিরণ করে। ক্রন্দনের শব্দ হাপুস; আর স্নানের সময় জলে ডোবার শব্দও হাপুস। হৈ হৈ করিয়া বেড়ান আস্ফালন-সহিত ভ্রমণ; উহার রূপভেদ হৈ চৈ। আকস্মিক হেঁচকা টানে কোন জিনিসকে হেঁচড়িয়া লইয়া যাওয়া হেঁাতকা স্বভাবের কাজ; এই কাজে হ-কারের মহাপ্রাণতার পরিচয় পাই। হুঁকার ভিতরে নিশ্চয় একটা হুঙ্কার ধ্বনি গুপ্ত থাকে; তামাকখোর বলিবেন, উহা নিশ্চয় বেদের হিঙ্কারের অনুরূপ। হাঁচ শব্দে নখ-প্রয়োগে জোরে আঁচড় দেওয়ার নাম হাঁচড়ান। হটমট, হুটমুট, হুটুর মুটুর করিয়া হাঁট। যেন দন্তের সহিত কঠিন ভূপৃষ্ঠ দলিয়া চলা। হলহল করিয়া হেলা বা হালা আন্দোলনের বেগবত্তার পরিচায়ক। হেলে বা হলহলে সাপ হেলিয়া চলে। বস্তুর ভূপৃষ্ঠের উপর টানিলে হরহর, হরমর, হরবর, হুরমুর ইত্যাদি কর্কশ ধ্বনি হয়। অস্থির বাঙ্গালা নাম হাড় কি উহার কাঠিন্যজ্ঞাপক? হাড়ী জাতি কি এককালে হাড়ের ব্যবসায় করিত? হঠা, হেঁটকা, হুরকো, হেরফের, হিমশিম, হুটোহুটি, হুটোচুটি, হপহপ, হপাহপ, হুড়ুম হাড়ুম, হুড়ুমধুম, হনহন, হানাহানি, হুমরো চুমরো, হুনুরি, হলকা, হালকা, হিজিবিজি, হাবলা, হাবুডুবু, হাঁটু, হেঁট, হামার, হামরাই, হুমকি, হাঙ্গামা, হুজ্জত, হুজুগ, হুবহু, হুবাহুব, হোঁচট, হাঁদা, হস্তিকাল প্রভৃতি অগণ্য হ-কারাদি শব্দ মহাপ্রাণ হ-বর্ণের বলবত্তা, বেগবত্তা ও স্থূলতা বহন করিতেছে। শিশুরা হুটু হুটু হুটুরি বলিয়া এক পায়ে নাচে আর লাফায়; বালকেরা হাডুডুডু শব্দে খেলা করে।

বাঙ্গালা ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনা এইখানে শেষ করিলাম। বলা বাহুল্য যে, এই আলোচনায় প্রচুর পরিমাণে অনুমান ও কল্পনার সাহায্য

লইতে হইয়াছে। বহু স্থলে হয়ত কষ্টকল্পনারও অভাব হয় নাই। ভাষাবিজ্ঞানশাস্ত্রে এইরূপ কল্পনার আশ্রয় না লইলে উপায় নাই। বড় বড় ভাষাতাত্ত্বিকেরাও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়া কল্পনাকে উধাও ভাবে উড়িতে ও খেলিতে দিয়া থাকেন। এ দেশের প্রাচীন শাব্দিক পণ্ডিতই বল, আর পশ্চিমদেশের আধুনিক শাব্দিকই বল, কল্পনার সাহায্য বিনা কাহারও এ ক্ষেত্রে চলিবার উপায় নাই। কাজেই পণ্ডিতে পণ্ডিতে সদাই দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। সংস্কৃত দু হি তা শব্দ স্পষ্টতঃ দোহনার্থক দুহ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন; যে দো হ ন করে, সেই দুহিতা। আমাদের ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বলিবেন, কন্যা পিতার ধনসম্পত্তি দোহন করেন, সেই জন্য তিনি দুহিতা। পাশ্চাত্য শাব্দিক বলিবেন, ঐ শব্দটি যখন ইংরেজীতেও daughterরূপে বিদ্যমান দেখিতেছি, তখন উহা প্রাচীন আর্য্যজাতির ভাষাতেও ছিল; নিশ্চয় সেকালে কন্যার উপর গো-দোহনের ভার অর্পিত ছিল; যিনি সেকালে গাভী দোহন করিতেন, তিনিই দুহিতা। বলা বাহুল্য, উভয় স্থলেই দুহিতা শব্দের তাৎপর্য্য নিরূপণে কল্পনার খেলা চলিয়াছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। সংস্কৃত ত্রি শব্দ, বাঙ্গালায় যাহা তিন, ইংরেজীতে উহা three, লাটিনে উহা tri; বলা বাহুল্য, উহা প্রাচীন আর্য্যভাষায় বর্ত্তমান ছিল। শাব্দিক পণ্ডিত সেইস লিখিয়াছেন, লাটিন trans, ইংরেজী through, সংস্কৃত তরণ, তরণি প্রভৃতি শব্দের সহিত উহার সম্পর্ক আছে। সংস্কৃত তৃ ধাতু ঐ সকল শব্দের মূলে বিদ্যমান। সংস্কৃত তৃ ধাতুর অর্থ পার হওয়া, অর্থাৎ উ ত্তী র্ণ হওয়া। পণ্ডিত মহাশয় বলেন, অতি প্রাচীন কালে আর্য্যেরা এক ও দুই, ইহার উপরে গণিতে পারিতেন না; তাঁহাদের গণনার শক্তি ঐ সীমায় আবদ্ধ ছিল; ঐ সীমা যে দিন উত্তীর্ণ হইলেন ও তিন গণিতে পারিলেন, সেই দিন বলিলেন, "এই পার হইলাম," অর্থাৎ দুই সংখ্যা পার হইয়া তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যায় আসিলাম। এইরূপে তৃ ধাতু হইতে ত্রি অর্থাৎ তিন শব্দের সৃষ্টি হইল। তিনের পর চারি; সংস্কৃত চ ত্বা রি = চ + ত্রি; চ শব্দের সংস্কৃতে অর্থ "আরও" অর্থাৎ আর একটা; চত্বারি অর্থে তিনের উপর আর একটা।

এই সকল দৃষ্টান্তে পণ্ডিতদের কল্পনা কষ্টকল্পনা হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে নানা জনের নানা মত হইবে। ফলে ভাষাবিজ্ঞানশাস্ত্রে এইরূপ কল্পনা ও কষ্টকল্পনার আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধেও

যে কল্পনার সাহায্য লইয়া অনেক শব্দের তাৎপর্য্য জোরপূর্ব্বক আনা হয় নাই, তাহা বলিতে পারিব না। তবে এই কল্পনার খেলার মধ্যেও কিছু-না-কিছু সত্যের ভিত্তি থাকিতে পারে, এই ভরসায় এই প্রসঙ্গের উত্থাপনে সাহসী হইয়াছি। বহু স্থলে আমার অজ্ঞতা ও অনবধানহেতু সংস্কৃত, আর্বী ও ফার্সী প্রভৃতি মূল হইতে উৎপন্ন শব্দকে ধ্বনিমূলক দেশজ শব্দ বলিয়া হয়ত গ্রহণ করিয়াছি ; এরূপ ভ্রমপ্রমাদ এই প্রবন্ধমধ্যে বহুসংখ্যায় আবিষ্কৃত হইলেও বিস্মিত হইব না।

পরিশেষে একটি কথা বলা আবশ্যক। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের বানানে এখনও কোন বাঁধা নিয়ম নাই। মনস্বী অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার শব্দকোষে সম্প্রতি নিয়ম বাঁধার চেষ্টা করিয়াছেন ; এই বোধ করি প্রথম চেষ্টা। আমি এই প্রবন্ধে বানানের সামঞ্জস্য রাখিতে পারি নাই। অধিকাংশ শব্দের উচ্চারণ প্রদেশভেদে ভিন্ন ; আমি উত্তর-রাঢ়ের অধিবাসী ; আমার বানানে, বিশেষতঃ র' ও ড়' এই দুই বর্ণের প্রয়োগে, উত্তর-রাঢ়ের বিশিষ্ট উচ্চারণ—রেঢ়ো উচ্চারণ, হয়ত বহু স্থলে আসিয়া পড়িয়াছে। পাঠক মহাশয় দয়া করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

কারক-প্রকরণ

বাঙ্গালা ব্যাকরণের কারক-প্রকরণে নানা গণ্ডগোল আছে। সাধারণতঃ ইংরেজী ও সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি একত্র মিশাইয়া যে কারক-প্রকরণ রচিত হয়, তাহা অযুক্ত ও অসঙ্গত। বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি নির্দ্ধারণ করিয়া কারক-প্রকরণের সংস্কার আবশ্যক।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র অষ্টম ভাগের প্রথম সংখ্যায় দেখাইয়াছিলেন যে, ইংরেজী case ও সংস্কৃত কারকের তাৎপর্য্য সমান নহে। ইংরেজী ব্যাকরণের case অর্থে বিশেষ্য পদের অবস্থা ; সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক ক্রিয়ার সহিত অন্বিত বা সম্বন্ধযুক্ত। ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় নাই, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের হিসাবে কারক-লক্ষণযুক্ত হইতে পারে না। যেমন, "ভীমো গদাঘাতেন দুর্য্যোধনস্য উরূ বভঞ্জ"—এ স্থলে ভাঙ্গা ক্রিয়ার কর্ত্তা ভীম, কর্ম্ম উরু, আর করণ গদাঘাত ; তিনেরই সহিত ক্রিয়ার অন্বয় আছে। দুর্য্যোধনের উরুর সহিত সেই ভাঙ্গা ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে, কিন্তু দুর্য্যোধনের সহিত সে ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই : দুর্য্যোধনের সহিত সম্পর্ক তাঁহার উরুর। কাজেই দুর্য্যোধন খোঁড়া হইলেন বটে, কিন্তু বৈয়াকরণের নিকট তিনি কারকত্ব পাইলেন না, তিনি সম্বন্ধে ষষ্ঠী-বিভক্তিযুক্ত হইয়াই পড়িয়া থাকিলেন। কিন্তু ঐ বাক্যের ইংরেজী অনুবাদে ভীমের nominative, উরুর objective ও দুর্য্যোধনের হইবে possessive case, কেন না, উরু দুইটা তাঁহারই সম্পত্তি। আবার ঐ বাক্যটিকে বাচ্যান্তরিত করিয়া কর্ম্মবাচ্যে লইয়া গেলে ভীম প্রথমা বিভক্তি ত্যাগ করিয়া তৃতীয়া বিভক্তি গ্রহণ করেন, কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে তাহাতে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব যায় না। আর দুর্য্যোধনের উরু দ্বিতীয়া বিভক্তি ত্যাগ করিয়া প্রথমান্ত হইয়া পড়িলেও কর্ম্মকারকই থাকে। ইংরেজীতে কিন্তু অন্যরূপ ; Bhim broke his legs, এখানে দুর্য্যোধনের পাদদ্বয়ের দশা objective ; কিন্তু his legs were broken by Bhim, এইরূপ ঘুরাইয়া বলিবা মাত্র তাঁহার পা দুখানা একেবারে nominativeএর দশায় পড়ে। বুঝা গেল, সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক অর্থগত, কিন্তু ইংরেজীর case বাক্যমধ্যে স্থানগত ও অবস্থাগত।

সংস্কৃতে বিভক্তির সংখ্যা সাতটি, তন্মধ্যে ছয়টি কারকে ছয়টি বিভক্তি নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছে, আর সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ষষ্ঠী বিভক্তিটি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ইংরেজীতে এতগুলি বিভক্তি নাই। কর্ত্তার বিভক্তি-চিহ্ন নাই; কর্ম্মের বিভক্তি-চিহ্ন আছে, কেবল সর্ব্বনামে মাত্র; বিশেষ্য পদ কর্ম্মে বিভক্তি গ্রহণ করে না; উহার বাক্য-মধ্যে অবস্থান দেখিয়া কর্ম্মত্ব নিরূপণ করিতে হয়। এক possessive caseএর বিভক্তি-চিহ্ন রহিয়াছে। কারণ, অপাদান, অধিকরণ ইত্যাদি স্থলে পদের পূর্ব্বে preposition বসে এবং বলা হয় পদগুলি in the objective case governed by this preposition. ইংরেজীতে যাহার objective case, তাহা কোন স্থানে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত, কোথাও বা prepositionএর সহিত অন্বিত। এই preposition গুলা অব্যয় পদ; অন্বিত পদের পূর্ব্বে বসে বলিয়া নাম preposition. এখানে objective case বলায় দোষ নাই; কেন না, ইংরেজী caseএর সহিত ক্রিয়ার কোন অন্বয় থাকা আবশ্যক নহে।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের কারকের সংজ্ঞা সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে; ইংরেজী হইতে লইলে চলিবে না; এ বিষয়ে মতভেদ হইবে না। কিন্তু এই বিভক্তির ব্যাপারে বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের মিল নাই, বরং ইংরেজীর মিল আছে। সংস্কৃতে সাত বিভক্তি, বাঙ্গালায় অতগুলা বিভক্তি নাই; গোটা তুই চারি আছে। বাঙ্গালা-কারক সেই কয়টা বিভক্তির সাহায্য লয়। অন্যত্র ইংরেজীতে preposition দ্বারা যে কাজ হয়, বাঙ্গালাতে postposition দ্বারা সেই কাজ চলে। বাঙ্গালার বিভক্তি-গুলির একটু আলোচনা আবশ্যক।

(১) কর্ত্তায় বিভক্তির চিহ্ন প্রায় থাকে না,—যথা—জ ল পড়িতেছে, ফ ল পাকিয়াছে, মে ঘ ডাকিতেছে। স্থলবিশেষে কর্ত্তায় বিভক্তি-চিহ্ন এ', যথা—সা পে কাটে, বা ঘে খায়, 'চল শীঘ্র তুই জ নে কন্যা লঞা যাব,' 'তাঁহার মহিমা কিছু লো কে না জানিল'। ঐ এ' চিহ্নের বিকৃতি য়'—যথা, দু জ নে যাব, অথবা দু জ না য় যাব। এ'র পরিবর্ত্তে তে'-ও প্রচলিত,—যথা, দু জ না তে যাব।

(২) কর্ম্মকারকে বহু স্থলে বিভক্তি-চিহ্ন থাকে না; যথা—ভা ত খাও, গা ছ কাট, আ ম পাড়। স্থলবিশেষে বিভক্তি-চিহ্ন কে' যথা—রা ম কে ডাক, য দু কে বল। পদ্যে কে'র স্থলে রে' বা এ রে'

প্রয়োগ দেখা যায়—রামেরে ডাক, 'ব্রাহ্মণীরে দ্বিজবর কহিতে লাগিল'। 'পুত্রে ডাকি বলে,' এ স্থলে কর্ম্মে বিভক্তি এ'। সর্ব্বনামে তোমাকে, আমাকে স্থলে তোমায়, আমায় দেখা যায়। যথা, তোমায় বল, আমায় দেখ। এই য়'কে এ'র বিকার বলা যাইতে পারে।

(৩) করণে বিভক্তি-চিহ্ন এ' এবং তে' যথা—কানে শোন, চোখে দেখ, দায়ে কাট, 'উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে'। দ্বারা, দিয়া প্রভৃতিকে বিভক্তি বলিতে আমি প্রস্তুত নহি।

(৪) বাঙ্গালায় সম্প্রদান কর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রচুর বিতণ্ডা জন্মাইবার হেতু হইয়াছে। সম্প্রদানের কোন স্বতন্ত্র বিভক্তি-চিহ্ন নাই ; কর্ম্মের সহিত অভেদ—যথা, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও, 'কন্যা হইলে দাসী করি দিব যে তোমায় (=তোমাকে)'।

(৫) অপাদান কারক বিভক্তি-চিহ্ন লইতে চায় না ; postposition বা পরবর্ত্তী অব্যয় পদ দ্বারা কাজ চালায়—ঘোড়া হইতে পড়িয়াছে, বাঘ হইতে ভয় পায়, হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিতেছে। এই হইতে postpositionএর মূল যাহাই হউক, উহা সম্প্রতি বাঙ্গালায় অব্যয়ের কাজ করে। উহাকে বিভক্তি বলিয়া গণ্য করিলে নিতান্ত অবিচার হইবে। ফলে ঘোড়া, বাঘ এবং হিমালয়ের যখন ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বয় নাই, তখন লাঠি তুলিলেও উহাদিগকে অপাদান-কারক বলিতে পারিব না।

(৬) সম্বন্ধের চিহ্ন র', এর', কার'; যথা—আমার বাড়ী, তোমার নাক, রামের বহি, আপনকার অনুগ্রহ। পদ্যে আজিও আমাকার, তোমাকার, সবাকার প্রচলিত আছে।

(৭) অধিকরণের বিভক্তি এ', তে', যথা—ঘরে থাকে, আসনে বসে, তিলে তেল আছে, বিছানাতে শোও। এ' রূপান্তরিত হইয়া য়' আকার গ্রহণ করে, যেমন—বিছানায় শোও।

ফলে বাঙ্গালায় বিভক্তি-চিহ্ন অতি অল্প ; আবার একই বিভক্তি একাধিক কারককে দখল করিয়াছে। নিম্নের দৃষ্টান্তে ইহা স্পষ্ট হইবে ; যথা—

অধিকরণে—মাছ জলে থাকে, রাম নৌকাতে আছেন, অথবা রাম নৌকায় আছেন।

করণে—কাপড়ে ঢাক, লাঠিতে মার, দড়ায় তোল।

কর্ত্তায়—তুজনে যাব, তুজনাতে যাব, তুজনায় যাব।

কর্ম্মে—'জগন্নাথে প্রণমিল অষ্টাঙ্গ লোটিয়া'।

সম্প্রদানে—'জগন্নাথে দিব কন্যা হয়ে হৃষ্টমন'।

দ্বারা, দিয়া, হইতে, থাকিয়া, চেয়ে, চাইতে প্রভৃতি পদগুলিকে বিভক্তি-চিহ্ন মনে করা চলিতে পারে না, তাহা অন্য কারণেও বুঝা যায়। আমা দ্বারা এ কাজ হইবে না, এই বাক্যে আমা দ্বারা স্থলে আমার দ্বারা, আমাকে দিয়া, যথেচ্ছাক্রমে ব্যবহৃত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, আমার ও আমাকে বিভক্ত্যন্ত পদ; দ্বারা এবং দিয়া বিভক্তি-চিহ্ন হইলে একটা শব্দের উপর তুটা বিভক্তির যোগ হইয়া পড়ে। ইহা অনুচিত। তদ্রূপ অন্য উদাহরণ—রাম চেয়ে শ্যাম ছোট, অথবা রামের চেয়ে শ্যাম ছোট; লাঠি দিয়া মার, অথবা লাঠিতে করিয়া মার; হাতে ক'রে লও; 'কড়ি দিয়ে কিন্‌লেম, দড়ি দিয়ে বাঁধলেম', তাঁহার লেগে মন কি কর্‌ছে; আমার পানে চাও, 'চাহিলা দূতী স্বর্ণলঙ্কা পানে'; তিনি নইলে চলিবে না, অথবা তাঁহাকে নইলে চলিবে না। এই সকল বাক্যে postpositionগুলির পূর্ব্ববর্ত্তী পদের উত্তর বিভক্তি-চিহ্ন কোথাও রহিয়াছে, কোথাও বা লুপ্ত হইয়াছে। বিভক্তি-চিহ্ন কোথায় থাকিবে বা থাকিবে না, তাহার সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। হইতে পারে, বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন অবস্থায় সর্ব্বত্রই বিভক্তি বসিত; এখন উচ্চারণে শ্রমসংক্ষেপের অনুরোধে বিভক্তি-চিহ্নগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে। কালে সমস্তই লোপ পাইতে পারে; এমন কি, এমন সময় আসিতে পারে, যখন postpositionগুলি, যাহা এখন স্বতন্ত্র পদ, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আরও সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করিয়া বিভক্তি-চিহ্নে পরিণত হইবে। কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা। বর্ত্তমানে উহাদিগকে বিভক্তি-চিহ্ন বলিয়া গণনা করা চলিবে না; উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলিতেও কারকত্ব অর্পণ করা চলিবে না।

লোকমুখে প্রচলিত আধুনিক ভাষাগুলির বিভক্তি-চিহ্ন ত্যাগ করাই স্বভাব। গ্রীকে লাটিনে dative, accusative, ablative প্রভৃতি নানা কারক ও তদনুযায়ী নানা বিভক্তি-চিহ্নের কথা শুনা যায়। ইংরেজী সে

সকল চিহ্ন ত্যাগ করিয়াছে। সেইরূপ সংস্কৃতে যত বিভক্তি-চিহ্ন ছিল, বাঙ্গালায় তাহা নাই।

বাঙ্গালায় দ্বিবচনের চিহ্ন একবারে উঠিয়া গিয়াছে। বহুবচনের বেলায় নিতান্ত কষ্টে কাজ সারিতে হয়। কর্ত্তাকারকে বহুবচনের এক মাত্র বিভক্তি রা'—পশু—পশুরা, মানুষ—মানুষেরা। কিন্তু বহু স্থলে গণ, গুলা, সব, সকল প্রভৃতি স্বতন্ত্র পদ যোগ করিয়া বহুবচনের বিভক্তির কাজ চালাইতে হয়। কোন কোন বাঙ্গালা ব্যাকরণে ঐ সকল শব্দকেও বিভক্তি-চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু ইহা নিতান্ত অত্যাচার। প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতেছি—'অজয়কিনারে সভে বৈষ্ণবের গণে,' 'জয়দেব ঠাকুর সঙ্গে বৈষ্ণবের গণ';—অতএব গণ পৃথক্ শব্দ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কর্ত্তা কারক ভিন্ন অন্যত্র বহুবচন নির্দ্দেশের আর একটি কৌশল আছে। যথা, বৈষ্ণবদিকে=বৈষ্ণবদিগকে, বৈষ্ণবদের=বৈষ্ণবদিগের। কেহ কেহ বলেন, বৈষ্ণবদের= বৈষ্ণবাদির; বৈষ্ণবদিগের=বৈষ্ণবাদিকর। এককালে আদি শব্দ-যোগে বহুবচন নির্দ্দেশ হইত, স্বার্থে ক' যোগ করিয়া উহা আদিক, এই রূপ গ্রহণ করিত। বর্ত্তমান রূপ ঐ প্রাচীন রূপের বিকৃতিমাত্র। কেহ বা বলেন, দিগ বৈদেশিক দিগর হইতে আসিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষায়, আমার দিগের, মানুষের দিগকে, এইরূপ প্রয়োগ ছিল; উহাতে দিগ চিহ্নটি এককালে স্বতন্ত্র পদ ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক।

এখন মোটামুটি এই কয়টি নিয়ম দাঁড়াইল।—(১) কর্ত্তায় সাধারণতঃ বিভক্তি-চিহ্ন থাকে না। স্থান-বিশেষে বিভক্তি-চিহ্ন এ', য়, তে।

(২) কর্ম্মের বিভক্তি-চিহ্ন কোথাও কে', কোথাও বা রে'; কোথাও বা বিভক্তি-চিহ্ন থাকে না। স্থান-বিশেষে চিহ্ন এ', য়।

(৩) সম্বন্ধ বুঝাইবার চিহ্ন র', এর।

(৪) অপাদানের বিভক্তি-চিহ্ন নাই।

(৫) সম্প্রদানের চিহ্ন কর্ম্ম হইতে অভিন্ন।

(৬) করণ ও অধিকরণের চিহ্ন এ', য়' এবং তে'; কিন্তু ঐ কয়টি চিহ্ন করণ এবং অধিকরণের নিজস্ব নহে, অন্য কারকেও উহাদের প্রয়োগ হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, বাঙ্গালার যখন প্রয়োগরীতি এইরূপ, তখন ব্যাকরণে এতগুলা কারকের কল্পনার দরকার কি ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে একবার সম্প্রদানকারক-ঘটিত বিতণ্ডাটা তোলা আবশ্যক। (সংস্কৃতে কারক অর্থগত। যে কর্ত্তা, সে কর্ত্তাই থাকিবে; 'রামো বনং জগাম' এ স্থলে প্রথমান্ত রাম্ কর্ত্তা; 'রামেণ বনং গতম্' এ স্থলে তৃতীয়ান্ত রাম ও কর্ত্তা। সংস্কৃতে বিভক্তি-চিহ্ন দেখিয়া কারক নির্ণয় হয় না।) আবার 'নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্'—অগ্নি কাষ্ঠে তৃপ্ত হন না—এ স্থলে কাষ্ঠ তৃপ্ত্যর্থ ধাতুর যোগে ষষ্ঠ্যন্ত হইলেও করণ-কারক। 'দ্বির্দিবসস্য ভুঙ্্ক্তে'—দিনে দুই বার খায়—এ স্থলে দিবস ষষ্ঠ্যন্ত হইলেও অধিকরণ। (কাজেই সংস্কৃত ব্যাকরণে বিভক্তি দেখিয়া কারকের নিরূপণ হয় না, অর্থ দেখিয়া কারক নিরূপিত হয়। 'দরিদ্রকে ধন দাও'—এই বাক্যে দরিদ্রের বিভক্তি কর্ম্মের বিভক্তির সহিত অভিন্ন হইলেও দরিদ্র যখন দানপাত্র, তখন সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিতে চলিলে তাহার সম্প্রদানত্ব যাইবে কিরূপে ? ক্রিয়ার সাধক যদি বিভক্তি-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই করণ হয়, দানক্রিয়ার পাত্র তখন সর্ব্বত্র সম্প্রদানই হইবে।)

'কাজেই এক পক্ষের বক্তব্য, সংস্কৃত ব্যাকরণের পন্থা অবলম্বন করিতে হইলে সম্প্রদানকে কর্ম্মের বিভক্তিযুক্ত দেখিলেও কর্ম্ম বলা চলিবে না। কেন না, বিভক্তি দেখিয়া কারক স্থির করিতে হইলে 'সাপে কাটে, বাঘে খায়' এ সকল স্থলে সাপকে ও বাঘকে কর্ত্তা না বলিয়া অধিকরণ বা ঐরূপ কিছু একটা বলিতে হয়।'

এই পক্ষের উত্তরে এইরূপ বলা চলিতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণে সাধারণ বিধি অনুসারে দানপাত্রের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট বিভক্তি রহিয়াছে—চতুর্থী বিভক্তি। সাধারণতঃ কর্ম্মে দ্বিতীয়া ও সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। এই নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়াই কর্ম্ম হইতে ভিন্ন একটা সম্প্রদান-কারক বৈয়াকরণেরা খাড়া করিয়াছেন। নতুবা কেবল দানক্রিয়ার পাত্র বলিয়াই উহাকে একটা স্বতন্ত্র কারক বলা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাহা হইলে ভোজনক্রিয়ার পাত্রকে সম্ভোজন কারক, তাড়ন-ক্রিয়ার পাত্রকে সন্তাড়ন কারক, এইরূপে ক্রিয়া মাত্রেরই জন্য এক-একটা বিশিষ্ট কারক স্থির করিতে হইত। ফলে সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে ক্রিয়া যাহাকে আক্রমণ করিয়া রহে, তাহার নাম কর্ম্ম; উহার নির্দ্দিষ্ট বিভক্তি

দ্বিতীয়া ; ক্রিয়া মাত্রের পক্ষেই এই বিধি। কেবল দানক্রিয়ার বেলায় ভিন্ন বিভক্তি চলিত থাকায় উহার জন্য একটা স্বতন্ত্র কারক কল্পনা হইয়াছে মাত্র। নতুবা দানক্রিয়া পরম পুণ্য হইলেও বৈয়াকরণের নিকট উহাকে অন্যান্য ক্রিয়া হইতে স্বাতন্ত্র্য দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাঙ্গালায় যখন দানক্রিয়ার পাত্রের জন্য কোন স্বতন্ত্র লক্ষণ নাই, তখন উহাকে অন্যান্য ক্রিয়ার সমতুল্য মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। সেই জন্য দানক্রিয়া যে ব্যক্তিকে সবেগে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাকে দানক্রিয়ার সম্প্রদান না বলিয়া, কর্ম্ম বলিলে এমন ক্ষতি কি হইবে?

এই যুক্তিতে যাঁহারা সন্তুষ্ট না হইবেন, তাঁহাদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণেরই দোহাই দিয়া অন্য একটা যুক্তি দেখান যাইতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণের কারকগুলি যে কেবল অর্থ দেখিয়াই সর্ব্বত্র স্থির হয়, এমন নহে। একটু জোর করিয়া নানা অর্থে একই কারক ঘটান হয়। যেমন অপাদানের মূল অর্থ, যাহা হইতে বিশ্লেষণ ঘটে বা সরান যায়। যেমন, অশ্বাৎ পতিতঃ, গৃহাৎ প্রস্থিতঃ, জলাৎ উত্থিতঃ, এই সকল উদাহরণে অশ্ব, গৃহ, জল স্পষ্টতঃ অপাদান। কিন্তু তদ্ব্যতীত, যাহা হইতে লোকে ভয় পায়, যাহা উৎপত্তির হেতু, যাহা হইতে বিরাম হয়, যাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়, তাহারা সকলেই অপাদান ; তাহাদের সাধারণ লক্ষণ পঞ্চমী বিভক্তি।

পুনশ্চ দেখ। ভৃত্যায় ক্রুধ্যতি, শত্রবে দ্রুহ্যতি, এই সকল স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণ ভৃত্যকে ও শত্রুকে সম্প্রদানের কোঠায় ফেলিয়াছেন। এই দুই দৃষ্টান্তে ভৃত্যকে ও শত্রুকে কিছুতেই দানের পাত্র বলা যাইতে পারে না ; তবে প্রহার-দানটা যদি দান হয়, তাহা হইলে উহারা সম্প্রদান বটে। অথচ সংস্কৃত ব্যাকরণ তাহাদের জন্য পৃথক্ বিধি করিয়াছেন 'ক্রোধদ্রোহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং তদুদ্দেশ্যঃ সম্প্রদানম্।' যিনি দানের পাত্র বলিয়া সম্প্রদান, তিনি সৌভাগ্যশালী জীব ; কিন্তু এই হতভাগ্য ক্রোধের পাত্র ও দ্রোহের পাত্র ব্যক্তিরাও সম্প্রদান-শ্রেণীতে পড়িলেন কিরূপে? তাঁহারা দৈবক্রমে চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন আর কোন হেতু দেখি না। এইরূপ 'মোদকং শিশবে রোচতে,' 'তত্তদ্ ভূমিপতিঃ পত্নৈ্য দর্শয়ন্', ইত্যাদি স্থলেও কেবল চতুর্থী বিভক্তির খাতিরেই শিশুর ও পত্নীর সম্প্রদান সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি যে,

সংস্কৃত ব্যাকরণে অর্থ দেখিয়াই কারক স্থির হয়, বিভক্তি দেখিয়া হয় না। কিন্তু এখানে দেখিতেছি উলটা ; এখানে বিভক্তির খাতিরেই কারকের সংজ্ঞা স্থির হইয়াছে। ক্রোধের পাত্র, দ্রোহের পাত্র প্রভৃতিও যদি বিভক্তির খাতিরে সম্প্রদানের কোঠায় স্থান পায়, তবে বাঙ্গালা ভাষায় দানের পাত্রকে কর্ম্মসংজ্ঞা দিয়া বিভক্তির খাতিরে কর্ম্মকারকের কোঠায় ফেলিলে এমন কি অপরাধ হইবে ?

আবার সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্যরূপ কায়দাও আছে। ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হয়, এই অর্থে 'ধ র্ম্ম মভিনিবিশতে' এই বাক্যে ধ র্ম্ম পদের উপসর্গ সহিত ধাতু-যোগে কর্ম্মসংজ্ঞা হইল। উপসর্গপূর্ব্বক ক্রুধ্ ধাতু ও দ্রুহ্ ধাতুর সম্প্রদান কর্ম্ম হইয়া যায় ; শত্রবে দ্রুহ্যতি, কিন্তু শ ত্রু মভিদ্রুহ্যতি। ক্রীড়ার্থক দিব্ ধাতুর করণ কারক বিকল্পে কর্ম্মসংজ্ঞা পায়। যেমন অ ক্ষা ন্ দীব্যতি, অ ক্ষৈ দীব্যতি। কর্ম্মসংজ্ঞা কেন পায় ? কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তির খাতিরে। যদি বিভক্তি-চিহ্নের খাতিরে করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ প্রভৃতি সকল কারকেই কর্ম্মসংজ্ঞা পাইতে পারে, তবে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণে দানক্রিয়ার সম্প্রদানকে কর্ম্মসংজ্ঞা দিলে এমন কি অপরাধ হইবে ?

ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতেরা এই তর্কে নীরব হইবেন কি না জানি না, কিন্তু এবং মাত্র দানক্রিয়ার জন্য বাঙ্গালায় একটা পৃথক্ কারক খাড়া করা উচিত কি না, পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

সম্প্রদানকে যদি বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে তুলিয়া দিতে হয়, অপাদানকে তুলিতেই হইবে। অপাদানের জন্য কোন বিভক্তি-চিহ্নই নাই। হ ই তে, থে কে প্রভৃতি অব্যয়গুলি বিভক্তির কাজ চালায় মাত্র। আমি দ্বা রা, দি য়া প্রভৃতি পদকে করণ-কারকের বিভক্তি-চিহ্ন বলিতে সম্মত নহি ; হ ই তে, থে কে প্রভৃতিকেও অপাদানের বিভক্তি বলিতে চাহিব না। উহারা স্বতন্ত্র আস্ত গোটা পদ ; দ্বা রা পদটি সংস্কৃত হইতে অবিকল আসিয়াছে ; অন্যগুলা হয়ত অসমাপিকা ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উহারা এখন মূল অর্থ পরিহার করিয়া সঙ্কীর্ণ অর্থে কেবল অব্যয় পদে দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজীতে preposition যেমন objective caseএর পূর্ব্বে বসিয়া উহাকে govern করে বা শাসন করে, ইহারা সেইরূপ বাঙ্গালা পদের পরে বসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পদকে শাসন করে বা পদের সহিত অন্বিত হয় হি মা ল য় হ ই তে গঙ্গা আসিয়াছেন, এ স্থলে গ ঙ্গা কর্ত্তা-কারক ; কেন

না, ক্রিয়ার সহিত গঙ্গার অন্বয় আছে। কিন্তু হিমালয়ের সহিত কোন ক্রিয়ার অন্বয় নাই; হিমালয় পদের সহিত সম্পর্ক হইতে পদের; কাজেই হিমালয় ইংরেজী হিসাবে in the objective case governed by the *postpostion* হইতে; কিন্তু সংস্কৃত হিসাবে উহা কারক নহে। কারক নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলেই বুঝা যাইবে যে, ক্রিয়ার সহিত উহার অব্যবহিত সম্পর্ক থাকা আবশ্যক; নতুবা কারক নামের সার্থকতা থাকিবে না। যেখানে মাঝে একটা অব্যয় পদ বা অন্য কোন পদ থাকিয়া ক্রিয়ার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, সেখানে কারক নাম প্রযোজ্য হইতে পারে না। হিমালয় হইতে, এখানে হিমালয়কে যদি কারক বলিতে হয়, তাহা হইলে 'রাম সীতা সহিত বনে গিয়াছিলেন,' এই বাক্যে সীতাও কারক হইয়া বসেন।

সে যাহা হউক, বাঙ্গালায় সম্প্রদান কর্ম্মের সহিত অভিন্ন ও অপাদানের অস্তিত্বই নাই। এই দুইটিকে উঠাইতেই হইবে। থাকে করণ আর অধিকরণ; উভয়েরই একই বিভক্তি-চিহ্ন এ' এবং তে'। আকারান্ত শব্দের পর এ' বিকৃত হইয়া য়' হয় মাত্র; যথা নৌকায়, বিছানায়। প্রাচীন পুঁথিতে নৌকাএ, বিছানাএ, এইরূপ বানান দেখা যায়।

করণ ও অধিকরণ উভয় স্থলেই বিভক্তি এক; তবে অর্থ দেখিয়া কোন্‌টা করণ, আর কোন্‌টা অধিকরণ, বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। 'হাতে গড়া' এ স্থলে হাত করণ, আর হাতে রাখা' এ স্থলে হাত অধিকরণ। কিন্তু সর্ব্বত্র এইরূপ বিচার চলে কি না সন্দেহ। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে অর্থ দেখিয়া করণ, কি অধিকরণ, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ 'অলং বিবাদেন,' 'কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন,' 'মাসেন ব্যাকরণমধীতম্', 'জটাভি স্তাপসমদ্রাক্ষম্' এই সকল বাক্যে তৃতীয়ান্ত পদগুলিকে করণ কারক বলিতে সাহস করেন নাই, উহাদের তৃতীয়া বিভক্তির জন্য বিশেষ বিধির সৃষ্টি করিয়াছেন। কোথাও বারণার্থ, কোথাও প্রয়োজনার্থ শব্দের যোগে তৃতীয়া, কোথাও অপবর্গে তৃতীয়া, কোথাও লক্ষণবোধক শব্দের উত্তর তৃতীয়া, এইরূপ বিশেষ বিধির প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গালায় এইরূপ বিশেষ বিধির প্রয়োগ করিতে গেলে দিশাহারা হইতে হইবে। বিবাদে কাজ নাই, মূর্খ পুত্রে দরকার নাই, এক মাসে ব্যাকরণ সারিয়াছি, জটায় তাপস চিনিয়াছি, এই সকল বাঙ্গালা বাক্যে

বিভক্ত্যন্ত পদগুলিকে কারক বলা চলিতে পারে ; কেন না, ক্রিয়ার সহিত উহাদের অন্বয় আছে। কিন্তু কোন্ কারক বলিব ? বোধ হয় না যে, সকল পণ্ডিতে একই উত্তর দিবেন।

তার পরে আর কতকগুলি বাঙ্গালা প্রয়োগ আছে, সংস্কৃতে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। সীতাসঙ্গে বন গেলেন, আনন্দে ভোজন করে, অন্তরে দুঃখিত হইয়া, "সচ্ছন্দেতে অগ্রভাগ করিলা ভোজন," "কি কারণে জীয়াইলে না গেলে যমঘর," "তুঞি পুত্রে লজ্জা আমি লভিলাম," "ক্রোধে দুইগুণ বীর্য্য বাড়িল শরীর," "আপনার বলে বীর করিল টঙ্কার," "বহয়ে ধারা প্রেমের তরঙ্গে," "উচ্চ স্বরে ডাকে রাধামাধব বলিয়া," "চারি হস্তে ভোজন করিলা ব্রজমণি," এই সকল স্থলে এ' এবং তে' বিভক্তিযুক্ত পদগুলিকে কোন্ কারক বলিব ? উহারা স্পষ্টতঃ করণের লক্ষণেও আসে না। কোন-কোনটা ক্রিয়ার বিশেষণের মত দেখায়, কিন্তু খাঁটি বিশেষ্য পদকে বিশেষণ বলাও দায়। 'সানন্দে ভোজন করে' এখানে সানন্দকে ক্রিয়ার বিশেষণ বলা চলিতে পারে, কিন্তু 'আনন্দে ভোজন করে' বাঙ্গালায় তুল্যমূল্য হইলেও আনন্দ শব্দকে বিশেষণ বলিতে গেলে পণ্ডিতেরা লাঠি তুলিবেন। নিতান্ত কষ্টকল্পনা করিয়া কোনটাকে করণ, কোনটাকে অধিকরণ বলা চলিতে না পারে, এমন নহে। কিন্তু এত ক্লেশের প্রয়োজন কি ?

ফলে বাঙ্গালায় ঐরূপ কষ্টকল্পনার দরকার নাই ; কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম বাঙ্গালায় চলিবে না। এই মাত্র বলিলাম, 'ক্লেশের প্রয়োজন কি ?' এখানে প্রয়োজনার্থক শব্দের যোগে বাঙ্গালায় সম্বন্ধসূচক বিভক্তি র' বসিয়াছে। কিন্তু 'ক্লেশে প্রয়োজন কি ?' বলিলেও বাঙ্গালায় কোন দোষ ঘটিত না। এখানে এ' বিভক্তি দেখিয়া উহাকে অধিকরণ বলিব না কি ? উত্তর দেওয়া কঠিন। কাজেই বাঙ্গালায় ঐরূপ আঁটাআঁটি চলিবে না।

আমার বিবেচনায় বাঙ্গালায় করণ ও অধিকরণ দুইটা কারকে ভেদ রাখিবার প্রয়োজন নাই। দুয়েরই বিভক্তি-চিহ্ন সমান ; সর্ব্বত্র অর্থভেদ বাহির করাও কঠিন। দুইটাকে মিশাইয়া একটা নূতন কারক, নূতন নাম দিয়া প্রচলন করা যাইতে পারে। এমন কি, যে সকল স্থলে অর্থ ধরিয়া করণ বা অধিকরণ, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে পারা যায় না, অথচ বিভক্তির রূপ তৎসদৃশ, সেই সকল স্থলেও এই নূতন কারকের পর্য্যায়ে

ফেলা চলিতে পারে। কর্ত্তা ও কর্ম্ম ব্যতীত আর যে সকল পদের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় আছে, এবং যাহারা উক্তরূপ বিভক্তি গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই এই নূতন কারকের শ্রেণীতে পড়িবে। তাহাদের মধ্যে আর সূক্ষ্ম বিভাগ কল্পনা করিয়া ইতরবিশেষ করা নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজী হিসাবে বলিতে গেলে প্রত্যেক predicateএর একটা subject আছে, একটা object থাকিতেও পারে এবং তদ্ভিন্ন বিবিধ adjunct থাকিতে পারে। ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক এই adjunctগুলি ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইলে এ' বা তে' বিভক্তি গ্রহণ করে; তা করণই হউক, আর অধিকরণই হউক, আর ক্রিয়ার বিশেষণের অর্থযুক্তই হউক। কর্ম্ম ও কর্ত্তা ব্যতীত আর যে সকল বিশেষ্য পদ ক্রিয়ার আশ্রয়ে থাকে, তাহাদিগকেও ঐ বিভক্তির খাতিরে এই নূতন কারকের কোঠায় ফেলা যাইতে পারে। ইহার নামকরণ আমার সাধ্যাতীত। পণ্ডিতেরা আমার প্রস্তাব মঞ্জুর করিলে নামের জন্য আটকাইবে না।

যে সকল পদ এ' আর তে' বিভক্তি গ্রহণ করে, তাহারা কোন-না-কোন রূপে ক্রিয়াটিকেই অবলম্বন করিয়া থাকে; ক্রিয়াটার কোন-না-কোন বিশিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়। 'ঘরে চল,' 'বিছানায় শোও,' 'হাতে লও,' 'কানে শোন,' 'ছুরিতে কাট,' 'দড়িতে বাঁধ,' 'সুখে ঘুমাও,' 'আনন্দে নাচ,' 'সঙ্গে চল,' 'হাতীতে যাবেন,' এই সমুদয় দৃষ্টান্তে বিভক্ত্যন্ত পদটা ক্রিয়াকে কোন-না-কোন প্রকারে ব্যাখ্যাত করিতেছে। উহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ আনিবার প্রয়োজন নাই। উহাদিগকে কারক বলিতেই হইবে; কেন না, ক্রিয়ার সহিত উহাদের সাক্ষাৎ সম্পর্কে অন্বয় আছে; মাঝে কোন পদান্তরের ব্যবধান নাই। এই সমুদয় পদকে একই কারকের কোঠায় বসাইতে দোষ দেখি না।

ঐ দুই বিভক্তির ভাবখানাই ঐরূপ। উহা যে পদে সংযুক্ত হয়, তাহাকে ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনয়ন করে; ক্রিয়ারই ব্যাখ্যার জন্য সেই পদটাকে টানিয়া আনে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ঐ বিভক্তি কর্ত্তা ও কর্ম্ম পদকেও ছাড়ে না। 'সাপে কাটে,' 'বাঘে খায়,' 'রামে মারিলেও মারিবে, রাবণে মারিলেও মারিবে,' এই সকল বাক্যের কর্ত্তাগুলি যেন instrumentএ বা করণ-কারকে পরিণত হইয়াছে; উহারা যেন কর্ত্তাও বটে, করণও বটে। সাপে কাটিয়াছে, এই বাক্যে কাটা ক্রিয়ার

করণ যেন সাপ; বাঘে খায়, এই বাক্যে খাওয়া ক্রিয়াব instrument যেন বাঘ; যেন কোন দৈবশক্তি সাপের দ্বারা, বাঘের দ্বারা, রামের দ্বারা, রাবণের দ্বারা ঐ ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া লইতেছে: সাপ বাঘের বা রাম রাবণের যেন সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব নাই। এই জন্য সন্দেহ হয়, সাপ, বাঘ, রাম, রাবণ যেন প্রকৃত কর্ত্তা নহে; হয়ত কর্ম্মবাচ্যের সর্পেণ, ব্যাঘ্রেণ, রামেণ, রাবণেন প্রভৃতি তৃতীয়ান্ত পদই বাঙ্গালায় আসিয়া সাপে, বাঘে, রামে, রাবণে, এই রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

ঐরূপ 'মোহে বল,' 'তোমায় দিব,' 'আমায় ডাক,' "কর্ণ পুত্রে ডাকি বলে," "তব পুত্রে কন্যা দিব," "জীবে দয়া কর," এই সকল স্থলে কর্ম্মপদগুলিও যেন অধিকরণের কাজ করিতেছে। মানুষগুলা যেন তত্তৎ ক্রিয়ার আধারে পরিণত হইয়াছে। এ' আর তে' এই দুই বিভক্তির স্বভাবই এই।

যাক, তথাপি কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারককে উঠাইয়া দিতে বলিব না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে চাহি যে, বাঙ্গালা ব্যাকরণের কারকপ্রকরণে তিনটির বেশী কারক রাখা অনাবশ্যক ঃ—কর্ত্তা, কর্ম্ম ও আর একটি তৃতীয় কারক, যাহার বিভক্তি-চিহ্ন এ' এবং তে'। করণ ও অধিকরণ এবং আর যে সকল পদের অর্থ ধরিয়া কারক নির্ণয় দুরূহ, তাহারা এই তৃতীয় কারকের অন্তর্গত হইবে। সম্প্রদান কর্ম্ম হইতে অভিন্ন, সম্প্রদান রাখিয়া দরকার নাই। ক্রিয়ার সহিত অন্বয়ের অভাবে অপাদান অস্তিত্বহীন। সেই কারণে সম্বন্ধবাচক পদও কারক নহে। অতএব বাঙ্গালা ব্যাকরণে তিনটির অধিক কারকের প্রয়োজন নাই।

সম্বন্ধসূচক বিভক্তি বিষয়ে দুই এক কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। যে সকল পদের অন্বয় ক্রিয়ার সহিত নাই, পদান্তরের সহিত অন্বয় আছে, সেইগুলির সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। সম্বন্ধ নানাবিধ; সকল সম্বন্ধ সমান নিকট নহে। 'দুর্য্যোধনস্য উরু,' 'রামস্য গৃহম্', 'নদ্যা জলম্', 'বায়োর্বেগঃ,' এই সকল স্থলে সম্বন্ধ অতীব নিকট; সংস্কৃত ভাষায় এ সকল স্থলে ষষ্ঠীর প্রয়োগ। 'শিশোঃ শয়নম্,' 'অশ্বস্য গতিঃ,' 'তব পিপাসা,' 'সুখস্য ভোগঃ,' 'ধনস্য দানম্', এ স্থলে তত্তৎ কর্ত্তৃপদের বা কর্ম্মপদের সহিত কৃদন্ত ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ। ক্রিয়াপদগুলি কৃৎপ্রত্যয়-যোগে এ স্থলে বিশেষ্যে পরিণত হইয়াছে; ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম

তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় ষষ্ঠী বিভক্তি পাইয়াছে। কিন্তু এরূপ কৃদন্ত পদ-যোগেও সর্ব্বত্র ষষ্ঠীর প্রয়োগ হয় না। 'ধ ন স্য দাতা,' 'ধ ন ং দাতা,' দুই-ই সিদ্ধ, যদিও উভয়ের মধ্যে অর্থের কিছু পার্থক্য আছে। আবার 'গৃ হ ং গচ্ছন্', 'জ ল ং পিবন্', 'গৃ হ ং গন্তুম্', এই সকল স্থলে কৃদন্তের পূর্ব্বে ষষ্ঠী না হইয়া দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে।

অন্যরূপ সম্বন্ধে অন্যবিধ বিভক্তির প্রয়োগ আছে। যেমন তাদর্থ্যে চতুর্থী, হিতসুখ-নমোভিশ্চতুর্থী, কালাধ্বনোরবধেঃ পঞ্চমী, হেতৌ পঞ্চমী তৃতীয়া চ, প্রকৃত্যাদিভ্যস্তৃতীয়া, ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত, কু ণ্ড লা য় হিরণ্যম্, গু র বে নমঃ, মা ঘা ৎ তৃতীয়ে মাসি, ধ না ৎ কুলম্, ভ য়া ৎ কম্পঃ, আ কৃ ত্যা সুন্দরঃ।

আবার অব্যয় পদের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে সংস্কৃত ব্যাকরণে নানা বিশেষ বিধি আছে। সী ত য়া সহ, ত্ব য়া বিনা, দী নং প্রতি, কৃ প ণ ং ধিক্, ক ল হে ন কিম্, গৃ হা ৎ বহিঃ, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এ সকল স্থলে বিভক্তিযুক্ত পদগুলি ক্রিয়ার সহিত অন্বিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অব্যয় পদের সহিত অন্বিত হইয়াছে, অতএব উহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে কারক-লক্ষণযুক্ত নহে।

রা মে র বাড়ী, ম হি ষে র শিঙ, ঘো ড়া র ডিম, প্র ভু র ইচ্ছা, অ ন্নে র পাক, জ লে র শোষণ, ইত্যাদি দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া দরকার নাই। ঘ রে গিয়া, জ লে নামিয়া, প থে চলিতে চলিতে, এই সকল দৃষ্টান্তেরও বাহুল্য অনাবশ্যক।

অন্য শ্রেণীর দৃষ্টান্ত কতকগুলি দেওয়া যাক :—

দী নে র প্রতি, সী তা র সহিত, ঘ রে র বাহিরে, ন দী র কাছে, গ্রা মে র নিকটে, ঘ রে র চারি দিকে, ইত্যাদি স্থলে বিভক্তি-চিহ্ন র'। কৃ প ণ কে ধিক্, গু রু কে প্রণাম, তো মা কে নহিলে, আ মা কে ছাড়া, ইত্যাদি স্থলে বিভক্তি কে'। 'ঘো ড়া র [জন্য] ঘাস,' 'রা ন্না র [জন্য] হাঁড়ি,' 'রো গে র [জন্য] ঔষধ,' এ সকল স্থানে জ ন্য শব্দটির ব্যবধান ইচ্ছাধীন এবং বিভক্তি-চিহ্ন র'।

'চো খে কাণা,' 'পা য়ে খোঁড়া,' 'আ কা রে ছোট,' 'ব য় সে বড়,' 'না মে দশরথ,' 'জা তি তে কায়স্থ,' 'ব্যা ক র ণে পণ্ডিত,' 'ক্রো ধে তাপ' ইত্যাদি স্থলে সেই পূর্ব্বপরিচিত এ' বা তে'।

'ঘোড়া হইতে পড়িয়াছে,' 'জল থেকে উঠেছে,' 'ছাদ থেকে দেখ্‌ছে,' 'মাঘ হইতে তৃতীয় মাস,' 'রাম চেয়ে শ্যাম ছোট,' 'ঘর হইতে বাহির' ইত্যাদি স্থলে অব্যয় পদের পূর্ব্বে বিভক্তি প্রায় লুপ্ত থাকে। ক্বচিৎ বিভক্তির যোগ হয়। যথা জলে থেকে, রামের চেয়ে, আমাকে হইতে, আমার হইতে, ছুরিতে করিয়া, তোমাকে দিয়া।

দেখা গেল, বাঙ্গালায় বিভক্তির সংখ্যা অতি অল্প। এই বিভক্তিগুলির উৎপত্তি কিরূপে হইল, উহারা কবে কিরূপে ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিল, তৎসম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত আছে। বিদেশী পণ্ডিতেরা ইহা আলোচনা করিয়াছেন; দেশী পণ্ডিতদের মধ্যেও কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন। এখনও সুমীমাংসা হয় নাই। অতি প্রাচীন বাঙ্গালায় ঐ সকল বিভক্তির রূপ কেমন ছিল, তাহার রীতিমত অনুসন্ধান না হইলে মীমাংসা হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত দিব। কর্ম্ম-কারকে চলিত বিভক্তি কে,' যথা—আমা-কে, তোমা-কে, তাহা-কে, রাম-কে, হরি-কে ইত্যাদি। সম্বন্ধে বিভক্তি র' বহু স্থলে আগে একটা ক' লইয়া 'কার' হইয়া যায়, যথা—আমা-কার, তোমা-কার, আপনা-কার, সবা-কার, তথা-কার, সেখান-কার, আজি-কার, কালি-কার। বাঙ্গালায় সম্বন্ধ সূচনায় এই ক'য়ের প্রচলন অধিক না থাকিলেও হিন্দী ভাষায় ইহার প্রচলন খুব অধিক; যথা,—সাহিত্য-কার ভাণ্ডার, খেদ-কী বাত, জিস্‌-কে ভাষা, প্রচার করণে-কার ইত্যাদি। অধিকরণ-কারকে প্রধান বিভক্তি এ,' বা তে'; কিন্তু স্থলবিশেষে অধিকরণেও কে' বসে, যথা—আজি-কে, কালি-কে। এই সকল দৃষ্টান্তে ক' আসিল কোথা হইতে? সংস্কৃতে সাত দফা বিভক্তি আছে, কিন্তু তন্মধ্যে কোথাও ক' নাই। কাজেই গোলে পড়িতে হয়। কেহ বলেন, সংস্কৃতে না থাক, প্রাকৃতে 'কের' বিভক্তি পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ এই কের সংস্কৃত কৃত বা কৃতে হইতে উৎপন্ন। এই প্রাকৃত কের ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় কে,' ক,' কার' প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। অন্য পণ্ডিতে বলেন, সংস্কৃতের স্বার্থে ক' হইতে বাঙ্গালায় এই কে,' কার' প্রভৃতি উৎপন্ন। অতএব এই স্বার্থে ক' যে-কোন শব্দের উপর বসিতে পারে, তাহাতে অর্থান্তর-প্রাপ্তি ঘটে না।

দলিল দস্তাবেজের ভাষায় এই স্বার্থে ক'য়ের একটা কৌতুককর দৃষ্টান্ত প্রচলিত আছে। চলিত প্রথামতে কোন একটা দলিল লিখিতে হইলে ক স্য দিয়া আরম্ভ করিতে হয় এবং আ া গে দিয়া শেষ করিতে হয়। যথা— ক স্য তমস্সুকপত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আ া গে। এই 'ক স্য' এবং 'আ া গে' কোথা হইতে আসিল ?

এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে কি না, জানি না। আমার বোধ হয়, এই আ া গে সংস্কৃত আ া জ্ঞা প য় তি হইতে প্রাকৃতের ভিতর দিয়া আসিয়াছে। অতি পুরাতন তাম্রশাসনাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দানকর্ত্তা রাজা তাঁহার দানপত্রের আরম্ভেই তাঁহার অমাত্য কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রজাবর্গ প্রভৃতিকে "আ া জ্ঞা প য় তি স মা দি শ তি চ" বলিয়া হুকুম জারি করিতেছেন। সেই প্রথার অনুসরণে অদ্যাপি বাঙ্গালার জমিদারেরা জমিদারি-মধ্যে কোন আদেশ জারি করিতে হইলে আদেশপত্র-মধ্যে আরম্ভ করেন—"মণ্ডল-গোমস্তা-হালসানা-প্রজাবর্গাণাং প্রতি আগে।" এই আ া গে সেকালের আ া জ্ঞা প য় তি পদেরই অপভ্রংশ। ইহা যে আদেশজ্ঞাপন-বাক্য, তাহা ভুলিয়া গিয়া এখন পাট্টা কবুলতি তমস্সুক প্রভৃতি যে-কোন দলিলে দাতা ও গ্রহীতা উভয় পক্ষই লিখিয়া বসেন "কার্য্যঞ্চ আ া গে"—অর্থাৎ কর্ত্তব্য বিষয়ে আজ্ঞা (আদেশ) দিতেছি। আ া গে সম্বন্ধে এই কথা। তার পরে ক স্য। ক স্য ত ম স্সু ক প ত্র মি দং— কাহার তমস্সুক পত্র এখানা ?—এইরূপ অর্থ ঘটাইলে বিপরীত কাণ্ড হইবে। কিন্তু এই বাক্যের অন্তর্গত ক' কিম্ শব্দের ক' না হইয়া যদি স্বার্থে ক' হয়, তাহা হইলে একটা মীমাংসা পাওয়া যায়। যথা দা স স্য=দা স ক স্য, ঘো ষ স্য=ঘো ষ ক স্য, চ ট্টো পা ধ্যা য় স্য=চ ট্টো পা ধ্যা য়-ক স্য। দলিলের আরম্ভ—"লিখিতং শ্রীরামচন্দ্র দা স ক স্য তমস্সুকপত্র-মিদম্," "লিখিতং শ্রীঘনরাম দ ত্ত ক স্য পট্টকপত্রমিদম্," "লিখিতং শ্রীহরিচরণ-চট্টোপাধ্যায়কস্য কবুলতিপত্রমিদম্"—"লিখিতং শ্রীদুর্গাচরণ-ভূতিকস্য একরারপত্রমিদম্"—ইত্যাদি বিবরণের ফারম (form) ছকিতে গেলে এইরূপে ছকিতে হইবে ;—"লিখিতং শ্রী——————কস্য——— পত্রমিদম্"—শ্রী'র পরবর্ত্তী ফাঁকে দাতার বা গ্রহীতার নামটা বসাইয়া দিলেই চলিবে। এইরূপে দা স ক স্য, দ ত্ত ক স্য, ভূ তি ক স্য প্রভৃতি

সর্ব্বসাধারণের নামের সাধারণ অংশ ‘ক স্য’টুকু স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়া একালের দলিলে পত্রে বিরাজ করিতেছে।

কে, কার প্রভৃতি বাঙ্গালা বিভক্তির মূল যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙ্গালায় উহাদের আরও সংক্ষিপ্ত আকার দেখা যায়। যথা—আমা-ক, তোমা-ক, মো-ক, তো-ক, সবা-ক, আপনা-ক; আমা-কর, মো-কর, সবা-কর; ইত্যাদি।

অধিকরণের বিভক্তি-চিহ্ন তে,’—ইহারও মূল যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙ্গালায় উহা সংক্ষিপ্ত আকারে ত-রূপে বর্ত্তমান, তাহার ভূরি দৃষ্টান্ত আছে; যথা—আমা-ত, তোমা-ত, জলে-ত, নৌকা-ত। যত্র, তত্র, কুত্র প্রভৃতি সংস্কৃত পদের ত্র’টুকুই কি শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ‘ত’য়ে দাঁড়াইয়াছে?

বাঙ্গালা এ’ বিভক্তি আর য়’ বিভক্তি যে একই, তাহাতে সন্দেহ নাই। আজি কালি আমরা যেখানে লিখি আমা-য়, তোমা-য়, প্রাচীনেরা সেখানে লিখিতেন আমা-এ, তোমা-এ।

বাঙ্গালা বিভক্তি-চিহ্নগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া শেষ পর্য্যন্ত ক, ত, র, এ (=য়), আ এবং দি, এই ছয়টির অধিক অবশিষ্ট থাকে না। দেখা যাউক :—

আমা-এ	= আমা-য়	= আমায়
তোমা-এ	= তোমা-য়	= তোমায়
তাঁহা-এ	= তাঁহা-য়	= তাঁহায়
লোক-এ	= লোকে	
বাঘ-এ	= বাঘে	
জল-এ	= জলে	
নৌকা-এ	= নৌকা-য়	= নৌকায়
বিছানা-এ	= বিছানা-য়	= বিছানায়
আমা-ক	= আমা-ক-এ	= আমাকে
মো-ক	= মো-ক-এ	= মোকে
তাঁহা-ক	= তাঁহা-ক-এ	= তাঁহাকে, তাঁকে
আমা-র	= আমার	
তোমা-র	= তোমার	
তাঁহা-র	= তাঁহার	

হরি-র	= হরির	
লোক-এ-র	= লোকের	
শ্যাম-এ-র	= শ্যামের	

আমা-র-এ	= আমা-রে	= আমারে (আমাকে)
তাঁহা-র-এ	= তাঁহা-রে	= তাঁহারে (তাঁহাকে)
হরি-র-এ	= হরি-রে	= হরিরে (হরিকে)
রাম-এ-র-এ	= রাম-এরে	= রামেরে (রামকে)

সবা-ক-র	= সবা-কার	= সবাকার
আপনা-ক-র	= আপন-কার	= আপনকার
আজি-ক-র	= আজি-কার	= আজিকার
কালি-ক-র	= কালি-কার	= কালিকার
আজি-ক-এ	= আজি-কে	= আজিকে
কালি-ক-এ	= কালি-কে	= কালিকে

আমা-ত	= আমা-ত-এ	= আমা-তে	= আমাতে
তোমা-ত	= তোমা-ত-এ	= তোমা-তে	= তোমাতে
তাঁহা-ত	= তাঁহা-ত-এ	= তাঁহা-তে	= তাঁহাতে
নৌকা-ত	= নৌকা-ত-এ	= নৌকা-তে	= নৌকাতে
বাড়ী-ত	= বাড়ী-ত-এ	= বাড়ী-তে	= বাড়ীতে
ছুরি-ত	= ছুরি-ত-এ	= ছুরি-তে	= ছুরিতে
জল-ত	= জল-এ-ত-এ	= জল-এতে	= জলেতে

বহুবচনের চিহ্ন কর্ত্তায়—রা, এরা; কর্ম্মে—দিকে, দিগকে, সম্বন্ধে—দের, দিগের। ইহাদের উৎপত্তির এখনও মীমাংসা হয় নাই। ফার্সী দিগর শব্দ হইতে দিগ আনা নিতান্ত কষ্টকল্পনা। তার চেয়ে সংস্কৃত আদি হইতে দি' আনা সঙ্গত; উহার উপর স্বার্থে ক যোগ করিলেই দিক=দিগ আসিবে।

বহুবচনের চিহ্নগুলি এইরূপে ভাঙ্গিয়া দেখা যাইতে পারে :—

আমা-র-আ	= আমা-রা	= আমরা
তোমা-র-আ	= তোমা-রা	= তোমরা
তাঁহা-র-আ	= তাঁহা-রা	= তাঁহারা
মুনি-র-আ	= মুনি-রা	= মুনিরা

বাঙ্গালী-র-আ	= বাঙ্গালী-রা	= বাঙ্গালীরা
ইংরেজ-এ-র-আ	= ইংরেজ-এরা	= ইংরেজেরা
লোক-এ-র-আ	= লোক-এরা	= লোকেরা
আমা-আদি-ক-এ	= আমা-দিকে	= আমাদিকে
আমা-আদিক-ক-এ	= আমা-দিগ-কে	= আমাদিগকে
লোক-আদিক-ক-এ	= লোক-দিগ-কে	= লোকদিগকে
আমা-আদি-এ-র	= আমা-দের	= আমাদের
আমা-আদিক-এ-র	= আমা-দিগের	= আমাদিগের
লোক-আদি-এ-র	= লোক-দের	= লোকদের
লোক-আদিক-এ-র	= লোক-দিগের	= লোকদিগের
আমা-র-আদি-এ-র	= আমার-দের	= আমাদের
লোক-এ-র আদি-এ-র	= লোকের-দের	= লোকেরদের
	= লোকেদের	= লোকদের

বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালার বিভক্তি-চিহ্ন কেবল তিনটি—একবচনে চিহ্ন এ' (= য়'), সম্বন্ধে চিহ্ন—র', এবং কর্ত্তায় বহুবচনের চিহ্ন আ'। এই কয়টি বিভক্তি-চিহ্ন দরকারমত ক', ত', এবং দি'—এই কয়টি চিহ্নে যুক্ত হইয়া বাঙ্গালায় সমুদয় বিভক্ত্যন্ত পদ নিষ্পন্ন করে।

পরিশিষ্ট

[সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় আমার অনুরোধক্রমে বাঙ্গালা বিভক্তি-চিহ্নের বহু দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। বসন্ত বাবুর নিকট এ জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বসন্ত বাবু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি গভীর আলোচনা করিয়াছেন ; তাঁহার মতামত পাঠকগণের উপাদেয় হইবে বুঝিয়া তাঁহার মন্তব্যটুকু আমি তাঁহার অনুমতিক্রমে অবিকল প্রকাশ করিলাম।—আশ্বিন, ১৩২৩]

প্রথমা—প্রথমার একবচনে এ' বা ই' প্রত্যয় এবং প্রত্যয় লোপ মাগধীর অনুরূপ[১]। উদাহরণ,—

পাপ দুঠ্‌ঠ ক ং সে তাক সবই মারিব।—কৃষ্ণকীর্ত্তন

শুনিয়া রা জা এ বোলে হইয়া কৌতুক।—সঞ্জয়ের মহাভারত

(১) 'অত ইদেতৌ লুক্ চ'—প্রাকৃতপ্রকাশ, ১১।১০

কোন মতে বিধাতা এ করিছে নির্ম্মাণ।—রামেশ্বরী মহাভারত
কহিলোঁ মোঁাই সকল তোহ্মার ঠাএ।—কৃষ্ণকীর্ত্তন
ভ্রূহি কাম ধনু নয়ন বাণে।—কৃষ্ণকীর্ত্তন
[হি=ই]

সু' প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রাকৃতে ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের অন্ত্য স্বর দীর্ঘ হয়;[১] যথা—মুনী, পতী, বাউ, গুরূ প্রভৃতি। বাঙ্গালা সাহিত্যেও এইরূপ পদের প্রয়োগ দেখা যায়। উদাহরণ,—

ধিক জাউ নারীর জীবন দহে পসু তার পতী।—কৃষ্ণকীর্ত্তন
হেনই সম্ভেদে নারদ মুনী
আসিআঁ দিল দরশনে॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন

মাগধীর অনুরূপ 'হনুমন্তা,' 'নাতিআ' ইত্যাকার পদও দৃষ্ট হয়; যথা—

রাম কাজে হনুমন্তা।
তেহেন আহ্মার দূতা॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন
দেখিল লগুড় করে নাতিআ কাহ্নাঞিঁ॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন

প্রাকৃতে দ্বিবচন নাই[২]। সম্ভবতঃ সেই হেতু বাঙ্গালাতেও নাই। বহুবচনে নির্দ্দিষ্ট বিভক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। গণ, সব, সকল, যত প্রভৃতি শব্দের যোগে বহুবচনের অর্থ প্রকাশিত হইত। শূন্যপুরাণ, চণ্ডীদাসের পদাবলী, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতির পুথিতে মুরা, আমরা, তোমরা, তারা ইত্যাদি পদের প্রয়োগ পাওয়া যায়; কিন্তু পুথির অপ্রাচীনত্ব হেতু ওগুলিকে প্রাচীন বলা চলে না। পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত প্রাচীনতম গ্রন্থ কৃষ্ণকীর্ত্তনের তিনটি মাত্র স্থলে রা' দিয়া বহুবচনের পদ পাওয়া গিয়াছে; যথা—

আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী॥
বিকল দেখিআঁ তথাঁ রাখোআলগণে।
পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মনে॥
আহ্মারা মরিব শুনিলেঁ কাঁশে।

(১) 'সুভিসুপ্সু দীর্ঘঃ'—প্রাকৃতপ্রকাশ, ৫।১৮
(২) 'দ্বিবচনস্ত বহুবচনম্'—প্রা. প্র., ৬।৬৩; 'দ্বিত্বং বহুত্বং'—প্রা. লক্ষণ, ২।১২

রাজেন্দ্রদাসের আদিপর্ব্বে,—

তবে কণ্ব মুনি কথা তাহাতে কহিল।
আ মা রা নিকটে থাকি সে কথা শুনিল॥

ষষ্ঠ্যন্ত আ মা র, তো মা র পদের উত্তর গৌরবার্থে আকার যুক্ত করিয়া প্রথমার বহুবচনে আ মা রা ও তো মা রা পদ হইয়া থাকিবে[১]। স্বর্গীয় কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে 'আমার প্রসাদে তো ম রা হবে উত্তম গতি'; এখানে তো ম রা অর্থে তো মা দে র।

দ্বিতীয়া—দ্বিতীয়া বিভক্তিতে এ' প্রত্যয় প্রথমার অনুকরণ উদাহরণ,—

দেখি রাধার রূপ যৌ ব নে।
মাত্মক বুয়িল আইহনে॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন
বন মাঝেঁ পাইল ত রা সে।—কৃষ্ণকীর্ত্তন
নয় বান দিয়া দৈত্য বিন্ধিল রা জা এ।
বভ্রুবাহ এক সত বান মারে তা এ॥
—হরিদাস-কৃত জৈমিনি ভারতের পুথি

নিমিত্তার্থে বা তাদর্থ্যে প্রযুক্ত প্রাকৃত কএ' বিভক্তি[২] বাঙ্গালায় কে' বা ক' বিভক্তিরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান অযুক্ত নহে।

---

(1) 'In Bengali the nominative plural may, in the case of human beings, be formed by adding *a* to the genitive singular; thus *santan*, a son; genitive singular, *santaner;* nominative plural, *santanera*... The same is the case with the pronouns; thus *amar*, of me; *amara*, we; *tahar*, his; *tahara*, they.'—Encyclopœdia Britannica (11th ed.) Vol. 3, p. 734.

'সম্বন্ধের র হইতে কর্ত্তাকারকের বহুবচনের রা আসা অসম্ভব নহে।'—যোগেশবাবুর ব্যাকরণ, পৃ. ২০৮।

(২) 'ণং ভণাহি ইমশ্‌শ কএ মচ্ছিআভত্তুণো ত্তি'—শকুন্তলা, প্রবেশক; 'ইমস্‌স কএ সউন্তলা কিলম্মই'—শ. কু., ৬ অঙ্ক; 'পুপ্‌ফঞ্জলি-দাণ-কএ নীবাবচএ কিম্‌ আলস্‌সং'—কু. চ., ৫।৩০; 'তুমম্মি ভণাম জুহি-কএ'—কু. চ., ৫।৩৪; 'অথুড়িঅ-গমণম্‌, অতোড়িঅ-মদম্‌, অতুড়িঅ-লক্‌খণং মহেন্ত-কুলং। অণিলুক্ককন্ত-সিণেহো গউড়ো পেসীঅ তুজ্‌ঝ কএ॥'—কু. চ., ৬।৭৮;

'পরিহর মাণিণি মাণং
পেক্‌খহি কুসুমাইঁ নীবস্‌স।
তুম্হ কএ খর হিঅও
গেহ্নই গুড়িআ ধণুংহি কিল কামো॥—প্রা. পৈ., ১।৬৭

কে,' ক' প্রত্যয়ের কতিপয় উদাহরণ,—

রৌদ্রে কাঁটাকুটায় রাঁধে।
খড় কাট বর্ষাকে রাখে॥—ডাক
কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিআঁ॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন
কাহ্ন মোকে মাঙ্গে আলিঙ্গনে।—ঐ
প্রথমত কংশে পূতনাক নিয়োজিল।—ঐ
মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ।—ঐ
দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ।—শূন্যপুরাণ
গুরু উপদেশে আমি রথ বাহিবাক।
শিখিয়াছো যেমত দেখিবা তাক॥—বিশারদ-কৃত বিরাটপর্ব্ব

রে' বা এরে'র মূলে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন বর্ত্তমান।

পরাণ অধিক বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।—কৃষ্ণকীর্ত্তন
শুণী কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন
দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণায়িল॥— ঐ

তৃতীয়া—এঁ' বা এ' প্রত্যয় অপভ্রংশের অনুরূপ[১]। উদাহরণ,—

মিছাই মাথাএ পাড়এ সান॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন
দধি দুধেঁ পসার সজাআঁ।— ঐ

ত'(= তস্) প্রত্যয় যোগে—

মিনতী করিআঁ হাথেত ধরিআঁ
আন গিআঁ চন্দ্রাবলী॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন

চতুর্থী—চতুর্থী বিভক্তির স্থানে সাধারণতঃ দ্বিতীয়া বিভক্তি বিহিত হয়।

পঞ্চমী—হতেঁ, হৈতেঁ, হন্তে, হনে প্রভৃতি প্রাকৃত হিংতো-রই রূপভেদ[২]। অপেক্ষার্থক পঞ্চমী বিভক্তিতে তে' ও ত' প্রয়োগ দেখা যায়।

এবে হতেঁ দৈবকীর যত গর্ভ হএ।—কৃষ্ণকীর্ত্তন
কথা হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।—ঐ
হাড় হন্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনি হাড়।—আলওয়াল-কৃত পদ্মাবতী
সেই হনে প্রাণ মোর আছে বা না জানি।—সঞ্জয়ের মহাভারত

---

(১) 'ত্রিম্বেৎ টঃ'—প্রা. সর্ব্বস্ব ; 'এৎটা'—স, সা., প্রা. অ., সূ. ২৪।

(২) 'হিংতোত্তসঃ—প্রা. লক্ষণ। আর্ষ প্রাকৃত ও মাগধীতে পঞ্চমীর একবচনেও 'হিংতো' হয় ; যথা—'দেবাহিংতো' (দেবাৎ), 'তুমাহিংতো' (ত্বৎ)।

কৌশল্যা জননী পিতৃ অযোধ্যার পতি।
দুই হস্তো কৈকঈত করিল ভকতি॥—মাধব কন্দলীকৃত অরণ্যকাণ্ড
রাজাতে বিদায় মাগে ভরত কুমার।—কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডের পুথি
এতেক ভাবিআঁ সুন্দরী নারী তোতে নিবারিলোঁ মন।—কৃষ্ণকীর্ত্তন
আহ্মাতে চাহসি বাঁশী।—ঐ
আহ্মাত আধিক কোন দেহ আছে।—ঐ
মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহিঁ।—ঐ

ষষ্ঠী—কের, কর, এর প্রত্যয় প্রাকৃত সম্বন্ধবাচক কেরক শব্দের বিকারে উৎপন্ন। উদাহরণ—

জদি নয়ন কমলবর মুকুলকের কন্তি ধর
খর নখর ঘাত কই গেহে বেলা।—বিদ্যাপতি
সদা বসথি জমুনাক তীর।
পর জুবতীকের হরথি চীর॥—ঐ
তিরীর যৌবন রাতির সপন
যেহ্ন নদীকের বাণে।—কৃষ্ণকীর্ত্তন
দেখিয়া রাম দামোদর বৎসকের সঙ্গে।
—গুণরাজ খান-কৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়
রূপাঁকর পাটএ বেসাতির বৈসএ হাট।—শূন্যপুরাণ
এখন হইনু কোড়াকর ভিখারি।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান

ক' প্রত্যয়—

বিঘিনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥—বিদ্যাপতি
অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।
নিত্যানন্দ রাম বন্দো রোহিণীক সুত॥
—লোচনদাস-কৃত চৈতন্যমঙ্গল
বিহারক রাজপুরী নামে অম্রাবতী।
বীরনারায়ণ দেব যার অধিপতি॥
—মহারাজ বীরনারায়ণ-কৃত কিরাতপর্ব্ব
গৃহস্থক ধর্ম্ম এহি পুরাণ কহিছে।—সঞ্জয়-কৃত মহাভারত

লজ্জার্থক শব্দ বা ক্রিয়ার যোগে ত' বা তে' প্রয়োগ। যথা—

কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।—কৃষ্ণকীর্ত্তন
দিঠিত পড়িলে বাঘত হএ লাজ।— ঐ
দারুণী বুঢ়ী তোর বাপেত নাহি লাজ।—ঐ

নেহ ত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেথী।—কৃষ্ণকীর্ত্তন

সিনান করিয়া যাও মহলত লাগিয়া।

র' প্রত্যয়—(১) অপভ্রংশ ভাষার অনুকরণে[১]।

(২) প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন 'ণ'-র রকারে পরিণতিতে[২]।

সপ্তমী—ত,' তে,' তা'-যোগে; ইহাদের মূল থ' বা ত্ত'। উদাহরণ,—

খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে।—কৃষ্ণকীর্ত্তন

সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।—ঐ

চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিন্দুর।—ঐ

এ' প্রত্যয় প্রাকৃতের অনুবর্ত্তিতায়।

বিভক্তি-চিহ্নের নির্ব্বিশেষ প্রয়োগ—

প্রথমায় ত,' তে' প্রত্যয়,—

আমা সভা কৌতুকে আসি ব্রহ্মাত হরিল।

—কবিশেখর-কৃত গোপালবিজয়ের পুথি

মুঞি যত কৈলুম পাপ বিশ্বমিত্র হেন বাপ

মেনকাত ধরিছিল উদরে।—রাজেন্দ্র দাসের আদিপর্ব্ব

মূর্খেতে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।—বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ

হাঁটু পাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥—রামেশ্বরের শিবায়ন

দ্বিতীয়াতে ত', তে'—

কত বড় বাস তুমি সিতাত রূপসি।—কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডের পুথি

পণ্ডিত না হয় মুই কহিলুম তোমাত।

—রামজীবন-কৃত সূর্য্যের পাঁচালী

কহিল তোহ্মাতে আহ্মি ব্রত ফল বিধি।—মৃগলুব্ধ

কি য়াশ্চর্য্য কথা তুমি থাইবে আমাতে॥—গোশৃঙ্গের যুদ্ধপালা পুথি

পঞ্চমীতে এ'—

তার পরাণ হরিলোঁ শরীরে॥—কৃষ্ণকীর্ত্তন

পঞ্চমীতে ক'—

এ তীন ভুবনে নাহিঁ আহ্মাক বীর॥—ঐ

প্রত্যয় লোপ ও বিভক্তি বিনিময়ের দৃষ্টান্ত অবিরল এবং উহা অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব। একাধিক প্রত্যয়ের একত্র প্রয়োগ সাধারণ।

(১) অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর 'ঈয়' প্রত্যয় স্থানে 'ডার' আদেশ হয়; 'যুষ্মদাদেরীয়স্য ডারঃ'—সিদ্ধহেম., ৮।৪।৪৩৪

(২) জাণ=জাঁর=যাঁর বা যাঁহার; তাণ=তাঁর বা তাঁহার ইত্যাদি।

না

আর্য্যভাষায় 'না' অতি প্রাচীন শব্দ; উহা 'হাঁ'-এর বিপরীত। সম্মুখের দিকে উর্দ্ধাধোভাবে ঘাড় নাড়িলে হয় হাঁ,—উহা সম্মতিসূচক; আর পাশাপাশি ডাহিনে বামে ঘাড় নাড়িলে হয় না,—উহা অসম্মতিজ্ঞাপক। না'য়ের ক্ষমতা বড় ভীষণ; উহা চকিতের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নস্যাৎ করিয়া দিতে পারে।

এই না'কে অব্যয় পদ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; কেন না, উহা কোনরূপ বিভক্তি-চিহ্ন গ্রহণ করিতে চায় না। সাধারণ ক্রিয়ার সহিত উহা বিশেষণরূপে বসে; কিন্তু যে ক্রিয়ার বিশেষণ হয়, সাধারণতঃ তাহাকে একবারে উলটাইয়া দেয়। এমন সর্ব্বনেশে বিশেষণ আর নাই।

'না' যে ক্রিয়াকে নষ্ট করিতে চায়, তাহার পরে বসে। যথা;—তিনি করেন না, করছেন না, করতেন না, করলেন না, করছিলেন না, করবেন না। তুমি করিও—ইহা আদেশ; তুমি করিও না—ইহা নিষেধ। করিয়াছেন আর করিয়াছিলেন, এই দুই ক্রিয়ার পরে 'না' বসিতে চায় না। 'করিয়াছেন না' এবং 'করিয়াছিলেন না' এই উভয় স্থলেই 'করেন নাই' এইরূপ প্রয়োগ হয়। এই ই-যুক্ত না বর্ত্তমান ক্রিয়া করেন-কে অতীত কালে পৌঁছিয়া দেয়। তিনি করেন—বর্ত্তমান কালে; তিনি করেন না—সেও বর্ত্তমানে; কিন্তু তিনি করেন নাই—একেবারে অতীতের কথা। ঐরূপ অতীত-বার্ত্তাসূচক দৃষ্টান্ত;—তুমি কর নাই, আমি যাই নাই, সে খায় নাই, তাহা হয় নাই।

না একেলাই ক্রিয়ানাশক, কিন্তু সময়ে সময়ে আপনার সাহায্য করিবার জন্য একটা নিরর্থক ক' ডাকিয়া আনে। তুমি যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে 'না, আমি যাব না,' ইহাই সম্পূর্ণ উত্তর; কিন্তু যেন গায়ে বল পাইবার জন্য বলা হয়, 'না, আমি যাব না ক'। বাঙ্গালার এই ক' কোন্ মুলুক হইতে আসিয়াছে, সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। হয়ত ইহা স্বার্থে ক'।

উপরে দত্ত দৃষ্টান্তগুলির সর্ব্বত্র না ক্রিয়ার পরে বসে। কিন্তু স্থল-বিশেষে আগে বসিতেও আপত্তি নাই। 'আমি কি জানি না?' প্রশ্ন-কর্ত্তার জ্ঞানে যে ব্যক্তি সংশয় করে, তাহার উপর এই প্রশ্নের চাপ দেওয়া হয়। প্রশ্নকর্ত্তা সংশয়কারীকে জোরের সহিত বলেন, 'আমি কি না জানি!' অথবা, 'আমি না জানি কি!'—ইহার অর্থ, আমি সমস্তই জানি। আবার কখনও বা ঈষৎ ব্যঙ্গের সহিত বলা হয়, 'আমি না জানি, তুমি ত জান।' এই সকল দৃষ্টান্তে না ক্রিয়ার পরে না বসিয়া পূর্ব্বে বসিয়া থাকে।

সংশয়, অনিশ্চয় প্রভৃতি গোলমেলে ভাবের সহকারে না ক্রিয়ার আগে বসিতে চায়; যথা, তিনি যদি না যান, আমি যাব; তিনি না খান, আমি খাব। অনিশ্চিত ক্রিয়ার ফল বিরক্তি অথবা অভিমান ;—যথা, না হয়, না হবে; না যান, না যাবেন। বিরক্তি বা অভিমান একটু উচ্চ মাত্রায় উঠিলে না' একটা ই-কার ডাকিয়া লয়,—না যান, নাই বা গেলেন; না খান, নাই বা খেলেন।

বলা উচিত, এই নাই গেলেন এর নাই এবং যান নাই এর নাই ঠিক এক নাই নহে। নাই গেলেন বস্তুতঃ না-ই গেলেন। এখানে ই একটা পৃথক্ শব্দ, সম্ভবতঃ সংস্কৃত হি হইতে উৎপন্ন। উহা না'কে বলবত্তর করে। আর 'যান নাই' এই দৃষ্টান্ত না'র পরবর্ত্তী ই' না'র সঙ্গে একেবারে মিশিয়া আছে; উহাকে ছাড়াইয়া লইবার উপায় নাই।

না করিবার জন্য, না দেওয়ার ইচ্ছা, না যাইতে যাইতে, না দিয়া, না বলিয়া, না চড়িতে এক কাঁধি ইত্যাদি স্থানে না'-কে বাধ্য হইয়া ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসিতে হইয়াছে। সে কেবল স্থানাভাবে। বলা চেয়ে না বলা ভাল,—এখানেও তদ্রূপ।

এ পর্য্যন্ত না'র যত প্রয়োগ দেখা গেল, উহা সর্ব্বত্র ক্রিয়াকে পণ্ড করে। না' একাই ক্রিয়া পণ্ড করিতে সমর্থ। যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে 'যাব না,' এত দূর বলার দরকার নাই; ঘাড় নাড়িয়া শুধু 'না' বলিলেই যথেষ্ট; ভাবী ক্রিয়া ইহাতেই পণ্ড হইল। বুঝিয়া লইতে হইবে, এখানে না'র ষোল আনা অর্থ যাব না। না যখন একটা বিসর্গযুক্ত

হইয়া সবলে নাসিকা হইতে নির্গত হয়—যেমন না:, যেতেই হ'ল; অথবা না:, যাব না,—তখন বুঝিতে হইবে যে ঐ বিসর্গযুক্ত না পূর্ব্ববর্ত্তী সংশয় বিতর্ক আলোচনা আন্দোলনের চূড়ান্ত মীমাংসা; কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যা কিছু সংশয় ছিল, তাহা সমূলে বিনষ্ট করিয়া একবারে চরম মীমাংসায় আসা গেল। "জগৎটা কিছু না:" বৈরাগীর এই গায়ের জোরে মীমাংসার কাছে তার্কিকের দার্শনিক মীমাংসা নিতান্তই দুর্ব্বল। ইহা সংশয়বাদ নহে, একবারে নাস্তিবাদ।

এ পর্য্যন্ত না'কে ক্রিয়ানাশী ক্রিয়ার বিশেষণরূপে পাইয়াছি। কিন্তু উহা বস্তুরও বিশেষণ হয়, বিশেষণেরও বিশেষণ হয়। যথা—নাটক্, না-মিষ্ট; না-ভাল, না-মন্দ; না-সাদা, না-কাল; না-ঝাল, না-অম্বল, না-ভাত, না-তরকারি। এ সকল দৃষ্টান্তে না উভয় পদকেই নস্যাৎ করিতেছে। এককে নস্যাৎ করিয়া অপরকে বাহাল করিবার ইচ্ছা থাকিলে প্রশ্ন হয়,—ভাল, না, মন্দ? সাদা, না, কাল? আম, না, জাম? রাম, না, শ্যাম? ঐরূপ উভয় ক্রিয়ার মধ্যে এককে নস্যাৎ করিবার চেষ্টায়—যাবেন, না, থাকিবেন? খেতে হবে, না, ঘুমাতে হবে? যাবেন, না, যাবেন না? এখানে না স্পষ্টতঃ অথবা, কিংবা, এই-রূপে অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। যাবে, না, যাবে না? ইহার সহিত তুল্যমূল্য—যাবে, কিংবা যাবে না? যাবে কি যাবে না? অথবা আরও সংক্ষেপে—যাবে কি না?

তুমি যাবে, না, আমি যাব? আমি ফলারে যাব, তুমি পূজো করবে? না, তুমি পূজো করবে, আমি ফলারে যাব?—এই সকল প্রশ্নেও উভয় সঙ্কল্পের মধ্যে একটাকে নষ্ট করিয়া অন্যটিকে রাখিবার চেষ্টা রহিয়াছে। না এখানেও আপনার নষ্টামি ছাড়ে নাই। এখানেও না অর্থে অথবা।

দাদা না কি? এই সংশয়ের তাৎপর্য্য, অন্য কেহ নহে ত।

আমিই করি না কেন! তুমিই যাও না! তিনিই করুন না! এই সকল প্রশ্নে মনে হইতে পারে, না যেন তাহার নষ্টামি ছাড়িয়াছে। তিনিই করুন না—ইহার অর্থ, তিনিই করুন। কি আশ্চর্য্য! অকস্মাৎ না'য়ের এই ধর্ম্মজ্ঞান আসিল কোথা হইতে? তলাইয়া দেখিলে বোধ হইবে, না'য়ের এই মতিপরিবর্ত্তনের ভিতরেও

একটু গুপ্ত দুরভিসন্ধি আছে। তিনিই করুন না—ইহার গুপ্ত অর্থ, অন্যের করিয়া কাজ নাই। এক জনকে অপদস্থ করিয়া, তাহার অধিকার কাড়িয়া লইয়া, অপরকে কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইতেছে। রামই খান না, ইহাতে প্রকাশ্যে রামের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ, কিন্তু অপ্রকাশ্যে শ্যামের, রাখালের ও পাঁচকড়ির প্রতি ঘোর নির্দ্দয় আচরণ। তাহাদিগকে ভোজন ব্যাপারে নস্যাৎ করা হইল।

না তাহার সেই নস্যাৎ করিবার প্রবৃত্তি, তাহার দুরভিসন্ধি, ক্রমশঃ গূঢ় করিয়া একবারে নিরীহ ভালমানুষের বেশেও দাঁড়াইতে পারে। সেখানে না যেন একবারে হাঁ।

যথা—গেলেনই না=গেলেনই বা, করিলেনই না=করিলেনই বা। যা'ক না গোল্লায়=গোল্লায় যাক, গোল্লায় যাইতে দাও।

করই না=কর; খাও না=খাও। না চিরকাল ভ্রূকুটী দ্বারা নিষেধ করিয়া আসিতেছিল। এই সকল দৃষ্টান্তে বিশেষ জোরের সহিত ও জেদের সহিত আদেশ ও অনুরোধ জানাইতেছে।

"অশ্রু ঝরে কার? না, যার হৃদয় আছে; মনুষ্য কে? না, যে হৃদয়বান্।" এ সকল দৃষ্টান্তেও না নিরীহ উদাসীন; যেন উহার স্বাভাবিক অর্থ একবারে পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু তথাপি উহার কটাক্ষ-প্রান্তে একটু নষ্টামির দীপ্তি যেন বাহির হইতেছে।

না'র নিকট-সম্পর্কের আর দুইটি শব্দ আছে? নাই ও নহে।

নাই'য়ের দুইটা প্রয়োগ পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। তিনি নাই বা গেলেন—এ স্থলে নাই=না-ই; উহা বলবত্তর না মাত্র। দ্বিতীয় প্রয়োগ—তিনি যান নাই, আমি যাই নাই। এ সকল স্থলে নাই বর্ত্তমান ক্রিয়াকে অতীতে ফেলিয়া, পরে তাহাকে নস্যাৎ করিতেছে। সাহিত্যের ভাষার নাই লোকমুখে নি আকারে বাহির হয়। যথা, আমি যাই নি; তুমি যাও নি, সে বলে নি।

নাই পদের তৃতীয় প্রয়োগ আছে, উহাই উহার বিশিষ্ট প্রয়োগ। সংস্কৃত অস্তি শব্দ হইতে বাঙ্গালা আছে আসিয়াছে। কিন্তু এই আছে ক্রিয়া অন্যান্য ক্রিয়ার দল-ছাড়া; ইহার আচার-আচরণ কি রকম সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। করা ক্রিয়ার কত রূপ! করি, করিতেছি,

করিলাম, করিয়াছি, করিয়াছিলাম, করিতাম, করিতেছিলাম, করিব, করিয়া থাকি, করিয়া আসিতেছি, করিতে হয়, করিতে হইবে, করা হইবে, করা যাইবে, করিয়া ফেলিব, করিতে, করিলে, করিয়া, করিবার ইত্যাদি। এইরূপ খাওয়া, পরা, শোয়া প্রভৃতি ক্রিয়ারও নানা রূপ। কিন্তু এই দল-ছাড়া আছে ক্রিয়া কেবল বর্ত্তমানে আছি, অতীতে ছিলাম, এই দুইটি মাত্র রূপ গ্রহণ করে। পদ্যে ছিল স্থলে আছিল প্রয়োগ দেখা যায় বটে—যথা, "আছিল দেউল এক অপূর্ব্ব গঠন"। কিন্তু গদ্যে ঐরূপ প্রয়োগ নাই। ইহার ভবিষ্যৎ রূপ পর্য্যন্ত নাই। অতীতের ছিলাম আগে পিছে না' লয়;—ছিলাম না, না ছিলাম; কিন্তু বর্ত্তমান আছি কেবল আগে না' লইতে পারে, না আছি; কিন্তু 'আছি না' এরূপ প্রয়োগ অপ্রচলিত। যেখানে আছি না বলা উচিত, সেখানে বলিতে হয় নাই। আছি অর্থে অস্তি; নাই অর্থে নাস্তি। ইহা কেবল বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ। পুরুষভেদে ইহার বিকার নাই,—আমি নাই, তুমি নাই, তিনিও নাই। বলা বাহুল্য, যাই নাই, খাই নাই, করি নাই প্রভৃতির নাই এবং আমি নাই, তুমি নাই প্রভৃতির নাই এক নাই নহে। ছন্দোবদ্ধ পদ্যে নাই রূপান্তরিত হইয়া নাহি হইয়া যায়, "কাঞ্চন থালি নাহি আমাদের"। খাঁটি না'-রও পদ্যের ভাষায় একটা হি যোগ করা রোগ আছে—যথা "বাঙ্গালীর রণবাদ্য বাজে না বাজে না। বঙ্গদেশে নাহি হয় সমর-ঘোষণা"। এ স্থলে নাহি হয়=হয় না। নাহি আবার ক' যোগ করিয়া নাহিক (নাইক) রূপ গ্রহণ করেন। যথা—"অন্ন নাহিক জুটে"। এখানে নাহিক জুটে=জুটে না।

নাই'-এর আর একটা চতুর্থ প্রয়োগ আছে,—যথা, করিতে নাই, খাইতে নাই, মারিতে নাই। খাইতে নাই=খাইতে হয় না=খাওয়া অনুচিত। এ স্থলে করিতে, খাইতে, মারিতে প্রভৃতি পদগুলি ইংরেজী infinitiveএর মত—বিশেষ্য পদের মত—উহারা যেন নাই ক্রিয়ার কর্ত্তা। খাইতে হয় এবং তাহার উলটা খাইতে নাই—যথাক্রমে বিধি ও নিষেধ বুঝায়।

না'য়ের অপর কুটুম্ব নহে। এ একটি অদ্ভুত ক্রিয়াবাচক পদ আমি নহি (নই), তুমি নহ (নও); সে নহে (নয়); তিনি নহেন (নন্)। সমস্তই বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ। অতীতে বা ভবিষ্যতে প্রয়োগ দেখি না; পদ্যে নহিব কদাচিৎ দেখা যায়। সংস্কৃত ভূ-ধাতু প্রাকৃতের ভিতর দিয়া বাঙ্গালা হওয়া ক্রিয়াতে উপনীত হইয়াছে। না-যুক্ত হওয়া হইতে সম্ভবতঃ নহি'র উৎপত্তি। মারা, ধরা ও রাখা'র মত নহা প্রচলিত দেখি না।

নিকট-সম্পর্কের আর একটি শব্দ নহিলে (নইলে) সম্ভবতঃ না হইলে=নহিলে। সংস্কৃত বিনা শব্দ সাহিত্যে আছে, লোকমুখে বিনা অর্থে নইলের ব্যবস্থা। উহাকে বাঙ্গালা অব্যয়ের শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। দিয়া, চেয়ে, থেকে, হইতে প্রভৃতির সঙ্গে এক শ্রেণীতে বসিবে। ঘুমাও, নইলে (ঘুম না হইলে) অসুখ হবে,—এ স্থলে নইলে=নতুবা।

আর একটি ক্রিয়াপদ আছে, নারি=পারি না;—আমি নারি, সে নারে। ইহার প্রয়োগ পদ্যেই বেশী, কদাচিৎ লোকমুখে। গদ্য-সাহিত্যের ভাষায় প্রয়োগ দেখা যায় না। নারিল, নারিব, নারিছে প্রভৃতি রূপের ভূরি প্রয়োগ মাইকেল মধুসূদন করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত

['সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র অষ্টম ভাগের তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের আলোচনা করেন। ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করেন। আমি সে সময়ে পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্যরূপে আমি যে কয়টি কথা লিখিয়াছিলাম, তাহাই এ স্থলে প্রকাশ করা গেল।]

খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের অর্থ বিচারকালে ও ব্যুৎপত্তি বিচারকালে কোন একটা প্রদেশের উচ্চারণ ধরিয়া বিচার করিতে গেলে চলিবে না। সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর শব্দের অধিকাংশই কোনরূপ প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন। সেই প্রাকৃত উচ্চারণ কি ছিল, তাহা এখন বলা কঠিন। হয়ত কোন স্থানে পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ সেই মূল উচ্চারণের নিকটবর্ত্তী; কোন স্থানে হয়ত পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণ অধিক নিকট। বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণ একত্র মিলাইলে সেই মূল উচ্চারণ ধরা পড়িতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। মনে কর জালিয়া শব্দ; জেলে লিখিলেও ইহার ঠিক চলিত উচ্চারণ প্রকাশ পায় না; কেহ হয়ত জে'লে এইরূপ লিখিয়া, অর্থাৎ মাঝে একটা (') চিহ্ন দিয়া, উহার উচ্চারণ প্রকাশ করিতে চাহিবেন। প্রদেশভেদে ইহার উচ্চারণ জ'লা বা জা'লা। সম্ভবতঃ মূল শব্দ জালিক। সংস্কৃত ক' প্রাকৃতে অ' হইয়া যায়। বাঙ্গালায় আবার শব্দের অন্ত্য স্বরটা দীর্ঘ হইয়া থাকে। তাহা হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা জালিআ হওয়াই সম্ভব। প্রাচীন পুঁথির সাক্ষ্য এই অনুমানের পক্ষে। প্রাচীন জালিআ আধুনিক কালে প্রদেশভেদে জে'লে জা'লা প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। অন্ত্য স্বর অর্থাৎ আ' যে লোপ পাইয়াছে, তাহা আধুনিক ট্যারচা উচ্চারণেও প্রকাশ পায়; সেই লোপটা বুঝাইবার জন্য মাঝে একটা স্বরলোপের চিহ্ন (') দিতে হইতেছে। ফলে এই শ্রেণীর শব্দের চলিত উচ্চারণ প্রদেশভেদে ভিন্ন; বানান দ্বারা সেই উচ্চারণের ভেদের ঠিক প্রকাশ চলে না। এই গোলযোগ হইতে অব্যাহতির জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত তাঁহার বাঙ্গালা

শব্দের তালিকায় ই অ া প্রত্যয় দিয়া 'জ া লি অ া' এইরূপ বানান করিয়াছেন। তাহার কারণ যে, এইরূপ লিখিলে কোন প্রদেশ-বিশেষের প্রতি পক্ষপাত হইবে না, এবং মূল অর্থাৎ প্রাচীন উচ্চারণের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারিবে।

সম্প্রতি যে সকল লেখক এই সকল শব্দ লইয়া আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা আপন আপন প্রদেশের চলিত উচ্চারণ ধরিয়াই আলোচনা করিলে ভাল হয়। তাহা হইলে ভ্রমের আশঙ্কা অধিক থাকিবে না, এবং বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণ মিলাইয়া প্রাচীন উচ্চারণটার নিকটে পৌছিবারও সুবিধা হইবে। মূল উচ্চারণটি যত ক্ষণ না পাওয়া যাইবে, তত ক্ষণ প্রত্যয়টি কি, ঠিক জানা যাইবে না। প্রত্যেক শব্দের যতগুলি প্রাদেশিক উচ্চারণ, ততগুলি প্রত্যয় নির্দ্ধারণ করিলে চলিবে না। মূল উচ্চারণ বাহির করিয়া মূল প্রত্যয় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে; তার পর সেই মূল বাঙ্গালা প্রত্যয় কোন্ প্রাকৃত বা সংস্কৃত প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে, তাহা স্থির হইবে।

মি ঠা, তি তা, উ চা—এখানে মূল প্রত্যয় স্পষ্টতই আ'। বাঙ্গালা বিশেষণ শব্দের আকারান্ত হওয়াই স্বভাব। এ কথা আমি ব্যোমকেশ বাবুকে এক সময় বলিয়াছিলাম; তিনি তদনুসারে আকারান্ত বাঙ্গালা বিশেষণ শব্দের একটা তালিকা পরিষৎ-পত্রিকায় বাহির করিয়াছিলেন। যখন শেষ অক্ষরটা যুক্ত অক্ষর ভাঙ্গিয়া উৎপন্ন হয়, তখন একটা আ-কার আসিয়া বসে। মি ষ্ট তি ক্ত উ চ্চ এই তিনের যুক্ত বর্ণ ভাঙ্গিয়া আ-কার আসিয়াছে; সেই আ-কার মোলায়েম হইয়া এ' উ' প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে ও বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধরিয়াছে। সি ধা যদি শু দ্ধ হইতে আসিয়া থাকে, তবে এখানেও ঐ কথা। ন্যু লো কোথা হইতে আসিল, তাহা জানি না; কিন্তু ইহার প্রত্যয় যে বাঙ্গালার প্রচলিত আ' সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আ' মোলায়েম হইয়া ও' হইয়াছে মাত্র।

স্বার্থে ক' বাঙ্গালায় আ' হইয়াছে: ইহার অর্থ এই যে, বাঙ্গালা আ' প্রত্যয় সংস্কৃত ক' হইতে উৎপন্ন। ক' মাত্রকেই যে আ' হইতে হইবে, এমন নহে। শৌ ণ্ডি ক এখন শুঁ ড়ি বা শু ড়ী; ক' এখানে লুপ্ত; কিন্তু প্রাচীন মূর্ত্তি শুঁ ড়ি অ া বা শুঁ ড়ি অ ছিল কি না, তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। হিন্দীর সাক্ষ্য এখানে প্রামাণিক হইতে পারে। স্বার্থে ক' ও ক্ষুদ্রার্থে বা অল্পার্থে ক,' এই দুই ক-কারে অধিক প্রভেদ নাই।

বাঙ্গালাতে দুই ক'ই আ-কারে পরিণত হইয়াছে। পাগলা, বামনা, এমন কি, রামা, শ্যামা, হ'রে (=হরিআ) প্রভৃতির আ-কার ক্ষুদ্রার্থ ক' বা অবজ্ঞাবাচী ক' হইতে উৎপন্ন।

মাটিয়া, বালিয়া প্রভৃতি শব্দ এবং জঙ্গলিয়া প্রভৃতি শব্দ এক পর্য্যায়ে ফেলা চলিবে না। মাটি ও বালি, ইহাদের ই-কার প্রত্যয়ের ই-কার নহে। মৃত্তির ই-কার মাটি'তে বর্ত্তমান; বালু'র উ-কার বালি'তে ই-কারে পরিণত। কিন্তু জঙ্গলিয়া'র ই-কার প্রত্যয়ের ই-কার; এবং এই প্রত্যয় ইয়া=ইআ না লিখিয়া ই+আ লেখাই সঙ্গত। বিশেষ্য জঙ্গল হইতে বিশেষণ জঙ্গলি (জঙ্গলবাসী); তাহাই আবার স্বার্থে জঙ্গলিআ; শেষ পরিণতি জঙ্গুলে। এখানে আ' বোধ করি ক' হইতে উৎপন্ন। আর যদি সংস্কৃত ইক (ষ্ণিক) হইতে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ই+আ না হইয়া ইআ হইবে। মাটিয়া বালিয়া ইহাদের আ' বিশিষ্টার্থবাচী, স্বার্থবাচী নহে; তাহাদের মূলও সম্ভবতঃ পৃথক্।

দেনা=যাহা দিতে হইবে

পাওনা=যাহা পাওয়া যাইবে

খেলনা=যাহা দ্বারা খেলা যায়

বাটনা=যাহা বাঁটা যায়

বাজনা=যাহা দ্বারা বা যাহা বাজান যায়

ঢাকনা=যাহা দ্বারা ঢাকা যায়

এই সমুদয়কে এক শ্রেণীতে ফেলা চলিবে না। শেষ শব্দ চারিটির না বোধ করি সংস্কৃত অন (=অনট্) প্রত্যয়ের সম্পর্ক রাখে। সেখানে প্রত্যয়কে 'না' না বলিয়া 'অন+আ' বলা উচিত। কিন্তু দেনা পাওনার না' কোথা হইতে আসিল? শুক্‌না'র না'রও বোধ করি অন্য মূল।

ই প্রত্যয়ের নানা অর্থভেদ। নানা অর্থে প্রযুক্ত ই প্রত্যয় বিভিন্ন মূল হইতে উৎপন্ন। আবার ই' লিখিব, কি ঈ' লিখিব, তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত। দিদিতে আপত্তি নাই, কিন্তু মাসি লিখিব, কি মাসী লিখিব, মামি লিখিব, কি মামী লিখিব, ইহা লইয়া উভয় পক্ষে বাগ্‌যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। এই বিবাদ কলুনী, মালিনী

প্রভৃতির নী'তেও উঠিয়াছে। উভয় পক্ষেই যুক্তি আছে। আমি মীমাংসায় অক্ষম।

তবে নবাবী, মাষ্টারী, জমীদারী, ওকালতী প্রভৃতির ঈ'কে ই-কারে পরিণত করিবার সময় বোধ হয় যায় নাই। এরূপ দৃষ্টান্তে অকারণে ঈ-কারের বোঝা বহিয়া লাভ কি?

খাঁটি বাঙ্গালায় যখন হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণভেদ নাই, তখন খাঁটি বাঙ্গালা লিপিমালায় উহাদের একটাকে বিসর্জ্জন দিলে হানি কি? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত তালিকা দেখিলে বোধ হয় যে, তিনি এইরূপ বিসর্জ্জনের পক্ষপাতী ছিলেন।

রবি বাবু যে সকল প্রত্যয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া দুই তিন ভাগ করিয়াছেন, তাহার কারণ এখন বুঝা যাইবে। কলিকাতার উচ্চারণ বা কোন প্রাদেশিক উচ্চারণ ধরিলে ঐরূপ খণ্ডীকরণের হেতু না পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অর্থ ধরিয়া মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে ঐরূপে ভাঙ্গা আবশ্যক, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। ব্যোমকেশ বাবু যে সকল নূতন প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়াছেন, অর্থ ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, ইহার মধ্যে অনেকগুলিই ঐরূপ বিশ্লেষণযোগ্য। লম্বাই চৌড়াই, এই দুই বিশেষ্য পদ লম্বা চৌড়া এই দুই বিশেষণ পদে ই-কার যোগে উৎপন্ন; এখানে প্রত্যয় ই; আই নহে। কিন্তু বাছাই=বাছ+আ+ই। বাছ ধাতু হইতে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বাছা; স্বার্থে বাছাই। আবার ঢাকাই=ঢাকা+ই (ঢাকাতে উৎপন্ন); এখানে ই' প্রত্যয়ের অন্য অর্থ। ব্যোমকেশ বাবুর দত্ত দৃষ্টান্তগুলি অনেক স্থলে এইরূপ বিশ্লেষণসাপেক্ষ।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ

সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ব্যাকরণ আলোচনার ফলে সাহিত্য-সমাজে অনেকের মনে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। অনেকে ভাবিতেছেন, বুঝি বা বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধিনাশই এক দল লেখকের অভিপ্রায়। বাঙ্গালা-ব্যাকরণঘটিত কয়েকটি প্রবন্ধ পরিষৎ-সভায় পঠিত বা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের দুই জন সহকারী সভাপতি, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অগ্রণী হইয়া এই আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের লিখিত প্রবন্ধগুলিতে চলিত বাঙ্গালা শব্দগুলির সংগ্রহ ও আলোচনা হইয়াছে। এই শ্রেণীর শব্দের একটি তালিকা, যাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। পত্রিকা-সম্পাদক নগেন্দ্র বাবুও এই শ্রেণীর শব্দ সংগ্রহের জন্য পাঠকগণকে আহ্বান করিয়াছেন।

এই সকল শব্দের অধিকাংশই চলিত ভাষায় অর্থাৎ কথাবার্ত্তার ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তাহাদের অনেকেরই সাধুভাষায় অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষায় সম্প্রতি স্থান নাই। হয়ত তাহাদের মধ্যে অনেক শব্দ এরূপ আছে, যাহা প্রকৃতই slang, অর্থাৎ ভদ্রসমাজে কথাবার্ত্তায় বর্জ্জনীয়। এই সকল 'অসাধু' শব্দের আলোচনা সকলের প্রীতিকর হয় নাই।

সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান সম্পাদক ব্যাকরণবিষয়ে অব্যবসায়ী; উপস্থিত বিতণ্ডায় আমার কোন কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু যখন 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' এই আন্দোলন উপস্থিতির জন্য বিশেষতঃ দায়ী, তখন পরিষৎ-সম্পাদকেরও আত্মসমর্থন স্বরূপে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। পরিষৎ-পত্রিকার দ্বারা যদি ভাষার বিশুদ্ধিহানি বা সৌষ্ঠবহানি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে পত্রিকার সেই দোষ মার্জ্জনীয় হইবে না। অতএব যখন এরূপ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহার কোন মূল আছে কি না দেখা আবশ্যক, এবং যদি মূল থাকে, সর্ব্বতোভাবে তাহার উৎপাটন বাঞ্ছনীয়।

সৌভাগ্যক্রমে এই আতঙ্কের কোনই মূল নাই। বাদী ও প্রতিবাদী যাঁহারা বিতণ্ডায় যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই

বোধ হইবে, ইহার কোন মূল নাই। সাহিত্য-পরিষদে উত্থাপিত মূল প্রস্তাবে সকলেই একমত; একমত না হইয়া উপায় নাই। অথচ সম্পূর্ণ ঐকমত্য সত্ত্বেও অবান্তর প্রসঙ্গ বহু পরিমাণে উপস্থিত হইয়া একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে।

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিতণ্ডায় বুঝি ইহাই সনাতন নিয়ম।

আমাদের সাহিত্য-সমাজের সুধীগণ স্থূলতঃ দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এক পক্ষ সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগী; তাঁহারা সাহিত্যের ভাষায় ও লৌকিক ভাষায় পার্থক্য বজায় রাখিতে, এমন কি, সেই পার্থক্য বাড়াইতে চাহেন। লৌকিক ভাষাকে তাঁহারা কতকটা কৃপার ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন; লৌকিক ভাষা নইলে সংসারযাত্রা চলে না, তাই লৌকিক ভাষাটা চলুক। কিন্তু সাহিত্য তাহার আক্রমণ হইতে ঊর্দ্ধে অবস্থান করুক, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। লৌকিক ভাষাটা গৃহকর্ম্মে ও সংসারযাত্রায় আবশ্যক হইলেও সাহিত্যক্ষেত্রে উহাকে প্রশ্রয় দিতে নাই। সে সকল খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ লৌকিক ভাষার সম্পত্তি, উহা সংস্কৃতমূলক হউক আর দেশজই হউক, উহাদের যথাসাধ্য বর্জ্জন কর, নতুবা সাহিত্যের ভাষা সাধু ভাষা হইবে না।

অপর পক্ষ সাহিত্যের ভাষা ও লৌকিক ভাষার মধ্যে এই পার্থক্য রাখিতে চাহেন না। ইহারা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বিরূপ। ইহাদের প্রধান যুক্তি যে, ভাষার উদ্দেশ্যই যখন লোকশিক্ষা, তখন যে ভাষায় লোকশিক্ষা সুচারুরূপে সাধিত হয়, তাহাই সার্থক ভাষা। যে ভাষা কেবল পণ্ডিতেই বুঝিবে, আর মূর্খে বুঝিবে না, সে ভাষার অস্তিত্ব অজাগলস্তনের ন্যায় নিরর্থক। কাজেই সাহিত্যের জন্য একটা দুর্ব্বোধ্য ভাষা এবং দৈনিক ব্যবহারের জন্য আর একটা সুবোধ্য ভাষা, এই দুই ভাষা রাখবার দরকার নাই।

উভয় পক্ষের যুক্তিতেই কিছু-না-কিছু সত্য আছে; এবং বোধ করি, উভয় পক্ষ ত্যাগ করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিলেই শ্রেয়ঃ হইতে পারে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসই কতকটা এইরূপ মধ্যপথ অবলম্বনের সমর্থক। প্রাচীন সাহিত্য সাধারণ লোকের জন্য লিখিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস ও রামপ্রসাদ সর্ব্বসাধারণের জন্যই তাঁহাদের কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বিশাল বৈষ্ণব-সাহিত্যও সর্ব্বসাধারণের জন্যই লিখিত হইয়াছিল। সে-কালের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত-সাহিত্যের মাহাত্ম্যে

মুগ্ধ ছিলেন; প্রাকৃত ভাষার প্রতি তাঁহাদের বিরূপ থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহারা বাঙ্গালা স্পর্শ করিতেন না। কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতেন, তাঁহারা সাধারণের জন্যই লিখিতেন, এবং সবল লৌকিক ভাষাতেই যথাসাধ্য লিখিতেন। প্রাদেশিক শ্রোতার ও পাঠকের জন্য লিখিত হইত বলিয়া উহা প্রাদেশিকত্ববর্জ্জিতও হইত না।

ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের ছাত্রদের জন্য প্রাদেশিকত্ববর্জ্জিত সাধু বাঙ্গালা পুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছিল। যে সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই সময়ে বাঙ্গালা রচনার ভার লইয়াছিলেন, তাঁহারা সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ দ্বারা একটা নূতন ভাষারই যেন সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। উহা সাধু ভাষা হইল বটে ও সর্ব্বতোভাবে প্রাদেশিকত্বরহিত হইল বটে, কিন্তু সাধারণের বোধ্য হইল না। প্রধানতঃ উহা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যাভিমান স্ফীত করিবার জন্য বর্ত্তমান রহিল।

অতঃপর যাঁহারা বঙ্গভাষার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গালায় গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিতগণকে অগ্রণী দেখিতে পাই। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামকমল ভট্টাচার্য্য, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতির নাম এই ব্যাপারে স্মরণীয় হইয়াছে। ইঁহাদের অনেকের ভাষায় যে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের জন্য এই সকল মনস্বী ব্যক্তি যথেষ্ট বিদ্রূপ ও তিরস্কারের ভাগী হইয়াছেন; কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্ত্তমান গদ্য-সাহিত্যের ভাষার ইঁহারা জন্মদাতা না হইলেও ভাষার শৈশব কালে বিনয়াধান রক্ষণ ও ভরণের জন্য ইঁহারাই সর্ব্বতোভাবে পিতৃস্থলীয় ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম এতন্মধ্যে অগ্রগণ্য।

সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃতশব্দবাহুল্য সম্বন্ধে দুই মত থাকিবারই কথা; এবং এক পক্ষ অপর পক্ষ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবেন, তাহাও অসঙ্গত নহে। কিন্তু একটা কথা আমরা ভুলিয়া যাই। গদ্যরচনায় বাক্যবিন্যাসের ও বাক্যমধ্যে পদবিন্যাসের রীতি, ইংরেজীতে যাহাকে syntax বলে, সেই পদবিন্যাসরীতির সংস্কার এই সকল পণ্ডিতের প্রতিভা হইতেই ঘটিয়াছিল; এবং এই মার্জ্জিত বাক্যবিন্যাস ও পদসন্নিবেশ-রীতি ব্যতীত উত্তর কালে বাঙ্গালায় গদ্যরচনা উৎকর্ষ লাভ করিত না। ইহার ক্রটিতেই রাজা

রামমোহন রায়ের রচনা হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে নাই; এবং এই জন্যই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির সারগর্ভ সন্দর্ভসকলও সাধারণের নিকট স্থায়ী সমাদর পায় নাই।

পক্ষান্তরে টেকচাঁদ ঠাকুরের ও হুতোমের বাঙ্গালা লৌকিক বাঙ্গালা হইতে অভিন্ন; কিন্তু উহাও যে সর্ব্বত্র সাহিত্যের বাঙ্গালা হইতে পারে না, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হইয়া গিয়াছে।

উত্তর কালের লেখকগণ মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া যে সাহিত্যের ভাষা প্রচলিত করিয়াছেন, তাহাই এখন সর্ব্বত্র গৃহীত ও আদৃত হইয়াছে। এই মধ্যপথ আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালা ভাষার ক্ষমতা যে কত দূর-প্রসারী হইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছে।

ফলে সাহিত্যের ভাষা কোন্ পথ আশ্রয় করিয়া চলিবে, তাহা কার্য্যতঃ মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে; এ বিষয় লইয়া এখন বাদবিতণ্ডা কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। তবে প্রাণবানের প্রাণের স্ফূর্ত্তি অন্য কাজ না পাইলে ক্রীড়াচ্ছলেও আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়; তাই আমাদের সুধীগণের পাণ্ডিত্য যখন অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইবার অবকাশ পায় না, তখন এই ক্রীড়া-বিতণ্ডার আশ্রয় লইয়া আপনার ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রকাশ করে মাত্র। বর্ত্তমান কালে সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ কিরূপে ও কি পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে, এ বিষয়ে কার্য্যতঃ যে বিশেষ মতভেদ আছে, তাহা বোধ হয় না; কেন না, উভয় পক্ষই প্রয়োগকালে এক শ্রেণীর ভাষারই ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে সামান্য প্রভেদ থাকে, তাহা ব্যক্তিগত। তবে যে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে দুই দলে সাজিয়া যুদ্ধার্থ দাঁড়ান, তাহা প্রকৃত যুদ্ধ নহে, যুদ্ধের অভিনয় মাত্র।

সম্প্রতি সংস্কৃত কালেজের পুরাতন ছাত্র ও বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বগামীদের অপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের জন্যই যেন সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত-শব্দ প্রয়োগের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ব্যাকরণসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন, খাঁটি বাঙ্গালা 'তেল' শব্দ ব্যবহার করিলে যখন সকলেই বুঝে, এবং লৌকিক প্রয়োগে যখন সর্ব্বদা 'তেল' শব্দেরই ব্যবহার আছে, তখন সাহিত্যের ভাষায় 'তৈল' ব্যবহার করিয়া লেখকের ও মুদ্রাকরের পরিশ্রম অকারণে বাড়ানতে লাভ কি?

আমরাও বলি, ঠিক কথা; অকারণে ভাষাকে দুর্ব্বোধ্য করিয়া লাভ কি? অথবা অকারণে পরিশ্রম বাড়াইবারই বা সার্থকতা কি? 'তেল' শব্দ অশ্লীলও নহে, অশ্রাব্যও নহে; ভদ্রসমাজে উহার ব্যবহারে কেহ কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না; সুতরাং আমরা সাহিত্যের ভাষাতেও তেলই ব্যবহার করিব। তবে যদি কেহ স্থলবিশেষে লালিত্যের বা সৌষ্ঠবের অনুরোধে 'তৈল' শব্দেরই ব্যবহার করিয়া ফেলেন, তাহাতেও তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইব না।

কেন না, সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা হইলেও উহার আর একটা উদ্দেশ্য আছে; উহাকে রসসৃষ্টি বলা যাইতে পারে। সাহিত্যের একটা অংশ আছে, তাহা সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে; উহা গুণীর জন্য ও অভিজ্ঞের জন্য ও কলাবতের জন্য ও সমজদারের জন্য। শেক্সপীয়রের কাব্য সর্ব্বসাধারণের জন্য লিখিত হয় নাই; সর্ব্বসাধারণ উহার রসবত্তা আস্বাদনে অধিকারী নহে। কালিদাস তাঁহার কাব্যগ্রন্থ-সকল তৎকালে অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছিলেন; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সমজদারের জন্য রসসৃষ্টি। কুমারসম্ভবের "ইয়ং মহেন্দ্রপ্রভৃতীনধিশ্রিয়শ্চতুর্দ্দিগীশানবমত্য মানিনী" ইত্যাদি শ্লোকসপ্তক যত বার পড়িয়াছি, কি কারণে জানি না, আমার অন্তরিন্দ্রিয় মোহগ্রস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ কয়েকটি শ্লোকে বিশেষ কোন ভাবগাম্ভীর্য্য আছে কি না, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু ইহার ললিতগম্ভীর পদবিন্যাসজাত ধ্বনি যে এই মোহোৎপত্তির একটা প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ করি না।

সাহিত্যের একাংশের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি; আধুনিক বাঙ্গালা লেখকগণ মুখ্যতঃ রসসৃষ্টির জন্য সংস্কৃতশব্দসম্পত্তির সাহায্য লইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, সুনির্ব্বাচিত ও সুবিন্যস্ত সংস্কৃত শব্দের যেমন উন্মাদনা আছে, তাহা প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দের নাই। ইহার মূল অনুসন্ধান বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন; সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক উৎকর্ষ ইহার মুখ্য কারণ হইতে পারে; কিন্তু আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, এমন কি, আমাদের জাতীয় প্রকৃতি ও জাতীয় ইতিহাস প্রভৃতির সহিত অন্যান্য কারণ জড়িত আছে, সন্দেহ নাই।

সুতরাং সাহিত্যের ভাষার বলবিধানার্থ ও সৌষ্ঠবসাধনার্থ সংস্কৃতশব্দসম্পদের গৌরব আছে ও চিরকালই থাকিবে, তজ্জন্য ক্ষুব্ধ কিংবা দুঃখিত

হইবার কিছু মাত্র কারণ নাই। সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের দ্বার আমাদের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। অকুণ্ঠিতভাবে সেই ভাণ্ডার লুঠ করিয়া আমাদের বাঙ্গালা ভাষার শরীরে অলঙ্কার পরাও, কেহই চৌর্য্যবৃত্তির জন্য দণ্ডিত করিবে না।

কিন্তু এইখানে একটু তর্ক আসিয়া পড়িবে। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ দ্বারা ভাষার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য সাধিত হইতে পারে না, ইহা স্বীকারে অনেকে কুণ্ঠিত হইবেন। ইংরেজী দৃষ্টান্ত সম্মুখে আছে। অনেক ইংরেজী লেখক ভাষার সৌষ্ঠবের জন্য মুখভরা, গালভরা বিজাতীয় লাটিন শব্দের বহুল ব্যবহার করিয়াছেন; প্রচলিত দৃষ্টান্ত জনসনের ভাষা। কিন্তু অনেকে আবার খাঁটি ইংরেজী, যাহাকে নিতান্ত homely আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, এরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়াও মধুর ললিত সুন্দর রচনা করিয়াছেন। ইংরেজী বাইবেলের ভাষা, যাহাতে গালভরা লাটিন শব্দের স্থান নাই বলিলেই চলে, সৌষ্ঠবে ও সৌন্দর্য্যে সেই ভাষা ইংরেজী সাহিত্যে অদ্বিতীয় লাটিন শব্দের আড়ম্বর না থাকিলেও টেনিসনের লকসি হলের ভাষায় ছন্দের ধ্বনি কানে মেঘগর্জ্জনের মত বাজিতে থাকে; সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দও অনেক সময় তাহার নিকট হারি মানে। যাঁহারা প্রতিভাবান্, যাঁহারা ক্ষমতাবান্, যাঁহারা ওস্তাদ, তাঁহাদের হাতে ঘোষবান্ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন নাই; চলিত বাঙ্গালা শব্দেরই সাহায্য লইয়া তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে রস সৃষ্টি করিতে পারেন। রসসৃষ্টি কেবল যে শব্দের গুণে হয়, এমন নহে; শব্দ-নির্ব্বাচন ও শব্দ-বিন্যাসের গুণেও হয়। ক্ষমতাশালী লেখকের হাতে সকলই সম্ভব। দৃষ্টান্তও যথেষ্ট আছে। চণ্ডীদাস অথবা কৃত্তিবাস সাধু সংস্কৃত শব্দ অধিক ব্যবহার করেন নাই। তাঁহাদের ভাষায় যাঁহারা রস পাইতে অক্ষম, তাঁহাদিগকে আমরা কৃপাপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় 'ভারতী' পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষা হিন্দী মরাঠী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা হইতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় যথেষ্ট পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ চলে; হিন্দী প্রভৃতিতে চলে না। ভাষার এইরূপ নমনীয়তা আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত শব্দ লইয়া যদি সম্পত্তি বাড়ান চলে ও তাহাতে কোন বিঘ্ন না থাকে, তাহাতে মন্দ কি? কিন্তু অনেকে হয়ত পালটাইয়া বলিবেন, উহা বাঙ্গালা ভাষার দুর্ব্বলতার চিহ্ন। যে ভাষা

অন্য ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ না করিয়া কাজ চালাইতে পারে না, সে ভাষা সেই পরিমাণে দুর্ব্বল। বাঙ্গালা ভাষা যে দুর্ব্বল, তাহার নানা লক্ষণ আছে। বাঙ্গালায় রাগ করা চলে না, গালি দেওয়া চলে না। রাগ করিতে হইলেই আমরা হিন্দীর সাহায্য লই ; ইংরেজীনবিস লোকে ইংরেজী চালান। ইহা বাঙ্গালার পক্ষে উৎকর্ষের চিহ্ন নহে। শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয় এরূপ আবদার করিবেন না যে, সাহিত্যের ভাষায় গালি দিবার কোন কালে প্রয়োজন হইবে না। যদি প্রয়োজন হয়, তখন সংস্কৃতশব্দভূষিত সাধু ভাষা কতটা সফল হইবে, বিবেচ্য বটে। চোরকে ডাকিবার সময় 'ওরে চোর' না বলিয়া 'অরে চৌর' বলিতে পণ্ডিত মহাশয়েরাও কুণ্ঠিত হইবেন।

বিশুদ্ধিবিচারের পূর্ব্বে বিশুদ্ধি কাহাকে বলে, বুঝিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা ভাষায় বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে। সাহিত্যের ভাষাতেও আছে ; কথাবার্ত্তার ভাষাতেও আছে। এই সকল শব্দ খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ; বাঙ্গালা ভাষা তাহা সংস্কৃতের নিকট পাইয়াছে। কতক উত্তরাধিকারসূত্রে অতি পুরাকাল হইতেই দখল করিয়া আসিতেছে ; কতক আধুনিক কালে ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। ঋণগ্রহণ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই অব্যাহত ভাবে চলিবে ; অব্যাহত ভাবে—কেন না, ইহাতে সুদও লাগে না, এবং পরিশোধেরও প্রয়োজন নাই ; উত্তমর্ণের দ্বার উন্মুক্ত ; অধমর্ণেরও আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই।

কিন্তু এই সকল বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত আরও অনেক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান, এইগুলিকে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ বলা যাইতে পারে। এই সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষার শরীরে অস্থিমজ্জায় সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। ইহাদিগকে বর্জ্জনের উপায় নাই। বাঙ্গালা লিখিতেই হউক আর বলিতেই হউক, ইহাদিগকে ত্যাগ করিবার উপায় নাই। বরং যে সকল শব্দ বিশেষ্য বা বিশেষণ-পদরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগের অনেকটা বর্জ্জন চলিতে পারে ; তাহাদিগের স্থলে সংস্কৃত শব্দ বসাইতে পারা যায়। কিন্তু সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদের স্থলে কোনই উপায় নাই। এখানে তাহাদের আশ্রয় লইতেই হইবে ; নতুবা বাঙ্গালা, এমন কি, 'বিশুদ্ধ' বাঙ্গালাও রচিত হইবে না।

"আমি মাছ খাইতেছি," এ স্থলে মাছ'কে মৎস্যে ও খাইতেছি'কে ভোজন করিতেছি'তে রূপান্তরিত করিয়া ভাষাকে 'বিশুদ্ধতর' করা যাইতে না পারে, এমন নহে। কিন্তু এই 'আমি' এবং 'করিতেছি' এই দুয়ের হাত হইতে

অব্যাহতি লাভের উপায় কোন পণ্ডিতই নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন না। কেবল কথাবার্ত্তার সময়েই নহে, বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনার সময়েও অব্যাহতির আশা নাই। অতএব বাঙ্গালা ভাষাতে কতকগুলি শব্দ থাকিবেই, যথা, 'আমি' ও 'করিতেছি,' যাহা সংস্কৃতমূলক বটে, কিন্তু সংস্কৃত নহে, যাহা খাঁটি বাঙ্গালা।

এইরূপ খাঁটি বাঙ্গালা ও খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সমবায়ে আমাদের আধুনিক ভাষা গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালা শব্দরাশিকে এই দুই প্রধান ভাগে সাজাইতে পারা যায়। প্রশ্ন এই যে, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণী 'বিশুদ্ধ' বাঙ্গালা ?

কেহ হয়ত বলিবেন, সংস্কৃত শব্দগুলি বিশুদ্ধ, আর খাঁটি বাঙ্গালা শব্দগুলি অবিশুদ্ধ। এক শ্রেণীর শব্দগুলিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সাধিতে পারা যায় ; এই হিসাবে উহারা বিশুদ্ধ বটে। অন্য শ্রেণীর শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সাধিতে পারা যায় না ; এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু এই হিসাবে কি উহারা অবিশুদ্ধ ? কখনই না। 'আমি' ও 'করিতেছি' সংস্কৃত শব্দ নহে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় উহাদের বিশুদ্ধিপক্ষে কেহ এ পর্য্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত করেন নাই ; কেন না, উহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া কেহই এ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে সমর্থ হন নাই।

কাজেই অসংস্কৃত শব্দও বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় স্থান পাইতে পারে। সংস্কৃত না হইলেই যে বিশুদ্ধ হয় না, এমন নহে।

আবার অন্য পক্ষ বলিবেন, 'আমি' ও 'করিতেছি' এই দুইটি শব্দই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দ ; 'মাছ' ও 'খাইতেছি' এই দুইটাও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দ। কিন্তু 'মৎস্য' ও 'ভোজন' এই দুইটি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা নহে। এমন কি, 'মৎস্য' ও 'ভোজন' এই দুই শব্দ বাঙ্গালাই নহে ; উহা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ; বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উহাদিগকে ধার করিয়াছে মাত্র। এই যুক্তিও ফেলিবার নহে। 'মৎস্য' ও 'ভোজন' শব্দ বর্জ্জন করিয়া বাঙ্গালায়,—বিশুদ্ধ বাঙ্গালায়,—লেখা ও কথা কহা চলিতে পারে, কিন্তু 'আমি' ও 'করিতেছি' ইহাদিগকে বর্জ্জন করিলে কোন বাঙ্গালারই অস্তিত্ব থাকে না।

এই ত গেল সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে। তার পর আছে কথাবার্ত্তার ভাষা। কথাবার্ত্তার ভাষাতেও দুই শ্রেণীর শব্দ বর্ত্তমান আছে ; খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ও খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ। খাঁটি বাঙ্গালা নইলে কথা কহা অসাধ্য

হয়; এবং খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সম্পূর্ণ বর্জ্জনও বোধ করি অসাধ্য। যদি কাহারও সেরূপ দুষ্প্রবৃত্তি থাকে, এক বার বাজি রাখিয়া চেষ্টা করিবেন। বস্তুতঃ কথাবার্ত্তার ভাষাতেও উভয় শ্রেণীর শব্দেরই প্রচলন আছে; তবে উভয়ের সংখ্যার তারতম্য স্থানভেদে ও কালভেদে বিভিন্ন।

প্রভেদ এই যে, কথাবার্ত্তার ভাষায় সর্ব্বত্রই খাঁটি সংস্কৃতের অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালার প্রচলন অধিক। অবশ্য স্থানভেদে ও কালভেদে ইতর-বিশেষের কথা মনে রাখিতেই হইবে। সে-কালের অপেক্ষা বোধ হয় এ-কালে খাঁটি সংস্কৃতের প্রচলন বাড়িয়াছে। বোধ হয় মাত্র, কেন না, নিশ্চয় জানি না। প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা দেখিয়াই ও কালের গতি দেখিয়াই সে-কালের চলিত ভাষার অবস্থা অনুমান করিয়া লইতে হয়। আবার এ-কালেও শিক্ষিতসমাজে ও ভদ্রসমাজে কথাবার্ত্তার ভাষায় যত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়, অশিক্ষিতসমাজে বা নিম্নসমাজে তত হইতে পারে না। আবার পর্দ্দার বাহিরে যত হয়, পর্দ্দার আড়ালে তত হয় না। আবার এক প্রদেশে যত হয়, পণ্ডিতপ্রধান স্থানে যত হয়, পণ্ডিতহীন প্রদেশে তত হয় না। স্থানভেদে ও কালভেদে ও সমাজের স্তরভেদে ও বক্তার সাময়িক অবস্থাভেদে এরূপ ইতরবিশেষ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ হইবারই কথা। এ দেশেও এইরূপ, অন্য দেশেও এইরূপ। ইহা 'সার্ব্বভৌমিক' নিয়ম।

শিষ্টসমাজে সুধীগণ যখন শিষ্ট ভাষায় শিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করেন, তখনও বোধ করি, তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় খাঁটি সংস্কৃত অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালাই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং অশিক্ষিতসমাজে অশিষ্ট লোকে যখন জ্ঞানতঃ অসাধু ভাষা ব্যবহার করে, তখন যে খাঁটি বাঙ্গালারই প্রাধান্য থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। কথাবার্ত্তার ভাষায় খাঁটি বাঙ্গালার প্রাধান্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাঁহারা এ জন্য দুঃখিত, তাঁহারা হয়ত আশা করেন যে, 'প্রাচীনা বঙ্গভূমির এই পুরাতন সমাজের ভবিষ্যতে ঈদৃশ শুভ দিন আগমন করিবেক, যখন নিরক্ষর কৃষকবালক অবাধ্য ধেনুবৎসকে তিরস্কার-কালে সাধুভাষার প্রয়োগ করিবেক, হট্টমধ্যে পণ্যবীথিকাপার্শ্বে উপবিষ্টা মৎস্যজীবিনী কলহব্যপদেশে অসাধ্বী ভাষার প্রয়োগে কুণ্ঠিতা হইবেক, এবং গৌড়ীয় ভাষার কোষগ্রন্থসকল প্রাকৃত শব্দের দুর্ব্বহভারবহনের শ্রমস্বীকারে অব্যাহতি পাইবেক।' কিন্তু যত দিন সেই 'সুদূরপরাহত' শুভ দিন 'উপাগত' না হইতেছে, তত দিন আমাদিগকে ম্লানমুখে স্বীকার

করিতেই হইবে যে, কথোপকথনের ভাষায় 'প্রাকৃত গৌড়ীয়' শব্দের প্রাধান্য থাকিবেই থাকিবে।

এই কথাবার্ত্তার ভাষায় ব্যবহৃত খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের সংখ্যা কত? কেহই বলিতে পারেন না। সংখ্যানিরূপণের চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সংখ্যানিরূপণ অতি বৃহৎ ব্যাপার; কেন না, অসংখ্য প্রাদেশিক শব্দ, যাহা দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই, যাহা সঙ্কীর্ণ প্রদেশমধ্যে আবদ্ধ, তাহাও এই শ্রেণীর মধ্যে আসিবে। আবার অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ, যাহা চাষার ব্যবসায়ে, তাঁতির ব্যবসায়ে, মুদির ও ময়রার ব্যবসায়ে, আদালতে, জমিদারি সেরেস্তায়, এইরূপ নানা স্থানে প্রচলিত, তাহা সেই সেই শ্রেণীবিশেষের মধ্যেই চলিত আছে; অপর সাধারণের নিকট সেই সকল শব্দরাশি পরিচিতও নহে এবং সুবোধ্যও নহে। কিন্তু সেই শব্দরাশিও এই শ্রেণীর বাঙ্গালা শব্দের মধ্যেই আসিবে। এই বিশাল শব্দসমূহের সংখ্যানির্দ্দেশ অল্প জনের বা অল্প দিনের কাজ নহে। বহু কালের ও বহু জনের সমবেত চেষ্টায় এই কার্য্য কতক পরিমাণে সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু এই কার্য্য সুসম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের বাঙ্গালা ভাষার ধাতু কি, মজ্জা কি, শোণিত কি, অস্থি কি, তাহার নিরূপণ হইবে না।

এই শব্দরাশির মধ্যে কতিপয় শব্দ বিদেশ হইতে বিজাতীয় লোকের সংস্রবে বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প না হইলেও সাহিত্যের মধ্যে তুলনায় মুষ্টিমেয়। অবশিষ্ট সমস্ত শব্দ আবার দুই শ্রেণীর। কতক শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত শব্দই কালসহকারে রূপান্তরিত হইয়া ঐ সকল শব্দে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দই একবারে বিকৃত হইয়াছে, অথবা সংস্কৃত শব্দ ক্রমশঃ প্রাচীন প্রাকৃতে ও প্রাচীন প্রাকৃত হইতে আধুনিক প্রাকৃতে বা বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে। এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের মতে সংস্কৃত ভাষা, যাহা পাণিনি প্রভৃতি আচার্য্যেরা আলোচনা করিয়াছেন ও যাহা প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে শরীরবদ্ধ হইয়াছে, সেই সংস্কৃত ভাষা কস্মিন্ কালে জনসমাজে লোকমুখে কথাবার্ত্তার ভাষারূপে প্রচলিত ছিল না। কাজেই তাঁহাদের মতে সংস্কৃত ভাঙ্গিয়া প্রাকৃত বা বাঙ্গালা উৎপন্ন হয় নাই; প্রাচীন কালে প্রচলিত কোন লৌকিক ভাষা বিকৃত হইয়াই প্রাকৃত বাঙ্গালা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। সে বিচারে এখানে প্রয়োজন নাই। প্রাচীন কালে একটা প্রাচীন ভাষা ছিল

সন্দেহ নাই ; সেই ভাষাই কালসহকারে বিকৃত হইয়া প্রাচীন প্রাকৃতে ও আধুনিক প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার কেহ করিবেন না। আমরা যাহাকে সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা শব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহার অধিকাংশই এইরূপে উৎপন্ন।

কিন্তু এই সংস্কৃতমূলক খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ ব্যতীত আর এক শ্রেণীর বাঙ্গালা শব্দ আছে, সংস্কৃতের সহিত তাহার কোন সম্পর্কই নির্ণয় করিতে পারা যায় না ; সংস্কৃত কোন শব্দের সহিতই তাহাদের জাতিগত সম্বন্ধ নাই ; এই সকল শব্দকে দেশজ শব্দ বলা হয়। এই শ্রেণীর শব্দের মূল কি, আমরা জানি না। হয়ত সংস্কৃত শব্দই এত বিকার লাভ করিয়াছে যে, এখন আর তাহাদের চেনা কঠিন। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এইরূপ দেশজস্বরূপে গৃহীত বহু শব্দের সংস্কৃত মূল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি এমন শব্দ অনেক আছে, যাহা প্রকৃতই দেশজ অর্থাৎ যাহা সংস্কৃতের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না।

হইতে পারে যে, বাঙ্গালা দেশে অনার্য্য, মোগল, দ্রাবিড় বা অন্য কোন বংশের আদিম নিবাসী যাহারা ছিল, তাহাদেরই ভাষা হইতে এই সকল শব্দ গৃহীত হইয়াছিল। আর্য্যাধিকারের সহিত তাহাদের অস্তিত্ব আর্য্যগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। হয়ত এখনও নিম্নশ্রেণীর লোকের ভাষা ও আরণ্য ও পার্ব্বত্য লোকদিগের ভাষা আলোচনা করিলে অনেক খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা এ পর্য্যন্ত কেহই করেন নাই।

কোন্ শ্রেণীর শব্দ সংখ্যায় অধিক, তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। দেশজ শব্দের ব্যবহার কেবল লোকমুখেই চলিত, এমন নহে ; সাহিত্যের ভাষাতেও উহারা প্রচুর পরিমাণে স্থান পাইয়াছে, পাইতেছে ও পাইবে। সাহিত্যে উহাদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত কি না, সে স্বতন্ত্র কথা ; কিন্তু বহু দেশজ শব্দ যে সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, তাহা সত্য কথা ; এবং তাহাদের প্রবেশ নিষেধেরও উপায় দেখি না।

ফলে আমাদের সাহিত্যের ভাষা ও কথোপকথনের ভাষা উভয়েই খাঁটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ বিদ্যমান। কোথাও অধিক, কোথাও অল্প। আবার খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের মধ্যে কতক সংস্কৃতমূলক, এবং কতক দেশজ ;

এবং এই উভয় শ্রেণীর বাঙ্গালা শব্দই সাহিত্যের ভাষায় ও চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় ; কোথাও অধিক, কোথাও অল্প। তদ্ব্যতীত প্রাদেশিক বাঙ্গালা শব্দের প্রাধান্য চলিত ভাষায় অধিক ; সাহিত্যের ভাষায় উহাদের প্রাধান্য নাই, থাকা উচিতও নহে। আধুনিক কালের যে সকল গ্রন্থকার সাবধান, তাঁহারা সাধ্যমত প্রাদেশিকত্ব বর্জ্জনেরই চেষ্টা করেন। কেন না, এ-কালে সকলেই সমস্ত দেশের জন্য লিখিয়া থাকেন, প্রদেশ-বিশেষের জন্য কেহ লেখেন না।

সাহিত্যের ভাষায় ও লৌকিক ভাষায় আর একটা পার্থক্য আছে, উহা উচ্চারণ লইয়া। যেমন 'করিতেছি,' 'খাইতেছি,' এই দুইটি খাঁটি বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ ; ইহারা সাহিত্যে ঐ আকারে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কথা কহিবার সময় আমরা সুবিধামত উচ্চারণের জন্য 'করছি' 'খাচ্ছি' প্রভৃতি বলিয়া থাকি। এই উচ্চারণ আবার প্রদেশভেদে বিভিন্ন ; অতএব সাহিত্যের ভাষায় এই প্রাদেশিকত্বের বর্জ্জনই প্রার্থনীয়।

দ্বিবিধ বাঙ্গালার আলোচনা করিতেছি,—সাহিত্যের বাঙ্গালা ও লৌকিক বাঙ্গালা। লৌকিক বাঙ্গালা অর্থে লোকমুখে প্রচলিত কথাবার্ত্তার বাঙ্গালা। দেখা গেল, উভয় ভাষাতেই যথেষ্ট মিল আছে, আবার কতক পার্থক্যও আছে। সাহিত্যের ভাষায় খাঁটি সংস্কৃত শব্দ যত ব্যবহৃত হয়, লৌকিক ভাষায় তত হয় না। সংস্কৃতমূলক ও দেশজ, উভয়বিধ খাঁটি বাঙ্গালা শব্দেরই লৌকিক ভাষায় প্রাধান্য আছে। তদ্ব্যতীত প্রাদেশিক শব্দের ও প্রাদেশিক উচ্চারণের ভেদ লৌকিক ভাষায় যতটা বর্ত্তমান, সাহিত্যের ভাষায় ততটা নাই, এবং থাকা উচিতও নহে।

উভয় শ্রেণীর শব্দ ভাষায় সমানভাবে ব্যবহৃত হয় না। খাঁটি সংস্কৃত শব্দ আধুনিক বাঙ্গালায় সাহিত্যের ভাষায় ও সম্ভবতঃ কথাবার্ত্তার ভাষাতেও পূর্ব্বাপেক্ষা বহুতর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে, সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলিবেন, ইহা দুঃখের বিষয়। অনেকে আবার বলিবেন, ইহা সুখের বিষয়। আমিও বলি, ইহা সুখের বিষয়। যাহাই হউক, সে সুখ-দুঃখের কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। আধুনিক বাঙ্গালায় খাঁটি সংস্কৃতের ব্যবহার বাড়িয়াছে, ইহা প্রকৃত কথা ; ইহাতেও কাহারও সন্দেহ নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে খাঁটি সংস্কৃত শব্দের এত প্রচলন ছিল না, ইহা সত্য কথা।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ধ্বংসাবশেষ, যাহা এ-কালে সম্মার্জ্জনীসংস্কৃত হইয়া পরিমার্জ্জিত বা অর্দ্ধমার্জ্জিত ও অমার্জ্জিত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে, তাহাই তাহার সাক্ষী। সে দিন পরিষৎ-সভায় কোন সদস্য বলিয়াছিলেন, প্রাচীন গ্রন্থকারেরা ইতর সাধারণের জন্য পুস্তক লিখিতেন, পণ্ডিত জনের জন্য লিখিতেন না, সেই জন্যই তাঁহারা অসাধু শব্দের প্রশ্রয় দিয়াছেন। কারণটা খুবই সঙ্গত ; বস্তুতই চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস ও রামপ্রসাদ সাধারণের জন্যই সাধারণের বোধ্য ভাষাতেই রচনা করিয়াছিলেন ; এমন কি, ভারতচন্দ্রেরও সেইরূপ অসাধু প্রবৃত্তি যে একবারেই ছিল না, এমন বলা যায় না। কারণ যাহাই হউক, প্রাচীন সাহিত্যে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের প্রচুর প্রয়োগ ছিল, এ-কালের অপেক্ষা বহুলতর প্রয়োগ ছিল। সেই প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা বর্ত্তমানে অনুকরণীয় না হইতেও পারে ; কিন্তু সেই প্রাচীন সাহিত্যকে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। সেই অসাধুভাষাবহুল সাহিত্যের লোপ হউক, এ ইচ্ছা বোধ হয় কেহই করেন না। বরং তাহার উদ্ধার বিধানের জন্যই আজকাল একটা উৎকট আগ্রহ দেখা যাইতেছে। সাহিত্য-পরিষৎ লুপ্ত সাহিত্যের উদ্ধার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আরও একটু স্পষ্ট বলা ভাল। বাঙ্গালার প্রাচীন লেখকেরা যে পণ্ডিতসেবিত সাধুভাষা ব্যবহার না করিয়া ইতরজনসেবিত ইতরজনবোধ্য অসাধু ভাষার প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, সে জন্য আমরা যতই পরিতপ্ত হই না কেন, তাঁহাদের রচনা বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে কেহই চাহিবেন না। আধুনিক সাধুশব্দবহুল সাহিত্যের পনর আনা লুপ্ত হইলেও আমরা সবিশেষ দুঃখিত হইব না ; কিন্তু যদি কেহ চণ্ডীদাসের অথবা রামপ্রসাদের গানের সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসন ব্যবস্থা করিতে চাহেন, আমরা তাঁহার জন্য তুষানলের ব্যবস্থা করিব।

ফলে আধুনিক ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে খাঁটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাঙ্গালা যত শব্দের ব্যবহার আছে, সকলই বাঙ্গালা। সম্পূর্ণ কোষগ্রন্থ সঙ্কলনকালে ইহাদের কাহারও প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন চলিবে না।

কেহ হয়ত বলিবেন, কোষগ্রন্থের উদ্দেশ্য ত অর্থ বুঝান। দুর্ব্বোধ্য শব্দই অভিধানে স্থান পাইবে। সুবোধ্য শব্দ, সকলেই যাহার অর্থ বুঝে,

অর্থাৎ অধিকাংশ খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ অভিধানে প্রবেশ করাইয়া অভিধানের কলেবর অকারণে ফাঁপাইবার প্রয়োজন কি?

এ প্রশ্নেরও বোধ করি উত্তর আবশ্যক। প্রথমতঃ, সকল শব্দ সকলের নিকট সুবোধ্য নহে; আপনার নিকট যাহা সুবোধ্য, আমি তাহা হয়ত বুঝি না। এ স্থলে সকল শব্দের সমাবেশই নিরাপৎ; সঙ্কলনকর্ত্তার বিবেচনার উপর ভার দিলে অনেক শব্দ এড়াইয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সঙ্কলনকালে এই আপত্তি উঠে না; তখন সরল ও দুরূহ সকল শব্দই নির্ব্বিশেষে গৃহীত হয়। সংস্কৃত কোষকারেরাও সরল সর্ব্বজনবোধ্য শব্দগুলিকে কোষগ্রন্থে স্থান দিতে আপত্তি করেন নাই। তৃতীয়তঃ, কেবল শব্দের তাৎপর্য্য বোঝানই অভিধানের উদ্দেশ্য নহে। অভিধানে অর্থবিচারের সহিত ব্যুৎপত্তিবিচারেরও প্রথা আছে। যে শব্দের অর্থ সকলেই জানে, সে শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে কিরূপে হইল, তাহা সকলে না জানিতে পারে। চতুর্থতঃ, অভিধানের আরও একটা মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। ভাষার সর্ব্বাঙ্গ বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদ না করিলে ভাষার প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে তথ্য নির্ণয় অসম্ভব। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শব্দরাশির সঙ্কলন আবশ্যক। লোকসংখ্যাকর্ম্মে বা সেনসাস্ ব্যাপারে যেরূপ রাজাধিরাজ হইতে ভিক্ষুক পর্য্যন্ত মনুষ্য মাত্রেরই একই মূল্য, রাজ-চক্রবর্ত্তীকেও যেমন এক জন লোক বলিয়াই ধরা যায় ও লোকগণনার তালিকায় তিনি তাহার অধিক স্থান পান না, এখানেও সেইরূপ। বৈজ্ঞানিক হিসাবে সকল শব্দেরই সমান আদর।

কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য নামে পরিচিত সমস্ত সাহিত্যে খাঁটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাঙ্গালা যত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই সঙ্কলন আবশ্যক; সকলই বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত। অর্থবিচার ও ব্যুৎপত্তি-বিচারকালে অপক্ষপাতে সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সম্পূর্ণ তালিকা-সঙ্কলন অসাধ্য ব্যাপার; তবে যথাসাধ্য সম্পূর্ণতার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কোন শব্দকেই বর্জ্জন করিলে চলিবে না। সকলেরই আদর সমান।

মাইকেল অনেক খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার পূর্ব্বে কেহই তাহার ব্যবহার করেন নাই, তাঁহার পরেও কেহ ব্যবহারে সাহসী হন নাই। 'ইরম্মদ' ও 'মহেষ্বাস' শব্দের অর্থ কি, প্রশ্ন করিলে অনেককেই স্থিরনেত্র হইতে হইবে। কিন্তু কি করা যাইবে! মাইকেল

যখন মেঘনাদবধে তাহাদের ব্যবহার করিয়াছেন, এবং মেঘনাদবধের নাম বাঙ্গালা বহির তালিকা হইতে উঠাইতেও যখন আমরা সম্মত নহি, এবং ভবিষ্যতেও অপর কোন লেখক কর্ত্তৃক ঐ ঐ শব্দের প্রয়োগ নিবারণের জন্য আমরা কোন আইনই খাটাইতে পারিব না, তখন ঐ দুই শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত খাঁটি সংস্কৃত শব্দস্বরূপে বাঙ্গালা অভিধানে স্থান দিতেই হইবে। সেইরূপ প্রাচীন কিংবা আধুনিক কোন লেখক যদি কোন বাঙ্গালা পুস্তকে 'গলদ' ও 'বলদ' ও 'গতর' শব্দের ব্যবহার করিয়া ভাষাকে কলঙ্কিত করিয়াই থাকেন, তাঁহার এই সাধুবিগর্হিত কার্য্য যতই নিন্দনীয় হউক না, ঐ কয়টি গ্রাম্য শব্দকে অভিধানে স্থান না দিলে উপায় নাই।

বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ একখানি সম্পূর্ণ অভিধান সঙ্কলিত না হইলে বলিতে পারা যাইবে না যে, কোন্ শ্রেণীর শব্দের সংখ্যা আমাদের সাহিত্যের ভাষায় অধিক।

ফলে বিশুদ্ধ শব্দ লইয়া এইরূপ কথা-কাটাকাটি যুগ ব্যাপিয়া চালান যাইতে পারে। 'বিশুদ্ধ' শব্দটা উভয় পক্ষ এক অর্থে প্রয়োগ করেন না। আপন আপন অর্থে উভয় পক্ষই ঠিক। বিবাদের হেতু না থাকিলেও বিবাদ চালান যায়। আমি 'বিশুদ্ধ' শব্দটাকেই বর্জ্জন করিয়া 'খাঁটি' শব্দ ব্যবহার করিব। আশা করি, 'খাঁটি' শব্দটির অবিশুদ্ধির জন্য পণ্ডিতেরা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

দাঁড়াইল এই। বাঙ্গালা ভাষার সম্পূর্ণ কোষগ্রন্থে দুই শ্রেণীর শব্দ থাকিবে,—(১) 'খাঁটি' সংস্কৃত ও (২) 'খাঁটি' বাঙ্গালা। রচনার ভাষায় ও কথার ভাষায় দুই শ্রেণীর শব্দই প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। চেষ্টা করিলে বরং 'খাঁটি' সংস্কৃতকে কতক পরিহার করা যাইতে পারে, কিন্তু 'খাঁটি' বাঙ্গালার সম্পূর্ণ পরিহার একবারে অসাধ্য। খাঁটি সংস্কৃতের পরিহার কতক চলিতে পারে বটে ; কিন্তু সেইরূপ পরিহার কর্ত্তব্য বটে কি না, সে স্বতন্ত্র কথা।

তার পরের কথা, কোন্ শ্রেণীর শব্দ ভাষামধ্যে সংখ্যায় অধিক ? বলা কঠিন ; বাঙ্গালা ভাষার শব্দসমূহের সংখ্যা নিরূপণে এ পর্য্যন্ত কেহ হঠাৎ সাহসী হয়েন নাই। বাঙ্গালার সম্পূর্ণ কোষগ্রন্থ সঙ্কলিত হয় নাই। যে সকল অভিধান প্রচলিত আছে, তাহা সংস্কৃত কোষগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত ; তাহাতে এমন খাঁটি সংস্কৃত শব্দের উল্লেখ আছে, যাহা আজি পর্য্যন্ত বাঙ্গালা

ভাষার,—'বিশুদ্ধ' বাঙ্গালা ভাষার রচনাতেও ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের যেগুলি নহিলে আমাদের দৈনিক জীবনযাত্রা অচল হয়,—বিশুদ্ধ বাঙ্গালা রচনাও অসাধ্য হয়, তাহাদের অধিকাংশই সেই সকল কোষগ্রন্থে স্থান পায় নাই। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আক্ষেপোক্তি সাহিত্য-পরিষদের অনেকেরই মনে আছে, সন্দেহ নাই।

সাহিত্যের ভাষায় ও লৌকিক ভাষায় একটা পার্থক্য থাকিবেই। এই পার্থক্য বিলোপের চেষ্টায় কোন ফল নাই। যে অংশের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা, তাহা লৌকিক ভাষার নিকটবর্ত্তী হইবে; এবং যে অংশের উদ্দেশ্য শিক্ষিতের জন্য রসসৃষ্টি, অথবা অভিজ্ঞের সহিত জ্ঞানালোচনা, তাহাও লৌকিক ভাষা হইতে দূরবর্ত্তী হইবে। ইহা সাধারণ নিয়ম। কেবল এ দেশে কেন, উহা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রচলিত সাধারণ নিয়ম। সকল দেশেই এই প্রভেদ আছে ও থাকাই উচিত ও থাকিবেই। তজ্জন্য বাদানুবাদ বৃথা। লেখকগণও ব্যক্তিগত শিক্ষা দীক্ষা ও রুচি অনুসারে কেহ বা সাহিত্যের ভাষাকে লৌকিক ভাষার অভিমুখে, কেহ বা বিমুখে লইয়া যাইবেন, সে বিষয়েও বাদানুবাদ বৃথা। সকলের ভাষা এক ছাঁচে ঢালা হইবে না; কখনও হয় নাই ও হওয়া প্রার্থনীয়ও নহে। তাহা হইলে সাহিত্যে বৈচিত্র্যের ও সৌন্দর্য্যের নাশ হইবে মাত্র। ব্যক্তিগত রুচিভেদের জন্য কোন নিয়ম-বন্ধন চলে না। যাঁহারা নিয়মের বন্ধনে ব্যক্তিগত রুচিকে আবদ্ধ করিতে চান, তাঁহারা নিতান্তই নিষ্ফল শ্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্যক্তিগত প্রতিভাকে নিয়মরজ্জুতে আবদ্ধ করিতে চান, তাঁহারা নিতান্তই মৃণালতন্তু দ্বারা মত্ত হস্তীকে বাঁধিতে চাহেন।

সুতরাং এ বিষয়ে নিয়ম স্থাপনের চেষ্টা নিরর্থক, উপদেশদান নিরর্থক ও বাদানুবাদ নিতান্তই নিরর্থক। আপনার রুচি ও আপনার উদ্দেশ্য অনুসারে, পাঠকের রুচি ও পাঠকের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কেহ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের, কেহ বা বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী হইবেন, ইহাই নিয়ম। অন্য সঙ্কীর্ণ নিয়ম জারি করিলে তাহা কেহ মানিবে না।

যদি কোন সাধারণ নিয়ম স্থাপন করা চলে, তাহা এই। ভাষার মধ্যে শ্রুতিকটুতা ও অশ্রাব্যতা দোষ যথাসাধ্য পরিহার করিবে, এবং নিতান্ত অকারণে ভাষাকে অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য করিবে না।

আর যাহা প্রকৃতই গ্রাম্য অর্থাৎ slang, ভদ্রসমাজ যাহার উচ্চারণে কুণ্ঠিত, যাহা প্রকৃতই অসাধু অশিষ্ট ও অশ্লীল, তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে। এই নিয়মের প্রতি কোন পক্ষেরই আপত্তি হইবে না।

এতটা বাক্যব্যয়ের পর বোধ করি, আমি প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, এতটা বাক্যব্যয়ের কোন প্রয়োজনই ছিল না; কেন না, যাহা এতটা পরিশ্রমের পর প্রতিপন্ন করা গেল, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য; তাহাতে কাহারও কোন মতভেদ নাই।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বাক্যব্যয় একবারে অপ্রাসঙ্গিক। যে মূল বিষয় লইয়া বর্ত্তমান বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই অবান্তর কথাটার প্রসঙ্গ মাত্র তুলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেন না, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণের অভাব দেখিয়া সেই ব্যাকরণ রচনার প্রসঙ্গই উত্থাপিত করিয়াছেন মাত্র। কোন্ ভাষা ভাল, কোন্ ভাষা মন্দ, সে প্রসঙ্গই তাঁহারা উঠান নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত রুচি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের অনুকূল, এইরূপ একটু আভাস আছে বটে। কিন্তু তাহা ব্যক্তিগত কথা ও অবান্তর কথা। তিনি স্বয়ং খাঁটি বাঙ্গালায় অনুরাগী হইতে পারেন ও অন্য লেখককে সেই পথ অবলম্বনে উপদেশ দিতে পারেন; অন্যে সেই পথ অবলম্বন কবিলে তিনি সুখী হইতে পারেন। তজ্জন্য তাঁহার সহিত অন্যের মত না মিলিতে পারে। কিন্তু এই অবান্তর প্রসঙ্গের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার উত্থাপিত মূল প্রসঙ্গকে বাগ্‌জালে আচ্ছন্ন করা উচিত নহে। মূল প্রসঙ্গ বাঙ্গালা ব্যাকরণের গঠন-প্রণালী লইয়া; সাহিত্যের ভাষার গঠনপ্রণালী লইয়া নহে।

অন্যতর দ্বন্দ্বী রবীন্দ্রনাথ ভাষার সৌষ্ঠব-বিচারের প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপন করেন নাই। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় তাঁহার যে কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার কোন স্থলে এমন আভাস মাত্র নাই, যাহাতে সংস্কৃতের পক্ষপাতীদের মনে কোনরূপ আঘাত লাগিতে পারে। তিনি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কোন স্থলে বলেন নাই যে, সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করিবে বা সংস্কৃত শব্দের প্রতি বিরাগ দেখাইবে। তিনি স্বয়ং রচনাকালে সংস্কৃত শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার আধুনিক রচনায়—গদ্য রচনায় ও কবিতা রচনায় সংস্কৃত-শব্দ-বাহুল্য দেখিয়া হয়ত তাঁহার

অনেক বন্ধু ভীত হইয়া থাকিবেন। সে যাহাই হউক, বর্ত্তমান বিবাদক্ষেত্রে, অর্থাৎ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ও সাহিত্য-পরিষৎ-সভায় তাঁহার যে মত এ পর্য্যন্ত প্রবন্ধমধ্যে বা বক্তৃতামধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার কুত্রাপি এমন কোন অনুরোধ নাই যে, তোমরা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিও না বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারকালে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পালন করিও না। তিনি কেবল মাত্র কতিপয় বাঙ্গালা শব্দ,—খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ সঙ্কলন করিয়া 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং ঐ সকল শব্দের তাৎপর্য্য লইয়া, ব্যাখ্যা ও ব্যুৎপত্তি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন ও অপরকে সেইরূপ আলোচনার জন্য আহ্বান করিয়াছেন মাত্র। ঐ সকল শব্দের সকলগুলিই খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ; কতক সংস্কৃতমূলক, কতক বা দেশজ। কতকগুলি সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, কতক হয়ত সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই; কতকগুলি হয়ত প্রকৃতই গ্রাম্য অপশব্দ, উহাদের সাহিত্যে স্থান দেওয়া উচিতও নহে। কিন্তু তিনি তাহাদের অর্থ বিচার করিয়াছেন; তাহারা কোথা হইতে আসিল, কিরূপে সিদ্ধ বা নিষ্পন্ন হইল, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কোথাও তিনি এ কথা বলেন নাই যে, তোমরা সাহিত্যের সাধু ভাষায় এই সকল শব্দের প্রয়োগ করিও। তাঁহার সকল প্রবন্ধ অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ দুরভিসন্ধির স্পষ্ট বা অস্পষ্ট চিহ্ন আমি কোথাও পাই নাই। যদি কেহ পাইয়া থাকেন, দেখাইয়া দিলে উপকৃত হইব।

স্বীকার্য্য যে, রবীন্দ্রনাথ পরিষৎ-পত্রিকাতে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দেরই ব্যাকরণবিষয়ক আলোচনা করিয়াছেন। ইহাও স্বীকার্য্য যে, সেই সকল শব্দের মধ্যে অনেক অসাধু শব্দ রহিয়াছে, অনেক গ্রাম্য শব্দ রহিয়াছে, যাহা সাধু সাহিত্যে আদৃত হয় না ও আদৃত হইবে না। বস্তুতই তন্মধ্যে অনেক শব্দ আছে, যাহা প্রকৃতই slang, অপভাষা ও গ্রাম্য ভাষা। এই অপভাষার আলোচনাই অনেকের প্রীতিকর হয় নাই। তাঁহারা হয়ত মনে ভাবিয়াছেন, এই সকল শব্দের প্রতি লেখকের একটা আন্তরিক আকর্ষণ আছে ও অনুরাগ আছে; তিনি ব্যাকরণ আলোচনা উপলক্ষ্য করিয়া ঐ সকল অপশব্দ সাহিত্যে চালাইতে চাহেন, এবং যদিও সম্প্রতি উহাদের ব্যবহারে সাহসী হন নাই, ভবিষ্যতে কোন্ দিন ব্যবহার করিয়া ফেলিবেন। অর্থাৎ তিনি যখন মাছের তেলের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তখন কোন্

দিন মাছের তেল মাখিয়াই ফেলিবেন ; যখন শেয়ালের জীবতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, তখন কোন্ দিন শেয়াল পুষিয়া দরজায় রাখিবেন। লেখকের স্পষ্ট ও তীব্র ভাষা সত্ত্বেও যদি কাহারও এইরূপ আশঙ্কা থাকে, সেই আশঙ্কা দূর করিবার উপায় নাই। পরিষৎ-সভায় তিনি যে প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, যাহা তৎপরে 'বঙ্গদর্শনে' বাহির হইয়াছে, এবং পরিষদে বাদপ্রতিবাদের উত্তরে তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য যেরূপে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহার পর যে ওরূপ সন্দেহ কিরূপে থাকিতে পারে, তাহা আমার বুদ্ধিতে কুলায় না। অথচ দেখিতেছি, অনেকেরই সন্দেহ যায় নাই। এখনও অনেকেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তর্ক করিতেছেন, সাহিত্যের ভাষায় গ্রাম্য শব্দের সমাবেশ বাঞ্ছনীয় নহে ; যেন রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্য শব্দের ব্যবহারেরই সমর্থন করিয়াছেন। এ স্থলে কোন উপায় দেখি না। রবীন্দ্রনাথ বিতণ্ডায় নামিয়া অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন ; তথাপি তাঁহাদের যদি অনুভূতির সঞ্চার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বস্তুতই উপায় নাই। ত্বগ্‌ভেদাৎ শোণিতস্রাবাৎ মাংসস্য ক্রথনাদপি, আত্মনো যে ন জানন্তি, তাঁহাদের প্রতি বাক্যপ্রয়োগ নিরর্থক।

সাহিত্যে অপভাষার ব্যবহার করিব কি না, এ কথাটাই বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কেন না, কেহ তাহা বলে নাই। কিন্তু অপভাষার ব্যাকরণ আলোচনা করিব কি না, ইহা প্রাসঙ্গিক বটে। এত ক্ষণ পরে যে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণার অবসর পাইলাম, ইহাও সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় 'ভারতী' পত্রে বলিয়াছেন, এই সকল শব্দগুলির অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের আলোচিত শব্দগুলির অধিকাংশই অতি অকিঞ্চিৎকর ; কেন না, সাধু ভাষায় ও সাধু সাহিত্যে উহাদের ব্যবহার দোষাবহ ; কাজেই উহাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পরবর্তী সংখ্যার 'ভারতী'তে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের ন্যায় নানাভাষাবিৎ পণ্ডিতও বলিয়াছেন, চলিত ভাষার ব্যাকরণ রচনা নিষ্প্রয়োজন ; কেন না, ব্যাকরণ রচনা দ্বারা চলিত ভাষার স্বাধীন গতি ও উন্নতি রুদ্ধ হইতে পারে।

ফলে দুই জন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত দুই বিভিন্ন হেতুবাদ দর্শাইয়া বলিতেছেন, চলিত বাঙ্গালার অর্থাৎ লৌকিক বাঙ্গালার ব্যাকরণ আলোচনা আবশ্যক নহে। রবি বাবু যে দিন পরিষৎ-সভায় কৃৎ ও তদ্ধিত বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ

করেন, সে দিন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কতকটা আভাসে বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ ব্যাকরণ আলোচনার এখনও সময় আসে নাই। ইহাকে একটা তৃতীয় হেতুবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই ত্রিবিধ হেতুবাদের আলোচনা আবশ্যক।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ কি, তাহা স্পষ্ট ভাবে বুঝা আবশ্যক বোধ করিতেছি। কেন না, ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি, সেইটা নির্দ্ধারিত হইলে বিচারের পথ অনেকটা সোজা হইতে পারে। ব্যাকরণ শব্দের অর্থেও একটু গোল আছে।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন, ব্যাকরণ শব্দের প্রকৃত অর্থ পদের বিশ্লেষণ; ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রত্যেক পদকে ব্যবচ্ছেদ দ্বারা দেখাইতে চাহেন, কিরূপে কোন্ মূল ধাতু হইতে পদটি উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ উহার উপাদানগুলি কি প্রণালীতে বিন্যস্ত হইয়া উহার শরীরটি গঠিত হইয়াছে, তাহা দেখানই ব্যাকরণের উদ্দেশ্য। ইংরেজীতে যাহাকে Etymology বলে, ব্যাকরণ শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহাই। কিন্তু আজকাল ব্যাকরণ শব্দ আরও ব্যাপক অর্থে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়; উহা ইংরেজী গ্রামার শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপে ব্যবহৃত হইতেছে; তন্মধ্যে Etymology ব্যতীত Syntax বা বাক্য-নির্ম্মাণ-প্রকরণ, ছন্দঃপ্রকরণ, এমন কি, অলঙ্কার-প্রকরণ পর্য্যন্ত স্থান পাইয়া থাকে। আমরা ব্যাকরণ শব্দ এই ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিলাম। তাহাতে বক্তব্যের কোন ক্ষতি হইবে না।

মনুষ্যের ভাষা বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, ভাষার গঠনপ্রণালীতে কতকগুলি নিয়ম আছে। শব্দের গঠনে, পদের গঠনে ও বাক্যের গঠনে এইরূপ নিয়মের আবিষ্কারই ব্যাকরণের (অর্থাৎ গ্রামারের) উদ্দেশ্য। এইরূপ নিয়ম যে ভাষা মাত্রেই বর্ত্তমান, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না; কোন নিয়ম না থাকার নাম সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা; এবং যে ভাষা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল, কোন নিয়মই যাহা মানে না, তাহা মনুষ্যের ব্যবহার্য্য নহে। অতি অসভ্য জাতির ভাষাকেও বিশ্লেষণ করিলে সেই ভাষার অবস্থানুরূপ নিয়মের আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

অসভ্য জাতির ভাষারও ব্যাকরণ গঠিত হইতে পারে। যে ভাষায় নিয়ম আদৌ নাই, সে ভাষা কেহ শিখিতে পারে না, কাহাকেও শিখান যায় না;

তাহা ভাষাই নহে। কোন নিয়ম থাকিলেই সেই নিয়মের আবিষ্কার যিনি করিবেন, তিনিই সেই ভাষার বৈয়াকরণিক।

ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রকৃত পক্ষে একটি বিজ্ঞান শাস্ত্র; ব্যাপক অর্থে ইহাকে ভাষাবিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। এই ভাষাবিজ্ঞানের যে অংশ বোধ করি সর্ব্বপ্রধান অংশ, যাহা Etymology অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাকরণ, তাহা আমাদের ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালে পরা কাষ্ঠা পাইয়াছিল। মহর্ষি পাণিনির হস্তে ইহার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনিই জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণিক; তাঁহার তুল্য আর কেহ জন্মায় নাই। মেকলের ভাষায় বলা যাইতে পারে, একলিপ্‌স্‌ সকলের অগ্রণী; অন্যের স্থান বহু দূরে। পাণিনির বহু পূর্ব্ব হইতে আচার্য্যেরা ব্যাকরণ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া সংস্কৃত-ভাষাবিজ্ঞান গঠিত করিতেছিলেন; পাণিনি সেই বিজ্ঞানকে প্রায় সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা দান করেন। তার পর যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা তাহারই বার্ত্তিক ও ভাষ্য ও টীকা। আধুনিক বৈয়াকরণেরা যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা সেই প্রাচীন কালের ভাষাবিজ্ঞানের বালকপাঠ্য পুস্তক মাত্র।

পাণিনি প্রভৃতি আচার্য্যেরা ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া যে সকল নিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সংস্কৃত ভাষার পক্ষে প্রকৃত ভাষাবিজ্ঞান; তাহাই প্রকৃত ব্যাকরণ। আমরা বালকগণকে ও অনভিজ্ঞকে ভাষা শিখাইবার জন্য যে সকল ব্যাকরণ-ঘটিত পুস্তক লিখি, তাহা বৈজ্ঞানিক পুস্তক বটে, কিন্তু তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্র নহে।

আর একটা কথা বলা আবশ্যক। অনেকের বিশ্বাস, ব্যাকরণকারেরা যে নিয়ম বাঁধেন, ভাষা সেই নিয়মে চলে। মিথ্যা কথা। কোনও ব্যাকরণকারের সাধ্য নহে যে কোন নিয়ম বাঁধেন, কোন আইন জারি করেন। ভাষার নিয়ম ব্যাকরণকারের বৃদ্ধপিতামহগণের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান থাকে; তিনি সেইগুলি আবিষ্কার করিয়া অন্যকে দেখাইয়া দেন মাত্র। নিয়ম বাঁধার কথা উঠিতেই পারে না।

বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালা ব্যাকরণ নামে যে কয়েকখানি শিশুবোধক পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহার কোনখানিও প্রকৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ নহে। নহে, কেন না বাঙ্গালা ব্যাকরণই এখন নির্ম্মিত হয় নাই, কোন্ ভবিষ্যতে হইবে, তাহাও কেহ জানে না। উহা সংস্কৃতের আদর্শে লিখিত, এ কথার এই অর্থ

যে, উহা বাঙ্গালা ব্যাকরণ নহে ; উহা সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটা পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা অনুবাদ।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যাঁহারা তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল বালকপাঠ্য ব্যাকরণ লইয়াই যেন ব্যাকুল। যেন ব্যাকরণ শাস্ত্র বালক ভিন্ন বৃদ্ধের জন্য আবশ্যক নহে। প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ গ্রন্থগুলি বালকেরই পাঠ্য ; উহা বালকগণকে ভাষা শিখাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু আমি ব্যাকরণ নামে যে বিজ্ঞান শাস্ত্রের উল্লেখ করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য ভাষা শেখান নহে। উহার উদ্দেশ্য নিজে শেখা ; ভাষার ভিতরে কোথায় কি নিয়ম প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, তাহাই আলোচনা দ্বারা আবিষ্কার করা। আগে সেই নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইবে ; অর্থাৎ তাহার নিয়ম বাহির করিয়া তাহার সহিত স্বয়ং পরিচিত হইতে হইবে ; তাহার পর উহা অন্যকে শেখান যাইতে পারিবে। বাঙ্গালা ভাষার সেই ব্যাকরণ এখনও রচিত হয় নাই, কেন না, বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে কি নিয়ম আছে না-আছে, তাহার কেহই আলোচনা করেন নাই। সে সকল নিয়মের যখন আবিষ্কারই হয় নাই, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনাই এ পর্য্যন্ত হয় নাই, তখন বাঙ্গালার ব্যাকরণ এখন বর্ত্তমানই নাই। বাঙ্গালার ব্যাকরণ কি পদার্থ, তাহা কেহই জানেন না ; রবীন্দ্রনাথও জানেন না, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্রও জানেন না। কেহই যখন জানেন না, তখন অন্যকে শিখাইবেন কি ? কাজেই পরকে শিখাইবার জন্য ব্যাকরণ রচনার প্রসঙ্গ এখন উঠিতেই পারে না। এখন যাহাকে বাঙ্গালা ব্যাকরণ বলা হয়, উহা বাঙ্গালা ব্যাকরণ নহে। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের নিকট যাহা পাইয়াছে, সংস্কৃতের নিকট যাহা ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, উহা সেই অংশের ব্যাকরণ। সেই ব্যাকরণ রচনার জন্য আমাদিগকে কষ্ট করিতে হইবে না ; সে-কালের আচার্য্যেরা তাহা সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা যদি শিখিতে চাই, তাঁহাদের পুঁথি পড়িলেই হইবে ; অন্যে যদি শিখিতে চায়, সেইখানে বরাত দিলেই হইবে। বালকেরা যদি শিখিতে চায়, তাহাদিগকে মূল সংস্কৃত হইতে অথবা তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে শিখাইলেই চলিবে। বালকদিগকে উহা পড়াইও না, এ কথা কেহ বলে না। কিছু পড়াইতেই হইবে ; কেন না, বাঙ্গালা যখন সংস্কৃতের সম্পত্তির কিয়দংশ আত্মসাৎ করিয়াছে, তখন সেই অংশটুকু বুঝাইবার জন্য

পড়াইতে হইবে। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের সেই সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোচনার পরিশ্রমে প্রয়োজন নাই।

কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালার ব্যাকরণ এখনও অস্তিত্বহীন। বাঙ্গালার যে অংশ সংস্কৃত হইতে ধার করা নহে, যে অংশ খাঁটি বাঙ্গালা, সে অংশের ব্যাকরণ নাই। সেই অংশের ব্যাকরণ এখন গড়িতে হইবে; খাঁটি বাঙ্গালার আলোচনা করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাই সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য; পরিষৎ যদি তাহার কিঞ্চিৎ সম্পাদন করিয়া যাইতে পারেন, পরিষদের জীবন সার্থক হইবে।

এই কথাটা অত্যন্ত সহজ; অথচ কি কারণে ইহা পণ্ডিতগণের মাথায় আসিতেছে না, তাহা বলা কঠিন। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রচুর পরিমাণে থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। অন্যের তাহাতে রুচিগত আপত্তি থাকিতে পারে; আমার সে আপত্তি নাই। অন্যের মতে সীতার বনবাসের ভাষা উৎকৃষ্ট ভাষা না হইতে পারে; আমার মতে উহা উৎকৃষ্ট ভাষা। এই উৎকৃষ্ট ভাষা সংস্কৃতবহুল; ইহা বুঝিতে হইলে ও বুঝাইতে হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তাহাও স্বীকার করি। যাঁহারা এই ভাষা পছন্দ করেন না, যাঁহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে ঐরূপ ভাষা কখনও ব্যবহার করিবেন না, তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের ধার ধারিতে না চাহিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের সেরূপ প্রতিজ্ঞা নাই, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির নিয়ম ও সমাসের নিয়ম ও পদ সাধিবার নিয়ম শিখিতেই হইবে। তাঁহারা শিখুন, তাহাতে কে আপত্তি করিবে? তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণসমুদ্র সাঁতার দিয়া পার হউন, কাহারও আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। তাঁহারা গ্রীক লাটিনের ব্যাকরণ শিখিতে গেলে ত কেহ আপত্তি করে না; তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিতে গেলেই বা কে বাদী হইবে? বিদ্যালয়ের বালকদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে যতটা শেখান দরকার বোধ কর, শেখাও; তাহাতেই বা আপত্তি কি? বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তজ্জন্য ব্যাকুল হইবার আমি কোন প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু একটা বিষয়ে সাহিত্য-পরিষদের ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন আছে। সীতার বনবাসেও খাঁটি বাঙ্গালা পদের বহু প্রয়োগ আছে। সেই সকল পদ কোথা হইতে আসিল, সেই সকল পদ কি নিয়মের অনুসারে প্রযুক্ত হয়, তাহা কেহই জানে না। সেইগুলির আলোচনা সাহিত্য-

পরিষদেরই কাজ। সাহিত্য-পরিষৎ সেই আলোচনার যোগ্য পাত্র। সংস্কৃত ব্যাকরণ আছে; সাহিত্য-পরিষৎ তজ্জন্য কিছু মাত্র চিন্তিত নহেন। বাঙ্গালা ব্যাকরণ নাই; সাহিত্য-পরিষৎকে তাহা গড়িতে হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় অনেক খাঁটি সংস্কৃত শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে; কালে আরও হইবে; হউক, ইহাই প্রার্থনা করি। এই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা আবশ্যক। 'সীতার বনবাসে' প্রথম বাক্য—"রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত-প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন,"—ইহা বাঙ্গালা বাক্য, সংস্কৃতশব্দবহুল বাঙ্গালা বাক্য। কেহ বলিবেন, ইহাতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য আছে, কাজেই উহা অপকৃষ্ট বাঙ্গালা; আমি বলিব, তথাস্তু। কেহ বা বলিবেন, ইহাতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য আছে, কাজেই ইহা উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা; আমি বলিব, তথাস্তু। উৎকৃষ্টই হউক বা অপকৃষ্টই হউক, উহা বাঙ্গালা। উহার মধ্যে কতক পদ খাঁটি বাঙ্গালা; কতক খাঁটি সংস্কৃত; কিন্তু বাঙ্গালা বাক্য রচনার নিয়মানুসারে ঐরূপ দ্বিবিধ পদ একত্র গাঁথিয়া বাক্যটি রচিত হইয়াছে। ঐ বাক্যটি ইংরেজী নহে, ফারসী বা আরবী নহে, সংস্কৃতও নহে, প্রাচীন প্রাকৃতও নহে; উহা বাঙ্গালা। এই বাক্যটির অন্তর্গত সমুদয় পদের ব্যাকরণ অর্থাৎ ইটিমলোজি না জানিলে এই বাক্যের ভাষাগত জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে না। এই জন্য তদন্তর্গত সংস্কৃত পদগুলির ব্যুৎপত্তি জানা আবশ্যক। প্র তি ষ্ঠি ত পদের ব্যুৎপত্তি প্র তি + স্থা + ত; উহা না জানিলে প্র তি ষ্ঠি ত পদটি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, কেন উহার অর্থ ঐরূপ হইল, তাহা বুঝা যাইবে না। প্র তি ষ্ঠি ত পদটিকে তজ্জন্য ভাঙ্গিয়া উহার ধাতুপ্রত্যয় বাহির করা আবশ্যক। এইরূপে বিশ্লেষণ-কার্য্য সমাধানের পর ঐ পদটির অর্থ বুঝা যাইবে। সংস্কৃত ব্যাকরণের আচার্য্যেরা এই বিশ্লেষণ-কর্ম্মের সমাধান করিয়া গিয়াছেন।

এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য তাঁহারা কিছুই রাখেন নাই। আমাদের তজ্জন্য মস্তিষ্ক আলোড়নের কোন অবকাশ নাই। কোন সংস্কৃত ব্যাকরণের পাতা উলটাইলেই দেখিতে পাইবে যে, প্র তি ষ্ঠি ত শব্দের ব্যুৎপত্তি কি। বাঙ্গালা ভাষা এই শব্দটি সংস্কৃতের নিকট গ্রহণ করিয়াছে; যাঁহারা বাঙ্গালা ব্যাকরণ লেখেন, তাঁহারাও সংস্কৃত ব্যাকরণের সেই অংশটুকু অনুবাদ করিয়া

আপন গ্রন্থমধ্যে বসাইয়া দেন ও তাহার নাম দেন বাঙ্গালা ব্যাকরণ। কিন্তু উহা বাঙ্গালা ব্যাকরণ নহে, ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের বাঙ্গালা অনুবাদ।

এইরূপ অনুবাদকারের সবিশেষ কৃতিত্ব নাই : সবিশেষ অপরাধ আছে, তাহাও বলিব না। তবে যদি তাঁহারা স্পর্দ্ধার সহিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করিয়াছি বলিয়া আস্ফালন করেন, তাহা হইলে লজ্জাই তাহার পুরস্কার। যে সকল ছাত্রকে 'সীতার বনবাস' পড়িতে হয়, অথচ যাহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ জানে না, তাহাদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ অনুবাদ করিয়া দিলে সংস্কৃত পদগুলির ব্যুৎপত্তি তাহারা বুঝিতে পারিবে। এই কারণে এই সকল শিশুপাঠ্য গ্রন্থের উপকারিতা আছে।

এইরূপ অ প্র তি হ ত প্র ভা ব ও অ প ত্য নি র্বি শে ষ শব্দ দুইটি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণে বহু দিন হইল স্থির হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা কিরূপ দর্পের সহিত পঞ্চাশটা শব্দকে একত্র সমাসবদ্ধ করিয়া একটা পদ নির্ম্মাণ করে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণে তন্ন তন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে। উহা ছাত্রগণকে তর্জ্জমা করিয়া দিলে বিশেষ ক্ষতি দেখি না। সুতরাং শিশুবোধের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটা পরিচ্ছেদ অনুবাদ করিয়া দিলে গর্হিত কাজ হয় না।

কিন্তু এ কথাটাও মনে রাখিতে হইবে যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের যে অংশের বাঙ্গালায় প্রয়োগ হয় না, বাঙ্গালা ব্যাকরণে তাহারও যেন অনুবাদ করা না হয়। তাহা হইলে বালকদের মতিভ্রম জন্মাইতে পারে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

কিন্তু 'সীতার বনবাসে'র ঐ বাক্যমধ্যে সংস্কৃত পদগুলি ছাড়া কয়েকটি বাঙ্গালা পদ আছে ; যথা, হ ই য়া এবং ক রি তে লা গি লে ন। এই কয়টি পদ না থাকিলে বাক্যটি সম্পূর্ণ হইত না। বরং সংস্কৃত পদগুলির স্থানে খাঁটি বাঙ্গালা পদ বসাইলে উৎকৃষ্ট না হউক, চলনসই বাঙ্গালা হইতে পারিত ; কিন্তু এই খাঁটি বাঙ্গালা পদগুলির স্থান লইতে পারে, এমন কোন সংস্কৃত পদই নাই। ইহাদিগকে বর্জ্জন করিলে বাক্যটা বাঙ্গালাই হইত না। এই পদগুলির সন্নিবেশই বাঙ্গালার বিশিষ্টতা।

কিন্তু এই পদগুলি কিরূপে সাধিতে হইবে, তাহা কোন সংস্কৃত ব্যাকরণ-গ্রন্থে নাই। কেন না, এই পদগুলি সংস্কৃতমূলক হইলেও সংস্কৃত নহে। ইহারা খাঁটি বাঙ্গালার নিজস্ব। ইহাদিগের উপর অন্য কোন ভাষার কোন

স্বত্ব নাই। ইহাদিগের গঠনপ্রণালীর বিচার যে শাস্ত্রে করিবে, তাহাই বাঙ্গালা ব্যাকরণ। কিন্তু সেই বাঙ্গালা ব্যাকরণ এখন কোথায়?

প্রচলিত শিশুপাঠ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলি খুলিয়া দেখিলে ঐ শ্রেণীর পদের ব্যুৎপত্তির কোন তথ্য পাওয়া যাইবে না। কোন ব্যাকরণকার যদি বাঙ্গালা শব্দের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া উহাদিগকে সাধিবার কোন চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহার সৎসাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার চেষ্টা কত দূর সফল হইয়াছে, জানি না। কেন না, এই পদকয়টির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের জন্য যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বাঙ্গালা দেশের সপ্তকোটি অধিবাসীর মধ্যে কেহ করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করি না।

যদি বলেন, ঐ সকল শব্দ অতি অকিঞ্চিৎকর, উহাদিগকে লইয়া ভাষার সৌষ্ঠব সাধিত হয় না, তাহা হইলে অবশ্য নিরুত্তর হইতে হইবে। উহারাই বাঙ্গালা ভাষার দেহ গড়িয়াছে; উহাদিগকে বর্জ্জন করিলে বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা হইবে না।

হ ই য়া পদ সংস্কৃত ভূ ত্বা পদ হইতে আসিয়া থাকিবে; খুব সম্ভবই তাহাই। কিন্তু এই পরিণতি কখনই সহসা সাধিত হয় নাই। ভূ ত্বা পদ নানা রূপপরিবর্ত্তের পর অবশেষে হ ই য়া'-তে দাঁড়াইয়াছে। সেই সকল মধ্যবর্ত্তী রূপ কি? কোন বাঙ্গালা ব্যাকরণে তাহার উত্তর নাই; অথচ তাহার উত্তর দেওয়াই বাঙ্গালা ব্যাকরণের কার্য্য। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য যে যে ভাষার সাহায্য লইতে হয়, লও। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভগ্নাবশেষ যেখানে যাহা বর্ত্তমান আছে, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ। বঙ্গদেশের দূর-দূরান্তের প্রাদেশিক ভাষায় কোন্ কোন্ রূপ বর্ত্তমান আছে, খুঁজিয়া দেখ। তাহার পর উত্তর দিবার চেষ্টা করিও। তৎপূর্ব্বে একটা আনুমানিক উত্তর দিলে তাহা গ্রহণ করিব না;—কিছুতেই না। হর্ণলী সাহেব বলিয়াছেন, ক র্ত্ত ব্য হইতে ক রি ব উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বলেন, ক রি ষ্যা মি হইতে ক রি ব হইয়াছে। ক রি ষ্যা মি' কিরূপে ক রি ব'-তে পরিণত হইয়াছে, তাহার প্রমাণের জন্য সমস্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য ঘাঁটিয়া দেখা আবশ্যক; প্রাদেশিক ভাষা সমস্ত খুঁজিয়া দেখা আবশ্যক। সহজে প্রমাণ হইবে না। অর্থসাদৃশ্য প্রমাণ নহে। প্রমাণ ভাষার প্রাচীন ইতিহাসে। সে প্রমাণ কোথায়?

হ ই য়া শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে সমর্থ হইলে তখন যা ই য়া ক রি য়া খা ই য়া প্রভৃতির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের পথ সুগম হইবে। তখন বাঙ্গালা ব্যাকরণের একটা সূত্র আবিষ্কৃত হইবে। সেই সূত্র একটা নবাবিষ্কৃত তথ্য ; এইরূপ তথ্যসমষ্টি লইয়া নূতন বাঙ্গালা ব্যাকরণের দেহ রচিত হইবে। সে বহু দূরের কথা ; এখন মজুরি কর।

বাঙ্গালা ভাষার সমুদ্র আলোড়ন কর। ডুবুরির মত সাগরবক্ষে ঝাঁপ দাও। সমুদ্রগর্ভে শামুক ঝিনুক কঙ্কাল কঙ্কর মুক্তা প্রবাল যেখানে যাহা আছে, তুলিয়া আন। কাহাকেও বর্জ্জন করিও না ; কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না ; কাহাকেও অগ্রাহ্য করিও না। কি জানি, কোন্ অবজ্ঞাত জঞ্জাল হইতে কি নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইবে ! কি জানি, কোন্ অগ্রাহ্য কঙ্কর মাজিয়া ঘষিয়া দেখিলে কোন্ রত্নে পরিণত হইবে ! ডুবুরির মত যাহা পাও, কুড়াইয়া আন। সংগ্রহ করিয়া বিশেষজ্ঞের হাতে অর্পিত কর। জহুরি কোন্ উপলখণ্ড হইতে কি জহর বাহির করিবেন, কে জানে ? যত দিন বিশেষজ্ঞের হাতে না পড়ে, তত দিন জাতীয় মিউজিয়মে সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখ। সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিতে পার, উত্তম ; তোমার পরিশ্রম বিশেষজ্ঞের সহায় হইবে। সাজাইতে না পার, রাখিয়া দাও। কিন্তু অবহেলা করিও না। অবহেলায় তোমার অধিকার নাই। 'অকিঞ্চিৎকর' বলিবার অধিকার তোমার নাই। 'গ্রাম্য ভাষা' বলিয়া অবজ্ঞায় অধিকার তোমার নাই।

আমি যে ব্যাকরণের কথা বলিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য নিয়ম আবিষ্কার। ভাষার মধ্যে অজ্ঞাত নিয়ম বর্ত্তমান আছে ; সেই নিয়ম খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সকল ভাষাতেই নিয়ম আছে। সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, লাটিনে, গ্রীকে, ধাঙ্গড়ের ভাষায় ও সাঁওতালের ভাষায় সর্ব্বত্র নিয়ম আছে। কেন না, নিয়মহীন ভাষা চিন্তার অগোচর। নিয়ম আছে ; তবে বিনা অন্বেষণে তাহা বাহির হইবে না। নিয়ম সাহিত্যের ভাষাতে আছে, লৌকিক ভাষাতেও আছে। কথাবার্ত্তার ভাষা অনেকটা বন্ধনশূন্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতই কি তাহা নিয়মবর্জ্জিত ? অসম্ভব। প্রাদেশিক লৌকিক ভাষার মধ্যেও নিয়ম আছে। অন্বেষণ কর, বাহির হইবে।

ব্যাকরণ কখনও নিয়ম বাঁধে না ; উহা নিয়ম আবিষ্কার করে মাত্র। ব্যাকরণ ভাষার উন্নতির প্রতিরোধ কিরূপে করিবে, ইহা বুঝিলাম না। ভাষা

স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত ও পরিবর্ত্তিত হইবে; ব্যাকরণও নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করিবে; তাহাতে ভয় কি?

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও ত তাহাই দেখি। আমাদের এই অতি প্রাচীন বসুন্ধরার মূর্ত্তি যুগ ব্যাপিয়া বিকৃত হইতেছে। এই বিকৃতির নিয়ম আবিষ্কার যে বিজ্ঞানের কার্য্য, সেই বিজ্ঞানের নাম ভূবিদ্যা। কোটি বর্ষ পূর্ব্বে পৃথিবীর অবস্থা যেরূপ ছিল, এখন ঠিক সেরূপ নাই। সে সময়ে পার্থিব ঘটনা যে যে নিয়মে সঙ্ঘটিত হইত, এখন সে সে নিয়মে হয় না; আবার বহু বৎসর পরে, যখন সূর্য্যের তাপ মন্দ হইবে, যখন দিবাভাগের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, যখন চন্দ্রের আকর্ষণ মন্দ হইবে, তখন আর ঠিক বর্ত্তমান নিয়মে পার্থিব ব্যাপার ঘটিবে না। কিন্তু ভূতাত্ত্বিকেরা বর্ত্তমান কালের নিয়ম আবিষ্কার করেন বলিয়া ভূপৃষ্ঠের পরিণতির রোধ হয় না। ভাষার পক্ষেও সেই কথা। পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষার বিকৃতি রোধ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত ভাষা স্বাভাবিক নিয়মেই অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে; অথবা বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া অন্য ভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোন বৈয়াকরণ এই স্বাভাবিক বিকারের রোধ করিতে পারেন নাই।

নিয়ম বাঁধা যখন ব্যাকরণকারের উদ্দেশ্য নহে, নিয়ম আবিষ্কারই তাঁহার যখন উদ্দেশ্য, তখন এ আপত্তি টিকিতেই পারে না। বাঙ্গালা ভাষাতে যদি নিয়ম থাকে, সেই নিয়মগুলি জানা আবশ্যক। কেবল সাহিত্যের ভাষা কেন, লৌকিক ভাষা এবং প্রাদেশিক ভাষাও অনিয়ত নহে। ঐ সকল ভাষারও ব্যাকরণ আলোচনা চলিতে পারে। সাহিত্যের ভাষা যত সুশৃঙ্খল ও যত সুনিয়ত, লৌকিক ভাষা ও প্রাদেশিক ভাষা ততটা সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ত নহে; উহার ব্যাকরণও তদনুরূপ হইবে। হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? ভাষাবিজ্ঞান যদি আলোচ্য হয়, তবে ভাষার কোন অবস্থাকে অবহেলা করিলে চলিবে না।

ভাষাবিজ্ঞানের Etymology অংশ লইয়া এত কথা বলা গেল। Syntax অংশ সম্বন্ধেও ঠিক সেই সেই কথা প্রযোজ্য। বাঙ্গালা ভাষার বাক্যরচনা-রীতি সংস্কৃত বাক্যরচনা-রীতির সহিত সর্ব্বাংশে সমান নহে। কাজেই বাঙ্গালা ব্যাকরণের এই অংশেও সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত পার্থক্য থাকিবেই। সাদৃশ্যও থাকিবে, পার্থক্যও থাকিবে। বাঙ্গালা ব্যাকরণে

সেই সাদৃশ্য ও সেই পার্থক্য উভয়েরই বিচার করিতে হইবে। নতুবা ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইবে না।

বাঙ্গালা ভাষা একটা স্বতন্ত্র ভাষা। সংস্কৃতের সহিত ইহার সম্পর্ক আছে; কিন্তু ইহা তৎসত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষা নহে। বহু কোটি মনুষ্যে বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহে; বহু শত লোকে বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে। কিন্তু ইহাদের সকলে সংস্কৃত বুঝে না। সংস্কৃত ভাষা ইহাদিগকে চেষ্টা করিয়া শিখিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা ইহারা মাতৃস্তন্য পানের সহকারে শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত শিখিয়া থাকে। অন্য ভাষাতে যেমন নিয়ম আছে, বাঙ্গালা ভাষাতেও সেইরূপ নিয়ম আছে। নিয়ম না থাকিলে ইহা মনুষ্যের ভাষা হইত না; মনুষ্যের প্রয়োজনে লাগিত না।

কিন্তু সেই সকল নিয়মের এখনও কেহ আলোচনা করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষাকে বিশ্লেষণ করিলে যে সকল নিয়ম বাহির হইতে পারে, তাহা আজ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় সেই সেই নিয়মের আবিষ্কারের জন্য সুধীমণ্ডলীকে আহ্বান করা হইয়াছে মাত্র। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-সভার মুখপাত্র স্বরূপে সুধী জনকে এই কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন মাত্র।

বালকগণের জন্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ-রচনা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ এখনও গঠিত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম-সকল অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত। এই সকল নিয়ম যখন আবিষ্কৃত হইবে, তখন বাঙ্গালার পাণিনি নিজ প্রতিভাদ্বারা পূর্ব্বাচার্য্যগণের আবিষ্কার-সকলের সমন্বয় করিয়া বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ শাস্ত্র সম্পূর্ণ করিবেন। তার পরে সেই ব্যাকরণ বালকদিগের জন্য প্রচারিত হইবে। সেই পাণিনির জন্মের এখনও অনেক বিলম্ব। এখনও তাঁহার জন্মের সময় হয় নাই। আমাদিগকে তাঁহার আবির্ভাবের জন্য আয়োজন করিতে হইবে। আমরা ক্ষুদ্র শক্তি প্রয়োগে বহু দিনে যদি সোপান গড়িয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে তিনি যখন আবির্ভূত হইবেন, তখন সেই সোপানের দ্বারা উচ্চে আরোহণ করিবেন। অথবা তিনি যে মন্দির গড়িবেন, আমাদিগকে তাহার জন্য খড় খুঁটি চুন কাঠ ইষ্টক প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। যদি

কাহারও সাধ্য থাকে, অট্টালিকার নক্‌শাটাও তৈয়ার করিয়া রাখিবেন; কাহারও সাধ্য থাকে, তুই-একটা ভিত্তিপত্তন করিয়া রাখিবেন মাত্র।

মান্যবর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই অর্থে যথার্থ। ব্যাকরণ শাস্ত্র নির্ম্মাণের এখনও সময় হয় নাই, কিন্তু উপাদান-সংগ্রহের সময় হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ এখনই সম্পূর্ণ ব্যাকরণ রচনা করিতে পারিবেন, এরূপ কেহ আশা করেন না; সাহিত্য-পরিষদের কোন বর্ত্তমান বা ভাবী সদস্য যদি নক্‌শাটা প্রস্তুত করিতে পারেন বা অট্টালিকার কোন ভগ্নাংশ গড়িয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার কৃতিত্ব ধন্য হইবে। উপাদান-সংগ্রহ সাহিত্য-পরিষদের সাধ্য। কেন না, উপাদান-সংগ্রহ মজুরের কাজ; ইহাতে কেবল পরিশ্রম আবশ্যক। সংগৃহীত উপাদানগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিতে যে বুদ্ধিটুকু দরকার, তাহা থাকিলেই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে যিনি ব্যাকরণ-রচনা-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাকে যেন মশলা খুঁজিয়া লইতেই দিনক্ষেপ না করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ সেই মশলা সংগ্রহের জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং এই মজুরের কাজে যদি কেহ অপমান বোধ করেন, এই কর্ম্মকে হেয় কার্য্য জ্ঞান করেন, সেই আশঙ্কায় স্বয়ং মজুরের কাজ গ্রহণ করিয়া অন্যের অনুকরণীয় হইয়াছেন মাত্র। তজ্জন্য তিনি ধন্য; তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞতার ভাজন; তজ্জন্য সাহিত্য-সমাজ তাঁহার নিকট ঋণবদ্ধ। তিনি পাণিনি-স্থলাভিষিক্ত হইবার স্পর্দ্ধা করেন নাই; তবে ভবিষ্যতের পাণিনি যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবেন, তাহার কোন ক্ষুদ্র অংশের নক্‌শার আঁচড় ফেলিবার চেষ্টা করিয়া যদি সফল হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য পুরস্কার না দিলে চলিবে কেন?

সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতিদ্বয়ের উদ্দেশ্য আমি এইরূপ বুঝিয়াছি; এবং পরিষদের সম্পাদক-স্বরূপে উপাদান-সংগ্রহের জন্য পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়াছি। ইন্দ্রনাথ বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, যথোচিত উপাদান-সংগ্রহ না হইলে ব্যাকরণ রচিত হইবে না। সেই উপাদান-সংগ্রহই পরিষৎ-পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া আমি গ্রহণ করিয়াছি। যত দিন এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি পরিষদের অনুগ্রহভার বহনে বাধ্য থাকিবে, তত দিন ইহাই পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কিন্তু এই যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ, যাহা এক্ষণে অস্তিত্বহীন, এবং যাহা ভবিষ্যতে রচিত হইবে, ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে রচিত হইবে কি না? এই প্রশ্ন লইয়াও অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। অথচ ইহার অধিকাংশই বাগ্‌জালমাত্র।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃতের আদর্শে রচিত হইবে কি না, এ প্রশ্নে এত গণ্ডগোল কেন হয়, বুঝিলাম না। এক অর্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ কেবল বাঙ্গালায় কেন, সকল ভাষাতেই গ্রহণ করা চলিতে পারে। বস্তুতঃ ভাষাবিজ্ঞান সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণের হাতে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সেরূপ আর কোথাও করে নাই। শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে ভাষাবিজ্ঞানের অবস্থা উন্নত ছিল না। সংস্কৃত ভাষার ও সংস্কৃত ব্যাকরণের আবিষ্কারের পর পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভাষাবিজ্ঞান কিরূপে অনুশীলন করিতে হয়, তাহা শিখিয়াছেন। তৎপরে বিবিধ ভাষার তুলনায় আলোচনা দ্বারা ভাষাবিজ্ঞান তাঁহাদের হাতে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য বিজাতীয় ভাষাতেই যখন সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে, তখন বাঙ্গালা ব্যাকরণে হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

কিন্তু এই আদর্শ হইবে প্রণালীগত আদর্শ। বিজ্ঞানের পদ্ধতি সর্ব্বত্রই একরূপ। ভাষাবিজ্ঞানেও যে পদ্ধতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ও জীববিজ্ঞানে, সর্ব্বত্রই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কিন্তু তাই বলিয়া পদার্থবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান নহে; জ্যোতিষও রসায়ন নহে। সেইরূপ নানা ভাষার আলোচনাতে একই আদর্শ গৃহীত হইলেও সেই নানা ভাষা এক হইয়া যায় না।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের রচনাতেও সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ অবলম্বিত হউক, ইহা প্রার্থনা করি। এমন উৎকৃষ্ট আদর্শ আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষা নহে। উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সামান্য বা সাদৃশ্য প্রচুর পরিমাণে আছে। উভয় ভাষা তুলনা করিয়া সেই সামান্যের আবিষ্কার করিতে হইবে। আবার উভয় ভাষায় প্রকৃতিগত বৈষম্যও প্রচুর আছে। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধে তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। উভয় ভাষা তুলনা করিয়া সেই বৈষম্যের নিয়মগুলি আবিষ্কার করিতে হইবে। সম্পূর্ণ ব্যাকরণে এই সামান্য ও বৈষম্য উভয় পক্ষেরই যথাযথ আলোচনা থাকিবে। কেবল সংস্কৃত

ব্যাকরণের সূত্রগুলি তর্জ্জমা করিয়া দিলে উহা বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইবে না।

বর্ত্তমান শিশুপাঠ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণে এই সকল বৈষম্য দেখাইবার চেষ্টা যে একেবারে হয় না, এমন নহে। কিন্তু সে চেষ্টার বিশেষ কোন মূল্য নাই। যে পরিমাণ পরিশ্রমের ও চিন্তার পর এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা কখনও কেহ করেন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ সেই চেষ্টার জন্য সুধীগণকে আহ্বান করিতেছেন। সুধীগণ কার্য্যে অগ্রণী হইয়া কার্য্যের গৌরবানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন, ইহাই প্রার্থনা করি। ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা তাঁহাদের কার্য্য; বৈজ্ঞানিকোচিত ধৈর্য্য-সহকারে তাঁহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অনর্থক বাদ-বিসংবাদে সময় নাশের প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রীয় বিচারে বিসংবাদ অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু সেই বিবাদে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইতে হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটা অবান্তর কথা আসিয়াছে, সেটারও একটু আলোচনা আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল শব্দ ব্যবহারকালে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন উচিত কি না? এ প্রশ্নও যে কেন উঠে, তাহা জানি না। অথচ ইহা উঠিয়াছে। এক দল পণ্ডিত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, বুঝি বা সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে স্বেচ্ছাচার অবলম্বিত হয়। কিন্তু হরপ্রসাদ বা রবীন্দ্রনাথ কোন স্থানে এরূপ কোন কথা বলিয়াছেন কি যে, সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানিব না? আমি ত কোথাও সেরূপ উক্তি দেখি নাই। এই আশঙ্কা অমূলক; কিন্তু আশঙ্কার অবশ্য একটা ভিত্তি আছে। আজ-কাল অনেকে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগকালে ব্যাকরণ ভুল করিয়া ফেলেন। কেবল যে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ লোকেই ভুল করেন এমন নহে; সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেও ভুল করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের ব্যাকরণে অনভিজ্ঞতার ফল অথবা অনবধানের ফল। 'কেশ-বিনাশিনী তৈল' অথবা 'কৃতান্তাকর্ষণী মহৌষধ' কেবল যে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনেই দেখা যায়, এমন নহে; এ-কালের সাহিত্যেও ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে সকল লেখক অনবধান বা অনভিজ্ঞতা বশে এইরূপ ব্যাকরণ ভুল করেন, তাঁহাদিগের যথাযোগ্য শাস্তি দাও। তাঁহাদিগকে ছেদন ভেদন কুন্থন কর; তাঁহাদিগকে তপ্ত তৈলে ভাজিয়া ফেল; অথবা তাঁহাদের জন্য ডালকুত্তার ব্যবস্থা কর।

কেহ আপত্তি করিবে না। এই অধম লেখক আপত্তি করিবে না। রবীন্দ্রনাথ ও শাস্ত্রী মহাশয়ও আপত্তি করিবেন না। কেন না, ইহা অতি সহজ কথা। সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে সংস্কৃতের নিয়ম চলিবে; সে নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য আমাদের গবেষণা নিরর্থক। কিন্তু বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগে বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়ম চলিবে। সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ অগ্রাহ্য।

বোধ হয় এ বিষয়েও মতদ্বৈধ বর্ত্তমান নাই। বিবাদ উঠে প্রয়োগের বেলায়। দু-একটা দৃষ্টান্ত লইব। অপ্সরাগণ লিখিব, কি অপ্সরোগণ লিখিব? সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে অপ্সরাগণ ভুল হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থানবিশেষে, যেখানে সংস্কৃত-শব্দ-বহুল সমাসঘটালঙ্কৃত পদাবলির ব্যবহার হইতেছে, সেখানে অপ্সরোগণ লিখিতেই হইবে। কিন্তু অপ্সরা একটি বাঙ্গালা শব্দ; উহা সংস্কৃতমূলক; সংস্কৃত অপ্সরস্ শব্দ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা আকারান্ত অপ্সরা এবং ঈকারান্ত অপ্সরী শব্দ বহু দিন হইল প্রচলিত হইয়াছে। সংস্কৃত চক্ষুস্ ধনুস্ প্রভৃতি সকারান্ত শব্দের অন্ত্য বর্ণ বিলুপ্ত হইয়া বাঙ্গালায় উকারান্ত চক্ষু, ধনু প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। 'চক্ষুষ্মান্' 'ধনুর্ব্বাণ' প্রভৃতি স্থলে খাঁটি সংস্কৃতের অনুযায়ী শব্দের প্রয়োগ আছে; কিন্তু 'চক্ষু দ্বারা' 'ধনু ধরিয়া' প্রভৃতি স্থলে বাঙ্গালা শব্দেরই ব্যবহার আছে। সাহিত্যের ভাষায় দুই রকম প্রয়োগই চলিতে পারে। সেইরূপ, অপ্সরা এই বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগে সংস্কৃত ব্যাকরণের দোহাই দেওয়া অনাবশ্যক। সংস্কৃত নিয়মানুসারে অপ্সরাগণ হয় না; কিন্তু বাঙ্গালার নিয়মে হয়। মনে হইতেছে, ভারতচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, 'গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর, অপ্সরাগণের বাস'। তিনি বাঙ্গালা প্রয়োগ-বিধির অনুসরণ করিয়াছেন; সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করেন নাই। ভালই করিয়াছেন; অপ্সরোগণ এখানে ভাল শুনাইত না। বাঙ্গালায় যখন অপ্সরা শব্দ চলিয়া গিয়াছে, তখন বাঙ্গালা সমাসেই বা আপত্তি কি?

'সৃজন' ও 'সর্জ্জন' একটা পুরাতন আপত্তির ক্ষেত্র। সর্জ্জন শব্দ ব্যাকরণসঙ্গত সংস্কৃত শব্দ; কিন্তু উহা বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত চলে নাই। বিসর্জ্জন চলিয়াছে, সর্জ্জন চলে নাই; চলা হয়ত প্রার্থনীয়ও নহে। সংস্কৃত শব্দ এমন অনেক আছে, যাহা বাঙ্গালায় চলে নাই; জোর করিয়া

চালাইলেও সাধারণে গ্রহণ করিবে না। মাইকেল তাহার প্রমাণ। শুনিতে পাই 'সৃ জ ন' শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণসঙ্গত নহে। তথাপি উহা বাঙ্গালা শব্দ ; উহা বহু কাল হইতে প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দ ; বৈষ্ণব লেখকেরা না কি উহা চালাইয়া গিয়াছেন। ম ৎ স্য স্থলে মা ছ লিখিলে যদি ভুল না হয়, তৈ ল স্থলে তে ল লিখিলে যদি ভুল না হয়, স র্জ্জ ন স্থলে বহু কালের প্রচলিত সৃ জ ন লিখিলেই বা ভুল হইবে কেন? তবে সংস্কৃতজ্ঞের লেখনী যদি নিতান্তই কম্পিত হয়, তিনি সৃ ষ্টি লিখুন ; অনুগ্রহপূর্ব্বক স র্জ্জ ন লিখিবেন না।

কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বাদানুবাদে কোন ফল নাই। মূল বিষয়টা ইহাতে লক্ষ্যচ্যুত হইয়া যায়। বাঙ্গালা নামে একটা ভাষা আছে। ইহা সম্ভবতঃ সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া পরিণত হইয়াছে। কেহ বা বলেন, কোন অনার্য্যভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের পরিচ্ছদ পরিয়া, সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া বাঙ্গালা রূপ ধারণ করিয়াছে। হয়ত এ সিদ্ধান্তের সম্যক্ ভিত্তি নাই, হয়ত ইহা অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু প্রমাণ আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, বিনা অনুসন্ধানে তাহা মিলিবে না। **বিনা** পরিশ্রমে ইহার সদুত্তর পাওয়া যাইবে না। ঘরে বসিয়া কাগজ-কলমের সাহায্যে ইহার উত্তর মিলিবে না। আনুমানিক উত্তর অগ্রাহ্য।

ইহার উত্তর দিতে হইলে, যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষাকে কাটিয়া, ছিন্ন করিয়া, ভিন্ন করিয়া, বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে হইবে। শরীরতত্ত্ববিৎ যেমন শবদেহ ছিন্ন করেন, সেইরূপে ভাষার দেহ ছিন্ন করিতে হইবে। শরীরতত্ত্ববিৎ যেমন অণুবীক্ষণ-যোগে প্রত্যেক কোষকে পরীক্ষা করেন, সেইরূপ যুক্তির অণুবীক্ষণ-যোগে প্রত্যেক শব্দকে পরীক্ষা করিতে হইবে। কোন শব্দকে অবহেলা করিলে চলিবে না। শরীরতত্ত্ববিৎ কোন অঙ্গ পরিহার করেন না। সেইরূপ এ শব্দটা slang, এটা প্রাদেশিক, এটা অকিঞ্চিৎকর, এই বলিয়া অবহেলা করিলে চলিবে না। এইরূপ প্রবৃত্তিকে বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি বলে না। তত্ত্বান্বেষীর নিকট কিছুই অবহেলার বিষয় নহে ; কিছুই অকিঞ্চিৎকর নহে। ধূলিকণায় যে তত্ত্ব নিহিত আছে, সৌরজগতের তত্ত্ব তাহা অপেক্ষা গুরুতর না হইতেও পারে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, মরাঠী প্রভৃতির সহিত বাঙ্গালার তুলনা করিতে

হইবে। প্রাদেশিক লৌকিক ভাষা-সমুদয় পরস্পর তুলনা করিতে হইবে। পারিভাষিক শব্দরাশি সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে তাহাদের প্রচলন পরীক্ষা করিতে হইবে। ধাঙ্গড়ের ভাষা, সাঁওতালের ভাষা, কোল দ্রাবিড় ভুটিয়ার ভাষা খুঁজিতে হইবে ; কে বলিতে পারে, ঐ সকল ভাষার সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ কি ; কে জানে, উহাদের কাছে বাঙ্গালার কতটা ঋণ আছে।

কার্য্য অতি বৃহৎ। দশ জনের বা দশ বৎসরের চেষ্টায় ইহা সম্পন্ন হইবে না। কোনও দেশে হয় নাই ; কোনও কালে হয় নাই। বিজ্ঞান কখনও সম্পূর্ণ হয় না। বিজ্ঞানের গতি কেবল পূর্ণতার অভিমুখে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যদি সেই কর্ম্ম কিঞ্চিৎ অগ্রসর করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের অস্তিত্ব নিরর্থক হইবে না।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

আমার মনের ভাব তোমাকে জানাইবার জন্য ভাষা; এই উদ্দেশ্য যত সহজে, যত অল্প শ্রমে ও যত সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয়, ততই ভাষার সার্থকতা।

শব্দ লইয়া ভাষার শরীর ও ভাব লইয়া ভাষার জীবন, এ কথা বলিলে নিতান্ত ভুল হয় না। ভাবের সহিত শব্দের একটা সম্বন্ধ আছে। এ সম্বন্ধটা বিধাতার নির্দ্দিষ্ট কি না, তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টায় আমার কোন প্রয়োজন নাই। অধিকাংশ স্থলে শব্দের ও অর্থের সম্বন্ধ মানুষেরই কল্পিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শব্দ একটা সঙ্কেত মাত্র। পাঁচ জনে মিলিয়া মিশিয়া সঙ্কেতটা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এক অর্থে প্রয়োগ করিলেই জীবনযাত্রা চলিয়া যায় ও ভাষার উদ্দেশ্যও সাধিত হয়।

মানুষের মনে যত কিছু ভাবের উদয় হইতে পারে, তাহার প্রত্যেকের জন্য এক-একটি পৃথক্ সঙ্কেত থাকিলে বোধ করি, ভাষাকে সম্পূর্ণ ভাষা বলা যাইতে পারিত। আমাদের মনে ভাবের সংখ্যার সীমা নাই, কিন্তু আমাদের শব্দসঙ্কলনশক্তি সঙ্কীর্ণ। ফলে কয়েকটি মাত্র শব্দ বা সঙ্কেত লইয়া অসংখ্য মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হয়। এইখানে ভাষার প্রধান অপূর্ণতা। কিন্তু এই অপূর্ণতা পরিহারের উপায় দেখা যায় না।

এই দোষ কথঞ্চিৎ পরিহারের জন্য নানাবিধ কৌশল প্রযুক্ত হয়। পাঁচটা ভাব একজাতীয় হইলে আমরা একটা শব্দকেই উপসর্গ প্রত্যয়াদি যোগে নানা উপায়ে গড়িয়া পিটিয়া নানাবিধ আকার দিয়া থাকি। কিন্তু ইহাতেও কুলায় না।

অগত্যা বাধ্য হইয়া একটা শব্দ কখন কখন পাঁচটা অর্থে ব্যবহার করিতে হয়। ইহা ভাষার নির্দ্ধনতাসূচক। আবার একই অর্থে কখন কখন পাঁচটা শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহা নির্দ্ধনের ধনবত্তার আড়ম্বর। এই আড়ম্বর না থাকিলে ভাষার সৌষ্ঠবার্থ বসন ভূষণ প্রভৃতির একটু হানি হইত, কিন্তু তাহার অস্থিমজ্জা মাংসপেশী সবল ও সমর্থ হইত।

তবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভূমি কর্ষণ করিতে গিয়া কৃষিযন্ত্রের সৌষ্ঠব অপেক্ষা কার্য্যকারিতার উপর অধিক দৃষ্টি রাখিতে হয়। যেখানে মাটি খুব দড়, সেখানে এমন অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে সেই শক্ত মাটিতে চাষ

চলে। যখন শুষ্ক নিরেট জ্ঞানের আলোচনা লক্ষ্য করিতে হইবে, তখন ভাষার পূর্ণতার দিকেই বেশী দৃষ্টি রাখিতে হয়।

বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠনের সময় এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে। যে শব্দটি প্রয়োগ করিবে, তাহার যেন একটি সুনির্দ্দিষ্ট, বাঁধাবাঁধি, সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট তাৎপর্য্য থাকে। প্রত্যেক শব্দ একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে; সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করিবে না, এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের প্রয়োগ করিবে না। এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূল সূত্র। এই মূল সূত্রে দৃষ্টি রাখিয়া ভাষা প্রণয়ন করিলে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে।

জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে বিজ্ঞানের ভাষার পরিধি ও প্রসার বিস্তৃত হয়। ভাষা নূতন ভাবে গঠিত হয়। নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হয়; নূতন শব্দের প্রণয়ন করিতে হয়। উল্লিখিত কয়েকটি সূত্র মনে রাখিয়া পরিভাষা-প্রণয়নে প্রবৃত্ত না হইলে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং যাঁহারা জ্ঞানপ্রচারে ব্রতী, তত্ত্বপ্রচার ও সত্যপ্রচার যাঁহাদের ব্যবসায়, তাঁহাদিগকে বিষয়ের গৌরববোধে সাবধান হইয়া চলিতে হইবে।

পাশ্চাত্য জাতির সহিত আমাদের সম্পর্ক ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতির বহুশ্রমাহৃত জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে প্রসারিত হইয়াছে। আমরা ইচ্ছা করিলে অপরের সমাহৃত এই অতুল সম্পত্তি আমাদের নিজস্ব করিয়া লইতে পারি। ইহাতে ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত বা জাতিগত বিরোধ বা বৈরিতা নাই। এক্ষণে যদি আমরা অলস হইয়া এই ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিতে পরাঙ্‌মুখ হই, তাহাতে যে ক্ষতি, যে লজ্জা, যে পাপ হইবে, আমাদিগকেই তাহার ফলভাগী হইতে হইবে। আমরা যদি আমাদের গৌরব রাখিতে চাই, তবে আমাদের প্রাচীন কালে শিষ্য যেরূপ বিনয়ের সহিত অবনতশিরে গুরুসমীপে উপস্থিত হইত, সেইরূপ বিনয়ের সহিত শিক্ষার্থিরূপে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিম্মিত বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারস্থ হইতে হইবে।

কিন্তু এই জ্ঞানার্জ্জনের পথে বিদেশীয় ভাষা প্রধান অন্তরায়স্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। ফরাসী হয়ত আশা করেন, তাঁহার ভাষা কালে বিশ্বজগৎকর্তৃক গৃহীত হইবে; ইংরেজ হয়ত আশা করেন, তাঁহার ভাষা বিশ্বভাষা হইয়া দাঁড়াইবে; কিন্তু সম্প্রতি সে আশা সুদূরপরাহত। শুনা

যায়, অনেকে সার্ব্বভৌমিক ভাষা সৃষ্টির জন্য প্রয়াস পাইতেছেন ; কিন্তু এখনও সে দিন আসিতে বিলম্ব আছে। সুতরাং পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জ্জন করিতে গেলে বিজাতীয় অনাত্মীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ না করিলে চলিবে না।

পাশ্চাত্য জাতির উপার্জ্জিত জ্ঞানরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য আমাদিগকে পাশ্চাত্য ভাষার অনুশীলন করিতে হইবে। কিন্তু ঐ বিজাতীয় ভাষা কখন আমাদের আপনার ভাষা হইবে না ; কখনও আমরা অন্তরের কথা ঐ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। যদি আমাদের স্বজাতিকে ও আমাদের আত্মীয়বর্গকে পাশ্চাত্য জাতির উপার্জ্জিত জ্ঞানসম্পত্তির অধিকারী করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের মাতৃভাষাকে এইরূপে সংস্কৃত মার্জ্জিত পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে সেই মাতৃভাষা এই জ্ঞানবিস্তার কর্ম্মের ও জ্ঞানপ্রচার কর্ম্মের যোগ্য হয়। এই বঙ্গভাষারই অঙ্গে নূতন রক্ত সঞ্চালিত করিয়া, তাহাকে পুষ্ট সমর্থ পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে। এই কার্য্যসম্পাদন এখন কৃতী বাঙ্গালীর অন্যতম কার্য্য।

বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থের প্রণয়ন কিছু দিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। ভরসা করা যায়, এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িবে। গ্রন্থকারগণ ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দের বাঙ্গালায় অনুবাদ ও প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দের অনুবাদে যত দূর সাবধান হওয়া আবশ্যক, সকলে তত দূর সাবধান হয়েন না। গ্রন্থকারগণের দোষ দেওয়াও সর্ব্বত্র সমীচীন নহে : কার্য্যটি প্রকৃতপক্ষে বড়ই দুরূহ।

সম্প্রতি পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্মুখে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পরিষদ্‌ও বঙ্গসাহিত্যের গতিপথনির্দ্দেশে উদ্যোগী হইয়া ঐ কার্য্যের ভারগ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং এই সময়ে এই সম্পর্কে দুই চারিটি কথা উত্থাপন করা অসাময়িক না হইতে পারে।

বিজ্ঞানের ভাষার সহিত বিজ্ঞানের উন্নতির অতি নিকট-সম্বন্ধ। যাঁহারা বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাঁহারাই এই সম্বন্ধ জানেন। বিজ্ঞানের ভাষা প্রচলিত ভাষা হইতে কয়েকটি কারণে স্বতন্ত্র। উভয়ত্র ভাষার উদ্দেশ্য এক হইলেও, একত্র সৌষ্ঠবের দিকে, অন্যত্র সামর্থ্যের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিতে হয়। বিজ্ঞানের ভাষা সমর্থ ভাষা না হইলে, বিজ্ঞান

করে না ; অঙ্গে বল পায় না ; বিজ্ঞানের পরিণতি ও বিকাশ ঘটে না। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, বিজ্ঞানের উন্নতি যেমন প্রতিভাদ্বারা সাধিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের ভাষাসংগঠনেও সেইরূপ সময়ে সময়ে অসাধারণ প্রতিভা প্রযুক্ত হইয়াছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব।

বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে গণিতবিদ্যা। গণিতবিদ্যার ভাষা প্রচলিত ভাষা হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন অবলম্বন করিয়া গণিতবিৎ মনের কথা ব্যক্ত করেন। পাটীগণিতে দশমিক লিপি ও বীজগণিতে সাঙ্কেতিক লিপি যত দিন প্রচলিত না হইয়াছিল, তত দিন ঐ দুই শাস্ত্রের উন্নতির আরম্ভ হয় নাই। ভারতবর্ষ ঐ উভয়বিধ লিপিরই আকরস্থান। ইউরোপে নিউটন ও লাইব্‌নিজ্‌ একই সময়ে Differential Calculus নামক প্রচণ্ড গণিতপ্রক্রিয়ার আবিষ্কার করেন। কিন্তু নিউটনের আবিষ্কৃত লিপি লাইব্‌নিজের উদ্ভাবিত লিপিপ্রণালীর নিকট দাঁড়াইতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার অভূতপূর্ব্ব উন্নতির সহিত পদার্থবিদ্যার জন্য স্বতন্ত্র ভাষা সঙ্কলনের প্রয়োজন হইয়াছে। উপযুক্ত ভাষা সঙ্কলনের জন্য প্রতিভাবান্ পুরুষগণ আপনাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন। মহামতি ল্যাবোয়াশিয়া রসায়নবিদ্যা ও রসায়নের সাঙ্কেতিক ভাষা, উভয়েরই জন্মদাতা। এই সাঙ্কেতিক ভাষার অস্তিত্ব না থাকিলে রসায়নবিদ্যার আজ কি অবস্থা ঘটিত, বলা যায় না।

পরিষদের কর্ত্তব্য সঙ্কীর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রমধ্যে অনেক কাজ করিবার আছে ; এবং পরিষৎ যদি সাবধান হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে মাতৃভাষার যথার্থ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা, কথাটি বড়ই প্রকৃত ; এবং ভিন্ন ভিন্ন International Congress প্রভৃতির সমবেত চেষ্টায় সম্প্রতি ইউরোপে বৈজ্ঞানিক ভাষার কত দূর সামর্থ্য সাধিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলে পাঁচ জনের সমবেত চেষ্টা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা থাকে না।

ইংরেজী হইতে অনুবাদের সময় যে যে বিষয় উপস্থিত হইতে পারে, তাহার দুই একটির উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের সমাপ্তি করিব।

ইংরেজী শব্দের অনুবাদ বা রূপান্তরদান না করিয়া উহাদিগকে অবিকল গ্রহণ করিতে পারা যায় কি না, এই কথা প্রথমে বিবেচ্য। সর্ব্বত্র এই ব্যাপার সাধ্য হইলে পরিভাষা-প্রণয়নে চিন্তা করিবার কিছু থাকিত না।

কিন্তু সর্ব্বত্র ইহা সাধ্য নহে, কর্ত্তব্যও নহে। ইংরেজীতে এমন শব্দ অনেক আছে, যাহা অবিকল গ্রহণ করিলে কালে বাঙ্গালার সহিত মিশিয়া যাইতে পারে, এবং আপাততঃ একটু অসুবিধা ঘটিলেও কালে ঐ সকল শব্দ মাতৃভাষার অঙ্গীভূত হইয়া যাওয়ার সম্ভব।

ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রায় সর্ব্বত্রই বিজাতীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনের চেষ্টা হইয়াছে। ইংরেজী ভাষা লাটিন গ্রীক ফরাসী হইতে দুই হাতে ঋণ করিয়া আত্মপুষ্টি সাধন করিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষাতে আরবী ফারসী ও ইংরেজী শব্দ অজস্র পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সকল বিদেশীয় শব্দ এখন নিতান্ত আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগকে ত্যাগ করিবার উপায় নাই; ত্যাগ করিলে ভাষারই অঙ্গহানি ও শ্রীহানি হইবে মাত্র। যখন যে জাতির সহিত ঐতিহাসিক কারণে কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখনই সেই জাতির ভাষার নিকট ঋণগ্রহণ না করিলে চলে না। বাঙ্গালা ভাষার কোষগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে, ফরাসী পোর্টুগীজ প্রভৃতি ভাষার নিকটেও প্রচুর ঋণগ্রহণ আবিষ্কৃত হইবে। প্রচলিত ভাষার পুষ্টির জন্য এইরূপ ঋণগ্রহণ আবশ্যক; বৈজ্ঞানিক ভাষার পুষ্টির জন্য উহা অবশ্যম্ভাবী। এই ঋণগ্রহণে কাতর হইলে চলিবে না; এখানে অযথা আত্মাভিমান প্রকাশ করিতে গেলে নিজেরই ক্ষতি।

ইংরেজী শিল্পের ও ইংরেজী বিজ্ঞানের বিস্তারের সহিত অনেক ইংরেজী শব্দ আমাদের দেশে লোকমুখে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে ও ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। টেবিল চেয়ার বাক্স তোরঙ্গ বোতল বিস্কুট প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্তুর নামের মত, কোর্ট আপীল পুলিস প্রভৃতি বিলাত হইতে আমদানি পদার্থের মত, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ টেলিফোন, মিনিট, সেকেণ্ড, ডিগ্রি প্রভৃতি ইংরেজী শব্দ এখন আমাদের আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের সবগুলি এখনও আমাদের মাতৃভাষার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায় নাই; কালে মিশিয়া যাইবে। ইহাদের প্রবেশপথ রোধ করিয়া তত্তৎস্থানে খাঁটি দেশী শব্দ সঙ্কলনের প্রয়াস যুক্তিসঙ্গত নহে।

রসায়নবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান হইতে এইরূপ ইংরেজী শব্দ আমাদিগকে অকাতরে অবিকল গ্রহণ করিতে হইবে। অন্য উপায় নাই।

রসায়নশাস্ত্রোক্ত সত্তরটা মূল পদার্থের জন্য সত্তরটা খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ সঙ্কলনের প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র।

কিন্তু এমন স্থলেও কথা উঠিতে পারে; Uranium ও Tungsten না হয় ইংরেজী হইতে অবিকল গ্রহণ করা গেল; Oxygen Hydrogen Chlorine প্রভৃতি বিশ্বব্যাপী পদার্থেও কি খাঁটি বাঙ্গালা নাম থাকিবে না? এ সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়ম দেওয়া চলে না; সুবিধা বিবেচনায় প্রত্যেকটির জন্য পৃথক্ ভাবে বিচার করিতে হইবে।

বোধ করি, কোন ভাষাতে এমন কোন শব্দ প্রচলিত নাই, সংস্কৃত ভাষার অতলস্পর্শ সমুদ্র মন্থন করিলে যাহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ না মিলিতে পারে। তথাপি বিদেশী সামগ্রী গ্রহণ করিব না, এরূপ পণ ধরিয়া বসার কোন প্রয়োজন দেখি না।

সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে চাহিলেই এ সম্বন্ধে সঙ্গত উত্তর মিলিতে পারে। মহৈশ্বর্য্যশালিনী আর্য্যা সংস্কৃত ভাষাও যে অনার্য্য দেশজ শব্দ অজস্রভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মপুষ্টি সাধনে পরাঙ্মুখ হন নাই, তাহা সংস্কৃত ভাষার কোষগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন কালে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল ম্লেচ্ছ বৈদেশিকের সহিত আমাদের আদান-প্রদান চলিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতেও ঋণগ্রহণে এ দেশের আচার্য্যেরা কুণ্ঠিত হন নাই।

প্রাচীন কালে হিন্দুর সহিত গ্রীকের জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে আদান-প্রদান চলিয়াছিল। সেই সময়ে সংস্কৃত জ্যোতিষের ভাষায় খাঁটি গ্রীক শব্দ অনেকগুলি প্রবেশ করে। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহাদের নিকট এই সংবাদ নূতন, তাঁহাদের অবগতির ও কৌতূহল তৃপ্তির জন্য নীচে এইরূপ শব্দের একটি তালিকা দিলাম।

খাঁটি সংস্কৃত	গ্রীক হইতে গৃহীত সংস্কৃত	গ্রীক
মেষ	ক্রিয়	Krios
বৃষ	তাবুরি	Tauros
মিথুন	জিতুম	Didumos
কর্কট	——	Karkinos
সিংহ	লেয়	Leon
কন্যা	পার্থোন	Parthenos
তুলা	জূক	Jugon

খাঁটি সংস্কৃত	গ্রীক হইতে গৃহীত সংস্কৃত	গ্রীক
বৃশ্চিক	কৌর্প	Skorpios
ধনুঃ	তৌক্ষিক	Toxikos
মকর	আকোকের	Akokeros
কুম্ভ	হৃদ্রোগ	Hudrokoos
মীন	ইথম্	Ikthos
	হেলি	Helios
	হিম্ন	Hermes
	আর	Ares
	জ্যৌ	Zeus
	কোণ	Kronos
	আস্ফুজিৎ	Aphrodite
	হোরা	hora
	কেন্দ্র	kentron
	দ্রেক্কাণ	dekanos
	লিপ্তা	lepta
	অনফা	anaphe
	সুনফা	sunaphe
	দুরুধরা	doruphoria
	আপোক্লিম	apoklima
	পণফর	epanaphora
	জামিত্র	diametros
	ইত্যাদি।	

সুতরাং যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পরের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তখন আমাদের পক্ষেও সেইরূপ ঋণ গ্রহণে লজ্জা দেখাইলে কেবল অহম্মুখতাই প্রকাশ পাইবে।

তবে সর্ব্বত্র ঋণ গ্রহণে প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা রত্নগর্ভা। ঐ অনন্ত আকর হইতে যথেচ্ছ পরিমাণে চিরদিন ধরিয়া রত্ন সংগ্রহ করিলেও এই ভাণ্ডার শূন্য হইবার নয়। ইংরেজী বিজ্ঞানে গ্রীক ভাষা হইতে প্রভূত পরিমাণে শব্দ সঙ্কলন করা হয়। ইংরেজীর সহিত গ্রীকের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের সম্বন্ধ তদপেক্ষা প্রচুরভাবে সন্নিকট; অথচ সমৃদ্ধিতে সংস্কৃত ভাষা গ্রীক হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে।

সুতরাং আমরা নিশ্চিন্তভাবে দ্বিধাহীন হইয়া সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের ভাষা পুষ্ট করিতে পারি। কিন্তু এইখানে আর একটি কথা আছে। বিশুদ্ধ সংস্কৃতের পাশে খাঁটি প্রচলিত বাঙ্গালা কখন কখন আসিয়া দাঁড়ায়। সেই খাঁটি চলিত বাঙ্গালার দাবি কতক পরিমাণে আমাদিগকে রক্ষা করিতেই হইবে। চলিত ইংরেজী হইতে কতকগুলি শব্দ বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় গৃহীত হইয়াছে। এই শব্দগুলি যেমন উপযোগী, তেমনই মিষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি নিম্নে দিলাম—mass, force, stress, strain, step, spin, twist, shear, torque, whirl, squirt, pressure, tension, flux, power, work. বিজ্ঞানে এই শব্দগুলি প্রত্যেকে সুনির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চলিত ভাষায় উহাদের যে অর্থ, বিজ্ঞানের ভাষায় ঠিক সেই অর্থ নহে। এইরূপে চলিত বাঙ্গালা হইতে কতকগুলি শব্দ বিজ্ঞানের ভাষায় গ্রহণ করা চলিতে পারে। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি নাম নিম্নে দিলাম। পাঠকেরা ইহাদের উপযোগিতা বিবেচনা করিবেন।

mass	...	বস্তু
lens	...	পরকলা
prism	...	কলম
wind	...	হাওয়া
work	...	কাজ
tension	...	টান

নূতন শব্দ সঙ্কলনের সময় ব্যবহারে সুবিধার ও উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। ব্যাকরণের দিকে ও ব্যুৎপত্তির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে গেলে কাজের ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে অভিধান-ছাড়া শব্দ সৃষ্টি করিতে হয়, অথবা আভিধানিক শব্দকে সুবিধামত কাটিয়া ছাঁটিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ভাষা মূলে সঙ্কেত মাত্র, ইহা মনে রাখিলে এই বিষয়ে আপত্তির কোন সঙ্গত কারণ থাকিবে না।

বলবিজ্ঞান ও তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা প্রস্তুত করিবার জন্য বিলাতি ব্রিটিশ এসোসিয়েশন যে সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার রিপোর্ট দেখিলেই এ কথা বুঝা যাইবে। রিপোর্টে ব্যাকরণের ও ব্যুৎপত্তির ও বিশুদ্ধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হয় নাই। সমিতির রিপোর্ট অনুসারে কতকগুলি অভিধান-ছাড়া ও ব্যাকরণ-দুষ্ট—dyne, erg প্রভৃতি নূতন

শব্দ বিজ্ঞানের পরিভাষায় স্থান পাইয়াছে ; এবং ইউরোপের সর্ব্বত্রই সকল জাতির মধ্যেই ঐ সকল শব্দ সমাদৃত ও গৃহীত হইয়াছে।

প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকের নামানুসারে তাঁহাদের নাম কাটিয়া ছাঁটিয়া কতকগুলি নূতন শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। দৃষ্টান্ত :—

Ohm	হইতে	ohm
Volta	...	volt
Ampere	...	ampere
Faraday	...	farad
Watt	...	watt
Joule	...	joule
Henry	...	henri
Coulomb	...	coulomb
পুনশ্চ second এবং ohm	সমাসবদ্ধ করিয়া	sec-ohm
ampere এবং meter	সমাসবদ্ধ করিয়া	am-meter
এবং ohm	উলটাইয়া	mho

পুনশ্চ—

centimetre	=	hundredth of a metre
kilogramme	=	a hundred grammes
megohm	=	a million ohms
microfarad	=	millionth part of a farad
milli-ampere	=	thousandth part of an ampere
gramme nine	=	10^9 grammes
ninth gramme	=	$\frac{1}{10^9}$ of a gramme

সুবিধা সরলতা শ্রুতিসুখতা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ব্যাকরণ বা ব্যুৎপত্তির খুটিনাটি ত্যাগ করিয়া, একটু সাহসের সহিত চলিতে হইবে, মূল কথাটা এই।

প্রাচীন কালে সংস্কৃত-সাহিত্যে যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে এই সাহসিকতার দৃষ্টান্ত পদে পদে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ব্যাকরণ শাস্ত্রে লট্ লোট্ লঙ্ লুঙ্ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের দৃষ্টান্ত থাকিতে দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, গোলমিতি (Spherical Trigonometry), জ্যোতিষ

প্রভৃতি শাস্ত্রের রচয়িতারা কিরূপ সাহসের সহিত নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতেন, পুরাতন শব্দকে নূতন সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিতেন, চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রচলিত কোষগ্রন্থের পাতা খুঁজিয়া শব্দ সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে বিজ্ঞানের গতি কচ্ছপের গতির ন্যায় মন্থর হইত, সন্দেহ নাই। ঐ সকল শাস্ত্রে যে সকল শব্দ যে যে অর্থে প্রচলিত আছে, আমরা নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে তাহা এখন গ্রহণ করিতে পারি। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালায় যাঁহারা বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ বর্তমান থাকিতে তাহার প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া নূতন শব্দ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্নে কতকগুলি প্রাচীন পারিভাষিক শব্দের উদাহরণ দেওয়া গেল।

অক্ষান্তর	=	latitude (terrestrial)
লম্বান্তর	=	co-latitude
দেশান্তর	=	longitude
ধ্রুবক	=	longitude (celestial)
বিক্ষেপ	=	latitude (celestial)
ক্ষিতিজ	=	horizon
প্রতিবৃত্ত	=	eccentric circle
মন্দফল	=	equation of the centre
উচ্চরেখা	=	line of apsides
মন্দোচ্চ	=	apogee
রবিমধ্য	=	mean sun
চন্দ্রমধ্য	=	mean moon
ভুজজ্যা	=	sine
কোটিজ্যা	=	cosine
ক্রমজ্যা	=	right sine
উপক্রমজ্যা	=	versed sine
পরিধি	=	circumference (of a great circle)
স্ফুটপরিধি	=	rectified circumference (of a small circle)
কক্ষা	=	orbit
পাত	=	node
স্ফুট, স্পষ্ট	=	corrected, rectified, true
ক্রান্তি	=	declination

দৃক্‌সূত্র	=	line of vision
লম্বন	=	parallax
অধিমাস	=	intercalary month
সূচী	=	cone
স্বয়ংবহ যন্ত্র	=	automatic instrument
শৃঙ্গ	=	cusp
চক্র	=	circle
চাপ	=	semicircle
তুরীয়	=	quadrant
পট্টিকা	=	index arm

ইত্যাদি।

সুন্দর সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ বর্ত্তমান থাকিতেও কোন কোন স্থলে বাঙ্গালায় নূতন শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। এখনও সেগুলিকে বর্জ্জন করিয়া প্রাচীন শব্দ গ্রহণের সময় যায় নাই।

ইংরেজীতে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে, সেগুলি ভ্রান্তিজনক অর্থ সূচনা করে। অথচ সেগুলি বহু কাল ধরিয়া প্রচলিত থাকায় এক্ষণে ভাষায় গাঁথা পড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানের ভাষা হইতে উহাদের নির্ব্বাসন দুরূহ হইয়াছে। অথচ সেই সকল শব্দ এতই ভ্রমপূর্ণ ভাব আনিয়া ফেলে যে, নূতন শিক্ষার্থীর বিষম অসুবিধা হয়। এখন শিক্ষার্থীর জন্য যাঁহারা গ্রন্থ লেখেন, তাঁহাদিগকে সেই শব্দগুলিকে লইয়া কিছু বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। স্বতন্ত্র টিপ্পনী করিয়া বুঝাইতে হয় যে, এই এই শব্দে যেন এই এই অর্থ বুঝিও না। বাঙ্গালায় সেই সেই ইংরেজী শব্দের ঠিক শব্দগত অনুবাদ করিলে আমাদেরও সেই বিপদের সম্ভাবনা। নূতন অনুবাদের সময় এই দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হইবে। দুঃখের বিষয়, ইহার মধ্যেই এইরূপ অনেকগুলি শব্দ বাঙ্গালা বিজ্ঞান-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। অনুবাদকগণ এই বিপদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই। নিম্নে এ বিষয়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ইংরেজী Oxygen শব্দের যৌগিক অর্থ অম্লোৎপাদক। উহার বাঙ্গালায় অম্লজান শব্দ গৃহীত হইয়াছে। Oxygen শব্দের যখন সৃষ্টি হয়, তখন পণ্ডিতদিগের ধারণা ছিল, অম্ল পদার্থ মাত্রেই ঐ বায়ু বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ ঐ বায়ুর বিদ্যমানতাই পদার্থের অম্লতার কারণ। কিন্তু পরে

জানা গিয়াছে, এমন অনেক তীব্র অম্ল পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহাতে Oxygen একেবারেই নাই ; এমন কি, অম্লতার কারণ Oxygen নহে, অম্লতার কারণ Hydrogen। এই কারণে এক্ষণে Oxygen শব্দকে যৌগিক শব্দরূপে গ্রহণ না করিয়া রূঢ় শব্দরূপে গ্রহণ করিতে হয়। পঙ্কজ যেমন পঙ্কজাত পদার্থ মাত্রকে না বুঝাইয়া কেবল পদ্মকেই বুঝায়, সেইরূপ Oxygen অম্লজনক পদার্থ না বুঝাইয়া এমন কোন পদার্থকে বুঝায়, যাহার সহিত অম্লতার কোন সম্পর্ক না থাকিতেও পারে। Oxygenএর বাঙ্গালায় অম্লজান শব্দ বজায় রাখিলে এখন যে বিশেষ ক্ষতি আছে, তাহা নহে। বরং উহা যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন আর উহাকে ত্যাগ না করাই ভাল। তবে প্রথম অনুবাদের সময়ে এই আপত্তিটুকুর উপর দৃষ্টি রাখিলে ভাল হইত।

ইংরেজী পদার্থবিদ্যায় এমন আরও কতকগুলি শব্দ প্রচলিত হইয়াছে, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিষচোখে দেখেন। এই শব্দগুলির অস্তিত্বে তাঁহাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। এগুলি ভাষা হইতে কোনরূপে উঠাইয়া দিতে পারিলে তাঁহাদের যেন শান্তিলাভ হয়। দৃষ্টান্তস্থলে specific heat, latent heat, centrifugal force প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকারগণ উহাদের স্থলে আপেক্ষিক তাপ, গূঢ় তাপ, কেন্দ্রাপসরণ-বল অথবা কেন্দ্রবিমুখ-বল প্রভৃতি শব্দ চালাইয়াছেন। আমার বিবেচনায় উহাদের প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ড প্রয়োগের সময় এখনও অতীত হয় নাই। ইংরেজীতে heat ও temperature এই দুইটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। প্রচলিত ভাষায় অর্থভেদের এই নির্দ্দেশ না থাকায় শিক্ষার্থীরা সহজে উভয়ের পার্থক্য ধরিতে পারে না। বাঙ্গালায় heat অর্থে তাপ ও temperature অর্থে উষ্ণতা প্রচলিত হইয়াছে। Heat মাপিবার যন্ত্রের ইংরেজী নাম calorimeter ; temperature মাপিবার যন্ত্রের নাম thermometer. অথচ বাঙ্গালায় thermometer অর্থে তাপমান শব্দ চলিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু calorimeterএর বাঙ্গালা কি হইবে ?

আর একটি মাত্র কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। ইংরেজী পদার্থবিদ্যার পরিভাষায় এখনও ব্যবস্থার যেটুকু অভাব আছে, তাহা দূর করিবার জন্য বড় বড় পণ্ডিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া বিজ্ঞান-বিদ্যায় শব্দ প্রণয়নের জন্য

যেন একটা নূতন ব্যাকরণ গঠিত হইতেছে। বাঙ্গালায় পরিভাষা প্রণয়নের সময় আমাদের তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রসায়ন শাস্ত্রে ইংরেজীতে যে শৃঙ্খলাবদ্ধ সুনিয়ত পরিভাষা প্রবর্ত্তিত আছে, অন্য কোন শাস্ত্রে বুঝি তাহার তুলনা নাই। বাস্তবিকই রাসায়নিক পরিভাষার সেই শৃঙ্খলা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। পদার্থবিদ্যাতেও সেইরূপ শৃঙ্খলাবিশিষ্ট পরিভাষা প্রচলন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

পদার্থবিদ্যায় আচার্য্য অলিবার হেবিসাইড্ এবং ফিট্জ্-জেরাল্ড্ যে নূতন পরিভাষা প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা নিম্নের দৃষ্টান্ত দেখিলে পাঠক কতকটা বুঝিতে পারিবেন। এই প্রস্তাব শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত হইতেও পারে। বাঙ্গালায় যাঁহারা নূতন পরিভাষা প্রণীত করিতে যাইবেন, তাঁহারা যেন এই দৃষ্টান্ত হইতে উপদেশ গ্রহণ করেন, এই প্রার্থনা।

অলিবার হেবিসাইড্-প্রদর্শিত রীতি :—

Conduct*ion* = *phenomenon* of conduction of electricity,
তাড়িত-পরিচালন ব্যাপার

Conduct*ance* = *amount* of electricity conducted
অর্থাৎ পরিচালিত তাড়িতের পরিমাণ

Conduct*ivity* = *co-efficient* of condution
অর্থাৎ পদার্থ-বিশেষের পরিচালন-শক্তি

এই রীতি অনুসারে Fitz-Geraldএর প্রস্তাবিত পরিভাষা—

Phenomenon	*Amount*	*Co-efficient*
diffusion	diffusance	diffusivity
expansion	expansance	expansivity
gravitation	gravitance	gravitivity
inertia	inertance (= mass)	intertivity (= density)
rotation	rotatance	rotativity

এমন কি,

heat	heatance (= amount of heat)	heativity (= specific heat)

ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, heatance, heativity প্রভৃতি শব্দ শুনিলে শাব্দিক পণ্ডিতেরা সভয়ে কর্ণ আচ্ছাদন করিবেন। কিন্তু আচার্য্য ফিট্জ্-জেরাল্ড সাহসের সহিত বলেন,—"Most of the words appear at first as if they would prove most awkward in practice, but remembering similar fears (which subsequently proved groundless) in similar matters, one is afraid to say that they are due to more than unfamiliarity." অর্থাৎ আপাততঃ ভয় হইতে পারে, এই সকল শব্দের ব্যবহারে লোকে বিরক্ত হইবে; কিন্তু এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই; একবার অভ্যাস হইয়া গেলে এই সকল শব্দ বিজ্ঞানের ভাষায় দিব্য চলিয়া যাইবে।

শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা

বৈদিক সাহিত্যে পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যায়। পশুযজ্ঞ উপলক্ষে পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করা হইত। নিহত পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শাস নামক ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া পৃথক্ করা হইত। যে ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিত, তাহার নাম ছিল শমিতা। যজ্ঞভূমির সংলগ্ন যে স্থানে এই কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইত, সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেইখানেই অগ্নি জ্বালিয়া পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাক করা হইত। যে অগ্নিতে পাক হইত, তাহার নাম শামিত্র অগ্নি। যে দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, তাঁহার উদ্দেশে যাগ—প্রধান যাগ। প্রধান যাগের সম্পূর্ণতার জন্য স্বিষ্টকৃৎ নামক অগ্নির উদ্দেশে যাগ করিতে হইত; ইহার নাম স্বিষ্টকৃৎ যাগ। প্রধান যাগের পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে একাদশ জন দেবতার উদ্দেশে একাদশটি যাগ করা হইত; তাহার নাম প্রযাজ যাগ। প্রধান যাগ সম্পাদনের পর হুতাবশিষ্ট যজ্ঞীয় দ্রব্য যজমান ও ঋত্বিকেরা একযোগে ভক্ষণ করিতেন। এই ভক্ষণীয় দ্রব্যের নাম ইড়া। উহা ভক্ষণের নাম ইড়া-ভক্ষণ। ইড়া-ভক্ষণেই প্রধান যাগ সমাপ্ত হইত বটে, কিন্তু তৎপরেও কতিপয় আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান না করিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইত না। এই অসম্পূর্ণতা বিধানের জন্য অপর একাদশ জন দেবতার উদ্দেশে একাদশ যাগ অনুষ্ঠিত হইত; ইহার নাম অনুযাজ যাগ। অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ স্বহস্তে এই প্রধান যাগ, স্বিষ্টকৃৎ যাগ, প্রযাজ যাগ ও অনুযাজ যাগ সম্পাদন করিতেন। একাদশ অনুযাজ যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপ্রস্থাতা নামক আর একজন ঋত্বিক্ আরও একাদশটি যাগ সম্পাদন করিতেন; ইহার নাম উপযাজ যাগ। এই সমুদয় যাগ যজমানের মঙ্গলার্থ অনুষ্ঠিত হইত।

আহবনীয় নামক অগ্নিতে মন্ত্রসহকারে যজ্ঞীয় দ্রব্য নিক্ষেপদ্বারা যাগ অনুষ্ঠিত হইত। যজমান সপত্নীক হইয়া যাগ করিতেন। যজমানের পত্নী স্বামীর সমান ফল পাইতেন। তৎসত্ত্বেও যজমান-পত্নীর পক্ষ হইতে দেবপত্নী-গণের উদ্দেশে পৃথক্‌ভাবে যাগ করিতে হইত, ইহার নাম পত্নী-সংযাজ যাগ। গার্হপত্য নামক অগ্নিতে এই পত্নী-সংযাজ যাগ অনুষ্ঠিত হইত।

পশুবধের পর পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শামিত্র অগ্নিতে পাক করিয়া ঐ সমুদয় যাগ,—প্রধান যাগ, স্বিষ্টকৃৎ যাগ, প্রযাজ যাগ, অনুযাজ যাগ, উপযাজ যাগ এবং পত্নী-সংযাজ যাগ অনুষ্ঠিত হইত। কোন্ যাগে পশুর কোন্ অঙ্গ যজ্ঞীয় দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইবে, বেদের ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তাহার বিধান আছে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে সকল সূত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাতেও সেই সকল বিধি পাওয়া যায়। কতিপয় ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থ হইতে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামগুলি সঙ্কলন করিয়া দিলাম। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন-কার্য্যে ইহা হইতে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারিবে।

সঙ্কলিত শব্দগুলির অর্থ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে সংশয় ঘটিতে পারে। অনেকগুলি শব্দ এখন অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যে সময়ে শ্রৌত-কর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তখন যাজ্ঞিকেরা ঐ সকল শব্দের অর্থ নিশ্চিত জানিতেন। ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থের যে সকল ভাষ্য বা বৃত্তি এখন পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ভাষ্যকার ও বৃত্তিকারদিগের মধ্যে কতিপয় শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয়, শ্রৌত-কর্ম্ম ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়ায় এইরূপ মতভেদের হেতু জন্মিয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থে এই সমুদয় নাম প্রচলিত আছে কি না, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন। আমি যে শব্দগুলি পাইয়াছি, ভাষ্যকার বা বৃত্তিকার কর্ত্তৃক লিখিত অর্থ-সহিত তাহার তালিকা করিয়া দিলাম।

মার্টিন হৌগ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত শব্দগুলির ইংরেজী প্রতিশব্দ সেই অনুবাদ হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

পশুযজ্ঞ-প্রকরণ ব্যতীত অন্যান্য স্থলেও কিছু কিছু শব্দ পাওয়া যায়। সমুদয় বৈদিক-সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে এরূপ শব্দ বহু সংখ্যায় মিলিতে পারে। সেরূপ অনুসন্ধানের অবকাশ আমার নাই। চোখের উপর যাহা পড়িয়াছে, তাহাই এ স্থানে সঙ্কলিত করিলাম। বৈদিক-সাহিত্যে যাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিলে পরিষদের পরিভাষা-সমিতি উপকৃত হইবেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে যজমানের দীক্ষা উপলক্ষে, ষষ্ঠ অধ্যায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে প্রযাজ যাগ উপলক্ষে এবং একবিংশ

অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে পশুবিভাগ উপলক্ষে অনেকগুলি শব্দ আছে। আমার অনুবাদিত ও সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পুস্তকে শব্দগুলি যথাস্থানে পাওয়া যাইবে।

মার্টিন হৌগের ইংরেজী প্রতিশব্দের সহিত আবশ্যক স্থলে সায়ণভাষ্যোক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া গেল। তদ্ব্যতীত মাধ্যন্দিন বাজসনেয়ি-সংহিতা হইতে এবং কাত্যায়নের ও আপস্তম্বের শ্রৌতসূত্র হইতে কতিপয় শব্দ সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—১।৩

যোনি	womb
গর্ভ	embryo
উল্ব	caul (গর্ভস্থ অভ্যন্তরং চর্ম্ম সর্ব্ববেষ্টনম্—সায়ণ)
জরায়ু	placenta

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৬।৬

চক্ষুঃ	eye
প্রাণ	breath
অসু	life
শ্রোত্র	hearing
শরীর	body
ত্বক	skin
নাভি	navel
বপা	omentum
উচ্ছ্বাস	breathing
বক্ষঃ	breast
বাহু	arm
দোষণী (প্রকোষ্ঠৌ	forearms
অংস	shoulder
শ্রোণি	loin
ঊরু	thigh
বঙ্ক্রি (ষড়্‌বিংশতি সংখ্যক)	rib—পার্শ্বাস্থি (সায়ণ)
ঊবধ্য	excrement—পুরীষ (সায়ণ)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৬।৭

বনিষ্ঠু	entrails (?)—বপায়াঃ সমীপবর্ত্তী মাংসখণ্ড (সায়ণ)
জিহ্বা	tongue

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩১ ১

হনু	jawbone
কণ্ঠ	throat
কাকুদ্র	palate
শ্রোণি	loin
সক্থি	thigh—ঊর্দ্ধাধোভাগঃ (সায়ণ)
পার্শ্ব	side
অংস	shoulder
দোঃ	arm—বাহুঃ (সায়ণ)
উরু	thigh
অনুক	urinal bladder—মূত্র-বস্তি (সায়ণ)
সদ	backbone—পৃষ্ঠবংশ (সায়ণ)
পাদ	foot
ওষ্ঠ	upper lip
জাঘনী	tail—পুচ্ছ (সায়ণ)
স্কন্ধ	neck
মণিকা	fleshy portion in neck—স্কন্ধে ভবা মণিসদৃশা মাংসখণ্ডাঃ (সায়ণ)
কীকস	gristle—কীকসাঃ পার্শ্বে স্থিতা মাংসশকলাঃ (সায়ণ)
বৈকর্ত্ত	fleshy part on the back—প্রৌঢো মাংসখণ্ডঃ (সায়ণ)
ক্লোমা	left lobe—হৃদয়পার্শ্ববর্ত্তী মাংসখণ্ডঃ (সায়ণ)
শিরঃ	head
অজিন	skin

মাধ্যন্দিন বাজসনেয়ি-সংহিতা—২৫ অধ্যায়—
অশ্বমেধ-প্রকরণে পশ্বঙ্গের নাম—মহীধর-ভাষ্যোক্ত
ব্যাখ্যা সমেত—

দৎ দন্ত

দন্তমূল	
বর্ত্ম	দন্তপীঠ
দংষ্ট্রা	
অগ্রজিহ্বা	
জিহ্বা	
তালু	
চঞ্চু	বক্ত্রৈকদেশ
আস্য	মুখ
আণ্ড	বৃষণ
শ্মশ্রু	মুখকেশ
ভ্রূ	ললাটগ রোমপঙ্ক্তি
বর্ত্তুঃ	পক্ষ্মপঙ্ক্তি
কনীনক	নেত্রমধ্যস্থ কৃষ্ণগোল
পক্ষ্ম	
ঈক্ষ	নেত্রাধোভাগ-রোম
অধর ওষ্ঠ	
উত্তর ওষ্ঠ	
মূর্দ্ধা	মস্তক
নির্ব্বাধ	শিরোঽস্থি-মধ্য-সংলগ্ন মজ্জাভাগ
মস্তিষ্ক	শিরোমধ্যস্থ জর্জ্জর মাংসভাগ (মস্তকমজ্জা ইতি ক্ষীরস্বামী)
কর্ণ	কর্ণশষ্কুলী
শ্রোত্র	শ্রোত্রেন্দ্রিয়
অধর কণ্ঠ	কণ্ঠাধোভাগ
শুষ্ক কণ্ঠ	কণ্ঠস্য যঃ শুষ্কো নির্মাংসো দেশঃ
মন্যা	গ্রীবাপশ্চাদ্‌ভাগে কৃকাটিকায়াং শিরা মন্যা মন্যতে (পশ্চাদ্‌-গ্রীবা শিরা মন্যা ইতি অমরঃ)
শীর্ষ	শিরঃ
কেশ	অশ্বপক্ষে স্কন্ধস্থ রোম
বহ	স্কন্ধ
শফ	খুর
স্থুর	গুল্‌ফ
খঞ্জলা	গুল্‌ফাধঃস্থা নাড়ী

জঙ্ঘা	গুল্ফজানুনোঃ মধ্যভাগঃ
বাহু	অগ্রপাদস্য জানূর্দ্ধভাগঃ
জাম্বীর	জম্বীরফলাকারজান্বমধ্যভাগঃ
অতিরুক্	জানুদেশ
দোঃ	করঃ—অগ্রপাদস্য জান্বধোভাগঃ
অংস	স্কন্ধ
রোর	অংসগ্রন্থি
পক্ষতি	পক্ষস্য পার্শ্বস্য মূলভূতং অস্থি বঙ্ক্রিশব্দবাচ্যম্ তানি চ প্রতিপার্শ্বং ত্রয়োদশ ভবন্তি।
নিপক্ষতি	দ্বিতীয় পক্ষতি
স্কন্ধ	
কীকস	অশ্বপুচ্ছোপরি তিস্রোঽস্থিপণ্ডক্যঃ সন্তি, তা অস্থিপণ্ডকানি কীকসানি
পুচ্ছ	
ভাসদ	নিতম্ব
শ্রোণি	কটি
উরু	
অগ্ন	বঙ্ক্ষণ, উরুসন্ধি
স্থূর	স্থূলঃ ফিচঃ নিতম্বাধোভাগঃ
কুষ্ঠ	নিতম্বস্থঃ কুপকঃ আবর্ত্ত ককুন্দরশব্দবাচী
বনিষ্ঠু	স্থূলান্ত্র
স্থূলগুদা	গুদা = গুদং পায়ুঃ তস্য স্থূলভাগঃ
আন্ত্র	অন্ত্রসম্বন্ধীয় মাংসভাগ
বস্তি	মূত্রপুট
আণ্ড	অণ্ড, মুষ্ক
শেপ	লিঙ্গ
রেতঃ	শুক্র
পিত্ত	ধাতুবিশেষঃ
পায়ু	
শকপিণ্ড	বিষ্ঠাপিণ্ড
ক্রোড়	বক্ষোমধ্যভাগ
পাজস্য	বলকরমঙ্গম্
জত্রু	অংসকক্ষয়োঃ সন্ধিঃ

ভসৎ	লিঙ্গাগ্র
হৃদয়ৌপশ	হৃদয়স্থ মাংস
পুরীতৎ	হৃদয়াচ্ছাদক অন্ত্র
উদর্য্য	উদরস্থ মাংস
মতস্ন	গ্রীবাধস্তাস্তাগস্থিত-হৃদয়োভয়-পার্শ্বস্থে অস্থিনী মতস্নে
বৃক্ক	কুক্ষিস্থ আম্রফলাকৃতি মাংসগোলক
প্লাশি	শিশ্নমূলনাড়ী
প্লীহা	হৃদয়বামভাগে শিথিলো মাংসভাগঃ পুপ্পুসসংজ্ঞঃ
ক্লোমা	উদরস্থজলাধারঃ (ক্লোমা গলনাড়ী ইতি কর্কঃ ; হৃদয়স্য দক্ষিণে ক্লোমা বামে প্লীহা পুপ্পসশ্চ ইতি বৈদ্যা ইতি ক্ষীরস্বামী)
গ্নৌ	হৃদয়নাড়ী
হিরা	অন্নবাহিনী নাড়ী
কুক্ষি	উদরস্য দক্ষবামভাগৌ কুক্ষী
উদর	জঠর
নাভি	
রস	ধাতুবিশেষঃ, বীর্য্যম্
যূষ	পক্কান্ন-রস
বসা	মেদ
অশ্রু	নেত্রাম্বু
দূষিকা	নেত্রমল
অসা	অসৃক্, রুধির
ত্বক	চর্ম্ম

কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে ৬ অধ্যায়, ৭ কণ্ডিকা পশুযাগ-প্রকরণে—
যাজ্ঞিক-দেবকৃত ব্যাখ্যা সমেত—

হৃদয়ম্	আম্রফলসদৃশম্
জিহ্বা	রসনা
ক্রোড়ম্	বক্ষোভুজান্তরম্
সব্যসক্থি পৃষ্ঠনড়কম	সব্যস্য বাহোঃ প্রথমং নড়কং অংসাদধো বর্ত্তমানম্
পার্শ্বে	দ্বে পার্শ্বে একৈকং ত্রয়োদশবঙ্‌ক্র্যাত্মকম্
যকৃৎ	'কালেয়ম্

বৃক্কৌ	কুক্ষিস্থৌ গোলকৌ মহদামলকতুল্যৌ আম্রফলাকৃতী ইতি ধূর্ত্তস্বামী
গুদমধ্যম্	গুদস্য মধ্যং যেন শকৃৎ নির্গচ্ছতি তদ্বিষমং ত্রেধা কৃত্বা তস্য যো মধ্যমো ভাগঃ ন স্থূলঃ ন চ কৃশঃ
দক্ষিণা শ্রোণিঃ	কটি দক্ষিণাপরসক্থ্‌ঃ উপরি বর্ত্তমানঃ মাংসলঃ প্রদেশঃ। শ্রোণিঃ দক্ষিণা স্ফিক্ ইতি ধূর্ত্তস্বামী
দক্ষিণসক্থি পৃষ্ঠনড়কম	দক্ষিণস্য বাহোঃ প্রথম নলকং, আংসাদধ এবাবস্থিতম্
গুদতৃতীয়াণিষ্ঠম্	আন্ত্রস্য যোঽণিষ্ঠঃ অতিশয়েন অণুঃ অতিকৃশঃ তৃতীয়ো ভাগঃ
সব্যা শ্রোণিঃ	উত্তরাপর-সক্থ্‌ উপরিভাগে মাংসলঃ প্রদেশঃ কটি-শব্দবাচ্যঃ
বর্ষিষ্ঠম্	অতিশয়েন মহৎ বর্ষিষ্ঠং যদ্ গুদতৃতীয়মতিস্থূলম্
বনিষ্ঠু	স্থূলান্ত্রম্
জাঘনী	জঘনপ্রদেশে ভবা পুচ্ছদণ্ড ইত্যর্থঃ। জাঘনী পশোঃ পুচ্ছমিতি হরিস্বামী।
	জাঘনী বালদণ্ড ইতি মাধবাচার্য্যাঃ। জাঘনী যেন মশকানপনয়তীতি ধূর্ত্তস্বামী। জাঘনী বালধিরুচ্যতে ইতি জ্ঞানদীপিকাকারঃ।
ক্লোম	গলনাড়িকা
প্লীহঃ	পীহ ইতি যঃ প্রসিদ্ধঃ
অধ্যুধ্নী	শতপুটঃ ঊধস উপরি ভবতি
পুরীতৎ	হৃদয়ং প্রচ্ছাদিতং যেন মাংসেন তৎ
মেদ	
উবধ্যং	পুরীষম্
লোহিতম্	রুধিরম্
বপা	
বসা	

আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে—

৭ প্রশ্ন, ২২-২৭ কণ্ডিকা—পশুযজ্ঞ-প্রকরণ—

ভট্টরুদ্রদত্ত-প্রণীত বৃত্তি সমেত—

হৃদয়

জিহ্বা

বক্ষঃ

যকৃৎ	কালখণ্ডং নাম প্রদীপ্তো মাংসম
বৃক্কৌ	পার্শ্বগতৌ পিণ্ডৌ
সব্যং দোঃ	
উভে পার্শ্বে	
দক্ষিণা শ্রোণিঃ	
গুদতৃতীয়ম্	
দক্ষিণং দোঃ	
সব্যা শ্রোণিঃ	
ক্লোমা	যকৃৎসদৃশম্ তিলকাখ্যং মাংসম
প্লীহা	গুল্ম
পুরীতৎ	অন্ত্রম
বনিষ্ঠুঃ	স্থবিষ্ঠান্ত্রম
অধ্যুধ্নী	উধঃ-স্থানীয়ং মাংসম
মেদঃ	চর্ম্ম হৃদয়স্য বৃক্যয়োশ্চ
জাঘনী	পুচ্ছম্
যূষ	পশুরসঃ
বসা	পশুরসঃ
অংসৌ	স্কন্ধৌ
অণূকঃ	অন্তরাস্থিবিশেষঃ
অপরে সক্থিনী	শ্রোণ্যোরুপরিদেশে

বৈদ্যক পরিভাষা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে কিছু দিন হইল, আমি একখানি পুস্তক দেখিবার জন্য লইয়াছিলাম। পুস্তকখানি তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পত্তি। পুস্তকের টাইটেল পেজে ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্বাক্ষর রহিয়াছে; পুস্তকখানির নাম A Vocabulary of the Names of the various parts of the Human Body and of Medical and Technical Terms in English, Arabic, Persian, Hindee and Sanskrit for the use of the Members of the Medical Department in India. গ্রন্থের সঙ্কলনকর্ত্তা Peter Breton, Surgeon in the Service of the Hon'ble East India Company and Superintendent of the Native Medical Institution. পুস্তকখানি ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট লিথোগ্রাফিক যন্ত্রে মুদ্রিত। তদানীন্তন মেডিকাল বোর্ডের সভাপতি ও মেম্বারগণকে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হইয়াছে।

স্থানীয় ইংরেজ ও দেশীয় চিকিৎসকগণের সাহায্যের জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান-ঘটিত বিবিধ পারিভাষিক শব্দের তালিকা গ্রন্থমধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছে। পাঁচটি স্তম্ভে পারিভাষিক শব্দগুলি সজ্জিত হইয়াছে। প্রথমে ইংরেজী শব্দ, তৎপরে আরবী, পারসী, হিন্দী ও সংস্কৃত প্রতিশব্দ পর পর সাজান আছে। পুস্তকখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত; প্রথম ভাগে সমস্ত তালিকা ইংরেজী হরপে, দ্বিতীয় ভাগে নাগরী ও তৃতীয় ভাগে পারসী হরপে লিথোগ্রাফে মুদ্রিত। সংস্কৃত শব্দ সঙ্কলনের জন্য সংগ্রহকার নিম্নলিখিত কয়খানি গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন।

Wilson's Sanskrit Dictionary
Chikitsa, Practice of Physic
Soosrut
Nidaun, Pathology
Bhao Prikash, Revealer of Thoughts.

সঙ্কলনকর্ত্তা পরিভাষা সঙ্কলনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এবং গ্রন্থকে যথাসাধ্য সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ

প্রকাশের পর চিকিৎসা-বিদ্যার যে পরিমাণ উন্নতি ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এত নূতন নূতন শব্দ বিজ্ঞান শাস্ত্রে স্থান লাভ করিয়াছে ও পুরাতন শব্দের অর্থ-বিকার ঘটিয়াছে যে, এই তালিকা এ-কালের পক্ষে নিতান্তই অসম্পূর্ণ। তথাপি এ বিষয়ে এত বড় বাঙ্গালা পরিভাষা আর কোথাও সঙ্কলিত দেখি নাই। এ-কালেও চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর ও চিকিৎসা-গ্রন্থ-লেখকগণের কাজে আসিবে, এই বিবেচনায় ইংরেজী পারিভাষিক শব্দগুলি ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দগুলি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। যথাদৃষ্ট উদ্ধৃত হইল; কোনরূপ ভুলভ্রান্তি সংশোধন করিলাম না।

Parts of the Body.

alveoli	দন্ত, দশন, রসন
ankle	ঘুণ্টক, ঘুন্টিকা, গুল্ফ
arm	বাহু
arm, upper	ভুজ, প্রগণ্ড
arm, lower	প্রকোষ্ঠ
arm pit	কক্ষ
artery	বায়ুবাহিনী, ধমনী
back	পৃষ্ঠ
back-bone or spine	পৃষ্ঠবংশ
beard	শ্মশ্রু
belly	উদর
bladder	ক্লোম
blood	রক্ত
blood-vessel	রক্তবাহিনী
body	গাত্র, দেহ, শরীর
bone	অস্থি
brain	মস্তলুঙ্গ
breast	উরোজ, কুচ
breath	শ্বাস
buttocks	প্রোথ

canthus, inner	——
canthus, outer	অপাঙ্গ
cartilage or gristle	কূর্চ্চা
cheek	কপোল
chest	উরস্
chin	চিবুক
chyle	ধাতুপ
chyme	——
clavicle	জত্রু
diaphragm	——
ear	কর্ণ, শ্রবণ
ear, tip of the	কর্ণপালী
ear-wax	কর্ণমল
elbow	কফোণি
eye	নয়ন, নেত্র, অক্ষি
eyebrow	ভ্রূ
eye-lash	পক্ষ্ম
eyelid	বর্ত্ম
eye, pupil of the	কনীনিকা
eye, rheum of the	নেত্রমল
eye, socket of the	অক্ষিকোষ
eye, white of the	নেত্র-শ্বেতভাগ
excrement	বিষ্ঠা
excretory duct	স্রোতপথ
face	আনন
fat	মেদ, মেধস্
fibre	রজ্জু
finger	অঙ্গুলি
finger, fore	তর্জ্জনী
finger, little	কনিষ্ঠিকা
finger, middle	মধ্যমা
finger, ring-	অনামিকা

finger, top of the	অঙ্গুল্যগ্র
fist	মুষ্টি
flesh	মাংস
foetus	গর্ভ, ভ্রূণ
foot	পাদ
foot, sole of the	পাদতল
forehead	ভাল; ললাট
gall-bladder	পিত্তাশয়
gland	পিণ্ড
gristle or cartilage	কূর্চ্চা
groin	বঙ্‌ক্ষণ
gullet or oesophagus	গল
gum	দন্তবেষ্ট
hair	কেশ
hand	হস্ত, কর
hand, back of the	হস্ত-পৃষ্ঠ
hand, left	বাম হস্ত
hand, palm of the	হস্ততল
hand, right	দক্ষিণ হস্ত
head	শিরস্
heart	হৃদ
heel	পাদমূল, পার্ষ্ণি
hip	কট
humour	রস
instep	পিচণ্ডিকা
intestine	অন্ত্র
jaw	হনু
jaw, lower	অধোহনু
jaw, upper	ঊর্দ্ধহনু
joint	গ্রন্থি, সন্ধি

knee	জানু
knee-pan	নলকিনী
knuckle	অঙ্গুলিসন্ধি
leg	জঙ্ঘা
leg, calf of the	পিণ্ডলী
ligaments	সন্ধিবন্ধন
lip	ওষ্ঠ
liver	যকৃৎ
loins	কটী
lungs	ফুস্ফুস
marrow	মজ্জা, মজ্জন্
member	অঙ্গ, অবয়ব
membrance	সূক্ষ্ম ত্বক্
menses	আর্ত্তব
milk	পয়:
mouth	মুখ
muscle	মাংসপেশী, স্নায়ু
nail	নখ
navel	নাভি
navel-string	নাল
neck	গ্রীবা
neck, nape of the	অবটু
nerve	——
nipple	চুচুক
nose	নাসা, নাসিকা
nose, mucus of the	নাসিকামল
nostril	নাসারন্ধ্র
palate	তালু
penis	লিঙ্গ, শিশ্ন
pericardium	হৃদাশয়
peritoneum	——

phlegm	কফ
placenta	পোত্রী
pore	রোমকূপ
pulse	নাড়ী
rib	পার্শ্বাস্থি
saliva	দ্রাবিকা, নিষ্ঠীব
scrotum	অণ্ডকোষ
secretion	রস
shoulder	স্কন্ধ
side	পার্শ্ব
sinew or tendon	শিরা
skeleton	অস্থিপঞ্জর
skin	ত্বক্
skull	খর্পর
spine or backbone	পৃষ্ঠবংশ
spleen	প্লীহা
stomach	পক্বাশয়
suture	সেবনী
sweat	স্বেদ
tear	অশ্রু
temple	শঙ্খ
tendo-achilles	পিণ্ডলী শিরা
tendon or sinew	শিরা
testicle	অণ্ড
thigh	সক্থি
throat	কণ্ঠ
thumb	অঙ্গুষ্ঠ
toe	পাদাঙ্গুলি
toe, great	পাদাঙ্গুষ্ঠ
tongue	রসনা, জিহ্বা
tonsil	——

tooth	দন্ত, দশন, রসন
trachea or wind-pipe	কণ্ঠ, ঘণ্টিকা
urethra	মূত্রদ্বার, মূত্রপ্রবাহিণী
urine	মূত্র
uvula	প্রতিজিহ্বা
vein	শিরা
womb	গর্ভাধান, গর্ভস্থান, কুক্ষি
wrist	মণিবন্ধ

Accidents of the Body.

adolescence	যুবত্ব
baldness	চন্দিল
blindness	দৃষ্টিলুপ্ত, অন্ধত্ব
childhood	বালত্ব
deafness	বধিরত্ব
digestion	জীর্ণ, পচন, পাক
dream	স্বপ্ন
dumbness	মূকত্ব
fatness	স্থূলত্ব, তুন্দিলত্ব
hair, curling	কুটিল কেশ
hair, grey	শ্বেতকেশ, পলিত
humpback	কুব্জতা
hunger	ক্ষুধা
lameness	খঞ্জতা
leanness	দুর্ব্বলত্ব
lowness	খর্ব্বতা, লঘুত্ব
old age	বৃদ্ধত্ব

pregnancy	গর্ভাধান
scurf	দারুণক
sleep	নিদ্রা
slenderness	সুকুমারত্ব
sneezing	ছিক্কা
soundness	অরোগতা
speech	বচন, বাক্
squinting	বক্রদৃষ্টি
stammering	স্খলিতবাক্
stretching of the limbs	অঙ্গমোটন
tallness	দীর্ঘতা
thirst	পিপাসা, তৃষ্ণা
tingling sensation felt when a limb is asleep	ঝিঞ্জিনী
voice	স্বর, শব্দ
wart	মাংসবৃদ্ধি
watching	জাগরণ
wrinkle	বলি
yawning	জৃম্ভা

Diseases.

abortion	গর্ভপাত
ague	শীতজ্বর
amaurosis	কাচ
anasarca	জলোত্তরণ
apoplexy	অঙ্গবিকৃতি
appetite voracious	ভস্মক
ascarides	ক্ষুদ্রকৃমি
asthma	শঙ্কা, কাশশ্বাস
blister	স্ফোট

blear-eyedness	ক্লিন্নাক্ষ
boil	স্ফোট, স্ফোটক
boil, throbbing of	স্ফোট, স্ফুরণ
bloody flux	রক্তাতিসার
borborygmi	আধ্মান
boulimus	ভস্মক
bronchocele	গলগণ্ড
bruise	ঘাত
bubo	বিস্ফোট
cataract	মৌক্তিক বিন্দু
catarrh	প্রতিশ্যায়
chancre	শিশ্ন বিস্ফোট
chilblain	বিপাদিকা
cholera morbus	বিসূচিকা
cholic	বাতশূল
cholic, flatulent	বাতগুল্ম
coin of the foot	গোখুর
cold	প্রতিশ্যায়
consumption	ক্ষয়
costiveness	অনাহ, কোষ্ঠবদ্ধ
cough	কাশ
crisis	জ্বরমুক্তি
day-blindness	দিনান্ধ
delirium	রোগপ্রলাপ
diabetes	মধুপ্রমেহ
diarrhoea	অতিসার
diagnosis	——
dislocation	গ্রন্থিবিশ্লেষ
distortion of the face	অর্দ্দিত
dropsy	জলোদর
dysentery	রক্তাতিসার
dysopsia luminis	দিনান্ধ

elephantiasis	শ্লীপদ
emprosthotonos	অন্তরায়াম
empyema	বিদ্রধি
epilepsy	অপস্মার
episthotonos	বাহ্যায়াম
eructation	বায়ুদ্গার
fainting	মূর্চ্ছা
fever	জ্বর
fever, accession of	জ্বরাগম
fever, ardent	সতত জ্বর
fever, hectic	জ্বর ক্ষয়ী
film	পুষ্প
fistula	নাড়ীব্রণ
fistula in ano	ভগন্দর
flatulence	উদাবর্ত্ত, বায়ুদ্গাম
fracture	অস্থিভঙ্গ
gangrene	অজীব
goitre	গলগণ্ড
gonorrhea	প্রমেহ
gout	গৃধ্রসী
granulation	মাংসাঙ্কুর
gravel	অশ্মরী
guinea-worm	জলসূত্র
gumboil	দ্বিজব্রণ
gutta-screna	তিমির, কজ্জলবিন্দু
haemorrhage	রক্তপ্রবাহ
hair in the eye	লোহিতার্শ
hare-lip	খণ্ডোষ্ঠত্ব
headache	শিরোরুজ
hemicrania	অর্দ্ধকপালী
hemiplegia	অর্দ্ধাঙ্গ

hernia	অন্ত্রবৃদ্ধি
hiccough, hiccup	হিক্কা
hoarseness	স্বরভেদ
horripilation	রোমাঞ্চ
hydrocele	কোষবৃদ্ধি
hydrocephalus	শিরোগত জল
hydrothorax	উরোগত জল
indigestion	অজীর্ণ
inflammation	দাহ
intermittent	একান্তর
itch	পামা, কণ্ডূতি
jaundice	কামলা, কমলবন্ধ, পাণ্ডুরোগ
laxation	গ্রন্থিবিশ্লেষ
leprosy	কুষ্ঠ
lethargy	নিদ্রালু
lippitudo	ক্লিন্নাক্ষ
liver	যকৃৎপীড়া
liver, obstruction of the	যকৃৎ বিবন্ধ
locked-jaw	দন্তলগ্ন
looseness	অতিসার
lues	উপদংশ
lumbrice	বর্ত্তুল ক্রিমি
madness	উন্মাদ
maggots	ক্রিমি
matter	পূয
measles	পনসিকা
menorrhagia	প্রদর
nedyusa	তৃষ্ণা
night-blindness	রাত্র্যন্ধ
nightmare	দুঃস্বপ্ন

nose, bleeding of the	নাকসীর ?
nose, polypus of the	নাসিকার্শ
numbness	শূন্য
nyctalopia	রাত্র্যন্ধ
ophthalmia	অর্বুদ
pain	ব্যথা
palsy	শীতাঙ্গ
palpitation	হৃৎকম্প
paroxysm	জ্বরকাল
piles	অর্শ
pimple	পামা
plague	মহামারী
plethora	অতিরক্ত
pleurisy	পার্শ্বশূল
pox	উপদংশ
prickly heat	ক্ষুদ্রস্ফোট
prolapsus ani	গুদভ্রংশ
prolapsus uteri	যোন্যর্শস্
pterygian	লোহিতার্ম
pus	পূয
pustule	বটী
quartan	চাতুর্থিক জ্বর
quotidian	আহ্নিক জ্বর
rheumatism	বাত, গ্রন্থিবাত
rheumatism, acute	বাত, রক্ত, বাঃ
ringworm	চকাণী, দদ্রু
rupture	অন্ত্রবৃদ্ধি
scab	পপটি
scaldhead	অরুংষিকা
scar	কিণ, ব্রণচিহ্ন

scrofula	কণ্ঠমালা
sickness	রোগ, আময়
sickness at stomach	অরুচি
smallpox	মসূরিকা, বাসন্তিকা
sore	ক্ষত
sore throat	গলপীড়া
spasm	অঙ্গগ্রহ
spleen	প্লীহোদর
stone	বৃহদশ্মরী
strangury	মূত্রাঘাত
stroke of the sun	সূর্য্যকিরণ
stroke of the wind	বাতাঘাত
sty in the eye	গুহাঞ্জনী
sudden death	অকালমৃত্যু
swelling	শ্বপথু, শোথ
symptom	লক্ষণ
taenia, tapeworm	দীর্ঘ কৃমি
tenesmus	শূল
tetanus	ধনুষ্টঙ্কার, ধনুস্তম্ভ
tertian	তৃতীয় জ্বর
toothache	দন্তপীড়া
torpor	বিসংজ্ঞ
thirst, excessive	তৃষ্ণা
thrush	——
trismus	দন্তলগ্ন
urethra, stricture of the	মূত্রস্রোত নিবন্ধ
urinae, ardor	মূত্রদাহ
urine, difficulty in voiding	মূত্রকৃচ্ছ্র
vertigo	ভ্রমণী
vomiting	বমন, ছর্দ্দি

weakness	নির্ব্বলতা, বলহীনতা, বলক্ষয়
worms	ক্রিমিরোগ
wound	ব্রণ
wound, healing of a	ব্রণ পূর্ত্তি

Qualities.

anodyne	নিদ্রাকারী
antidote	বিষঘ্ন
anthelmintic	ক্রিমিঘ্ন
aphrodisiac	বাজীকরণ
appetite, promoter of	ক্ষুধাকারী
aromatic	ঔষধ সুগন্ধ
astringent	কোষ্ঠবন্ধক
cardiac	হৃদ্‌বলদ
carminative	বায়ুনাশক
cathartic	ভেদক, রেচক
caustic	ক্ষারকর্ম্মণ্য
cautery	দাহক, অগ্নিকর্ম্মণ্য
cephalic	শিরোবলদ
cholagogue	পিত্তভেদক
cicatrisant	পর্প টীকর
coagulent	সংযমনকর
condiments	উপস্কর, উষ্ণদ্রব্য
corroborant	বলপ্রদ
demulcent	আর্দ্রীকরণ
deobstruent	বন্ধঘ্নী
depillatory	লোমপাতন, লোমাপহারক
detergent	বিস্রাবণ, ব্রণশুদ্ধিকর
digestive	ব্রণরোহণকর, মাসাঙ্কুরকারী
——	পাচক, পাচন
discutient	শোথঘ্নী
diuretic	মূত্রল

emetic	বামক
epulotic	পর্পটীকর
errhine	ছিক্কাকারী
exhilarant	হর্ষকর
expectorant	শ্লেষ্মহর
hepatic	যকৃদ্‌বলদ
hypnotic	নিদ্রাকারী
inebrient	মাদক, মৃদুভেদক
lithotriptic	অশ্মরীচূর্ণক
mucilaginous	পিচ্ছিল
narcotic	শূন্যকারক
poison	গরল
refrigerant	শীতলকর
relaxant	শিথিলকারী
repellent	স্তম্ভনকর
rubefacient	লোহিতকর
sedative	প্রহ্লাদন
soporific	নিদ্রাকারী
sternutatory	ছিক্কাকারী
stomachic	পাচক, পাচন
styptic	রক্তস্থগিঘ্ন
sudorific	স্বেদকারী
suppurative	শোথপক্ককারী
thirst, exciter of	তৃট্‌কর, তৃষাকারী
tonic	পক্বাশয়বলদ
vermifuge	কৃমিঘ্ন
vesicant	স্ফোটকারী

Forms of Remedies.

abstinence	সংযম
anointing with oil	তৈলমর্দ্দন
applying leeches	জলৌকাক্রিয়া
bath, vapor	সবাষ্প স্বেদ
bath, warm	রোগিস্থিতে উষ্ণ জল
besmearing	লিপ্তি
blood letting	শিরাব্যাধি
bougie	মূত্রবন্ধাপহারণী শলাকা
cataplasm	লোপত্রী
caustic	ক্ষারকর্ম্ম
cautery	দাহকর্ম্ম
collyrium	অঞ্জন
compound powder	মিশ্রিত চূর্ণ
confection	মোদক
cosmetic	অভ্যঞ্জন
cupping	শৃঙ্গীক্রিয়া, তুম্বীক্রিয়া
decoction	ক্বাথ
dentifrice	প্রতিসারণ
diet	পথ্য
dose	মাত্রা, পরিমাণ
drink	পেয়
electuary	আলেহ্য
embrocation	স্নেহন
enema	বস্তিক্রিয়া
fasting	উপবাস, উপবস্ত
fluid scent	আঘ্রাণার্দ্রসুগন্ধৌষধ
fomentation	আশেক্যন
fracture, setting a	ভগ্নাস্থিবন্ধন
fumigation	ধূপন

gargarism	গণ্ডূষ
infusion	শীত কষায়
injection for the urethra	মূত্রনাড়ীপ্রক্ষালক
liniment	স্নেহন
lotion	অভ্যঞ্জন
lozenge	সুখবর্ত্তিকা
ointment	আলেপ
pediluvium	পাদপ্রক্ষালন
perfume	আঘ্রাণার্দ্রসুগন্ধৌষধ
pessary	উত্থাপক
pill	বটিকা
plastering	লিপ্তি
plug	স্থাপক
poultice	লোপত্রী
powder	চূর্ণ
rinsing the month	আচমন
seton	বর্ত্তি
smelling medicines	আঘ্রাণৌষধ
solution	কষায়
sprinkling powder on ulcers	ব্রণসেচন চূর্ণ
succedaneum	প্রতিনিধি
suppository	স্থাপক
tampon	উত্থাপক
vehicle	অনুপান

Instruments and Articles.

amputating knife	ক্ষুরক

bandage	পট্টিকা
bathing tub	দ্রোণ
canula	নাড়ী
catheter	——
cauterizing iron	তপ্তায়স্
cotton	তূলা
cupping glass	শৃঙ্গী, তুম্বী
dosil	স্থূলপট্টিকা
file	উঁখ
fillet	বন্ধনী
forceps	স্বস্তিক, সন্দংশ
glyster syringe	গুদবস্তি
gum lancet	দন্তবেষ্টচ্ছেদক
instrument	শস্ত্র, অস্ত্র
lancet	বেধী
leech	জলৌকা
lint	মৃদু বস্ত্র
medicine chest	ঔষধমঞ্জুষা
mortar	খল
pad	স্থূলপট্টিকা
paper of medicine	পুটিকা
penis syringe	মেঢ্রবস্তি
pestle	মুষল
plaster	স্নেহপট্টিকা
pounding mortar	উদূখল
probe	এষণী শলাকা
razor	ক্ষুর
saw	করপত্র
scale	তুলা

scalpel	ক্ষুরিকা
scissors	কর্ত্তরী
scarificator	ছেদনী, লেখনী
slips of plaster	খণ্ডপট্টিকা
splint	কাষ্ঠময় পত্রক
spoon	দর্ব্বী
sticking plaster	দ্রবপট্টিকা
tenaculum	বড়িশ, অঙ্কুশ
tongs	স্বস্তিক, সন্দংশ
tooth instrument	দন্ত-শঙ্কু
trocar	বৃত্তাগ্র
tweezers	সন্দংশিকা
weight	প্রমাণ

General Terms.

alembic	ভগযন্ত্র
analogy	সমতা, অনুমান
analysis	অনুক্রমচর্চ্চা
anatomy	শরীরব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা
anomaly	অসামান্য
apothecary	ভৈষজ্যকারী
attraction	আকর্ষ
blood, circulation of the	রুধিরাভিসরণ
cause and effect	কারণ ও কার্য্য
chemistry	রসায়ন
coagulation	সংযমন
collapse	সম্মোহন
compound	মিশ্রিত
concavity	অন্তর্বর্ত্তুলত্ব
condensation	গাঢ়ভবন
contraction	সঙ্কোচ

convexity	বহির্বর্তুলত্ব
crucible	মূষা
crystallization	—
definition	লক্ষণ
diastole, dilatation	প্রসার
distillation	সংস্রাবণ
ductility	পরিকর্ষ
elastic	সঙ্কোচপ্রসারযুক্ত
elasticity	সঙ্কোচপ্রসার
electricity	গুণতৃণমণি, তৃণমণিভাব
element	বস্তু
essence	সার
evaporation	শুষ্ককরণ
experiment	পরীক্ষা
fermentation	কিণ্বন
fluid	স্রাবী
focus	কিরণসমাহার
froth	ফেন
furnace	চুল্লিকা
fusion	স্রাবণ
hermaphrodite	ক্লীব, নপুংসক
heterogeneity	ভিন্নত্ব
homogeneity	সম্মতিত্ব
human body, structure of the	শরীর-সংগ্রহ
inversion	অধোত্তরস্থান
magnet	চুম্বক-প্রস্তর
magnetism	চুম্বকপ্রস্তরস্বভাব
materia medica	রোগান্তকসার

menstruum	পুট, দ্রাবক
midwife	ধাত্রী
midwifery	গর্ভাবেক্ষণ
mobility	জঙ্গমত্ব
oculist	নেত্রবৈদ্য
operation	শস্ত্রবৈদ্য
optics	দৃষ্টিবিদ্যা
pathology	নিদান, রোগাভিজ্ঞান
pharmacopœia	ভৈষজ্যকল্পনাবিধি
pharmacy	ঔষধকল্পনা
philosophy	প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান
physician	ভিষক্, বৈদ্য
physiology	শরীরসূত্র
practice	অভ্যাস
practice of physic	বৈদ্যবৃত্তি
prescription	ঔষধ-পত্র
property	ভৈষজ্যগুণ
putrefaction	সড়ন
quality	ঔষধস্বভাব
rays of light	কিরণ
receiver	গ্রহণযন্ত্র
refraction	ব্যতিভা
repulsion	দূরকরণ, বিকর্ষ
retort	প্রস্রাবী যন্ত্র
science of medicine	বৈদ্যবিদ্যা
science of surgery	শস্ত্রবিদ্যা
sediment	ক্লেদকীট
sensibility	স্পর্শজ্ঞান
simple	অমিশ্রিত
solid	অস্রাবী, সংযমিত

solution	দ্রবিত
solvent	পুট, দ্রাবক
specific	বিশেষণ
surgeon	শস্ত্রবৈদ্য
surgery	শস্ত্রক্রিয়া
still	ভগযন্ত্র
systole	সঙ্কোচ
technical	সংজ্ঞা, পারিভাষিক
tenacity	নির্য্যাস
theory	ন্যায়তা
tube	নলী
volition	ইচ্ছা, ব্যবস্থা

রাসায়নিক পরিভাষা

পারিভাষিক শব্দের অভাবে বাঙ্গালা ' ভাষায় বৈজ্ঞানিব গ্রন্থের রচনা ও প্রচার দুঃসাধ্য হইয়াছে। পরিভাষা প্রণয়নের জন্য সাহিত্য-পরিষৎ চেষ্টা করিতেছেন। রসায়ন-শাস্ত্রে পরিভাষার অভাব কথঞ্চিৎ পূরণের জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা।

বলা বাহুল্য যে, উপযোগী পরিভাষার আশ্রয় না পাইলে কেবল মাত্র প্রচলিত ভাষার সাহায্যে কোন বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সম্যক্ প্রচার বা সম্যক্ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। পাশ্চাত্য ভাষায় রসায়ন-শাস্ত্রের জন্য প্রণালীবদ্ধ পরিভাষা বর্ত্তমান আছে। সেই পরিভাষা অবলম্বন করিয়া রসায়ন-বিজ্ঞানের বহুল প্রচার হইয়াছে এবং রসায়ন-বিজ্ঞান দিন দিন দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ করিতেছে। মহামতি লাবোয়াশিয়া যে দিন আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানের জন্ম দান করেন, সেই দিনই উক্ত বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষার প্রণয়ন আবশ্যক হইয়াছিল। লাবোয়াশিয়া পরিভাষাগঠন-কার্য্যও স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত রাসায়নিক পরিভাষাই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইয়াছিল ; এবং আজ পর্য্যন্ত সেই পরিভাষাই মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইয়া ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। লাবোয়াশিয়া-প্রণীত সেই পরিভাষা বর্ত্তমান না থাকিলে রসায়ন-বিজ্ঞানের এইরূপ উন্নতি সম্ভবপর হইত না।

ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক ভাষা প্রচলিত থাকিলেও সর্ব্বত্র সকলেই বৈজ্ঞানিক ভাষা সঙ্কলনের সময় লাটিন ও গ্রীক হইতে দুই হাতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত বিজ্ঞানের ভাষা সম্বন্ধে ইউরোপের সকল প্রদেশের মধ্যে একটা একতা দেখা যায়। এইরূপই হওয়া উচিত। বিজ্ঞানের সহিত দেশগত বা জাতিগত ভেদের সম্বন্ধ যত না থাকে, ততই কল্যাণ। বিজ্ঞানের ভাষা সার্ব্বভৌম ভাষা হওয়া উচিত। এরূপ হওয়া উচিত যে, যে-কোন দেশের যে-কোন পণ্ডিত সেই ভাষায় কথা কহিলে অন্য দেশের পণ্ডিতেরা যেন তখনই তাহা বুঝিতে পারেন। জগতের বৈজ্ঞানিক-সমাজের মধ্যে ভাব-বিনিময় নিয়ত আবশ্যক। নতুবা বিজ্ঞানের উন্নতি দ্রুতগতিতে ঘটে না। ইউরোপে সকল জাতির

পণ্ডিতেই বৈজ্ঞানিক ভাষা সঙ্কলনকালে লাটিন ও গ্রীক ভাষাকে মূলস্বরূপে অবলম্বন করেন ; এই জন্য ইউরোপে বিজ্ঞানের ভাষায় অনেকটা একতা দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশে যদি কোন কালে ইংরেজী ভাষা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া মাতৃভাষার পাশাপাশি দাঁড়াইতে সমর্থ হয়, তখন বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষার আশ্রয় আবশ্যক হইবে না। ইংরেজী পরিভাষাই সশরীরে আমদানি করিলে চলিতে পারিবে। কিন্তু ইংরেজী ভাষা সেরূপে প্রচলিত ভাষা হইয়া কখন এ দেশে দাঁড়াইবে কি না সন্দেহ ; ঐরূপ ঘটনা আমাদের স্বজাতির স্পৃহণীয় হইবে কি না, সে বিষয়েও সংশয় আছে। আর দূর-ভবিষ্যতে যদি বা সেই ঘটনা সম্ভবপর হয়, সে কালের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবার সময় নাই।

সম্প্রতি আমাদের মাতৃভাষাতেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমাদের মাতৃভাষা সংস্কৃতমূলক। গ্রীক ও লাটিনের সহিত দূর জ্ঞাতিসম্পর্ক থাকিলেও সে সম্পর্কে আমাদের কোন লাভ হইবে না।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় দুই চারিখানি মাত্র রাসায়নিক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। তাহাও বালকদের শিক্ষার নিমিত্ত রচিত। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবই এই দুর্দ্দশার কারণ এবং এই কারণেই ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের নিকট রসায়ন-শাস্ত্রের প্রচার ঘটিতেছে না।

বাঙ্গালায় রাসায়নিক পরিভাষা সঙ্কলনের কোন চেষ্টা অদ্যাপি হয় নাই বলিলেই চলে ; দুই চারিটি পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ হইয়াছে মাত্র। অধিকাংশ স্থানেই ইংরেজী শব্দ যথাসাধ্য উচ্চারণ ঠিক রাখিয়া অক্ষরান্তরিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু ঐ সকল শব্দ বিজাতীয় শব্দ ; বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্র তাহাদের উচ্চারণে পরাঙ্মুখ। সুতরাং সেই সেই পারিভাষিক শব্দের প্রচারের কোন আশা নাই। দুরুচ্চার্য্যতা ও শ্রুতিকটুতা দোষে বিজাতীয় শব্দ সাধারণে যথাশক্তি পরিহার করিবে। তাহার উপর ঐ সকল শব্দ আমাদের নিতান্ত অনাত্মীয়। যাহারা ইংরেজী ভাষায় শিক্ষালাভ করে নাই, ঐ সকল শব্দের উচ্চারণ তাহাদের মনে কোনরূপ ভাবের বা অর্থের উদ্রেক করে না। বাক্যের সহিত অর্থের হরগৌরী-সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক ; বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন অর্থ আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিজাতীয় অনাত্মীয় বাক্য আমাদের সাধারণের

নিকট স্বতঃ অর্থহীন ; সবিশেষ অভ্যাসসহকারে ও চেষ্টাসহকারে অর্থকে মনে টানিয়া আনিতে হয় ; অর্থ আপনা হইতে মনে আসে না। সুতরাং কেবল মাত্র ইংরেজী শব্দগুলি বাঙ্গালা হরপে বসাইয়া পরিভাষা প্রণয়নে চেষ্টা করিলে উহাতে ফলোদয় হইবে না।

বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর স্বভাবের উপযোগী বিজ্ঞানের ভাষা সঙ্কলন করিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রস্তাব সেই কার্য্যের প্রয়াস মাত্র।

সর্ব্বাংশে অসঙ্গতিহীন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ পরিভাষা-প্রণয়ন অসাধ্য ব্যাপার। কোন শব্দ কোন কারণে, অন্য শব্দ অন্য কারণে সঙ্গত বিবেচিত হয়। কোন্‌টি বাছিয়া লইতে হইবে স্থির করা দায়, এবং প্রত্যেকের উপযোগিতা লইয়া চিরদিন বিতণ্ডা চালান যাইতে পারে। সঙ্কলনকারিগণ চিরকাল বিতণ্ডা চালাইবেন ও অপর সাধারণে দিশাহারা হইয়া তাঁহাদের মুখ চাহিয়া থাকিবে, এরূপ বাঞ্ছনীয় নহে। কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে, এর চেয়ে উপযোগী শব্দ আর মিলিবে না। আর একজন একটা পরিভাষা প্রণয়ন করিলেন, কিছু দিন পরে আর এক জন তাহার নানাবিধ অসঙ্গতি নির্দ্দেশ করিয়া আর একটা নূতন পরিভাষা প্রণয়ন করিতে পারেন। নিত্য-নূতনের অবতারণা দেখিয়া সাধারণে কর্ত্তব্যমূঢ় হইবে ও শাস্ত্রও নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিবে।

বিজ্ঞানের ভাষাকে অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি দোষ হইতে যথাশক্তি মুক্ত করিতে হইবে, ঠিক কথা। সুতরাং ভবিষ্যতের সঙ্কলকগণ নূতন পরিভাষা প্রণয়নে সম্পূর্ণ অধিকারী। কিন্তু পরিভাষার অন্য গুণ যে পরিমাণে থাক বা নাই থাক, পরিভাষায় স্থায়িত্ব-গুণের আবশ্যকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পরিভাষা ভাষারই প্রকারভেদ ; উহা কল্পিত ভাষা, অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রচিত ভাষা। স্থিতিশীলতা ভাষা মাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য। ভাষা নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল হইলে তাহাকে আর ভাষা বলা চলে না। নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল ভাষায় মানুষের কাজ চলে না। অধিকন্তু উহা একটা যন্ত্রণা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং পরিভাষা স্থায়ী হওয়া আবশ্যক ; কালসহকারে তাহার সংস্কার হউক, ক্ষতি নাই ; কিন্তু আকস্মিক ও মৌলিক পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নহে।

সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ পরিভাষা-প্রণয়নের জন্য জেদ ধরিয়া বসিয়া থাকিলে কার্য্যনাশ মাত্র হইবে। স্থির থাকিলে চলিবে না ; অপেক্ষা করিবার সময়

নাই। লাবোয়াশিয়া রসায়নের জন্য যে পরিভাষা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত। এমন কি, সমস্ত বিজ্ঞান-বিদ্যায় ঐ পরিভাষার তুলনা নাই বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহাও দোষরহিত বা অসঙ্গতিবর্জ্জিত নহে। এমন কি, উহাতে এমন একটা প্রধান দোষ বর্ত্তমান আছে, যাহাতে উহার গোড়ায় গলদ। লাবোয়াশিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যৌগিক পদার্থ মাত্রেরই দুইটি ভাগ; দুইটি বিপরীত-ধর্ম্মাক্রান্ত ভাগ একত্র মিলিত হইয়া যাবতীয় যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। লাবোয়াশিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ও তদনুসারে তাঁহার পরিভাষা প্রণয়ন করেন। লাবোয়াশিয়ার সিদ্ধান্ত তৎকালে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, এবং পরবর্ত্তী রসায়ন-বিদেরা এই সিদ্ধান্ত আরও ফলাইয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল এই সিদ্ধান্ত অনেকটা উলটাইয়া গিয়াছে। যে সিদ্ধান্ত আশ্রয়ে পরিভাষার রচনা, সে সিদ্ধান্ত এখন নাই, কিন্তু সেই পরিভাষা অদ্যাপি অবলম্বিত রহিয়াছে।

কোনও পরিভাষা যে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ হইবে, এইরূপ আশা করা যায় না। সাহসে ভর করিয়া যথাসাধ্য সঙ্গতি রাখিয়া ও অসঙ্গতি নিবারণ করিয়া পরিভাষা সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। যদি সেই পরিভাষায় মূলগত এবং সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য দোষ লক্ষিত না হয়, তবে সাধারণে ইহা গ্রহণ করিতে পারিবে। তাহার আশ্রয়ে গ্রন্থরচনা ও জ্ঞানপ্রচার কার্য্য আরব্ধ হইতে পারিবে। তাহাকেই ভিত্তি করিয়া তাহার উপর গাঁথন চলিতে পারিবে। আবশ্যকমত কালক্রমে তাহাকে সংস্কৃত করিয়া লইলেই চলিবে।

লাবোয়াশিয়া অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন; পরিভাষা প্রণয়নেও তাঁহার অসামান্য প্রতিভারই পরিচয় পাই। আমাদের কাজ কেবল অনুবাদ মাত্র। ইহাতে প্রতিভা প্রয়োগের কোন আবশ্যকতা নাই। আমাদিগকে ইংরেজী পরিভাষা আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্রের বিশিষ্টতায় দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে মাত্র।

পারিভাষিকত্বের এই কয়টি লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে;

১। প্রত্যেক শব্দ একটি মাত্র অর্থে ব্যবহৃত হইবে; তাহার দ্বিতীয় অর্থ থাকিবে না।

২। এক অর্থে একটি মাত্র শব্দ প্রযুক্ত হইবে; দুই শব্দ একার্থবাচী হইবে না।

৩। প্রত্যেক শব্দ তাহার নির্দ্দিষ্ট অর্থে সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইবে।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের সময় প্রচলিত লৌকিক ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিতে হয়; আবার অনেক সময়ে প্রচলিত শব্দের অভাবে নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতে হয়। প্রচলিত শব্দের একটা দোষ আছে; উহা লোকসমাজে এক মাত্র নির্দ্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় না। প্রচলিত ভাষার অন্তর্গত প্রায় অধিকাংশ শব্দেরই পাঁচ সাত দশটা অর্থ থাকে। সুতরাং উহাতে পারিভাষিকত্বের মুখ্য লক্ষণ থাকে না। পারিভাষিকত্ব স্থাপন করিতে গেলে উহাদিগকে সঙ্কীর্ণ অর্থে বাঁধিয়া ফেলিতে হয়; কিন্তু অনভ্যাস হেতু সাধারণে সহসা উহাদের পারিভাষিক প্রয়োগ বুঝিতে পারে না। নবকল্পিত অপ্রচলিতপূর্ব্ব শব্দে এই দোষটি ঘটে না। তাহাতে যে অর্থ আরোপ করা যায়, তাহা সেই অর্থ মাত্রই ব্যক্ত করে। তবে পরিচয়ের অভাবে প্রথমটা কানে ঠেকিতে পারে; কিন্তু অভ্যাস-বলে সহিয়া যায়। কোন স্থানে প্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে; কোথাও বা অপ্রচলিত শব্দের কল্পনা করিতে হইবে। অনভ্যাস ও অপরিচয় হেতু প্রথম প্রথম কানে বাজিবে; অভ্যাস ও পরিচয়ের সহিত সে দোষ থাকিবে না।

ফল কথা, পাঁচ জনে সম্মত হইয়া যে শব্দে যে অর্থ আরোপ করা যায়, সে শব্দের সেই অর্থ। শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহা আরোপিত সম্বন্ধ মাত্র। যে-কোন অর্থে যে-কোন শব্দ ব্যবহার করিতে আমাদের অধিকার আছে; সকলে সম্মত হইয়া যে অর্থ দেওয়া যায়, তাহাই গ্রাহ্য।

রসায়ন-শাস্ত্রের ইংরেজী পরিভাষাও যে নির্দ্দোষ নহে, তাহা দুই একটি দৃষ্টান্তের বিচার করিলেই দেখা যাইবে। কয়লা পোড়াইলে যে বায়ু পাওয়া যায়, রসায়ন-শাস্ত্রে তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট নাম নাই; পাঁচ জনে পাঁচ রকমের নাম ব্যবহার করেন; একই পদার্থের carbonic acid, carbon dioxide, carbonic anhydride, এই তিনটি নাম প্রচলিত আছে। আর একটি পদার্থ সোরা; ইহার প্রচলিত নাম দুইটি, nitre আর saltpetre; রসায়ন-গ্রন্থে এই দুইটি নাম অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়; তাহা সেওয়াই nitrate of potash, nitrate of potassium, potassium nitrate, potassic nitrate, এইরূপ ঈষদ্ ভিন্ন কয়েকটি নামও যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ভেদ শুধু উচ্চারণগত ভেদ নহে, তাৎপর্য্যগত ভেদও বর্ত্তমান আছে। Nitrate of potash নামের সহিত

একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত জড়িত আছে; সে সিদ্ধান্তটি প্রাচীন; বর্ত্তমানে সে সিদ্ধান্ত ভ্রমমূলক বলিয়া স্থির হইয়াছে। Potassic Nitrate ঐ নামের আধুনিক আকার; সেই পুরাতন ভ্রম সংস্কারের চেষ্টায় এই নাম গৃহীত হইয়াছে। তথাপি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় নাম, এমন কি, nitre প্রভৃতি লোকমুখে চলিত নামও আধুনিক গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতি অল্প চেষ্টায় এই যথেচ্ছাচার নিরাকৃত হইতে পারে। তথাপি চলিত প্রথা এমনই স্থিতিশীল যে, রসায়ন-বিদ্যার গ্রন্থে একই দ্রব্যের এতগুলি নাম আজিও চলিতেছে।

ইংরেজীতে চারিটা নাম বর্ত্তমান আছে বলিয়া বাঙ্গালা অনুবাদের সময় চারিটা নাম খুঁজিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? দোষের অনুকরণ সর্ব্বথা পরিহার্য্য। একটু সাবধান হইয়া চলিলে এই সকল সামান্য দোষ আমরা পূর্ব্ব হইতেই পরিহার করিতে পারি।

যাঁহারা এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই। নতুবা oxygen বাঙ্গালায় অম্লজান হইত না। Carbon dioxide-এর বাঙ্গালায় দ্ব্যম্লজনিত অঙ্গার মধুর নহে; উহাতে অন্য দোষও রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রথা অনুসারে ঐ দ্রব্যের নাম carbonic anhydride; ইংরেজী বহিতে একাধিক নাম আজিও দেখা যায়; বাঙ্গালায় তাহা থাকিবে কেন?

পাশ্চাত্য রসায়ন-গ্রন্থে নামকরণ সম্বন্ধে যে প্রথা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও প্রণালীবদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইব। যে সকল ইংরেজী নাম কেবল প্রাচীনতার বলে ইংরেজী পুস্তকে অদ্যাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের একেবারে বর্জ্জন করিব। নির্দ্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে একাধিক শব্দ থাকা উচিত নহে; এই নিয়মে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিজ্ঞানের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন থাকা কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভাষার ভেদ বিজ্ঞানের উন্নতির অন্তরায় হয় মাত্র। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ভাষা বিভিন্ন, কাজেই স্বজাতির মুখ চাহিয়া জাতীয় ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখিতে হয়। ইহাতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান-কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে। কিছু কাল পূর্ব্বে ইউরোপে প্রসিদ্ধ গ্রন্থসকল লাটিন

ভাষায় লিখিত হওয়া নিয়ম ছিল। নিউটনের প্রিন্সিপিয়া লাটিনে লিখিত হইয়াছিল। অদ্যাপি উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিষয়ক অনেক গ্রন্থ লাটিনে লিখিত হইয়া থাকে। সার্‌ জোসেফ হুকার সাহেবের ভারতবর্ষের উদ্ভিদ্‌-বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ লাটিনে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা ভিন্ন হইলেও গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক নামগুলি অন্ততঃ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন হওয়া উচিত নহে।

সুতরাং রসায়ন-শাস্ত্রের পারিভাষিক নামগুলি একেবারে সশরীরে আমাদের ভাষায় গ্রহণ করিবার পক্ষে প্রবল যুক্তি আছে। ইংরেজী নামগুলি অনুবাদের চেষ্টা না করিয়া কেবল বাঙ্গালা হরপে বসান উচিত, জোরের সহিত অনেকে এই বলিয়া থাকেন।

রসায়ন-শাস্ত্রে প্রায় সত্তরটি মূল পদার্থের সত্তরটি নাম রহিয়াছে; তাহা ব্যতীত সেই সত্তরটি পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাগের সমবায়ে উৎপন্ন শত সহস্র যৌগিক পদার্থের শত সহস্র পারিভাষিক নাম রহিয়াছে। এই শত সহস্র নাম বাঙ্গালায় অনুবাদের চেষ্টা করিয়া খাঁটি বাঙ্গালা বা সংস্কৃত-মূলক বাঙ্গালা নাম প্রচলনের চেষ্টা বিড়ম্বনা। একে এইরূপ অনুবাদ সম্ভবপর নহে; দ্বিতীয়তঃ সম্ভবপর হইলেও তাহাতে কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই।

বাঙ্গালীর মধ্যে যদি কেহ রসায়ন-বিজ্ঞানে প্রকৃত অধিকার লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে এখন বাঙ্গালার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না; ইংরেজী ভাষার আশ্রয় লইতেই হইবে। যদি বাঙ্গালায় কোন ব্যক্তি রসায়ন-বিদ্যার কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তাঁহাকে তাহা ইংরেজী ভাষাতেই প্রচার করিতে হইবে। সুতরাং প্রথমে কিছু দূর বাঙ্গালা ভাষার অবলম্বনে চলিয়া, পরে ইংরেজীর আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। সুতরাং প্রত্যেক বাঙ্গালী রসায়নবিৎ এক সেট্‌ ইংরেজী ও এক সেট্‌ বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দের ভারে মেরুদণ্ড নমিত করিয়া চলিতে থাকিবেন।

একটা আপত্তি উঠিতে পারে। আপত্তি এই যে, ইংরেজী শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই ইংরেজের ছেলের মনে একটা ভাবের উদয় করে; কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলের কানে কেবল একটা ধাক্কা দিয়া যায়, মনের উপর রেখাপাত পর্য্যন্ত করে না। অতএব বাঙ্গালীর ছেলের জন্য অনুবাদই আবশ্যক। কিন্তু পারিভাষিক শব্দের বেলায় সে আপত্তি টিকিবে না। মনে কর, একটি ধাতুর ইংরেজী নাম Ruthenium; ইংরেজের ছেলেই বল আর বাঙ্গালীর

ছেলেই বল, যে রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, এই শব্দের উচ্চারণে তাহার মনে কোন ভাবের উদয় হয় না। Ruthenium শব্দে হাতী, কি ঘোড়া, কি গাছ, কিছুই তাহার মনে আসে না। ঐ শব্দটি রসায়নবিৎ পণ্ডিতের সৃষ্টি; প্রচলিত ভাষায় উহার কস্মিন্ কালে ব্যবহার নাই; সুতরাং উহার সহিত ইংরেজের ছেলের ও বাঙ্গালীর ছেলের তুল্য সম্বন্ধ। সুতরাং উহা যখন ইংরেজীতে চলিবে, তখন বাঙ্গালায় চলিবে না কেন? বাঙ্গালায় আবার উহার অনুবাদের প্রয়োজন কি? উহাকে অক্ষরান্তরিত করিলেই যথেষ্ট।

স্বদেশী ভাষাকে আশ্রয় করিয়া পারিভাষিক শব্দের প্রণয়নে অবশ্য একটা বাহাদুরী আছে। আমাদের দেশে প্রাচীন পণ্ডিতদিগের এই কার্য্যে একটা অদ্ভুত পরাক্রম ছিল। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে, ব্যাকরণ বা অলঙ্কার বা গণিত বা জ্যোতিষ বা চিকিৎসা, যে-কোন শাস্ত্রেই দেখা যায়, পারিভাষিক শব্দের ছড়াছড়ি। শাস্ত্রকর্ত্তারা অণু মাত্র দ্বিধা না করিয়া শতে শতে, সহস্রে সহস্রে পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি করিয়া যাইতেছেন। সময়ে সময়ে নির্ব্বাচন-প্রণালী ও সঙ্কলন-প্রণালীর মৌলিকতা ও কার্য্যকারিতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ব্যাকরণ-শাস্ত্রে হল্ হস্ ণিচ্ ক্বিপ্ লট্ লোট্ প্রভৃতি যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাদের মৌলিকতার ও তাহাদের কার্য্যকারিতার তুলনা কোথায়? অথচ স্থলান্তরে দেখিতেছি যে, পারিভাষিক শব্দ-প্রণয়নে এই অতুল পরাক্রম বর্ত্তমান থাকিতেও প্রাচীন জ্যোতিষীরা যাবনিক ভাষা হইতে বিস্তর পারিভাষিক শব্দ অক্ষরান্তরিত করিয়া লইয়াছেন। আমাদেরও সেই প্রথা অবলম্বনে দোষ হইবে কেন?

তবে আর একটা কথা আছে। সত্তরটা মূল পদার্থের মধ্যে কতকগুলি পদার্থ এ দেশের জনসমাজেও বহু দিন হইতে পরিচিত এবং তাহারা আমাদের সাংসারিক কার্য্যে নিত্য ব্যবহৃত হয়। যেমন—কয়লা, গন্ধক, সোনা, রূপা, লোহা ইত্যাদি। এই সমুদয় পরিচিত পদার্থের খাঁটি বাঙ্গালা নাম কেহই ত্যাগ করিবে না। রূপার মত পরিচিত পদার্থটিকে সিল্‌বার বা আর্জেণ্টম বলিতে নিতান্তই সঙ্কোচ বোধ হইবে।

এতদ্ভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়াসকলের এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধনের জন্য যে সকল যন্ত্রাদির ব্যবহার হয়, উহাদের পারিভাষিক নামের অনুবাদ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্তস্বরূপে oxidation,

combustion, reduction, solution, distillation প্রভৃতির এবং যন্ত্রের দৃষ্টান্তস্বরূপে retort, flask প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি। ইহাদের খাঁটি বাঙ্গালায় অনুবাদ আবশ্যক। এখানে শব্দগুলি অক্ষরান্তরিত করিলে চলিবে না। যুক্তিপ্রয়োগ অনাবশ্যক।

এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর পারিভাষিক শব্দ আছে। শব্দশাস্ত্রানুসারে ইহারা class names. দ্রব্যের জাতিবাচক বা শ্রেণীবাচক নাম। উদাহরণ,—element, compound, metal, alloy, acid, base, salt, fat, oil ইত্যাদি। ইহাদেরও অনুবাদ আবশ্যক; হরপ বদলাইলে চলিবে না।

এই পর্য্যন্ত দাঁড়াইল যে, রসায়ন-শাস্ত্রে মূল পদার্থ বা যৌগিক পদার্থ সকলের যে-সকল নাম রহিয়াছে, যেগুলি প্রকৃতপক্ষে proper noun, তাহাদের মধ্যে সুপরিচিত ও সুলভ পদার্থগুলি বাদ দিয়া অপরের জন্য কেবল ইংরেজী নাম অক্ষরান্তরিত করিয়া লইলেই চলিতে পারে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। গ্রীকেরা উচ্চারণের সুবিধার জন্য আমাদের চন্দ্রগুপ্তকে অক্ষরান্তরিত করিয়া Sandracottusএ পরিণত করিয়াছিলেন, এবং চীনবাসীরা রাঙ্গামাটিকে লোচোমোচি-তে পরিণত করিয়াছিলেন। Sandracottus যে চন্দ্রগুপ্ত, এবং লোচোমোচি যে রাঙ্গামাটি, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করিতে পণ্ডিতদের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি এক জাতির লোকের নাম অন্য জাতির ভাষায় লিখিবার সময় কেবল উচ্চারণসৌকর্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিতে গেলে ঘোর বর্ব্বরতা হইয়া দাঁড়ায়; তাহাতে জ্ঞানের পথে অনর্থক কাঁটা দেওয়া হয়। এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় শব্দ অক্ষরান্তরিত করিতে হইলে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে বানান করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ অর্থাৎ যে জাতির মধ্যে সেই শব্দটি প্রচলিত আছে, সেই জাতির লোকে তাহাকে যেরূপে উচ্চারণ করে, ঠিক সেই উচ্চারণ যাহাতে অবিকৃত থাকে, এই উদ্দেশ্যে বানানের এই নিয়মগুলি অবধারিত হয়। তর্ক উঠিবে যে, বৈজ্ঞানিক শব্দের বানানে বৈজ্ঞানিকতারক্ষা যদি কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ইংরেজী শব্দ অক্ষরান্তরিত করিবার সময় এইরূপ কতকগুলি নিয়ম অবলম্বন করিয়া তদনুসারে চলা উচিত কি না?

এই তর্কের উত্তর আছে। বাঙ্গালায় পরিভাষা সঙ্কলনের উদ্দেশ্য কি? এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যে দুই চারিখানি রসায়ন-বিষয়ক গ্রন্থ লিখিত

হইয়াছে, তাহাতে ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ যথাশক্তি অবিকৃত রাখিয়া তাহাদিগকে অক্ষরান্তরিত করিয়াই ব্যবহার করা হইয়াছে। কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড্, সলফেট্ অব্ পটাশ প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় প্রচলিত রাসায়নিক গ্রন্থে ও ডাক্তারি গ্রন্থে প্রচুর দেখা যায়। কিন্তু এই সকল শব্দ বাঙ্গালীর কর্ণ এরূপ তীব্রভাবে ভেদ করে যে, জ্বররোগীর কুইনীন্ সেবনের ন্যায় ঐগুলিকে কোন রকমে কষ্টে-সৃষ্টে মস্তিষ্কসাৎ করা হয় মাত্র। ঐরূপ প্রথা প্রচলিত থাকিলে বাঙ্গালী চিরদিন রসায়ন-শিক্ষা একটা দৈব নিগ্রহস্বরূপ গণনা করিবে সন্দেহ নাই। সুতরাং পুরাতত্ত্ববিৎ, ঐতিহাসিক ও শব্দ-শাস্ত্রজ্ঞদের নির্দ্দিষ্ট মার্গ ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অন্য পন্থা দেখিতে হইবে। বিজাতীয় শব্দগুলির শ্রুতিকটুতা-দোষ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। কঠোর শব্দগুলিকে কোমল ও মোলায়েম আকার দিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে আনিতে হইবে।

পুরাকালে এ দেশেও এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল। যাবনিক Helios শব্দ হেলি এবং Aphrodite আস্ফুজিৎ আকারে সংস্কৃত জ্যোতিষ-শাস্ত্রে দেখা দেয়। Heliocentric শব্দ হেলিকেন্দ্রক আকার গ্রহণ করিয়া ঠিক আত্মীয় ও পরিচিতের ন্যায় শুনায়। অথচ উভয় শব্দের ঐক্যনির্ণয়ে কোন কষ্ট হয় না। সংস্কৃত কাস্তীর শব্দ যাবনিক kassiteros শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াও কেমন সংস্কৃতের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। যাবনিক ভাষার জ্যোতিষিক শব্দ সংস্কৃত জ্যোতিষ-শাস্ত্রে গৃহীত হইয়া কিরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, স্থানান্তরে তাহার একটি তালিকা দিয়াছি; এ স্থলে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। বলা বাহুল্য, আমরা সেই প্রাচীন কালের জ্যোতিষীদের অবলম্বিত পদ্ধতি অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ করি।

পাশ্চাত্য ভাষায় মূল পদার্থের নামকরণ ব্যাপারে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বিত হয় নাই। যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি সেই নাম দিয়াছেন; এবং সেই নামই সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। পদার্থের গুণানুসারে নামকরণের চেষ্টা কয়েক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ, Oxygen = অম্লোৎপাদক, Hydrogen = জলোৎপাদক, Rubidium = লোহিতক (যাহা বাষ্পাবস্থায় লোহিতবর্ণের আলো উৎপাদন করে) ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে নামকরণ ব্যাপারে কেবল ব্যক্তিগত অভিরুচি ও খেয়াল ভিন্ন আর কিছু

দেখা যায় না। নামকরণ ব্যাপারই সর্ব্বত্র খেয়ালের উপর স্থাপিত ; কাণা পুতের নাম পদ্মলোচন রাখিতে কোন আইনে নিষেধ নাই। উদাহরণ ;—পারদের নাম Mercury ; বুধগ্রহের সহিত উহার একটা কাল্পনিক অথচ অমূলক সম্বন্ধ অনুসারে এই নাম। ধাতুবিশেষের নাম Cerium ; সেই বৎসর Ceres নামক গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এই সূত্রে। ধাতুবিশেষের নাম Cobalt অর্থাৎ একজাতীয় উপদেবতার নামানুসারে।

ফল কথা, নামের সহিত পদার্থের গুণের বা ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ থাকিবার দরকার নাই ; সুতরাং সেই সেই নামের অর্থ ধরিয়া অনুবাদের চেষ্টা ব্যর্থ পরিশ্রম। Oxygen ও Nitrogenএর অনুবাদে অম্লজান ও যবক্ষারজান, এই দুই নামের কল্পনা কেন হইয়াছিল বলিতে পারি না। ঐরূপ অনুবাদের কোন বিশেষ উপযোগিতা ছিল না।

পদার্থ-সকলের ইংরেজী নামের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহাদিগকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১। কতকগুলি যৌগিক পদার্থ রসায়ন-বিজ্ঞানের উৎপত্তির বহু পূর্ব্বেই জনসমাজে বিশিষ্টরূপে পরিচিত ছিল। তাহাদের খাঁটি ইংরেজী নাম বিজ্ঞানের ভাষাতেও গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ—gold, silver, sulphur, iron প্রভৃতি। কিন্তু যে সকল যৌগিক পদার্থে তত্তৎ মূল পদার্থ বর্ত্তমান আছে, তাহাদের নামকরণকালে উহাদের ইংরেজী নামের পরিবর্ত্তে লাটিন নাম ব্যবহারে সুবিধা হয়। যেমন—*auric* acid, *argentic* nitrate, *ferrous* sulphate ইত্যাদি।

২। রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার পর যে-সকল মূল পদার্থ নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে, কতিপয় স্থলে তাহাদের কোন-না-কোন একটি গুণ অবলম্বন করিয়া নামকরণ হইয়াছে। উদাহরণ—Oxygen, Chlorine, Iodine, Phosphorus, Potassium, Calcium.

৩। তদ্ভিন্ন অপরত্র কোন একটা কল্পিত ব্যাপার অনুসারে খেয়ালের উপর নাম সঙ্কলিত হইয়াছে। উদাহরণ—Tellurium, Cobalt, Gallium, Germanium ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় নামকরণ ব্যাপারে নিম্নলিখিত কয়েকটি সূত্র অনুসারে চলা যাইতে পারে।

১। পরিচিত পদার্থের মধ্যে যাহাদের নাম ভাষায় বহু কাল হইতে প্রচলিত আছে, সেই সেই নাম বজায় রাখা যাইবে। যেমন—স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, গন্ধক, পারদ ইত্যাদি।

২। যে কয়টি নূতন নাম বাঙ্গালা ভাষায় কিছু পূর্ব্ব হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা যথাসাধ্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করা যাইবে। অম্লজান, যবক্ষাবজান প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় ইতঃপূর্ব্বে গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে। বিশেষ আপত্তি না থাকিলে উহাদিগকে রক্ষা করা যাইবে।

৩। তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র কেবল ইংরেজী শব্দ অক্ষরান্তরিত করা যাইবে। তবে উচ্চারণেব সুবিধার জন্য কাটিয়া ছাঁটিয়া শব্দগুলিকে মোলায়েম করিয়া লওয়া হইবে। শব্দগুলি শ্রুতিসুখ হওয়া দরকার; বাঙ্গালা ভাষার ধাতুর সহিত না মিশিলে কোন শব্দ গ্রাহ্য হইবে না।

আবার বলিতেছি যে, পারিভাষিক নামের অধিকাংশই খেয়ালের উপর আবিষ্কৃত, সুতরাং তাহাদের কোন সার্থকতা নাই। কাণা পুত্রের পদ্মলোচন নামের যেমন সার্থকতা নাই, সেইরূপ অধিকাংশ মূল পদার্থের নামেরও কোনরূপ সার্থকতা লক্ষিত হইবে না। আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত পরিভাষা সঙ্কলনের যে কিঞ্চিৎ চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে নামের সার্থকতা রক্ষার জন্য একটা উৎকট প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু এই কার্য্যের জন্য এতটা পরিশ্রমের কোন দরকার ছিল না। পারিভাষিক নামের সার্থকতা থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক।

বাঙ্গালার প্রথম রসায়ন-গ্রন্থ

কিছু দিন হইল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয় হইতে একখানি রসায়ন-গ্রন্থ আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। গ্রন্থখানির সহিত বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যের সম্বন্ধ আছে দেখিয়া উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ কর্ত্তব্য বোধ করিলাম।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্য ইংরেজ মিশনারিদের নিকট নানা কারণে ঋণী। এই গ্রন্থখানিও মার্শমান প্রভৃতি মিশনারিদের প্রযত্নেই প্রচারিত। গ্রন্থের নাম Principles of Chemistry by John Mack of Serampur College—কিমিয়া বিদ্যার সার, শ্রীযুক্ত জান মাক সাহেব কর্ত্তৃক রচিত ও গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত। গ্রন্থখানি শ্রীরামপুর যন্ত্রে ১৮৩৪ অব্দে মুদ্রিত। বর্ত্তমান পুস্তক ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মাত্র। দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল কি না, জানি না।

ডিমাই বার-পেজী আকারে গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৯-১৬৯। প্রথম উনিশ পৃষ্ঠায় ভূমিকা ও সূচী আছে। ভূমিকা ইংরেজীতে লিখিত। সূচী ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের দুই ভাগ; প্রত্যেক ভাগ অধ্যায়ে ও প্রত্যেক অধ্যায় প্রকরণে বিভক্ত। প্রথম ভাগে 'কিমিয়া-প্রভাব'—chemical forces;—যথা, "আকর্ষণ," "তাপক," "আলো," "বিদ্যুতীয় সাধন,"—বিভিন্ন অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়—'কিমিয়া-বস্তু'—chemical substances; তন্মধ্যে দুই অধ্যায়ে "বিদ্যুৎসম্পর্কীয় অভাবরূপ বস্তু" (electro-negative substances), এবং "ধাতু-ভিন্ন বিদ্যুৎসম্পর্কীয় স্বভাবরূপ বস্তু" (unmetallic electro-positive substances) বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ধাতু ব্যতীত অন্য সমুদয় মূল পদার্থকে, অর্থাৎ non-metalদিগকে, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণী-বিভাগ আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। প্রথম শ্রেণী বা electro-negative শ্রেণীমধ্যে Oxygen, Chlorine, Bromine, Iodine, Fluorine স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় বা electro-positive শ্রেণীর মধ্যে Hydrogen, Nitrogen,

Sulphur, Phosphorus, Carbon, Boron, Selenium স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ধাতু-সকলের ও জৈব পদার্থের—"সেন্দ্রিয় সম্পর্কীয় বস্তু" সকলের বিবরণ থাকিবে, গ্রন্থমধ্যে এইরূপ আভাস আছে। গ্রন্থশেষে "ক্রোড়পত্র" (appendix) মধ্যে চিত্র-সহিত বাষ্পীয় এঞ্জিনের ব্যাখ্যা আছে।

গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভূমিকামধ্যে নিম্নোদ্ধৃত বাক্য আছে—

> "Mr. Marshman having proposed some years ago to publish an original series of elementary works on history and science, for the use of youth in India, I thought it a privilege to be associated with him in the undertaking and cheerfully promised to furnish such parts of the series as were more intimately connected with my own studies. Other engagements have retarded the execution of our project, much against our will. He has therefore been able to do no more than bring out the first part of his Brief Survey of History; and now, at length, I am permitted to add to it this first volume of the Principles of Chemistry."

গ্রন্থকার শ্রীরামপুর কালেজে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। শ্রীরামপুর কালেজে তৎকালে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সহকারে শিক্ষা দেওয়া হইত। স্কটলণ্ড-নিবাসী জেম্‌স্‌ ডগ্‌লাস্‌ যন্ত্রাদি ক্রয়ার্থ পাঁচ শত পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন; তজ্জন্য গ্রন্থকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। জ্যোতিষ, বস্তুবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রচার গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ছিল। এই অভিপ্রায় কত দূর সফল হইয়াছিল, জানি না। শ্রীরামপুরে ও কলিকাতায় গ্রন্থকার রসায়ন সম্বন্ধে যে লেক্‌চার দিতেন, তাহারই অবলম্বনে বর্ত্তমান গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

রসায়ন-শাস্ত্রে বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "Be it understood, the native youth of India are those for whom we chiefly labour; and their own tongue is the great instrument by which we hope to enlighten them." গ্রন্থকার এক জায়গায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিতেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষার দ্বারা বিজ্ঞান শিক্ষা চলিতে পারে না। বাঙ্গালা দেশে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রচারের জন্য যিনি সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় সভাপতির আসন হইতে সে দিন বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালা ভাষা আমাদের মাতৃস্তন্যের স্থানীয় বটে; কিন্তু জননী বহু দিন হইতে রুগ্না; তাঁহার স্তন্য এখন বিষবৎ পরিহার্য্য। পাঠকেরা অবধান করুন।

এই গ্রন্থখানির অধ্যয়নে প্রচুর আমোদ পাওয়া যায়। চৌষট্টি বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানের শৈশব ছিল। তখন যাহা অস্পষ্ট ছিল, এখন তাহা স্পষ্ট। তাপ তখনও দ্রব পদার্থমধ্যে গণ্য হইত; আলোক কণিকাবৃষ্টি হইতে উৎপন্ন, এ বিশ্বাস তখনও যায় নাই; তাড়িতের অধিকাংশ ধর্ম্মই অজ্ঞাত ছিল; ডাল্টনের পরমাণুবাদ আঁধারে আলো দিতে গিয়া আঁধারকে আরও ঘনাইয়া তুলিতেছিল; অধিকাংশ মূল পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব তখনও নির্ণীত হয় নাই; নাইট্রজেনের এক পরমাণুর সহিত অক্সিজেনের পাঁচ পরমাণু যোগে নাইট্রিক দ্রাবক জন্মে; এইরূপ নানাবিধ তত্ত্ব তখন রসায়নজ্ঞগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইতেছিল। এখন সে সমস্ত মত বদলাইয়া গিয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক-সাহিত্য এখনও অপূর্ণ। আলোচ্য গ্রন্থে বাঙ্গালায় রসায়ন-শাস্ত্রের যে অবস্থা দেখিতে পাই, তাহার অপেক্ষা বড় অধিক উন্নতির চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাই না।

গ্রন্থের ভাষা সত্তর বৎসরের পূর্ব্বতন বাঙ্গালা; গ্রন্থের বিষয় বিজ্ঞান; গ্রন্থকার ইংরেজ। সুতরাং গ্রন্থের ভাষায় যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাই প্রচুর আমোদের সঞ্চার করে। বাঙ্গালা ভাষা আজকাল সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে; কিন্তু তথাপি বিবিধ বিজ্ঞানের তাৎপর্য্য প্রচারে এখনও সাহসী হয় নাই। এখনও বৈজ্ঞানিকের বাঙ্গালা সাধারণের বোধগম্য হয় নাই। যাঁহারা বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার দৈন্য বুঝিতে পারেন। এখনও এই অবস্থা! সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এক জন বিদেশী কিরূপে এই ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লিখিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তাহা চিন্তনীয়। বিদেশীর যে সাহস ছিল, আমাদের সে সাহস আছে কি? থাকিলে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যের অদ্যাপি এরূপ দুরবস্থা থাকিত না।

এই গ্রন্থের ভাষার নমুনা স্বরূপ দুই এক স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কিমিয়া বিদ্যা দ্বারা এই এই শিক্ষা হয়, বিশেষতঃ নানাবিধ বস্তুজ্ঞান এবং সেই নানাবিধ বস্তু, যে যে ব্যবস্থানুসারে পরস্পর সংযুক্ত ও লীন হইলে ঐ বস্তু হইতে নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা।" ৩ পৃ.।

"কিমিয়া প্রভাব চারি প্রকার। ১ আকর্ষণ। ২ তাপক। ৩ আলোক। ৪ বিদ্যুতীয় সাধন। অনুমান হয় যে অপর এক প্রকার চুম্বকীয় গুণ।" ৫ পৃ.।

"দ্রব হওন কালে কতক তাপক দ্রব বস্তু মধ্যে লীন হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা দ্রব বস্তুর তাপের কিছু বৃদ্ধি হয় না এবং সেই দ্রব বস্তু পুনর্ব্বার কঠিন হইলে তাপক বোধ হয়। এই এক মহার্ঘ কথা বিষয়ে পশ্চাৎ স্পষ্টরূপে লেখা যাইবেক।" পৃ. ৩১।

"এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পরমেশ্বর যে আছেন এবং তাঁহার অসীম পরাক্রম ও বুদ্ধি ও ভদ্রতাতে লোকসকলকে সৃষ্টি ও রক্ষা করিতেছেন, ঐ সকল প্রমাণেতে তাঁহাকে স্তুতিবাদ কে না করিবে।" ৪১ পৃ.।

"আলোকের চালন ও কার্য্যদ্বারা অনেকে বোধ করে যে সে এক প্রকার বস্তু। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি অনুমান করেন যে, সে বস্তু নহে, কেবল বস্তুর মধ্যগত একপ্রকার বিশেষ সংলড়ন দ্বারা উৎপন্ন।" ৫০ পৃ.।

"আলোকের চলন শীঘ্র বটে, তথাপি মাপিত হইতে পারিবে। অপর আলোক চলত বাধিত কিম্বা অন্যদিগে পরাবর্ত্তিত হইতে পারিবেক।" ৫০ পৃ.।

"সামান্য আকাশের মধ্যস্থ অক্সিজনের দ্বারা তাবৎ জীব জন্তুর প্রাণ রক্ষা হয় এবং তাহাতে মনুষ্যের ব্যবস্থার কর্ম্মনিমিত্তক তাবৎ অগ্নি জাজ্বল্যমান হয়, অতএব আমাদের ভদ্রদ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের হিতজনক কার্য্যের মধ্যে সামান্য আকাশকে বিশেষরূপে গণনা করিতে হয়।" ১১১ পৃ.।

"সোদিয়ামের খ্লোরিণ অর্থাৎ সামান্য লবণের ৮ ঔন্স আর গুড়াকৃত মাঙ্গানেসের কালা অক্সিদের ৩ ঔন্সে হামানদিস্তাতে গুঁড়া করিয়া, তাহা রিটোর্টের মধ্যে রাখিয়া ও জলের ৪ ঔন্সে মিশ্রিত গান্ধকিকাম্লের ৪ ঔন্স ঠাণ্ডা হইলে তাহার উপর ঢালিয়া, সে সকল অল্পে অল্পে উত্তপ্ত কর, তাহাতে খ্লোরিণ আকাশ নির্গত হইবে।" ৭২ পৃ.।

এই যথেষ্ট। এ-কালে লিখিত কোন কোন বৈজ্ঞানিক পুস্তকের ভাষার সহিত মিলাইলে এই ভাষাকে বড় বেশী দুর্ব্বোধ মনে হইবে না।

রসায়ন-শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলনে আধুনিক গ্রন্থকারদের যে সমস্যা উপস্থিত হয়, মাক্ সাহেবেরও তাহা উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার লিখিতেছেন—

"In composing this volume, my primary object has been to introduce Chemistry into the range of Bengalee literature and domesticate its terms and ideas in this language. The attempt will be generally acknowledged to have been attended with no small difficulties * * * * The names of chemical substances are, in the great majority of instances, perfectly new to the Bengalee language; as they were but a few years ago to all languages. The chief difficulty was to determine, whether the European nomenclature should be merely put into Bengalee letters, or the European terms be entirely translated by Sanskrit, as bearing much the same relation to Bengalee as the Greek and Latin do to the English. * * * I have preferred, therefore, expressing the European terms in Bengalee characters, merely changing the prefixes and terminology, so as decently to incorporate the new words into the language."

কটক কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রণীত 'সরল রসায়ন' বোধ করি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত রসায়ন সম্বন্ধে শেষ গ্রন্থ। ইহার প্রকাশের তারিখ ১৮৯৮। এই গ্রন্থেও স্থূলতঃ মাক্ সাহেবেরই প্রবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

ইংরেজী পারিভাষিক শব্দগুলিকে অক্ষরান্তরিত করিয়া লওয়া উচিত, কি তাহাদের অনুবাদ আবশ্যক, এই কথা লইয়া তর্ক আছে। রসায়ন-শাস্ত্রে যে হাজার হাজার পারিভাষিক নাম প্রচলিত আছে, তাহাদের অনুবাদের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। এ বিষয়ে দ্বিরুক্তির সম্ভাবনা নাই। তবে অক্ষরান্তরিত করিবার সময়ে বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্রের উচ্চারণ-শক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শব্দগুলিকে একটু কাটিয়া ছাঁটিয়া মোলায়েম করিয়া লইতে হইবে।

মাক্ সাহেব তাহাই করিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও সেইরূপ কাটা-ছাঁটার পক্ষপাতী ছিলেন। যোগেশ বাবু কোন স্থানেই অনুবাদে সম্মত নহেন; অক্ষরান্তরিত করিবার সময়ে অধিক কাটা-ছাঁটারও পক্ষপাতী নহেন। অন্ততঃ তাঁহার রসায়ন-গ্রন্থ দেখিলে সেইরূপই বোধ হয়।

বিজ্ঞান-শাস্ত্র মাত্রেরই দুইটা অঙ্গ আছে। একটা অঙ্গ পণ্ডিতদিগের জন্য অর্থাৎ খাঁটি বৈজ্ঞানিকের জন্য, সে অংশে ইতর সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই; অনধিকারীর পক্ষে সেখানে প্রবেশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। বিজ্ঞানের অপর অঙ্গ সাধারণের জন্য। কতকটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকিলে মানুষের জীবনযাত্রাই আজকাল অচল হইয়া পড়ে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা, সকল শাস্ত্রেরই মধ্যে খানিকটা অংশ আছে, যাহা সকলের পক্ষেই জ্ঞাতব্য; সেইটুকু না জানিলে কেবল যে মূর্খ বলিয়া সমাজে পরিচিত হইতে হয়, তাহা নহে, সেটুকুর জ্ঞান জীবনরক্ষা ও সংসারযাত্রার জন্যও নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ লোককে বিজ্ঞানের এই ভাগের সহিত পরিচিত করা লোকশিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য। সাধারণের সহিত বিজ্ঞানের এই ভাগের পরিচয় করাইতে হইলে বিজ্ঞানের ভাষাকেও সাধারণের বোধগম্য করিতে হইবে। উৎকট পারিভাষিক-শব্দ-ভীষণ ভাষা পণ্ডিতদের জন্য। সাধারণকে বিজ্ঞান শিখাইতে হইলে পারিভাষিকত্ব যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া, ভাষাকেও সুশ্রাব্য ও মোলায়েম না করিলে চলিবে না। তথাপি বিজ্ঞান যখন বিজ্ঞান, তখন উহার পারিভাষিকত্ব কতকটা থাকিবেই। সেই পারিভাষিকতা যদি আবার শ্রুতিকঠোর দুরুচ্চার্য্য বৈদেশিক ভাষা আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে সাধারণের পক্ষে বিজ্ঞানশিক্ষার কোন আশাই থাকিবে না। প্রায় আশী বৎসর হইল, বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম রসায়ন-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু আজিও বাঙ্গালীর নিকট রসায়ন-শাস্ত্র একবারে অপরিচিত; ইহার অন্যতম কারণ এই যে, যে-ভাষায় রসায়নের গ্রন্থ লিখিত হয়, তাহা বাঙ্গালীর ভাষা নহে; কোন কালে তাহা বাঙ্গালীর ভাষা হইবে না। যাঁহারা আশা করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন যে, বাঙ্গালী জনসাধারণ এক কালে ইংরেজীতে পণ্ডিত হইয়া উঠিবে, তখন আর বাঙ্গালা ভাষায় কোন বৈজ্ঞানিক সাহিত্য প্রণয়নের আবশ্যকতা থাকিবে না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমার সে আশা নাই। বাঙ্গালার জনসাধারণ মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরেজী ধরুক, সে আকাঙ্ক্ষা আমার মনে প্রবেশ করিতেও

পারে না। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজীর স্থানে বাঙ্গালা আসিয়া বসিবে, আমি বরং সেই দিনের আশা রাখি। এই হতভাগ্য দেশে সে দিন শীঘ্র আসিবে না ; কিন্তু আমাদের চেষ্টার অভাবে যদি সে দিন না আসে, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষায় ধিক্ !

যোগেশ বাবু তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "যিনি কেবল সংস্কৃত ভাষাকেই বাঙ্গলা ভাষা করিতে বলেন, তিনি অজ্ঞাতসারে বাঙ্গলা ভাষাকে মৃত ভাষায় পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন।" আমি বাঙ্গালা ভাষাকে মৃত ভাষা করিতে চাই না ; সংস্কৃতকে অকারণে বর্জ্জন করিতেও আমি প্রস্তুত নহি। সংস্কৃতে অনুবাদ যেখানে অসাধ্য, সেখানেই সংস্কৃতের আশ্রয় লইতে আমার আপত্তি। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার একটা ধাতু আছে ; একটা genius আছে ; তাহার সহিত না মিশিলে কোন শব্দ চলিবে না। প্রাচীন আচার্য্যেরা গ্রীকগণের নিকট রাশিচক্রের বিষয় শিখিয়াছিলেন। দ্বাদশ রাশির নামের জন্য ক্রিয় তাবুরি প্রভৃতি এক সেট্ গ্রীক শব্দ গৃহীত হইয়াছিল ; কিন্তু সে নামগুলি চলে নাই। Kriosকে ছাঁটিয়া ক্রিয়, Taurosকে ছাঁটিয়া তাবুরি, Aphroditeকে মোলায়েম্ করিয়া আস্ফুজিৎ করা হইয়াছিল ; নতুবা সংস্কৃত ভাষার বিশিষ্ট ধাতুর সহিত ঐ সকল শব্দের সঙ্গতি একেবারেই ঘটিত না। এই সঙ্গতির জন্য ইংরেজেরা সিপাহী শব্দকে সেপাই করিয়া লইয়াছেন ; আমরা schoolকে ইস্কুল, screwকে ইস্ক্রুপ, tableকে টেবিল করিয়া লইয়াছি। এইরূপ কাটা-ছাঁটা না করিলে ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা হয় না ; বিদেশী শব্দ বিদেশী থাকিয়া যায় ; স্বদেশীর সহিত মিশিতে পারে না।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। মাক্ সাহেবের গ্রন্থে ব্যবহৃত কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সাহিত্য-পরিষদের পরিভাষা-সমিতির ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ-প্রণেতাদের প্রয়োজনে আসিতে পারে ; তা ছাড়া অনেকগুলি শব্দ যথেষ্ট কৌতুক উৎপাদন করিবে। এই উদ্দেশ্যে তাহাদের একটি তালিকা সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

chemistry	কিমিয়া-বিদ্যা
optics	দৃষ্টি-বিদ্যা
heat	তাপক
temperature	তাপ

light	আলোক
electricity	বিদ্যুতীয় সাধন
magnetism	চুম্বকীয় গুণ
element	মূল বস্তু
compound	সঞ্চয় বস্তু
combination	লয়
combining weight	লয়যোগ্য ভাগ
equivalent	তুল্য ভাগ
atom	পরমাণু
atomic weight	পরমাণু সম্পর্কীয় ভার
law	ব্যবস্থা
analysis	ব্যস্তকরণ
synthesis	সমস্তকরণ
force	প্রভাব
attraction	আকর্ষণ
cohesion	সংলাগাকর্ষণ
gravity	গুরুত্বাকর্ষণ
mass	রাশি, বস্তু
volume	অবয়ব, রূপ, পরিসর
solid	কঠিন
liquid	দ্রব
gas	আকাশ
gaseous	আকাশীয়
vapour	বাষ্প
common air	সামান্য আকাশ
standard	পরিমাপক
specific gravity	স্বাভাবিক গুরুত্ব
solution	গলন
crystal	স্ফটিক
water of crystallisation	স্ফটিক জল
deliquescent	গলনশীল
property	গুণ
decomposition	বিভাগ

density	নিবিড়ত্ব
pressure	চাপন
barometer	বারোমেতর
thermometer	তেরেমোমেতর
surface	মুখ
tetrahedron	ঘনাষ্টমুখ
experiment	পরীক্ষা
saturation	প্রচুরতা
proportion	ভাগ
denominator	হারক
movement	সংলড়ন
expansion	বৃদ্ধি
melting	দ্রবত্ব
evaporation	বাষ্পীভাব
ignition	অগ্নিভাব
freezing point	জমাট অংশ
boiling point	স্ফোটন অংশ
contraction	সঙ্কোচন
melting ice	গলনীয় বরফ
freezing water	জমনীয় জল
elasticity	স্থিতিস্থাপনীয় শক্তি
combustion	দহন
supporter of combustion	দহনপোষক
radiation	কিরণত্ব
source	আকর
sea-level	সমুদ্রজলতুল্য উচ্চস্থান
conductor	তাপসঞ্চারক
metal	ধাতু
equator	রেখাভূমি
pole	কেন্দ্র
lens	মৃদঙ্গাকৃতি বস্তু
specific heat	স্বাভাবিক তাপক
heat capacity	তাপকধারণ-শক্তি

latent heat	অব্যক্ত তাপক
sensible head	ব্যক্ত তাপক
condensation	ঘনসার সম্পাদন
pump	বোমা
air pump	আকাশ বোমা
pure	নির্ভাঁজ
alloy	কুধাতু
salt	লবণ
acid	অম্ল
alkali	ক্ষার
retort	রিটোর্ট
friction	ঘর্ষণ
reflection	পরাবর্ত্তন
orange	নারাঙ্গী
indigo	বাগুনীয়া
violet	বিওলা
solar spectrum	সৌরব্যস্তবর্ণ
positive	স্বভাবরূপ
negative	অভাবরূপ
positive pole	স্বভাবি পার্শ্ব
negative pole	অভাবি পার্শ্ব
cell	কেটুয়া
battery	মুর্চ্চা
conductor	সঞ্চারক
non-conductor	অসঞ্চারক
insulated	অলগ্ন
electric machine	বিদ্যুতের কল
leyden-jar	লেইডেন পাত্র
spark	স্ফুলিঙ্গ
quantity	যতিতা
intensity or tension	তেজ
dispersion	ভিন্নীকরণ
amber	কহরুবা

electrometer	বিদ্যুন্মাপক যন্ত্র
voltaic pile	বল্‌তার স্তম্ভ
steam engine	বাষ্পীয় কল
boiler	হাঁড়ি
cylinder	চুঙ্গি
beam	আড়া
furnace	অগ্নিকুণ্ড
safety valve	রক্ষক কপাট
tank	কুণ্ড
piston	পালিস
condenser	জমায়ন পাত্র
handle	হাতোল
lever	তরাজু
fulcrum	থাল
fly-wheel	মহাচক্র
electro-negative substance	বিদ্যুৎ-সম্পর্কীয় অভাবরূপ
electro-positive substance	বিদ্যুৎ-সম্পর্কীয় স্বভাবরূপ
organic	সেন্দ্রিয়
strong acid	শক্ত অম্ল
dilute acid	দুর্ব্বল অম্ল
ash	ভস্ম
volatile	উড্ডীয়মান
neutralise	পরিতৃপ্ত করা
bleaching	শুক্লকরণ

সমাপ্ত

বিচিত্র জগৎ

[১৯২০ সনের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত]

বিজ্ঞান-বিদ্যায় বাহ্য জগৎ

Bain সাহেবের *Mental and Moral Science* এক কালে বি. এ.-পরীক্ষার্থী 'A' Courseএর ছেলেদের পড়িতে হইত। ঐ পুস্তকে 'Perception of Material World' অধ্যায়ে কতকগুলি কথা আছে, বহু দিন আগে তাহা পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি নাই। সেই কথাগুলি লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিতে চাই। আমি যে ভাবে আলোচনা করিব, সে ভাবে আর কেহ আলোচনা করিয়াছেন কি না, তাহা আমি জানি না; দার্শনিক-সাহিত্যে আমার বিদ্যার দৌড় যতটুকু, তাহাতে আমি বলিতে পারিব না যে, অন্য কেহ এরূপ আলোচনা করেন নাই। যদি কেহ আমার সমর্থন করিয়া থাকেন বা করেন, তাহাতে আমার আনন্দই হইবে

Bain সাহেব বলিতেছেন,—"In regard to the Object-properties, all minds are affected alike in regard to the Subject-properties, there is no constant agreement." এখানে—'Object-properties' বলিতে মোটামুটি সেই 'sensation' বা অনুভূতিগুলি বোঝায়, যেগুলি বাহির হইতে আসিতেছে, এইরূপ আমরা মনে করি; দেশী ভাষায় এগুলিকে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ বলা হয়। আরও বলা হয় যে, এগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া বাহির হইতে ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করে। এইগুলিকে অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের 'Objective World' বা 'External Material World' গড়িয়া লই। বাঙ্গালায় উহাকেই 'বাহ্য জগৎ' বা 'জড় জগৎ' বলিব। এইগুলি ছাড়িয়া আরও অসংখ্য 'feeling' বা বেদনা লইয়া কারবার করিতে হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলিকে 'organic sensations' বলা হয়, এবং কতকগুলিকে 'appetites and emotions' পর্য্যায়েও ফেলা চলিতে পারে। মাথাধরা, দাঁত-কামড়ানির বেদনা হইতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং রাগ-দুঃখ, শোক-তাপ পর্য্যন্ত সমস্তই এই শ্রেণীতে পড়ে। এইগুলাকেই 'Subject-properties' বলা হইয়াছে। এগুলা যেন বাহির হইতে আসে না; এগুলা যে-জগতের অন্তর্গত, তাহা বাহিরের 'Material World' নহে; কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বার

দিয়া ইহাদের আসিবার যেন দরকার নাই। দেশী পণ্ডিতেরা ইহাদের জন্যও একটা অন্তরিন্দ্রিয় কল্পনা করিয়াছেন ; সেই অন্তরিন্দ্রিয়ের নাম **মন**। একটু তলাইয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, External বা Objective জগৎ এবং ভিতরের Subjective জগৎ, এই দুই জগৎই অন্তরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। চোখ-কান প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়গুলি Objective বা বাহিরের জগতের খবর মনের নিকট আনিয়া উপস্থিত করে এবং মন তাহা গ্রহণ করে ; আর ভিতরের Subjective Worldএর খবর, কোন বহিরিন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া, একেবারে মনের নিকট উপস্থিত হয়, এবং মন তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কোন্‌গুলা বাহির হইতে আসে এবং কোন্‌গুলা ভিতরের জিনিস, তাহা সকল সময়ে আমরা নির্ণয় করিতে পারি না, অথচ দুই শ্রেণীর মধ্যে একটা সীমারেখা না টানিতে পারিলে কোন্‌টা Objectএর সামিল, আর কোন্‌টা Subjectএর সামিল, তাহা পৃথক্ করা চলে না। Bain সাহেব বলিতেছেন, যেগুলি Object-properties, সেগুলিকে সকলেই সমান ভাবে দেখে ; আর যেগুলি Subject-properties, সেগুলিকে সকলে সমানভাবে দেখে না—এক-এক জনে এক-এক রকমে দেখে। সম্মুখে সাপ বা বাঘ আসিলে ঘরসুদ্ধ সকল লোকেই একই জিনিস দেখিতে পাইয়া ব্যতিব্যস্ত হয় ; কিন্তু এক জনের যখন মাথা ধরে, অন্যের তখন মাথা ধরে না—এমন কি, তাহার মাথাধরা বেদনাটা সত্য কি না, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করাও অন্যের পক্ষে সম্ভব হয় না। আমার দাঁতের বেদনার আমিই এক মাত্র সাক্ষী ; এ বিষয়ে আমার সাক্ষ্যে সংশয় করিবার অধিকার অন্যের আদৌ নাই। অতএব Bain সাহেবের ভাষা একটু ঘুরাইয়া বলিতে পারা যায়—আমি, তুমি, শ্যাম, রাম—আমরা সকলে যাহা একসঙ্গে একভাবে দেখি, যাহার অস্তিত্ব বিষয়ে সকলে মিলিয়া সাক্ষ্য দিই, সেই জিনিসটাই Objective World ; ইহারই নামান্তর External World, Material World প্রভৃতি। এই বাহিরের জগৎটা সর্ব্বসাধারণের কোন এক জনের নিজস্ব নহে। সকলের সহিত ইহার সমান সম্পর্ক। সকলেই ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, ইহা-কর্তৃক অভিভূত হইতেছে, এবং ইহার প্রতি প্রভুত্ব চালাইয়া ইহাকে আপন-আপন কাজে লাগাইবার চেষ্টায় রহিয়াছে। এই সর্ব্বসাধারণের বাহ্য জগৎকে অবলম্বন করিয়াই আমরা জীবনযাত্রা চালাইতেছি। কিন্তু এই বাহ্য জগৎকে ছাড়াইয়া—ইহার

অতিরিক্ত আর একটা জগৎ আছে, যেটা আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব। সেটাকে যদি অন্তর্জগৎ বলি, সেই অন্তর্জগৎ প্রত্যেকের পক্ষে ভিন্নরূপ। বেইন সাহেবের ভাষায় সেই অন্তর্জগতে মানুষে মানুষে constant agreement নাই। একের অন্তর্জগতে অপরের কোন অধিকার নাই; একের সহিত অন্যের সম্পর্কও বিশেষ কিছু নাই। আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রাগ-দ্বেষের সহিত তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রাগ-দ্বেষের কোন সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে; এমন কি, আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রাগ-দ্বেষ কোন কালে কোন উপায়ে তোমার প্রত্যক্ষ বিষয় পর্য্যন্ত হইতে পারে না। আমার মনে শোক উপস্থিত হইলে, সেই শোকের বেদনাটা আমার যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তোমার সেরূপ প্রত্যক্ষ হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। তুমি যাহা দেখিতে পাও, সে আমার নাক-মুখ-চোখের অবস্থা, আমার চোখের জল, আমার মুখের বিকার; তাহা তুমিও দেখ, আর সকলেও দেখে; অতএব সেই চোখের জল ও মুখের বিকার সর্ব্বজনের সাধারণ Object Worldএর অন্তর্গত। কিন্তু সেই শোকের বেদনাটুকু কেবল আমারই গ্রাহ্য এবং আমারই প্রত্যক্ষ; তোমার বা অন্যের তাহা বুঝিবার কোন উপায়ই নাই। এ-কালে thought-readingএর কথা শুনিতে পাওয়া যায়,—কাহারও না কি এরূপ ক্ষমতা আছে যে, অন্যের মনের ভিতরে যাহা যাতায়াত করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারেন। কিন্তু যত ক্ষণ পর্য্যন্ত এই thought-reading কিরূপে ও কি উপায়ে ঘটিয়া থাকে, তাহা বৈজ্ঞানিক রীতি-ক্রমে নির্ণীত না হইতেছে, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে না যে অপরের মনের রূপহীন ভাবগুলাই কোনও রূপে thought-readerএর প্রত্যক্ষ হয়; অথবা সেই ব্যক্তির আকার-ইঙ্গিত মুখভঙ্গি দেখিয়া, কোনরূপ law of association আশ্রয় করিয়া, সেই ভাবগুলা জানিতে পারা যায়। ফলে, একের অন্তর্জগৎ, কোন-না-কোনরূপে হয়ত অপরের অনুমানগম্য হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে না। বিজ্ঞান-বিদ্যার বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার অধিক বলা চলিবে না।

Bain সাহেবের ঐ উক্তি অবলম্বন করিয়া আমরা External Objective Material Worldএর একটা সংজ্ঞা বা definition খাড়া করিতে পারি। প্রত্যক্ষগোচর অনুভবরাশির মধ্যে যাহা সর্ব্বজনসাধারণ, তাহাই একত্র করিয়া এই বাহ্য জগৎ। এ-কালে যাহাকে Physical

Science বলে, এই বাহ্য জগৎ তাহারই আলোচনার বিষয়। এই বাহ্য জগৎটাকে postulate করিয়া লইয়া Physical Science তাহার কাজ আরম্ভ করে। দার্শনিকেরা এই বাহ্য জগতের তথ্য লইয়া যাহা কিছু বলুনই না, Physical Scienceএর তাহাতে কান দিবার কোন দরকারই নাই। বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া না লইলে, Physical Scienceএর কোন কাজই থাকে না। আমি কেবল Physical Science-এর কথাই বলিতেছি—Mental বা Moral Science, Biological বা Sociological Scienceএর কথা বলিতেছি না। Scienceএর একটা সুনির্দ্দিষ্ট method আছে; যে-কোন বিষয়ে সেই method আশ্রয় করিয়া আলোচনা করা যায়, তাহাকেই আজকাল Science বলা হইয়া থাকে। ভাষাতত্ত্ব বা ইতিহাসতত্ত্ব পর্য্যন্ত আজকাল Scienceএর মধ্যে পড়িয়াছে। আমি সে সকল Scienceএর কথা আনিতেছি না; আমি অতি বিশিষ্ট সঙ্কীর্ণ অর্থে Physical Science নামটা গ্রহণ করিব—এমন কি, Physiology বা Chemistryরও সমস্তটা এই সঙ্কীর্ণ অর্থে Physical Scienceএর ভিতর পড়িবে না। এই Physical Scienceকেই বাঙ্গালায় আমি বিজ্ঞান-বিদ্যা বলিব। সে যাক,—এই Physical Scienceএর আলোচ্য যে বাহ্য জগৎ, তাহা জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বিষয়। প্রত্যেক মনুষ্যের যেটুকু নিজস্ব, যাহা অন্যের প্রত্যক্ষ-বহির্ভূত, তাহা এই বাহ্য জগতের অন্তর্গত নহে। এই definition বা সংজ্ঞা ধরিয়া লইলে আপাততঃ অগ্রসর হওয়া চলিতে পারে। কোন্‌টুকু Physical Scienceএর আলোচ্য হইবে এবং কোন্‌টুকু হইবে না, তাহার মোটামুটি নির্দ্ধারণ চলিতে পারে। গোটাকতক দৃষ্টান্ত লইলে কথাটা বুঝাইবার সুবিধা হইবে।

গোড়াতেই বলিয়াছি, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ আমরা এই বাহ্য জগৎ হইতে পাই; কিন্তু রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ পাইলেই তাহা সর্ব্বজনসম্মত বাহ্য জগৎ হইবে না। স্বপ্নে আমরা রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ লইয়াই খেলা করি। যত ক্ষণ স্বপ্ন দেখি, তত ক্ষণ সেই রূপ-রস-শব্দাদি আমার বাহিরে অবস্থিত জগৎ হইতেই আসিতেছে, এ বিষয়ে আমার সংশয় মাত্রও থাকে না; কিন্তু সেই স্বপ্নদৃষ্ট বাহ্য জগৎ স্বপ্নকালে আমাকে যতই অভিভূত করুক না কেন, ইহা কেবল আমারই প্রত্যক্ষ হয় এবং আমাকেই অভিভূত করে, অন্যের প্রত্যক্ষ হয় না বা অন্যকে অভিভূত করে না; তাহা স্বপ্ন

ভাঙ্গিলেই আমরা অপরের সাক্ষ্য লইয়া জানিতে পারি, এবং তখন উহাকে আমার স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিই। অথচ স্বপ্নকালে উহার মত সত্য পদার্থ আমার নিকট কিছুই ছিল না, স্বপ্নভঙ্গে অন্যের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তখন উহার মিথ্যার্থ আমি মানিয়া লই। এই স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ, Physical Scienceএর আলোচ্য বাহ্য জগৎ নহে; কেন না, উহা নিজস্ব মাত্র, সর্ব্বসাধারণের নহে। এইরূপে আফিমের নেশায় বা গাঁজার দমে যে-জগতের সহিত কারবার করা যায়, সেই নেশাখোরের জগৎও রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় হইলেও, সর্ব্বতোভাবে সেই নেশাখোরের নিজস্ব জগৎ—অন্যের ইহাতে কোন ভাগ বা অধিকার নাই; কাজেই, Physical Science সেইরূপ জগৎকে আমল দেন না। ঐরূপ, যে ব্যক্তি কোন রোগের ধাক্কায় অপ্রকৃতিস্থ অথবা স্বভাবতঃ যাহারা অপ্রকৃতিস্থ বা পাগল, বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের সাক্ষ্য বাতিল ও না-মঞ্জুর। যাঁহারা কোন emotionএর বা ভাবের মাত্রাধিক্যে ক্ষণেকের জন্য অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সাক্ষ্যও এই কারণে অগ্রাহ্য। সে দিন কোন মাসিক-পত্রে দেখিলাম, ব্রাহ্মসমাজের কোন উৎসব উপলক্ষে ভাবুক ভক্তগণের মধ্যে অত্যন্ত মাতামাতি হইয়াছিল। অনেকেই দেখিয়াছিলেন, ঘরের মধ্যে যেন একটা আলো ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। অনেকেই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু অনেকেই আবার দেখেন নাই; অতএব বৈজ্ঞানিক সেই ভাবমুগ্ধ অনেকের কথা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন না। আমরাও বাল্যকালে সন্ধিপূজার সময় দেখিতাম, অথবা দেখিতেছি বলিয়া মনে করিতাম, প্রতিমার মধ্য হইতে 'মা' যেন আমাদের দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন, আর সিংহের চক্ষু দুটা ঘুরিতেছে। এখন সে ভক্তিও নাই, মাও এখন আর হাসেন না, সিংহও আর এখন চোখ ঘুরায় না। কোন পল্লীগ্রামের গৃহস্থ-বাড়ীর বালগোপাল বিগ্রহ-মূর্ত্তির সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। ব্রাহ্মণ গৃহস্থ একদিন বাড়ী ছাড়িয়া দূরে গিয়াছিলেন। তাঁহার সদ্য উপনীত বালক পুত্রের উপর নারায়ণের সেবার—পায়সান্ন ভোগ দেওয়ার ভার দিয়া গিয়াছিলেন। বালক যথারীতি ভোগ নিবেদন করিয়া, বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু নারায়ণ খাইতে আসিলেন না। তাহার মনে ভয় হইল, তাহার কোন ত্রুটি হইয়াছে, অথবা তাহাকে বালক দেখিয়া অগ্রাহ্য করিয়া ঠাকুর বাহির হইলেন না। অনেক কান্নাকাটি সাধ্য-সাধনাতেও তাঁহার

আবির্ভাব হইল না দেখিয়া নিরুপায় বালক অবশেষে লাঠি বাহির করিল। তখন নারায়ণ-শিলার মধ্য হইতে বালগোপাল হামাগুড়ি দিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইলেন;—মাথায় তাঁহার ময়ূরপুচ্ছ, হাতে সোনার বাজু, নূপুরের ধ্বনিতে ঘর মুখরিত হইয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে পায়স খাইয়া তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন। আর, সেই শালগ্রামশিলা তদবধি বালগোপাল বিগ্রহে রূপান্তরিত হইল। ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরিয়া অবাক্ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিলেও, কোন বৈজ্ঞানিকের কঠিন হৃদয় ইহাতে ভিজিবে না।

আলো-আঁধারিতে দড়িগাছটা সাপের মত দেখায়, হয়ত রীতিমত ফণা তুলিয়া ছোঁ দেয়। বৈজ্ঞানিক এখানে বলিবেন—রজ্জুতেই সর্পভ্রম, আকস্মিক আতঙ্কের ফল; যাহার তেমন আতঙ্ক হয় না, সে দড়িকে দড়িই দেখে। ইহা judgmentএর ভুল, দর্শনের ভাষায় ইহার নাম **অধ্যাস**। মরুভূমির মরীচিকা, অথবা অন্তরীক্ষে লম্বিত গন্ধর্ব্বনগর—এও কতকটা এই শ্রেণীর;—atmospheric refractionএর ফলে, একই সময়ে বহু লোকেরই এইরূপ ভ্রান্তি ঘটিতে পারে। যাহা গাছপালার প্রতিবিম্বরূপে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা এক হিসাবে সত্য হইলেও জলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত মনে আসে, তাহা ভুল;—স্থান-পরিবর্ত্তনে এই ভুল ধরা পড়ে। মরুভূমিতে মনে হয়, ঐখানে জল আছে; কিন্তু নিকটে গেলে দেখা যায়, জল নাই;—নিতান্তই যে ব্যক্তি মৃগ নহে, সে বুঝিতে পারে, আমার ভুল হইয়াছিল। কাজেই এই ভুল স্থানভেদে কতক লোকের ঘটে, কতক লোকের ঘটে না। মরীচিকা এক জায়গার লোকে দেখিতে পাইলেও অন্য জায়গার লোকে দেখিতে পায় না। আর, সকলে একবাক্যে যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় না, বৈজ্ঞানিক তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া দরকার নাই। সকল লোকে একমত হইয়া যাহাতে সাক্ষ্য দেয়, বৈজ্ঞানিক তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তিনি যাহাকে বাহ্য জগৎ বলিবেন, তাহা সকলেই সমান ভাবে দেখিবে—অন্ততঃ সমস্ত প্রকৃতিস্থ লোকে সমান ভাবে দেখিবে। অধিকাংশ লোকে যাহা দেখে, তিনি তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন; দু-দশ জনে যদি না দেখিতে পায়, বা অন্যরূপ দেখে, তাহারা কোন-না-কোন হেতুতে অপ্রকৃতিস্থ

—ইহাই তিনি ধরিয়া লন। প্রাকৃতিক ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয়ের অন্য কোন উপায় বৈজ্ঞানিকের নাই। অধিকাংশ লোকে যাহা সত্য বলিয়া মানিবে, তিনি তাহাই সত্য বলিতে বাধ্য, এবং তাহাই লইয়া তাঁহার আলোচনা ও কারবার। দু-দশ জন লোক মাত্র যাহার সাক্ষ্য দেয়, তাহারা খুব মাতব্বর সাক্ষী হইলেও তাহাদের কথা গ্রহণে তিনি বাধ্য নহেন। ব্যক্তিবিশেষের প্রত্যক্ষের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের কোন সম্পর্ক নাই—অন্ততঃ আর সকলে সেটাকে যত ক্ষণ প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার না করে। যত ভূতের গল্প বা apparitionএর গল্প আছে, তাহা মানিয়া লইতে, বা তাহার আলোচনা করিতে বৈজ্ঞানিক বাধ্য নহেন। যিনি ভূত দেখেন তিনি নিজের প্রত্যক্ষে নির্ভর করিয়া তাহাতে আস্থা করেন, অন্যে সংশয় করিলে চটিয়া উঠেন; কিন্তু চটিবার দরকার নাই। তাঁহার ভূত, তাঁহার কাছে যতই সত্য হউক, ইতরসাধারণের কাছে যত ক্ষণ সেইরূপ সত্য না হইবে, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত Physical Science সে ভূতের কোন তোয়াক্কা রাখিবেন না। Psychical Science বা অন্য Science তাহা লইয়া আলোচনা করিতে পারেন; কিন্তু Physical Science তাহাকে একেবারে আমল দিবেন না। আবার সর্ব্বসাধারণে আসিয়া যদি সেই ভূত একভাবে দেখিতে পায়, এবং একবাক্যে তাহার সাক্ষ্য দেয়, তখন Physical Scienceও তাহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন। তখন মানিতে না চাহিলে তাঁহার বৈজ্ঞানিকতায় দোষ স্পর্শিবে। তবে মজা এই, তখন সেই সর্ব্বজনস্বীকৃত ভূতের অদ্ভুতত্ব কিছু থাকিবে না। তখন ঝড়-বৃষ্টি-উল্কাপাতের মত সর্ব্বজনসম্মত প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যেই তাহার স্থান হইবে; এবং বৈজ্ঞানিকও তখন কোথাকার আলো কোন্ পথে আসিয়া এই apparitionএর সৃষ্টি করিয়াছে, গম্ভীরভাবে তাহার আলোচনা করিবেন। হয়ত সেই apparitionটা অত্যন্ত আজগুবি ধরণের, তেমন দৃশ্য ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই; কিন্তু তাহাতে কিছুই যায়-আসে না, সর্ব্বজনমান্য হইলে উহা বৈজ্ঞানিকেরও মান্য হইবে। আর যত ক্ষণে সর্ব্বজনে দেখিতে না পাইবে, বা সর্ব্বজনকে দেখাইতে না পারা যাইবে, তত ক্ষণ কোন মাতব্বর সাক্ষীর কথাই গৃহীত হইবে না,—হউন না কেন তিনি Sir William Crookes, বা Sir Alfred Wallace। অতি-বড় বৈজ্ঞানিক, আপনার প্রত্যক্ষ বিষয়ে নিঃসংশয় হইলেও অন্যকে মানাইবার অধিকারী

হইবেন না। Crookes কিংবা Wallaceএর মত লোকের বৈজ্ঞানিকতায়, অথবা বৈজ্ঞানিকোচিত সতর্কতায় কেহ সন্দেহ মাত্র করেন না। তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সে প্রত্যক্ষেও সন্দেহ করিবার সম্যক্ হেতু নাই। তাঁহারা মিথ্যা বলিতেছেন, এরূপ মনে আনাই পাপ। তাঁহারা ঠকিয়াছেন, এতটুকু বলাও হয়ত ধৃষ্টতা। তথাপি, যত ক্ষণ তাঁহারা Royal Institutionএর ঘরে দাঁড়াইয়া সাধারণের প্রত্যক্ষ করাইতে না পারিবেন, তত ক্ষণ তাঁহাদের প্রত্যক্ষ Physical Scienceএর আলোচনার বিষয় হইবে না।

Huxley পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—বৈজ্ঞানিক কেবল evidence চায়। এই evidence কথাটার তাৎপর্য্য মনে রাখিলে, miracle সম্বন্ধে অধিকাংশ গণ্ডগোল অনাবশ্যক হইয়া যায়। কোন ঘটনা যতই আজগুবি হোক না, তাহাতে বৈজ্ঞানিকের কিছুই যায়-আসে না। নিত্য-নূতন আজগুবি ঘটনার আবিষ্কারই বড় বড় বৈজ্ঞানিকের ব্যবসায়। আজকাল Radioactivity সম্বন্ধে যে সকল আজগুবি ঘটনা বাহির হইয়াছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহার সম্ভাবনাই কাহারও মাথায় আসে নাই। কোন পণ্ডিত উহা 'প্রত্যক্ষ করিয়াছি' বলিলেও অন্য পণ্ডিতে হাসিয়া উড়াইতেন; হয়ত কেহ বা উহা অসম্ভব বলিয়াই উড়াইতেন। কিন্তু দশ বৎসর আগে যাহা অসম্ভব ছিল, আজ তাহা সম্ভব হইয়াছে;—কেবল বিজ্ঞান-ব্যবসায়ীর আবিষ্কৃত বলিয়া সম্ভব হয় নাই, ইতরসাধারণের প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে বলিয়া সম্ভব হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা নিজে দেখিয়াছেন, এবং রাস্তার লোককে ডাকিয়া দেখাইয়াছেন। যে সকল পণ্ডিত সাবেক theoryর দোহাই দিয়া অসম্ভব বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই theoryগুলাই লণ্ডভণ্ড হইয়াছে; নূতন theoryর জন্য তাঁহারা মাথা চুলকাইতেছেন। সর্ব্বসাধারণে কোন theoryর ধার ধারে না। তাহারা উহার সত্যতা মানিয়া লইয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা ব্যবসাদার, তাহারা এই আবিষ্কারগুলিকে কাজে লাগাইয়া দু-পয়সা ঘরে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কোন ঘটনা অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অসম্ভাব্য,—এ সকল অজুহাত বিজ্ঞান-বিদ্যায় আদৌ চলিবে না। Physical Science চায় কেবল evidence; এবং এই evidence জনসাধারণের মান্য এবং স্বীকার্য্য হওয়া চাই। অধিকাংশ miracleএর পক্ষে এইরূপ evidence পাওয়া যায় না বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা Physical Scienceএর মধ্যে তাহার আলোচনা করিতে চাহেন না—যে কয় জন

সেই-সেই ঘটনায় বিশ্বাস করেন তাঁহাদের সহিত ঝগড়ায়ও সময়ক্ষেপ করিতে চাহেন না। সাধারণে যত ক্ষণ বিশ্বাস না করিবে, তত ক্ষণ তাহা Physical Scienceএর আলোচ্য হইবে না—এইটুকু বলিয়াই তাঁহারা নিরস্ত। এইখানে কথা উঠিতে পারে, এক কালে সর্ব্বসাধারণে যে সকল miracleএ বিশ্বাস করিত, এ-কালের Physical Science তাহা মানিয়া লইবে কি না? ইহারও উত্তর সোজা উত্তর, কোনরূপ প্যাঁচ খেলাইবার দরকার নাই ;—সে-কালের লোকে যাহা মানিত, সে-কালের Physical Scienceও তাহার আলোচনা করিত : এ-কালের সকলে যখন তাহা মানিতে চায় না, অথবা এ-কালে সকলের সম্মুখে তাহার আবিষ্কার করিয়া সকলকে জানাইবার যখন কোন উপায় নাই, তখন এ-কালের Physical Science তাহার আলোচনা করিবে না। এ-কালের evidence যত ক্ষণ তৃপ্ত না হয়, তত ক্ষণ তৎসম্বন্ধে আলোচনায় কোন লাভ নাই। যত ক্ষণ এ-কালের মত evidence না মিলিবে, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত আলোচনা স্থগিত থাকুক।

বিজ্ঞান প্রত্যক্ষবাদী, ইহা সকলেই জানেন। অনুমান ও শব্দ—এই দুই প্রমাণেরও সর্ব্বদা আশ্রয় লইতে হয় বটে, কিন্তু সেই অনুমান ও শব্দেরও ভিত্তি প্রত্যক্ষে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহাদের প্রামাণিকতা। যাহা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার সহিত constant association পূর্ব্ব হইতে জানা ছিল বলিয়া, তাহারই সাহায্যে, যাহা প্রত্যক্ষ নহে, তাহার অনুমান করা যায়। যেমন ন্যায়শাস্ত্রের—ধূম হইতে অগ্নির অনুমান। ধূমের সহিত অগ্নির সাহচর্য্য পূর্ব্বে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই, আজিও ধূম দেখিলে তাহার সহচর অগ্নির অনুমান করি। এইরূপ অনুমানে মাঝে মাঝে ঠকিতে হয়, যেমন মরীচিকায় দূরের গাছপালার প্রতিবিম্ব দেখিয়া জলের অনুমান করিয়া ঠকিতে হয়। এখানে ভুল প্রত্যক্ষের নহে—ভুল প্রত্যক্ষ হইতে inferenceএর বা judgmentএর। শব্দপ্রমাণে অপরের প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া কাজ চালাইতে হয় ;—কোথাও বা ঠকিতে হয়, কোথাও বা হয় না। নিজের প্রত্যক্ষও যে ঠকায় না, এমন নহে ; ইন্দ্রিয়কে ত বিশ্বাস করিবার জো-ই নাই ; অন্তরিন্দ্রিয় যে মন, সেও সকল সময় প্রকৃতিস্থ থাকে না। সেই জন্য নানারূপ যন্ত্রতন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রিয়ের দোষ সামলাইতে হয়। পাঁচ বার পাঁচটা point of view হইতে দেখিতে হয়। অবশেষে, আর পাঁচ জনকে ডাকিয়া

বলিতে হয়—দেখ, ঠিক হইতেছে কি না। সকলেই যদি বলে, হাঁ, ঠিক দেখিতেছি, তখনই উহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। ফল কথা, শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষই এক মাত্র প্রমাণ। উপমান, বা analogy' বলিয়া যে আর একটা প্রমাণ শোনা যায়, সেটা প্রমাণের মধ্যেই নয়; সেটা কেবল পথ দেখায় মাত্র। এই analogyর সাহায্যে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক অসাধ্য-সাধন করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শিত পথে চলিয়া অনেক নূতন তথ্যের সাক্ষাৎকার পাইয়াছেন। কিন্তু, সেই প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত, analogy কেবল পথপ্রদর্শকেরই কাজ করে,—বড়-জোর আঁধারে আলো দেয়। জল স্বভাবতঃ উঁচু হইতে নীচে, higher level হইতে lower levelএ যায়। সেইরূপ উত্তাপ গরম হইতে ঠাণ্ডায়, higher temperature হইতে lower temperatureএ যায়; এই analogy ধরিয়া Fourier উত্তাপের গতায়াত সম্বন্ধে এক নূতন Science পত্তন করিয়াছিলেন। Electricity ঐরূপ higher potential হইতে lower potentialএ যায় বলিয়া তাড়িত-প্রবাহের গতায়াত সম্বন্ধে Ohm আর এক নূতন scienceএর পত্তন করেন। এই নূতন scienceএর পত্তন না হইলে, সমুদ্রগর্ভে তার পাতিয়া, টেলিগ্রাফ পাঠানই হয়ত চলিত না, Atlantic Cableএর সমুদায় খরচাটাই মাটি হইবার উপক্রম হইয়াছিল। Electrical, অথবা Magnetic, Lines of force ঐরূপ higher potential হইতে lower potentialএ যায়—এইরূপ কল্পনা করিয়া এ-কালের পণ্ডিতেরা Electrical flux এবং magnetic flux, এই উভয়ের প্রবাহ কল্পনা দ্বারা তাড়িত-বিজ্ঞানকে নূতনভাবে গঠন করিয়া তুলিয়াছেন। নইলে ডাইনামো চালান কত দুঃসাধ্য হইত, তাহা তত্ত্বজ্ঞেরা জানেন। দুইটা তার এক সুরে বাঁধা থাকিলে, একটায় ঘা দিলে অন্যটা চঞ্চল হইয়া উঠে; শব্দের ঢেউয়ের এই analogy তাড়িতের ঢেউ প্রতি প্রয়োগ করিয়া Hartz বিনা-তারে টেলিগ্রাফির উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এ সমস্তই analogyর বলে ঘটিয়াছে; অথচ analogyর বলে তাঁহারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা পরে প্রত্যক্ষ প্রমাণে সমর্থিত হইয়াছে বলিয়াই analogyর সার্থকতা ঘটিয়াছে। ফলেও দেখা গিয়াছে, analogy কিছু দূর পর্য্যন্ত বেশ পথ দেখায়—তার পরে আর চলে না। কাজেই উপমান বা analogy প্রমাণ নহে। এ-কালে theoryর কথা অনেক শোনা যায়; একটা থিয়োরী খাড়া

করিয়া, তাহা হইতে নানা নূতন সিদ্ধান্ত আনা চলিতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণে সমর্থিত না হইলে সে সকল সিদ্ধান্তের কোন মূল্যই থাকে না। গ্রহগুলা সূর্য্যের চারি দিকে আপন আপন পথে ঘুরিয়া বেড়ায়; কোন্ পথে বেড়ান উচিত, Newton তাহার একটা theory দিয়াছিলেন। Herschelএর দূরবীনে নূতন গ্রহ ধরা পড়িল—Uranus। কিছু দিন পরে দেখা গেল, উহার যে পথে চলা উচিত, সে পথে চলিতেছে না—একটু বাহির ঘেঁষিয়া চলিতেছে। Adams এবং Leverier উভয়ে Newtonএর theory মান্য করিয়া গণিতে বসিলেন; গণিয়া দেখাইলেন, বাহিরে অমুক জায়গায় একটা অপরিচিত গ্রহ আছে, যাহার টানে Uranusএর এরূপ অপথে পদার্পণ। কিছু দিন পরে সেই স্থানে সেই গ্রহ Galle সাহেবের দূরবীনে ধরা পড়িল—তিনি নাম পাইলেন, Neptune; প্রত্যক্ষ প্রমাণ theoryকে সমর্থন করিল; তাই theory বাঁচিয়া গেল; নহিলে Newtonএর Law of Gravitationএর সংশোধন আবশ্যক হইত; কোনও বৈজ্ঞানিক Newtonএর উপর কলম চালাইতে ভয় পাইতেন না।

অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণই প্রমাণ; কিন্তু এ প্রত্যক্ষ কার প্রত্যক্ষ? পাগলের প্রত্যক্ষ বা আফিমখোরের প্রত্যক্ষ ধরিলে অবশ্য চলিবে না; জনসাধারণের প্রত্যক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কাহাকে লইয়া এই জনসাধারণ? এই জনসাধারণের মধ্য হইতে নেশাখোর এবং পাগলের সহিত, কবিকে ও প্রেমিককে বাদ দিতে বিজ্ঞান দ্বিধা করিবেন না, ইঁহারা সকলেই অপ্রকৃতিস্থের সামিল। তবে প্রকৃতিস্থ কাহাকে বলা যাইবে? কি লক্ষণ দেখিয়া দর্শককে (observer) প্রকৃতিস্থ ঠিক করিব? যে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নিজে বাহ্য জগতের তত্ত্ব আলোচনা করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যক্ষ বিশ্বাস করা যাইবে কি না? তাঁহাকেও বিশ্বাস করা যায় না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের সকলেরই মাথায় একটা-না-একটা theory থাকে; তাঁহারা সেই theory সমর্থনের জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতড়াইয়া বেড়ান। কেহ কেহ বা কোন একটা analogy ধরিয়া, সেই analogyর প্রদর্শিত পথে চলিয়া, তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। আপন আপন theory বা সিদ্ধান্তের উপর তাঁহাদের টান, খুব প্রবল টান। সেই টানে তাঁহাদের মেজাজ ঠিক থাকে না। Theory বা analogyর অনুকূল প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখিতে না পাইলে তাঁহারা চোখে আঁধার দেখেন।

এইরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ বলা যাইবে কি না ? বস্তুতই তাঁহাদের প্রত্যক্ষকে বিশ্বাস করা যায় না, বস্তুতই তাঁহারা অনেক সময় হয়-কে নয় এবং নয়-কে হয় দেখেন। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যাঁহারা আবার শীর্ষস্থানে, তাঁহারা এক-একটা genius, এই genius এবং পাগলে যে বড় তফাৎ নাই, তাহা বলা বাহুল্য। ইহারা সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে একটা-না-একটা formulaয় ফেলিবার জন্য এত ব্যাকুল যে, ইহাদের মাথা সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে। ইহাদের মাথার খুলির ভিতরে কল্পনাদেবী নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছেন ; কোন ইন্দ্রিয়কে স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই। ফলে, যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ বিজ্ঞানালোচনার এক মাত্র ভিত্তি, এবং বৈজ্ঞানিকদের কাজ, সেই প্রমাণ সংগ্রহে বৈজ্ঞানিকদেরই পটুতার অভাব, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বৈজ্ঞানিকেরাও তাহা বোঝেন ; সেই জন্য কোন একটা experimentএ, কোন একটা observationএ, কোন নূতন তথ্যের সন্ধান পাইলে আপনার চক্ষু-কর্ণকে বিশ্বাস না করিয়া আশ-পাশ হইতে রাস্তার লোক ডাকিয়া আনেন—যাহাদের মাথার ভিতর কোন theory নাই, experimentএর ফলাফলে যাহাদের কোনরূপ অনুরাগ বিরাগ নাই, কোনরূপ পক্ষপাতের সম্ভাবনা মাত্র নাই, সেইরূপ লোককে ডাকিয়া আনিয়া দেখান। Observer যত গাধা হয়, observationএর গৌরব যে ততই বাড়ে, ইহা মোটামুটি বলা যাইতে পারে।

তাহাই না হয় হইল ;—নেশাখোর ও পাগল হইতে সাধু, ভক্ত, কবি এবং বড় বড় পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলকেই পূর্ব্বোক্ত জনসাধারণের মধ্য হইতে বাদ দেওয়া গেল। তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া কেবল প্রকৃতিস্থ লোকদিগকেই লওয়া গেল। কিন্তু তাহাই কি সম্ভব ? Bain সাহেব যে বলিয়াছেন—"In regard to object properties all minds are affected alike" এই কথাটা কি সম্পূর্ণ ঠিক ? বৈজ্ঞানিকেরা জানেন, কোন দুই জন observer ঠিক এক-রকম দেখেন না। সকলেই ঠিক এক-রকম দেখিলে observationএর artটা খুব সহজ হইয়া যাইত ; কিন্তু উহা তত সহজ নহে। এক টুকরা রূপা লইয়া যদি নিক্তিতে ওজন করা যায়, কোন দুই নিক্তি ঠিক এক ওজন দিবে না,—সে যত সূক্ষ্ম chemical balanceই হউক। এ ত গেল যন্ত্রের দোষ। একই লোক একই নিক্তি লইয়া যত বারই ওজন করুক, প্রত্যেক বারই কিছু-না-কিছু তফাৎ হইবেই। দশমিক ভগ্নাংশের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ

স্থানে গিয়া গরমিল হইবে। আর দুই জন লোক আসিয়া যদি একই নিক্তিতে একই সঙ্গে দেখে, তাহা হইলে ত কথাই নাই ;—এক জন একটু অধিক, এক জন একটু অল্প দেখিবেই।' খুব সাবধান, সতর্ক, পক্ষপাতবিহীন লোকে ওজন করিতে গেলেও এক ওজন কিছুতেই পাইবে না, কিছু-না-কিছু তফাৎ ঘটিবেই। এক-একটা লোকের ধাতুই যেন বায়ুপ্রধান, তাহারা একটুকু বেশী দেখে। আবার এক-একটা লোকের ধাতু যেন শ্লেষ্মাপ্রধান, তাহারা একটুকু অল্প দেখে। ফলে কোন দুই ব্যক্তি ঠিক এক-রকম দেখে না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইন্দ্রিয়দোষেই হউক, আর মেজাজের দোষেই হউক, একটু-না-একটু বিশিষ্টতা আছে। সেটা তাহার personal equation. এই personal equationএর হিসাব না লইলে বৈজ্ঞানিক observation নিষ্ফল হয়। কাজেই "all minds are affected alike" এ কথা কিছুতেই বলা চলে না। বৈজ্ঞানিকেরা ইহা জানেন বলিয়াই কেবল এক জন লোকের observationএ আদৌ বিশ্বাস করেন না ; রাস্তা হইতে দশ জন অপরিচিত লোক ডাকিয়া এবং প্রত্যেককে দেখাইয়া শেষ পর্য্যন্ত একটা গড় (average) ঠিক করিয়া লন ; প্রকৃত ওজন যাহা ধরিয়া লওয়া হয়, কেহ তাহার চেয়ে একটু অধিক, কেহ বা একটু অল্প বলে। বহু লোকের average হিসাব করিতে গিয়া, আধিকে অল্পে কাটাকাটি হইয়া যাহা প্রকৃত, প্রায়ই তাহার কাছাকাছি দাঁড়ায়।

Physical Scienceএর কাজ হইতেছে বাহ্য জগতের বিবরণ বা description দেওয়া। কোন্ জিনিসটা কেমন, এক জিনিসের সহিত অন্য জিনিসের কি সম্বন্ধ, কোন্ ঘটনা কিরূপে ঘটে, এক ঘটনার সহিত অন্য ঘটনার কি সম্বন্ধ, ইহার বর্ণনা করাই তাহার কাজ। বর্ণনার সময়ে বৈজ্ঞানিক নিজের একটা ভাষা ব্যবহার করেন, সেই ভাষা সকলে না বুঝিতে পারে ; কিন্তু এই বর্ণনা দিবার সময় তাঁহাকে মুখ্যতঃ অপর পাঁচ জনের প্রত্যক্ষে নির্ভর করিতে হয়। সেই অপর পাঁচ জন যতই প্রকৃতিস্থ হউক না, সকলে ঠিক এক-রকম সাক্ষ্য দেয় না। ইন্দ্রিয়ের দোষেই হউক, আর মেজাজের দোষেই হউক, প্রত্যেকেই বাহ্য জগৎকে কিছু-না-কিছু ভিন্নভাবে দেখে। যিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি কোন এক জনের সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া সকলেরই সাক্ষ্য মিলাইয়া মিশাইয়া একটা average কষিয়া লইয়া মাঝারি রকমের বর্ণনা দেন। এইরূপে বর্ণিত যে জগৎ, তাহাই Physical Scienceএর বাহ্য জগৎ বা objective material world। কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ

বাহ্য জগতের সহিত বৈজ্ঞানিকের বর্ণিত এই বাহ্য জগতের সম্পূর্ণ মিল হয় না। বৈজ্ঞানিকের এই জগৎ তাঁহার নিজের হাতে-গড়া বা মন-গড়া কাল্পনিক জগৎ। এ জগৎ কাহারও প্রত্যক্ষ নহে; অতএব ইহা মন-গড়া এবং কাল্পনিক। কোন জীয়ন্ত মানুষকে যদি চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করা হয়—বৈজ্ঞানিক-কল্পিত এই জগৎ তোমার প্রত্যক্ষ জগৎ বটে কি না? সে বলিতে বাধ্য হইবে যে, "হাঁ, কতকটা তার মত বটে, কিন্তু ঠিক তাহা নহে।" বিজ্ঞান-বিদ্যা যে-জগতের আলোচনা করে, যাহার মধ্যে নানাবিধ laws বা নিয়মের আবিষ্কার করে, যাহার সম্বন্ধে নানাবিধ theory খাড়া করিয়া সেই নিয়মগুলার পরস্পর সম্পর্ক বুঝিতে চায়, সে জগৎ বস্তুতই সেই কাল্পনিক জগৎ। সেই জগতের দ্রষ্টা এবং সাক্ষী কোনও জীয়ন্ত মানুষ নহে; নিতান্তই যদি সাক্ষী বা দ্রষ্টা একজন উপস্থিত করিতে হয়, তাহা হইলে এক জন কাল্পনিক দ্রষ্টা ও সাক্ষী খাড়া করিতে হইবে। সে একটা মাঝারি রকমের মানুষ হইবে। অতি-বড় পণ্ডিত হইতে অতি-বড় মূর্খ পর্য্যন্ত বাদ দিয়া, অতি-বড় ভাবুক হইতে অতি-বড় অভাবুককে বর্জ্জন করিয়া একটা মাঝারি রকমের মানুষের কল্পনা করিতে হইবে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সে যেন একটা average। বৈজ্ঞানিককে পদে পদে এইরূপ মাঝারি বস্তুর কল্পনা করিতে হয়। সূর্য্যের দৈনিক গতির সহিত মিলাইয়া আমাদিগকে সময় নিরূপণ করিতে হয়। সূর্য্য-ঘড়িতে একটা কাঠির ছায়া দেখিয়া এইরূপে সময় নিরূপণ করা চলিতে পারে। কিন্তু সূর্য্যদেব সারা বৎসর সমান বেগে চলেন না। তিনি পৃথিবী হইতে কখন একটু দূরে থাকেন, কখন নিকটে থাকেন; কাজেই কখন একটু দ্রুত চলেন, কখন একটু ধীরে চলেন। কাজেই সূর্য্য-ঘড়ির প্রদত্ত সময় ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্নরূপ হয়। সব দিন এক-রকমের হয় না। আমাদের clock ঘড়ি কিংবা timepieceএর সময় সেই জন্য সূর্য্য-ঘড়ির সময়ের সঙ্গে ঠিক মেলে না। Clock ঘড়িকে সাধ্যমত সারা বৎসর সমান ভাবে চলিতে হয়। কখন দ্রুত, কখন ধীরে চলিলে ক্লক ঘড়ির চলিবে না। সেই জন্য সূর্য্য-ঘড়ির সময়ে কখন কয়েক মিনিট যোগ দিয়া, কখন কয়েক মিনিট বিয়োগ করিয়া, clock ঘড়ির সময় পাওয়া যায়। যেটায় মিনিট যোগ বিয়োগ করিতে হয়, তাহাকে বলে equation of time. আসল সূর্য্যের বারো মাসের average করিয়া জ্যোতিষীরা একটা মন-গড়া নকল সূর্য্যের কল্পনা করেন।

জ্যোতিষের ভাষায় ইহার নাম—Mean Sun (মধ্যম সূর্য্য বা মাঝারি সূর্য্য)। এই কাল্পনিক মাঝারি সূর্য্য সারা বৎসর জ্যোতিষীর কল্পনায় সমান বেগে চলিয়া থাকে। আমাদের clock ঘড়ি সেই মাঝারি সূর্য্যের অনুবর্ত্তন করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলে। যেটা আসল সূর্য্য, সে এই নকল সূর্য্যের কখন একটু আগে, কখন একটু পিছনে থাকে। এইরূপ আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বৈজ্ঞানিকেরা theory খাড়া করিয়াছেন যে, বাতাসের অণুগুলা ভীমবেগে ছুটাছুটি করিতেছে। প্রত্যেক অণুর এক-একটা বেগ আছে। অণুগুলা বেগে ধাক্কা দেয় বলিয়া বাতাসের চাপ জন্মে। প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চি জমির উপর বাতাস সাড়ে সাত সের চাপ দেয়, এই যে একটা কথা শোনা যায়, সেই চাপ এই ধাক্কা হইতে উৎপন্ন। দুর্গের প্রাকারে অজস্র গোলা বর্ষণ করিয়া, সেই বৃষ্টির চাপে পাষাণের প্রাচীরও ফেলিয়া দেওয়া যায়, কতকটা তদ্রূপ। বাতাস গরম হইলে সেই বেগ বাড়ে; ঠাণ্ডা হইলে বেগ কমে। এই বেগের পরিমাণ উষ্ণতা-সাপেক্ষ; কিন্তু একই বাতাসের একই উষ্ণতায় সকল অণুর বেগ সমান থাকে না; কারো বা একটু বেশী, কারো বা একটু কম থাকে। সকলগুলায় বেগের গড় করিয়া, একটা মাঝারি বেগের Mean Velocity কল্পনা করা হয়, এবং বলা হয় যে, অণুগুলার এই Mean Velocity বাতাসের উষ্ণতার নিয়ামক; কিন্তু কোন অণুটারই আসল বেগ ঠিক এই Mean Velocityর সমান হয় না। তবে অধিকাংশেরই বেগ তাহার কাছাকাছি, কারও বা অল্প একটু বেশী, কারও অল্প একটু কম। দুই-দশটা অণু হয়ত এমনও আছে যে, তাহার আসল বেগ সেই মাঝারি বেগের অনেক বেশী বা অনেক কম। তবে সেইরূপ অপ্রকৃতিস্থ অণুর সংখ্যা, প্রকৃতিস্থ অণু-সাধারণের তুলনায় অল্প। Average কষিবার সময় তাহাদিগকে বর্জ্জন করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। ব্যাপারটা কতকটা লক্ষ্য বেঁধার মত। কালো দেওয়ালে ছোট্ট একটি সাদা দাগ দিয়া, দূরে দাঁড়াইয়া সেই লক্ষ্য বা target বিঁধিতে হয়। যিনি লক্ষ্য বিঁধিবেন, তিনি অর্জ্জুনের মত ধনুর্দ্ধর হইলেও ঠিক লক্ষ্যটির গায়ে বিঁধিতে পারেন না। তাহার নিক্ষিপ্ত তীর আসিয়া লক্ষ্য হইতে একটু-না-একটু—আধ ইঞ্চি, সিকি ইঞ্চি, কিংবা তার চেয়েও কম দূরে পড়িবেই। বেধকর্ত্তা যদি খুব পটু হন, তাহা হইলে অধিকাংশ বারেই খুব কাছেই পড়িবে; পুনঃ পুনঃ বহু বার বিঁধিতে গেলে দু-এক বার ছট্‌কিয়া

অধিক দূরে, দু-দশ ইঞ্চি দূরেও পড়িতে পারে। লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যতটুকু দূরে পড়ে, সেইটুকুকে Error বলা যায়। পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, এই Errorএরও আবার একটা Law আছে। Error কম হইবার সম্ভাবনা অধিক, বেশী হইবার সম্ভাবনা অল্প। কতটুকু Errorএর সম্ভাবনা কতটুকু, তাহা এই Law of Error ধরিয়া গণিয়া বলা চলে। পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য বিঁধিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, পরীক্ষাফল এই Law of Errorএর সঙ্গে মোটামুটি মেলে। বৈজ্ঞানিকেরাও কোন একটা observationএ, ভিন্ন ভিন্ন observerএর কাছে ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষ্য পাইয়া মানিয়া লন যে, কোনটাই ঠিক নহে, সবটাতেই কিছু-না-কিছু ভুল আছে। তবে মনুষ্যমধ্যে যাহারা জনসাধারণ—যাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহাদের মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা অল্প; আর যাহারা অপ্রকৃতিস্থ, Poet, lover বা lunatic—তাহাদের ভুলের সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু কাহারই প্রত্যক্ষ সম্পূর্ণ ঠিক নহে। যেটাকে ঠিক বলিয়া অগত্যা গ্রহণ করা হয়, তাহা সেই কাল্পনিক মাঝারি মানুষের বা Mean manএর। এই Mean man পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের average; পাগল, ভাবুক ও নেশাখোরের সংখ্যা এত অল্প যে, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া average করিলে বিশেষ দোষ হয় না। কিন্তু বলা উচিত যে, এই Mean manএর পৃথিবীতে অস্তিত্ব নাই; Mean Sunএর মত তিনিও এক কল্পিত বস্তু, এবং এই কল্পিত মানুষের প্রত্যক্ষ যে বাহ্য জগৎ, Physical Scienceএর নিকট সেইটাই সত্য জগৎ; এবং সমস্ত Physical Science সেই জগতের আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। বিজ্ঞান-ব্যবসায়ী মাত্রেই জানেন, বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ণয়ের অন্য উপায় নাই; নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। মজা এই, আমরা সর্ব্বসাধারণে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া সেই কল্পিত জগতের কল্পিত সত্যগুলাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লই এবং আমাদের আপনাপন প্রত্যক্ষ জগৎকে ভুল বলিয়া স্বীকার করি।

বিজ্ঞান যে প্রত্যক্ষবাদী, এ কথা অহরহঃ শোনা যাইতেছে বটে; কিন্তু কথাটার তাৎপর্য্য তলাইয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। দাঁড়াইতেছে এই—যেটা প্রত্যক্ষ, বিজ্ঞানের নিকট সেটা ঠিক নহে; আর যেটা প্রত্যক্ষ নহে—একেবারে কাল্পনিক, সেইটাই বিজ্ঞানের নিকট ঠিক। বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষবাদের ইহাই তাৎপর্য্য। ব্যাপারটা দাঁড়াইল একটা paradox;

যিনি প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রথাই মানেন না, তাঁহার নিকট যাহা প্রত্যক্ষ, তাহা সত্য নহে; যাহা কাল্পনিক, তাহাই সত্য। এইটুকু মনে রাখিলে miracle লইয়া ঝগড়া প্রায়ই থাকে না। যাঁহারা miracle প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ভাবেন, অথবা অন্য কেহ miracle প্রত্যক্ষ করিয়াছে এইরূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বৈজ্ঞানিকদিগের সংশয় দেখিয়া মেজাজ ঠিক রাখিতে পারেন না। অথচ বৈজ্ঞানিকের এখানে কোন দোষ নাই। বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষবাদী হইলেও কাহারও প্রত্যক্ষে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না—এমন কি, নিজের প্রত্যক্ষকেও বিশ্বাস করেন না। তিনি, তাঁহার কাল্পনিক মাঝারি মানুষের যাহা প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, তাহাকেই সত্য বলিয়া চালান—ইহাই তাঁহার ব্যবসায়। যিনি miracle দেখেন, তিনি কখনই সেই মাঝারি মানুষ নহেন। তিনি মাঝারি মানুষের নিম্নে, ইহা বলিলে যদি রাগ করেন, তাহা হইলে মাঝারি মানুষের উঁচু বলিয়াই তাঁহাকে ধরিয়া লইলাম। অন্যত্র অন্য কার্য্যে সেই শ্রেণীর লোককে মাথায় তুলিয়া রাখিতে বৈজ্ঞানিকের আপত্তি হইবে না; কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তাঁহাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। আবার বৈজ্ঞানিকও তাঁহাদিগকে যদি মিথ্যাবাদী বলিয়া বসেন বা অন্য কিছু বলিয়া একটা গালি দেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষেও একটু বাড়াবাড়ি হইবে। তাহাতে তিনি নিজের সীমানা ছাড়াইয়া অনধিকারচর্চ্চার অপরাধী হইবেন। নিজের কল্পিত, মাঝারি মানুষের কল্পিত সত্যই যখন তাঁহার নিকট এক মাত্র সত্য—প্রত্যক্ষদর্শীর প্রত্যক্ষ সত্যকে যখন তিনি আমলে আনিবেন না, তখন তিনি নিজের অধিকার ছাড়িয়া প্রত্যক্ষদর্শীর সহিত ঝগড়া করিতে যান কেন?

বিজ্ঞানে যেগুলাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বা Laws of Nature বলে, সেগুলা বৈজ্ঞানিকের এই কাল্পনিক জগতের মধ্যেই ঘটে; কেন না, বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের জগতের মধ্যেই এগুলার আবিষ্কার করিয়াছেন। Law of Gravitation হইতে Laws of Conservation of Matter ও Conservation of Energy পর্য্যন্ত সকলের পক্ষেই এই কথা। সকল Lawএর উপরে যে Law,—যার নাম Law of Uniformity of Nature, যেটাকে বাঙ্গালায় বলা যাইতে পারে নিয়তি বা ঋত,—যেটাকে গোড়ায় মানিয়া লইয়া বাহ্য জগতের বৈজ্ঞানিক আলোচনা আরম্ভ হয়, তার

পক্ষেও ঐ কথা। কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রত্যক্ষগোচর জগতের পক্ষে এই সকল Law ষোল আনা খাটিতে পারে না। বৈজ্ঞানিকদের মতে যাহারা অপ্রকৃতিস্থ, তাহাদের পক্ষে ত আদৌ খাটে না। সকলের পক্ষেই এই সকল Lawএর সত্য ভাব approximate মাত্র ;—approximationএর মাত্রা লইয়াই কেবল তারতম্য। উনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকেরা এই রকম কতকগুলা Law আবিষ্কার করিয়া কিছু বেশী বেশী আস্ফালন আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে তাঁহারা কতকটা সংযত হইয়াছেন। Conservation of Matter এবং Conservation of Energy সম্বন্ধে এখন তাঁহারা সাবধানে কথা কন। উহাদের limitation বা সীমানা কত দূর, তাহা লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এমন কি, Law of Gravitation পর্য্যন্ত কোন্ ক্ষেত্রমধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা লইয়াও অনেকে ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। উহার Universal বিশেষণটা আজ-কাল বড়-একটা ব্যবহার হয় না। তবে Uniformity of Natureটাকে তাঁহারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, এবং সম্ভবতঃ চিরকাল আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবেন। ওটাকে ছাড়িতে গেলে বিজ্ঞানের ব্যবসাই হয়ত নষ্ট হইবে। নিয়ম আছে ধরিয়া লইয়াই বিজ্ঞান অতীতে আস্থা স্থাপন করিয়া ভবিষ্যৎ গণিতে বসেন। ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ও ব্যবসায়। নিয়মে আস্থা হারাইলে তাঁহার কাজ কিছুই থাকে না। কিন্তু Natureএর এই uniformity কোথায়, কোন্ জগতে রহিয়াছে, আপনারা এত ক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন। কোন জীয়ন্ত মানুষের প্রত্যক্ষ জগতে এই uniformity নাই ;—অত্যন্ত প্রকৃতিস্থ মানুষও সময়ে সময়ে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে, তখন তাহার Nature তাহার কাছে uniform থাকে না। গত শতাব্দীতে Reign of Law লইয়া অনেক বক্তৃতার আস্ফালন শুনা গিয়াছে। কিন্তু নিয়মের এই প্রভুত্ব কখনই তোমার আমার প্রত্যক্ষ-দৃশ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই—সে প্রভুত্ব কেবল বৈজ্ঞানিকের মন-গড়া সেই কাল্পনিক জগতে, যাহার অস্তিত্ব কেবল বৈজ্ঞানিকের কল্পনায় বিদ্যমান।

এই কথাটা লইয়া আর একটু নাড়াচাড়া আবশ্যক। বেইন সাহেব যাহাকে Objective material world বলিতে চাহেন, তাহা তাঁহার মতে সর্ব্বসাধারণের জগৎ। কিন্তু এই সর্ব্বসাধারণ হইতে অপ্রকৃতিস্থ লোকগুলাকে বর্জ্জন করিতে হইবে ; বৈজ্ঞানিকেরা তাহা করিয়াও থাকেন। সংশোধন

করিয়া বলিতে হইবে যে, উহা প্রকৃতিস্থ সর্ব্বসাধারণের জগৎ। এই যে পুনঃ পুনঃ "প্রকৃতিস্থ" ও "অপ্রকৃতিস্থ" এই দুটা কথা ব্যবহার করা গেল, এই দুইএর মধ্যে ভেদ কিরূপের? প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ লোক বা Normal man সেই কাল্পনিক Mean man, মাঝারি মানুষ, পৃথিবীতে যাহাকে কেহ কখনও দেখে নাই; জ্যোতির্বিদ্যার Mean Sunএর মত তিনি বিজ্ঞান-বিদ্যার কল্পিত পদার্থ;—সকল লোকই একটু-না-একটু অপ্রকৃতিস্থ। যেগুলা প্রকৃতপক্ষে বড় লোক, সেইগুলাই হয়ত অত্যন্ত অপ্রকৃতিস্থ। বরাবরই বলিয়া আসিতেছি, রাস্তার লোকই সব চেয়ে বেশী প্রকৃতিস্থ; ইহারাই মাঝারি রকমের মানুষ এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ইহাদের সাক্ষ্যই মাতব্বর;—ইহারাই সেই Mean manএর কাছাকাছি। পৃথিবীতে ইহাদের সংখ্যাই খুব বেশী। ইহারা খায়-দায়, হাসে নাচে, গালাগালি-মারামারি করে, কোনরূপ ভাবুকতার স্পর্দ্ধা রাখে না, এমন কি, high intelligenceএর বা অতিরিক্ত বুদ্ধিমত্তারও কোন স্পর্দ্ধা রাখে না—সকল বিষয়েই ইহারা মাঝারি গোছের। ইহাদেরই বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাণ্ডজ্ঞান বা common sense বলা যায়। পৃথিবীতে ইহারাই সবচেয়ে successful; ইহাদের সংখ্যাধিক্যই তাহার প্রমাণ। জীবনে সফল বা successful না হইলে ইহাদেরই সংখ্যা এত অধিক হইত না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইহারাই সেই পনর আনা, যাহারা খায়-দায় ও যথাকালে মরিয়া যায়; কোন নাম বা চিহ্ন রাখিয়া যায় না; অথচ যাহাদিগকে লইয়া সমাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রতন্ত্র বিব্রত হইয়া আছে। ইহারা ঘাসের ও আগাছার সামিল। অশ্বত্থ-বটের মত ছায়া দেয় না; আম-কাঁঠালের মত ফল দেয় না; যুঁথি-চামেলির মত ফুল দেয় না; অথচ বিনা চাষে, বিনা তদ্‌বিরে, বিনা আয়োজনে পৃথিবীর পিঠ ছাইয়া আছে। ইহাদিগকে নির্ম্মূল উৎপাটন বা উচ্ছেদ করা কাহারও সাধ্য নহে। এই যে success বা সফলতা, ইহা জীবধর্ম্ম লইয়া সফলতা, হালের ভাষায় জীবন-সংগ্রামে সফলতা। এই "জীবন" শব্দ খুব উচ্চ অর্থে ব্যবহার করিবার দরকার নাই। Biology শাস্ত্রে যাহাকে জীবন বা life বলে, এ সেই জীবন। চলা-ফেরা, secretion, excretion, digestion, assimilation—আহার-সংগ্রহ এবং শত্রুকে প্রহার, এই শ্রেণীর ব্যাপার-গুলাই এখানে জীব-ধর্ম্ম। উচ্চাঙ্গের Psychical life হয়ত ইহার অন্তর্গত নহে। উচ্চাঙ্গের moral বা religious life ইহার অন্তর্গত একেবারেই

নহে। পশুধর্ম্ম বলিলে যদি গালি দেওয়া না হয়, তাহা হইলে এই জীবধর্ম্মকে পশুধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। Biology শাস্ত্র মানুষকে এবং কুকুরকে প্রায় এক চক্ষে দেখেন, কাহারও উপর বিশেষ পক্ষপাত করেন না। এই সকল পশুধর্ম্মের প্রভাবেই মানুষ জীব-জগতে জীবন-সংগ্রামে এতটা সফল হইয়াছে এবং সকলের উপরে স্থান পাইয়াছে। এই হিসাবে যাহারা most successful, তাহাদের সংখ্যাই চিরকাল অধিক আছে এবং অধিক থাকিবে। তাহারাই সেই মাঝারি-গোছের মানুষ। সবল দেহ ও সুস্থ ইন্দ্রিয় ব্যতীত ভাষায় যাহাকে কাণ্ডজ্ঞান বলে, সেই কাণ্ডজ্ঞানের বলে তাহারা এতটা successful. যাহারা সেই মাঝারি মানুষ হইতে অধিক ছোট বা অধিক বড়, তাহারা জীবন-সংগ্রামে কৃতকার্য্য হয় না। যাহারা বিকলাঙ্গ বা বিকৃতেন্দ্রিয়, যাহাদিগকে বিকৃতবুদ্ধি বা পাগল বলা যায়, তাহাদিগকেই এই অধিক ছোটর দলে ফেলা গেল। আর যাহারা অতিবুদ্ধি, যাহাদের intelligence খুব উচ্চ অঙ্গের, যাহাদের Psychical, Moral বা Religious life সাধারণকে ছাড়াইয়া দূরে গিয়াছে, তাহাদিগকেই অধিক বড়র শ্রেণীতে ফেলা গেল। অতিবুদ্ধি যে কার্য্যনাশিকা হয়, তাহা প্রবাদেই বলে। যে অতি-বড় পণ্ডিত, সে অনেক সময়ে বিষয়-বুদ্ধিহীন এবং কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত। বড় বড় Geniusকে প্রায় moral wreck হইতে দেখা যায়। সমাজের সহিত কারবারে তাঁহারা কর্ম্মের সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন না। কবি আর ভাবুক—তাঁরা ত lunaticএরই সামিল। যাঁহারা vision দেখিতে অভ্যস্ত, সমাজে তাঁহাদের স্থান নাই। যাঁহারা যোগী, তাঁহারা আহার বর্জ্জন করিয়া মাটির তলে বাস করিতে যান। যাঁহারা তপস্বী, তাঁহারা শীতকালে বরফ-জলে গলা ডুবাইয়া বাস করেন। যাঁহাদের religious enthusiasm বেশী, তাঁহারা গৃহত্যাগী। দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া দরকার নাই। অথচ সর্ব্বসাধারণে ইঁহাদিগকে বড় বলে, কখনও পূজা করে, কখনও বা ভয় করে। আবার কখনও বা হাসে, গালি দেয়, কোন দেশে বা পোড়াইয়া মারে। ইঁহারা জীবন-সংগ্রামে কৃতকার্য্য হন না। Natural Selection মোটের উপর ইঁহাদিগকে eliminate করিতে চায়; ইঁহাদের সংখ্যা বাড়িতে দেয় না। লক্ষ্য-বেঁধার উপমা ধরিলে দেখা যায়, Natural Selection যে Mean manএর উৎপাদনকে লক্ষ্য স্থির করিয়া অবিরাম আপনার অস্ত্র ছুঁড়িতেছে, ইঁহারা কোন গতিকে সেই

লক্ষ্যস্বরূপ Mean position হইতে ছট্‌কিয়া দূরে পড়িয়াছেন। ইঁহারা প্রকৃতিদেবীর প্রিয়পুত্র নহেন। ইঁহারা যে জগতে বাস করেন, যে জগতের সহিত কারবার করেন, যে জগতের ইঁহারা সাক্ষী, সে জগৎ মাঝারি মানুষের common senseএর বা কাণ্ডজ্ঞানের অনুমোদিত জগৎ নহে। কাজেই বৈজ্ঞানিকের আলোচ্য যে জগৎ, তাহার সহিত ইঁহাদের মিল নাই। ইঁহাদের জগতে নিয়মের শৃঙ্খলা নাই; সে জগৎ নিয়তির অধীন নহে। ইঁহাদের জগতে যদি uniformity না থাকে, সেখানে যদি থাকিয়া থাকিয়া miracle গজায়, তাহাতে বৈজ্ঞানিকের আপত্তি করিলেও চলিবে না, দুঃখিত হইলেও চলিবে না।

ফরাসী-রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধে না কি গল্প আছে, Revolutionary Governmentএর কর্তৃপক্ষগণ সভায় বসিয়া স্থির করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন---God আছেন কি না! অধিকাংশের ভোটে স্থির হইল, God নাই। অতএব Government রাষ্ট্রমধ্যে আদেশ জারি করিলেন, সকলেই বল God নাই; এবং God-সম্পৃক্ত যত কিছু আচার-অনুষ্ঠান আছে, সমস্ত উঠাইয়া দাও। এই গল্পে আমরা হাসি বটে, কিন্তু সমস্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্রের ব্যবহারটাও কতকটা এইরূপ। এখানেও vote লইয়া বাহ্য জগতের স্বরূপ নির্দ্ধারণ হয়; কিন্তু তাহাতে কেহ হাসে না; পরন্তু গম্ভীরভাবে তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এখানেও অধিকাংশ লোকের vote লইয়া যে একটা মাঝারি রকমের জগতের অস্তিত্ব খাড়া করা গিয়াছে, সেই জগৎটাকেই সত্য বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকে, অর্থাৎ ইতরসাধারণে, যাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি অতি সাধারণ রকমের, যাহারা কোন বিষয়েই অগ্রণী বা অসাধারণ নহে, তাহাদেরই vote লইয়া বিজ্ঞান স্থির করিয়াছেন যে, বাহ্য জগৎটা এই রকম। আর যাহারা সেই পক্ষে vote দিতে পারে নাই, বিজ্ঞান-বিদ্যা তাহাদিগকে অপ্রকৃতিস্থ বিশেষণের ছাপ দিয়াছেন। তাহাদের দোষ এই—তাহারা জীবন-সংগ্রামে সমর্থ নহে, পশুধর্ম্মে তাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, সংখ্যায় তাহারা অতি অল্প। তাহারা অপ্রকৃতিস্থ, এ কথাটার মানেই হইতেছে এই যে—তাহারা নিজে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাত্রা চালাইতে পারে না, তাহাদের অনুবর্ত্তন করিলে অন্যকেও জীবনযাত্রায় ঠকিতে হয়। অতএব জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাহাদের মতামত অগ্রাহ্য, তাহাদের সাক্ষ্য বর্জ্জনীয়। বৈজ্ঞানিক—তাহাদিগকে

বর্জ্জন করিয়া মোটা-বুদ্ধি, মোটা-চরিত্র ইতরসাধারণের সাক্ষ্যই গ্রহণ করেন; এবং তাহারা যে-জগৎ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, সেই জগৎকেই সত্য জগৎ বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সত্য কিরূপ সত্য? এই সত্যে আস্থা না করিলে জীবন-সংগ্রামে ঠকিতে হয়, জীবনযাত্রা সুষ্ঠুরূপে চলে না। কিন্তু এই যে জীবন, সে Biologistএর জীবন মাত্র; Physiologyর মোটা অংশ যে-জীবনের আলোচনা করে, এ জীবন সেই জীবন মাত্র; খাইয়া-দাইয়া জীবন কাটানই এই জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। অন্য কোন মহত্তর উদ্দেশ্য ইহার নাই। ঘাসের মত ও আগাছার মত আপনাকে বাঁচাইয়া এবং ফসলের গাছকে সাধ্যমত নষ্ট করিয়া, আপনার বংশরক্ষা করা ভিন্ন মহত্তর উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে আবিষ্কার করা যায় না। এ জীবনকে পশু-জীবন বলিলে ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ নাই। এই জীবনটা সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হইলে কিন্তু Physical Scienceকে অমান্য করিলে চলিবে না। এই জীবন Uniformity of Nature স্বীকারে বাধ্য; এবং Physical Science, তার আলোচ্য জগতে ভিন্ন ভিন্ন সীমানার মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন সংকীর্ণ ক্ষেত্রে, আর যে সকল ছোট-বড় laws আবিষ্কার করিয়াছে, অথবা আজ আবিষ্কার করিয়া পর-দিন তাহা সংশোধন করিয়া লইতেছে, সেই সকল laws মানিতে বাধ্য;—মানিয়া লইলে তবে এই জীবন সফল হইবে, না মানিলে পদে পদে ঠকিতে হইবে। যে মানে, সে মোটের উপর জিতিয়া যায়। Physical Science যে গত দুই শত বৎসরে অসাধ্য সাধন করিয়াছে, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য ইহাই। বাহ্য জগতের উপর মানুষের প্রভুত্ব সম্বন্ধে যে আস্ফালন অহরহঃ শোনা যায়, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য ইহাই,—কিন্তু ইহার অধিক কিছু নহে।

বিজ্ঞানের স্বীকৃত এই সত্যটাকে কিরূপ সত্য বলিব? ইতরসাধারণে —মোটা লোকে, মাঝারি লোকে যেটাকে মোটামুটি সত্য বলে, অথচ যাহার সহিত কাহারও প্রত্যক্ষ সত্য মিলে না,—বড় লোকদের প্রত্যক্ষ সত্য ত একেবারেই মিলে না, সেই সত্যটাকে কিরূপে সত্য বলিব? প্রায় একুশ বৎসর আগে আমি এক বার সত্যের definition দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের মধ্যে এই প্রসঙ্গের সেই প্রবন্ধটি স্থান পাইয়াছে। তাহাতে বলিয়াছিলাম, "প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা Uniformity of Nature একটা সত্য কথা। এই হিসাবে সত্য। প্রাণভয়ে বা প্রসাদের আশায়

জল উঁচু স্বীকার করিতে হয়। একরূপ প্রাণের দায়ে ইহাকেও সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। জীবনরক্ষা যদি কর্ত্তব্য হয়, আত্মহত্যা যদি অকর্ত্তব্য হয়, ইহাও তবে সত্য বলিয়া মানিতে হইবে।...জগদ্-যন্ত্রে ব্যবস্থা নাই, নিয়ম নাই, এরূপ কল্পনায় আনা আমাদের অসাধ্য। মনে করিতে গেলে মনের গ্রন্থি ও জীবনের গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যায়। মানব-জীবনের সহিত সুতরাং সত্যের সম্বন্ধ। মানবকে বাঁচিতে হয়, সেই জন্যই এটা সত্য, ওটা অসত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।" এখনও আমি এই definition আঁকড়াইয়া আছি। এই যে জীবন, এই জীবন রাখিতে হইলে একটা বাহ্য জগৎ স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার সহিত নিয়ত আদান-প্রদান করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক যে বাহ্য জগৎ স্বীকার করেন, সেই বাহ্য জগৎটা মানিলে, এই আদান-প্রদান কার্য্যে ঠকিতে হয় অল্প; না মানিলে হঠিতে হয়। যাহাকে জীবন বলি, তাহা টিকে না। কাজেই আমরা জীবনের দায়ে বৈজ্ঞানিকের বাহ্য জগৎকে মানিয়া চলি, এবং বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত, এই মানার একমাত্র উদ্দেশ্য—জীবনধারণ, অর্থাৎ অপর পাঁচ জনের সহিত, অপর পাঁচ বস্তুর সহিত আদান-প্রদান কারবার; তাহার অধিক কিছু নহে। এই কারবারকে শাস্ত্রীয় ভাষায় **ব্যবহার** বলে। এই ব্যবহার চালাইবার জন্য ঐরূপ সত্য মানিতে হয়। কাজেই শাস্ত্রে ইহাকে বলে—"ব্যাবহারিক সত্য"। কোন প্রত্যক্ষদর্শীর প্রত্যক্ষ জগৎ যদি এই ব্যাবহারিক জগতের সহিত ঠিক না মিলে, তাহা হইলে উভয়ের লাঠালাঠির কোন প্রয়োজন দেখি না। না মিলিবারই ত কথা, কেন না, প্রত্যক্ষ জগৎ প্রত্যেকের পক্ষেই ভিন্নরূপ; আর এই ব্যাবহারিক জগৎ কাহারও প্রত্যক্ষই নহে; ইহা সহস্র লোকের প্রত্যক্ষের average কষিয়া লব্ধ একটা কাল্পনিক জগৎ মাত্র। জীবনের দায়ে এই কাল্পনিক জগৎটাকেই আমরা সত্য জগৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি; এই সত্যকে ব্যাবহারিক সত্য বলিলে আর ঝগড়ার কারণ থাকে না। আর যদি কোন ব্যক্তি, আপনার প্রত্যক্ষ জগতের সহিত এই কাল্পনিক জগতের মিল না দেখিয়া ইহাকে মিথ্যা বলিতে চান এবং আপনার প্রত্যক্ষ জগৎকেই সত্য বলিতে চান, তাহাতেও কোন ক্ষোভের কারণ দেখি না। তবে, এই সত্যটারও একটা বিশেষণ দিলে বোধ হয় গণ্ডগোলের আশঙ্কা কমে। শাস্ত্রের ভাষায় এই সত্যের 'প্রাতিভাসিক' বিশেষণ দেওয়া চলিতে পারে। যে জগৎ প্রত্যেকের

নিজস্ব, যাহা তাহার নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণে উপলব্ধ হয়, ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া আসিয়া বুদ্ধির সমীপে প্রতিভাত বা perceived হয়, তাহাই তাহার পক্ষে 'প্রাতিভাসিক' জগৎ। এই জগতের অস্তিত্ব তাহার নিকট প্রাতিভাসিক সত্য। এই সত্যেরও অপলাপ করার প্রয়োজন নাই। Physical Science ইহার অপলাপ করিতে পারেন না; ইহা তাঁহার আলোচ্য বিষয়ও নহে। প্রাতিভাসিক সত্য প্রত্যেকের নিজস্ব সত্য এবং প্রত্যেকের পক্ষে ভিন্নরূপ; —একের প্রাতিভাসিক জগৎ অন্যে মানিবেন না, মানার দরকারও নাই; কিন্তু ব্যাবহারিক জগৎ, যাহা বিজ্ঞানের আলোচ্য, তাহা কাল্পনিক হইলেও সর্ব্বসাধারণের উহাতে সমান অধিকার; সর্ব্বসাধারণ মিলিয়া-জুলিয়া পরস্পর আদান-প্রদানের জন্য উহাকে মানিয়া লইয়াছে। উহা মানিয়াই ব্যবহার, অর্থাৎ জীবন-যাত্রা। না মানিলে অন্য দিকে লাভ থাকিতে পারে, কিন্তু পরস্পর ব্যবহারে জীবন-যাত্রায় ঠকিবার আশঙ্কা থাকে। যদি কেহ জীবন-যাত্রায় ঠকিবার ভয় না রাখে—যদি কেহ স্থির করিয়া থাকে, জীবন-যাত্রা অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আমার আছে, আমি সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখে চলিব, জীবন-যাত্রায় ঠকিবার আশঙ্কা করিব না; এমন কেহ থাকিলে তাঁহার সহিত বিবাদের কোন প্রয়োজন দেখি না; বিবাদ করিতে গেলেই বা সে শুনিবে কেন ?

যখন সত্য সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তখন Pragmatic Philosophyর কথা বড়-একটা উঠে নাই। William James এবং অন্যান্য পণ্ডিতের প্রসাদে এখন Pragmatism শব্দটি দার্শনিক সাহিত্য জুড়িয়া বসিবার উপক্রম করিয়াছে। এই Pragmatismএর মোটা তাৎপর্য্য এই—যাহা কাজে লাগে, যাহা না মানিলে চলে না, আদানে, প্রদানে, কারবারে, জীবনের কর্ম্মে যাহা মানিয়া সফলতা লাভ করা যায়, তাহাই pragmatic truth. প্রকৃতপক্ষে ইহা কোন নূতন তত্ত্ব আনে নাই, তবে দার্শনিক সাহিত্যে একটা নূতন point of view দিয়াছে; সকল তত্ত্বের আলোচনায় একটা নূতন attitude দেখাইয়াছে। এই Pragmatismএর বাঙ্গালা কি হইবে, অনেক দিন ঠিক করিতে পারি নাই। এখন দেখিতেছি, এই Pragmatism আর "ব্যবহার," এই উভয় শব্দের তৎপরতা বা connotation প্রায় সমান। যে সত্য pragmatic হিসাবে সত্য, তাহাকেই এ দেশের প্রাচীন দার্শনিক সাহিত্যে 'ব্যাবহারিক সত্য' বলা

হইয়াছে। Physical Science বস্তুতঃ জগতের একটা pragmatic view লইয়া থাকে। চলিত কথায় ইহাকে common sense view বলা যাইতে পারে। বাহ্য জগতের অস্তিত্ব লইয়া যাহারা সংশয় উপস্থিত করে, চলিত ভাষায় তাহাদিগকে কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত বলে। দার্শনিক পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁহারা বাহ্য জগৎ আছে কি না, এই তর্ক তুলেন, লোকে তাঁহাদিগকে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বলিয়া বিদ্রূপ করে। প্রকৃতপক্ষে এই সত্য ধরিয়াই আমরা জীবনের কাজ চালাই; কাজেই ইহা কাজ-চালান সত্য, তাহার অধিক কিছু নহে। আর 'প্রাতিভাসিক' শব্দের তর্জ্জমায় 'Phenomenal' ব্যবহার করা চলিতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহা তাহার পক্ষে phenomenal মাত্র; এই Phenomenal World প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব এবং প্রত্যেকের পক্ষে স্বতন্ত্র। ইহার মধ্যে রজ্জু-সর্প হইতে মরীচিকা ও গন্ধর্ব্বনগর পর্য্যন্ত সকলই স্থান পায়; সমস্ত illusion, hallucination, apparition স্থান পায়; স্বপ্নাবস্থার বা hypnotic conditionএর সমুদায় প্রত্যক্ষ ঘটনা স্থান পায়, subconscious বা hyper-conscious অবস্থার সমস্ত clairvoyant অবস্থার যাবতীয় প্রত্যক্ষও স্থান পায়; সমাধিস্থ যোগী হইতে religious enthusiastদের সমুদায় vision, এমন কি, credulous লোকদিগের miracle পর্য্যন্ত ইহার ভিতর স্থান পাইতে পারে। এই সত্যকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইবার কোন কারণ দেখি না। তবে, ইহার 'প্রাতিভাসিক' এই বিশেষণটা দিলে উভয় পক্ষের গণ্ডগোলের কোন অবসর থাকে না। নেশাখোর বা পাগল যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহাকেও এই হিসাবে প্রাতিভাসিক সত্য বলিলে সত্যের মর্য্যাদা কমিবে না। বস্তুতই সে যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহা তাহার পক্ষে নিজস্ব সত্য। সে সেই সত্যবিষয়ে কিছু মাত্র সন্দিহান নহে; অপরে যে তাহাকে মানে না, তাহাতে তাহারও দোষ নাই, অপরেরও দোষ নাই। সে নিজে যাহা দেখে, অপরের তাহা দেখিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। একে যাহা দেখে রাঙা, অন্যে তাহাকে নীলা দেখিলে, কোন তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায় মীমাংসা হইতে পারে না। তবে লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া অবজ্ঞা করে, বা নেশাখোর বলিয়া গালি দেয়, তাহার প্রধান কারণ এই যে—জীবন-যুদ্ধে তাহার পটুতা নাই, জীবন-যাত্রা চালাইতে সে পদে পদে ঠকিয়া যায়, এবং ইতরসাধারণের তুলনায় তাহারা সংখ্যায় অল্প। কিন্তু

এই অপরাধ তাহাদের একা নহে, এ অপরাধ অতি-বড় Geniusএর পক্ষেও বর্ত্তে;—তাঁহারাও এক রকমের পাগল, আজকালকার পণ্ডিতেরা তাহা বলিতেছেন। Geniusএরাও জীবন-যুদ্ধে অপটু এবং সংখ্যায় অল্প। পৃথিবীতে যদি এই পাগলের সংখ্যাই অধিক হইত, তবে তাহাদেরই প্রত্যক্ষ-প্রমাণের সাক্ষ্যের average করিয়া বৈজ্ঞানিককে তাঁহার আলোচ্য জগৎ গড়িতে হইত; এবং তাহাই মানিয়া অগত্যা সর্ব্বসাধারণকে চলিতে হইত। যে না মানিত, সে-ই সেখানে পাগল বলিয়া গণ্য হইত। আমরা প্রকৃতিস্থ বলিয়া এখন বড়াই করি; কিন্তু ন্যাংটার দেশে কাপুড়ের মত আমাদের দশা দেখিয়া তখন সকলে হাসিত। তাহাদের বিজ্ঞান-বিদ্যা যে জগৎকে সত্যজগৎ বলিত, সেই জগতে আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মগুলা নিশ্চয়ই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের নিয়মগুলার সঙ্গে মিলিত না। তৎসত্ত্বেও সেই নিয়মগুলাই তখন ব্যাবহারিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইত, এবং তাহার সত্যতা বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিলে, তখনকার বৈজ্ঞানিকেরা লাঠি বাহির করিতেন। বর্ত্তমান পৃথিবীতে যে তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে, তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় তাহারা জীবন-সমরে পটু নহে; পৃথিবীর Course of Evolutionই তাহার জন্য দায়ী—কতকগুলা succession of accidents তাহার জন্য দায়ী। পৃথিবীর হাওয়ার মধ্যে যদি Carbonic Acidএর মাত্রা একটু অধিক হইত, আর Nitrogenএর মাত্রা একটু কম হইত, তাহা হইলে তাহারাই হয়ত তাৎকালিক Environmentএর সহিত লড়াই করিয়া জীবন-সমরে জয়ী হইত, তাহাদেরই সংখ্যা তখন অধিক হইত; আমরাই তখন minorityতে পড়িতাম ও জীবন-যুদ্ধে হঠিতাম—তাহারাই আমাদিগকে পাগল ও অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া টিট্‌কারি দিত। এ পৃথিবীতে তাহারা দৈবক্রমে জয়ী হয় নাই; অন্য কোন Planetএ কে জয়ী, তাহা কে জানে?

ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ

বিজ্ঞান-বিদ্যায় আলোচ্য বাহ্য জগতের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম। সন্ধানে চলিয়া দুই রকমে জগতের সন্ধান পাইয়াছি। একটা হইল, ব্যাবহারিক জগৎ অর্থাৎ কাজ-চালান জগৎ। আর একটা হইল, প্রত্যক্ষ বা প্রাতিভাসিক জগৎ,—পৃথিবীর অধিকাংশ লোকে অর্থাৎ যাহাদিগকে ইতর-সাধারণ বলা যায়, সেই মোটা শ্রেণীর মোটা চরিত্রের লোকে জীবনের কাজ চালাইবার জন্য এই ব্যাবহারিক জগৎকে মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়। পৃথিবীতে ইহাদের সংখ্যাই অধিক; কেন না, উহারাই পৃথিবীতে মোটের উপর successful অর্থাৎ জীবন-সমরে সফল। সফল বলিয়াই ইহাদিগকে প্রকৃতিস্থ বলা যায়। প্রকৃতিস্থ বলিবার আর কোন মানে নাই। প্রকৃতিদেবী যেন ইহাদিগকেই বাছাই করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃতিদেবীর লক্ষ্যই ইহাই; যাহারা সেই লক্ষ্য হইতে অধিক দূরে ছটকিয়া পড়িয়া জীবন-সমরে সমর্থ না হয়, তাহারা বড়ই হউক আর ছোটই হউক, তাহাদিগকে এই কারণেই অপ্রকৃতিস্থ বলা হয়। পৃথিবীর জল হাওয়া অন্যরূপ হইলে তাহারাই হয়ত জীবন-সমরে সমর্থ হইয়া টিকিয়া যাইত; তাহাদেরই সংখ্যা তখন অধিক হইত এবং তাহারাই তখন প্রকৃতিস্থ বলিয়া গণ্য হইত। বর্ত্তমান পৃথিবীতে তাহারা যে প্রকৃতিস্থ বলিয়া গণ্য হয় না, তাহা তাহাদের দোষ নহে, বর্ত্তমান পৃথিবীর আবহাওয়ার দোষ। যাহাই হউক, বর্ত্তমান পৃথিবীতে জীবনযাত্রাকর্ম্মে তাহারা অক্ষম ও অপটু। যাহারা মাঝারি রকমের মানুষ বলিয়া বর্ত্তমান পৃথিবীতে জীবনযাত্রায় পটু, অতএব যাহারা সংখ্যায় অধিক, তাহারা পরস্পর আদান-প্রদানের জন্য, পরস্পর ব্যবহারের জন্য, পরস্পর ব্যবহারে জীবনের কাজ চালাইবার জন্য, যে কাজ-চালান রকমের জগৎটা মানিয়া লয়, তাহাই সেই কাজ-চালান বা ব্যাবহারিক জগৎ। কিন্তু এই প্রকৃতিস্থ লোকগুলিরও প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ experience সমান নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটু-না-একটু বিশিষ্ট ভাব আছে, একটু-না-একটু personal equation আছে। একের experience ঠিক অন্যের experience-এর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মেলে না। এই জন্য প্রত্যেককে নিজের স্বতন্ত্রতা কিছু-না-কিছু ছাঁটিয়া ফেলিতে

হয়। যেটুকু প্রত্যেকের বিশিষ্ট বা নিজস্ব, সেটুকুকে বর্জ্জন করিয়া, যেটুকু সকলের পক্ষে common বা সাধারণ, সেইটুকুকেই সর্ব্বজনসম্মতিক্রমে মানিয়া লইতে হয়। ব্যাপারটা ঠিকই যেন ভোটের ব্যাপার; অধিকাংশ লোকে ভোট দিয়া যেটাকে সত্য সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে, সেইটাকেই মানিয়া চলিতেছে। অথবা ইহা যেন conventionএর ব্যাপার; অর্থাৎ সকলে মিলিয়া মিশিয়া, mutual agreementএর দ্বারা আপাততঃ ইহাকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যাক, এইরূপ একটা সংকল্প বা resolution করিয়া লইয়াছে; অতএব আপাততঃ ইহাই সত্য। নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জন করিয়া, এই common experienceটুকু লইয়া যে জগৎ গড়া হয়, সেই সর্ব্বসাধারণের জগৎই এই ব্যাবহারিক জগৎ। সকলে মিলিয়া মিশিয়া যদি এই সাধারণ জগতের অধীনতা স্বীকার না করিত, যদি প্রত্যেকেই আপনার বিশিষ্ট নিজস্ব experienceএর দোহাই দিয়া, তাহাকেই সত্য বলিয়া অন্যের সহিত আদান-প্রদান করিতে চাহিত, তাহা হইলে পরস্পরের বিসম্বাদের অন্ত হইত না। পরস্পর লাঠালাঠি করিয়া ধরাধাম হইতে লুপ্ত হইত; কেন না, কাহারও প্রত্যক্ষ experienceএর সহিত অপরের প্রত্যক্ষ experienceএর মিল হইত না। এক জন যেখানে বলিত—"হাঁ," অন্যে সেখানে বলিত—"না"। একের ভাষা অন্যে বুঝিত না; একের প্রশ্নে অন্যে উত্তর দিতে পারিত না। পরস্পর কাটাকাটি করিয়া সকলেই মরিত, অথবা পরস্পরের সাহায্য না পাইয়া সকলে মরিত; তাহাদের বংশে বাতি দিতে কেহ থাকিত না। সেই জন্যই বুঝি, প্রকৃতিদেবী দয়া করিয়া, তাহাদিগকে আপনার স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া, এই সর্ব্বসাধারণের common experienceটাকে মানিয়া চলিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন। প্রবৃত্তি দিয়াছেন বলিয়াই তাহারা বাঁচিয়া আছে; অথবা যাহারা দৈবক্রমে এই প্রবৃত্তি পাইয়াছে, তাহারাই বাঁচিয়া যাইতেছে। তাহাদেরই বংশ থাকিতেছে। আর যাহারা আপনার স্বাতন্ত্র্যটুকু পরিহার করিতে চায় না, তাহারা ছট্‌কিয়া পড়িয়া পাগলের ও ভাবুকের খ্যাতি পাইতেছে। অতএব এই জনসাধারণের, এই পনর আনার স্বীকৃত জগৎই ব্যাবহারিক জগৎ। জীবনযাত্রায় না মানিলে চলে না বলিয়া ইহা ব্যবহারতঃ সত্য। বিজ্ঞান-বিদ্যা এই জগতেরই আলোচনা করেন এবং এই জগতের আলোচনা করেন বলিয়াই জীবনযাত্রা-বিষয়ে বিজ্ঞান-বিদ্যার এই আশ্চর্য্য সফলতা।

জীবনযাত্রা-বিষয়ে বিজ্ঞান-বিদ্যার আদেশই চূড়ান্ত আদেশ। এই আদেশ যিনি না মানিবেন, তাঁহাকে জীবনযাত্রায় ঠকিতে হইবে। বিজ্ঞান-বিদ্যার বলে মানুষ যে বাহ্য জগতের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতেছে, সেই প্রভুত্বলাভের গোড়ার কথা এই। এই প্রভুত্বলাভের মূলে একটা অধীনতাস্বীকার আছে। নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বর্জ্জন করিয়া, নিজের প্রত্যক্ষকে অমান্য করিয়া, পরের প্রত্যক্ষকে মানিয়া লওয়াতেই এই অধীনতা। এই যে ব্যাবহারিক জগৎ, যাহা আমার নিজস্ব নহে, যাহা সর্ব্বসাধারণের এবং ইতর-সাধারণের, আমাকে প্রাণের দায়ে তাহাকেই মানিয়া লইতে হয়, এবং তাহারই অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। যাহাকে বাহ্য জগতের উপর প্রভুত্ব বলা হয়, সেই প্রভুত্বের মত দাসত্ব আর কিছুই নাই। এ কেবল নিজের দাসত্ব নহে, পরের দাসত্ব; ছত্রিশ কোটি ইতর অন্ত্যজ লোকের দাসত্ব। ছত্রিশ কোটি ইতর লোকের গরজে বাধ্য হইয়া যাহা মানিতে হয়, তাহারই দাসত্ব। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহার নাম বন্ধন। দেখা গেল, এই যে common experience, সেটার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই। বৈজ্ঞানিকেরা ছত্রিশ কোটি মাঝারি মানুষের প্রত্যক্ষের average কষিয়া একটা কাল্পনিক জগৎ খাড়া করেন, সেইটাকেই এই ব্যাবহারিক জগতের স্বরূপ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ইহাই সেই কাল্পনিক Normal Manএর বা Mean Manএর জগৎ;—যে মানুষটার অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল না, নাই বা হইবে না। এই কাল্পনিক জগতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলাই জীবনরক্ষার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায়। সর্ব্বসাধারণের experienceই তাহা বলিতেছে। এই কাল্পনিক জগতের অনুবর্ত্তনই যদি প্রভুত্ব হয়, তাহা হইলে দাসত্ব আর কাহাকে বলা যাইবে! কোনও শিকলের বন্ধন এই বন্ধনের চেয়ে কঠিন হইতে পারে না। এই বন্ধনকে আমরা নিয়মের বা নিয়তির বন্ধন বলি। বৈজ্ঞানিকের কল্পিত সেই ব্যাবহারিক জগতে নিয়মেরই বন্ধন, নিয়মেরই রাজত্ব! তাহা ত হইবেই; কেন না, গোড়াতেই যখন আমরা স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জন করিয়া, একমত হইয়া, একটা convention মানিয়া চলিব, ইহা স্থির করিয়া লইয়াছি, তখন এই বন্ধন ত থাকিবেই। কোন সভার সভ্যেরা সভার কাজ চালাইবার জন্য অধিকাংশের ভোটে কতকগুলি নিয়ম রচনা করেন ও আপনাদের রচিত ও প্রতিষ্ঠিত নিয়ম মানিয়া চলেন, এও কতকটা সেইরূপ। নিজেরাই যখন একটা নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই নিয়ম মানিয়া

চলিতেছি, তখন সে নিয়ম ত থাকিবেই। সে নিয়ম কোথা হইতে আসিল, তাহা নিরূপণের জন্য দিশাহারা হইবার প্রয়োজন কি? সভার নিয়ম দেখিয়া কোন সভ্য ত এরূপ বিস্মিত হন না! এই যে নিয়তি, এই যে Uniformity in Nature, ইহার বন্ধন স্বীকার না করিলে জীবনযাত্রাই চলিত না। জীবনযাত্রা চালাইবার জন্যই Natureএর uniformity মানিতে হয়, অথবা Natureকে uniformরূপে দেখিতে হয়। জীবনযাত্রা চালাইবার জন্যই আমাদের বিজ্ঞান-বিদ্যা যে ব্যাবহারিক জগৎকে খাড়া করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেই ব্যাবহারিক জগতে যদি uniformity না দেখিতাম, অথবা দেখিবার ক্ষমতা না থাকিত, অথবা দেখিবার প্রবৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে কিরূপে জীবনযাত্রা সম্ভব হইত, কিরূপে পরস্পরের সহিত কারবার করিতাম? কিরূপে কালিকার ব্যবস্থা আজি করিতাম? ফলে, বৈজ্ঞানিকের বাহ্য জগতে নিয়মের বন্ধন না দেখিলে আমাদের চলিতই না। বাহ্য জগতে নিয়মের বন্ধন আছে, এই বলিয়াই আমাদের জীবনযাত্রা চলিতেছে, এমন কথা আমি বলিব না। বরং আমি বলিব,—আমাদের জীবনযাত্রা চালাইবার জন্যই আমরা নিয়মের বন্ধন দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। আমরাই মিলিয়া মিশিয়া আমাদেরই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়মের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। নিজের হাতে এই লোহার শিকল গড়াইয়া, নিজের পায়ে পরাইয়া, নিজের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়াছি।

এই যে Uniformity, এই যে নিয়তি, ইহাকে Causality বলা হয়। ব্যাবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনা কার্য্যকারণ-সম্পর্কের শিকলে আবদ্ধ দেখা যায়। এই Causalityর—এই সম্পর্কের নামান্তর Determinism। ইহা যেন একেবারে বাঁধা-ধরা কাটা-ছাঁটা রহিয়াছে। ইহা আছে বলিয়াই আমরা অতীতের অভিজ্ঞতার বলে ভবিষ্যৎ ঘটনার গণনা করিতে পারি। কাল কিরূপে কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আজ সেইরূপে সেই ঘটনা হইবে, ইহা নিশ্চিত গণিয়া দিতে পারি। যাবতীয় ঘটনাকে একটা formulaর, বা কতকগুলি formulaর ভিতর ফেলিতে পারি। Formulaর ভিতর ফেলিতে না পারিলে গণনা অসাধ্য হয়। বিজ্ঞান-বিদ্যা ব্যাবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনাকে এইরূপ কতকগুলি formulaয় ফেলিয়া গণনা-কর্ম্মে অগ্রসর হন। বিজ্ঞান-বিদ্যার ইহাই কাজ। Astronomy বা জ্যোতিষ-বিদ্যা তাহার প্রধান সাক্ষী। অন্যান্য বিজ্ঞানও সেই কার্য্যে ব্যাপৃত

আছেন ; কেবলই formulaয় ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন। যেখানে ঘটনা-পরম্পরা অত্যন্ত জটিল দেখায়, সেইখানে হয়ত formula এখনও বাহির করিতে পারেন নাই ; কিন্তু প্রয়াস কেবলই সেই দিকে। যাবতীয় ঘটনাকে কোন-না-কোন দিন একটা ছোট formulaয় ফেলিব, এই চরম লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া বিজ্ঞান-বিদ্যা চলিতেছেন। ফলে তিনি গোড়ায় মানিয়া বসিয়া আছেন যে, তাঁহার ব্যাবহারিক জগৎটা fully determinate। ইহার কোন স্থানে কোনরূপ freedomএর স্থান নাই। আজিকার অবস্থা যদি সম্পূর্ণভাবে জানা থাকে, তাহা হইলে কালিকার অবস্থা কি হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া গণিতে পারিব। এখন যে গণিতে পারি না, সে কেবল বিজ্ঞান-বিদ্যার অপূর্ণতা মাত্র ; কিন্তু গতি পূর্ণতার দিকে : এই পূর্ণতা যদি কখন পাওয়া যায়, তাহা হইলে কোটি বৎসর পরের ঘটনা এখনই গণা চলিবে। এই যে determinism, এই যে causal connection, এই যে নিয়তি, ইহা অবশ্যম্ভাবী necessary বটে কি না, ইহা দর্শন-শাস্ত্রের একটা তুমুল সমস্যা। Humeএর সময় হইতে অথবা তাহারও পূর্ব্ব হইতে আজি পর্য্যন্ত ইহার সমাধানের চেষ্টা হইতেছে। কোন নূতন সমাধান দিবার ধৃষ্টতা আমার নাই ; তবে ব্যাবহারিক জগতের যে সংজ্ঞা বা definition দিবার চেষ্টা করিলাম, তাহাতে এই সমাধানের পক্ষে একটা নূতন attitude হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। এই নিয়মের বন্ধন necessary এই অর্থে যে, ইহাকে না মানিলে আমাদের জীবনযাত্রা চলিত না। এই নিয়তি আছে, ইহা আমরা মানিয়া লই ; এই নিয়তি আমরা দেখিতে চাই ও আমরা দেখিতে পাই। এই নিয়তি দেখিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি। প্রাণের দায়ে অভ্যস্ত হইয়াছি ; এই অর্থে ইহা necessary। এই necessityকে সত্য বল, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ইহা একটা ব্যাবহারিক সত্য, একটা pragmatic truth. বর্ত্তমান পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায়, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির বা intelligenceএর বর্ত্তমান অবস্থায়, এইরূপ মানিয়া লওয়াতে বর্ত্তমান ধরণে জীবনযাত্রা চালান সম্ভব হইয়াছে ; তাই আমরা উহাকে মানিয়া চলিতেছি। না মানিলে এখন যেন জীবনের গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়। না মানিলে কিরূপে চলিত, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি না। কিন্তু ইহার অধিক বলা চলে না। অন্য পৃথিবীতে, বা বর্ত্তমান পৃথিবীর অন্য অবস্থায় আমাদিগকে অন্যরূপ truth মানিয়া

চলিতে হইত না, ইহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তখনকার pragmatic truth কিরূপ হইত, তাহা এখন আমাদের কল্পনার অতীত। এখনকার যাহা বন্ধন, তখনকার তাহা বন্ধন হইত কি না, কে জানে? এখন আমরা যে ব্যাবহারিক জগতের কল্পনা করি, তখনকার ব্যাবহারিক জগৎ সেইরূপ হইত কি না, কে জানে? এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা যাহা সত্য বলিয়া মানিতেছেন, তখনকার বৈজ্ঞানিকেরা তাহা সত্য বলিতেন কি না, কে জানে? এখন আমরা অধিকাংশের ভোট লইয়া যে সংকল্প করিয়াছি, তখনকার অধিকাংশের ভোটে সেই সংকল্প কি মূর্ত্তি ধারণ করিত, কে বলিতে পারে? বর্ত্তমানের ব্যাবহারিক জগৎটাই যদি বর্ত্তমান কালের ইতর-সাধারণের কাজ চালাইবার জন্য একটা মন-গড়া কাল্পনিক জগৎ হয়, তাহা হইলে সেই কাল্পনিক জগতের মধ্যে যে নিয়তির বন্ধন দেখিতে পাই, সেই বন্ধন, তখনকার জগতে কিরূপে কি মূর্ত্তিতে থাকিত, অথবা আদৌ থাকিত কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

আমি যাহাকে প্রাতিভাসিক জগৎ বলিয়াছি, তাহাকে এই ব্যাবহারিক জগতের পাশে রাখিয়া উভয়ের তুলনা করিলে ঐ Law of Causality আমাদের পক্ষে necessary কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে একটা নূতন point of view পাওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেকে যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহাই তাহার পক্ষে প্রাতিভাসিক জগৎ। এ কথা বোধ হয় খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই যে, আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা কতকগুলি feelings ও sensationsএর সমষ্টি মাত্র। Feeling এই সাধারণ নামটিই ব্যবহার করা যাউক। Feeling ভিন্ন আর কিছু আমাদের প্রত্যক্ষ বিষয়, অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়, আমাদের immediate perceptionএর বিষয় হইতে পারে না। যাহাকে জড় জগৎ বা বাহ্য জগৎ বলি, তাহাও রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ, এই কয়টা feelingরূপেই আমাদের প্রত্যক্ষ হয়। এ বিষয়ে কথা-কাটাকাটির কোন প্রয়োজন দেখি না। Bain সাহেব এইগুলিকেই object properties বলিয়া ধরিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে যেগুলি সর্ব্বসাধারণের common experience, তাহাকেই Objective বা Material Worldএর উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন organic sensations, appetites এবং emotions প্রভৃতিকে তিনি subject properties বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এগুলাও মানস-প্রত্যক্ষের

বিষয়। মনে হয়, ইহারা ভিতরের জিনিস, বাহির হইতে ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া যেন ইহারা আসে না। সেই জন্য ইহাদিগকে লইয়া একটা Subjective World বা অন্তর্জগৎ তৈয়ার করা চলিতে পারে, যাহা বহির্জগৎ হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক্। প্রকৃতপক্ষে উভয় জগৎই যখন প্রত্যক্ষ বিষয়, তখন উভয়কেই প্রাতিভাসিক জগতের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে; ব্যাবহারিক জগৎটা সম্পূর্ণভাবে ষোল আনা বাহ্য জগৎ বলিয়া গৃহীত হয়, কিন্তু প্রাতিভাসিক জগতের কতকটা মানস-প্রত্যক্ষ অন্তর্জগৎ, আর বাকীটা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বাহ্য জগৎ। ব্যাবহারিক এবং প্রাতিভাসিক, এই দুই জগতের তুলনা করিতে গিয়া প্রাতিভাসিক জগতের যে অংশটা মানস-প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যে অংশটাকে অন্তর্জগৎ বলি, তাহার কথা না তুলিলেও চলে। তুলনার জন্য প্রাতিভাসিক বহির্জগৎ এবং ব্যাবহারিক বহির্জগৎ, এই উভয়কে পাশাপাশি স্থাপন করা যাউক। এখন হইতে প্রাতিভাসিক জগৎ বলিতে সেই প্রাতিভাসিক বহির্জগৎই বুঝিব; কেন না, Physical Science বহির্জগতেরই আলোচনা করে, অন্তর্জগতের সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাহে না। এই প্রাতিভাসিক বহির্জগৎ প্রত্যেকের নিকট রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দরূপে উপস্থিত হয়। অতএব ইহাকে প্রত্যক্ষগোচর রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-সমষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। আমাদের বোধ হয়, এই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ যেন আমাদের বাহির হইতে আসিতেছে। আমরা যখন প্রকৃতিস্থ থাকি, তখন ত এইরূপ বোধ হয়ই; যখন নেশার ঝোঁকে, রোগের তাড়নায় বা ভাবুকতার মোহে অপ্রকৃতিস্থ থাকি, তখনও বোধ হয়, ইহারা বাহির হইতেই আসিতেছে। এমন কি, স্বপ্নাবস্থায় বা clairvoyant অবস্থায় রূপ-রসাদি যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয়, তাহাও একটা বহির্দ্দেশ হইতে আসিতেছে, এইরূপই বিশ্বাস থাকে। যখন কোন ব্যক্তি কোন apparition দেখেন, তখন সে apparitionটা বাহিরে আছে, ইহাই মনে হয়। কোন সাধু ভক্ত ভাবাবেশে যখন কোন vision দেখেন, কোন দেবতার বা ঈশ্বরের আবির্ভাব বা presence অনুভব করেন, তখনও বাহির হইতে আগত একটা রূপ দেখেন, বা শব্দ শুনেন, বা স্পর্শ অনুভব করেন। প্রকৃতিস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ, সুস্থ বা মুগ্ধ, যে কোন অবস্থায় এই শ্রেণীর যে কিছু প্রত্যক্ষ রূপ, রস, গন্ধ, যে-কোন ভাবেই আসুক, তখন তাহাদের বিশিষ্ট ভাব এই sense of out-ness; যাহা কিছু আসে, তাহা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ,

এইরূপ একটা-না-একটা feelingরূপেই আসে এবং যেন বহির্দ্দেশ হইতেই আসে। এইরূপে যখন যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তখন তাহার মত সত্য বস্তু আর কিছু থাকে না। অন্যের পক্ষে তাহা সত্য হউক আর নাই হউক—যিনি যখন দেখেন, তখন তাঁহার নিকট তাহার মত সত্য কিছুই থাকে না। পরে হয়ত তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া, অপরের কথার উপর আস্থা করিয়া, আপনার প্রত্যক্ষের সত্যতায় সন্দিহান হন ; কিন্তু যখন এবং যত ক্ষণ উহা প্রত্যক্ষ থাকে, তখন এবং তত ক্ষণ উহার মত সত্য আর কিছুই থাকিতে পারে না। ফল কথা, প্রত্যক্ষের মত সত্য পদার্থ আর কিছুই নাই। অন্যে যাহাই বলুক, যিনি প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ মানেন না, তাঁহাকে ইহা বলিতেই হইবে। যদি কাহাকেও সত্য বলিতে হয়, যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই সত্য ; যাহা immediate perceptionএর বিষয়, তাহাই সত্য। আর এই feelingগুলাই যখন এক মাত্র প্রত্যক্ষ, এক মাত্র objects of immediate perception, তখন এইগুলিই সত্য। যিনি প্রত্যক্ষ দেখেন, যিনি অনুভবকর্ত্তা, তিনি কোন্ অবস্থায় আছেন, তাহা দেখিবার দরকারই নাই ; কেন না, তিনি প্রকৃতিস্থ কি অপ্রকৃতিস্থ, সুস্থ কি অসুস্থ, ইহা কেবল তাঁহাকে দেখিয়া নির্দ্ধারণ করা চলে না। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অবস্থার সহিত তাঁহার অবস্থা মিলাইতে হয়। যদি অধিকাংশ লোকের অবস্থার সহিত তাঁহার অবস্থা মেলে, তাহা হইলেই তাঁহাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ বলা যায় ; না মিলিলেই অসুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ বলা হইয়া থাকে। সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ বিশেষণের আর কোন মানেই নাই। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যাহা যখন প্রত্যক্ষ, তাহাই তখন সত্য এবং এই সত্যকেই প্রাতিভাসিক সত্য বলা হইতেছে। এই প্রাতিভাসিক সত্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব সত্য। অপরের সহিত ইহার মিল আছে কি না, তাহা জানিবার আপাততঃ দরকার নাই।

প্রকৃতিস্থ এবং অপ্রকৃতিস্থ, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোনরূপ line of demarcation বা সীমারেখা টানা চলে না। প্রকৃত পক্ষে সেই কল্পিত Mean Man, যিনি পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্যের কাল্পনিক average, তিনিই প্রকৃতিস্থ ;—আর সমুদয় জীয়ন্ত মানুষই তাঁহার তুলনায় কিছু-না-কিছু অপ্রকৃতিস্থ। সেই মাঝারি মানুষ হইতে কেহ অল্প দূরে, কেহ বেশী দূরে। যে যত দূরে, সে ততটা অপ্রকৃতিস্থ। প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রাতিভাসিক

জগৎ তাহার নিজস্ব এবং তাহার নিকট সত্য ; কিন্তু একের প্রাতিভাসিক জগতের সহিত অন্যের প্রাতিভাসিক জগৎ সম্পূর্ণ মিলিতে পারে না। প্রত্যেকের প্রাতিভাসিক জগৎ স্বতন্ত্র ; অতএব পৃথিবীতে যত মনুষ্য, প্রাতিভাসিক জগতের সংখ্যাও তত। যাহাকে ব্যাবহারিক জগৎ বলিতেছি, তাহা যেন সেই বহুসংখ্যক প্রাতিভাসিক জগতের একটা কল্পিত average মাত্র। অতএব ব্যাবহারিক জগতের সংখ্যা এক মাত্র। বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ হইতেছে সেই average বাহির করা। বিজ্ঞান-বিদ্যায় যাহাকে art of observation বলে, তাহা সেই average বাহির করিবার উপায় মাত্র। খাঁটি average বাহির করিতে হইলে, পৃথিবীর দেড় শত কোটি বাসিন্দাকে হাজির করিয়া প্রত্যেকের সাক্ষ্য লইতে হয়; কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না। কার্য্যতঃ হাতের কাছে যে কয় জনকে পাওয়া যায়, সেই কয় জনকেই ডাকা হয় ; তাহাদের মধ্যেও আবার যাহারা average হইতে অধিক দূরে ছট্‌কিয়া পড়িয়া অপ্রকৃতিস্থ আখ্যা পাইয়াছে, তাহাদিগকে বর্জ্জন করা হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এইরূপেই মোটামুটি তাঁহাদের average বাহির করেন এবং সেই average অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের আলোচ্য ব্যাবহারিক জগৎ খাড়া করেন। এই ব্যাবহারিক জগৎ একটা conceptual জগৎ মাত্র ; উহা বৈজ্ঞানিকদের মন-গড়া, বৈজ্ঞানিকদেরই সৃষ্ট। প্রত্যক্ষ perceptual worldএ সে জগতের স্থান নাই। আর এই যে প্রাতিভাসিক জগৎ, তাহাই প্রত্যেকের perceptional world, প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ-লব্ধ জগৎ, প্রত্যেকের immediate perceptionএর উপলব্ধ জগৎ। যাহা প্রত্যক্ষ, তাহা বহু ; যাহা কল্পিত, তাহা এক মাত্র। মজা এই, আমরা সকলেই প্রত্যক্ষবাদী—প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ স্বীকারই করি না ; অথচ প্রত্যক্ষ-লব্ধ প্রাতিভাসিক জগৎকে সত্য না বলিয়া মনঃকল্পিত ব্যাবহারিক জগৎকেই সত্য বা real world বলিয়া থাকি। আর প্রত্যক্ষ জগৎ যেখানে সেই কল্পিত জগতের সহিত মেলে না, তখন বলি—এই না-মেলা মস্তিষ্ক-বিকারের ফল। আবার প্রত্যক্ষদর্শী যখন দেখেন যে, তাঁহার দৃষ্ট প্রত্যক্ষ জগৎ বৈজ্ঞানিকের কল্পিত ব্যাবহারিক জগতের সঙ্গে ঠিক মিলিতেছে না, এই জন্য বৈজ্ঞানিক তাহার অনুমোদন করিতেছেন না, পরন্তু তাঁহাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া গালি দিতেছেন, তখন তিনিও আপনার প্রত্যক্ষের বলে বলীয়ান্ হইয়া বৈজ্ঞানিককে পাল্‌টা গালি দিয়া থাকেন। উভয়ের মধ্যে

বিসম্বাদ, ইতিহাসের গোড়া হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে। আমি উভয়ের এই গণ্ডগোল মিটাইতে চাহি। উভয়কেই সত্য বলিব। প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ জগৎকে বলিব—প্রাতিভাসিক সত্য, আর বৈজ্ঞানিকের জগৎকে বলিব—ব্যাবহারিক সত্য; আরও বলিব, প্রত্যক্ষ প্রাতিভাসিক জগতের সংখ্যা বহু, আর কল্পিত ব্যাবহারিক জগৎ একটা মাত্র।

বৈজ্ঞানিক যে নিজের ব্যাবহারিক জগৎকেই সত্য জগৎ বলেন, ইহাকেই মানিয়া চলেন এবং অন্যকেও মানিতে বলেন, অন্যের প্রাতিভাসিক জগৎকে তাঁহার ব্যাবহারিক জগতের অসম্পূর্ণ, বিকৃত বা distorted প্রতিকৃতি মাত্র বলেন, তাহারও কারণ বেশ বুঝা গেল। প্রাতিভাসিক জগতে যখন মানুষে মানুষে মিল নাই, তখন প্রত্যেকেই যদি আপন প্রাতিভাসিক জগতে ভর দিয়া কর্ম্ম করিতে যায়, তাহা হইলে কর্ম্ম পণ্ড হয়। কর্ম্ম মাত্রই আদান-প্রদান, এবং এইরূপ স্বাতন্ত্র্য লইয়া আদান-প্রদানের এক মাত্র ফল পরস্পর লাঠালাঠি। কাজেই সকলে মিলিয়া মিশিয়া কর্ম্মের জন্য, আদান-প্রদানের জন্য, ব্যবহারের জন্য, জীবনযাত্রার জন্য, আপন আপন স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জন করিয়া, আপন আপন জগৎকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া, সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য এই ব্যাবহারিক জগতের সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং সর্ব্বতোভাবে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে—সেই আনুগত্যের বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে। সেই সাধারণ জগৎকে নিয়মানুগত, শৃঙ্খলাযুক্ত—কার্য্য-কারণ-পরম্পরার শিকলে বদ্ধরূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। দায়ে পড়িয়া জীবন রক্ষার্থ যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে, তাহাই causality; তাহাই নিয়তি; তাহাই Uniformity of Nature;—ইহা ছাড়িয়া Uniformity of Natureএর আর কোন অর্থ নাই।

এই কল্পিত ব্যাবহারিক জগতেই নিয়মের প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে। প্রাতিভাসিক জগৎ যখন ব্যাবহারিক জগতের সহিত ষোল আনা মেলে না, তখন প্রাতিভাসিক জগতে নিয়ম থাকিতে পারে না, অন্ততঃ ষোল আনা নিয়ম থাকিতে পারে না। কতকটা হয়ত regular, uniform, নিয়মবদ্ধ দেখা যাইতে পারে; কিন্তু খানিকটা সেই নিয়মের অধীন থাকিবে না। আর নিয়ম পদার্থ টাই এইরূপ যে, উহার কোথাও একটুকু আলগা দিলে সমস্তটাই আলগা হইয়া যায়। যে নিয়ম ষোল আনাই পূর্ণ, সেই নিয়মই নিয়ম; তাহাই নিয়তি; তাহাই determinism; আর যাহা পৌনে ষোল

আনা নিয়ম, যাহার কোন জায়গায় একটুকু ফাঁক আছে, তাহাকে নিয়তি বলা যায় না, তাহা determinism নহে। এক ফোঁটা অম্লরসে সমস্ত খাঁটি দুধটাই নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই এই প্রাতিভাসিক জগৎ অথবা প্রত্যক্ষ জগৎ কাহারও পক্ষে নিয়মবদ্ধ নহে। এখানে যদি কিছু নিয়ম থাকে, তাহার অস্তিত্ব কোন প্রকারেই necessary নহে। প্রাতিভাসিক জগৎ কেবল প্রত্যক্ষ পরম্পরা মাত্র—succession of phenomena মাত্র। সেখানে প্রত্যক্ষের পর প্রত্যক্ষ সারি বাঁধিয়া চলে,—পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নাই,—একটার পর একটা আসিতে কোনরূপে বাধ্য নহে। প্রত্যেকটা স্ব স্ব প্রধান; কেহ কাহারও ধার ধারে না; কেহ কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। এই stream of phenomenaর মধ্যে, এই succession of eventsএর মধ্যে, কোনরূপ regularity থাকে, ভালই;—কোনরূপ regularity থাকিতে বাধ্য বা থাকা উচিত, ইহা বলিতে পারা যাইবে না। একেবারে বৌদ্ধ দার্শনিকদের ক্ষণিকবাদে পৌঁছিতে হয়। প্রত্যেক ঘটনা ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেক প্রত্যক্ষ phenomenon আপনা হইতে আসে, আপনা হইতে যায়;—যাইবার সময় কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না; থাকিবার সময় কাহারও অপেক্ষা করিয়া থাকে না। এটার পর ওটা কেন আসে, তাহা কেহ জানে না; আসিতেই যে হইবে, ইহা জোর করিয়া বলা চলে না। কাহারও পক্ষে আসে, কাহারও পক্ষে আসে না। Empirical philosophyর পক্ষে psychological analysisএর ইহাই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। ইহার উপর কাহারও কোন কথা বলা চলিবে না। ব্যাবহারিক জগতের মধ্যে causal relationকে necessary বলিতে হয়, বল,—না হয়, না বল,—তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। বলিতে যে হয়, সে কেবল প্রাণের দায়ে; বলিতে যে হয়, সে for pragmatic reasons; কিন্তু প্রাতিভাসিক জগতে এই causal relation, নিয়তি, বা determinism, কোন প্রকারেই—কোন অর্থেই necessary বলা চলিবে না; কেন না, সেখানে এই uniformityর একেবারে অভাব। Humeএর অনুবর্ত্তী কোন দার্শনিকও বোধ হয়, ইহার অধিক কিছু বলিবেন না। আমার বোধ হয়, এই প্রাতিভাসিক জগৎ ও এই ব্যাবহারিক জগৎ,—এই উভয় জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্য্যায়ের পদার্থ, এই কথাটা খুব জোরের সহিত বলিবার সময় আসিয়াছে। এই প্রভেদটা ভাল করিয়া ধরা হয় না বলিয়াই বৈজ্ঞানিকে ও দার্শনিকে, দার্শনিকে ও দার্শনিকে, পণ্ডিতে

পণ্ডিতে ঝগড়া মিটিতেছে না। Causality লইয়া চিরন্তন ঝগড়াও মিটিতেছে না। প্রাতিভাসিক জগৎ যে এক পর্য্যায়ের জিনিস, এবং ব্যাবহারিক জগৎ যে অন্য পর্য্যায়ের জিনিস,—প্রাতিভাসিক জগৎটাই প্রত্যক্ষ perceptual জগৎ, এবং এই হিসাবে real জগৎ; এবং ব্যাবহারিক জগৎ প্রত্যক্ষের অগোচর, conceptual, unreal,—এক হিসাবে বৈজ্ঞানিকের কারখানা-ঘরে manufactured জগৎ, উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্যটুকু স্পষ্ট স্থাপনা করিলে, determinism এবং necessity সম্বন্ধে দার্শনিক-সাহিত্যের এই চিরন্তন গণ্ডগোলের একটা মীমাংসা মিলিতে পারে। ব্যাবহারিক জগৎটা বস্তুগত্যা একটা নিয়মবদ্ধ জগৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; উহাকে আমরা প্রাণের দায়েই নিয়মবদ্ধ দেখিতে বাধ্য হইয়াছি এবং সেই নিয়মের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেছি। উহার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে। উহার একটা ঘটনা দেখিয়া আর একটা ঘটনার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করি এবং প্রত্যাশায় থাকি। এইটার পর এইটা নিশ্চয়ই আসিবে, এই ভরসা করি। উহা যেন একটা যন্ত্র; তাহার চাকায় চাকায় বাঁধা আছে। একখানা চাকা ঘুরিলে যেন আর সকল চাকা ঘুরিতে বাধ্য আছে। একটা কাঁটা নড়িলে অন্য কাঁটা নড়িতে বাধ্য আছে। মিনিটের কাঁটা কতখানি ঘুরিলে ঘণ্টার কাঁটা কতটুকু চলিবে, তাহা আমরা fully expect করি; এই expectationএ নিরাশ হইলে আমরা দিশাহারা হই, জীবনের গ্রন্থি আলগা হইয়া যায়—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড টল্‌মল্ করিয়া উঠে,—সবই উলট্‌পালট্ বিপর্য্যস্ত হইবার আশঙ্কা হয়; কিসের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইব, আমরা তাহার ঠাওর পাই না। কিন্তু প্রাতিভাসিক জগতে এরূপ বাঁধাবাঁধি কিছুই নাই। ঘটনাগুলি পর-পর নিয়মমত আসে, তাও স্বস্তি; না আসে, তাও স্বস্তি। স্বপ্ন, hallucination, vision, apparition, miracle, যে যখন আসে আসুক, কাহারও কোন আপত্তি করিবার অধিকার নাই, কোনটাকেই অস্বীকারের উপায় নাই। যে যখন আসে, তাহাকে তখন তেমনই অবারিতদ্বারে স্বাগত করিয়া লইতে হয়। ব্যাবহারিক জগৎ যেন একখানা drama;—উহার একটা plot আছে, একটা end আছে, গোড়ায় একটা design আছে,—অঙ্কের পর অঙ্ক, একটা উদ্দেশ্য purpose লইয়া আসে, কেহই নিরর্থক আসে না। আর প্রাতিভাসিক জগৎ যেন একটা Epic poem; ঘটনাবহুল, বিচিত্র, উচ্ছৃঙ্খল; সর্ব্বত্রই একটা

উলট্‌পালট্‌, বিপর্য্যয় ও বিপ্লবের কাণ্ড। দেখিলে তাক্‌ লাগে; হাসিতে হয়; কাঁদিতে হয়; অভিভূত হইতে হয়; পুলকিত হইতে হয়;—কিন্তু কোথায় কি উদ্দেশে চলে, তাহা বলা যায় না। প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক জগতের এই পার্থক্য মনে রাখিয়া চলিলে জগতের অনেকগুলা হেঁয়ালি নূতন ভাবে নূতন রূপে দেখা যাইতে পারে, অনেক বিতণ্ডার অবসান হইতে পারে,—ইহাই ক্রমশঃ আমার ধারণা জন্মিতেছে। সে সকল কথা সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। তৎপূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকের কল্পিত ব্যাবহারিক জগতের সহিত আর একটু পরিচয় স্থাপন আবশ্যক হইবে। প্রাতিভাসিক জগৎ কোন্‌ মশলায় নির্ম্মিত, ব্যাবহারিক জগৎই বা কোন্‌ মশলায় নির্ম্মিত, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার হইবে। আপনাদের যদি ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়, আপনারা যদি অভয় দেন, তাহা হইলে আবার আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহসী হইব।

বাঙ্ময় জগৎ

প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক জগতের কথা বলিয়াছি। এ বার একটা তৃতীয় জগতের আবিষ্কার করিব। উহার নাম দিব—বাঙ্ময় জগৎ।

তৎপূর্ব্বে গোড়ার কথাগুলা আর এক বার আওড়াইয়া লওয়া যাক। আমরা প্রত্যেকেই এক-একটা জগতের মাঝখানে বসিয়া আছি এবং তৎকর্ত্তৃক অভিভূত হইতেছি। এই জগতের নাম দিয়াছি—প্রাতিভাসিক জগৎ। ইহা আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষলব্ধ। প্রত্যক্ষই যদি সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ হয়, তাহা হইলে প্রাতিভাসিক জগতের মত সত্য পদার্থ আর কিছু থাকিতে পারে না। ইহাকে যদি সত্য না বলি, তাহা হইলে সত্য কাহাকে বলিব, আমি জানি না। আমি যদি একাকী হইতাম, তাহা হইলে আমার এই প্রাতিভাসিক জগৎ লইয়াই আমাকে সকল কারবার করিতে হইত। আমি কিন্তু একা নহি; আমার মত আরও বহু জীব বর্ত্তমান আছে; তাহাদের সহিতও আমাকে আদান-প্রদান করিতে হয়। এই আদান-প্রদানের নাম জীবনযাত্রা। আমার মত অন্যেরও এক-একটা প্রাতিভাসিক জগৎ আছে। প্রত্যেকেই যদি স্বতন্ত্রভাবে আপনাপন প্রাতিভাসিক জগতের সহিত কারবার করিত, তাহা হইলে পরস্পরের আদান-প্রদান চলিত না—অর্থাৎ কাহারও জীবনযাত্রা চলিত না। পরস্পর আদান-প্রদানের জন্য সকলকে মিলিয়া মিশিয়া এইরূপ একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইয়াছে যে, প্রত্যেকের প্রাতিভাসিক জগতের অন্ততঃ কিয়দংশকে তুল্যরূপে একভাবে দেখিতে হইবে। ইহা একটা ব্যবস্থা মাত্র; আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য পরস্পর সম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত একটা convention মাত্র। প্রত্যেকের প্রাতিভাসিক জগৎ প্রত্যেকের নিজস্ব হইলেও উহার কিয়দংশকে আমরা অন্যের সহিত তুল্যরূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। প্রাতিভাসিক জগতের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশকে নিজস্ব না রাখিয়া সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। এই সাধারণ অংশটুকুর নাম দিয়াছি—ব্যাবহারিক জগৎ। পরস্পর আদান-প্রদানের জন্য—পরস্পর ব্যবহারের জন্য ইহাকে নির্দ্দিষ্ট রাখা হইয়াছে বলিয়াই ইহাকে বলা যাইতে পারে—ব্যাবহারিক জগৎ। এই ব্যাবহারিক জগৎকেই বাহ্য

জগৎ নাম দেওয়া হয়। মনে করা হয়, ইহা আমাদের সকলেরই বাহিরে আছে। বাহিরে থাকিয়া ইহা সকলকেই তুল্যরূপে অভিভূত করিতেছে।

এই বাহিরে-থাকা কথাটার আর একটু আলোচনা আবশ্যক। যাহার সহিত অন্যের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা সর্ব্বতোভাবে আমারই ; আমাকে ছাড়িয়া তাহার স্ব-তন্ত্র অস্তিত্বের কল্পনা একেবারে অনাবশ্যক : আমাকে লইয়াই তাহা আছে, অথবা তাহাকে লইয়াই আমি আছি ; অতএব তাহাকে বাহিরে মনে করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যাহা আমার নিজস্ব নহে, যাহা আমারও বটে—অপরেরও বটে, যাহা আমিও দেখি—অপরেও দেখে এবং তুল্যরূপে দেখে, যাহা আমাকে অভিভূত করে এবং অপরকেও অভিভূত করে এবং তুল্যরূপে অভিভূত করে, যাহার সহিত আমি কারবার করি এবং অপরেও কারবার করে এবং তুল্যরূপে কারবার করে, সে বস্তুটা সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি ; কাহারও নিজস্ব নহে। কাজেই মনে করিতে হয়, উহার স্ব-তন্ত্র স্বাধীন নিরপেক্ষ পৃথক্ অস্তিত্ব রহিয়াছে। উহা আমারও নহে, তোমারও নহে, অন্য কাহারও নহে। কাজেই উহা স্ব-প্রধান ও স্ব-তন্ত্র। উহা আমাদের সকলের হইতেই পৃথক্। উহা পৃথক্ থাকিয়া, স্ব-তন্ত্র থাকিয়া, আমাদের প্রত্যেকের উপরেই প্রভুতা-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে। আমি উহাকে যেমন ভাবে দেখিতেছি, তুমিও উহাকে সেইরূপ দেখিতেছ, রাম শ্যাম হরি সকলেই উহাকে সেইরূপ দেখিতেছে। আমরা যখন ছিলাম না, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও উহাকে সেইরূপ দেখিতেন ; এবং আমরা যখন থাকিব না, আমাদের পরবর্ত্তী পুরুষেরাও উহাকে সেইরূপ দেখিবেন। এইরূপ যখন ধরিয়া লওয়া হয়, তখন আপনা হইতেই এই ধারণা জন্মে যে, উহার অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্বের কোন অপেক্ষাই রাখে না। মনে হয়, উহার একটা নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। আমি থাকিলেও উহা আছে, আমি না থাকিলেও উহা থাকিবে। অতএব উহা আমার বা তোমার বা অন্যের কাহারও কোন অপেক্ষা না রাখিয়া, আপনা হইতেই আছে। যাহা সর্ব্বতোভাবে আমার নিজস্ব, তাহাকে আমি রাখিলেও রাখিতে পারি, নাশ করিলেও নাশ করিতে পারি। কিন্তু যাহা কেবল আমার নহে, যাহাতে অন্যেরও তুল্যরূপ ভাগ, তুল্যরূপ অধিকার, তুল্যরূপ সম্পর্ক আছে, তাহা আমার ইচ্ছায় থাকিবে না, আমার ইচ্ছায় যাইবেও না। সেইরূপ উহা তোমার ইচ্ছাতেও থাকিবে না বা যাইবে না। তুমি আমি চলিয়া গেলেও

তাহা অন্যের সম্পর্কে থাকিয়া যাইবে। কাজেই তাহার অস্তিত্ব নিরপেক্ষ অস্তিত্ব, স্ব-তন্ত্র অস্তিত্ব। প্রাতিভাসিক জগতের যে অংশকে আমরা এইরূপে সর্ব্বসাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহা—সেই অভ্যাসের ফলেই তোমার আমার এবং সর্ব্বসাধারণের নিরপেক্ষ, সকলের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা যখন সকলেরই, তখন উহা কাহারও নহে। এই যে স্বতন্ত্রভাবে, স্বাধীনভাবে, অন্যের নিরপেক্ষভাবে থাকা, ইহারই নাম বাহিরে থাকা। যাহা একান্ত ভিতরের, যাহা একান্তভাবে আমার, যাহার সহিত অন্যের কোন সম্পর্কই নাই, অন্যে যাহার কিছুই জানে না, অন্যে তাহাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া টানিয়া আনিতে পারে না; তাহা আমার অন্তরের সামগ্রীই রহিয়া যায়। আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখ-দুঃখের সহিত অন্যের কোন সম্পর্ক বা ভাগ নাই; অতএব উহা আমার অন্তরের সামগ্রী;—উহাকে বাহিরে রাখা হয় না। কিন্তু যাহা লইয়া সকলেই টানা-হেঁচড়া করিতে পারে, যাহাকে কেহই অন্তরের নিধি করিয়া রাখিতে পারে না, তাহাকেই বাহিরের জিনিস বলা হয়। আমার দৃষ্ট রূপ-রসাদির সহিত অপরের দৃষ্ট রূপ-রসাদির ঐক্য দেখিলেই ঐ রূপ-রসাদিকে বাহিরে মনে করিতে হয়। বাহিরে-থাকা কথাটার মানেই তাই। আমি বলিতে চাহি যে, আমাদের প্রত্যেকের প্রাতিভাসিক জগৎ প্রত্যেকের নিজস্ব হইলেও, প্রত্যেকের অন্তরের সামগ্রী হইলেও, উহার যে অংশকে আমরা পরস্পর ব্যবহারের জন্য সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া পৃথক্‌ভাবে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, যে অংশে আপনার স্বত্বটুকু ত্যাগ করিয়া তাহাকে সর্ব্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি, বা বিসর্গ করিয়াছি, বা বিসর্জ্জন করিয়াছি, বা ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছি, সেই অংশই এইরূপে বাহ্য জগৎরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

বেইন সাহেবের উক্তি লইয়া আমি আরম্ভ করিয়াছিলাম। বেইন সাহেবের উক্তি লইয়াই এখানে আমার উক্তি সমর্থন করিব। পূর্ব্বে যে উক্তি তুলিয়াছিলাম, তাহার একটু পরেই বেইন সাহেব বলিতেছেন,—"In order to distinguish what is common to all men from what is special to each, we ascribe separate and independent existence to the common element—the Object." অর্থাৎ নিজস্ব প্রত্যক্ষ হইতে সাধারণের প্রত্যক্ষটুকু প্রভেদ করিবার জন্যই আমরা সেই সাধারণ অংশটুকুতে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের আরোপ করি। বেইন সাহেব খুব

সাবধানে কথা কহিতেছেন। ঐ সাধারণ জগতের separate and independent existence আছে, ইহা না বলিয়া তিনি বলিতেছেন, "We ascribe separate and independent existence to the common element." ঐ অংশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, ইহা না বলিয়া তিনি বলিতেছেন, ঐ অংশে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমরা আরোপ করি। আমি আরও একটু সাবধানে কথা কহিতাম; in order to distinguish what is common to all, এরূপ না বলিয়া, আমি বলিতাম, in order to distinguish what we take to be common to all. আমি বলিতাম, প্রাতিভাসিক জগতের যে অংশটাকে আমরা সর্ব্বসাধারণের নিকট তুল্যরূপ বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইয়াছি, বা অভ্যস্ত হইয়াছি, সেই অংশটাতেই আমরা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আরোপ করি; তাহাকে আমাদের সকলের বাহিরে রাখিয়া তাহার বাহ্য জগৎ আখ্যা দিয়া থাকি। সেই অংশ বাহিরে আছে, এইরূপ আমি বলিব না। আমি বলিব যে, সেই অংশকে আমরা বাহিরে দেখি বা বাহিরে রাখি।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিক-সাহিত্যের একটা বিতণ্ডার কথা না তুলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনারা একজীববাদ ও বহুজীববাদ, এই দুইটি কথা শুনিয়া থাকিবেন। একজীববাদীরা বলেন, জগতে এক মাত্র জীব আছে এবং আমিই সেই এক মাত্র জীব; আর দ্বিতীয় জীব কেহ নাই। বহুজীববাদীরা এই উক্তিকে পাগলামি বলিয়া ভাবেন; এবং বলেন, সে আবার কি, আমি তুমি সকলেই ত তুল্যরূপ জীব; সকলেই ত তুল্যরূপে সুখী দুঃখী এবং ক্রিয়াপর। এখানে জীব শব্দের অর্থ—conscious being—চেতন পুরুষ; যে পুরুষ একটা objective world সম্মুখে রাখিয়া, তাহার সহিত আদান-প্রদান কারবার করে, সেই পুরুষ। একজীববাদ পাগলামি হউক, আর না-ই হউক, সে তর্কে এখন কাজ নাই। তবে একজীববাদী বলিয়া যে একটা মত আছে, তাহা আপনারা জানেন। কার্য্যতঃ আমরা সকলেই বহুজীববাদী। বহু জীবের অস্তিত্ব মানিয়াই আমরা জীবনযাত্রা চালাইতেছি। আমি যদি একজীববাদী হইতাম, অর্থাৎ আপনাদিগকে চেতন পুরুষ বলিয়া মানিয়া না লইতাম, তাহা হইলে এই উৎকট প্রসঙ্গ লইয়া অপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার কোন প্রয়োজনই হইত না। আপনারা যদি বলিয়া ফেলিতেন, আমাদের অস্তিত্বই যখন তুমি স্বীকার কর না, তখন আমাদের উপরে এই উৎপীড়ন কেন, তাহা

হইলে আমার গত্যন্তর থাকিত না। আপনারা অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিলে তাহাই সহিতে হইত। অতএব কার্য্যতঃ আমি বহুজীববাদী। আমিও যেমন চেতন, আপনারাও তেমনই চেতন, ইহা মানিয়া লইয়াই আমি আপনাদের সহিত কারবারে প্রবৃত্ত হইয়াছি।—আপনাদের সহিত আদান-প্রদান না করিলে আমার জীবনযাত্রা চলে না বলিয়াই আপনাদের সকলের সাধারণ সম্পত্তি এই বাহ্য জগৎকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছি। এই রূপ-রসাদি লইয়া আমিও যেমন কারবাব করি, আপনারাও ঠিক সেইরূপই কারবার করেন, ইহা দেখিয়াই এই রূপ-রসাদিকে স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ আমাদের সকলের বাহিরে আমি স্থাপন করিয়া লইয়াছি। আপনাদিগকে চেতন পুরুষ বলিয়া মানি, এই জন্যই আমাকে এই বাহ্য জগৎ স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমি না থাকিলেও যখন আপনারা উহার সহিত কারবার করিতে থাকিবেন, তখন উহার অস্তিত্ব আমার অপেক্ষা করিতে পারে না; উহার অস্তিত্ব স্বতন্ত্র, অতএব বাহ্য। আপনাদিগকে চেতন পুরুষ বলিয়া যদি স্বীকার না-ই করিতাম, আপনাদিগকে কেবল কলের পুতুল মাত্র ভাবিতাম,—পুত্তলিকার মত কর্ণ থাকিলেও আপনারা শুনিতে পান না, চক্ষু থাকিলেও দেখিতে পান না, এইরূপই আমার যদি ধারণা থাকিত,—এক কথায় আমি যদি একজীববাদী হইতাম, তাহা হইলে এই রূপ-রসাদিময় জগৎকে বাহিরে স্বীকার করা আমার পক্ষে আদৌ আবশ্যক হইত না। স্বপ্নদৃষ্ট রূপ-রসাদি যেমন অন্তরের সামগ্রী, ইহাও তেমনই অন্তরের সামগ্রী থাকিত। ফলে পৃথিবীতে যদি একটি মাত্র চেতন পুরুষ থাকিত, তাহা হইলে তাহার একটা জগৎ থাকিত, সন্দেহ নাই। নতুবা তাহাকে চেতন পুরুষ বলিতাম কেমন করিয়া? কিন্তু সেই জগৎ সর্ব্বতোভাবে ষোল আনায় তাহার নিজস্ব হইত; তাহার কিয়দংশ বাহিরে, কিয়দংশ অন্তরে, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু থাকিত না। তাহার ষোল আনাই প্রাতিভাসিক হইত, কোন ভগ্নাংশই ব্যাবহারিক হইত না। ব্যবহারই যখন থাকিত না, তখন ব্যাবহারিক জগৎ লইয়া সে কি করিত? আপনার প্রাতিভাসিক জগতের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সে 'I am monarch of all I survey' বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারিত। জাগরণে আর স্বপ্নে তাহার পক্ষে কোন প্রভেদ থাকিত না। আজকাল আমরা স্বপ্ন ভাঙ্গিলে অপরের সাক্ষ্য লইয়া স্থির করি—এটা আমার স্বপ্ন। হঠাৎ কোন apparition দেখিলে, অন্যের সাক্ষ্য লইয়া বলিতে পারি, ইহা একটা ভ্রান্তি

মাত্র, hallucination মাত্র। বলিতে পারি যে, উহা একটা subjective phenomenon, উহার কোন objective existence নাই। কিন্তু সেই এক মাত্র জীবের পক্ষে অন্যের সাক্ষ্য পাওয়া চলিত না। সাক্ষ্য দিবার জন্য কেহ যখন থাকিত না, তখন কিরূপে সে স্থির করিত, কোন্‌টা তাহার পক্ষে subjective, আর কোন্‌টা objective,—কখন্ তাহার স্বপ্ন, আর কখন্ তাহার জাগরণ? সমস্তটাই তাহার স্বপ্ন, অথবা সমস্তটাই তাহার জাগরণ হইত। উভয়ের মধ্যে সীমা-নির্দ্দেশ তাহার পক্ষে অসাধ্য হইত।

আপনারা বেদান্তদর্শন এবং সাংখ্যদর্শনের নাম শুনিয়াছেন। আপনারা আরও শুনিয়া থাকিবেন যে, বেদান্তদর্শন—একজীববাদী, আর সাংখ্যদর্শন—বহুজীববাদী। বেদান্ত বলেন, জীব এক বই দুই নয়;—আমিই এক মাত্র চেতন পুরুষ; তোমরা জীব নহ, জীবাভাস মাত্র। বেদান্তের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই বাক্যের আর কোন তাৎপর্য্য নাই। আপনাদের যদি উহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অন্যবিধ ধারণা থাকে, তাহা সমূলে উৎপাটন করুন। বেদান্ত যখন এক বই দুই জীব মানেন না, তখন বাহ্য জগতের প্রতি তাঁহার কিরূপ attitude হইবে, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিবেন। আর সাংখ্যদর্শন বহুজীববাদী,—তিনি বহু চেতন পুরুষ মানেন। কাজেই তিনি স্বতন্ত্র independent বাহ্য জগতের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকারে বাধ্য আছেন। বহু পুরুষ যখন বিদ্যমান, তখন তাহাদের সাধারণ সম্পত্তি কিছু থাকিলে, তাহা তাহাদের সকলের independent বা স্বতন্ত্র ত হইবেই। এই স্বাধীন নিরপেক্ষ বাহ্য জগতের স্বীকারে সাংখ্যদর্শন কাজেই বাধ্য। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন—'প্রকৃতি'। বহু পুরুষ যেখানে বর্ত্তমান, তখন তাহাদের সকলের জন্য স্বতন্ত্র প্রকৃতি ত থাকিবেই। সেই এক প্রকৃতি বহু চেতন পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তুল্যরূপে, অথবা প্রায় তুল্যরূপে, তাহাদের নিকট প্রতিভাত হয়। যত ক্ষণ তাহা কোন চেতন পুরুষের সম্মুখে থাকে না, তত ক্ষণ তাহার স্বরূপ-নির্ণয় অসাধ্য থাকে। তত ক্ষণ তাহার অস্তিত্ব থাকিলেও, সে অস্তিত্ব অব্যক্ত থাকে। যখন তাহা কোন চেতন পুরুষের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখন তাহা তাহার নিকট ব্যক্ত হয়। যে রূপ লইয়া সে চেতন পুরুষের সমীপে ব্যক্ত হয়, তাহাই তাহার ব্যক্ত রূপ। এখন আপনারা বুঝিবেন, সাংখ্যদর্শন কেন প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য, আর বেদান্ত বাধ্য নহেন। আমি যাহাকে বিজ্ঞান-বিদ্যা বলিয়া আসিতেছি,

তাহার standpoint এ বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের standpoint হইতে অভিন্ন। বিজ্ঞান-বিদ্যা কাজে-লাগান বিদ্যা, কর্ম্মের বিদ্যা, আদান-প্রদানের বিদ্যা, জীবনযাত্রায় সফলতা লাভের বিদ্যা। ইহাকে বহু জীব মানিয়া চলিতে হয়। বহু জীবের অস্তিত্ব postulate করিয়া লইতে হয়। কাজেই ইহাকেও বাহ্য জগতের অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়। সাংখ্যদর্শনও এক হিসাবে কাজে-লাগান বিদ্যা। দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি, সেই কাজ। বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজের মত মোটা কাজ না হইলেও, কাজ বটে। এই যে দুঃখ, ইহার অধিকাংশ অন্য জীবের সহিত আদান-প্রদান হইতে উৎপন্ন; জীবনযাত্রাই দুঃখময়; কাজেই সাংখ্যদর্শনকে দুঃখের উৎপাদক অন্য জীবকে মানিতে হইয়াছে। অতএব সাংখ্যদর্শনকে বাধ্য হইয়া বাহ্য জগৎকে বা প্রকৃতিকেও মানিতে হইয়াছে। সর্ব্বজীবের পক্ষে যাহা সাধারণ, তাহাই সেই বাহ্য জগৎ। সর্ব্বজীবের সাক্ষ্য লইয়া তাহার ব্যক্ত রূপ নির্ণয় করিতে বিজ্ঞান-বিদ্যা নিযুক্ত আছে। সর্ব্বজীবে একরূপ সাক্ষ্য দেয় না বলিয়া, অধিকাংশের সাক্ষ্য লইয়াই বিজ্ঞান-বিদ্যাকে তুষ্ট থাকিতে হয়। অব্যক্ত রূপ কেমন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ব্যক্ত রূপের নির্ণয়ের জন্য চতুষ্পার্শ্ব হইতে সাক্ষী ডাকিতে হয়, এবং সাক্ষীদের মধ্যে যাহারা খুব বড় এবং যাহারা খুব ছোট, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া, কেবল মাঝারি জীবের সাক্ষ্য লইয়া, তাহারই average কষিতে হয়।

পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, scientific observation ব্যাপারে এই মাঝারি মানুষের সাক্ষ্যই মাতব্বর। বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের সাক্ষ্যের কোন বিশিষ্ট মূল্য নাই। হয়ত কেহ প্রশ্ন করিয়া বসিবেন, তবে কি আমরা মাঝারি মানুষের সাক্ষ্য অনুসারে এখন হইতে বলিতে থাকিব যে, পৃথিবী সচলা নহে—অচল? দার্শনিক-সাহিত্যে আমাদের গুরুস্থানীয় পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধ পড়িয়া এইরূপ প্রশ্ন তোলায় আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছি। মনের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা কত কঠিন, তাহা ইহাতেই বুঝিতেছি। কোপার্ণিকস্ যখন সিদ্ধান্ত করেন যে, সূর্য্যটাই স্থির আছে, আর পৃথিবী তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমিতেছে, তখন দেশসুদ্ধ মাঝারি মানুষ তাঁহার কথায় হাসিয়াছিল। তথাপি আমি বলিব যে, observation ব্যাপারে, পর্য্যবেক্ষণ ব্যাপারে, কোপার্ণিকসের সাক্ষ্যের চেয়ে সেই সকল মাঝারি মানুষের সাক্ষ্যের দাম বেশী। বস্তুতই মাঝারি মানুষে

যাহা দেখে, কোপার্ণিকস্‌ও চর্ম্মচক্ষে তাহার অধিক কিছু দেখিতে পান নাই। সকলেই যেমন দেখে পৃথিবী অচল, তিনিও তাহাই দেখিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা একটা সিদ্ধান্ত, একটা থিয়োরি, তাহা observation নহে। উহা চর্ম্মচক্ষুর বিষয় নহে, উহা দিব্য চক্ষুর বিষয়। সে রকম চোখ লইয়া যে-সে লোক জন্মগ্রহণ করে না। এ-কালে বৈজ্ঞানিকদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সূর্য্য চলিতেছে, না পৃথিবী চলিতেছে, তাহা হইলে তাঁহারাও বলিবেন যে, ঐ প্রশ্ন লইয়া আমার মাথা ঘামাইবার কিছু মাত্র দরকার নাই। চলা, আর না-চলা—এই দুইটা কথার আমার কাছে বিশেষ কোন মানেই নাই। পৃথিবী স্থির আছেন, আর সূর্য্য গ্রহগুলিকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, অথবা সূর্য্যই স্থির আছেন আর পৃথিব্যাদি গ্রহগণ ভ্রমিতেছেন, আমার নিকট উভয় বাক্যই প্রায় তুল্যমূল্য। যাঁহারা Dynamics শাস্ত্র পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ঐ শাস্ত্রের আরম্ভেই সকল motionকে relative বলিয়া, সকল গতায়াতকে আপেক্ষিক বলিয়া ধরা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকের কার্য্য ভবিষ্যৎ গণনা। কোন্ গ্রহটাকে কখন্ আকাশের কোন্‌খানে দেখা যাইবে, ইহা বৈজ্ঞানিককে গণিয়া বলিতে হইবে। পৃথিবীকে স্থির ধরিয়া বৈজ্ঞানিক গণিতে পারেন, আবার সূর্য্যকে স্থির ধরিয়াও গণিতে পারেন। তবে সূর্য্যকে স্থির ধরিলে গণনাটা খুব সহজ হয়, আর পৃথিবীকে স্থির ধরিলে গণনাটা জটিল হয়,—এইটুকু যা প্রভেদ। পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া আমরা যখন আকাশের দিকে চাই, তখন মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগুলার যাতায়াতের জটিলতার যেন অন্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু কোপার্ণিকস্ যখন মনোরথে চড়িয়া আকাশ বাহিয়া সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই জটিলতা কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল। তখন দেখা গেল, ঐ জ্যোতিষ্কগুলি যেন সারি বাঁধিয়া, ঘানিগাছের গরুর মত আপনাপন নির্দ্দিষ্ট চক্রপথে চলিতেছে, উহাদের গতিবিধিতে কোন জটিলতা নাই। ফলে বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে সাধারণ লোকের প্রভেদ পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতায় নহে, কোথায় দাঁড়াইয়া দেখিতে হইবে, তাহার নিরূপণের ক্ষমতায়। বৈজ্ঞানিকও যেমন দেখেন, মাঝারি মানুষও তেমনই দেখে—সবল সুস্থ ইন্দ্রিয় থাকায় হয়ত বৈজ্ঞানিকের অপেক্ষা ভালই দেখে। কিন্তু কোথায় দাঁড়াইলে দেখিবার সুবিধা হইবে, সেটা মাঝারি মানুষে নিরূপণ করিতে পারে না, বৈজ্ঞানিক তাহা নিরূপণ করেন। মাঝারি

লোকের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তিনি একটা নূতন standpointএ তাহাকে দাঁড়াইতে বলেন ; এবং তার পর বলেন, 'দেখ দেখি, এখান হইতে তুমি কি দেখিতেছ ?' যেখানে-সেখানে দাঁড়াইলে ভূপৃষ্ঠের গোলত্ব বুঝা যায় না। বৈজ্ঞানিক মাঝারি মানুষকে সমুদ্রকূলে ডাকিয়া দূরে জাহাজের মাস্তুল পানে তাকাইতে বলেন ; তখন সে পৃথিবীর গোলত্ব বুঝিতে পারে। ইহা নূতন standpoint হইতে দেখার ফল। সেই নূতন standpointএর নির্দ্ধারণ বৈজ্ঞানিকের কাজ। ইহা observation নহে,—কোথা হইতে কিরূপে observe করিতে হইবে, তাহার নির্দ্ধারণ। ইহা ইন্দ্রিয়ের কাজ নহে, বুদ্ধির কাজ ; চর্ম্মচক্ষুর কাজ নহে, মানসচক্ষুর, এবং অনেক সময়ে দিব্য চক্ষুর কাজ। দাঁড়াইবার সেই জায়গা কোথায়, ইতরসাধারণে তাহার কোন সন্ধান রাখে না। বৈজ্ঞানিক কেবলই তাহার সন্ধানে রহিয়াছেন, এবং সন্ধান পাইলেই পথের পথিককে ধরিয়া আনিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া দেখিতে বলিতেছেন। পথের পথিক আপনার উদর পূরণের ব্যাপারেই ব্যস্ত আছে। বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্রাচার্য্যের মত সে আপনার বিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত। যাহাতে তাহার বিষয়কর্ম্মের সুবিধা না হয়, যাহাতে তাহার immediate interest কিছু নাই, তাহা দেখিবার জন্য সে বৈজ্ঞানিকের নির্দ্ধারিত standpointএ গিয়া সময় নষ্ট করিতে রাজি হয় না। বৈজ্ঞানিক তাহাকে ডাকিতে গেলে সে বিরক্ত হয়। বৈজ্ঞানিক যখন তাহাকে সেইখানে ডাকিয়া নূতন point of view হইতে নূতন দৃশ্য দেখাইতে যান, তখন হয় সে দিশাহারা হয়, অথবা গালি পাড়ে। অবশেষে বহু লোকে আসিয়া যখন এই নূতন স্থানে দাঁড়াইয়া নূতন দৃশ্য মানিয়া লয়, তখন সকলের দেখাদেখি সেও মানিয়া লইতে অভ্যাস করে। কোপার্ণিকস্‌ও সৌর জগৎ পর্য্যবেক্ষণের জন্য একটা নূতন standpoint আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কখন সেখানে দাঁড়ায় নাই। তিনি যখন সকলকে দাঁড়াইবার জন্য ডাক দিলেন, তখন সেখানে দাঁড়ান সকলের সাধ্য হইল না। কেন না, কোপার্ণিকস্‌ বলিলেন, পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া আকাশে তাকাইলে চলিবে না, সূর্য্যে দাঁড়াইয়া তাকাইতে হইবে। পৃথিবীর জীব, পৃথিবী ছাড়িয়া সূর্য্যে যাইতে সহসা সাহস করিল না। কাঠের রথ সেখানে পৌঁছে না,—মনোরথে সেখানে যাইতে হয়। হুকুম করিলেই এ রথ সকলের নিকট আসে না। কাজেই কোপার্ণিকসের সিদ্ধান্ত মানিতে মাঝারি লোকের এত কষ্ট হইয়াছিল।

এখনও যে মাঝারি লোকে উহা মানে, তাহা গুরু মহাশয়ের বা ছাপা বহির খাতিরে।

ফলে কোথা হইতে দেখিতে হইবে, বৈজ্ঞানিক তাহা নির্দ্ধারণ করেন। কিরূপ attitude হইয়া দেখিতে হইবে, তাহা নিরূপণ করেন,—কি ভাবে কিরূপে দেখিতে হইবে, তাহা নিরূপণ করেন। চর্ম্মচক্ষুতে যখন দেখিতে পায় না, তখন চোখের সামনে কাচের পরকলা লাগাইয়া দেখিতে বলেন। যন্ত্র-তন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া দর্শনের ইন্দ্রিয়গুলিকে সাহায্য করেন। আপনার observatory অথবা laboratoryর ভিতরে বসিয়া তিনি এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। এবং যখনই একটা নূতন attitude পাইয়া নূতন যন্ত্রের সাহায্যে নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইতেছেন, তখনই বাহিরে আসিয়া রাস্তার লোককে, পথের পথিককে, টানিয়া ঠেলিয়া ঘরে লইয়া যাইতেছেন এবং সেই নূতন দৃশ্য তাহাদিগকে দেখাইতেছেন—এবং কেমন দেখাইতেছে, তাহা তাহাদের মুখে শুনিতেছেন। এই শেষ কাজটুকু না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ থাকে। পথের পথিক আসিয়া সাক্ষ্য না দিলে তাঁহার আবিষ্কৃত কোন তত্ত্বই মঞ্জুর হইবে না। তিনি যত বড়ই উকীল হন, বিচারের ফল প্রথমতঃ সাক্ষীর হাতে এবং অবশেষে জুরির হাতে;—এবং এই সাক্ষী এবং জুরি, সকলেই মাঝারি মানুষ।

আপনারা কখনই মাঝারি মানুষ নহেন, আমিও কোনরূপ বৈজ্ঞানিকতার স্পর্দ্ধা করি না। তবে আমি বাহ্য জগতের আলোচনা করিতে গিয়া আপনাদিগকে একটা নূতন attitude লইতে বলিব। নূতন একটা standpointএ দাঁড়াইয়া নূতন একটা attitude লইয়া দেখিলে, কতকগুলা পুরাতন বাগ্‌বিতণ্ডার অবসান হইতে পারে,—ইহাই আমার বিশ্বাস। আমি বলিতে চাহি, আমরা সর্ব্বসাধারণে বহুজীববাদী; এবং আমাদের প্রত্যেকেরই এক-একটা নিজস্ব জগৎ আছে। ইহারই নাম দিয়াছি—প্রাতিভাসিক জগৎ। এই প্রাতিভাসিক জগৎ সংখ্যায় বহু। যত জীব, তত জগৎ এবং প্রত্যেকের জগৎ ভিন্নরূপ। হয়ত একের জগতের সহিত অন্যের জগতের কোন অংশেই মিল নাই। মিল থাকিলেও তাহা প্রতিপন্ন করা কঠিন। তবে আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য, পরস্পর কারবারের জন্য ধরিয়া লইয়াছি যে, এই সকল জগতের অন্ততঃ কিয়দংশ সকলের পক্ষেই একরূপ। সকলের পক্ষে যে অংশ একরূপ, সেই অংশ কাহারও নিজস্ব

হইতে পারে না। অতএব উহার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিয়াছে। সেই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমাদের কোন অপেক্ষা রাখে না। আমরা না থাকিলেও উহা থাকিবে। কাজেই উহা আমাদের বাহিরে আছে। অতএব উহা বাহ্য জগৎ। বৈজ্ঞানিকেরা এই বাহ্য জগতেরই বিবরণ দেন এবং ইহারই আলোচনা করেন। যাঁহারা বহুজীববাদী, তাঁহারা এই বাহ্য জগৎকে মানিয়া লইতে বাধ্য। বাহ্য জগৎ এই হিসাবে সত্য। এই সত্যকে আমি ব্যাবহারিক সত্য নাম দিয়া পুরাতন বিতণ্ডার মীমাংসা করিতে চাই।

বেইন সাহেবের text লইয়া আমি তাহার ভাষ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দেখিয়াছি যে, আমাদের প্রাতিভাসিক জগতের মধ্যে যেটুকু special to each, তাহাই subjective world এবং যেটুকু common to all, সেইটুকু objective world ; এবং এই উভয় অংশকে ভিন্ন করিতে গিয়া we ascribe separate and independent existence to the common element, that is, to the objective world.—বেইন সাহেব পরক্ষণেই বলিতেছেন, "In doing this, we are guilty of converting an abstraction into reality—the error of Realism."—অর্থাৎ বেইন সাহেবের মতে, এই বাহ্য জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার,—আমাদিগকে ছাড়িয়া আমাদের বাহিরে যে একটা জগৎ আছে, এইরূপ স্বীকার—একটা মস্ত ভুল,—একটা অধ্যায়,—যাহা যা-নয়, তাহাকে তাহাই বলা ; যাহা একটা abstraction মাত্র, একটা concept মাত্র, একটা মন-গড়া জিনিস মাত্র, তাহাকে real বলিয়া ভুল করা।

এই Realism কথাটার পিছনে মস্ত একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের অবতারণা এখানে করিতে চাহি না। কিন্তু একটু আলোচনা না করিলেও আমার বক্তব্য সমাধান হইবে না। কোন্ বস্তুটা real, কোন্ বস্তুটা real নহে, এই বিতণ্ডায় পণ্ডিতে পণ্ডিতে বহু কাল হইতে বাগ্‌বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। অধিকাংশ স্থলেই কথা কাটাকাটি এবং বকাবকি ঘটিয়াছে, এবং এই বকাবকির ফলে উভয় পক্ষই প্রচুররূপে পিত্ত বমন করিয়াছেন। আমি যে attitude লইতে চাহিতেছি, সেই attitude হইতে দেখিলে, বোধ হয় এতটা হুঙ্কার উদ্গিরণের প্রয়োজন থাকিত না। উদ্দেশ্য—সত্যনির্দ্ধারণ ; সত্য কি, ইহাই নিরূপণের চেষ্টা। এক কথায় যাহা আছে, তাহাই সত্য ;—যাহা নাই, তাহাই অসত্য। কিন্তু কি আছে, ইহাই

হইল বিতণ্ডার ক্ষেত্র। এক পক্ষ যাহাকে বলেন—আছে, অন্য পক্ষ জোরের সহিত বলেন—তাহা নাই। 'আছে' কথাটার মানে লইয়াই যত মারামারি। উভয় পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে 'আছে' শব্দটা ব্যবহার করেন। আমি বলি, উভয় পক্ষই ঠিক। আপনাপন attitude অনুসারে উভয় পক্ষই ঠিক। অনর্থক গণ্ডগোলের কোন প্রয়োজন নাই। একটা অতি সেকেলে দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। প্রশ্ন, গরু আছে কি না? অধিকাংশ লোকেই সমস্বরে বলিয়া উঠিবে, 'গরু আবার নাই? ঐ ত সম্মুখে ঐ শ্যামলা গাইটি পরমানন্দে ঘাস খাইতেছে, চক্ষে দেখিতেছি। ঐ ত গরু রহিয়াছে।' প্রশ্নকর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, 'আমি ত এই শ্যামলা গাভীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করি নাই; আমি প্রশ্ন করিয়াছি—গরু আছে, কি না? যে গরু শ্যামলাও নয়, ধবলাও নয়,—বাছুরও নয়, বুড়াও নয়,—গাভীও নয়, বলদও নয়,—যাহা গরু মাত্র। ঐ শ্যামলা গরু, ঐ ধবলা গরু, ঐ গাইটি, ঐ বাছুরটি আমি চোখে দেখিতেছি, উহাদের অস্তিত্ব আমি perceive করিতেছি, বা প্রত্যক্ষ করিতেছি। উহারা আমার objects of perception—perceptual objects, অথবা percepts; উহাদের অস্তিত্ব আমি অস্বীকার করিলাম না। কিন্তু আমি জানিতে চাহিতেছি—গরু আছে কি না? যাহা কালাও নহে—ধলাও নহে, গাইও নহে—বাছুরও নহে, যাহা গরু মাত্র, যাহাতে সকল perceptible গরুর সাধারণ ধর্ম্মগুলি বিদ্যমান, কিন্তু কোন গরু-বিশেষের বিশিষ্ট ধর্ম্ম বিদ্যমান নাই;—এমন গরু আছে কি না? যদি তেমন গরু থাকে ত আমাকে দেখাও দেখি।' বলা বাহুল্য, তেমন গরু দুনিয়ার মধ্যে নাই। গরু দেখাইতে হইলে, হয় গাই নয় বলদ, হয় কালা নয় ধলা গরু দেখাইতে হইবে। যদি তুমি বল—গরু আছে, আমি অমনই তোমাকে চাপিয়া ধরিব যে, আচ্ছা সে গরু কেমন?—আমাকে একটা ছবি আঁকিয়া দেখাও দেখি। অমনই তোমাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। কাহারও সাধ্য নাই যে, আমাকে নির্ব্বিশেষ গরু আঁকিয়া দেখায়। মনে থাকে যেন, আমি গাই চাই না; বলদও চাই না, বাছুরও চাই না, বুড়ো গরুও চাই না; এমন কি—চারপেয়ে গরুও চাই না; কেন না, খোঁড়া গরুকেও গরু বলিতে কেহ দ্বিধা বোধ করিবে না। আমার প্রশ্নোক্ত এই যে 'গরু,' ইহা object of perception অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পদার্থ হইতে পারে না; এমন কি, object of possible perception অর্থাৎ প্রত্যক্ষগম্যও হইতে পারে না। ইহা

একটা concept মাত্র। পৃথিবীর যাবতীয় গরুর বিশিষ্ট ধর্ম্ম কাটিয়া ছাঁটিয়া এমন একটা মন-গড়া পদার্থ তৈয়ার করিয়াছি, যাহার অস্তিত্ব ব্রহ্মাণ্ডে নাই; যাহা আঁকিয়া দেখান দূরে থাক, যাহার স্পষ্ট ছবি পর্য্যন্ত মনে কল্পনা করাও অসাধ্য। অতএব আমি বুক ফুলাইয়া বলিব যে, গরু নাই। জীয়ন্ত গরুগুলা objects of perceptionরূপে থাকিতে পারে। আর যে গরু concept মাত্র, তাহা কোনরূপ মন-গড়া জগতে বিদ্যমান থাকিতে পারে;—কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই perceptual জগতে থাকিতে পারে না। প্রত্যেক গরুর রূপ-রস-গন্ধ আছে, কিন্তু এই মন-গড়া গরুর রূপ-রস-গন্ধ থাকিতে পারে না। যিনি বলিবেন—উহার রূপ এইরূপ, তাঁহাকে ঠকিতে হইবে। অতএব গরু এক অর্থে অস্তি, অন্য অর্থে নাস্তি। এক অর্থে সত্য, অন্য অর্থে অসত্য। গরু conceptরূপে সত্য, কিন্তু perceptরূপে অসত্য। যাহা object of immediate perception, ইন্দ্রিয় দ্বারাই হউক, বা অন্যরূপেই হউক, যাহাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; অথবা যাহা object of possible perception,—সম্প্রতি প্রত্যক্ষবিষয় না হইলেও অন্য সময়ে প্রত্যক্ষ হইতে পারে; সেই perceptual objectকেই যদি real বলা যায়, তাহা হইলে গরু নামক conceptএর, বা conceptual গরুর কোনরূপ reality থাকিতে পারে না। অথচ লোকে কথায়-কথায় এই conceptগুলায় reality আরোপ করে। অন্যে সংশয় প্রকাশ করিলে ঠেঙা তুলিয়া মারিতে আসে। এইরূপ যাহা যা নয়, তাহাকে তাই বলার শাস্ত্রীয় নাম 'অধ্যাস'। ইহাকেই বেইন সাহেব error of realism বলিয়াছেন। এই অধ্যাসের ফলে কত অনর্থক বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে, বলা যায় না।

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, Scienceএর কাজ কি?—আমি বলিব, Scienceএর প্রধান কার্য্য কতকগুলা object of perception অবলম্বন করিয়া, তাহাদিগকে মিলাইয়া দেখিয়া, তাহাদের সামান্য এবং বিশেষ, agreements ও differences মিলাইয়া দেখিয়া কতকগুলা concept গড়িয়া তোলা। নানাবিধ এবং নানা জাতীয় জীয়ন্ত গরু—objects of perception বা প্রত্যক্ষ পদার্থ। তাহাদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট ধর্ম্ম ছাঁটিয়া ফেলিয়া, কেবল সাধারণ ধর্ম্মগুলিকে একত্র জড়াইয়া, যে মন-গড়া পদার্থের কল্পনা হয়, তাহারই নাম গরু। এই গরু একটা concept মাত্র। এই

গরু কখন কাহারও প্রত্যক্ষ হয় নাই, হইবেও না। ঐরূপ অন্যান্য concept—মানুষ, পশু, প্রাণী, সুন্দর, কুৎসিৎ, কালা, ধলা প্রভৃতি। ঐ সকল পদার্থ কোনরূপেই কাহারও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ইহাদের real existence আছে কি না, ইহা লইয়া তর্ক তুলিলে, কেবল কথা কাটাকাটিই সার হয়। Real কথাটার অর্থান্তর ঘটাইয়া প্লেটো হয়ত বলিতেন যে, এই concept-গুলা বা ideaগুলাই real জিনিস; আর যাহা percepts, যাহা প্রত্যক্ষ-গোচর, তাহা un-real। তিনি বলিতেন, ঐ যে conceptual অশরীরী গরু, উহাই খাঁটি বিশুদ্ধ জিনিস। উহাতে খানিকটা ময়লা মাটি আবর্জ্জনা মিশাইয়া আমাদের ব্যবহারের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা জীয়ন্ত গরুগুলা তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। আমার গোয়ালের শ্যামলী ধবলী, ঐ বলদটা, ঐ বাছুরটা খাঁটি গরু নয়। উহা খাঁটি গরু + খানিকটা আবর্জ্জনা। ঐ আস্ত জীয়ন্ত গরুগুলাকে লইয়া মোটা জীবনযাত্রার কাজ চলিতে পারে—চাষে খাটান, বা গাড়ী বহা, বা উদরপূরণের কাজ চলিতে পারে; কিন্তু সূক্ষ্মতর মননকার্য্য চলিতে পারে না; কোনরূপ thinking চলিতে পারে না। কালা গরুর সঙ্গে ধলা গরুর সম্পর্ক পাতাইতে হইলে, উভয়েই ঘাস খায়, এই সম্পর্ক পাতাইতে হইলেই আমাদিগকে গোত্ব বা গোজাতি, এইরূপ একটা concept খাড়া করিতে হয়। আবার একটা conceptএর সহিত আর একটা conceptএর সম্পর্ক পাতাইতে গিয়া, আর একটা ব্যাপকতর concept খাড়া করিতে হয়। গরুর সঙ্গে ভেড়ার বা ঘোড়ার সম্পর্ক পাতাইতে গিয়া চতুষ্পদ পশুর concept তৈয়ার করিতে হয়। চতুষ্পদ পশুর সহিত দ্বিপদ মানুষের এবং ষট্পদ ভ্রমরের সম্পর্ক পাতাইতে গিয়া 'প্রাণী'র concept খাড়া করিতে হয়। প্রাণীতে প্রাণীতে সম্পর্ক পাতাইতে গিয়া প্রাণি-সামান্য দেখিয়া, মরণধর্ম্মের concept আনিতে হয়। এইরূপ perceptএ perceptএ এবং conceptএ conceptএ সম্পর্ক পাতানই মনন-কর্ম্ম। মনুষ্যের অন্তঃশরীরে বসিয়া বসিয়া যিনি এই মননকর্ম্ম করিতেছেন, ইংরেজীতে তাঁহাকে Reason বলা হয়; তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য বড় হাতের R দিয়া লিখিতে হয়। এ দেশে উহার শাস্ত্রীয় নাম কি, ঠিক জানি না; প্রজ্ঞা বলিলে বোধ করি দোষ হইবে না। এই প্রজ্ঞা মানুষের অন্তরে বসিয়া কেবলই concept গড়িতেছেন; এবং conceptএর সহিত conceptএর সম্পর্ক পাতাইতেছেন। ইহা বস্তুতই সৃষ্টিকর্ম্ম—প্রজ্ঞা বস্তুতই

সৃষ্টিকর্ত্রী। প্রজ্ঞা conceptগুলিকে সৃষ্টি করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলেন, অন্য জীবের সহিত কারবারের জন্য উহাদের একটা মূর্ত্তি দিতে বাধ্য হন। সেই মূর্ত্তি শব্দময়ী মূর্ত্তি বা বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি। আমার মননকর্ম্মকে অন্যের গোচর করিতে গেলে, উহাকে বাক্যরূপে বা শব্দরূপে প্রকাশ করিতে হয়। এই জন্য বাক্যকে বা শব্দকেই মননকর্ম্মের প্রধান সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যে জিনিসটা concept, তাহার গায়ে একটা নামের টিকিট বসান যায়। ঐ নাম একটা শব্দ মাত্র। Thoughtএর সঙ্গে Languageএর কি সম্পর্ক, তাহা লইয়া অনেক বিতণ্ডা হইয়াছে। Language বা ভাষা না থাকিলে, thoughtএর প্রকাশ দূরে থাকুক, thinking কার্য্যটাই সম্ভব হইত কি না, তাহার এখনও মীমাংসা হয় নাই। আগে thought, না আগে ভাষা,—সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও বোধ করি হয় নাই। Logic শাস্ত্রের গোড়াতেই এই প্রশ্ন উঠে। মক্ষমূলর প্রভৃতির Language and Thought-ঘটিত বিচার এই প্রসঙ্গে মনে করুন। যে সকল ইতর জন্তু কোনরূপ ভাষার ব্যবহার করে না, তাহাদের মনের ভিতর ঢুকিতে না পারিলে, তাহারা think করিতে পারে কি না, জানিবার কোন উপায় দেখি না; কাজেই এ প্রশ্ন হয়ত অমীমাংসিতই থাকিয়া যাইবে। ইতর জন্তুর পক্ষে যাহাই হউক, মানুষের পক্ষে language এবং thoughtএর সম্পর্ক,—বাক্যের সহিত অর্থের সম্পর্ক,—কালিদাসের ভাষায় বলিতে গেলে একরূপ নিত্য-সম্পর্কই দাঁড়াইয়াছে। Gesture language, অথবা mimetic language নামে একটা কাজ-চালান ভাষা আছে বটে; ইহাতে মুখভঙ্গী দ্বারা বা অঙ্গসঞ্চালনের দ্বারা, শব্দের সাহায্য ব্যতিরেকেও মনের ভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করা যায় বটে। কোন রকম ভাবের বা emotionএর তাড়নায় যে সকল interjection বা ধ্বনি স্বভাবতঃ বাহির হয়, তাহাও অনেকটা gesture languageএর কাছাকাছি। স্বাভাবিক বা নৈসর্গিক নিয়মে এই gestureগুলা বা অঙ্গভঙ্গীগুলা এবং এই interjectionগুলা বা ধ্বনিগুলা, আপনা হইতেই বাহির হয়; law of associationএর দ্বারা নিজের অবস্থার সহিত অপরের অবস্থা মিলাইয়া, অপরের ইঙ্গিত, বা অপরের ধ্বনি অবলম্বনে অপরের মনের কথার অনুমান চলে বটে। এইরূপে একটা ভাষা তৈয়ার হয় বটে। এই ভাষাকে স্বাভাবিক, স্বভাব-প্রেরিত, জীবধর্ম্ম-প্রেরিত, natural language মনে করা যাইতে

পারে। কিন্তু আমাদের languageএর যাহা বিশিষ্টতা, তাহা এই ভাষাতে নাই। আমরা যাহাকে language বলি, উহা স্বাভাবিক জিনিস নহে। উহা অস্বাভাবিক—সম্পূর্ণ artificial ও conventional—হইতে পারে, গোড়ায় স্বভাবদত্ত ধ্বনির অনুকরণে natural language হইতে কালক্রমে এই conventional languageএর উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু এখন ঐ conventionটুকুই, ঐ অস্বাভাবিকতাটুকুই মানবীয় ভাষার প্রাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা কোন conceptএর গায়ে আমরা একটা শব্দের বা নামের টিকিট লাগাইয়া দিই। সেই শব্দটার উচ্চারণের সহিত সেই conceptএর কোন স্বাভাবিক সম্পর্ক হয়ত কোন কালে ছিল, হয়ত এখনও চেষ্টা করিলে তাহা আবিষ্কার করা যাইতে পারে; কিন্তু ভাষার কাজ চালাইবার জন্য উহা আবিষ্কারের কোন প্রয়োজনই নাই। যে conceptএর গায়ে যে নামের টিকিট আঁটা গিয়াছে, সকলে মিলিয়া সেইটাকে মানিয়া লইলেই কাজ চলিবে। নামটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হইলেও কোন ক্ষতি নাই। যে-কোন conceptকে যে-কোন নাম দিলেই চলিতে পারে। যাঁহারা নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা যে-কোন সঙ্কেতকে যে-কোন conceptএর পরিচায়করূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সঙ্কেতটার প্রয়োগে সুবিধা আছে কি অসুবিধা আছে, কেবল সেইটুকুই তাঁহারা দেখেন। আমাদের এই লট্ লোট্ লঙের দেশে, হুঁ ফট্ স্বধা স্বাহার দেশে দৃষ্টান্ত-বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। বিদেশের শাব্দিক পণ্ডিতেরা এ বিষয় লইয়া যে সকল আলোচনা করিয়াছেন, আপনারা তাহা জানেন; আমারই বরং অনধিকার-চর্চ্চা। সেকালের নিরুক্তকার ও ব্যাকরণকার হইতে, শাকটায়ন গার্গ্য ও যাস্ক হইতে, এ-কালের মীমাংসক ও নৈয়ায়িকগণ পর্য্যন্ত আচার্য্যেরা শব্দের সাঙ্কেতিকত্ব লইয়া যে সকল আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও আপনারা জানেন। Convention মাত্রই —সঙ্কেত মাত্রই সম্পূর্ণ arbitrary। ইহার নির্ব্বাচনে আমাদের একটা freedom বা স্বাধীনতা আছে। গোড়ায় আমরা যে-কোন সঙ্কেতকে প্রয়োগযোগ্য বলিয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্রমে গ্রহণ করিতে পারি। পরে সকলে মিলিয়া সেই সঙ্কেতের ব্যবহার করিতে হয়। Gesture languageএ, বা অন্য কোনরূপ স্বাভাবিক languageএ সে স্বাধীনতাটুকু নাই। মনুষ্য-সাধারণের যে gesture language বা যে natural language, তাহা

জীবধর্ম্ম প্রেরিত,-স্বভাব-প্রেরিত। উহাতে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা থাকে না। স্বাধীনতা লইতে গেলে উহার প্রয়োগও ব্যর্থ হইয়া যায়। মানুষের নিম্নে ইতর জীবে যদি কোন ভাষা ব্যবহার করে, উহাও স্বভাবদত্ত ভাষা। তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভাববিনিময়ে উহা সাহায্য করে বটে, কিন্তু উহার প্রয়োগক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। বানর বা বনমানুষের মত উচ্চ শ্রেণীর জন্তুও কোনরূপ সাঙ্কেতিক বা artificial language তৈয়ার করিয়া লইতে পারে নাই। এই স্বাভাবিক ভাষা পরস্পর ভাববিনিময়ে, পরস্পর communicationএ কাজে লাগিতে পারে বটে;—কিন্তু মনন-কর্ম্মে, thinking processএ ইহা কোনরূপ কাজে লাগে কি না, তাহা বলা দুষ্কর। আমি ইঙ্গিতে ইসারায় মুখভঙ্গী দ্বারা কিংবা চেঁচামেচি কোলাহল করিয়া অপরের নিকট আমার মনের কথা কতকটা জানাইতে পারি বটে, কিন্তু অপরের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, আপনার মনে মনে মননের সময়, চিন্তার সময়, বিচার-বিতর্কের সময়, আন্দোলন-আলোচনা করিবার সময় ঐ সকল অঙ্গভঙ্গীতে বা চেঁচামেচিতে কোনরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না। মনে মনে এই আন্দোলন আলোচনাই মনন-কার্য্য। ইহার জন্য এই অস্বাভাবিক, সাঙ্কেতিক, artificial ভাষারই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। সমস্ত Logic শাস্ত্রটা এই মনন-কার্য্যের বিধিব্যবস্থা-প্রণয়নে নিযুক্ত রহিয়াছে। কোন একটা concept যখন এইরূপে শব্দরূপে বা নামরূপে বাহিরে প্রেরিত বা বিসৃষ্ট হয়, তখন তাহাকে সংজ্ঞা বলা যায়। আমরা প্রত্যেক conceptকে একটা নাম দিতে পারি, একটা শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারি। সেই শব্দটাই সেই conceptএর সংজ্ঞা। ঐ শব্দটাকে বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহিরে প্রকাশ করারও সর্ব্বদা প্রয়োজন হয় না। সংজ্ঞাগুলা যেন মনের ভিতরেই মূর্ত্তিহীন শরীরহীন শব্দরূপে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। শব্দের যেন একটা বাহ্য, আর একটা আভ্যন্তর মূর্ত্তি আছে। অপরের নিকট মনের কথা প্রকাশের সময় কণ্ঠ-তালু প্রভৃতি অঙ্গ দ্বারা বায়ুতে আঘাত দিতে হয়, তখন উহা একটা শ্রবণেন্দ্রিয়গম্য বাহ্য মূর্ত্তি লইয়া অপরের নিকট প্রকাশ হয়। কিন্তু যখন আমরা নীরবে মনন-কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকি, তখন উহার বাহ্য প্রকাশ আবশ্যক হয় না। অথচ সেই শব্দগুলাই যেন শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগম্য কোনরূপ ছায়া-শরীর লইয়া আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়ের ভিতরে তোলপাড় করিয়া বেড়ায়। শব্দের এই আভ্যন্তর অশরীরী বা সূক্ষ্মশরীরী মূর্ত্তিকেই এ দেশের

পণ্ডিতেরা বুঝি, স্ফোট নাম দিয়াছিলেন। এই অশরীরী শব্দ কখনও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় না। উহা অন্তরিন্দ্রিয়ের গোচর থাকে। অপরের সহিত কারবারে ইহার দরকার হয় না, নিজের সহিত কারবারে ইহার দরকার হয়। প্রত্যেক সংজ্ঞা, প্রত্যেক concept, আমাদের নিকট শব্দরূপে বা নামরূপে পরিচিত। পরের সহিত কারবারে আমরা ঐ নামগুলিকে শ্রবণগোচর শব্দরূপে প্রেরণ করি। নিজের সহিত কারবারেও উহাদিগকে শ্রবণের অগোচর শব্দরূপেই নিজের নিকটে উপস্থিত করি। প্রত্যেক conceptএর প্রকাশই এই শব্দরূপে। বাহিরে প্রকাশ এবং ভিতরে প্রকাশ —উভয়ত্র প্রকাশই শব্দরূপে। অতএব শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ এই অর্থে নিত্য এবং অচ্ছেদ্য। আপনারা Conceptualism এবং Nominalism, এই দুইটা বড় বড় কথা শুনিয়াছেন; ইউরোপের মধ্যযুগে এই দুইটা নাম লইয়া দুই দলে বকাবকি হাতাহাতি এবং রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। প্লেটো যেগুলাকে idea বলিতেন, এবং তৎসম্বন্ধে বলিতেন— এইগুলাই খাঁটি জিনিস, বিশুদ্ধ জিনিস, আসল জিনিস, real জিনিস; অন্যে তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেন, না না—ওগুলা সব concept মাত্র, উহাদের real existence কিছুই নাই; উহাদের অস্তিত্ব আমাদের মনের মধ্যে; উহারা আমাদের মন-গড়া, আমাদের সৃষ্ট বা বিসৃষ্ট। ইহারাই Conceptualist। আর এক দল বলিতেন, না না—উহারা কেবলই নাম মাত্র, শব্দ মাত্র—আমাদেরই দেওয়া pure convention মাত্র; তদতিরিক্ত সত্তা উহাদের কিছুই নাই। ইহারা Nominalist. আপনারা দেখিতেছেন, এই যে গণ্ডগোল আর তর্কসংগ্রাম, ইহা কেবল ইউরোপখণ্ডেই ঘটে নাই। এ দেশেও ইহা নিরুক্তকারদের বা তাঁহাদেরও পূর্ব্বের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে।

অধিকাংশ স্থলেই কথার মানে লইয়াই প্যাঁচ-খেলান। Real শব্দের অর্থ যদি আমি প্রত্যক্ষগোচর বা perceptual ধরি, তাহা হইলে গো-জাতি-বাচক গরু জিনিসটা real হইতে পারে না, উহা percept হইতে পারে না, উহা concept হয়। Perceptual worldএ উহার স্থান থাকে না, Conceptual worldএ উহার স্থান হয়।

এই Conceptual World বস্তুতই একটা নূতন জগৎ। এই জগৎ মানুষের ইন্দ্রিয়গম্য নহে, ইহা কোনরূপে প্রত্যক্ষ বিষয় হইতে পারে না;

প্রত্যক্ষ প্রমাণের ইহা আদৌ অধিগম্য নহে। প্রত্যক্ষ যে সকল প্রমাণের ভিত্তি, সেই অনুমানাদি প্রমাণও এই জগতের কোন ঠিকানা দিতে পারে না। কাজেই ইহাকে প্রাতিভাসিক জগতের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে না। প্রাতিভাসিক জগৎ—রূপের জগৎ; উহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য রূপ আছে—উহা রূপময় জগৎ। কিন্তু এই conceptual worldএর অন্তর্গত কোন দ্রব্যেরই প্রত্যক্ষ রূপ নাই, কোনরূপে তাহারা অনুভূতির সম্পর্কে আসে না। Conceptগুলা একেবারে রূপ-রস-গন্ধ-বর্জ্জিত—মানুষের সুখ-দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত কোন সম্পর্কই তাহারা রাখে না। উহারা সংজ্ঞা মাত্র—নাম মাত্র—শব্দ মাত্র। বাহিরের শ্রবণেন্দ্রিয়গম্য মূর্ত্তিমান্ শব্দ নহে, অন্তরের মনন-কর্ম্মে নিযুক্ত অমূর্ত্ত শব্দ মাত্র। এই জগতের স্বতন্ত্র নামকরণ আবশ্যক। ইহাকে নামের জগৎ বলিব—শব্দময় জগৎ বলিব—বাক্যময় জগৎ বলিব—বাঙ্ময় জগৎ বলিব। মানুষের প্রজ্ঞা এই বাঙ্ময় জগতের সৃষ্টি করে,—স্বাধীন ভাবে free agentরূপে সৃষ্টি করে।

যাহা object of perception, তাহাকেই আমি real বলিব। শ্যামলা, ধবলা, পিঙ্গলা গাইকে আমি real বলিব। আর যাহা গরু মাত্র, তাহাকে conceptual বলিব। ইহাকে সংজ্ঞা মাত্র বল, বা নাম মাত্র বল, তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই। যাহা প্রত্যক্ষগম্য, perceptual, এবং এই অর্থে real, তাহা রূপ-জগতের জিনিস। আর যাহা আমাদের কল্পিত, উদ্ভাবিত, মন-গড়া, conceptual, তাহা নাম-জগতের জিনিস। রূপ-জগৎ, এবং নাম-জগৎ—এই দুই জগৎ লইয়া সমস্ত বিশ্বজগৎ। কে অস্তি, কে নাস্তি,—কে সত্য, কে অসত্য, ইহা লইয়া তর্ক তোলা নিষ্ফল। যাহা প্রত্যক্ষ, তাহা রূপ-জগতে অস্তি। এই রূপ-জগৎই প্রাতিভাসিক জগৎ। এই প্রাতিভাসিক জগতে তাহা অস্তি। ইহার কিয়দংশকে আমরা ব্যবহারের জন্য ব্যাবহারিক জগৎরূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। জীবনযাত্রার জন্য এই ব্যাবহারিক জগতের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছি। সেই অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যেকের কাছে real জগৎ। আমাদের প্রত্যেকের নিকট এই ব্যাবহারিক জগৎও প্রাতিভাসিকরূপে, perceptualরূপে, রূপ-জগতের অন্তর্গত বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের প্রত্যেকের ব্যাবহারিক জগতের average লইয়া সর্ব্বসাধারণের জন্য একটা মন-গড়া জগৎ তৈয়ার

করিয়াছেন। আমি বলিতে চাহি যে, সেই জগৎ সর্ব্বতোভাবে বৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবিত, বৈজ্ঞানিকেরই সৃষ্ট নামময় জগৎ। উহা প্রাতিভাসিক ত নহেই; উহাকে ব্যাবহারিক বলাও বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। কেন না, আমরা প্রত্যেকে যে বাহ্য জগতের সহিত কারবার করি, তাহা প্রাতিভাসিক জগতেরই এক অংশ মাত্র। তাহা ব্যবহারার্থ নির্দ্দিষ্ট হইলেও প্রত্যেকের পক্ষে স্বভাবতঃ প্রাতিভাসিক। প্রত্যেকের পক্ষে উহা ভিন্নরূপ। ভিন্নরূপ বলিয়াই বৈজ্ঞানিকেরা কল্পিত Mean Manএর জন্য একটা কল্পিত মাঝারি জগৎ উদ্ভাবন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উহা conceptual জগৎ, মনন-কর্ম্মের জন্য উহা আবশ্যক। এই মনন-কার্য্যটা বৈজ্ঞানিকেরই কার্য্য। এতদর্থে তাঁহাদিগকে নানা conceptএর উদ্ভাবনা করিতে হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে নানা সম্পর্ক পাতাইতে হইয়াছে; প্রত্যেক সম্পর্কের এক-একটা নাম দিতে হইয়াছে। আমি ক্ষণেকের জন্য nominalist সাজিতে চাই। ঐ নামসমূহে নির্ম্মিত জগৎকে আমি বাঙ্ময় জগৎ বলিব।

Scienceএর কাজ মনন-কর্ম্ম; বাহিরের প্রত্যক্ষগোচর কতকগুলি percept মিলাইয়া, তাহা হইতে concept তৈয়ার করিয়া, সেই সকল conceptএর সম্পর্ক-নির্দ্ধারণ, ইহাই মনন-কর্ম্ম। Inductive and Deductive Logic এই মনন-কর্ম্মের পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করে। Conceptএ পৌঁছিতে হইলে প্রত্যক্ষলব্ধ perceptগুলিকে নাড়াচাড়া করিয়া মিলাইয়া দেখিতে হয়। প্রত্যক্ষ জগতে কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা আসিতেছে, কোন্‌টার সঙ্গে কোন্‌টা আসিতেছে, ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়; ইহার নাম observation বা পর্য্যবেক্ষণ। কোথায় দাঁড়াইয়া, কিরূপে দেখিতে হইবে, বৈজ্ঞানিকেরা তাহা স্থির করেন, তাহা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু দেখিবার সময় তিনি নিজের ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস না করিয়া পাঁচ জন পথের পথিককে ডাকিয়া আনেন। পথের পথিকও এক-একজন ছোটখাট বৈজ্ঞানিক, তাহাকেও পাঁচটা জিনিস দেখিয়া, পাঁচটা concept খাড়া করিতে হয় বটে, কিন্তু সে আপনার immediate interests লইয়া, আপনার জীবিকানির্ব্বাহের ব্যাপার লইয়া এত ব্যস্ত যে, কোনরূপ সূক্ষ্ম conceptএ পৌঁছিবার তাহার অবসর নাই। সূর্য্য ঘুরিতেছে কিম্বা পৃথিবী ঘুরিতেছে, এ বিষয়ে তাহার মাথাব্যথার কোন প্রয়োজনই হয় না। কেন না, ডালরুটি-

সংগ্রহ ব্যাপারে উভয়েই প্রায় তুল্যমূল্য। কাজেই সে পৃথিবীতে দাঁড়াইয়াই পর্য্যবেক্ষণ করে। মনোরথে চড়িয়া সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইবার তাহার প্রবৃত্তিই নাই। বৈজ্ঞানিকের interests আরও দূরব্যাপী। তিনি সাধারণ লোককে টানিয়া আনিয়া সূর্য্যমণ্ডলে উধাও হইয়া দৌড়িতে বলেন। জলের ভিতর hydrogen oxygen আছে, তাহা না জানা সত্ত্বেও পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রা এত কাল চলিয়াছে ও চলিতেছে। কাজেই জলকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার তাহাদের প্রবৃত্তি নাই। বৈজ্ঞানিক কিন্তু আপনার laboratory-ঘরে জলকে তাড়িত-প্রবাহ দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিয়া, পথিকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া দেখান—এই দেখ, জলের ভিতর হইতে কিরূপ দুইটা নূতন জিনিস বাহির হইল। জল হইতে hydrogen oxygen বাহির করিতে হইলে হাত, পা, দাঁত, নখ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে কুলায় না; তাহার জন্য বিশিষ্ট রকমের হাতিয়ার বা tool তৈয়ার করিতে হয়, যন্ত্র-তন্ত্র, তোড়জোড় আবশ্যক হয়। বৈজ্ঞানিকের তাহার জোগাড় করিয়া লইতে হয়। সর্ব্বসাধারণের মাথায় তাহা আসে না। এইরূপ যন্ত্র-তন্ত্র, তোড়জোড় সাহায্যে যে observation, তাহার নাম experiment বা পরীক্ষা। এইরূপে কোথায় দাঁড়াইয়া observation করিতে হইবে এবং কিরূপ যন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা observe করিতে হইবে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটাইয়া তাহা ঠিক করেন; কিন্তু observationএর ভারটা দেন—দশ জন ইতর লোকের উপর। তাহারা observationএর পর যে সাক্ষ্য দেয়, বৈজ্ঞানিক তাহাই গ্রহণ করেন। দশ জনের নিকট দশ রকম সাক্ষ্য পাইয়া অগত্যা তাহার averageটা মানিয়া লন; এবং এইরূপে যাহা পান, তাহাই সংগ্রহপূর্ব্বক এবং সঙ্কলনপূর্ব্বক তাহাদের agreements ও differences আলোচনা করিয়া, সামান্য এবং বিশেষ ধর্ম্মগুলি মিলাইয়া, তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য দেখাইয়া নানাবিধ relation বা সম্পর্ক প্রদান করেন। সাক্ষ্য গ্রহণের পর যে সকল ফলাফল বা result পান, সেগুলিকে tabulate করেন, classify করেন, generalise করেন এবং একটা general statement দিবার চেষ্টা করেন। এই সব general statementকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় Laws of Nature বা প্রাকৃতিক নিয়ম বলা হয়। Man is mortal, এটাও যেমন একটা প্রাকৃতিক নিয়ম, pressure of a gas varies as its temperature, এটাও তেমনই একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। তবে

প্রথমটার আবিষ্কারে কোন বড় বৈজ্ঞানিকের দরকার হয় নাই। পৃথিবীর শত কোটি মাঝারি বৈজ্ঞানিকই উহা স্থির করিয়া লইয়াছে। কেন না, উহা তাহাদের immediate interestএর বিষয়। আর দ্বিতীয় নিয়মটার আবিষ্কারে এক জন বড় বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি যন্ত্র-তন্ত্র প্রয়োগ করিয়া সকলকে ডাকিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, gasএর ব্যবহার এইরূপ; এবং তাহার পর হইতে আমরাও পথের পথিককে ডাকিয়া দেখাইতে পারিতেছি যে, gasএর ব্যবহার ঐরূপ। এই যে প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহা একটা statement মাত্র; একটা description মাত্র, একটা বিবরণ বা বাক্য মাত্র। আর এই যে বিবরণ, ইহা conceptual termsএ বিবরণ মাত্র। মানুষ একটা concept, আমাদের সেই পূর্ব্বকথিত গরুর মতই concept; এবং মরণ-ধর্ম্ম আর একটা নূতন concept। ঐ বিবরণে মানুষের সঙ্গে মরণ-ধর্ম্মের সম্পর্ক পাতান হইয়াছে। তেমনই gas একটা concept এবং তাহার pressure এবং temperature আর দুটা concept। Gasসম্পৃক্ত এই বিবরণে ঐ তিনটা conceptএর পরস্পর সম্পর্ক পাতান হইয়াছে। মানুষ আর মরণ-ধর্ম্ম—এই দুই conceptএ পৌছিতে কোন বড় বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু gas আর তার চাপ আর উষ্ণতা, এই তিনটা conceptএ পৌছান সকলের ক্ষমতায় কুলায় না। ইহার জন্য বিশিষ্ট পরিভাষার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। যাঁহারা বিজ্ঞানব্যবসায়ী নহেন, তাঁহারা এই তিনটি নামের তাৎপর্য্য সহজে বুঝিবেন না। এইরূপে বৈজ্ঞানিককে নানা নূতন conceptএর বা সংজ্ঞার সৃষ্টি করিতে হয় এবং প্রত্যেকের এক-একটা নাম দিতে হয়। সে নামের মাহাত্ম্য তিনি ভিন্ন ইতর লোকে বুঝিতে পারিবে না। এই সংজ্ঞাগুলির সৃষ্টিকার্য্যেই বৈজ্ঞানিকের বাহাদুরী। সংজ্ঞাগুলি এমন হওয়া আবশ্যক যে, তাহাদের পরস্পর relation অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে নিবদ্ধ হইতে পারে। এই সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলি এক-একটি formula, সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক ভাষায় এক-একটি statement. Physical Science অথবা যে-কোন Science এইরূপ formulaর সৃষ্টিতেই ব্যাপৃত আছে। ইহাই বৈজ্ঞানিকের সর্ব্বপ্রধান কাজ, ইহাই scientific method. Conceptগুলি এমন হওয়া চাই, যাহাতে উহাদের পরস্পর সম্পর্ক অতি সরলভাবে অতি ছোট্ট formulaয় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যত সংক্ষিপ্ত এবং যত সরল হইবে, ততই

বৈজ্ঞানিকের বাহাদুরী হইবে। সৌর জগতের অন্তর্গত জ্যোতিষ্কগুলির গতিবিধি নির্দ্দেশের জন্য টলেমি যে formulaগুলির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ গতিবিধির জটিলতা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। তিনি কিন্তু পৃথিবীতে দাঁড়াইয়াই গতিবিধির পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে তাঁহার formula রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দেড় হাজার বৎসর পরে কোপার্ণিকস্ স্থান বদল করিয়া অন্যত্র দাঁড়াইলেন,—পৃথিবী ছাড়িয়া, সূর্য্যে গিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইবা মাত্র দেখিলেন যে, জ্যোতিষ্কগুলির গতিবিধিতে তেমন আর জটিলতা নাই। এখন নূতন formula তৈয়ার করিয়া গতিবিধির নূতন বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইয়া পড়িল। কেপ্‌লার জিনিসটাকে আরও সূক্ষ্ম করিয়া আনিলেন। শেষে নিউটন আসিয়া এমন কয়টা নূতন concept গড়িয়া ফেলিলেন, যাহাতে কেবল সৌর জগতের জ্যোতিষ্ক কেন, ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় দ্রব্যের গতিবিধির বিবরণ কয়েকটি formulaর মধ্যে পড়িয়া গেল। নিউটনের আগে হইতে গালিলিও তাঁহার পথ কতকটা সুগম করিয়াছিলেন। গালিলিও এবং নিউটন উভয়ে মিলিয়া যে নূতন Dynamical Scienceএর পত্তন করিলেন, তাহাই আজি পর্য্যন্ত বাহ্য জগতের যাবতীয় দ্রব্যের গতিবিধি নির্দ্ধারণের সব চেয়ে সরল ও সংক্ষিপ্ত উপায় বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। এই যে Dynamical Science, ইহা আর কিছু নহে, ইহা জড় জগতের যাবতীয় বস্তুর গতিবিধির একটা বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা মাত্র, একটা descriptionএর চেষ্টা মাত্র। ঐ descriptionটা conceptual termsএ description. উহার conceptগুলি এমন করিয়া তৈয়ার করিয়া লওয়া হইয়াছে, যাহাতে ঐ বর্ণনাটা অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকার ধারণ করিয়াছে। এত সংক্ষিপ্ত হইয়াছে যে, অক্লেশে মাথার মধ্যে উহা পূরিয়া রাখা যায় এবং ইচ্ছামত বিনা আয়াসে বাহির করিয়া প্রয়োগ করা চলে। এই সূত্রগুলা কতকটা আমাদের ব্যাকরণের সূত্রের মত। সহজে মাথায় পূরিয়া রাখিবার অনুরোধে এবং সহজে প্রয়োগ করিবার অনুরোধে উহাদের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকার দিবার চেষ্টা হইয়াছে। আমাদের দেশের প্রাচীন সূত্রকারদের সম্বন্ধে গল্প আছে যে, সূত্র-প্রণয়নের সময় একটি অক্ষর কমাইতে পারিলে, সূত্রকারের পরমায়ু দশ বৎসর বাড়িয়া গেল, এইরূপ তাঁহারা মনে করিতেন। আক্ষেপ এই, এই সূত্রগুলির তাৎপর্য্য, ব্যবসায়ী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। ইহার

ভিতরের শব্দগুলা সমস্তই পারিভাষিক, সমস্তই মন-গড়া। অপর সাধারণে ইহার মানে বুঝিবে না। সমস্তই লট্ লোট্ লঙ্ বিধিলিঙের মত। ইহাদের কার্য্যকারিতা ইহাদের প্রয়োগের বেলায়। প্রয়োগকালে ইহাদের কার্য্যকারিতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। একটা সহর্ণের্ঘঃ সূত্রের ভিতরে স্বরসন্ধিঘটিত সহস্র ঘটনা generalised formএ লুকাইয়া আছে। এই সূত্রটির প্রয়োগ করিবা মাত্র সন্ধিঘটিত কত প্রশ্নের এক নিশ্বাসে মীমাংসা হইয়া যায়। প্রাকৃতিক নিয়মের সূত্রগুলিও সেইরূপ। তিনটা laws of motion আর একটা law of gravitationএর ভিতরে জগতের অসংখ্য তত্ত্ব যেন লুকাইয়া রহিয়াছে। আরব্য উপন্যাসের ধীবরের কুপীর ভিতর যেমন একটা প্রকাণ্ড দৈত্য নিহিত ছিল, জড় জগতের সমস্ত movements বা গতিবিধিকে যেন ঠাসিয়া পূরিয়া ঐ চারিটি সূত্রের মধ্যে রাখা হইয়াছে। যে যাদুকর এই অঘটন-ঘটনায় সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি বস্তুতই জগতের নমস্য। এই সূত্র কয়টির প্রয়োগ করিবা মাত্র গুলি গোলা ক্রিকেট বল বৃষ্টিবিন্দু সমুদ্রের জল রেলগাড়ী ষ্টিমার হইতে চন্দ্র সূর্য্য রাহু কেতু এবং হেলির ধূমকেতু পর্য্যন্ত সকলেরই গতিবিধি যেন সেই যাদুকরের আয়ত্ত হইয়া পড়ে। তিনি বনমানুষের হাড় ঠেকাইয়া, যাহাকে যখন যেখানে উপস্থিত হইতে বলেন, সে তখনই সেখানে উপস্থিত হয়। অথবা তিনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষির মত কে কোথায় কখন্ উপস্থিত ছিল, কে কোথায় কখন্ উপস্থিত হইবে, তাহা চোখের সম্মুখে দেখিতে পান। তিনি গণিয়া বলেন, এবং গণনার ফল অব্যর্থ হয়। পৃথিবীর যাবতীয় মাঝারি মানুষ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখে। কোন্ মন্ত্রবলে তিনি এই অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, তাহার তাহারা ঠাহর পায় না। বস্তুতই তিনি মন্ত্রবলে তাহা করেন। মনন-কর্ম্মের জন্য মন্ত্রের প্রয়োজন। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে তিনি যে সূত্রের আকার দিয়াছেন, সেই এক-একটি সূত্র এক-একটি মন্ত্র। তিনি স্বয়ং সেই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি। সেই সূত্রের মধ্যে যে নামগুলি, যে সংজ্ঞাগুলি, যে শব্দগুলি, যে conceptগুলি বসিয়া আছে, তাহারা সেই সেই মন্ত্রের দেবতা। আদি-ঋষি বিশ্ববিধাতার মত তিনি সেই দেবতাগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং শব্দময়ী মূর্ত্তি দিয়া তাহাদিগকে বাঙ্ময় জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। স্বয়ং হোতা সাজিয়া, তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন; অধ্বর্য্যু সাজিয়া তাহাদের তৃপ্তিবিধান করিতেছেন; উদ্গাতা সাজিয়া তাহাদের স্তোত্র

গায়িতেছেন ; আবার আথর্ব্বণিক ঋত্বিক্ সাজিয়া, তাহাদিগকে বশীকরণ করিয়া, শান্তি পুষ্টি ও অভিচার কর্ম্মে তাহাদিগকে খাটাইয়া লইতেছেন।

আজকাল কথায় কথায় বলা হয়, এই Laws of Natureগুলা, এই প্রাকৃতিক নিয়মগুলা কেবল description মাত্র, কেবল বিবরণ মাত্র, কেবল predication মাত্র, কতকগুলা statement বা proposition মাত্র। এই propositionএর সমস্ত terms—ইহার subject এবং predicate উভয়েই conceptual। সহজে মনে রাখিবার জন্য এবং অক্লেশে প্রয়োগের জন্য এই conceptগুলাকে এমন আকার দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে ঐ statementগুলা যথাসম্ভব ছোট এবং সরল হয়। এমন সাঙ্কেতিক ভাষার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে যে, সেই ভাষা ব্যবসায়ী ভিন্ন অপরে সহজে বুঝিতে পারে না এবং অপরে প্রয়োগ করিতেও পারে না। ব্যবসায়ীর নিকট প্রত্যেক term, প্রত্যেক নাম, প্রত্যেক শব্দ অর্থপূর্ণ ; কিন্তু অন্যের কাছে উহা অর্থহীন হিং টিং ছট্ মাত্র। অব্যবসায়ীর কাছে এই হিং টিং ছট্ যতই অর্থশূন্য gibberish বা যতই mysterious হউক, যিনি ব্যবসায়ী, তিনি ইহার অর্থ জানেন। ইহার প্রত্যেক দেবতা তাঁহার পরিচিত এবং অধীন। তিনি যথাযথ এই মন্ত্রের বিনিয়োগ করিয়া দেবতাগুলিকে বশে রাখিতে পারেন। এই যে সাঙ্কেতিক ভাষা, ইহা যেন shorthandএর ভাষা। ব্যবসায়ীর নিকট সুগম, অব্যবসায়ীর কাছে হিজি-বিজি মাত্র। ইহার উদ্দেশ্য—কেবল মনন-কর্ম্মে শ্রম-সংক্ষেপ—economising of thought। এই shorthandএর আশ্রয় লইয়া, বৈজ্ঞানিকেরা ছোট্ট formulaগুলিকে অক্লেশে মনের ভিতর পূরিয়া রাখেন এবং স্বেচ্ছা মাত্রে অক্লেশে তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া প্রয়োগ করেন। এই জন্যই বলা হয়, physical laws are mere description in conceptual short-hand of the perceptual world। যে-কোন বিবরণ conceptual termsএই description। গরুর চারি পা আছে এবং মৌমাছিতে মধু খায়, এই যে বিবরণ, ইহাও conceptual languageএই বিবরণ। কেন না, গোড়াতেই বলিয়াছি, গরু এবং মৌমাছি, কোন জীয়ন্ত গরু বা জীয়ন্ত মৌমাছিকে বুঝায় না ; পা বলিলে আমার পা—তোমার পা বুঝায় না ; মধু বলিলেও আমার ঘরে যে মধুটুকু সঞ্চিত আছে, তাহাকে বুঝায় না। এই সকল বিবরণে এবং বৈজ্ঞানিকদের দত্ত প্রাকৃতিক নিয়মের বিবরণে এই

হিসাবে জাতিগত কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু ঐ বাক্যকে আমি একটু শোধন করিয়া লইতে চাই। আমি বলিব, physical laws are descriptions in conceptual shorthand of a conceptual world। কেন না, এই জগৎ Mean Manএর জগৎ; কোন জীয়ন্ত মানুষের জগৎ নহে। এই Mean Man নিজেই একটা কল্পিত মানুষ; উহার জগৎও কল্পিত জগৎ; উহা perceptual বা real জগৎ হইতে পারে না। মানুষ প্রকৃত পক্ষে এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। মনুষ্যকর্তৃক সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ছিল না। সৃষ্টির পর ইহা আবির্ভূত হইয়াছে। ইহা বাস্তবিকই creationএর ব্যাপার। এই creation—অ-সৎ হইতে সতের উৎপাদন। যাহা ছিল না, তাহা সৃষ্টিকর্ম্মের ফলে উৎপন্ন হয়। আগেই বলিয়াছি, সৃষ্টিকর্ত্তা যে মানুষ, তিনি এখানে free agent। এই সৃষ্টিকর্ম্ম তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা-প্রসূত। প্রত্যেক মানুষেরই অল্পাধিক পরিমাণে এই সৃষ্টিক্ষমতা রহিয়াছে। কাহারও অল্প আছে, কাহারও অধিক আছে,—কাহারও বা অত্যন্ত অধিক আছে। যাহাদের অত্যন্ত অধিক আছে, তাহারা বড়লোক, তাহারা মাঝারি মানুষ হইতে দূরে ছটকিয়া পড়িয়াছে। এ ক্ষেত্রে তাহারাই genius। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যাঁহারা genius, তাঁহারা ক্রমশঃ এই বাঙ্ময় জগতের সৃষ্টি করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন।

এই ক্ষমতার নাম দেওয়া যাইতে পারে—intelligence। ইংরেজী দার্শনিক-সাহিত্যে intelligence শব্দের ঠিক তাৎপর্য্য কি, তাহা আমি জানি না। বের্গসনের বহিতে দেখিলাম, তিনি ইহাকে tool-making faculty বলিয়াছেন। এই tool শব্দের অর্থ—অস্ত্রশস্ত্র, হাতিয়ার। যে-কোন দ্রব্য কর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাই হাতিয়ার। এই অর্থে হাত, পা, দাঁত প্রভৃতি আমাদের স্বভাবদত্ত হাতিয়ার। এই স্বভাবদত্ত হাতিয়ারগুলার কাজ supplement করিবার জন্য আমরা জড় জগৎ হইতে হাতিয়ার তৈয়ার করি। লাঠি, সোটা, তীর, বল্লম হইতে আরম্ভ করিয়া, ঘড়ি, ষ্টীমএঞ্জিন, দূরবীক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্তই এই অর্থে হাতিয়ার। বের্গসনের মতে এই হাতিয়ার তৈয়ার করা intelligenceএর কাজ। কোন একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হাতিয়ারের ব্যবহার হয়। যিনি হাতিয়ার তৈয়ার করেন, তিনি সাবেক অভিজ্ঞতা বা experienceএর উপর ভর দিয়া, মনে মনে একটা design বা নক্শা তৈয়ার করিয়া লন। এই যে নক্শাটি, ইহা

একটি conceptual হাতিয়ার। সেই conceptটাকে বাহিরে আনিয়া যখন তাহাকে একটা মূর্ত্তি দেওয়া যায়, তখন ঐ conceptual হাতিয়ারটি কর্ম্মসাধনোপযোগী perceptual হাতিয়ারে পরিণত হয়। তখন উহা perceptionএর বিষয় বা প্রত্যক্ষগোচর হয়। একটা অশরীরী conceptionকে এইরূপে একটা perceptible objectএ পরিণত করা, ইহাই intelligenceএর কাজ। যাহা প্রত্যক্ষ বস্তু, যাহা preceptionএর বিষয়, তাহাকেই real বলা যাইবে, এইরূপ আমি স্থির করিয়া লইয়াছি। এখন বলা যাইতে পারে, একটা conceptকে preceptএ পরিণত করা বা realএ পরিণত করা বা realise করা, ইহাই intelligenceএর কার্য্য। কিন্তু এই realisationএর পূর্ব্বে মনে মনে একটা conceptual design খাড়া না করিলে চলে না। এই conceptual design প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা থাকার দরকার। বাহ্য জগতে অবস্থিত perceptগুলি অবলম্বন করিয়া, তাহাদিগকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া মিলাইয়া-মিশাইয়া যে নূতন concept করা হয়, সেই conceptকে আবার মূর্ত্তি দিয়া বাহ্য জগতে প্রক্ষেপ করিয়া, একটা নূতন-গোছের perceptible objectএ পরিণত করা, এ সমস্তটাই আমি intelligenceএর কাজ বলিতে চাহি। এই অর্থে intelligence নিজেই একটা হাতিয়ার; উহা Reasonএর হাতে একটা হাতিয়ার বা instrument। Reasonএর কার্য্যের দুই ভাগ। প্রথম ভাগে কতকগুলা বাহিরের percept হইতে একটা concept গড়িয়া তোলা হয়; এই কাজটা designerএর কাজ। দ্বিতীয় ভাগে সেই design অনুসারে একটা নূতন perceptual object নির্ম্মাণ করা হয়। এই ভাবকে architect, fashioner বা modellerএর কাজ বলা যাইতে পারে। এই প্রথম অংশটুকুই প্রকৃতপক্ষে Science। দ্বিতীয় অংশটুকুকে Science না বলিয়া Art বলা যাইতে পারে। Science এবং Artএ প্রভেদ কি, আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি বলিব যে, Science উপস্থিত perceptগুলি অবলম্বন করিয়া নূতন নূতন concept গঠন করেন। আর Art, Scienceএর নিকট সেই conceptগুলি ধার করিয়া লইয়া, তাহাকে বাহিরে realise করেন। কার্য্যতঃ Scienceকে এবং Artকে হাত-ধরাধরি করিয়া একযোগে চলিতে হয়। বিজ্ঞান-বিদ্যা কলাবিদ্যাকে ছাড়িয়া চলিতে পারেন না। কলাবিদ্যাও পদে পদে বিজ্ঞান-

বিদ্যার মুখাপেক্ষী হইয়া চলেন। কিন্তু মুখ্যতঃ Scienceএর কারবার conceptual worldএ, বা নামের জগতে; এবং Artএর কারবার perceptual worldএ, বা রূপের জগতে। প্লেটো যে বলিয়াছিলেন, conceptগুলা বা ideaগুলাই বিশুদ্ধ জিনিস, আর বাহ্য জগতে যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় তাহা ময়লা জিনিস, তাহা এক হিসাবে ঠিক বটে। কোন artistএরই সাধ্য নাই যে, তিনি বৈজ্ঞানিকদিগের খাঁটি conceptগুলিকে সম্পূর্ণভাবে realise করেন। কিছু-না-কিছু ময়লামাটি-আবর্জ্জনা তাঁহাকে মিশাইতেই হয়। একটা দৃষ্টান্ত লইব। গল্প আছে, হাওয়ার বেগে ছাদ হইতে ঝাড় দুলিতেছে দেখিয়া গ্যালিলিও পেণ্ডুলমের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, ঝাড়টার প্রত্যেক দোলনে ঠিক সমান সময় লাগিতেছে। অতএব একটা পেণ্ডুলমকে দোলাইয়া দিলে উহার প্রত্যেক দোলনেই সমান সময় লাগিবে। পেণ্ডুলমের দৈর্ঘ্য কমাইয়া বাড়াইয়া, সেই সময়টুকু কমান বাড়ান চলিতে পারিবে। এইরূপে পেণ্ডুলমের দ্বারা সময়-নিরূপণ চলিতে পারে। ইহা হইতেই ক্লক-ঘড়ির উৎপত্তি হইল। গালিলিও ছিলেন—বৈজ্ঞানিক। তিনি এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীরা কতকগুলা experiment এবং observationএর সাহায্যে একটা concept গড়িয়া তুলিলেন। আপনারা simple pendulumএর নাম শুনিয়া থাকিবেন। ঐ simple pendulumটাই সেই concept। কিন্তু এই simple pendulumএর বাহ্য জগতে অস্তিত্ব নাই। উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক পদার্থ। একগাছি সুতায় একটা বল্ বা ভাঁটা ঝুলাইলে কতকটা simple pendulumএর মত হয় বটে, কিন্তু কতকটা মাত্র। Simple pendulumএর যে সূতা, তাহা অশরীরী। কোন chemical balance উহার ওজন ধরিতে পারিবে না। উষ্ণতাভেদে উহার দীর্ঘতারও কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। ঐ সূতায় যে ball ঝুলান আছে, উষ্ণতাভেদে উহা ছোট-বড় হইবে না। কাজেই বৈজ্ঞানিকের এই যে simple pendulum—কেহ কখন চোখে দেখে নাই, দেখিবেও না। উহার বসতি নামের জগতে; রূপের জগতে উহার স্থান নাই। কিন্তু এই simple pendulumএ মানুষের কোন কাজ চলিবে না। Artist বা কারিকর যখন সময়-নিরূপণের জন্য pendulum তৈয়ার করিতে যান, তখন তাঁহাকে পিতলের বা লোহার তারে পিতলের বা লোহার ভাঁটা ঝুলাইতে হয়। সেই তারটার ওজন নগণ্য নহে। গরমে

উহা লম্বা হয়, হাওয়া লাগিয়া উহাতে মরিচা ধরে। কাজেই কোন কারিকরে এ পর্য্যন্ত simple pendulum গড়িতে পারে নাই। কারিকরের হাতে-গড়া পেণ্ডুলম ঠিক সময় রাখিতেও পারে না। যে পেণ্ডুলম আমরা চোখে দেখি এবং কাজে লাগাই, উহার reality থাকিতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের চোখে উহা খাঁটি জিনিস নহে। খাঁটি simple pendulumএ খানিকটা ময়লামাটি দিয়া উহা তৈয়ার করিতে হইয়াছে। পিতলটুকু বা লোহাটুকু সেই ময়লামাটি। উহা প্রকৃতপক্ষে আবর্জ্জনা। কেন না, উহাকে বর্জ্জন করিতে পারিলে বৈজ্ঞানিকের মনের মত simple pendulum হইত। বর্জ্জন করিতে পারা যায় নাই বলিয়া উহা বৈজ্ঞানিকের ঠিক মনঃপূত হয় নাই। উহা ঠিক সময় রাখিতে পারিতেছে না। শীত-গ্রীষ্মে উহার compensationএর ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। মরিচা ধরিলে তেল দিতে হইতেছে। বৈজ্ঞানিক খাঁটি জিনিস লইয়া কারবার করেন। Artist বা কারিকর সেই খাঁটি জিনিসে ময়লা মিশাইয়া, কোনরূপে চলনসই করিয়া কাজে লাগান। কাজটা আগাগোড়া intelligenceএর ব্যাপার। তাহার বলেই বৈজ্ঞানিক pendulumএর design তৈয়ার করিয়াছেন। আর কারিকর সেই designটাকে বাহিরে realise করিয়া একটা toolএ বা হাতিয়ারে পরিণত করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক তাঁহার মনের ভিতরের designটাকে যখনই ব্যক্ত করিতে যান, লোহা পিতলের সম্পর্ক না রাখিয়া যদি কেবল কাগজ পেন্সিলেই pendulumএর নক্সা আঁকিতে যান, তখনই তাঁহাকে ক্ষণেকের জন্য artist সাজিতে হয়। কেন না, পেন্সিলে-আঁকা পেণ্ডুলমটাও রূপের জগতের জিনিস—উহা অসম্পূর্ণ জিনিস—উহা simple pendulumএর নক্শা নহে। আবার কারিকর যখন বৈজ্ঞানিকের পদতলে বসিয়া সেই নক্শার ভিতরের তত্ত্বটুকু আয়ত্ত করিতে যান, তখনই তিনি ক্ষণেকের জন্য বৈজ্ঞানিক সাজেন। তথাপি বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক মাত্র এবং শিল্পী শিল্পী মাত্র। উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক্। যিনি designer, তিনি architect না হইতেও পারেন এবং যিনি architect, তিনি designer না হইলেও চলিতে পারে। বৈজ্ঞানিক designer—তিনি বাঙ্ময় জগতের সৃষ্টি করেন—তাহা চর্ম্মচক্ষুতে দেখিতে পান না, মানস-চক্ষুতেও অনুভব করেন না; হয়ত দিব্য চক্ষুতে তাহা দেখেন। বাঙ্ময় জগৎকে যদি নিতান্তই সৎপদার্থ বল, তাহা হইলে তিনি অসৎ হইতে সৎএর কল্পনা

করেন, সৃষ্টি করেন, create করেন। আর যে শিল্পী—সে সেই অমূর্ত্ত সৎপদার্থকে মূর্ত্তি দেয়—একটা ideaকে সে realise করে। বিশুদ্ধ শব্দকে সে ময়লা করিয়া, বাহিরে প্রত্যক্ষ মূর্ত্ত পদার্থে পরিণত করে। সে সৃষ্টি করে না; কেবল model করে।

আজি আর না। নিশ্চয় আপনারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কথার জঙ্গলে পথ হারাইয়াছেন কি না জানি না। প্রাতিভাসিক জগৎ আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব জগৎ, প্রত্যেকের প্রত্যক্ষলব্ধ অতএব real জগৎ। ঐ প্রত্যক্ষ প্রাতিভাসিক জগতের যে অংশকে আমাদের সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি বলিয়া মনে করি, উহাকেই বাহ্য জগৎ বলি; উহা যখন সকলের, তখন উহা কাহারও নিজস্ব নহে;—অতএব উহা কাহারও আন্তর নহে, সকলেরই বাহ্য। পরস্পর ব্যবহারের জন্য উহার অস্তিত্ব স্বীকার করি, অতএব উহা ব্যাবহারিক জগৎ। এই ব্যাবহারিক জগতের বিবরণ দিতে বিজ্ঞান-বিদ্যা নিযুক্ত আছেন। বৈজ্ঞানিকেরা ঐ ব্যাবহারিক জগতের সন্ধানে বাহির হন; কিন্তু ইহাকে ধরিতে পারেন না, ইন্দ্রিয় দ্বারা ধরিবার চেষ্টা হয়; কিন্তু এক-একজনে এক-এক রকম সাক্ষ্য দেয়। অগত্যা সকলের সাক্ষ্য মিলাইয়া মিশাইয়া তাঁহারা একটা মন-গড়া জগৎ নির্ম্মাণ করেন। উহা সংজ্ঞায় নির্ম্মিত, নামে নির্ম্মিত, শব্দে নির্ম্মিত, এ জন্য উহা বাঙ্ময় জগৎ। উহা কাহারও প্রত্যক্ষ হয় না; প্রত্যক্ষ হইবারও নহে। কেন না, যে Mean Man তাহার সাক্ষী, সে স্বয়ং অপ্রত্যক্ষ। বৈজ্ঞানিক এই জগতের designer ও creator, উহার কল্পনাকর্ত্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনি স্বকর্ম্মোপযোগী করিয়া স্বাধীন ভাবে নিজের মনের মত করিয়া উহাকে গড়িয়াছেন। কিন্তু তিনি চর্ম্মচক্ষুতে উহা দেখেন না; মানস-চক্ষুতে বা দিব্য চক্ষুতে উহা দেখেন। এই বাঙ্ময় জগৎ লইয়াই বিজ্ঞান-বিদ্যার কারবার। ইহা অশরীরী ও অমূর্ত্ত। ইহা প্রত্যক্ষ নহে; কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না; অথচ আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, ইহারই নাম জড় জগৎ। আমি বলিতে চাই যে, বিজ্ঞান যাহাকে জড় জগৎ বলে, যাহাকে material world বলে, তাহাই এই অমূর্ত্ত জগৎ। সত্য প্রাতিভাসিক জগৎকে material world বলা চলিতে পারে না; উহার যে অংশ প্রত্যেকের নিকট বাহ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকেও material world বলা চলে না। ব্যাবহারিক জগতের সন্ধানে চলিয়া বৈজ্ঞানিক যে

অমূর্ত্ত জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই জড় জগৎ। ইহাকে যদি অসত্য জগৎ বলিতে চাহেন, আমার তাহাতে আপত্তি হইবে না। ব্যাবহারিক বাহ্য জগতের সহিত ইহার সম্বন্ধ নিরূপণ আবশ্যক। তজ্জন্য আমাকে অগাধ জলে সাঁতার দিতে হইবে।

বাস্তবিকই এবার আমাকে অগাধ জলে সাঁতার দিতে হইবে। Physical scienceএর গোড়ার কথাগুলা তোলপাড় করিয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে। Physical scienceএ আপনাদের অনেকে হয়ত অব্যবসায়ী। আপনাদের আমার সঙ্গে আসিতে ভয় হইবে। আমাকে হিজিবিজি ভাষায় কথা কহিতে হইবে। সে ভাষা আপনাদের অভ্যস্ত নহে। কিন্তু আপনারা সকলেই পণ্ডিত। আপনাদের বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি আছে। সমুদ্রের জলে ডুব দিয়া ডুবুরির মত দুই চারিটা মুক্তা-শুক্তি যদি তুলিতে পারি, আপনারা সেই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির প্রভায় তাহা যাচাই করিয়া লইতে পারিবেন।

জড় জগৎ

জড় জগতের কথা বলিব ; আপনারা অবধান করুন। আজিকার খোরাক লঘুপাক হইবে না। উহা রুচিকর করিতেও পারিব কি না সন্দেহ। আপনাদের বমনোদ্রেক না হইলেই সন্তুষ্ট থাকিব। দয়া করিয়া ধৈর্য্য রক্ষা করুন, ইহাই এই অধীনের বিনীত অনুরোধ।

জগতের নানা বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছি। প্রাতিভাসিক জগৎ, ব্যাবহারিক জগৎ, বাহ্য জগৎ, বাঙ্ময় জগৎ, জড় জগৎ—কোন্ বিশেষণটার কি তাৎপর্য্য, তাহা স্পষ্ট ভাবে সম্মুখে রাখিতে হইবে,—কথার ধাঁধায় দিশাহারা হইলে চলিবে না।

গোড়ায় বহুজীববাদ মানিয়া লইব। আমি যেমন চেতন জীব, আপনারা প্রত্যেকে ঠিক সেইরূপ চেতন জীব,—এইটুকু মানিয়া না লইলে পরস্পর আদান-প্রদান বা ব্যবহার চলে না, জীবনযাত্রা চলে না, জীবনযাত্রা আদৌ আবশ্যক হয় না। অতএব মানিয়া লইব, আমি যেমন চেতন জীব, আপনারাও ঠিক তেমনই চেতন জীব ; আমিও যেমন আমার প্রত্যক্ষ জগতের মাঝখানে বসিয়া আছি, আপনারাও তেমনই আপন আপন প্রত্যক্ষ জগতের মাঝখানে বসিয়া আছেন। এই প্রত্যক্ষসমষ্টির নাম দিয়াছি প্রাতিভাসিক জগৎ। আমার প্রত্যক্ষসমষ্টি যেমন আমার প্রাতিভাসিক জগৎ, আপনাদের প্রত্যক্ষসমষ্টিও তেমনই আপনাদের প্রত্যেকের প্রাতিভাসিক জগৎ। চেতন জীবের সংখ্যা বহু ধরিয়া লইয়াছি,—প্রাতিভাসিক জগতের সংখ্যাও তদনুসারে বহু। এই প্রাতিভাসিক জগৎ আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেকের নিজস্ব জগৎ। আমার প্রাতিভাসিক জগতের সহিত আপনার প্রাতিভাসিক জগতের কোন বিষয়ে কোন অংশে কোনরূপ সাদৃশ্য বা সামান্য আছে কি না, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই,—জানা দূরে থাকুক, তাহা অনুমান করিবার কোন উপায় বা কোন অধিকার আছে কি না সন্দেহ। অথচ আমরা ধরিয়া লই,—আমার প্রাতিভাসিক জগতের কিয়দংশ আপনার প্রাতিভাসিক জগতের কিয়দংশের সহিত তুল্য, সদৃশ বা সমান। সেই অংশ আমাকে যেরূপ অভিভূত করিতেছে, আপনাকেও সেইরূপ অভিভূত করিতেছে। আমিও সেই অংশকে যে ভাবে দেখিতেছি, আপনিও সেই

ভাবে দেখিতেছেন। এইটুকু ধরিয়া লই বলিয়াই আপনার সহিত আমার আদান-প্রদান কারবার বা ব্যবহার সম্ভবপর হইয়াছে। বহু জীবের সহিত যখন আমাকে কারবার করিতে হয়, তখন আমাদের সকলেরই প্রাতিভাসিক জগতের অন্ততঃ একটা অংশকে তুল্যরূপ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়; না মানিলে জীবনযাত্রা চলে না। বহু চেতন জীবের বহু প্রাতিভাসিক জগতের যে অংশটিকে আমরা এইরূপে সকলে মিলিয়া সমান বা সদৃশ বা তুল্যরূপ মনে করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি বা অভ্যস্ত হইয়াছি, সেইটুকুর নাম দিয়াছি ব্যাবহারিক জগৎ। পরস্পর ব্যবহারের জন্য উহাকে ঐ তুল্যরূপে দেখিতেছি বলিয়াই নাম দিয়াছি ব্যাবহারিক জগৎ। এই ব্যাবহারিক জগৎ প্রাতিভাসিক জগতেরই একটা অংশ মাত্র; একটা বিশেষ কারণে আমরা বাধ্য হইয়া এই অংশকে অপর অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছি মাত্র। বস্তুগত্যা আমাদের প্রত্যেকের প্রাতিভাসিক জগৎ আমাদের প্রত্যেকের সর্ব্বতোভাবে নিজস্ব; কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা তাহার একাংশকে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে একরূপ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। ঐ অংশে নিজের সম্পূর্ণ অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য চেতন জীবেরও তুল্য অধিকার মানিয়া লইয়াছি। প্রাতিভাসিক জগতের ঐ অংশ বস্তুতঃ না হইলেও কার্য্যতঃ, পরমার্থতঃ না হইলেও ব্যবহারতঃ সর্ব্বসাধারণের জগৎ। যাহা কাহারও নিজস্ব নহে, তাহা কাহারও অপেক্ষা রাখে না, তাহা সম্পূর্ণভাবে স্ব-তন্ত্র। আমি থাকিলেও উহা থাকিবে, আমি না থাকিলেও উহা অন্যের পক্ষে অন্যের জন্য থাকিবে। অতএব উহা কাহারও অন্তরের নহে, উহা সকলেরই বাহিরের। কেন না, এইরূপ স্বতন্ত্র ভাবে থাকার, এইরূপে অন্যের নিরপেক্ষ হইয়া থাকার নামই বাহিরে থাকা। বাহিরে থাকা কথাটার আর কোন মানেই নাই। অতএব এই যে ব্যাবহারিক জগৎ, উহারই এই কারণে নাম দিয়াছি বাহ্য জগৎ। প্রাতিভাসিক জগতের অংশ হইলেও উহাকে আমরা প্রাতিভাসিক জগৎ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া যেন বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছি। ঐ অংশে আপনার মমত্বটুকু ত্যাগ করিয়া মৎসদৃশ অন্যান্য চেতন জীবের তুল্য অধিকার স্থাপন করিয়াছি। আমি প্রাতিভাসিক জগতের কিয়দংশকে সম্পূর্ণ নিজস্ব রাখিয়া অপরাংশকে অপরের জন্য টানিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছি, সেই অংশটাই ব্যাবহারিক জগৎ ও বাহ্য জগৎ, আর যে অংশ এখনও সর্ব্বতোভাবে আমার নিজস্ব রহিয়াছে, তাহাই আমার অন্তর্জগৎ।

আমার অন্তর্জগৎ কিরূপ, তাহা আমি জানি ; তোমার অন্তর্জগৎ কিরূপ, তাহা তুমি জান ; কিন্তু আমার অন্তর্জগৎ তোমার জানিবার কোন উপায় নাই, তোমার অন্তর্জগৎ আমার জানিবার কোন উপায় নাই। উহা যখন আমাদের নিজস্ব সামগ্রী, তখন পরস্পরকে জানাইবার কোন বিশেষ প্রয়োজনও নাই। কিন্তু ঐ যে ব্যাবহারিক জগৎ—যাহাকে বাহ্য জগৎ বলিয়াছি, উহা যখন পরস্পরে ব্যবহারের জন্যই ঐরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার দ্বারাই যখন আমরা পরস্পর কারবার করিয়া থাকি, তখন পরস্পর ব্যবহারের জন্যই উহার পরিচয়েরও আদান-প্রদান করিতে হইবে। ঐ বাহ্য জগৎ আমার কাছে কিরূপে আসিতেছে, তোমার কাছে কিরূপে যাইতেছে, ইহা পরস্পরকে জানাইতে হইবে। সকলে মিলিয়া মিশিয়া ঐ বাহ্য জগতের লক্ষণ নিরূপণ করিতে হইবে। এই লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া বড়ই গোলে পড়িতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জানাইবার প্রধান উপায় অথবা এক মাত্র উপায়—বাক্য। বাক্যের দ্বারায় আমরা বাহ্য জগতের বিবরণ দিই। বাহ্য জগৎ কি মূর্ত্তি লইয়া, কি রূপ হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়ায়, আমি তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করি। তোমার নিকটেও যে মূর্ত্তি, যে রূপ লইয়া দাঁড়ায়, তুমিও তাহা বাক্যের দ্বারায় আমার নিকট প্রকাশ কর। এই বাক্যগুলি কতকগুলি শব্দের সমষ্টি। এক-একটা শব্দ এক-একটা সঙ্কেত। এক সঙ্কেত যদি সকলের নিকট এক অর্থই প্রকাশ করে, তবেই তাহার সার্থকতা থাকে। এক শব্দেই যদি ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আরোপ করে, তাহা হইলে শব্দের প্রয়োগ নিষ্ফল হয়। বাহ্য জগৎ যে মূর্ত্তি লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, কতকগুলি নাম দিয়া, কতকগুলি শব্দ দিয়া আমরা তাহার একটা প্রতিমা গড়ি এবং সেই প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই প্রতিমাকেই বাহ্য জগতের স্বরূপের প্রকাশ বলিয়া ধরিয়া লই। আমরা সকলে মিলিয়া মিশিয়া এই যে প্রতিমা গড়িয়াছি, ইহা বস্তুতঃ একটা বাঙ্ময়ী প্রতিমা। বাহ্য জগতের অর্থাৎ প্রাতিভাসিক জগতের ব্যাবহারিক অংশের যে মূর্ত্তি আমরা অন্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি, এই প্রতিমাকে তাহার অনুরূপ বা অনুকল্প বলিয়া ধরিয়া লই। এই যে প্রতিমা, ইহা একটা মন-গড়া প্রতিমা মাত্র। বাক্যের দ্বারায় নির্ম্মিত বলিয়া ইহার নাম দিয়াছি—বাঙ্ময় জগৎ। এই বাঙ্ময় জগৎ পূর্ব্বকথিত বাহ্য জগতের প্রতিমা মাত্র। ধ্যানগোচর দেবতার সহিত মৃন্ময় প্রতিমার যেরূপ সম্পর্ক, বাহ্য জগতের প্রকৃত মূর্ত্তির সহিত

বাহ্য জগতের এই বাঙ্ময় প্রতিমার কতকটা সেইরূপ সম্পর্ক। প্রাতিভাসিক জগৎ প্রত্যক্ষ বস্তু; উহার যে অংশ ব্যবহারার্থ বাহ্য জগৎরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহাও প্রত্যক্ষ বস্তু। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ বস্তুর গায়ে আমরা যে নামের টিকিট বসাইয়া দিই, সেই নামটা কখনও সেই অর্থে প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে পারে না। পদ্মলোচন মানুষটা যে অর্থে প্রত্যক্ষ, পদ্মলোচন নামটা কখনও সেই অর্থে প্রত্যক্ষ বস্তু নহে। বাহ্য জগৎ যে অর্থে প্রত্যক্ষ, বাহ্য জগতের সেই বাঙ্ময় প্রতিমা কখনও সেই অর্থে প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা প্রধানতঃ এই বাঙ্ময় জগৎ তৈয়ার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরিভাষা মতেই ইহার অপর আখ্যা জড় জগৎ হইয়াছে। এ-কালের বিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে জড় জগৎ বলে, Material World বলে, তাহা প্রত্যক্ষ বাহ্য জগৎ নহে, বাহ্য জগতের কল্পিত বাঙ্ময় প্রতিমা মাত্র। কল্পিত প্রতিমা এই জন্য বলিতেছি যে,—উহার কল্পনা অন্যরূপ হইতেও পারিত। ঘটনাক্রমে বিজ্ঞান-বিদ্যার ইতিহাস যেরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ঘটনাচক্র অন্যরূপ হইলে বিজ্ঞান-বিদ্যার ইতিহাস অন্যরূপ হইতে পারিত। গ্যালিলিও ও নিউটন বিজ্ঞান-বিদ্যাকে যে পথে চালাইয়াছেন, তাঁহাদের অনুবর্ত্তীরা সেই পথে চলিয়া যে কল্পনা খাড়া করিয়াছেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহারা যদি সে পথে না চালাইতেন, অথবা তাঁহাদের তুল্য প্রতিভাশালী অন্য লোকে যদি অন্য পথে চালাইতেন, তাহা হইলে আমরা অন্য পথে আসিয়া অন্যরূপ কল্পনা গ্রহণ করিতাম। প্রতিমাটা যখন প্রতীক মাত্র, সাঙ্কেতিক ব্যাপার মাত্র, convention মাত্র, তখন সেই কল্পনা স্বচ্ছন্দে অন্যরূপ হইতে পারিত। ঘটনাচক্রে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাই আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতেই আমাদের ব্যবহার চলিতেছে, তাহাতেই আমাদের জীবনযাত্রার সুবিধা বই অসুবিধা ঘটে নাই; কাজেই আমরা সেই বিশিষ্ট কল্পনাটাকে ধরিয়া রাখিয়াছি, সেই কাঠামও বজায় রাখিয়া পাঁচ রকমের রঙ ফলাইতেছি, নূতন নূতন সাজ বসাইতেছি, আবশ্যক-মত মেরামত করিয়া লইতেছি, অথবা নূতন নূতন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বসাইয়া পূর্ণতা সাধনের প্রয়াস করিতেছি। আমি বলিতে চাহি যে, বাহ্য জগতের সেই কল্পিত প্রতিমাই বৈজ্ঞানিকদের জড় জগৎ। বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে জড় জগৎ বলেন, তাহা একটা কৃত্রিম বস্তু। প্রত্যক্ষ বস্তুকে যদি সত্য বস্তু বলা যায়, তাহা হইলে উহা কখনই সত্য বস্তু নহে।

আমরা সকলে বৈজ্ঞানিক নহি। আমরা সাদাসিধা মানুষ। আমরা রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ, এই সকল প্রত্যক্ষ সামগ্রী লইয়াই কারবার করিতে চাই। আমাদের নিকট বাহ্য জগৎ এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ, এই পঞ্চ প্রত্যক্ষ পদার্থে নির্ম্মিত। বাহ্য জগৎ এই প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি লইয়াই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকে। কোন বাহ্য বস্তুর বিবরণ দিতে হইলেই আমরা বলি—উহা ঠাণ্ডা না গরম, তিক্ত বা মিষ্ট, রাঙ্গা বা নীলা, কোমল বা কঠিন। আমরা যে বাহ্য বস্তুর এইরূপ বিবরণ দিই, ইহা আমাদের বৈজ্ঞানিকতার অভাবে। বৈজ্ঞানিকেরা এ জন্য আমাদিগকে অবজ্ঞা বা উপহাস করিবেন। এই যে রূপ-রস-শব্দাদি, এইগুলিকে আমরা sensation বা অনুভূতি বলি। যে-কোন Physical Scienceএর বহি খুলিয়া দেখুন, এই sensation-গুলিকে যথাসাধ্য বর্জ্জন করিয়া বাহ্য জগতের বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা দেখিতে পাইবেন। সর্ব্বত্র দেখিবেন এই চেষ্টা। তাপ-বিজ্ঞানের অধ্যায়টা খুলিয়া দেখুন, আমরা যেখানে বলি—দুধটা গরম, বৈজ্ঞানিক সেখানে বলিতেছেন—দুধের উষ্ণতা বা temperature এত ডিগ্রি। কিন্তু সে temperature মাপিবার সময় তিনি স্পর্শেন্দ্রিয়কে একেবারেই বিশ্বাস করিতেছেন না, দেখিতেছেন—thermometerএর পারা কতখানি উর্দ্ধে উঠিতেছে। শব্দ-বিজ্ঞানের অধ্যায় খুলিয়া দেখুন, আমরা যেখানে বলি—এ সুরটা কোমল বা তীয়র, বৈজ্ঞানিক সেখানে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর একেবারে নির্ভর না করিয়া বলিতেছেন, বাতাসে সেকেণ্ডে এত বার ধাক্কা পড়িতেছে। আলোক-বিজ্ঞানের অধ্যায় খুলিয়া দেখুন, আমরা যেখানে বলি—এ রঙটা রাঙ্গা বা নীলা, বৈজ্ঞানিক সেখানে বলিতেছেন, etherএ প্রতি সেকেণ্ডে এত কোটি বার ধাক্কা পড়িতেছে। আমরা যেখানে বলি—এ জিনিসটার আস্বাদন টক, বৈজ্ঞানিক সেখানে বলিতেছেন, এখানে হাইড্রোজেনের ionগুলি স্বাধীন ভাবে এত বেগে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ফলে আমরা দেখি, বাহ্য জগৎ রূপ-রস-শব্দাদিময়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিতে চাহেন, ঐ রূপ-রস-শব্দাদি কেবল accident মাত্র, বাহ্য জগতের আগন্তুক ধর্ম্ম মাত্র। ওগুলিকে যথাসাধ্য বর্জ্জন করিতে পারিলেই বাহ্য জগতের খাঁটি বৈজ্ঞানিক বিবরণ দেওয়া হইবে। আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়াই বাহ্য জগৎকে প্রত্যক্ষ করি, নতুবা আমাদের গত্যন্তর নাই। বৈজ্ঞানিককেও ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া আরম্ভ করিতে হয়; কিন্তু তিনি তাড়াতাড়ি ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্য

বর্জ্জন করিয়া, sensationগুলিকে যথাশক্তি দূরে ফেলিয়া, বাহ্য জগতের বিবরণ দিতে চেষ্টা করেন। এমন কি, বিজ্ঞান-বিদ্যার যে অধ্যায় এ sensationগুলিকে যতটা বর্জ্জন করিতে পারে, সেই অধ্যায়টাই বৈজ্ঞানিকতায় ততটা পূর্ণতা পাইয়াছে। Chemistry বা রসায়ন-শাস্ত্রকে এখনও বহু স্থলে এই অনুভূতিগুলি অবলম্বন করিয়াই কথা কহিতে হয়; সেই জন্য Chemistry-শাস্ত্র এখনও অপূর্ণ। কোন দ্রব্যের বিবরণ দিতে গেলেই রাসায়নিক পণ্ডিতেরা এখনও বলেন—ইহার বর্ণ এইরূপ, স্বাদ এইরূপ, গন্ধ এইরূপ; কিন্তু এই যে বিবরণ, ইহাতে বৈজ্ঞানিকতার পরিচয় নাই, ইহাতে বৈজ্ঞানিকতার অপূর্ণতারই পরিচয়। Physics-শাস্ত্র বা পদার্থ-বিদ্যা ইহার তুলনায় অনেকটা পূর্ণতা পাইয়াছে। যিনি Physics-ব্যবসায়ী, তিনি উষ্ণতার বিবরণ দিতে গিয়া বলেন, এখানে moleculeগুলি বা অণুগুলি এত বেগে ছুটিতেছে; শব্দের বিবরণ দিতে গিয়া বলেন—এখানে তারটা সেকেণ্ডে এত বার কাঁপিতেছে; আলোর বিবরণ দিতে গিয়া বলেন—etherএ ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য এতটুকু; electric current বা তাড়িত-স্রোতের বিবরণ দিতে গিয়া বলেন—ইহা চুম্বকের কাঁটাকে এতটা ঠেলিয়া দেয়। তাঁহারা স্বাদ আর গন্ধ এই দুইটা sensationকে এখনও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। এখনও উহাদিগকে টানাটানি আর ঠেলাঠেলি আর ছুটাছুটির ব্যাপারে বিবৃত করিতে পারেন নাই। কাজেই Physicsএর বহিগুলিতে আপনারা Heat, Sound আর Lightএর অধ্যায় দেখিতে পাইবেন; কিন্তু স্বাদের বা গন্ধের অধ্যায় দেখিতে পাইবেন না। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত sensation ছাড়িয়া না যাওয়া যায়, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা sensationগুলিকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ লইয়াই আমাদের প্রত্যক্ষ বাহ্য জগৎ। এই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ বর্জ্জন করিলে আমাদের নিকট বাহ্য জগতের কিছুই অবশেষ থাকে না। কোন পণ্ডিত, কোন দার্শনিক পণ্ডিত, কোন empirical philosopher বাহ্য জগৎকে বিশ্লেষণ করিয়া রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ ভিন্ন আর কিছুই খুঁজিয়া পাইবেন না। বৈজ্ঞানিক ইহা জানেন, অথচ তিনি বাহ্য জগতের বিবরণ দিতে গিয়া এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দকেই অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল। প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতের বিবরণ দেওয়া বৈজ্ঞানিকের

এক মাত্র ব্যবসায়, অথচ তিনি বাহ্য জগতের সেই প্রত্যক্ষ লক্ষণগুলিকেই একেবারে চাপা দিয়া, উহাদিগকে তাড়াতাড়ি ঠেলিয়া ফেলিয়া, উহাদিগকে একেবারে অতিক্রম করিয়া, উহাদের অন্তরালে বা আড়ালে কি আছে বা কি না-আছে, তাহা দেখিবার জন্য ব্যাকুল। এও একটা মস্ত paradox বা হেঁয়ালি। paradoxটার নিশ্চয়ই একটা মানে আছে। আসুন, আমরা এই মানেটা বুঝিবার চেষ্টা করি।

ঐ যে যাহাকে অনুভূতি বা sensation বলিতেছি, উহার মত প্রত্যক্ষ পদার্থ আর কিছু নাই, উহার মত সত্য পদার্থ আর কিছু নাই; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, উহার কোনরূপ description বা বর্ণনা দেওয়া চলে না। যে অজ্ঞ, তাহাকে উহার কোনরূপ জ্ঞান দেওয়া চলে না। যে জন্মান্ধ, রূপ কি পদার্থ, বর্ণ কি পদার্থ, তাহাকে কিছুতেই বাক্য দ্বারা বুঝান চলে না। যে জন্ম-বধির, তাহাকে শব্দ কি পদার্থ, তাহা কিছুতেই বুঝান চলে না। অনুভূতি মাত্রেরই এই বিশিষ্টত্ব। জন্মান্ধের কথা ছাড়িয়া দিন; যে ব্যক্তি রাঙ্গা জিনিস কখনও দেখে নাই, তাহাকে রাঙ্গা বর্ণ কি, তাহা বাক্যের দ্বারা কিছুতেই বুঝান চলে না। নিতান্তই যদি বুঝাইতে চান, তাহা হইলে একটা রাঙ্গা জিনিস আনিয়া তাহার চোখের সামনে ধরিয়া দেখাইতে হইবে এবং শিখাইতে হইবে —এই যে বর্ণ দেখিতেছ, ইহাই রাঙ্গা। মজা এই যে, তদবধি সে ব্যক্তি রাঙ্গাকে রাঙ্গা বলিলেও রাঙ্গাকে রাঙ্গা দেখিতেছে কি না, উহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলিবে না। রক্তজবাকে আমিও রাঙ্গা বলি, আপনিও রাঙ্গা বলেন; কিন্তু আমরা উভয়ে ঠিক যে এক রকমই দেখি, তাহার প্রমাণ কোথায়? ইন্দ্রিয়-সাদৃশ্য অনুসারে আমরা অনুভূতি-সাদৃশ্য অনুমান করিয়া লই মাত্র। আমিও মানুষ, আপনিও মানুষ, আমারও চোখ সুস্থ, আপনারও চোখ সুস্থ। অতএব আমি ধরিয়া লই, ঐ জবাফুল আমিও যেমন রাঙ্গা দেখিতেছি, আপনিও তেমন রাঙ্গা দেখিতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক কি আমার চোখ ও আপনার চোখ সর্ব্বতোভাবে সমান? উভয়ের চোখের গঠনে, উভয়ের ইন্দ্রিয়-শক্তিতে কি কোনই ভিন্নতা নাই? নিশ্চয়ই আছে। নতুবা আপনিই বা চশমা লয়েন কেন, আর আমিই বা লই না কেন? এই যে ভিন্নতা, এটা ত মোটা। উভয়ের চোখের গঠনে আরও কত যে সূক্ষ্ম ভেদ রহিয়াছে, তাহা কোন চোখের ডাক্তারও ধরিতে পারে না। ফলতঃ আমরা উভয়েই বলি জবাফুল রাঙ্গা; কিন্তু আমি যেমন রাঙ্গা দেখি, আপনি ঠিক তেমন

রাঙ্গা দেখেন না—ইহা নিশ্চয়। উভয়ের রাঙ্গাতে একটু-না-একটু ভেদ আছে, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু কতটুকু ভেদ আছে, কিরূপে বলিব? Helmholtz যে দিন colour sensationএর theory তৈয়ার করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে,—Maxwell যে দিন colour triangle এবং colour pyramid তৈয়ার করিয়া বর্ণ-বিশ্লেষণের এবং বর্ণ-সংশ্লেষণের উপায় বিধান করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের বর্ণানুভূতি মিলাইবার নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে; কিন্তু চাপিয়া ধরিলে দেখা যাইবে যে, গোড়ার সমস্যাটার এখনও মীমাংসা হয় নাই। Sensation জিনিসটা মূলেই comparable বা তুলনীয় নহে। এক জনের অনুভূতির সহিত অপরের অনুভূতির কোনরূপে তুলনা হয় না। ঐ দৃষ্টান্তটাকেই চাপিয়া ধরুন, তাহা হইলে আমার কথাটা স্পষ্ট হইবে।

রাঙ্গা একটা sensation, নীলা আর একটা sensation। উভয়ে ভেদ কি, তাহা আমি জন্মাবধি জানি। জবাফুল দেখিয়া আমি বলি রাঙ্গা, আকাশের পানে চাহিয়া বলি উহা নীলা। আমি আজন্ম জবাফুলকে রাঙ্গা বলিয়া আসিতেছি এবং আকাশকে নীল বলিয়া আসিতেছি, ইহাই আমার শিক্ষা। আপনি বয়সে আমার ছোট। জ্ঞানোদয়ের পর কোন্ রঙকে কি নামে ডাকিতে হয়, আপনি আমারই নিকট শিখিয়াছেন। আমি আপনাকে শিখাইয়াছি, জবাকে রাঙ্গা বলিতে হয়, এবং আকাশকে নীল বলিতে হয়। আমারই শিক্ষা পাইয়া আপনি আজন্ম বলিয়া আসিতেছেন, জবা রাঙ্গা, আর আকাশ নীল। ধরিয়া লইলাম, আমার চোখ সর্ব্বতোভাবে আপনার চোখের সহিত সমান। দর্শনেন্দ্রিয় আমার যেমন সর্ব্বতোভাবে সুস্থ, আপনারও তেমন সর্ব্বতোভাবে সুস্থ। তথাপি আমি যদি জোর করিয়া বলি যে, আমার অনুভূতির সহিত আপনার অনুভূতির আদৌ মিল নাই—আপনি তাহা অপ্রমাণ করিবেন কিরূপে? আমি বলিতে চাহি যে, আপনি জন্মাবধি জবাফুলকে নীলই দেখিতেছেন, আমি আকাশকে যেরূপ নীল দেখি, আপনি জবাফুলকে সেইরূপই নীল দেখিতেছেন। দেখিতেছেন নীল, কিন্তু বলিতেছেন রাঙ্গা; কেন না, আমি আপনাকে ঐরূপই শিখাইয়াছি। আমার শিক্ষা পাইয়া আপনি জবাফুলকে নীল দেখিয়াও চিরকালই রাঙ্গা বলিয়া আসিতেছেন এবং চিরকালই উহাকে রাঙ্গা বলিয়া যাইবেন; কোন কালে নীল বলিবেন না। কাজেই আমার অনুভূতির

সহিত আপনার অনুভূতির কিছু মাত্র মিল না থাকিলেও কস্মিন্ কালেও সেই প্রভেদ ধরা পড়িবে না। আমি যে দ্রব্যকে যে বিশেষণ দিয়া আসিতেছি, আপনিও সেই দ্রব্যকে সেই বিশেষণ দিয়া আসিতেছেন এবং চিরকাল দিতে থাকিবেন। আপনার সহিত আমার ব্যবহারে আদানে প্রদানে কোনরূপই অসুবিধা ঘটিবে না। উভয়েরই জীবনযাত্রা অবাধে নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইবে। ফলে তাহাই হয়। খুব সম্ভব আপনাদের মধ্যেই অনেকে রঙকাণা আছেন। আপনারা নিজেও তাহা জানেন না, অন্যেও তাহা জানে না। যিনি রঙকাণা, তিনি কোন কোন রঙ আদৌ দেখিতে পান না; অথচ সকলেই যে জিনিসকে যে রঙের বলে, তিনিও সেই জিনিসকে সেই রঙের বলিয়া চালাইয়া আসিতেছেন, এ পর্য্যন্ত কখনও ধরা পড়েন নাই। হয়ত দৈবক্রমে এক দিন ধরা পড়িবেন। Helmholtz এবং Maxwellএর theory-মতে রঙ সম্বন্ধে তিনটা মাত্র মূল sensation আছে। এই তিনটা sensation ভিন্ন ভিন্ন ভাগে মিশাইয়া অসংখ্য যৌগিক sensationএর উৎপত্তি হয়। কোন রঙকাণা লোকের যদি সেই মূল sensationএর একটার অভাব থাকে, তাহা হইলে যৌগিক sensationএর বেলায় তাহার সহিত অন্যের প্রভেদ দাঁড়াইয়া যায়। কোন এক নূতন অদৃষ্টপূর্ব্ব যৌগিক রঙের sensation উপস্থিত হইলে যে রঙকাণা, সে এক নাম দেয়, আর যে রঙকাণা নয়, সে অন্য নাম দেয়। তখন হয়ত সে ধরা পড়ে। কিন্তু এরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। আমি যদি গোড়ায় ধরিয়া বসি যে, মূল sensationগুলিতেই আপনাতে আমাতে মিল নাই, অথচ আমিও যে নাম দিই, আপনিও সেই নাম দেন, সেখানে নিরুত্তর হইতে হয়। ফলে sensation জিনিসটাকে তুলনা করিবার কোন উপায়ই নাই। এক জনের sensationকে অপরের sensationএর পাশে রাখিয়া তুলনা করিবার কোন উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। উহা একেবারে অন্তরের সামগ্রী। উহাকে বাহিরে আনিবার কোন উপায়ই নাই। অন্যের সহিত আদান-প্রদানের সময় আমি কেবল নাম লইয়াই কারবার করি। এই নামগুলি কেবল সঙ্কেত মাত্র। এই সঙ্কেতগুলির ব্যবহারে যদি consistency থাকে, যদি কোন খামখেয়ালি না থাকে, তাহা হইলে আদান-প্রদানে জীবনযাত্রায় কোন অসুবিধা ঘটে না। কারবার করি আমরা নাম লইয়া; আসল জিনিসটার স্বরূপের সহিত তাহার নামের কোন

সম্পর্ক থাকা আবশ্যক নহে। সেই স্বরূপটা যিনি যে ভাবেই দেখুন না, তাহাতে কিছুই যায় আসে না। সকলে যদি এক নামে তাহাকে ডাকেন, তাহা হইলে জীবনযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়। এই জীবনযাত্রা নিতান্তই কাজ-চালান ব্যাপার। জীবনের কাজ কোনরূপে চলিয়া গেলে আমাদের মত মাঝারি মানুষের পক্ষে তত্ত্বান্বেষণের এবং তত্ত্বচিন্তার কোন প্রয়োজন থাকে না।

এখন আপনারা বুঝিতে পারিবেন, বিজ্ঞান-বিদ্যা কেন রূপ-রস-গন্ধাদি প্রত্যক্ষ sensationগুলিকে অতিক্রম করিয়া বাহ্য জগতের ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচ্য বিষয় বাহ্য জগৎ। এই বাহ্য জগৎ সর্ব্বতোভাবে ব্যাবহারিক জগৎ। জীবে জীবে আদান-প্রদান বা ব্যবহার না থাকিলে এই জগতের অস্তিত্ব কল্পনা অনাবশ্যক হইত। আদান-প্রদান ব্যবহার করিতে হয় বলিয়াই ইহাকে প্রাতিভাসিক জগতের মাঝে হইতে ছিনিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিতে হইয়াছে। বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে স্বরূপতঃ প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ প্রাতিভাসিক জগতেরই অংশ মাত্র। প্রাতিভাসিক জগতের মধ্যে নানা sensation, নানা feeling, নানা emotion রহিয়াছে ; তাহাদের সংখ্যা নাই। তন্মধ্যে কেবল কয়েকটি মাত্র sensationকে আমরা পৃথক্‌ভাবে—স্বতন্ত্রভাবে দেখি। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ সেই কয়টি sensation। আমি ধরিয়া লই যে, এই কয়টি sensation বিষয়ে আমার সহিত আপনার ও অন্যের যাহা কিছু সমানতা বা তুল্যতা। যে কয়টা sensationএ এই দেখিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি, সেই কয়টাকে আমরা বাহির হইতে আগত মনে করি, কিন্তু মনে করি মাত্র। আমরা প্রত্যেকে যদি আপন আপন বাহ্য জগৎকে বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে ঐ রূপ-রস গন্ধাদি অনুভূতির অতিরিক্ত আর কিছুই খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্যা ব্যাবহারিক বিদ্যা, কেবল বিশ্লেষণে আর স্বরূপ-নির্ণয়ে ক্ষান্ত থাকিলে বিজ্ঞান-বিদ্যার চলিবে না। বাহ্য জগৎটা জীবনের কাজের জন্যই রহিয়াছে এবং যাহাতে উহা ভাল করিয়া জীবনের কাজে লাগে, বিজ্ঞান-বিদ্যাকে সেই চেষ্টায় থাকিতে হইয়াছে। বিজ্ঞান-বিদ্যাকে যেরূপেই হউক, বাহ্য জগতের এবং বাহ্য জগতের অন্তর্গত যাবতীয় বাহ্য দ্রব্যের একটা পরিচয় দিতে হইবে। সর্ব্বসাধারণে যাহাতে বুঝিতে পারে, এমন ভাষায় পরিচয় দিতে হইবে। রূপ-রস-গন্ধাদি অনুভূতি যদি প্রত্যেক জীবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে

সমান, এরূপ মনে করিবার উপায় হইত, তাহা হইলে বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ অনেকটা সহজ হইতে পারিত। তাহা হইলে বাহ্য জগৎকে in terms of the sensations অর্থাৎ অনুভূতির সমষ্টিরূপে পরিচিত করা চলিতে পারিত। আমরা বৈজ্ঞানিক নহি, আমরা মোটামুটি ঐরূপে in terms of the sensations বাহ্য জগতের পরিচয় দিয়া থাকি। আমরা বলিয়া থাকি, জবাফুল রাঙ্গা, আকাশ নীলবর্ণ, চিনি মিষ্ট, কুইনাইন তিক্ত ইত্যাদি। ইহাতে মোটামুটি জীবনের কাজ চলিয়া যায়; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কাজ চলে না। তাঁহাকে আরও সূক্ষ্ম হিসাব দিতে হয়। তিনি দেখিতে পান যে, কোন দুই ব্যক্তি একই ক্ষেত্রে একটু অনুভূতি প্রত্যক্ষ করে না। যাহারা মাঝারি মানুষ, মোটামুটি যাহাদিগকে সুস্থ বলা যায়, তাহাদের মধ্যে হয়ত একটা মোটা মিল আছে মাত্র। যাহারা অসুস্থ, বিকলাঙ্গ, কাণা, কালা, তাহাদের নিকট সকল অনুভূতি ত পৌঁছায়ই না। তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া যে সকল ব্যক্তিকে আমরা সুস্থ বলিয়া গ্রহণ করি, তাহাদেরও মধ্যে পরস্পর মিল নাই। কোন দুই জনের ইন্দ্রিয়-শক্তি ঠিক সমান নহে। কাহারও অনুভব-শক্তি সূক্ষ্ম, কাহারও স্থূল। ইন্দ্রিয়-শক্তি সমান থাকিলেও কি জানি কোন কারণে মানুষের মধ্যে রুচিভেদ আছে; যাহা একের নিকট মিষ্ট, তাহা অন্যের নিকট তিক্ত। যে শব্দ একের নিকট মধুর, অন্যের নিকট তাহা কর্কশ। একই ব্যক্তি ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই sensationএর ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেয়। অবস্থাভেদে একই জিনিস তিক্ত বা মিষ্ট হয়, একই শব্দ মধুর বা কর্কশ হয়। যাহা এক হাতে লাগে ঠাণ্ডা, তখনই অন্য হাতে তাহা গরম লাগে। ইন্দ্রিয়ের উপর বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। আগেই বলিয়াছি, বৈজ্ঞানিককে বহু লোকের সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে হয়। স্পষ্টতঃ যাহারা অসুস্থ, একেবারে তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া বহুসংখ্যক সুস্থ প্রকৃতিস্থ মাঝারি মানুষের সাক্ষ্য লইয়া average কষিতে হয়। বহু লোকের average কষিয়া একটা কাল্পনিক Mean Man খাড়া করিতে হয় এবং সেই কাল্পনিক Mean Man বাহ্য জগতের যে পরিচয় দিবে, তদনুসারে তাঁহাকেও বাহ্য জগতের পরিচয় দিতে হয়; কিন্তু এই Mean Manও যেমন কাল্পনিক, তিনি যে জগতের পরিচয় দেন, সে জগৎটাও তদনুসারে ততটা কাল্পনিক। ইহাতেও রক্ষা নাই; এই যে পরিচয় দেওয়া হইবে, তাহাই বা কোন্ ভাষায় হইবে। যে সকল সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষ আসিয়া সাক্ষ্য দিবে, তাহারা কোন্ ভাষায়

দিবে। তাহারা নিজে বৈজ্ঞানিক নহে, তাহারা মাঝারি মানুষ মাত্র। তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলে in terms of the sensations তাহারা উত্তর দিবে। কিন্তু দেখা গিয়াছে, এই sensation বিষয়ে সাক্ষ্য জীবনের মোটা কাজ চালাইবার জন্য যথেষ্ট হইলেও সূক্ষ্ম হিসাবে একেবারে অগ্রাহ্য। রূপ-রস-গন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে মনুষ্যের সাক্ষ্য নিতান্ত স্থূল। কোন সাক্ষীকে বিশ্বাস করিবার কোন উপায় নাই। অনুভূতি পদার্থই যখন comparable নহে, তখন কোন্ সাক্ষীকে বিশ্বাস করিব কিরূপে? জবাফুলকে আমি রাঙ্গা দেখিয়া রাঙ্গা বলি, কিন্তু আর একজন উহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণের, হয়ত উহাকে নীল বর্ণের দেখিয়াও যখন রাঙ্গা বলে, তখন সে ব্যক্তির সে সাক্ষ্যের মূল্য কতটুকু? কোন মূল্যই নাই। ফলে বৈজ্ঞানিককে একেবারে হাল ছাড়িতে হইয়াছে। অনুভূতিগুলিকে একেবারে পরিহার করিয়া, উহাদিগকে একেবারে অতিক্রম করিয়া বাহ্য জগতের পরিচয় দিবার জন্য অন্য একটা উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। সেই উপায় কি, এইবার দেখা যাউক।

অধ্যাপক Stanley Jevonsএর প্রণীত Principles of Science নামে একখানি সুন্দর পুস্তক আছে। এক কালে আমাদিগকে উহা পড়িতে হইয়াছিল। ঐ বহিতে পড়িয়াছিলাম, Physics-শাস্ত্র যে-কোন রাশিকে বা quantityকে মাপিবার পূর্ব্বে উহাকে একটা lengthএ বা রেখায় পরিণত করিয়া মাপিয়া থাকেন। যাঁহারা পদার্থবিদ্যা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত মনে আসিবে। পদার্থবিদ্যা কোন physical quantityর পরিমাণ বা মাত্রা নিরূপণের সময় কোন ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করেন না। শেষ পর্য্যন্ত একটা রেখার দৈর্ঘ্য মাপেন মাত্র। পদার্থবিদ্যার নিকট উষ্ণতা স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। থার্ম্মমিটারের পারা কতটা উপরে উঠিয়াছে, পদার্থবিদ্যা-মতে উষ্ণতার তাহাই পরিমাণ। দুইটা বাতির আলোর উজ্জ্বলতা তুলনা করিতে গিয়া পদার্থবিদ্যা দেখেন, কোন্‌টা কত দূরে রাখিলে সমান উজ্জ্বল দেখায়। বাতাসের চাপ কত, মাপিতে গিয়া দেখেন—ব্যারোমিটারের পারা কতখানি উঠিয়াছে। আলোর রঙ ঠিক করিতে গিয়া তিনি দেখেন—কাচের prismএর ভিতর দিয়া যাইতে কোন্ আলো কত দূর সরিয়া গিয়াছে। কোন ধ্বনির সুর দেখিতে গিয়া যে বাঁশি হইতে সেই ধ্বনি বাহির হইতেছে, সেই বাঁশি, অথবা যে তন্ত্রী হইতে সেই ধ্বনি বাহির হইতেছে, সেই তার কতটা লম্বা, তাহাই তিনি

পরিমাণ করেন। দুইটা জিনিস ওজনে সমান কি না, তাহা পরীক্ষার সময় তিনি দেখেন যে, তুলদাঁড়ির বা নিক্তির অবলম্ববিন্দু বা fulcrum হইতে জিনিস দুইটা সমান দূরে ঝুলান হইয়াছে কি না। এমন কি, কালের পরিমাণ করিতে গিয়াও তিনি দেখেন যে, ছায়া কতটা সরিয়াছে, অথবা ঘড়ির কাঁটা কতটা নড়িয়াছে। অধ্যাপক Jevons কথাটা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। সম্প্রতি দার্শনিক পণ্ডিত Bergson এই কথাটাকে অত্যন্ত চাপিয়া ধরিয়াছেন। যে-কোন physical quantityর magnitude বা মাত্রা নিরূপণ করিতে হইলে উহাকে একটা lengthএর স্বরূপে অথবা in spacial terms প্রকাশ করিতে হয়। বের্গসোঁ বলেন যে, space বা দেশ বা আকাশই এক মাত্র জিনিস, যাহার quantitative measurement বা পরিমাণ-নির্দ্দেশ চলে। দেশ বা আকাশ ভিন্ন আর কোন সামগ্রী নাই, যাহা আমরা মাপিতে পারি। সংখ্যা এবং পরিমাণ, number এবং magnitude সম্বন্ধে আমাদের যে কিছু ধারণা আছে, তাহা সমস্তই Space হইতে উৎপন্ন। ছোট আর বড়, এই দুই প্রভেদের মূলে ঐ Space। বের্গসোঁ বলিতে চাহেন, আমাদের sensationগুলি আদৌ measurable নহে। উহাদের পরিমাণ নির্দ্দেশ একেবারে অসম্ভব। কোন দুইটা অনুভূতি একজাতীয় হইলেও তাহার মধ্যে এইটা ছোট এইটা বড়, এইটা অল্প এইটা অধিক, এরূপ নির্দ্দেশ করা উচিত নহে। দুইটা sensation একজাতীয় হইলেও তাহাদের যে ভেদ, তাহা qualitative বা গুণগত, কখনই quantitative বা মাত্রাগত নহে। আপনারা জানেন, আজকাল অনেক পণ্ডিত feeling ও sensationগুলি মাপিয়া একটা Science গড়িবার চেষ্টায় আছেন। উহার নাম Psyco-physics বা Experimental Psychology। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের curriculumএর মধ্যে এই নূতন বিদ্যা কয়েক বৎসর হইতে ক্যালেণ্ডারের পাতা জুড়িয়া বসিয়া আছে। বের্গসোঁর কথা মানিতে হইলে বলিতে হইবে, এই বিদ্যার গোড়ায় গলদ। আপনারা Fechner's Lawএর কথা শুনিয়া থাকিবেন। Stimulusএর মাত্রার সহিত সম্বন্ধ-নির্ণয় ঐ Lawএর উদ্দেশ্য। কোন গুরু দ্রব্য হাতে ধরিলে ভার বোধ হয়। এই গুরু দ্রব্যের ভারটা stimulus, আর ঐ ভারবোধটা sensation।

দুই সের আর আড়াই সের ওজনে যতটুকু প্রভেদ, sensationএর ১২ সের আর ১২॥ সের ওজনে ঠিক সেই প্রভেদ। তুলদাঁড়িতে মাপিয়া উভয় ক্ষেত্রেই একই প্রভেদ দেখা যাইবে। এই যে প্রভেদ, ইহা stimulusএর প্রভেদ। কিন্তু হাতে ধরিয়া দেখুন, ২ সের আর ২॥ সের ভারের প্রভেদ স্পষ্ট বুঝা যায়, কিন্তু ১২ সের আর ১২॥ সেরের প্রভেদ বুঝা যায় না বলিলেই হয়। এক বাতির আলোর এবং দুই বাতির আলোর উজ্জ্বলতার ভেদ চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে, কিন্তু ১১টা বাতির উজ্জ্বলতার সহিত ১২টা বাতির উজ্জ্বলতার প্রভেদ চোখে ধরিতে পারে না বলিলেই হয়। এইরূপ প্রায় সর্ব্বত্র। Stimulusএর ভেদ সমান হইলেও তজ্জাত sensationএর ভেদ সমান হয় না। Stimulus যে হারে বাড়ে, sensation সেই হারে বাড়ে না। ইহাই হইল Fechner's Law। নানা experiment করিয়া ইহার একটা quantitative expression দেওয়া হইয়াছে। Stimulus যদি বাড়ে geometric progressionএ, sensation বাড়িবে arithmetic progressionএ। Bergsonকে যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে Fechner's Law ভুয়া হইয়া দাঁড়ায়। Stimulus জিনিসটা physical quantity ; উহা মাপা চলে ; কিন্তু sensation মাপের জিনিস নহে। হাতে তুলিলে দুই সের আর দুই ছটাকের ভারে যে ভেদ বোধ হয়, উহা পরিমাণগত ভেদ নহে ; উহা গুণগত ভেদ। Sensation হিসাবে দুই ছটাকের ভার অল্প, আর দুই সেরের ভার অধিক, ইহা বলা চলে না। দুই ছটাকের ভার এক রকমের sensation, দুই সেরের ভার অন্য রকমের sensation। প্রভেদ যাহা তাহা গুণগত, তাহা মাত্রাগত নহে। দুই ছটাক ওজন হাতে তুলিলে গোটাকতক মাংসপেশীতে, গোটাকতক স্নায়ুতে চাপ পড়ে, দুই সের হাতে তুলিলে তদতিরিক্ত আরও অন্য মাংসপেশীতে, আরও অন্য স্নায়ুতে চাপ পড়ে। দুই মণ তুলিতে গেলে সর্ব্বাঙ্গেই হয়ত কিছু-না-কিছু চাপ পড়ে, রক্তচলাচল বিকৃত হয়, নিশ্বাস আট্‌কাইতে হয়, ইত্যাদি নানা নূতন উৎপাত উপস্থিত হয়। যে sensation হয়, তাহা এই নানা উৎপাত-সমষ্টির সহকারী। উহাকে নূতন রকমের sensation বলাই উচিত।

Bergsonএর সমুদয় যুক্তি আপনাদের নিকট উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করি না। Sensation পরিমাণযোগ্য হউক আর নাই হউক,

উহার পরিমাণ কত দুঃসাধ্য, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন। Physical Science কেন sensationকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাও আপনারা এত ক্ষণ বুঝিতেছেন। Sensationএর উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া তাঁহারা অন্য উপায়ে বাহ্য জগতের পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছেন। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন, Science is measurement। অন্য Scienceএর পক্ষে যাহাই হউক, Physical Scienceএর পক্ষে পরিমাণকর্ম্মই প্রাণ। Sensationএর পরিমাণ দুঃসাধ্য অথবা অসাধ্য দেখিয়া Physical Science পরিমাণযোগ্য অন্য পদার্থের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই পরিমাণযোগ্য পদার্থই Space। বাঙ্গালায় আমি ইহাকে আকাশ বা দেশ বলিব।

Physical Science বাহ্য জগৎকে Space-মধ্যে, দেশ-মধ্যে, আকাশ-মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছেন। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দিকে চল, বাম দিক্ হইতে ডান দিকে চল, অধঃ হইতে উর্দ্ধমুখে চল, যে দিকেই যাও, ইহাকে বিস্তীর্ণ দেখিবে। যে দিকেই চল না কেন, কোথাও ইহার সীমানা পাওয়া যায় না; এই জন্য বলা হয়—ইহা অসীম। অপিচ এই আকাশ সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে সমাকার, একাকার এবং নির্ব্বিশেষ absolutely homogeneous। এক স্থান হইতে অন্য স্থানকে পৃথক্ করিয়া চিনিবার কোন বিশিষ্ট চিহ্ন নাই। এই আকাশ পরিমাণযোগ্য; উহার এক টুকরার ভিতরে আর এক টুকরা থাকিতে পারে, এক অংশ অন্য অংশকে include করে। যে টুকরা ভিতরে থাকে, তাহাকে বলি ছোট; আর যে টুকরা বাহিরে থাকিয়া উহাকে include করে, তাহাকে বলি বড়। Spaceএর এক টুকরার মধ্যে আরও ছোট টুকরা যত ইচ্ছা তত সংখ্যায় বসাইতে পারি; উহার বিভাজ্যতার, উহার divisibilityর অন্ত নাই। এক টুকরা space যত ছোট হউক, তাহার অভ্যন্তরে তাহার চেয়ে ছোট টুকরা বসাইতে পারি। এই সকল কারণে আকাশ absolutely continuous। উহার কোথাও কোন ছেদ বা পরিচ্ছেদ নাই। Space নিজেই ফাঁকা, দুই টুকরা spaceএর মধ্যে অন্যরূপ ফাঁক থাকিতে পারে না; যাহা থাকিবে, তাহাও space। বিজ্ঞান-বিদ্যার যে আকাশ, এইগুলি তাহার লক্ষণ। বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের বাহ্য জগৎকে এই আকাশ জুড়িয়া ছড়াইয়া দিয়াছেন। এই আকাশ সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে সমান, ইহার কোন

স্থানে কোন বিশিষ্ট লক্ষণ বা চিহ্ন নাই। অকূল পাথারে তারকাহীন অন্ধকার রাত্রে নাবিক যেরূপ দিক্ নির্ণয় করিতে পারে না, সেইরূপ ইহার কোথাও কোন দিক্ নিরূপণের উপায় মাত্র নাই। এইরূপ সর্ব্বত্র সমাকার ভাবে থাকা না-থাকা সমান। ইহা থাকিলেও কোন জীবের কোন লাভ নাই, অথচ বিজ্ঞান-বিদ্যা জীবগণের কারবারের বিদ্যা। সেই কারবারের অনুরোধে এই আকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন কল্পনা করিতে হইয়াছে। যাহা সর্ব্বতোভাবে homogeneous নির্ব্বিশেষ বা সমাকার, তাহাকে দায়ে পড়িয়া heterogeneous সবিশেষ বা বিষমাকার করিয়া লইতে হইয়াছে। আকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন বসাইতে হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় সেই সকল চিহ্নের নাম material body বা জড় দ্রব্য। বৈজ্ঞানিকেরা সেই জন্য নানা স্থানে নানা জড় দ্রব্য বসাইয়াছেন ; এখানে চিত্রা ওখানে স্বাতী, এখানে সূর্য্য ওখানে চন্দ্র, এখানে শুক্র ওখানে শনি, এখানে হিমালয় ওখানে গন্ধমাদন। এক এক স্থানে এক-একটা চিহ্ন এবং তাহাদের মাঝে মাঝে কেবলই ফাঁকা,—ফাঁকা আকাশ বা অবকাশ। এইরূপ কোটি কোটি চিহ্ন এবং তাহাদের মাঝে মাঝে অবকাশ দিয়া আকাশ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আকাশ স্বয়ং চিহ্নবর্জ্জিত, ঐ চিহ্নগুলিই যেন উহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া উহাকে চিহ্নিত করিয়াছে। আকাশ নিজে গট্ হইয়া বসিয়া আছে ; উহা যেন স্থিরত্বের প্রতিমূর্ত্তি, উহার এক অংশকে ঠেলিয়া অন্যত্র লওয়া চলে না, উহার এক টুকরা কিছুতেই অন্যত্র গিয়া অন্য টুকরার সহিত মিশে না, উহার প্রত্যেক বিন্দু আপন আপন স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া আছে ; কিন্তু এই চিহ্নগুলি কোথাও স্থির হইয়া নাই। উহারা এখন এখানে, তখন ওখানে, এইরূপে সর্ব্বদা সঞ্চরণশীল। আকাশের মধ্যে উহারা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। বিজ্ঞান-বিদ্যা বাহ্য জগতের যাবতীয় ঘটনাকে এই ছুটাছুটিরূপে বর্ণনা করিতে চাহেন।

জড় দ্রব্যগুলির ইতস্ততঃ বিচরণের দ্বারা যাবতীয় ঘটনার বিবরণ দেওয়ার নাম mechanical description of the physical world। এই জন্য বিজ্ঞান-বিদ্যা Mechanical Science বা Mechanicsএ পরিণত হইয়াছে। এক-একটা জড় খণ্ড আকাশের এক এক টুকরা জুড়িয়া আছে। তাহাদের মাঝে মাঝে ফাঁকা আকাশ। এই ফাঁকা আকাশ বা শূন্যদেশ

না থাকিলে জড় খণ্ডগুলি ঐরূপে বিচরণ করিতে পারিত না। একটা জড় খণ্ড আর এক খণ্ড হইতে দূরে যায়, নিকটে আসে, পাশে আসিয়া বসে, কিন্তু একেবারে মিশিয়া যাইতে পারে না। দুইটা material body আকাশের একই অংশ জুড়িয়া বসিতে পারে না। একটা আর একটার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রবিষ্ট বা অনুস্যূত হইতে পারে না, পরস্পর interpenetrate করে না। জড় দ্রব্যের কাজই হইতেছে আকাশের নানা স্থানকে নানা রূপে চিহ্নিত করা, এক স্থানকে অন্য স্থান হইতে বিশিষ্ট করা। একটা দ্রব্য আর একটায় অনুপ্রবিষ্ট হইলে, উভয়ে পরস্পর সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া গেলে এইরূপ চিহ্নের কোন সার্থকতা থাকে না, জড় দ্রব্যেরও কোন সার্থকতা থাকে না। এই জন্য বলা হয়, জড় দ্রব্যের একটা মুখ্য লক্ষণ impenetrability। যেখানে দেখা যায়, একটা দ্রব্য আর একটা দ্রব্যে যেন মিশিয়া যাইতেছে,—জলে চিনি মিশিতেছে, hydrogenএ oxygen মিশিয়া জল হইতেছে, তামায় দস্তায় মিশিয়া পিতল হইতেছে, তখন একটা fictionএর আশ্রয় লওয়া হয়—বলা হয়, বস্তুতঃ তাহারা interpenetrate করে নাই—বলা হয়, উহাদের খুব ছোট ছোট অংশ বা কণিকা আছে; খুব ছোট বলিয়াই তাহাদিগকে আমরা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারিতেছি না। ঐ ছোট কণিকাগুলি পাশাপাশি রহিয়াছে, উহাদেরও মাঝে মাঝে ফাঁক আছে। একটা কণিকা আর একটা কণিকার সহিত মিশিয়া গিয়া এক স্থান জুড়িয়া নাই। এই সকল কণিকাগুলির ক্ষেত্রভেদে নাম দেওয়া হয় অণু, পরমাণু particle, corpuscle, atom, molecule ইত্যাদি। বিজ্ঞান-বিদ্যা সমস্ত আকাশমধ্যে এইরূপ ছোট বড় অসংখ্যেয় জড় দ্রব্য বা material body ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কাপিণ্ড, তারকা, এইগুলি বড় বড় দ্রব্য, আর অণু পরমাণু প্রভৃতি ছোট ছোট দ্রব্য। ছায়াপথের মধ্যে বহু কোটি তারকা বিছান রহিয়াছে, তাহাদের এক-একটা বৃহত্তায় সূর্য্যের সহিত তুলনীয়। সূর্য্য বৃহত্তায় বার লক্ষ পৃথিবীর সহিত তুলনীয়। পৃথিবীর তুলনায় একটা ফুটবল যেমন, এক ফোঁটা জলের তুলনায় একটা জলের অণু তদ্রূপ।

আকাশ জুড়িয়া ছোট বড় জড় দ্রব্য ছড়ান আছে; তাহাদের মাঝে মাঝে অবকাশ। সেই অবকাশমধ্যে তাহারা নানা বেগে নানা মুখে বিচরণ করিতেছে। আকাশ নিজে সর্ব্বতোভাবে সমাকার; উহার কোন

স্থানে কোন চিহ্ন নাই। কাজেই কোন জড় দ্রব্য আকাশের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থির হইয়া আছে কি না বলিবার কোন উপায় নাই। অগত্যা একটা কোন জড় দ্রব্যকে স্থির ধরিয়া লইয়া অন্যগুলার গতিবিধি নিরূপণ করিতে বাধ্য হই। আমরা সৌর জগতের অধিবাসী, সূর্য্যকে স্থির ধরিয়া লইয়া অন্যান্য দ্রব্যের গতিবিধি নির্ণয় করায় আমাদের পক্ষে সুবিধা। সূর্য্যকে স্থির নিশ্চল ধরিয়া তাহার তুলনায় কোন্ দ্রব্য কোন্ বেগে চলিতেছে, তাহা নিরূপণ করি। এই বেগ আপেক্ষিক বেগ মাত্র—ইংরেজীতে উহাকে relative velocity বলা হয়। এইরূপে নিরূপিত বেগ আপেক্ষিক; উহার প্রকৃত পরিমাণ কত, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই; কিন্তু বেগের হ্রাস বা বৃদ্ধি সে অর্থে আপেক্ষিক নহে। পুকুরে কত জল আছে, না জানিয়াও সেই জল বাড়িতেছে বা কমিতেছে, তাহার নিরূপণ চলে। গরমি কালে জল কমে, বর্ষাকালে জল বাড়ে, পুকুরের পাশে দাঁড়াইলে অতি বালকেও তাহা জানিতে পারে। ঘাটের সিঁড়িতে দাগ দিয়া রাখিলে প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি দিন কতটুকু বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে, তাহার নিরূপণ হয়। আপনার তহবিলে কত টাকা আছে, তাহা আমি জানি না; কিন্তু বাক্সের কত টাকা বাহিরে আসিতেছে, বাহিরের কত টাকা বাক্সে প্রবেশ করিতেছে, তাহা আমি বাহিরে থাকিয়াও জানিতে পারি। দেখা যায়, জড় দ্রব্য মাত্রের বেগ বৃদ্ধির দিকে, বেগ অর্জ্জনের দিকে একটা প্রবণতা, একটা প্রবৃত্তি আছে। কোন দ্রব্যের অধিক, কোন দ্রব্যের অল্প। চন্দ্র সূর্য্য হইতে জলকণা ধূলিকণা পর্য্যন্ত সকল জড় দ্রব্যেরই বেগ বর্দ্ধনে—বেগ অর্জ্জনে প্রবৃত্তি আছে; সেই প্রবৃত্তি বা প্রবণতা নিরূপণ করা চলে। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নিরূপণ করা চলে। একটা ঘড়ি ও আর একটা গজকাঠি মাত্র আবশ্যক হয়। এই যে বেগার্জ্জনের প্রবৃত্তি, দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে চলিবার প্রবৃত্তি, ইহার একটা নাম দেওয়া দরকার। ঘটনাক্রমে সেই প্রবৃত্তির কোন নাম দেওয়া হয় নাই; অপ্রবৃত্তির একটা নাম দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজীতে তাহাকে inertia বলে। বাঙ্গালায় আমি উহাকে জড়ত্ব বলিব। উহা অপ্রবৃত্তির নাম; কেন না, যে দ্রব্যের দ্রুত চলিবার প্রবৃত্তি যত অধিক, তাহার inertiaকে তত অল্প বলা হয়। এই কথাটুকু মনে রাখিবেন। সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর তুলনায় দেখা যায়, পৃথিবীর সূর্য্যের অভিমুখে

দৌড়িবার প্রবৃত্তি অধিক ; পৃথিবীর অভিমুখে সূর্য্যের দৌড়িবার প্রবৃত্তি তার তুলনায় অতি অল্প। বলা হয়, পৃথিবীর inertia বা জড়ত্ব অল্প ; সূর্য্যের inertia বা জড়ত্ব তার তুলনায় অধিক, তিন লক্ষগুণ অধিক। ঐরূপ পৃথিবী ও চাঁদ পরস্পরের অভিমুখে দৌড়িবার প্রবৃত্তি রাখে ; পৃথিবী ধীরে দৌড়ায়, চাঁদ দ্রুত দৌড়ায়। পৃথিবীর জড়ত্ব অধিক, আশী গুণ অধিক। বোটা হইতে খসিবা মাত্র আপেল-ফল পৃথিবীর অভিমুখে ছুটিয়া পড়ে ; পৃথিবী কিন্তু প্রায় নিশ্চল থাকে ; আপেল-ফলকে প্রত্যুদ্গমনের প্রবৃত্তি তাহার বুঝাই যায় না। অতএব আপেলের তুলনায় পৃথিবীর inertia খুব বেশী। বৈজ্ঞানিক যেন যাবতীয় জড় দ্রব্যের দৌড়ের পরীক্ষায় বসিয়াছেন,—দেখিতেছেন, কোন্টা ঢিমা, কোন্টা চট্পটে ;—চাঁদের তুলনায় পৃথিবী ঢিমা, পৃথিবীর তুলনায় সূর্য্য ঢিমা। যে যত ঢিমা, তাহাকে তদনুরূপ নম্বর দিয়া উচ্চে স্থান দিতেছেন। যেটাকে যে নম্বর দেওয়া যায়, সেই নম্বর তাহার inertiaর বা জড়ত্বের দ্যোতক। আপনারা মাষ্টারি করেন—ছেলেদের নম্বর দিয়া এক্জামিন করা আপনাদের অভ্যাস হইয়াছে। যে ছেলে যত নম্বর পায়, সেই নম্বর তাহার চিহ্ন। সেই চিহ্ন দেখিয়া কোন্ ছেলের কোথায় স্থান, তাহা আপনারা স্থির করেন। বৈজ্ঞানিকেরাও এইরূপে যাবতীয় জড় দ্রব্যের এক্জামিন করেন ; এবং এক-একটা দ্রব্যকে এক-একটা নম্বর দিয়া চিহ্নিত করেন।

ছেলেদের নম্বরে আর জড় দ্রব্যের নম্বরে একটা মস্ত পার্থক্য আছে। ছেলেদের নম্বরে ঠিক থাকে না। এবারকার পরীক্ষায় যে হয় প্রথম, অন্য বারের পরীক্ষায় সে হয়, হয়ত পঞ্চম ; এবারে যে পায় ৭০, অন্য বারে সে পায় ৫৫। পরীক্ষার ফল অস্থির। কিন্তু জড় দ্রব্যের inertiaর পরীক্ষার ফলে কোনরূপ অস্থিরতা নাই। যখনই যে দ্রব্যের পরীক্ষা কর, সেই একই নম্বর পাইবে। যে একবার ৭০ পায়, সে চিরকালই ৭০ পাইবে ; যে একবার ৫৫ পায়, সে চিরকালই ৫৫ পাইবে। সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র, সকল ক্ষেত্রে সেই একই অঙ্ক তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিবে ; কিছু মাত্র ইতরবিশেষ হইবে না। বস্তুতঃ এই যে inertia, ইহা একটা অঙ্ক মাত্র। এই অঙ্কের ছাপ দিয়া আমরা ভিন্ন ভিন্ন জড় দ্রব্যকে নির্দ্দিষ্ট করি। একটা হইতে অন্যটাকে পৃথক্ করিয়া চিনিয়া লই। প্রত্যেক জড় দ্রব্যের গায়ে যেন পাকা-কালিতে এই অঙ্কের ছাপ দেওয়া রহিয়াছে—তাহা মুছা যায় না।

এক-এক অঙ্কের টিকিট যেন এক-এক দ্রব্যের গায়ে খুদিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার কখন লোপ বা ব্যত্যয় হয় না। এই অঙ্কই সেই দ্রব্যের inertia-জ্ঞাপক বা জড়ত্ব-জ্ঞাপক।

কথাটা মনে রাখিবেন—নির্ব্বিশেষ, একাকার, নিরবয়ব, চিহ্নহীন আকাশকে চিহ্নিত করিবার জন্যই জড় দ্রব্যের অবতারণা। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকে অবৈজ্ঞানিকে বড় ভেদ নাই। বৈজ্ঞানিক কেবল সূক্ষ্ম হিসাবে চিহ্ন করেন। প্রত্যেক জড় দ্রব্যকে পৃথক্‌ভাবে চিনিবার জন্য তাঁহারা এক-একটা অঙ্কের মার্কা দিয়া দেন। এই মার্কা স্থায়ী মার্কা। একবার যে মার্কা দেওয়া গেল, তাহা বদল করিবার প্রয়োজন হয় না। কাজেই বলা হয়, inertia লক্ষণটা স্থায়ী লক্ষণ; কোন দ্রব্যে কোন কারণে ইহার ব্যত্যয় বা ইতরবিশেষ হয় না। এই inertiaর আর একটা নাম দেওয়া হয়—mass of a body; কেহ কেহ সোহাগ করিয়া বলেন—quantity of matter in a body. এই quantity of matterএর ইতরবিশেষ হয় না। জড়ের জড়ত্বের ইতরবিশেষ বা তারতম্য হয় না দেখিয়া কবির ভাষায় বলা হয়—matter is indestructible,—জড়ের ধ্বংস নাই, নাশ নাই। ইহা একটা principle,—ইহাকে বড় করিয়া নাম দেওয়া হইয়াছে Principle of Conservation of Matter। আসল কথাটা এই যে, প্রত্যেক জড় দ্রব্যের জন্য একটা অঙ্ক, একটা মার্কা, একটা চিহ্ন স্থায়িভাবে নির্দ্দিষ্ট করা যায়; তাহাই তাহার characteristic—মুখ্য লক্ষণ। আধুনিক Mechanics এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। গ্যালিলিয়ো ও নিউটনই এই Mechanicsএর উদ্ভাবনকর্ত্তা।

এই inertiaকে আর একটু চাপিয়া ধরা আবশ্যক। পৃথিবীর জড়ত্ব চাঁদের আশী গুণ, সূর্য্যের জড়ত্ব পৃথিবীর তিন লক্ষ গুণ। এক বাটি জলের যাহা জড়ত্ব, একটি বাটি পারার জড়ত্ব তাহার ১৩॥ গুণ। একটা hydrogen পরমাণুর যে জড়ত্ব, একটা oxygen পরমাণুর জড়ত্ব তাহার ষোল গুণ। বন্দুকের গুলির জড়ত্ব অপেক্ষা কামানের গোলার জড়ত্ব অধিক। এইরূপে ছোট বড় প্রত্যেক দ্রব্যের জড়ত্ব বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যাহার inertia যত বেশী, তাহার বেগ বাড়ান তত কঠিন।

বিজ্ঞান-বিদ্যা বলেন, কোন্ দ্রব্যটার জড়ত্ব কত, তাহা আমাকে একবার বাঁধিয়া ফেলিতে দাও। তার পর আমি গণিতের সাহায্যে গণিয়া বলিতে

পারিব, আজ যেটা এই স্থলে রহিয়াছে, কালই হউক আর কোটি বর্ষান্তেই হউক, সেটা কোথায় থাকিবে। বিজ্ঞান-বিদ্যার যে অংশের নাম জ্যোতির্ব্বিদ্যা, সেই অংশে বৈজ্ঞানিকেরা এইরূপ গণনায় আশ্চর্য্যরূপে সফলতা লাভ করিয়াছেন। সৌর জগতের অন্তর্গত যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধির গণনা যে পরিমাণ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। সৌর জগতের বাহিরে যে প্রকাণ্ডতর তারকা-জগৎ বর্ত্তমান, সেখানে কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এখনও হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছেন। সেই বৃহত্তর জগতেব তারকাগুলি এত দূবে রহিয়াছে যে, আমাদের সূর্য্যের তুলনায় তাহাদিগকে প্রায় নিশ্চলই দেখায়। তাহাদের দূরত্ব নিরূপণও দুঃসাধ্য বা অসাধ্য। কোন্ তারকাটা কোথায়, কোন্ বেগে চলিতেছে বা না চলিতেছে, তাহাদের বেগের হ্রাসবৃদ্ধি আছে কি না আছে, তাহা এখনও নিরূপণ হয় নাই। কাজেই দুই একটা স্থল ব্যতীত অধিকাংশ স্থলেই তারকাগুলির জড়ত্ব নিরূপণের কোন উপায় পাওয়া যায় নাই। উহাদের গতিবিধিও গণনার বহির্ভূত রহিয়াছে। সম্প্রতি গণিতে পারি আর না-পারি, বৈজ্ঞানিকেরা ধরিয়া রাখিয়াছেন যে, এই গণনার problem fully determinate। গণনার জন্য যে dataর আবশ্যক, সেগুলি যখন পাইব, তখন আর আটকাইবে না। ইহাই হইল mechanical scienceএর determinism ; data যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে problemটার solution মিলিবেই। অবশ্য যদি গণিত-বিদ্যার সামর্থ্যে কুলায়। একটার বেশী দুইটা solution হইবে না। এক রকমের বেশী দুই রকমের উত্তর হইবে না। একটা ছোট formulaর ভিতরে যাবতীয় দ্রব্যের গতিবিধি বাঁধিয়া ফেলিতে পারিব। সমস্ত জড় জগৎটা, উহার প্রত্যেক অংশ এই formulaর বা নিয়মের শিকলে বাঁধা পড়িয়া যাইবে ; সেই শিকল লোহার শিকল অপেক্ষাও কঠিন। উহা ভাঙ্গিবার বা মোচড়াইবার উপায় থাকিবে না। একবারে যাহাকে এই শিকলে বাঁধিয়া ফেলিব, কস্মিন্ কালেও তাহার আর নিস্তার থাকিবে না।

বৈজ্ঞানিকের জড় জগৎ কেমন, তাহার কতকটা পরিচয় পাইলেন। জড় জগতের পরিচয় দিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকেরা রূপ-রস-গন্ধাদি sensationএর কোন কথাই তোলেন না। রূপ-রস-গন্ধাদি আমার পক্ষে একরকম, আপনার পক্ষে অন্যরকম ; পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের পক্ষে যে কিরূপ,

তাহা বলিবার কোন উপায় নাই। মানুষের পক্ষে রূপ-রসাদি যেরূপ, মাছির কিংবা পিঁপড়ার পক্ষে রূপ-রসাদি তুল্যরূপ, এ কথা মনে আনিতেও কেহ সাহস করিবেন না। মানুষ হইতে মাছি পর্য্যন্ত প্রাণী অবর্ত্তমান থাকিলে বাহ্য জগতের রূপ রস গন্ধ অনুভব করিবার জন্য কেহই কোথাও থাকে না। অথচ বৈজ্ঞানিককে মানিয়া লইতে হয় যে, বাহ্য জগৎ কোন জীবের অপেক্ষা করে না; কোন প্রাণী বর্ত্তমান না থাকিলেও বাহ্য জগৎ রহিয়াছে; উহা চেতন জীবের নিরপেক্ষ, উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং স্বতন্ত্র বলিয়াই সকলের বাহ্য। কাজেই রূপ-রসাদিকে একেবারে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া সেই বাহ্য জগতের পরিচয় দিতে হয়। বৈজ্ঞানিকের বাহ্য জগৎ রূপহীন, রসহীন, গন্ধহীন, শব্দহীন, স্পর্শহীন জগৎ; উহা সীমাহীন আকাশ জুড়িয়া রহিয়াছে। সেই আকাশ বাহ্যতার প্রতিমূর্ত্তি। সেই আকাশ সর্ব্বত্র একাকার। উহার কোথাও কোন অবয়ব নাই, দাগ নাই, চিহ্ন নাই। উহাকে চিহ্নিত করিবার জন্যই এক-একটা জড় দ্রব্য আকাশের এক-এক টুকরা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে;—বসিয়া আছে বলিলে কোন লাভ নাই, উহারা ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে বলাই দরকার হইবে। ছুটিয়া বেড়াইতেছে অর্থাৎ উহাদের পরস্পর মধ্যগত ব্যবধান বা অবকাশ বা দূরত্ব কখনও অল্প, কখনও অধিক হইতেছে। এই যে দূরত্ব বা ব্যবধান, ইহা মাপিতে পারা যায়—ইহা পরিমাণযোগ্য; কেন না, আকাশই এক মাত্র পদার্থ, যাহা পরিমাণ করিতে পারা যায়, যাহার প্রতি ছোট আর বড় এইরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আকাশ ছাড়া এমন কোন সামগ্রী নাই, যাহা মাপিতে পারা যায়। অন্য কোন সামগ্রীকে যদি নিতান্তই মাপিতে হয়, তাহাকে in terms of a length মাপিতে হয়। জড় দ্রব্যের পরস্পর ব্যবধান মাপিয়া এই ক্ষণে ব্যবধান কত এবং পর ক্ষণে ব্যবধান কত, তাহা স্থির করিয়া তাহাদের গতিবিধির নিরূপণ হয়; দেখা যায়, পরস্পরের তুলনায় কেহ দ্রুত চলে, কেহ ধীরে চলে। এই ধীরে চলিবার প্রবৃত্তি আর দ্রুত চলিবার প্রবৃত্তি দেখিয়া প্রত্যেক জড় দ্রব্যের, প্রত্যেক material bodyর জড়ত্ব বা inertia নিরূপিত হয়। দ্রুত চলিবার যার প্রবৃত্তি, তার জড়ত্ব অল্প, ধীরে চলিবার যার প্রবৃত্তি, তার জড়ত্ব অধিক। এইরূপে প্রত্যেক দ্রব্যের জড়ত্বের মাত্রা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। একবার যে দ্রব্যে যতটুকু জড়ত্ব assign করা যায় বা আরোপ করা যায়—

সেইটুকু চিরকাল তাহার পক্ষে বজায় থাকে; তাহার ইতরবিশেষ বা তারতম্য করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। তারতম্য করিবার প্রয়োজন হয় না বলিয়াই বলা হয়—জড় দ্রব্যের মুখ্য লক্ষণই inertia; উহাই জড় দ্রব্যের জড়ত্ব। রূপ-রস-গন্ধাদি প্রত্যক্ষ অনুভূতিগুলি যেন নিতান্তই accidents মাত্র, আগন্তুক ধর্ম্ম মাত্র; জড় পদার্থের সহিত ঐ সকল অনুভূতির যেন মজ্জাগত ধাতুগত কোন সম্পর্কই নাই; উহাদের সম্পর্ক চেতন জীবের সহিত। চেতন জীব যেখানে আছে, সেখানে সেই চেতন জীবের উপযোগী রূপ-রস-গন্ধাদি থাকে; কিন্তু চেতন জীব যেখানে নাই, সেখানে রূপ-রসাদি থাকে না; থাকে কিন্তু জড় দ্রব্য, আর থাকে তাহার জড়ত্ব। Psychology বা মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের যে-কোন প্রচলিত বহি খুলিলেই দেখিতে পাইবেন যে, বলা হইতেছে—রূপ-রস-গন্ধাদি জড় দ্রব্যের secondary properties; উহারা মুখ্য ধর্ম্ম নহে, উহারা গৌণ ধর্ম্ম। এ বড় আশ্চর্য্য কথা। যাহা প্রত্যক্ষ, যাহার সত্যতার সম্বন্ধে সংশয় করিবার অধিকার প্রত্যক্ষবাদীর পক্ষে একেবারে নাই, তাহাই হইল এই সকল পণ্ডিতদের মতে জড় দ্রব্যের গৌণ ধর্ম্ম; মুখ্য ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা প্রত্যক্ষকে বর্জ্জন করিয়া মাথা খুঁড়িয়া বেড়াইতে থাকেন। এটা বস্তুতই একটা হেঁয়ালি; কিন্তু এই হেঁয়ালির তাৎপর্য্য এত ক্ষণে আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন। যখনই প্রত্যক্ষদৃষ্ট রূপরসাদিময় ব্যাবহারিক জগৎকে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থ স্বতন্ত্র অর্থাৎ চেতন জীবের নিরপেক্ষ জগৎ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তখনই সেই ব্যাবহারিক জগৎ বাহ্য জগতে পরিণত হয় এবং সেই বাহ্য জগৎ রূপহীন, রসহীন, শব্দহীন, গন্ধহীন, স্পর্শহীন একটা কিম্ভূতকিমাকার কাল্পনিক জগতে পরিণত হয়। রূপ-রস-গন্ধাদি প্রত্যক্ষ পদার্থ তখন তাহার গৌণ লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায় এবং সেই কিম্ভূতকিমাকারতাই তাহার মুখ্য লক্ষণ হইয়া পড়ে। জড় পদার্থের primary properties বা মুখ্য লক্ষণ কি, তাহার অন্বেষণ করিতে গিয়া ঐ সকল পণ্ডিতেরা বলেন যে, জড় পদার্থের মুখ্য লক্ষণ extension এবং inertia—দেশব্যাপ্তি এবং জড়ত্ব। আকাশের এক-এক অংশ অধিকার করিয়া থাকাই জড় দ্রব্যের extension; ঘুরাইয়া বলিলে উহাই impenetrability। আকাশ-মধ্যে জড় দ্রব্যগুলা ছুটাছুটি করিতেছে; বেগে ছুটিবার প্রবৃত্তি অনুসারে প্রত্যেক দ্রব্যের inertia বা জড়ত্ব নির্দ্ধারিত হয়। বাহ্য জগতে থাকে

কেবল Matter ও তাহার Motion। Mechanical Scienceএর কাজ হইল description of the motion। অতএব বৈজ্ঞানিকের যে জড় পদার্থ, তাহার মুখ্য লক্ষণ extension এবং inertia। Mechanical Science এই extension এবং intertia মাত্র অবলম্বন করিয়া জড় জগতের গতিবিধির পরিচয় দেন, সেই গতিবিধিকে formula-বদ্ধ, সূত্রবদ্ধ, নিয়মবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। নিয়মে একবার বাঁধিয়া ফেলিলে কর্ত্তব্য প্রায় শেষ হয়; তখন সমস্ত জড় জগৎটাই বৈজ্ঞানিকের করতলগত আমলকী-ফলবৎ আয়ত্ত হইয়া পড়ে। সমস্ত জড় জগৎটাকে এখনও সেরূপ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় আছেন এবং ক্রমশঃ কৃতকার্য্য হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, problemটা fully determinate। কোন্ দ্রব্য এখন কোথায় আছে জানিতে পারিলে, কালই হউক বা শতবর্ষান্তেই হউক, কোন্ দ্রব্য কোথায় থাকিবে, তাহা গণিয়া বলিতে পারিব এবং এখন কোথায় আছে জানিলে শত বর্ষ পূর্ব্বে কখন্ কোথায় ছিল, তাহা গণিয়া বলিতে পারিব।

Newton যে mechanical scienceএর ভিত্তি পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার আদর্শ যথাসম্ভব উপস্থিত করিলাম। জড় দ্রব্য-ঘটিত ব্যাপারটা কতকটা টানাটানি ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কির ব্যাপার। আমরা ধাক্কা দিয়া, টান দিয়া, ঠেলা দিয়া জড় দ্রব্যের গতি উৎপাদন করিতে পারি। ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা লইবার ক্ষমতাই জড়ত্ব বা inertia। সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী যেন পরস্পর দূরে থাকিয়াও, পরস্পরকে স্পর্শ না করিয়াও এইরূপ ধাক্কাধাক্কি করিতেছে। আপনি দূরে বসিয়া আছেন, আমার ইচ্ছা—ধাক্কা দিয়া আপনাকে উত্তেজিত করি। আমার তিন উপায় আছে; এই কেতাবখানা ছুঁড়িয়া আপনাকে মারিতে পারি,—এই একটা উপায়; লম্বা লাঠিগাছটা লইয়া তাহার গুঁতা দিতে পারি,—এই দ্বিতীয় উপায়; আপনার গলায় দড়ি বাঁধিয়া হেঁচ্‌কা টান দিতে পারি,—এই তৃতীয় উপায়। তিন উপায়েই আমার দেহের সহিত আপনার দেহের কোনরূপ immediate স্পর্শ বা সংযোগ থাকিল না। মধ্যস্থ বা ব্যবহিত যন্ত্র দ্বারা সংস্পর্শ ঘটিল। ঐ কেতাবখানা, লাঠিটা, চাদরখানা সেই মধ্যস্থ যন্ত্র। যন্ত্র দ্বারা এক দ্রব্যের ধাক্কা ঠেলা বা টান অন্য দ্রব্যে সঞ্চালিত হয়। ইহা বুঝিতে মোটা বুদ্ধির দরকার। সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, ইহাদের পরস্পরের মাঝে

শূন্য দেশ বা ফাঁকা আকাশ বর্ত্তমান। সেই ফাঁকা আকাশমধ্যেই ত তাহারা বিচরণ করিতেছে; পরস্পরকে স্পর্শ করে না, অথচ দূরে থাকিয়াও পরস্পরকে ধাক্কা বা টান দিতেছে; মধ্যস্থ কোন দ্রব্যের বা যন্ত্রের ব্যবধান দেখি না। কাজেই মোটা বুদ্ধিতে ইহা কেমন কেমন ঠেকে। এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদের এইরূপ মোটা বুদ্ধি। তাঁহারা এই বিনা যন্ত্রে ধাক্কা সঞ্চালন ব্যাপারটা বুঝিতে পারেন না। স্পর্শ বা সংযোগ ব্যতীত অথবা কোন মধ্যস্থের সাহায্য ব্যতীত কিরূপে পরস্পর ধাক্কাধাক্কি চলিতে পারে, তাহা তাঁহারা মনে করিতে পারেন না। জড় দ্রব্যের গতিবিধিকে নিয়মবদ্ধ, formulaবদ্ধ করিয়া তাঁহারা তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। বিনা সংযোগে, বিনা স্পর্শে এই যে ধাক্কাধাক্কি, ইহাকে action at a distance বলা হয়। এই action at a distance তাঁহাদের পক্ষে দুরবগাহ তত্ত্ব। তাঁহারা formulaয় সন্তুষ্ট থাকেন না। তাঁহারা প্রত্যেক actionএর সঞ্চালন জন্য একটা যন্ত্র বা visual model তৈয়ার করিতে চান। Mechanicsএ তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন না; তাঁহারা চাহেন mechanism। কোনরূপ মধ্যস্থ যন্ত্র তাঁহারা দেখিতে পান না, অগত্যা তাঁহারা মধ্যস্থ যন্ত্রের কল্পনা করেন। এই কল্পনার শাস্ত্রসঙ্গত নাম hypothesis। তাঁহারা দেখেন, কোন মধ্যস্থ বা medium নাই। তাঁহারা বলেন, একটা মধ্যস্থ বা medium আবশ্যক। এই medium তাঁহারা সৃষ্টি করেন। তাহাদের যাঁহারা বড় বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা। সৃষ্টি বিষয়ে তাহাদের পরাক্রমের অন্ত নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করেন, কামনা করেন, একটা medium হউক। যেমনটুকু medium দরকার, তেমনই medium হউক। তাঁহারা বলেন, medium হউক,— অমনই একটা medium হয়। তাঁহারা দেখিতে পান, তাঁহাদের দরকার-মত medium হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, ইহা অতি "উত্তম" medium। আমি এখানে বসিয়া শব্দ করিলাম, আপনি দূরে থাকিয়া চমকিয়া উঠিলেন; অর্থাৎ আমি দূরে থাকিয়াও আপনাকে ধাক্কা দিলাম। একটা medium আবশ্যক। মাঝে হাওয়া আছে, উহাই সেই medium। ঐ যে শব্দটা আপনি শুনিলেন, উহা আপনার প্রত্যক্ষ হইল বটে, আপনি মনে করিতেছেন যে, উহাই আপনাকে উত্তেজিত করিয়াছে। ইহা আপনার ভুল। ঐ শব্দ অনুভূতি মাত্র; বৈজ্ঞানিক উহার ধার ধারেন না। বৈজ্ঞানিক জানেন

কেবল জড় দ্রব্য; যাহা আকাশ জুড়িয়া আছে, যাহার inertia আছে, যাহা ধাক্কা লইতে পারে ও ধাক্কা দিতে পারে। আমার কণ্ঠনালীতে আছে দুইগাছা তার, পেশীনির্ম্মিত তার; উহা জড় দ্রব্য। আপনার কাণের ভিতরে আছে পর্দ্দা এবং তৎসংলগ্ন স্নায়ুতন্ত্রী; উহাও জড় দ্রব্য। উভয়ের মাঝে আছে খানিকটা হাওয়া; উহাও জড় দ্রব্য। উহারও কিঞ্চিৎ inertia আছে। উহা ধাক্কা লইতে পারে এবং ধাক্কা দিতে পারে। প্রবল ঝড়ে বড় বড় মহীরুহ উৎপাটিত হয়, তাহাই প্রমাণ। কণ্ঠনালীর তার দুইগাছা হওয়াতে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দেয়। হাওয়া medium বা মধ্যস্থ যন্ত্র, সেই ধাক্কা সঞ্চালিত করিয়া আপনার কাণের পর্দ্দায় ও স্নায়ুতন্ত্রীতে ধাক্কার পর ধাক্কা দেয়। এইরূপে আমি দূরে থাকিয়াও আপনাকে উত্তেজিত করিলাম; তাহার mechanism বুঝা গেল। সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলো আসে। আলো চোখে লাগিলে আমরা উত্তেজিত হই। সূর্য্য নয় কোটি মাইল দূরে আছে; মাঝে ত কেবল ফাঁকা শূন্য। এখানে medium কই? এখানে medium কল্পনা করিতে হইবে। এখানে hypothesis দরকার। Newton কল্পনা করিলেন, সূর্য্য হইতে ছোট ছোট কণিকা ছুটিয়া আসিতেছে। সেই কণিকাগুলি ছুটিয়া আসিয়া চোখের পর্দ্দায় ধাক্কা দিতেছে। এই কণিকাগুলিই medium। ব্যাপারটা সেই কেতাব ছোঁড়ার মত। সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে আট মিনিট সময় লাগে; নয় কোটি মাইল অতিক্রম করিতে ৮ মিনিট মাত্র সময় লাগে। কি ভীষণ বেগ! সেকেণ্ডে প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার মাইল। Newtonএর কল্পিত কণিকাগুলি এই ভীষণ বেগে ছুটিয়া আসিতেছে; শূন্যপথে এই বেগে আসিতেছে। জলপথে চলিতে Newtonএর মতে আরও অধিক বেগে চলা উচিত। জলপথে আলো চালাইয়া দেখা গেল, শূন্যপথের চেয়ে বেগ বেশী হয় না, বরং কমই হয়। Newtonএর কল্পিত medium দরকারমত হইল না। অন্যরূপ medium আবশ্যক হইল। Young এবং Fresnel বলিলেন, অন্যরূপ medium হউক। অমনই অন্যরূপ medium হইল। সূর্য্যের তপ্ত কণিকাগুলি সেই mediumএ পুনঃ পুনঃ সেকেণ্ডে কোটি কোটি বার ধাক্কা দেয়; সেই ধাক্কা medium দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া সেকেণ্ডে এক লাখ নব্বই হাজার মাইল বেগে আসিয়া আমাদের চোখে ধাক্কা দিয়া আমাদিগকে উত্তেজিত করে। তাঁহারা সেই mediumএর নাম দিলেন

ether। ব্যাপারটা কেতাব ছোঁড়ার মত নহে; লাঠির গুঁতার মত। তাঁহারা দেখিলেন, এই ether অতি "উত্তম" হইয়াছে, Newtonএর কল্পিত কণিকাগুলি "উত্তম" হয় নাই।

এই যে ether, ইহা দরকার-মত হওয়া চাই; সূর্য্য হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত ফাঁকা জায়গায় বর্ত্তমান থাকা চাই। ইহার ভিতর দিয়া ধাক্কা সঞ্চালিত হইবে; অতএব ইহা জড় দ্রব্য; ইহার inertia থাকা চাই। জল বায়ুর মত তরল জড় দ্রব্য ঠেলিয়া দেওয়া চলে, মোচড়ান চলে না। ইস্পাতের মত কঠিন জড় দ্রব্যে ঠেলাও চলে, মোচড়ও চলে। আলোর সঙ্গে যে ধাক্কা আসে, উহা মোচড়ানর মত; অতএব ঐ যে ether, উহা জলের মত বা বায়ুর মত তরল হইলে চলিবে না; কতকটা ইস্পাতের মত হওয়া চাই। অতএব এই যে ether কল্পিত হইল, উহা ইস্পাতের মত কঠিন; উহা সমস্ত আকাশ জুড়িয়া আছে; কেন না, যেমন সূর্য্য হইতে আলো আসে, তেমনই অতিদূরের তারাগুলি হইতেও আলো আসে। যে আকাশকে একেবারে ফাঁকা মনে করা যাইতেছিল, উহা আদৌ ফাঁকা নহে; এই ইস্পাতজাতীয় কঠিন etherএ পরিপূর্ণ। উহা সমস্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে; অণুপরমাণুর মধ্যেও যে ফাঁকা আকাশ বা অবকাশ, তাহাও পরিপূর্ণ করিয়া আছে; অথচ এই ইস্পাতের ভিতর দিয়া গ্রহ উপগ্রহ হইতে অণুপরমাণু পর্য্যন্ত অক্লেশে বিচরণ করিতেছে। মাছ যেমন জলের মধ্যে অক্লেশে বিচরণ করে, আপনারাও সেইরূপ ইস্পাতের সমুদ্রমধ্যে অক্লেশে বিচরণ করিতেছেন; প্রভেদ এই যে, জল মাছের শরীরের ভিতর ঢুকে না; কিন্তু এই ইস্পাত আপনাদের দেহের প্রত্যেক রক্তকণিকার ভিতর পর্য্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। এ কি রকমের ইস্পাত? ইহা কি সম্ভব? Fresnel এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীরা বলিলেন, ঐ ইস্পাতের মত কঠিন ether বড়ই দরকার, অতএব উহা আমরা সৃষ্টি করিলাম। Lord Kelvin গলা ছাড়িয়া বলিলেন, বাজারের ইস্পাতের অস্তিত্বে আমি বরং বিশ্বাস করি না, কিন্তু এই বিশ্বব্যাপী ইস্পাতে আমার সংশয় মাত্র নাই।

ভাল কথা। আপনারা তাড়িতের এবং চুম্বকের কথা শুনিয়াছেন। একটা electrified bodyর সহিত আর একটা electrified bodyর টানাটানি ঠেলাঠেলি হয়। একখানা চুম্বকের সহিত আর একখানা চুম্বকের টানাটানি ঠেলাঠেলি হয়; পরস্পর দূরে থাকিলেও হয়। Newton গ্রহ

উপগ্রহের টানাটানিকে যে formulaয় ফেলিয়াছিলেন, সে formulaয় electrified body এবং magnetএর গতিবিধি বাঁধা চলে না; ভিন্ন formula আবশ্যক হয়। Coulomb সেই ভিন্ন formula বাহির করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারও action at a distance। তাড়িত যখন স্থির না থাকিয়া স্রোতে প্রবাহিত হয়, তখন ঐ স্রোত দূরস্থিত চুম্বককে ঠেলা দেয়। উহাও action at a distance। Ampere ইহার formula বাঁধিয়াছিলেন। ঐ action at a distance যাঁহাদের মনঃপূত হয় না, তাঁহারা medium খুঁজিতে লাগিলেন। Coulomb এবং Ampere খাঁটি ফরাসী; formula বাঁধিয়াই তাঁহারা তৃপ্ত ছিলেন। Faraday এবং Maxwell খাঁটি ইংরেজ; তাঁহারা formulaতে তৃপ্ত থাকিলেন না; যন্ত্র বা medium খুঁজিতে লাগিলেন। Faraday আসিয়া বলিলেন, medium দরকার। এ আবার কোন্ medium? Maxwell আসিয়া বলিলেন, নূতন medium আবশ্যক নয়; আলোর ধাক্কা বহিবার জন্য যে mediumএর সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেই mediumএই কাজ চলিতে পারে; সেই medium দিয়াই electro-magnetic ধাক্কা সঞ্চালিত হইতে পারে। Hertz আসিয়া সেইরূপ ধাক্কা চালাইতে লাগিলেন। তদবধি wireless-telegraphyর ধাক্কা বিনা তারে আকাশপথে চালান হইতেছে। আলোর ধাক্কা secondএ এক লাখ নব্বই হাজার মাইল বেগে চলে। এই electro-magnetic ধাক্কা সেই ether দিয়াই সেই এক লাখ নব্বই হাজার মাইল বেগে চলে। আলোর ধাক্কা ছোট ছোট, এই ধাক্কাগুলি মোটা মোটা, বড় বড়। আমাদের চোখের পর্দ্দা ছোট ছোট ধাক্কায় কাঁপিয়া উঠে, বড় বড় ধাক্কাগুলি ধরিতেই পারে না। সাব্যস্ত হইল, আলোর ধাক্কায় আর electro-magnetic ধাক্কায় জাতিগত কোন পার্থক্য নাই।

যে etherএর মাঝ দিয়া এই electro-magnetic ধাক্কা সঞ্চালিত হয়, তাহার inertia আছে, ধরা হইয়াছে। inertia আছে বলিয়াই উহা ধাক্কা লইতে এবং ধাক্কা দিতে পারে এবং ধাক্কা সঞ্চালন করিতে পারে। এই জন্যই উহা জড় দ্রব্য। কিন্তু এই যে electricity এবং magnetism, এই দুইটা পদার্থ কি? Coulombএর সময় হইতে এই দুই জিনিস লইয়া নাড়াচাড়া হইতেছিল; কিন্তু উহার inertiaর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। Faraday আসিয়া দেখাইলেন—তড়িতের, electricityর

কোন inertia নাই বটে, কিন্তু তাড়িতের স্রোতের inertiaর মত কিছু আছে। তাড়িতস্রোত যখন চলিতে থাকে, তখন হঠাৎ তাহাকে থামান যায় না; যখন থামিয়া থাকে, তখন হঠাৎ তাহাকে চালান যায় না। Faraday ইহা দেখাইয়াছিলেন বলিয়াই আজ আপনারা ঘরে বসিয়া তাড়িতস্রোতের ধাক্কায় টানা-পাখার হাওয়া খাইতেছেন এবং রাজপথে ট্রামগাড়ীতে চড়িয়া যাইতেছেন। যাহাকে আমরা জড় দ্রব্য বলি, তাহার inertia আছে। অণু-পরমাণুর মত অতি ক্ষুদ্র জড় দ্রব্যেরও inertia আছে; inertia আছে বলিয়াই অণু-পরমাণুকে জড় দ্রব্য বলিতেছি। এই অণু-পরমাণু যখন electrified বা তাড়িতযুক্ত হয়, তখন সেই inertiaর কোন ইতরবিশেষ হয় না; কিন্তু electrified হইয়া যদি অণু-পরমাণু ছুটিতে থাকে, তখন উহার inertia বৃদ্ধি পায়। Electrified অণু-পরমাণু ছুটিতে থাকিলেই তাড়িতস্রোত উৎপন্ন করে। তাড়িতের inertia নাই; কিন্তু তাড়িতস্রোতের inertia আছে; যত বেগে ছুটে, inertiaও তত বাড়িয়া যায়। এখন প্রশ্ন উঠিল যে, এই যে তাড়িত, যাহা স্থির থাকিলে inertiaহীন থাকে, যাহা বেগে ছুটিলে inertiaযুক্ত হয়, উহাকে জড় দ্রব্য বলিব কি না? এ পর্য্যন্ত যাহাকে জড় দ্রব্য বলিয়া আসিতেছি, তাহা সকল অবস্থাতেই inertiaযুক্ত; স্থির থাকিলেও inertiaযুক্ত, বেগে ছুটিলেও inertiaযুক্ত। বেগের ইতরবিশেষে তাহার inertiaর ইতরবিশেষ হয় না। কিন্তু এই যে তাড়িত, স্থির থাকিলে যাহার inertia থাকে না, ছুটিলেই যাহাতে inertia আসে, যত বেগে ছুটে, inertia তাহার তত বাড়ে, ইহাকে জড় দ্রব্য বলিব কি না? এই তাড়িতের যদি জড়ত্ব থাকে, সে কিরূপ জড়ত্ব?

Mechanics-শাস্ত্র এত দিন গ্রহ উপগ্রহ হইতে অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত বড় ছোট জড় দ্রব্য লইয়াই সন্তুষ্ট ছিল; প্রত্যেক দ্রব্যে খানিকটা inertia আরোপ করিয়া সন্তুষ্ট ছিল; কিন্তু এই এক নূতন উৎপাত আসিয়া জুটিল। Hydrogenএর পরমাণুর চেয়ে ছোট জড় কণা ইতিপূর্ব্বে পরিচিত ছিল না। হঠাৎ এক দিন বাহির হইয়া পড়িল, তাহার চেয়েও ছোট কণা রহিয়াছে। ইহাদের নাম দেওয়া হইল electron বা তাড়িতকণা। তাড়িতের যাবতীয় ধর্ম্ম এই কণিকায় বিদ্যমান আছে। অতএব ইহার

নাম দেওয়া হইল—তাড়িতকণা বা ইলেক্‌ট্রন। চলন্ত তাড়িতের inertia আছে; অতএব চলন্ত ইলেক্‌ট্রনের inertia আছে। হাজারখানিক তাড়িতকণার inertia hydrogen পরমাণুর inertiaর সমান। আবার এক দিন বাহির হইল, Radium ধাতু। এই Radium ধাতু হইতে কেবলই electron ছুটিয়া বাহির হইতেছে। কেবল Radium কেন, সকল দ্রব্য হইতেই অবস্থাভেদে ইলেক্‌ট্রন-কণিকা ছুটিয়া বাহির হয়। ছুটিবার বেগই বা কি ভীষণ! Radium হইতে যে electron বাহির হয়, তাহার বেগ secondএ লক্ষ মাইল। কোন জড় দ্রব্যের এরূপ ভীষণ বেগ ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। ইলেক্‌ট্রন যখন বেগে ছুটিয়া বাহির হয়, তখন তাহার inertia থাকে; যত বেগে বাহির হয়, inertiaও তত অধিক হয়। জড় দ্রব্যের পরমাণু মাত্রেরই ভিতরে ইলেক্‌ট্রন রহিয়াছে। এক-একটা পরমাণুর ভিতরে হয়ত হাজার দরুনে ইলেক্‌ট্রন রহিয়াছে; কিন্তু তাহারা স্থির নাই; সেই পরমাণুটুকুর সীমানার ভিতরেই ভীষণ বেগে ছুটিতেছে, কাঁপিতেছে, ঘুরিতেছে। এই বেগের প্রাবল্যে দুই দশটা ইলেক্‌ট্রন মাঝে মাঝে পরমাণু হইতে ছট্‌কিয়া বাহিরে পড়ে। Radiumএর পরমাণু হইতে বহু ইলেক্‌ট্রন অনবরত ছট্‌কিয়া বাহিরে আসিতেছে। জড় দ্রব্যের পরমাণুগুলি খুব সম্ভব এই ইলেক্‌ট্রন-গুলিরই সমষ্টি মাত্র। জড় দ্রব্যের যে জড়ত্ব, তাহা হয়ত সেই ইলেক্‌ট্রন-গুলিরই জড়ত্ব। ইলেক্‌ট্রনগুলি স্থির থাকিলে কোন জড়ত্বই থাকিত না; ইলেক্‌ট্রনগুলি বেগে ছুটে বলিয়াই উহাদের জড়ত্ব থাকে। এই ইলেক্‌ট্রন তাড়িতের কণিকা মাত্র; তাড়িতের কোন জড়ত্ব নাই; কিন্তু চলন্ত তাড়িতের জড়ত্ব আছে।

গ্যালিলিয়ো এবং নিউটন যে Mechanics-বিদ্যার ভিত্তি পত্তন করিয়াছিলেন, সে ভিত্তি টলমল করিয়া উঠিল। এই mechanicsএর গোড়ার কথা, প্রত্যেক জড় দ্রব্যের একটা characteristic আছে; প্রত্যেকের একটা নির্দ্দিষ্ট inertia আছে; কোনরূপ অবস্থাভেদে সেই inertiaর কোনরূপ ইতরবিশেষ, কোনরূপ তারতম্য, কোনরূপ মাত্রাভেদ ঘটে না। এইটুকু ধরিয়া লইয়া mechanics-বিদ্যার যাবতীয় formula বাঁধা হইয়াছে। সমস্ত Physical science এই কথাটা মানিয়া লইয়া জড় জগতের যাবতীয় ঘটনার mechanical explanation দিবার চেষ্টায়

ছিলেন। সমস্ত electro-magnetic ঘটনা কোন-না-কোন দিন এইরূপ mechanical formulaর ভিতরে পড়িবে, এই ভরসায় বসিয়া ছিলেন : হঠাৎ mechanical scienceএর ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে। এই যাহাকে electricity বলা যায়, যাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাকে electron নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা এক হিসাবে জড় দ্রব্য হয়, অন্য হিসাবে হয় না। জড় দ্রব্যের inertia অবস্থানিরপেক্ষ ; ইহা Mechanicsর গোড়ার কথা। কিন্তু এই electricityর inertia তাহার অবস্থাসাপেক্ষ ; উহা তাহার বেগের অপেক্ষা করে। Electricity যখন স্থির থাকে, যখন উহার বেগ থাকে না, তখন উহাতে inertia থাকে না ; তখন জড়ত্ব থাকে না। তখন উহাকে জড় পদার্থ বলা চলে না। বেগে ছুটিলেই অমনি জড়ত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। বেগ যত বাড়ে, জড়ত্ব বা inertiaও তত বাড়িয়া যায়। অবস্থাভেদে এই electricityর জড়ত্ব থাকে বা থাকে না, জড়ত্ব অল্প বা অধিক হয়। এইরূপ যে পদার্থ, উহাকে জড় পদার্থ বলিব কি না ? এত কাল জল-বায়ু, সোনা-রূপা প্রভৃতি দ্রব্যকে জড় দ্রব্য বলিতেছিলাম। ঐ সকল দ্রব্যকে অণু এবং পরমাণু—molecule এবং atomএর সমষ্টি বলিয়া জানিতাম ; প্রত্যেক অণু এবং প্রত্যেক পরমাণু জড় দ্রব্য বলিয়াই গৃহীত হইতেছিল ; প্রত্যেক অণুর, প্রত্যেক পরমাণুর inertia বা জড়ত্ব একেবারে নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখন দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক অণু এবং প্রত্যেক পরমাণু সহস্র বা সহস্রাধিক electronএ নির্ম্মিত ; প্রত্যেক electron বেগে চলিতেছে বলিয়াই প্রত্যেক electronএর জড়ত্ব ; যতটুকু বেগে চলে, তদনুসারে তাহার জড়ত্ব। অণু-পরমাণুর যে জড়ত্ব, তাহা সেই চলন্ত electronএর জড়ত্বেরই সমষ্টি মাত্র। জড়ত্ব যদি বেগসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে উহার পরিমাণের কোন নির্দ্দেশ থাকে না ; বেগের তারতম্যে উহার জড়ত্বেরও তারতম্য হয়। Newtonian Mechanicsএর যাহা ভিত্তি, তাহা থাকে না। এখন নূতন করিয়া ভিত্তি পত্তন করিতে হইবে। ভিত্তি পত্তন করিতেছেন Lorentz ; সেই ভিত্তির উপর গাঁথিতেছেন তাঁহার সহবর্ত্তী এবং অনুবর্ত্তী পণ্ডিতগণ।

জড় জগৎকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকেরাই সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহারাই জড় জগতের একভাবে কাঠাম বাঁধিয়াছিলেন ; যেমন দরকার হইয়াছিল, সেইরূপ বাঁধিয়াছিলেন ; এখন অন্য ভাবে

কাঠাম বাঁধিতে হইবে; এখনকার দরকারমত বাঁধিতে হইবে। এত কাল স্থির ছিল—জড়ত্বের তারতম্য হয় না, জড় দ্রব্য অবিনাশী, অনশ্বর। এখন দেখা যাইতেছে, ঐরূপ জড় পদার্থে চলিবে না। জড়ত্বের তারতম্য কল্পনা করিতে হইবে; উহা বাড়িতেও পারে, কমিতেও পারে। জড়কে অবিনাশী বলা আর চলিবে না। যাহাকে এত ক্ষণ জড়ত্ব বলিতেছিলাম, যাহাকে জড়ের মুখ্য লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেছিলাম, সেই মুখ্য লক্ষণই যদি লোপ পায়, তাহা হইলে কোন্ লক্ষণে জড়কে জড় বলিব? জড়ের লক্ষণই বা কি হইবে?

লোষ্ট্রখণ্ড হইতে চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা পর্য্যন্ত সকলকেই জড় দ্রব্য বলিতেছিলাম। এই সকল ছোট বড় জড় দ্রব্য ছোট ছোট molecule বা অণুর সমষ্টি ছিল; molecule বা অণুগুলি atom বা পরমাণুর সমষ্টি ছিল। চন্দ্র-সূর্য্য হইতে অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত সকলেরই জড়ত্বের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরমাণু হইল electronএর সমষ্টি; ঐ electron তাড়িতের কণিকা মাত্র। ঐ তাড়িত-কণিকার জড়ত্ব থাকিতে পারে বা নাও পারে। বেগে ছুটিলে উহার জড়ত্ব জন্মে, বেগ বাড়িলে উহার জড়ত্ব বাড়ে। লোষ্ট্রখণ্ড স্থির থাকিলে উহাতে আমরা যে জড়ত্ব আরোপ করি, উহা বস্তুতঃ লোষ্ট্রখণ্ডের জড়ত্ব নহে; লোষ্ট্রখণ্ডের অভ্যন্তরে উহার প্রত্যেক পরমাণুর ভিতরে যে হাজার হাজার তড়িতকণা আছে, লোষ্ট্রখণ্ডের জড়ত্ব সেই সকল তড়িতকণারই জড়ত্ব। তড়িতকণাগুলি স্থির নাই; উহারা চঞ্চল, ভীমবেগে চঞ্চল, সেই জন্যই উহাদের জড়ত্ব। অতএব লোষ্ট্রখণ্ড তাহার জড়ত্ব হারাইল। চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী বড় বড় লোষ্ট্রখণ্ড মাত্র; তাহারাও তাহাদের নির্দ্দিষ্ট জড়ত্ব হারাইল। বৈজ্ঞানিকের জড় জগতে এখন থাকিল কি?

এখনও আছে আকাশব্যাপী ether। এই etherএ জড়ত্ব কল্পিত হইয়াছে। Etherএর ভিতর দিয়া ধাক্কা সঞ্চালিত হয়। এই দেখিয়া etherএ জড়ত্ব কল্পিত হইয়াছে। যে দ্রব্যের ভিতর দিয়া ধাক্কা সঞ্চালিত হয়, যাহা ধাক্কা লইতে পারে ও ধাক্কা দিতে পারে, তাহাকেই জড় দ্রব্য বলা গিয়াছে। ধাক্কা দিবার এবং ধাক্কা লইবার ক্ষমতা জড়ত্ব। আমি লাঠিগাছটার গুঁতায় আপনাকে ঠেলিতে পারি; সেই ঠেলার ধাক্কা লাঠি দিয়া সঞ্চালিত হয়। অতএব লাঠি জড় দ্রব্য। আপনার গলায় চাদর

জড়াইয়া টানিতে পারি ; চাদর দিয়াই এই টানের ধাক্কা সঞ্চালিত হয়। অতএব চাদর জড় দ্রব্য। জলের ধাক্কায় বাঁধ ভাঙ্গে ; হাওয়ার ধাক্কায় গাছ উপড়ায়। অতএব জল, হাওয়া জড় দ্রব্য। আলোর ধাক্কা চালাইবার জন্য ether নামক জড় দ্রব্যের কল্পনা হইয়াছিল। জড় দ্রব্য তাহার জড়ত্ব হারাইয়াছে ; লাঠি, চাদর হইতে জল হাওয়া সকলেই তাহাদের জড়ত্ব হারাইয়াছে। আলোর মোচড় সহিবার জন্য etherকে ইস্পাতজাতীয় কঠিন দ্রব্য মনে করা গিয়াছিল ; কিন্তু ইস্পাতও তাহার জড়ত্ব হারাইয়াছে। তাহা হইলে etherএ জড়ত্ব থাকে কোথায় ? চলন্ত electronএর জড়ত্ব আছে বটে ; কিন্তু এই ether ত কোনরূপ electronএ নির্ম্মিত নহে। Ether-সমুদ্রের মধ্যে অণু-পরমাণু ভাসিয়া বেড়ায়। অণু-পরমাণুর মাঝে মাঝে যে ফাঁক, তাহা etherএ পরিপূর্ণ। Etherএর কোথাও কোন ফাঁক নাই। Ether একেবারে নিরেট জিনিস। উহার কোথাও কোন ছিদ্র, কোথাও কোন ফাঁক, কোথাও কোন অবকাশ নাই। উহা একেবারে Plenum। Etherএর কাজই হইতেছে ধাক্কা সঞ্চালন করা। Etherএর কোথাও কোন ফাঁক থাকিলে, সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া ধাক্কা সঞ্চালিত হইবে কিরূপে ? তাহা হইলে action at a distance সম্ভব হইয়া পড়ে। Action at a distance সম্ভব হইলে etherএর কল্পনা আবশ্যক হইত না। কাজেই ether নিজে একাকার জিনিস। উহার ভিতরে কোনরূপে জড় দ্রব্যের অণু-পরমাণুগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে। পরমাণুগুলি যদি electronএর সমষ্টি হয়, তাহা হইলে etherএর মধ্যে electronগুলি চলিয়া বেড়াইতেছে। চলন্ত electronই এক মাত্র জড় পদার্থ। Ether-সমুদ্র স্থির, অচঞ্চল। উহার জড়ত্ব থাকিবে কিরূপে ? উহাকে জড় বলিতে পারা যায় না। জড়ত্ব বলিতে যাহা আমরা বুঝি, তাহা etherএ থাকিতে পারে না ; etherএর inertia থাকিতে পারে না। Etherএর মধ্য দিয়া যাহা সঞ্চালিত হয়, তাহাকে ধাক্কা বলা চলে না। উহা একটা change মাত্র, একটা বিকার মাত্র। উহার নাম দাও electro-magnetic oscillation। এই electro-magnetic oscillation ব্যাপার কি, তাহা visualise করিবার চেষ্টা করিও না। ঐ নামেই সন্তুষ্ট থাক। নামই যথেষ্ট ; তাহাতেই কাজ চলিবে ; রূপ কল্পনার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা formulay, নামে তৃপ্ত হন না, তাঁহারা

mechanical model অন্বেষণ করিতে গিয়া etherএর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই ether তাহার রূপ হারাইল; থাকিল formula আর নাম।

Mechanics-শাস্ত্র নূতন করিয়া গড়িতে হইতেছে। Inertia শব্দটি বজায় আছে। এক কালে inertia বলিতে আমরা যাহা বুঝিতাম, এখন আর তাহা বুঝি না। কি বুঝি, তাহা বলাও দুষ্কর। উহা একটা symbol মাত্র, একটা concept মাত্র, একটা সংজ্ঞা মাত্র, একটা relationএর নাম মাত্র; এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। পুরাতন Mechanicsএর inertia হইতে পৃথক্ করিবার জন্য নূতন Mechanicsএর এই নূতন inertiaকে electro-magnetic inertia নাম দেওয়া হয়; এবং বলা হয়, এই electro-magnetic inertia ব্যতীত আর কোন inertia নাই; এবং যে-কোন জড় দ্রব্যের inertia তাহা এই electro-magnetic inertia। ইহা কোন স্থায়ী ধর্ম্ম নহে; উহা ইচ্ছামত বাড়াইতে কমাইতে পারা যায়; উহা জড় দ্রব্যের বেগের সাপেক্ষ; বেগ বাড়িলে উহা বাড়ে, বেগ কমিলে উহা কমে; বেগ না থাকিলে হয়ত উহা একেবারে লুপ্ত হয়।

এইখানে আর একটা নূতন সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন জড় দ্রব্যের বেগ আছে কি না এবং থাকিলেও উহার পরিমাণ কত, তাহা জানিব কিরূপে? বেগের তারতম্য যদি inertiaর তারতম্য হয়, তাহা হইলে বেগের পরিমাণ নির্দ্দেশ না করিলে inertiaরও মাত্রানির্দ্দেশ হইবে না। কিন্তু বেগের পরিমাণ কিরূপে স্থির করিব? আপনারা জানেন, আকাশের কোথাও কোন চিহ্ন নাই। উহার কোন্ স্থানে কোন্ দ্রব্য আছে, তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। বাহ্য জগতে যদি একটি মাত্র জড় দ্রব্য থাকিত, তাহা আকাশে ছুটিয়া বেড়াইলেও তাহা জানিবার কোন উপায় থাকিত না। একাধিক জড় দ্রব্য আছে বলিয়াই আমরা তাহার মধ্যে একটিকে স্থির ধরি এবং অন্যগুলি তাহা হইতে কখন্ কত দূরে রহিয়াছে দেখিয়া তাহাদের বেগের পরিমাণ করিয়া থাকি। এই যে বেগ, ইহা নিতান্ত আপেক্ষিক জিনিস; ইহার absolute measure জানিবার কোন উপায় নাই। আপনি যখন গাড়ীর ভিতরে সুখাসীন হইয়া চলিতে থাকেন, তখন আপনার কোন অঙ্গ-সঞ্চালন হয় না, কোন প্রয়াস হয় না; গাড়ীর তুলনায় আপনি তখন স্থির, নিশ্চল, নির্ব্বেগ; কিন্তু পথপার্শ্বে যে সকল

গাছপালা, ঘরবাড়ী আছে, তাহাদের তুলনায় আপনি বেগে গতিশীল ঐ গাড়ী যদি রেলগাড়ী হয়, তাহা হইলে আপনি হয়ত ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে গতিশীল। আবার এই ভূমণ্ডলটা একটা প্রকাণ্ডতর গাড়ী। ঐ গাড়ীতে আজন্ম আপনি চাপিয়া আছেন এবং প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল পাক খাইতেছেন এবং প্রতি বৎসরে সাতান্ন কোটি মাইল পথ ঘুরিয়া সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতেছেন। অগত্যা আপনি সূর্য্যকে আকাশ-মধ্যে স্থির ধরিয়া লইয়াছেন; কিন্তু ঐ সূর্য্যও পৃথিবীকে এবং পৃথিবীর সহিত আপনাকেও কোন্ দিকে কত বেগে টানিয়া চলিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব আপনি যে সুখাসীন হইয়া বিশ্রাম করিতেছেন, আপনার বেগ কত, তাহা কিরূপে বলিব? কত কোটি মাইল বা কত কোটি কোটি মাইল, তাহা কিরূপে জানিব? এবং inertia যদি বেগসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে আপনার জড় দেহের inertiaই বা কত, তাহা কিরূপে বলিব? Newton যে Mechanicsএর পত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে এরূপ কোন বালাই ছিল না; কেন না, inertia তখন বেগের কোন অপেক্ষা করিত না। বেগ অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, inertiaর মাত্রার কোন তারতম্য ঘটিত না। কিন্তু এখনকার inertia বেগসাপেক্ষ; বেগের মাত্রা না জানিলে inertiaর মাত্রা স্থির হইবে কিরূপে?

একটা উপায় আছে। এই যে ether আকাশ ব্যাপিয়া আছে, এই etherএর ভিতর দিয়া যে আলো আসে, সেই আলোর বেগকে আমরা এক হিসাবে absolute velocityরূপে গ্রহণ করিতে পারি। উহার পরিমাণ সেকেণ্ডে এক লাখ নব্বই হাজার মাইল। চন্দ্রসূর্য্য-তারকাদি যে সকল চলন্ত দ্রব্য হইতে আলো আসে, তাহাদের বেগের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। যে দ্রব্য হইতে আলো আসে, তাহা যে বেগেই চলুক না, আমরা পৃথিবীর বাসিন্দা, আলো পাইবার সময় উহার কোন ইতরবিশেষ দেখিতে পাই না। আধুনিক Mechanics স্থির করিয়াছেন, কোন দ্রব্যেরই বেগ, এমন কি, electronএর বেগও এই আলোকের বেগকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। যাহাই হউক, এই আলোকের বেগকে আমরা নিরপেক্ষ বা absolute বেগরূপে গ্রহণ করিতে পারি। বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষাশালায় বসিয়া আমরা যদি প্রদীপের আলো জ্বালি, আলো ether দিয়া ঠিক সেই বেগে চলিয়া থাকে। Etherকে আমরা স্থির-সমুদ্র

ধরিয়া লই। উহা চঞ্চল নহে, উহাতে কোনরূপ প্রবাহ বা স্রোত নাই। এই স্থির-সমুদ্রে পৃথিবী চলিতেছে; পৃথিবীস্থ যাবতীয় দ্রব্য চলিতেছে; রিপণ কালেজের বাড়ীও চলিতেছে; তাহার পূর্ব্বে স্থিত শিয়ালদহ ষ্টেসনের বাড়ীও চলিতেছে। উভয় বাড়ীই একমুখে, একই বেগে চলিতেছে। রিপণ কলেজে প্রদীপ জ্বালিলে ঐ আলো ether বাহিয়া পূর্ব্বমুখে চলিবে; আলো চলিতে চলিতে শিয়ালদহ ষ্টেসনও একটু-না-একটু পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাইবে; কালেজের আলো ষ্টেসনে পৌছিতে একটু সময় লাগিবে বেশী। আবার শিয়ালদহ ষ্টেশনে প্রদীপ জ্বালিলে তাহার আলো পশ্চিমমুখে আসিতে আসিতে কালেজের বাড়ীও একটু-না-একটু পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইবে। কাজেই ষ্টেসন হইতে কালেজে আসিতে সময় লাগিবে একটু অল্প। কালেজ হইতে ষ্টেসনে আলো যাইবার সময় এবং ষ্টেসন হইতে কালেজে আলো আসিবার সময় ঠিক সমান হইবে না; উভয়ের মধ্যে একটু-না-একটু তারতম্য বা প্রভেদ ঘটিবেই। পৃথিবী যদি etherএর মধ্যে স্থির থাকিত, অর্থাৎ কালেজের বাড়ী এবং ষ্টেসনের বাড়ী, উভয়েই যদি স্থির থাকিত, তাহা হইলে কোন তারতম্যই ঘটিত না। পৃথিবী ether বাহিয়া যত অধিক বেগে চলিবে, এই তারতম্য তত অধিকই হইবে। এ-কালের সূক্ষ্ম যন্ত্রে অতিসূক্ষ্ম তারতম্যও ধরা পড়ে। সম্প্রতি Michelson এবং Morley অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের দ্বারা এই তারতম্য ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু ধরিতে পারেন নাই। তাঁহারা দেখিয়াছেন, আলো পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, কিংবা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আসিতেও যে সময় লাগে, উত্তর হইতে দক্ষিণে, কিংবা দক্ষিণ হইতে উত্তরে আসিতেও ঠিক সেই সময় লাগে; কোন দিকেই আলোর যাতায়াতে আলোর বেগের কোন তারতম্যই ধরিতে পারা যায় নাই। Etherএর স্থির-সমুদ্র দিয়া পৃথিবী দ্রুত বেগে পূর্ব্বমুখে চলিতেছে; অথচ কালেজ হইতে ষ্টেসনে এবং ষ্টেসন হইতে কালেজে আলো আসিতে ঠিক এক সময়ই লাগিতেছে। যেন নদীর স্রোতে ভাটিয়া চলিতে যে সময়, উজানে চলিতেও সেই সময় লাগিতেছে। এ এক মহাসমস্যা। এ সমস্যার পূরণ হইবে কিরূপে? Fitz-Gerald উত্তর দিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন, ether ভেদ করিয়া চলিবার সময়ে সকল দ্রব্যেরই আয়তনে একটু সঙ্কোচ ঘটে। পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় দ্রব্য পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে বেগে চলিতেছে; অতএব পৃথিবীর এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় দ্রব্যের পূর্ব্ব-পশ্চিমে একটু সঙ্কোচ

ঘটিয়াছে। সঙ্কোচ ঘটিয়াছে বলিয়াই কালেজের বাড়ীর এবং ষ্টেসনের বাড়ীর মাঝের দূরত্বে বা ব্যবধানে একটুকু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ঐ ব্যবধান আমরা যতটুকু মনে করি, ততটুকু নয়;—নয় বলিয়াই আলোর যাতায়াতের সময়ও আমরা যাহা মনে করি, তাহা নয়। উত্তর হইতে দক্ষিণে বা দক্ষিণ হইতে উত্তরে সেরূপ কোন সঙ্কোচ ঘটে নাই। উত্তর দক্ষিণে যে ব্যবধান বা দূরত্ব, তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

সমস্যা ক্রমেই গহন হইয়া আসিল। ঐ লাঠিগাছটা টেবিলের উপর পূর্ব্ব-পশ্চিমে রাখ; আবার ঘুরাইয়া উত্তর-দক্ষিণে রাখ; ঘুরাইবা মাত্র উহার দৈর্ঘ্যের ব্যতিক্রম হইবে। পূর্ব্ব-পশ্চিমে উহা একটুকু খর্ব্ব হইবে, উত্তর-দক্ষিণে রাখিলে উহা তদনুপাতে দীর্ঘ হইবে। টেবিলটারও ঐ দশা হইয়াছে। আপনারা মনে করিতেছেন যে, টেবিলটা square, পূর্ব্ব-পশ্চিমে যত লম্বা, উত্তর-দক্ষিণেও তত লম্বা; সে টেবিল তাহা নহে, উহা একটুকু rectangular। উত্তর-দক্ষিণের দৈর্ঘ্য, আর পূর্ব্ব-পশ্চিমের দৈর্ঘ্য সমান দেখাইলেও সমান নহে; একটুকু প্রভেদ আছে। ঐ প্রভেদ জানিবেন কিরূপে? গজকাঠি বা ফুটরুল দিয়া মাপিতে চান?—অসম্ভব। গজ-কাঠিটারও পূর্ব্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য আর উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ঠিক সমান নহে। গজকাঠিকে ঘুরাইবা মাত্র উহারও দৈর্ঘ্যের ব্যতিক্রম হইয়া যায়। অতএব পূর্ব্ব-পশ্চিমে যাহা এক গজ, উত্তর-দক্ষিণে তাহা ঠিক এক গজ নহে। পূর্ব্ব-পশ্চিমের মাইল, উত্তর-দক্ষিণের মাইলের সমান নহে। বাল্যাবধি আপনারা শুনিতেছেন—পৃথিবী গোলাকার; কিন্তু ঠিক গোলাকার নহে; উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা; কতটুকু চাপা, তাহার হিসাবও একটা পাইয়াছেন। পূর্ব্ব-পশ্চিমে পৃথিবীর যে ব্যাস, উত্তর-দক্ষিণে ব্যাস তাহার চেয়ে প্রায় ২৫ মাইল ছোট। Geodesy নামক শাস্ত্র কত মেহনত করিয়া এই প্রভেদ নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মতের যে গোড়ায় গলদ রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহাদের মাপকাঠি উত্তর-দক্ষিণে রাখিলে যে মপোর থাকে, পূর্ব্ব-পশ্চিমে রাখিলে সে মাপের থাকে না। পৃথিবী যদি উত্তর-দক্ষিণে চাপা না হইয়া সম্পূর্ণ গোলাকারই হইত, তাহা হইলেই বা কি হইত? আমরা দেখিতাম, উহা সম্পূর্ণ গোলাকার; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা হইত ডিম্বাকার। ডিম্বাকার হইলেও আমরা উহাকে

গোলাকারই দেখিতাম ; কোন সূক্ষ্ম মাপকাঠির দ্বারা উহার ডিম্বাকৃতি ধরিবার উপায় থাকিত না।

আপনারা শুনিয়া আসিতেছেন, Science is measurement, পরিমাণ-কর্ম্মই বিজ্ঞান-বিদ্যার প্রাণ। যেগুলি প্রত্যক্ষ বস্তু, যাহাকে sensation বলা যায়, যাহার অন্তরালে empirical philosophyর মতে আর কিছু নাই, সেগুলি ত পরিমাণযোগ্যই নহে। বিজ্ঞান-বিদ্যা যাহার পরিমাণ করেন, তাহা কতকগুলি conceptual পদার্থ, কল্পিত পদার্থ, মন-গড়া পদার্থ। সেগুলির নাম দেন physical quantities। সেই conceptual পদার্থগুলিরও পরিমাণযোগ্যতা নাই। পরিমাণ নিরূপণের সময়ে আমরা in terms of space পরিমাণ করি। সকল পদার্থকেই একটা lengthএ পরিণত করিয়া সেই lengthরূপে পরিমাণ করি। এই lengthই এক মাত্র পরিমাণযোগ্য পদার্থ। এই পরিমাণের উপরেই বিশ্বাস করিয়া এত বড় বিজ্ঞান-বিদ্যা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কোন্ দ্রব্য কখন্ কত দূরে থাকিবে, গণনার দ্বারা তাহা বলিতে পারিলেই বিজ্ঞান-বিদ্যা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এই যে দূরত্ব, তাহা পরিমাণের বিষয় ; এই দূরত্ব গজকাঠি দিয়া মাপিতে হয় ; কিন্তু দূরত্ব পরিমাণে এই গজকাঠির ক্ষমতার পরিচয় আপনারা পাইলেন। স্থানভেদে যদি গজকাঠির দৈর্ঘ্য ভিন্নরূপ হয়, তাহা হইলে সেই গজকাঠির সার্থকতা কতটুকু থাকিল ! অবস্থাভেদে গজকাঠির দৈর্ঘ্যের ব্যতিক্রম হয়, তাহা আমরা জানি ; উষ্ণতাভেদে দৈর্ঘ্যের তারতম্য হয়, তাহা আমরা জানি। সেটুকু আমরা সংশোধন করিয়া লইতে পারি। কিন্তু কেবল অবস্থানভেদে যদি দৈর্ঘ্যের ব্যতিক্রম হয় এবং কতটুকু ব্যতিক্রম হইল, তাহা ধরিবার কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে দৈর্ঘ্য-পরিমাণের সার্থকতা কতটুকু থাকে ! দৈর্ঘ্যের পরিমাপে এবং দূরত্বের পরিমাপে এরূপ গোড়ায় গলদ থাকিলে বিজ্ঞান-বিদ্যার যে সকল formula এই সকল পরিমাপের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সকল formulaরই বা সার্থকতা কিরূপ হয় ?

আকাশব্যাপী etherএর ভিতর দিয়া আলোর বেগ এক লাখ নব্বই হাজার মাইল। এই বেগকে এক হিসাবে absolute velocity বলা যাইতে পারে। যে জড় দ্রব্য হইতে আলো আসিতেছে, তাহার বেগের সহিত আলোর এই বেগের কোন সম্পর্ক নাই। Etherকে স্থির, অচঞ্চল,

stagnant ধরিয়া লইয়া আলোর এই বেগ নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু এই যে এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইলের কথা বলা যাইতেছে, এখানে এই মাইল শব্দের অর্থ কি? ১৭৬০ গজে মাইল, ইহা আমরা ধরিয়া লই বটে, কিন্তু ঐ গজ কোন্ গজ? আপনারা হয়ত বলিবেন, উহা British standard গজ; কিন্তু British standard গজ নিতান্তই পার্থিব গজ। উহা চন্দ্রলোকে গেলে যদি একরূপ হয় এবং সূর্য্যলোকে গেলে অন্যরূপ হয়; পৃথিবীতে থাকিয়াও উত্তর মুখে থাকিতে যদি একরূপ হয় এবং পূর্ব্বমুখে ধরিলে যদি অন্যরূপ হয়, তাহা হইলে সে গজেরই বা অর্থ কি হয় এবং মাইলের অর্থই বা কি হয়? সে কথা এখন থাক। ধরিয়া লইলাম, গজের একটা মানে আছে; ধরিয়া লইলাম, স্থানভেদে উহার দৈর্ঘ্যের কোন ব্যতিক্রম হয় না। Mechanics-শাস্ত্র relative velocity লইয়াই কারবার করেন; absolute velocityর সহিত কোনরূপ কারবার অসাধ্য। গজকাঠির তুলনার দ্বারাই সেই relative velocity মাপিতে হইবে। Ether যখন স্থির ও নিশ্চল, তখন etherএর মধ্য দিয়া কোন দ্রব্য যে বেগে চলে, তাহা মাপিতে পারিলে সেই বেগকে সেই দ্রব্যের absolute velocity বলা যাইতে পারিত। কিন্তু Michelson এবং Morleyর experiment হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, absolute velocity মাপিবার কোন উপায় নাই; কাজেই relative velocity মাপিয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। রেলের গাড়ী ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল চলে। রেলের গাড়ীর এই বেগ relative velocity, আপেক্ষিক বেগ; পৃথিবীকে স্থির ধরিয়া পৃথিবীর তুলনায় উহা নির্দ্দিষ্ট হয়। পৃথিবী এক বৎসরে সাতান্ন কোটি মাইল চলে, উহাও আপেক্ষিক বেগ। সূর্য্যকে স্থির ধরিয়া সূর্য্যের তুলনায় উহা নিরূপিত হয়। এই বেগ খুব ভীষণ বেগ বটে; কিন্তু আলোর বেগের তুলনায় যৎসামান্য। উহা সেকেণ্ডে উনিশ মাইল; আর আলোর বেগ সেকেণ্ডে এক লাখ নব্বই হাজার মাইল। Electronএর কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। জড় দ্রব্যের পরমাণু হইতে electronগুলি ছট্‌কিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসে, তাহাও বলিয়াছি। এই electronগুলিরও বেগ পরিমিত হইয়াছে। উহাদের বেগ আলোর বেগের তুলনায় যৎসামান্য নহে। সেকেণ্ডে লক্ষ মাইল বেগে চলিতেছে, এমন electron আজকাল সুপরিচিত। মনে করুন, একটা electron সেই বেগে অর্থাৎ সেকেণ্ডে লক্ষ মাইল বেগে

ছুটিতেছে,—পূর্ব্বমুখে ছুটিতেছে। মনে করুন, আর একটা electron ঠিক সেই বেগে অর্থাৎ সেকেণ্ডে লক্ষ মাইল বেগে উল্‌টামুখে ছুটিতেছে,—পশ্চিমমুখে ছুটিতেছে। উহাদের পরস্পর আপেক্ষিক বেগ কি হইবে? একটার তুলনায় আর একটার আপেক্ষিক বেগ হইবে সেকেণ্ডে দুই লক্ষ মাইল ; কেন না, এক লক্ষ আর এক লক্ষ, একযোগে দুই লক্ষের সমান। আপেক্ষিক বেগ পরিমাণযোগ্য। উহা যত ভীষণই হউক, একটা ঘড়ি আর একটা গজকাঠি থাকিলেই উহা পরিমাণ করা যায়। এখানে আপেক্ষিক বেগের পরিমাণ হইল সেকেণ্ডে দুই লক্ষ মাইল। কিন্তু আলোর বেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইল মাত্র ; অতএব electronএর বেগ হইল তাহার চেয়ে অধিক—সেকেণ্ডে দশ হাজার মাইল অধিক। ইহা অসম্ভব। কোন দ্রব্যের বেগ আপেক্ষিকই হউক, আর নিরপেক্ষই হউক, আলোর বেগের অধিক হইতে পারে না। নূতন Mechanics-মতে আলোর বেগই চরম সীমা, ঐ এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইলই চরম সীমা। কোন দ্রব্যের কোনরূপ বেগ ঐ সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। অথচ স্পষ্ট দেখিতেছি, এক-একটা electron সেকেণ্ডে লক্ষ মাইল বেগে চলিয়া থাকে। দুইটা electron পরস্পর উল্‌টামুখে চলিলে তাহাদের আপেক্ষিক বেগ সেকেণ্ডে দুই লক্ষ মাইল হইবে, আলোর বেগকে ছাড়াইয়া যাইবে। এ একটা নূতন সমস্যা। শুধু নূতন নহে, একটা তুমুল সমস্যা। সেকেণ্ডে দুই লক্ষ মাইল বেগ—আলোর বেগের চেয়ে অধিক বেগ নূতন Mechanicsএর মতে অসম্ভব ; হউক না তাহা আপেক্ষিক বেগ। আপেক্ষিক বেগ ব্যতীত অন্য নিরপেক্ষ বেগ মাপিবার কোন উপায় কেহ জানেন না। পুরাতন Mechanics তাহা জানিতেন না, নূতন Mechanicsও তাহা জানেন না। এই সমস্যার মীমাংসা কি? সেকেণ্ডে দুই লক্ষ মাইল বেগ স্পষ্ট দেখিতেছি ; অথচ উহা হইতে পারে না। মীমাংসা এইরূপ—যে কালটুকুকে এক সেকেণ্ড মনে করিতেছ, উহা এক সেকেণ্ড নহে, উহা এক সেকেণ্ডের চেয়ে একটুকু দীর্ঘ। তোমার ঘড়িতে উহা এক সেকেণ্ড দেখাইতেছে বটে ; কিন্তু ঐ ঘড়ির সাক্ষ্য সর্ব্বত্র গ্রাহ্য নহে ; স্থানভেদে, অবস্থাভেদে উহার সাক্ষ্য সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। যাহাকে এক সেকেণ্ড মনে করিতেছ, তাহা সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় এক সেকেণ্ড নহে।

সমস্যা ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিল। আগে দেখিয়াছি, যাহাকে এক গজ বলিতেছি, তাহা সর্ব্বত্র এক গজ নহে। গজ কথাটারই কোন নির্দ্দিষ্ট মানে নাই। এখন দেখিতেছি, যাহাকে এক সেকেণ্ড বলিতেছি, তাহারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এক সেকেণ্ড নহে। সেকেণ্ড কথাটারও নির্দ্দিষ্ট কোন মানে নাই। গজের হিসাবে আমরা দেশ পরিমাণ করি, সেকেণ্ডের হিসাবে আমরা কাল পরিমাণ করি। এখন দেখিতেছি, দেশের পরিমাণে এবং কালের পরিমাণে কোন বাঁধা standard নাই। আমরা দায়ে পড়িয়া যে standard অবলম্বন করি, সে standardএর কোন স্থিরত্ব নাই। দেশ মাপের সময়ে যাহাকে এক মাইল বলি, সে এক মাইলের কোথায় কি অর্থ, জোর করিয়া বলিতে পারি না। কাল মাপিবার সময়ে যাহাকে এক ঘণ্টা বলি, তাহার কখন কি অর্থ, তাহাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। দেশের এবং কালের পরিমাণে এইরূপ গোড়ায় গলদ। এই পরিমাণের উপর ভর করিয়াই বিজ্ঞান-বিদ্যা যাবতীয় গণনা করিতেছেন। সেই গণনা অনুসারে আমরা জীবনযাত্রা চালাইতেছি। জীবনযাত্রাও বেশ চলিয়া যাইতেছে; অথচ সেই পরিমাণকর্ম্মে কোনরূপ স্থিরতা নাই। বিজ্ঞান-বিদ্যার ভিত্তি খুঁজিতে গিয়া এই ফাঁক বাহির হইয়া পড়িল। কেঁচো বাহির করিতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, জড় জগতের তথ্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে অগাধ জলে সাঁতার দিতে হইবে;—সাঁতার দেওয়া দূরে থাকুক, এখন অতলস্পর্শে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হইতেছে। উদ্ধারের উপায় আছে কি না, দেখিবার ইচ্ছা থাকিল। আপনাদের ধৈর্য্য পরিমাণের কোন standard আমার হাতে নাই। যদি অভয় দেন, বারান্তরে চেষ্টা করিব।

বৈজ্ঞানিকের আকাশ

আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচ্য জড় জগতের কথা বলিতেছিলাম। মনের সামনে উহার একটা ছবি আঁকিবার চেষ্টা করুন। আকাশ সমাকার। সেই আকাশকে বিষমাকার করিয়া এই জড় জগৎ বিদ্যমান। সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ, এই সকল খণ্ড খণ্ড জড় দ্রব্য আকাশের এখানে ওখানে সেখানে ছড়াইয়া আছে। তাহাদের মাঝে মাঝে ফাঁক। সেই ফাঁকও একেবারে শূন্য নহে। উহা যাহাতে পূর্ণ, তাহার নাম ether। ঐ সকল জড়খণ্ড অণুতে পরমাণুতে নির্ম্মিত। অণু-পরমাণুগুলা ছোট ছোট জড়খণ্ড; তাহাদেরও মাঝে মাঝে ফাঁক, সেই ফাঁক ঈথারে পূর্ণ। বিজ্ঞান-বিদ্যা এখন বলিতে চাহিতেছেন যে, অণু-পরমাণুগুলিও আরও ছোট ইলেক্‌ট্রনে নির্ম্মিত। এক-একটা পরমাণুর মধ্যে হাজার দরুনে ইলেক্‌ট্রন আছে। সেই সকল ইলেক্‌ট্রনের মাঝে মাঝে যে ফাঁক, তাহাও ঈথারে পূর্ণ। শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল ঈথার এবং ইলেক্‌ট্রন। সমস্ত আকাশ জুড়িয়া ঈথার আর তার মাঝে মাঝে ইলেক্‌ট্রন। অতএব আকাশ-জোড়া জড় জগৎ বিচ্ছিন্ন, সন্ততিহীন, discontinuous; electronগুলি আকাশকে বিচ্ছিন্নতা—discontinuity দিতেছে। ঈথার জিনিসটা হয়ত বিচ্ছেদরহিত—continuous; ether যেমনই হউক, উহার মাঝে মাঝে electron থাকিয়া উহাকে discontinuity দিতেছে। এইরূপে সমস্ত জড় জগৎটাই ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। এইরূপেই সমাকার আকাশ, অথবা সমাকার আকাশ ব্যাপিয়া বিদ্যমান সমাকার ether বিষমাকৃতি পাইয়াছে। এই বিষমাকৃতি পাওয়া নিতান্তই দরকার। নতুবা সর্ব্বত্র সমাকার আকাশের সার্থকতা কি হইবে? সর্ব্বত্র সমাকার বা একাকার পদার্থের বিবরণ দেওয়া চলে না। Electronগুলি etherএর স্থির-সমুদ্রমধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। পরস্পর ব্যবধানে থাকিয়া কাছে আসিতেছে, দূরে যাইতেছে। কিন্তু দুইটা electron একেবারে মিশিয়া যায় না। দুইটা electron বোধ হয় কখনও গায়ে গায়ে লাগে না,—মিশিয়া যাওয়া দূরের কথা। প্রত্যেক electronএর চারি দিকে এক-একটু প্রদেশ আছে। সেই প্রদেশের মধ্যে অন্য electronএর প্রবেশ নিষিদ্ধ। প্রত্যেক electron আপনার সেই ক্ষুদ্র এলাকাটুকু কোন-না-কোনরূপে

অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। অন্য electronকে সেখানে আসিতে দেয় না। কাজেই একটা আর একটার গায়ে পড়িয়া মিশিয়া যাইবার অবসর পায় না। আপনার হাতে গুলিভরা পিস্তল থাকিলে আপনি ক্ষীণদেহ হইয়াও যেমন দশ বিঘা জমি অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন, অপরে সেই এলাকার মধ্যে ঘেঁসিতে সাহস করে না, ইহাও যেন কতকটা সেইরূপ। আমি Clerk Maxwellএর ভাষা ব্যবহার করিলাম। তিনি পরমাণু সম্বন্ধে এইরূপ ভাষার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাই জড় দ্রব্যের impenetrability। একটা জড় দ্রব্য আর একটা জড় দ্রব্যে একবারে মিশিয়া যাইতে পারে না। তাহার কতকটা ব্যাখ্যা এইরূপে মিলিতে পারে। তামায় দস্তায় মিলিয়া যখন পিতল হয়, সে পিতলের মধ্যে তামা বা দস্তা কিছুই পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না; অথচ তখনও সেই পিতলের অভ্যন্তরে তামার পরমাণু ও দস্তার পরমাণু পাশাপাশি রহিয়াছে, পরস্পর মিলিয়া যায় নাই। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে electron-গুলিও পাশাপাশি রহিয়াছে—এরূপ মনে করা যাইতে পারে। অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত জড় দ্রব্যকে বিচ্ছিন্ন বা discontinuous মনে করিতেই হইবে। এরূপ মনে না করিলে বোধ করি, dynamics-বিদ্যা জড় দ্রব্যকে আয়ত্ত করিতে পারিত না। আয়ত্ত করিতে পারিত না বলিয়াই কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পণ্ডিতেরা etherকে পর্য্যন্ত discontinuous মনে করিতে বাধ্য হইতেন। ঈথারেও একটা কণিকাময়তা, grained structure, molecular structure আরোপ করিতে বাধ্য হইতেন। আজকাল ether জিনিসটা খাঁটি dynamicsএর আলোচনার বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। উহাকে continuous বলিব, কি discontinuous বলিব, বিজ্ঞান-বিদ্যা তাহাতে সন্দিহান রহিয়াছেন। Etherএর পক্ষে যাহাই হউক, electronগুলিকে পরস্পর ব্যবহিত বলিয়া মনে করিতেই হয়। এই discontinuity ব্যাপারের উপর আমি অধিক জোর দিতে চাই। জড় দ্রব্যের কাজই হইতেছে—সমাকার আকাশকে বিষমাকার করা। এক-একটা জড় দ্রব্য, অথবা জড় দ্রব্যের অন্তর্গত এক-একটা electron এক একটা চিহ্ন মাত্র; জড় জগতের বিবরণ ঐ চিহ্নগুলিরই বিবরণ। চিহ্নগুলি স্থির ether-সমুদ্রমধ্যে ছুটিতেছে। সেই ছুটাছুটির বিবরণ জড় জগতের বিবরণ। বর্ত্তমান ক্ষণে কোন্ electronটি কোথায় রহিয়াছে

বলিয়া দাও এবং কোন্ পথে কি বেগে চলিতেছে, তাহা বলিয়া দাও তাহা হইলে সমস্ত অতীত কালে উহা কখন্ কোথায় চলিতেছিল এবং সমস্ত ভবিষ্যতে কখন্ কোথায় চলিবে, তাহা আমি গণিয়া বলিব ;—বৈজ্ঞানিকের ইহাই প্রতিজ্ঞা। বর্ত্তমানের জ্ঞান হইতে অতীতের জ্ঞান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান আদায় করিব, বৈজ্ঞানিকের ইহাই প্রতিজ্ঞা। Electronগুলার গতিবিধি সম্বন্ধে কতকগুলা conceptএর সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক পাতাইয়া, সেই সম্পর্ককে সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিলেই সমস্ত অতীত এবং সমস্ত ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকের আয়ত্ত হইয়া পড়িবে। দুঃখ এই, electronগুলির গতিবিধি মাপিবার কোন উপায় পাওয়া যায় নাই। Ether-সমুদ্রকে স্থির-সমুদ্র ধরিয়া লইয়া সেই স্থির-সমুদ্রে কোন্ electron স্থির আছে, কি বেগে চলিতেছে, তাহা মাপিবার কোন উপায় পাওয়া যায় নাই। কোন্ electron কতটুকু সময়ে কতটা পথ অতিক্রম করিল, তাহা মাপিতে গেলে ঘড়ির দরকার হয় এবং গজকাঠির দরকার হয়। কিন্তু সেরূপ ঘড়িও পাওয়া যায় না, গজকাঠিও পাওয়া যায় না। ঘড়ির সময় ঠিক থাকে না এবং গজকাঠিরও দীর্ঘতা ঠিক থাকে না, ইহা আপনাদিগকে আগে বলিয়াছি। অগত্যা etherকে বর্জ্জন করিয়া প্রচলিত ঘড়ি ও গজকাঠি দিয়া electronদের পরস্পরের দূরত্ব মাপিতে হয় এবং তদনুসারে উহাদের বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখিতে হয়। এই প্রচলিত ঘড়িতে যে সময় পাওয়া যায় এবং এই প্রচলিত গজকাঠিতে যে দূরত্বের নিরূপণ হয়, তাহা নিতান্তই কাজ-চালান,—conventional ; লজিকের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে উহা গুঁড়া হইয়া যায়—কোন তাৎপর্য্যই থাকে না! এইরূপে বেগের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি দেখিয়া inertia বা জড়ত্বের অঙ্কের নিরূপণ হয়। পুরাতন বিজ্ঞান নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এই জড়ত্বের অঙ্ক স্থায়ী অঙ্ক ; ইহার ইতরবিশেষ হয় না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান দেখিতেছেন, ওরূপে নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। আধুনিক বিজ্ঞান দেখিতেছেন, বেগ-বৃদ্ধির সহিত জড়ত্ব বাড়িয়া যায়। স্থির সমুদ্রে নিশ্চল electronকে চাপিয়া ধরিবার কোন উপায় নাই বটে, কিন্তু যদি তেমন কোন নিশ্চল electron থাকে, তাহা জড়ত্ববর্জ্জিত হইবে। অর্থাৎ এই যে inertia বা জড়ত্ব, ইহা electronএর স্বাভাবিক লক্ষণ নহে ; উহা অর্জ্জিত লক্ষণ। বেগবশে উহা অর্জ্জিত হয়। Electron নিজে জড়ত্বহীন। উহা যখন

বেগে ছুটে, তখনই উহা জড়ত্ব পায়। কোন কোন পণ্ডিত বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যাহা জড়ত্বহীন, তাহা ত বস্তুহীন, তাহা ত ফাঁকি। তাঁহারা বলিতে চাহেন, জলে যেমন বুদ্বুদ, ether-সমুদ্রে electronগুলা তেমনই বুদ্বুদ। বুদ্বুদ যেমন ফাঁকা অথবা প্রায় ফাঁকা জিনিস, electronগুলাও সেইরূপ ফাঁকা বা প্রায় ফাঁকা জিনিস। উহাতে কোন বস্তু নাই। বস্তু যদি থাকে, তাহা etherএ। ব্যাপারটা বুঝুন। সবই ওলট-পালটের ব্যাপার। বৈজ্ঞানিকদের মগজে etherএর যখন কল্পনা হয় নাই, তখন জড় দ্রব্যগুলাই ছিল বাস্তব জিনিস, আর চারি দিকের আকাশ ছিল ফাঁকা। এখন ফাঁকা আকাশ হইল নিরেট; উহা বাস্তব etherএ পরিপূর্ণ, আর electronগুলি অথবা electron-নির্ম্মিত জড় দ্রব্যগুলি হইল সম্পূর্ণ ফাঁকি। আপনারা ঐ ফাঁকা আকাশের মধ্যে ঐ যে চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী প্রভৃতি গোল গোল নিরেট জমাট দ্রব্য দেখিতেছেন, উহা নিতান্তই আপনাদের মনের ভুল। সমস্ত আকাশটা নিরেট অথবা নিরেট etherএ পরিপূর্ণ। আর এই চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী প্রভৃতি যে সকল জমাট দ্রব্য দেখিতেছেন, উহারাই নিতান্ত ভুয়া ফাঁকা বুদ্বুদ বা বুদ্বুদ-সমষ্টি। উহাদের নিজের কোন জড়ত্ব নাই। Ether ঠেলিয়া বেগে চলে বলিয়াই উহারা জড়ত্ব পায়। বেগবত্তা হইতেই জড়ত্ব। স্থির থাকিলে হয়ত জড়ত্ব থাকিত না। বেগে চলিতেছে বলিয়াই জড়ত্ব পাইয়াছে। নিউটনের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানশাস্ত্র ইহা শুনিলে স্তম্ভিত হইবে! সবই উলটাইয়া লইতে হইবে। যাহা ফাঁকা, তাহাকে মনে করিতে হইবে নিরেট জমাট; আর যাহা জমাট, তাহাকে মনে করিতে হইবে ভুয়া ফাঁকি।

সে-কালের বিজ্ঞান-বিদ্যা etherকে জানিত না, জড় দ্রব্যকেই জানিত। সূর্য্যকে জানিত, পৃথিবীকে জানিত; সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলোর ধাক্কা আসে, তাহাও জানিত। সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝে ধাক্কা বহিবার জন্য যে etherএর medium আবশ্যক, তাহা সে-কালের বিজ্ঞান-বিদ্যা জানিত না। পৃথিবীর মত জড় দ্রব্যই ধাক্কা লয় এবং ধাক্কা দেয়; ইহা দেখিয়াই—সেই ধাক্কা বহিবার জন্যই সূর্য্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে এই ধাক্কাবাহী etherকে বসাইতে হইয়াছিল। Analogy বা উপমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে, তবে analogy পথ দেখায়, ইহা আগেই বলিয়াছি। লাঠির মত বা দড়ির মত ধাক্কা-প্রেরণে সমর্থ জড় দ্রব্যের analogy হইতেই etherএর

কল্পনা হইয়াছিল। এখন জড় দ্রব্য যদি তাহাদের জড়ত্ব হারায়, তাহা হইলে তাহার analogy হইতে কল্পিত etherএই বা জড়ত্ব থাকে কিরূপে? জড় দ্রব্যগুলাই যদি ফাঁকি হয়, তবে etherকে বরং ফাঁকির উপরে ফাঁকি বলাই সঙ্গত। Etherকেই বা একটা নিরেট বস্তু মনে করিবার হেতু কি থাকে?

বস্তুতই এখন বিজ্ঞান-বিদ্যা কতকটা ফাঁপরে পড়িয়াছেন। Inertia বা জড়ত্ব—এই conceptটাকে তাঁহারা ছাড়িতে পারেন না। তাহার একটা নূতন বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—electro-magnetic inertia; জড়ত্ব মাত্রই এখন electro-magnetic—তাড়িত-চৌম্বক-জড়ত্ব। কিন্তু এই জড়ত্ব কোন্ দ্রব্যের জড়ত্ব? যে দ্রব্যে এত কাল জড়ত্ব অর্পণ করা হইতেছিল, তাহা ত ফাঁকিতে দাঁড়াইতেছে। তাহা হইলে জড়ত্ব আরোপ করিব কিসে? শুধু ফাঁকা শূন্য vacuous বস্তুহীন আকাশে জড়ত্ব অর্পণ করা চলে কি না? না করিবার বিশেষ হেতু আছে কি? বৈজ্ঞানিকেরা যে সেরূপ কল্পনা করিতে একেবারে অসমর্থ, তাহা বলিতে পারি না। আপনারা Boscovichএর নাম শুনিয়া থাকিবেন। জ্যামিতি-বিদ্যায় point বা বিন্দু কাহাকে বলে, তাহা আপনারা জানেন। এই বিন্দু পদার্থের কোনরূপ অংশও নাই, পরিমাণও নাই। উহা নিতান্তই একটা বস্তুহীন concept মাত্র। অথচ এই বিন্দুগুলার গতায়াত কল্পনা করা হয়। একটা বিন্দু যে পথে চলে, জ্যামিতি-শাস্ত্রে সে পথের নাম line বা রেখা। এই line বা রেখাও নিতান্ত বস্তুহীন, উহাও একটা concept। জ্যামিতি-বিদ্যা যে সকল পদার্থ লইয়া আলোচনা করে, তাহারা সকলেই concept মাত্র; কাহারও কোন বস্তু নাই, কাহারও কোন জড়ত্বও নাই। জড়ত্ব থাক আর না থাক, জড়ত্বহীন বস্তুহীন point বা বিন্দু জ্যামিতিবেত্তার কল্পনামতে শূন্যপথে স্বচ্ছন্দে ছুটিয়া বেড়াইতে পারে। নতুবা Kinematics বা গতিবিজ্ঞান-বিদ্যা থাকিত না। বস্কোবিচের সময়ে atomএর কথা উঠিয়াছিল। বস্কোবিচ বলিলেন, মনে কর না কেন—এই pointগুলাই atom। উহারাই দূর হইতে পরস্পরকে টানাটানি করে, ঠেলাঠেলি করে; পরস্পরকে না ছুঁইয়াও পরস্পরকে বেগ দেয় এবং পরস্পরের নিকট হইতে বেগ লয়। এই বেগ দিবার ও বেগ লইবার প্রবৃত্তি দেখিয়াই ঐ বিন্দুগুলারই inertia নিরূপণ করিতে পারি। মনে

রাখিবেন, ঐ যে inertia, উহা কেবল একটা সম্পর্ক মাত্র—একটা relation মাত্র। আপেল-ফল পৃথিবীর দিকে দ্রুতবেগে ধায়, পৃথিবী আপেলের দিকে সেরূপ দ্রুতবেগে ধায় না। উভয়ের দ্রুতত্ব তুলনা করিয়াই বলা হয়, আপেলের inertia অল্প, আর পৃথিবীর inertia তাহার তুলনায় অধিক। সেইরূপ দুইটা বস্তুহীন অথচ চলন্ত বিন্দুর পরস্পরের অভিমুখে দ্রুতত্ব তুলনা করিয়া তাহাদেরও inertiaর তুলনা করা না চলিবে কেন? যে বিন্দুটি চলিবে দ্রুত, তাহার জড়ত্ব হইবে অল্প; আর যে চলিবে ধীরে, তাহার inertia হইবে অধিক। এইরূপ জড়ত্বযুক্ত, কিন্তু বস্তুহীন point-কল্পনার দ্বারা Mechanical scienceএর সমস্ত কাজই না চলিবে কেন?

ফল কথা, সমাকার আকাশে বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ চলে না। ঐ আকাশকে কোন-না-কোন রকমে বিষমাকার করিয়া লইতে হইবে। কোন-না-কোনরূপ চিহ্ন নিক্ষেপ করিয়া উহাকে বিষমাকার করিয়া লইতে হইবে। এইটুকুই দরকার। কিন্তু ইহার জন্য আকাশের মধ্যে এই সকল চন্দ্র-সূর্য্যের মত বা অণু-পরমাণুর মত বড় ছোট ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করার নিতান্ত প্রয়োজন কি? এই ইট-পাটকেলগুলা যেন নিতান্তই foreign body। জন্তুদেহে যেমন foreign matter কিছুতেই হজম হয় না, লোহার পেরেকের মত গায়ে বিঁধে, অথবা কুলের আঁঠির মত পেটের পীড়া জন্মায়, এই ইট-পাটকেলগুলাও সেইরূপ আকাশের গায়ে হজম হয় না; তত্ত্ববিদের চোখে নিতান্তই বিস্ফোটকের মত পীড়া জন্মায়। আকাশ জিনিসটাই একটা বিশুদ্ধ Geometrical পদার্থ। উহা খাঁটি জ্যামিতিবিদ্যার প্রতিপাদ্য এবং আলোচ্য। আকাশের যে-কিছু লক্ষণ, তাহা সমস্তই জ্যামিতিক বা geometric লক্ষণ। কেবল এই জ্যামিতিক লক্ষণ-ভেদের দ্বারা আকাশকে বিষমাকারে চিহ্নিত করা চলে না কি? একেবারে গোড়াতেই চাপিয়া ধরুন না। আকাশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট বিন্দু কল্পনা করিয়া, এবং ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে ভিন্ন ভিন্ন জড়ত্ব অর্পণ করিয়া বস্কোবিচ আকাশকে বিষমাকার করিয়া লইয়াছিলেন। এই জড়ত্বযুক্ত বিন্দুগুলির প্রত্যেকের একটু করিয়া এলাকা আছে। এক বিন্দু অন্য বিন্দুকে সেই এলাকামধ্যে আসিতে দেয় না, এইরূপ মনে করিলেই ত impenetrability ও discontinuity, উভয়ই পাওয়া যাইবে। বিজ্ঞান-বিদ্যারও কাজ চলিবে।

অন্যরূপেও আকাশকে বিষমাকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আপনারা Michael Fadayর নাম শুনিয়াছেন নিশ্চয়। এই অদ্ভুত মানুষটির মগজে যে সকল কল্পনা খেলিয়াছিল, তাহাই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া প্রকাশ পাইয়া বিজ্ঞান-বিদ্যারও মূর্ত্তি বদলাইতে চলিয়াছে; নিউটন যে ভিত্তির উপর বিজ্ঞান-বিদ্যাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠায় স্থাপন করিয়াছিলেন, সে ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপাইয়াছে। ফারাডে কারবার করিতেন তাড়িত এবং চুম্বক লইয়া। তাড়িতযুক্ত দ্রব্য পরস্পর দূরে থাকিয়াও টানাটানি ঠেলাঠেলি করে। চুম্বকের কাঁটাও পরস্পর দূরে থাকিয়াও পরস্পরকে টানাটানি ঠেলাঠেলি করে। পরস্পর দূরে থাকিয়া পরস্পরকে ধাক্কা দেয়। ইহা action at a distance। এই action at a distance ফারাডেরও মনঃপূত হয় নাই। তিনিও মাঝে একটা medium খুঁজিতেছিলেন। কোন স্থূল medium তিনি পান নাই বটে, কোনরূপ দড়ি-দড়া খুঁজিয়া পান নাই বটে, কিন্তু তাঁহার মনশ্চক্ষু কতকগুলা শরীরহীন বস্তুহীন conceptual রজ্জুর আবিষ্কার করিয়াছিল। এইগুলির নাম দিয়াছিলেন তিনি lines of force। এই line of forceগুলি দিগ্‌দিগন্তে শূন্য বাহিয়া প্রসারিত হইয়াছে এবং তাহাদেরই চলাচলি টানাটানি এবং ঠেলাঠেলিতে যাবতীয় তাড়িতঘটিত এবং চুম্বকঘটিত ধাক্কাধাক্কি চলিতেছে। এ-কালের বিজ্ঞান-বিদ্যা ফারাডের সৃষ্ট সেই lineগুলিকে বা রেখাগুলিকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। এই lineগুলি আকাশ জুড়িয়া বর্ত্তমান আছে। কেহ কাহারও গায়ে পড়ে না। কেহ কাহাকেও কাটে না। কেহ কাহারও সহিত মিশে না। অথচ পরস্পরকে ঠেলিয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইতেছে এবং চলিতেছে, ছুটিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, কাঁপিতেছে, ঘুরিতেছে। আকাশের মধ্যে এই রেখাগুলি কোথাও বা ঘন-সন্নিবিষ্ট, কোথাও বা বিরল। এই সন্নিবেশভেদেই তাহারা আকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে, সমাকার আকাশকে বিষমাকার করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহাদের গতিশীলতা হইতেই আকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন inertia অর্পণ করিয়াছে। জড় দ্রব্যের যে inertia এবং impenetrability, তাহা এই অশরীরী, বস্তুহীন, রেখাগুলিরই inertia এবং impenetrability। রেখাগুলি পরস্পরকে কাটে না; যেখানে converge করিবার কথা, পরস্পরকে কাটিবার কথা, সেখানেও কাটাকাটি করিতে না পাইয়া হয়ত

কোনরূপে লুপ্ত হইয়া যায় ; এইরূপে সেখানে বিচ্ছেদ বা discontinuity আসিয়া পড়ে। যদি ইলেক্‌ট্রনই আনিতে হয়, সেই স্থানটাই হয়ত ইলেক্‌ট্রন। উহারা পরস্পর মেশে না ; অতএব উহারা impenetrable। পরস্পরকে বেগ দেয় এবং পরস্পর হইতে বেগ লয়। ইহা হইতেই তাহাদের inertia। এই lineগুলির সন্নিবেশবিধি এবং উহাদেরই গতাগতি—এতদ্দ্বারাই জড় জগতের যাবতীয় বিবরণ দেওয়া অসম্ভব নহে। আজকালকার বিজ্ঞান-বিদ্যার যাঁহারা খোঁজ রাখেন, তাঁহারা এ কথা জানেন। আমার পক্ষে এখানে অলং বিস্তরেণ।

বস্কোবিচের point আর ফারাডের line, এই দুইটা দৃষ্টান্ত লইয়াছি। আর একটা দৃষ্টান্ত লইতে চাহি। জ্যামিতিশাস্ত্রের সরল রেখা সোজা পথে চলে। উহার কোথাও কোন বক্রতা নাই, উহা সর্ব্বত্র সমাকার। উহার এক টুকরা অন্য টুকরার গায়ে গায়ে মিশিয়া যায়। আর যাহাকে বক্র রেখা বলা যায়, উহা কুটিল পথে চলে, উহা সর্ব্বত্র সমাকার না হইতেও পারে। উহার বক্রতা সর্ব্বত্র সমান না হইতেও পারে। উহার এক টুকরা অন্য টুকরার সহিত না মিশিতেও পারে। আপনি যদি সরল রেখা ধরিয়া চলিতে চান, কখন্ কত দূরে আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন না ; কেন না, সরল রেখার কোথাও কোন চিহ্ন থাকে না। আর বক্র পথে চলিলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন বক্রতা দেখিয়া, কখন্ কোথায় কত দূরে আসিলেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। খোলা মাঠে, প্রান্তরে,—যেখানে কোন ঘর বাড়ী নাই, গাছপালা নাই, তেমন প্রান্তরে,—রাজপথ যদি সরল রেখায় চলে, তাহা হইলে পথিকের পথ চলিবার জন্য মাঝে মাঝে milestone পোঁতার নিতান্তই দরকার হয়। আর রাজপথ যদি বাঁকিয়া চুরিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলে, তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ পথিক বিনা milestoneএও পথের বক্রতা দেখিয়াই স্থান নির্ণয় করিতে পারে। ইউক্লিডের আগে হইতে নিউটনের পরে পর্য্যন্ত আমাদের আকাশকে সর্ব্বত্র সমাকার বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, আকাশের কোথাও কোন বক্রতা নাই, উহার প্রত্যেক টুকরা সর্ব্বাংশে সর্ব্বতোভাবে অপর টুকরার সমান। এইরূপ সমাকার আকাশকে চিহ্নিত করিবার জন্যই জড় দ্রব্যের milestone সেই আকাশমধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। সেই জড় দ্রব্যের milestone-গুলিকে বাহির হইতে আমদানি করিয়া আকাশমধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

কিন্তু গোড়াতেই যদি আমি আকাশকে সমাকার মনে না করি, গোড়াতেই যদি ধরিয়া লই যে, আকাশের বক্রতা সর্ব্বত্র সমান নহে, তাহাতে ক্ষতি কি? সেই বক্রতা ভেদ দেখিয়া আমরা আকাশকে চিহ্নিত করিয়া লইতে পারি; এবং সেই বক্রতার ভেদকেই যদি জড় দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহাতে বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ আটকায় কি? এইরূপ কল্পনাটা আপনাদের নিকট নিতান্তই আজগুবি বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু যাঁহারা আজকালকার বৈজ্ঞানিকদের hyper-space এবং meta-geometryর খবর রাখেন, তাঁহারা আমার এই উক্তিতে শঙ্কিত হইবেন না। বস্তুতঃ আমাদের আকাশকে সর্ব্বত্র সমাকার মনে করিবার খুবই যে একটা আবশ্যকতা আছে, তাহা নহে। ইউক্লিড যে আকাশের কথা কহিয়াছেন, তাহা সমাকার আকাশ। নিউটন এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীরাও সেই সমাকার আকাশই মানিয়া লইয়াছেন। তাহাতে এত দিন কাজও চলিয়াছে বেশ। বিজ্ঞান-বিদ্যা কাজ চালাইবার বিদ্যা। কাজ চলিতেছে দেখিয়া সর্ব্বসাধারণেই অসঙ্কোচে তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু এই স্বতঃসিদ্ধতায় সন্দেহ করিবার এখন সময় আসিয়াছে। স্থানে স্থানে কাজ আটকাইবার উপক্রম হইয়াছে। আকাশের বক্রতাভেদ মানিয়া লইয়া তেমনই যদি কাজ চলে, অথবা আরও ভাল কাজ চলে, তাহা হইলে বিজ্ঞান-বিদ্যার আপত্তি করিবার কোন হেতু থাকিবে না। আকাশকে সর্ব্বত্র সমাকার মনে না করিয়া উহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বক্রতা অর্পণ করিতে পারা যায়। মনে করা যাইতে পারে, এই বক্রতাও কোথাও স্থির নাই, উহা নিশ্চল নহে। ঐ বক্রতারই গতিবিধি অনুসারে আকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে inertia-ভেদও নির্দ্দেশ করা চলিতে পারে।

ফলে এগুলি দৃষ্টান্ত মাত্র। বস্তুতই বস্কোবিচের pointএর দ্বারা, অথবা ফারাডের lineএর দ্বারা, অথবা নূতন জ্যামিতির বক্রতাভেদের দ্বারা বিজ্ঞান-বিদ্যার যাবতীয় কাজ, বাহ্য জগতের যাবতীয় বিবরণ,—অতীত ও ভবিষ্যৎ যাবতীয় ঘটনার গণনা চলিবে কি না, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার বিচার করিবেন। বস্তুতঃ তাহার বিচার চলিতেছে। আমি কেবল আপনাদিগকে জানাইতে চাহি যে, জড় জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের মন যে প্রশ্ন করে, তাহার কেবল একটা মাত্র উত্তর মিলিবে, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। প্রশ্নটা এক বটে, কিন্তু উত্তর তাহার নানাবিধ হইতে

পারে। গোড়া হইতেই বলিয়া আসিতেছি, বৈজ্ঞানিকের এই যে জড় জগৎ, ইহা বাঙ্ময় জগৎ—কতকগুলি conceptএ নির্ম্মিত জগৎ। এই conceptগুলি বৈজ্ঞানিকদের মন-গড়া জিনিস। পাঁচ জনে পাঁচ রকম concept সৃষ্টি করিয়া একই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। উহার মধ্যে এটা সত্য, এটা অসত্য, ইহা বলিবার উপায় নাই। যেটায় যেমন কাজ চলিবে, যেটায় ব্যবহার চালাইবার যেমন সুবিধা হইবে, সেটা তত দূর গ্রাহ্য হইবে, এই পর্য্যন্ত। এ সমস্ত সত্যই ব্যাবহারিক সত্য—কাজ-চালান সত্য। আকাশ জিনিসটা geometrical পদার্থ। উহার geometrical properties ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়া যদি বাহ্য জগতের সমুদয় বিররণ দেওয়া চলে, সমাকার আকাশের পরিবর্ত্তে বিষমাকার আকাশ কল্পনায় যদি বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ চলে, তাহা হইলে বাহির হইতে ইট-পাটকেল দ্বারা আকাশকে চিহ্নিত করিয়া বদ্হজমের উৎপাদন নিতান্ত আবশ্যক না হইতেও পারে।

আপনারা হয়ত বলিবেন, আকাশ সমাকারই হউক, আর বিষমাকারই হউক, উহা ত নিতান্ত unsubstantial, বস্তুহীন পদার্থ। কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্যা যে জড় জগতের আলোচনা করে, উহা ত অত্যন্ত substantial জিনিস; উহার ভিতরে একটা বস্তু আছে—একটা substance আছে। কোনরূপ substance-বর্জ্জিত শূন্য আকাশের জ্যামিতিক ধর্ম্ম দ্বারা—geometrical properties দ্বারা এমন substantial বাস্তবিক জড় জগতের ব্যাখ্যা কখনই চলিতে পারে না।

প্রশ্ন হয়, এই যে substance, এই যে বস্তুসত্তা, ইহা ত নিতান্ত প্রত্যক্ষ পদার্থ। উহাকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া, একেবারে unsubstantial ও conceptual ও geometrical আকাশ দিয়া বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ কিরূপে চলিবে? আকাশ স্বভাবতঃ সমাকারই হউক, আর বিষমাকারই হউক, উহা জ্যামিতি-শাস্ত্রেরই আলোচ্য। উহার আলোচনা চলিতে পারে, কিন্তু উহার সহিত কারবার চলিতে পারে না। জড় জগৎ আমাদের কারবারের জগৎ। উহাকে বস্তুহীন মনে করিলে চলিবে কেন? মনে আছে, পঠদ্দশায় এক দিন Science Associationএ ফাদার লাফোঁর লেক্চর শুনিতে গিয়াছিলাম। যে হতভাগ্যেরা জড় জগতের substance বা বস্তুসত্তা স্বীকার করে না, তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ফাদার

হাসিতে হাসিতে সবলে সম্মুখের টেবিল চাপড়াইলেন এবং বলিলেন, জড় দ্রব্যে বস্তু আছে কি না, এই প্রশ্নের আমার এই উত্তর। আমি এ পর্য্যন্ত জড় পদার্থের বস্তুহীনতা সম্বন্ধে যে সকল ছেঁদো কথা তুলিলাম, আপনারাও হয়ত এক চপেটাঘাতে তাহার উত্তর দিয়া আমাকে নিরুত্তর করিবেন।

আসুন, আমি চপেটাঘাতের জন্য প্রস্তুত আছি। আপনার চপেটাঘাতে আমি যখন ব্যথা পাইয়াছি, এবং আপনার হাতেও কিঞ্চিৎ ব্যথা হইয়াছে, তখন ঐ ব্যথাটাকে আমি অস্বীকার করিতে পারি না। ব্যথাটুকু স্বীকার করিবই; কিন্তু তাহার অতিরিক্ত কিছু স্বীকার করিব না। এই ব্যথাটুকু নিতান্তই সত্য প্রত্যক্ষ পদার্থ। জড় জগতের সহিত কারবার করিতে গিয়া আমরা পদে পদে ঐরূপ চপেটাঘাতের ব্যথা সহিতেছি। পদে পদে আমরা প্রতিহত হইতেছি এবং তদনুসারে ক্লেশ পাইতেছি, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। এই যে ব্যথা, ইহার নাম resistance। সমস্ত জড় জগৎ আমাদের নিকট একটা প্রকাণ্ড resisting somethingরূপে অনুভূত হয়। এই resistance নানা মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের প্রত্যক্ষ-সীমায় আইসে। উঠিতে, বসিতে, নড়িতে, নড়াইতে, বিচরণে, ভ্রমণে, ভারবহনে—সর্ব্বত্র আমরা আঘাতের ও প্রতিঘাতের বেদনা পাই। আমাদের দেহভার বহন করাই একটা বেদনা। জড় জগতের সহিত কারবারে প্রতি পদে আমরা আছাড় খাইতেছি ও মাথা ঠুকিতেছি এবং তদনুসারে বেদনা অনুভব করিতেছি। এই বেদনা একটা অনুভূতি। এই অনুভূতির নানা মূর্ত্তি। এই বেদনাই resistance এবং এই resistanceএর অনুভূতি হইতেই জড় জগতে আমরা substance আরোপ করি। যেখান হইতে আমরা যেমন resistance পাই, সেখানটাকে তেমন substantial মনে করি। 'যত' না বলিয়া আমি 'যেমন' বলিলাম; কেন না, এই resistance একটা অনুভূতি বা feeling-; উহার মাত্রা নির্দ্দেশ হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা যে resistance যন্ত্র দ্বারা মাপেন, তাহা feeling নহে, তাহা একটা পরিমাণযোগ্য conceptual term। ঐ resistanceএর অনুভূতি অনুসারে আমরা কঠিন, তরল, দৃঢ়, কোমল, কর্কশ, বন্ধুর, গুরু, লঘু ইত্যাদি নানা বিশেষণে জড় দ্রব্যকে বিশেষিত করি। আমরা মনে করি, এই বেদনার অনুভূতি বাহ্য জগৎ হইতেই আসে, এবং তদনুসারে আমরা বাহ্য জগৎকে substantial জগৎ ঠিক করিয়া লই। রূপ-রস-

গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদির ন্যায় এই বেদনাও একটা প্রত্যক্ষ অনুভূতি ; ইহা কিন্তু রূপ-রস-গন্ধ হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের অনুভূতি। রূপ-রসাদির জন্য যেমন চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় আছে, এই বেদনানুভূতির জন্য তদ্রূপ স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় আবশ্যক হয়। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ে কুলায় না দেখিয়া আর একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুঁজিতে হয়। দেহের মাংসপেশীর, এবং তৎসম্পৃক্ত স্নায়ুযন্ত্রের সহিত হয়ত এই resistance অনুভূতির বিশিষ্ট সম্পর্ক আছে। তজ্জন্য ইহাকে muscular sensation বলা হয়! হইতে পারে, tactile sense বা স্পর্শেন্দ্রিয় হইতে এই muscular sense সম্পূর্ণ পৃথক্। খাঁটি স্পর্শেন্দ্রিয় হয়ত কেবল শীতোষ্ণতারই খবর আনে, কোনরূপ resistanceএর কোন খবর দেয় না। ইহা শরীর-বিজ্ঞানের বা physiologyর আলোচ্য। ইহা লইয়া এখানে আমার মাথা ব্যথার দরকার নাই। ইন্দ্রিয় যাহাই হউক, এই অনুভূতিটা একটা সত্য প্রত্যক্ষ পদার্থ। এই অনুভূতির সহিত জড় দ্রব্যে বস্তু কল্পনার অতি নিকট সম্পর্ক। আমাদের এমনই সংস্কার ও অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে যে, জড় দ্রব্যকে আমরা বরং রূপহীন, রসহীন, গন্ধহীন, স্পর্শহীন, শব্দহীন মনে করিতে পারি ; কিন্তু উহাকে বস্তুহীন অথবা resistanceহীন, এরূপ মনে করিতেই পারি না। রূপ-রস-গন্ধাদি সমস্ত বর্জ্জন করিয়াও জড় দ্রব্যের এই resisting power, এই ব্যথা দিবার শক্তি অবশিষ্ট থাকে। এটুকু গেলে আর যেন কিছুই থাকে না। এই জন্য মনোবিজ্ঞানের কোন কোন পুথি খুলিলেই দেখিতে পাইবেন, জড় দ্রব্যের মুখ্য লক্ষণ extension এবং resistance। জড় দ্রব্য প্রথমতঃ আকাশ জুড়িয়া আছে ; দ্বিতীয়তঃ উহা বাধা দেয় বা বেদনা দেয়। অতএব resistance উহার অন্যতর মুখ্য লক্ষণ। মনোবিজ্ঞান জোর করিয়া এইরূপ বলিতে পারেন। মনোবিজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রাতিভাসিক পদার্থ লইয়া আলোচনা করেন। সুতরাং মনোবিজ্ঞানের নিকট ঐ প্রত্যক্ষ বেদনানুভূতি ব্যাবহারিক বাহ্য জগতে নিক্ষিপ্ত হইয়া জড় দ্রব্যরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু Physical scienceএর ব্যবসায় অন্যরূপ। Physical science প্রত্যক্ষ অনুভূতি লইয়া কারবার করেন না। প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে বর্জ্জন করাই তাঁহার ব্যবসায়। এই যে resistance, ব্যথা বা বেদনা, ইহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন। উহার মধ্যে কতটুকু সর্ব্বসাধারণের, তাহা নিরূপণের কোন উপায় না দেখিয়া, বিজ্ঞান-বিদ্যা এই sensationকে

বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির স্থলে সাধারণ জড় দ্রব্য পক্ষে মন-গড়া inertia এবং impenetrability বসাইয়াছেন এবং কাঠিন্য তারল্য প্রভৃতি বিশিষ্ট জড়-ধর্ম্মের পক্ষে নানাবিধ conceptual kinetic বিবরণ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। বৈজ্ঞানিকের নিকট সাধারণ জড় দ্রব্য inertia মাত্র এবং impenetrability মাত্র। উহা পূরাপূরি conceptual জিনিস। উহা একেবারেই অনুভূতির সীমায় আসে না। উহা বাঙ্ময় জগতের নাম-লোকের জিনিস। আর প্রত্যক্ষ resistance, উহা প্রত্যক্ষ রূপ-লোকের জিনিস। বিজ্ঞান-বিদ্যাকে এই প্রত্যক্ষ resistanceকে বর্জ্জন করিতেই হইবে—নিঃসঙ্কোচে বর্জ্জন করিতে হইবে। বিজ্ঞান-বিদ্যা যে জগতের আলোচনা করেন, উহাতে যেমন রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই; আছে কেবল ছুটাছুটি;—সেইরূপ উহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভূত resistanceএরও কোন স্থান নাই। উহাতে আছে কেবল inertia অর্থাৎ ছুটাছুটিতে প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি; আর impenetrability অর্থাৎ মিশিয়া যাইবার অক্ষমতা। আপনারা ভূতে-পাওয়া কাহাকে বলে, জানেন। আমাদের থিয়সফিষ্ট বন্ধুদের প্রত্যক্ষ জগতে ভূত যতই সত্য পদার্থ হউক, আমাদের মত মাঝারি মানুষের ব্যাবহারিক জগতে ভূত নামাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। ভূত নামাইতে গেলে উহা কেবল বিভীষিকা দেখায়, অথচ উহাকে চাপিয়া ধরিতে পারা যায় না। চাপিয়া ধরিতে গেলে, উহা ছায়ার মত এড়াইয়া যায়। উহা কিছুতেই বশ হয় না। এক লোকের জিনিসকে অন্য লোকে আনিতে গেলেই এইরূপ বিড়ম্বনা ঘটে। যাহার স্থান প্রত্যক্ষ প্রাতিভাসিক রূপ-লোকে, তাহাকে কাল্পনিক বাঙ্ময় নাম-লোকে আনিতে গেলেও সেইরূপ বিড়ম্বনা ঘটিবে। ঘটিয়াছেও তাহাই। জড় জগতের যে resistance, উহা অনুভূতি মাত্র, অতএব প্রাতিভাসিক জগতের—প্রত্যক্ষ জগতের অন্তর্গত সত্য বস্তু। বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচ্য বাঙ্ময় জড় জগতে আনিতে গেলে উহা কেবল বিভীষিকা জন্মাইবে মাত্র। উহাকে বৈজ্ঞানিকের Reasonএর এলাকায় ধরিয়া রাখিতে পারা যাইবে না। বৈজ্ঞানিকের ব্রহ্মাস্ত্র logic। সেই ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ করিয়া উহাকে বশে রাখা চলিবে না। জড় জগতে যে substance বা বস্তুসত্তার আরোপ করা যায়, উহা তাহার resistanceএরই ছায়া মাত্র—resistanceএর ভূত মাত্র। সেই Substance মনোবিজ্ঞানের

নিকট যতই সত্য পদার্থ হউক, জড় বিজ্ঞানের নিকট—Physical scienceএর এলাকায় তাহার ভূত নামাইবার কোনই প্রয়োজন নাই।

এই উপলক্ষে আর একটা দৃষ্টান্ত দিব। দৃষ্টান্তটা বাল্যকালে আচার্য্য ক্লিফোর্ডের নিকট পাইয়াছিলাম এবং তদবধি আমার মনের মধ্যে কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে। এখন উহা আমার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সরল রেখা ও বক্র রেখার কথা আগে বলিয়াছি। সরল রেখা সর্ব্বত্র সমাকার, উহার কোথাও কোন চিহ্ন নাই। বক্র রেখা বিষমাকার, উহার বক্রতা সর্ব্বত্র সমান না হইতেও পারে। ইউক্লিড যে সরল রেখা এবং বক্র রেখার কথা বলেন, সেই সরল রেখা ও বক্র রেখার কথা বলিতেছি। উহাদের কোনরূপ বস্তু বা substance আছে, এরূপ কেহ বলিবেন না। তার পর মনে করুন, একটি ক্ষুদ্র জন্তু। ছোট্ট এক টুকরা সরল রেখায় এই জন্তুর দেহটি নির্ম্মিত। মনে করুন, জন্তুটি বুদ্ধিজীবী। উহার দেহে কোন বস্তু নাই বটে, কিন্তু উহার অনুভবক্ষমতা আছে, ইচ্ছাক্ষমতা আছে; ইচ্ছামত দেহটিকে সে বাঁকাইতে পারে এবং তজ্জন্য প্রয়াস—effort অনুভব করিতে পারে। এই জন্তুটি যখন সরল রেখা ধরিয়া চলিবে, তখন তাহার দেহ বাঁকাইবার কোন প্রয়োজন হইবে না; সরল পথে চলিতে কোথাও কোন প্রয়াস বোধ হইবে না, কোথাও কোন বাধা বা resistance অনুভব করিবে না। কিন্তু তাহাকে যদি বক্র রেখা ধরিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে তাহার পথের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বক্রতাভেদে ভিন্ন-ভিন্নরূপ প্রয়াস-বোধ, ভিন্ন-ভিন্নরূপ resistanceবোধ নিশ্চয় জন্মিবে। ঐ বক্র রেখাটি তাহার বাহ্য জগৎ। সেই বাহ্য জগতে সে বিচরণ করে এবং তাহাতে চলিতে ফিরিতে বাধা অনুভব করে। ঐ রেখাকৃতি জগৎ আমাদের নিকট কেবল রেখা মাত্র,—বস্তুহীন রেখা মাত্র। কিন্তু সে যখন ঐ জগতে চলিতে ফিরিতে পদে পদে বাধা অনুভব করে, তখন সেই জগৎকে বস্তুময় ভাবে দেখা তাহার পক্ষে অসঙ্গত হইবে না। আমাদের অবস্থাও কতকটা সেই জন্তুর মত নয় কি? আমরা আমাদের বাহ্য জগতে বিচরণ করি। এই বিচরণ ব্যাপারটা কেবল বাধা এবং বিরোধের অনুভূতি মাত্র। এই অনুভব-ক্ষমতাটুকু না থাকিলে বাহ্য জগতে বস্তু-কল্পনার অবসর কোথায় থাকিত? বাহ্য জগতে যে বস্তু-কল্পনা, তাহা সেই বিরোধ-অনুভূতিরই নামান্তর মাত্র। এই বিরোধানুভব প্রত্যক্ষ ঘটনা, অতএব সত্য পদার্থ। সেই সত্য ঘটনাকে যদি নিতান্তই conceptual

ভাষায় ব্যক্ত করিতে হয়, তবে তজ্জন্য কোন substanceএর ভূত নামান নিতান্তই অনাবশ্যক। আকাশকে কেবল মাত্র তাহার geometrical properties দিয়া ইহার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া না চলিবে কেন ?

এই আকাশ পদার্থকে আর একটুকু চাপিয়া ধরিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এই আকাশে আমরা বিচরণ করি এবং পদে পদে বাধা পাই। বিচরণ কর্ম্মটাই একটা বিরোধের অনুভূতি। এই যে বাধা আর বিরোধ, তাহা সর্ব্বত্র সমান নহে। উপরে যে জন্তুটির উল্লেখ করিয়াছি, সে যে রেখাপথে বিচরণ করে, সে রেখাপথের dimension একটা মাত্র। সে রেখাপথের দৈর্ঘ্য আছে; কিন্তু বিস্তার নাই বা স্থূলত্ব নাই। আর আমরা যে দেশে বা আকাশে বিচরণ করি, উহার তিনটা dimension। এই তিনটা dimensionএর মানে কি ? উহার মানে এই—অধঃ হইতে ঊর্দ্ধে, বামে হইতে ডাহিনে এবং পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে কিছু দূর চলিয়া, আমরা আকাশের এক স্থান হইতে অন্য যে-কোন স্থানে যাইতে পারি। এই তিন দিকে বিচরণেই প্রয়াস বোধ হয়, কিন্তু সে প্রয়াস একজাতীয় নহে। এ-ঘর হইতে ও-ঘর যাওয়ার প্রয়াস, আর নীচের তলা হইতে উপর তলা যাওয়ার প্রয়াস যে একজাতীয় প্রয়াস নহে, তাহা আপনাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না; বিশেষতঃ আমাদের কলেজের চৌতলার সিঁড়ি ভাঙ্গিতে আপনারা যখন অভ্যস্ত। বামে হইতে ডাহিনে চলার প্রয়াস আর পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে চলার প্রয়াসও যে একজাতীয় প্রয়াস নহে, তাহাও আপনারা জানেন; বিশেষতঃ ঝড়ের সময়। এই তিন প্রকার প্রয়াসের সমষ্টি হইতে আমাদের দেশ-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়; এবং মূলে তাহা হইতেই শেষ পর্য্যন্ত আকাশের তিন dimension ধরিয়া লইয়াছি। আমরা যাহাকে দেশ বলি বা আকাশ বলি, প্রত্যক্ষতঃ তাহা এই তিনজাতীয় প্রয়াসের সমষ্টি-বুদ্ধি মাত্র। এই তিনজাতীয় অনুভূতি লইয়া আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ আকাশকে গড়িয়া লইয়াছি। প্রত্যক্ষ আকাশ বলিতেছি, তাহার একটু মানে আছে। এই প্রত্যক্ষ আকাশই আমাদের real আকাশ, আমাদের perceptual আকাশ। ইহা বিজ্ঞান-বিদ্যার আকাশ নহে। এই প্রত্যক্ষ আকাশ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। ইহাকে কিছুতেই অসীম বলা যাইতে পারে না। যে প্রদেশটুকুর মধ্যে আমরা বিচরণ করি, এবং বিচরণ করিতে করিতে পদে পদে বাধা পাই, কখনও দেওয়ালে মাথা ঠুকি, কখনও পা পিছলিয়া আহত হই, কখনও

ট্রামগাড়ী চাপা পড়ি, সেই সঙ্কীর্ণ প্রদেশমধ্যে এই আকাশ নিবদ্ধ। যেখানে আমাদের প্রত্যক্ষের সীমা, এই আকাশেরও সীমা সেইখানে। যত বয়স বাড়িয়াছে, ততই ইহার সীমা বাড়িয়া গিয়াছে এবং ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ-সীমার বাহিরে বৃহত্তর আকাশ আছে কি না, প্রত্যক্ষ তাহা বলে না। আমরা বয়স্ক মানুষ ঐ বৃহত্তর আকাশ কল্পনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি বটে, কিন্তু সূতিকাগারের শিশু তাহা করে না। শিশুর হাতের খেলেনা পড়িয়া অদৃশ্য হইলে উহা তাহার পক্ষে লুপ্তই হয়। কতকগুলা প্রত্যক্ষ অনুভূতি, actual sensations লইয়া এই সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ আকাশ আমরা গড়িয়া লইয়াছি। এ সমুদয় sensationই muscular sensation। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শাদি এ বিষয়ে কোন সাহায্য করে না বলিলেই হয়। মুখ্যভাবে ত করে না, তবে গৌণভাবে করিতে পারে। আপনারা হয়ত চমকিয়া উঠিবেন ; বলিবেন, সে কি ? দর্শনেন্দ্রিয় যে চোখ, তাহাতে কি আমাদের দেশবুদ্ধি জন্মে না ? চমকাইবেন না। খাঁটি দর্শনেন্দ্রিয় যে রূপের জ্ঞান দেয়, সে কেবল বর্ণজ্ঞান—শুক্ল, কৃষ্ণ, নীল পীতাদি বর্ণজ্ঞান। এই বর্ণজ্ঞানে দেশবুদ্ধি জন্মায় না। আমাদের চোখ দুইটা যদি কোটরের মধ্যে ঘুরিতে ফিরিতে না পারিত, চোখ দুইটা লইয়া মাথা যদি ঘাড়ের উপর ঘুরিতে ফিরিতে না পারিত, এবং মাথা সমেত সমস্ত দেহটা যদি এখানে ওখানে চলিতে না পারিত, এবং এই ঘোরাফেরা বিচরণকর্ম্মে যদি muscular effort না হইত, তাহা হইলে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় আমাদের দেশবুদ্ধিতে কোন আনুকূল্যই করিত না। ফলে এই যে দেশবুদ্ধি, তাহার পৌনে ষোল আনাই—হয়ত ষোল আনাই muscular effortএর বুদ্ধি ; এবং এই muscular effortএর অনুভূতি যে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রমধ্যে আবদ্ধ, সেইটুকুই আমাদের real space, perceptual space—প্রত্যক্ষ আকাশ। চাক্ষুষ অনুভূতি এই প্রত্যক্ষ আকাশকে স্পষ্টতর করিতে পারে, কিন্তু তাহা গৌণভাবে। এই প্রত্যক্ষ আকাশ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ এবং অত্যন্ত বিষমাকার : উহার সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ ভিন্নরূপ, ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ ভিন্নরূপ, দক্ষিণ হইতে বামদেশ ভিন্নরূপ। বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ-সীমা সরিয়া যাইতেছে এবং এই প্রত্যক্ষ আকাশের সীমা আমরা বাড়াইয়া লইতেছি। আমি এক মাত্র চেতন জীব নহি। আপনারাও মদ্বিধ চেতন জীব। আমারও যেমন সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, বিষমাকৃতি, প্রত্যক্ষ

আকাশ আছে, আপনাদেরও প্রত্যেকের সেইরূপ সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ একটা-না-একটা প্রত্যক্ষ আকাশ আছে। আমার আকাশ হইতে আপনার আকাশ অনেকাংশে পৃথক্। উভয়ের সীমানা এক নহে। স্থানে স্থানে overlap করে মাত্র। এই রিপণ-কলেজচিহ্নিত আকাশটুকু উভয়ের পক্ষে সাধারণ, কিন্তু তৎপর তাহার বাহিরে গিয়া উভয়ের মধ্যে প্রভেদ। আপনার প্রত্যক্ষ সমগ্র আকাশের আপনি যে বিবরণ দিবেন, আমার প্রত্যক্ষ সমগ্র আকাশের আমি সে বিবরণ দিব না। উভয়ের বিবরণ কিয়দংশে মিলিবে, সকল অংশে মিলিবে না। কিয়দংশে মেলে; এবং যে অংশে মেলে, সেই অংশমধ্যে উভয়ের নিঃসঙ্কোচে কারবার চলে। কারবারে ঠকিতে হয় না। বাহিরের অংশের বিবরণ ঠিক মিলিবে কি না, আমি তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তবে দেখিতে পাই, অনেক সময় মিলিয়া থাকে। আমি কাশী যাই নাই; কাশী-চিহ্নিত আকাশ, উহা আমার প্রত্যক্ষ আকাশের অন্তর্গত ছিল না। আপনার প্রত্যক্ষ আকাশের অন্তর্গত ছিল। আপনার মুখে তাহার বিবরণ পাইয়াছিলাম। কাশী প্রাপ্তির পর কাশী যখন আমার প্রত্যক্ষ-সীমায় আসিল, তখন দেখিলাম, আপনার বিবরণের সহিত আমার প্রত্যক্ষের মিল আছে। গোড়ায় ইহা মানিয়া লইলেও আমাকে ঠকিতে হইত না। আমি বিলাত যাই নাই; এ বয়সে যাইবার সম্ভাবনাও নাই। আপনি বিলাতের যে বিবরণ দেন, তাহাও আমি মানিয়া লই। মনে করি, যদি কখন যাই, আপনার দত্ত বিবরণ অনুযায়ী বিলাত প্রত্যক্ষ করিব। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কথা বলিতেছি না, muscular effortএর দ্বারা প্রত্যক্ষের কথা বলিতেছি। আপনি আপনার muscular effort অনুসারে বিলাতকে যেখানে রাখিয়াছেন, আমিও আমার muscular effort অনুসারে বিলাতকে সেইখানে ফেলিব। বিলাত যাত্রার অনুভূতি আপনার পক্ষে actual sensation, আমার পক্ষে possible sensation। এই possible sensationগুলিতেও বিশ্বাস করিয়া আমি জীবনযাত্রা চালাই। মোটের উপর আমাকে ঠকিতে হয় না। যে সঙ্কীর্ণ আকাশটুকু আমার প্রত্যক্ষ, তাহা আমার actual অনুভূতিতে নির্ম্মিত। তাহাকে ঘেরিয়া তাহার বহির্দ্দেশে আর খানিকটা আমার প্রত্যক্ষ; বহির্ভূত, অস্পষ্ট আকাশ আমি রাখিয়া দিয়াছি, যাহা possible অনুভূতির সমষ্টি। এক্ষণে উহা possible, কিন্তু কালে উহা actual

হইতে পারে, ইহা আমি বিশ্বাস করি এবং এই বিশ্বাসেই জীবনযাত্রা চালাইতেছি। তাহাতে মোটামুটি আমাকে ঠকিতে হয় নাই। এইরূপেই আমরা কলম্বস ও মঙ্গোপার্ক, ষ্টানলী ও নান্‌সেন প্রভৃতি ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত হইতে পৃথিবীর বৃত্তান্ত খাড়া করিয়াছি। ভ্রমণকারীর muscular effort হইতে ভূগোলের কোন্ স্থান কত দূরে আছে, তাহা শেষ পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে। শুধু ভূগোলবৃত্তান্ত কেন, চন্দ্র-সূর্য্য-তারা-মণ্ডিত খগোলের বৃত্তান্তও আমরা এইরূপ ভ্রমণকারীর muscular effort হইতেই খাড়া করিয়াছি। চমকাইবেন না। চন্দ্র সূর্য্যে ভ্রমণ জন্য কোন ব্যোমযান আজিও তৈয়ার হয় নাই। কিন্তু পৃথিবীতে ভ্রমণকালেই আমরা ঐ সকল খেচর দ্রব্যের দূরত্ব নির্দ্দেশ, স্থান নির্দ্দেশ করি। পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া যদি ঐ সকল খগোলবিহারী দ্রব্যের কোন parallax না পাইতাম, তাহা হইলে উহারা খগোল হইতে নামিয়া আসিয়া আমাদের বুকের উপর চাপিয়া পড়িত; উহাদিগকে দূরে স্বস্থানে রাখিতে পারিতাম না,—ইহা জ্যোতিষ-বিদ্যার ব্যবসায়ীরা জানেন। এই ভূগোল-চিহ্নে বা খগোল-চিহ্নে চিহ্নিত আকাশের কিয়দংশ মাত্র আমার প্রত্যক্ষ। উহা অতি সঙ্কীর্ণ, অথচ অনেকটা স্পষ্ট। এই সঙ্কীর্ণ অংশের বাহিরে খানিকটা কল্পিত অংশ আছে, তাহা এখনও প্রত্যক্ষ হয় নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ হইলে কেমন দেখাইবে, তাহার একটা অস্পষ্ট ছবি আমার মনে আছে। এইরূপে আমার প্রত্যক্ষ আকাশে খানিকটা কল্পিত আকাশ যোগ করিয়া আমি আমার সমগ্র আকাশ তৈয়ার করিয়া লইয়াছি। সেই আকাশের একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট সীমা আছে। তবে সেই সীমারেখা ক্রমেই সরিয়া যাইতেছে—ক্রমেই পরিসর পাইতেছে। স্থায়ী সীমারেখা আমি টানিতে পারি না। আজ যেখানে টানি, কাল সেখান হইতে সরিয়া যায়। মন ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া আসে, সীমা টানিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। শেষে পণ ধরিয়া বসি, আর আমি উহার সীমা টানিব না। মনে করিয়া লইব—উহার সীমা নাই। বস্তুতঃ এই আকাশ সর্ব্বদাই সীমাবদ্ধ। উহাকে যে অসীম মনে করি, উহাতে আমার মনের ক্লান্তিরই পরিচয় হয়। যে আকাশকে অসীম বলি, যাহার অসীমত্বের মহিমা কীর্ত্তনে আমরা বাগ্মিতার ফোয়ারা ছুটাই, উহার প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব কোথাও নাই। আমার কাছেও নাই, আপনাদের কাছেও নাই। উহার পৌনে ষোল আনাই আমার মন-গড়া। এই অসীম আকাশ আমার সৃষ্ট।

এই সৃষ্টিকর্ম্মে আমার ক্ষমতার পরিচয় আছে ; আমি বলি যে, অক্ষমতার পরিচয় আছে। আমার প্রত্যক্ষের উপর আপনাদের প্রত্যক্ষ চাপাইয়া, পৃথিবীর দেড় শত কোটি লোকের প্রত্যক্ষ সমষ্টীকৃত করিয়া, এবং এই সমষ্টির উপরে যাহা কাহারও প্রত্যক্ষ হয় নাই বা হইবে না, সেই অত্যন্ত অস্পষ্ট অন্ধকার দেশ চড়াইয়া আমরা আমাদের এই আকাশ নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছি ; এবং নির্ম্মাণকার্য্যে মন যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া উহাকে অসীম বলিয়া দিয়াছি, এবং তৎপরে এই অসীম আকাশকে বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচনার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি। বিজ্ঞান-বিদ্যা এই অসীম আকাশের আলোচনা করিতেছেন, আর কবি তাহার মাহাত্ম্য গান করিতেছেন। এই অসীম আকাশের কিয়দংশ আমাদের প্রত্যক্ষ, ঐটুকু স্পষ্ট, আর বহু অংশ অস্পষ্ট বা একেবারে অন্ধকার। এই অসীম আকাশ একটা কাল্পনিক পদার্থ, একটা মন-গড়া পদার্থ, একটা conceptual পদার্থ, উহা প্রত্যক্ষের বহির্ভূত। বিজ্ঞান-বিদ্যা উহার আলোচনা করেন। বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচনার জন্য আমরা উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি। কেন না, বিজ্ঞান-বিদ্যা প্রত্যক্ষ লইয়া কারবার করেন না। তাঁহার আলোচনা conceptual পদার্থের সহিত।

যে সঙ্কীর্ণ আকাশ আমাদের প্রত্যক্ষ, অতএব সেই অর্থে সত্য পদার্থ, তাহাকে কখনই সমাকার, homogeneous আকাশ বলা চলিবে না। উহার ডান দিক্ বাম দিকের সমান নহে, ঊর্দ্ধ অধের সমান নহে, সম্মুখ পশ্চাতের সমান নহে। এক এক দিক্ এক এক মত। এক এক দিকে বিচরণে প্রয়াস-বোধ যখন ভিন্নরূপ, তখন এই আকাশের ভিন্ন ভিন্ন দিক্ ভিন্ন-ভিন্নরূপ বলিতেই হইবে। যে-কোন একটা দিক্ পছন্দ করিয়া একমুখে চলিতে গেলেও যখন অনুভূতি স্থানে স্থানে ভিন্ন-ভিন্নরূপ হয়, কোথাও কাঠিন্য, কোথাও তারল্য অনুভূত হয়, কোথাও বা কাঠিন্য-তারল্য পর্য্যন্ত অনুভূত হয় না, তখন উহাকে বিষমাকার বলিতেই হইবে। প্রত্যক্ষের ভাষায় এই অনুভূতি সর্ব্বত্রই প্রয়াসের অনুভূতি, বাধার অনুভূতি, বিরোধের অনুভূতি। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি মুখ্যতঃ এ বিষয়ে কোন সাহায্য করে না। তবে ঐ প্রয়াস-অনুভূতির সহিত associationএর দ্বারা গৌণতঃ সাহায্য করে বটে। আমরা মাঝারি মানুষ, প্রত্যক্ষ লইয়া কারবার করি ; প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভাষা ব্যবহার করিতে চাই। আমরা এই অনুভূতিকে

বলি বাধা, বিরোধ, প্রয়াস, resistance। ইহাকে যদি substancne বলিতে হয়, বল—ক্ষতি নাই। Substance কথাটির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিলে, ঐ প্রয়াসের অনুভূতির বা বিরোধের অনুভূতির অতিরিক্ত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বিজ্ঞান-বিদ্যা কিন্তু মাঝারি মানুষের ভাষা যথাসাধ্য বর্জ্জন করিবেন। তিনি সাবধানে প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে বর্জ্জন করিয়া চলিবেন। কেন চলিবেন, তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। তাঁহাকে conceptual language ব্যবহার কবিতে হইবে। নিতান্তই তিনি যদি বলেন—এখানে কঠিন দ্রব্য, ওখানে তরল দ্রব্য, এখানে কোমল দ্রব্য, ওখানে বন্ধুর দ্রব্য; তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে—সর্ব্বসাধারণে কঠিন, তরল, কোমল, বন্ধুর বলিতে যাহা বুঝে, বিজ্ঞান-বিদ্যা তাহা বুঝে না। সর্ব্বসাধারণের নিকট ঐ সকল বিশেষণ এক-একটা অনুভূতির নাম মাত্র; কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্যায় উহাদের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। কি অর্থ, তাহা বিজ্ঞানের পুথিতে পাইবেন। অথবা তিনি বলিতে পারেন—অণু, পরমাণু, electron; কিন্তু তাঁহার নিকট অণু, পরমাণু, electron কেবল কতকগুলি concept মাত্র, নাম মাত্র, সংজ্ঞা মাত্র। উহার কোনটার ভিতরে কোন বস্তু নাই। উহার কোনটা কাহাকেও কোনরূপে ক্লেশ দেয় না। বাধা অনুভবের জন্য কোন চেতন জীব জগতে বিদ্যমান না থাকিলেও, ঐ সকল বস্তুহীন অণু পরমাণু ইলেক্‌ট্রন বিজ্ঞান-বিদ্যার কল্পনায় বর্ত্তমান থাকিত। তাহাদের বর্ণহীন, স্বাদহীন, শব্দহীন, গন্ধহীন, স্পর্শহীন এবং বস্তুহীন কাল্পনিক অস্তিত্ব লইয়া কাল্পনিক আকাশ জুড়িয়া থাকিত। যে কাল্পনিক আকাশে বৈজ্ঞানিক ঐ সকল বস্তুহীন দ্রব্য ছড়াইয়া ও ছুটাইয়া দিয়াছেন, উহা প্রত্যক্ষ আকাশ নহে; উহা কাল্পনিক, বাঙ্ময়, conceptual আকাশ। প্রত্যক্ষ আকাশ সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ, বিষমাকৃতি; অনুভূতিভেদে উহার বৈষম্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের আকাশ conceptual, কাল্পনিক;—বৈজ্ঞানিক যথেচ্ছ ভাবে উহার কল্পনা করিতে পারেন; যাহাতে তাঁহার কাজ চলে, যাহাতে তাঁহার গণনার সুবিধা হয়, যাহাতে তাঁহার formula গড়িবার সুবিধা হয়, সেইরূপে তাহার কল্পনা করিতে পারেন। সেইরূপ কল্পনা তাঁহার ইচ্ছাধীন; যেরূপ কল্পনায় তাঁহার ভাল কাজ চলিবে, তিনি সেইরূপ করিবেন। সেই কল্পিত আকাশকে অসীম, সমাকার homogeneous কল্পনা করিয়া, উহাতে অণু পরমাণু ইলেক্‌ট্রন বসাইয়া, উহাকে বিষমাকৃতি

প্রদান করিতে পারেন এবং সম্প্রতি তাহাই করিতেছেন। সুবিধা বুঝিলে তিনি বস্কোবিচের point অথবা ফেরাডের কল্পিত line বসাইয়া উহাকে বিষমাকার করিতে পারেন। অথবা ইচ্ছা করিলে ও সুবিধা বুঝিলে তিনি ঐ আকাশকে সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ মনে করিতেও পারেন; উহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বক্রতা আরোপ করিতেও পারেন; এবং ঐ বক্রতাভেদে এবং ঐ বক্রতার তারতম্যে উহাকে বিষমাকৃতি দিতে পারেন। এ সমুদয় তাঁহার ইচ্ছাধীন; এ বিষয়ে তিনি নিরঙ্কুশ। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি প্রভু। তিনি আপনার উদ্দেশ্য বুঝিয়া সৃষ্টি করিবেন এবং আপনার সৃষ্টিমধ্যে আপনার ব্যবস্থা করিবেন;—তাঁহার প্রভুত্বে হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও কোন অধিকার নাই।

Real Space এবং Conceptual Space—জনসাধারণের প্রত্যক্ষ আকাশ এবং বৈজ্ঞানিকের কাল্পনিক আকাশ—এই উভয় আকাশকে পৃথক্‌ভাবে বুঝিয়া দেখিতে হইবে। ইহা না বুঝিলে perception of space সম্বন্ধে যত কিছু থিয়োরি, সকল থিয়োরিতেই গণ্ডগোল থাকিবে। আমার যতটুকু বিদ্যা, তাহাতে বোধ হয়, Ernst Machএর পর হইতে বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যে এই প্রভেদটা স্পষ্ট হইয়াছে। Real space—প্রত্যক্ষ আকাশ সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, উহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার প্রয়াসের অনুভূতি হইতে—muscular effort হইতে উহা গড়িয়া লইয়াছে। এই muscular effortএর প্রকার-ভেদেই আমরা বলি, এটা ডাহিনে বা বামে, সম্মুখে বা পশ্চাতে, নিকটে বা দূরে, এক হাত দূরে বা এক ক্রোশ দূরে। এই প্রত্যক্ষ আকাশ কাজেই স্বভাবতঃ বিষমাকৃতি; কেন না, আমাদের অনুভূতিপরম্পরাই বিষমরূপ। এই প্রত্যক্ষ আকাশ প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব, এবং প্রত্যেকের অনুভূতির পরিসর অনুসারে, প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার পরিসর অনুসারে ক্রমশঃ প্রত্যেকের পক্ষেই প্রসরণশীল। প্রত্যেকের বয়স অনুসারে ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি সহকারে উহা ক্রমেই প্রসার পাইতেছে। কিন্তু প্রসার পাইলেও কোন কালেই সীমাহীন হয় না। বিজ্ঞান-বিদ্যা ছত্রিশ কোটি মাঝারি মানুষের প্রত্যক্ষ আকাশের বিবরণ দিতে গিয়া একটা মাঝারি আকাশের—Mean Spaceএর সৃষ্টি করিতে বাধ্য হন; ছত্রিশ কোটি লোকের অনুভূতির সম্মিলন সাধন করিতে না পারিয়া সকলের অনুভূতিকেই বর্জ্জন করিতে বাধ্য হন;

এবং অবশেষে কোন লক্ষণই দিতে না পারিয়া সর্ব্বলক্ষণ-বর্জ্জিত করিতে বাধ্য হন। কোন স্থানে সীমা টানিবার অবসর না পাইয়া একবারে অসীম করিয়া ফেলেন। এইরূপেই বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক সমাকার বা homogeneous সীমাহীন আকাশের সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ তিনি সমাকার আকাশের বিবরণ দিতে না পারিয়া, নানারূপ conceptual চিহ্ন অর্পণ করিয়া উহাকে বিষমাকৃতি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সকল চিহ্ন অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন, particle, corpuscle প্রভৃতি ছোট বড় জড় খণ্ড। চন্দ্র-সূর্য্যাদিও তাহাই। সাধারণের নিকট চন্দ্র সূর্য্য যে পদার্থ, বিজ্ঞান-বিদ্যার নিকট চন্দ্র সূর্য্য সেরূপ পদার্থ নহে। বিজ্ঞান-বিদ্যায় সূর্য্যে আলো নাই, কোন উত্তাপ নাই, কোন resistance নাই, কোন substance নাই; উহার আছে কেবল volume আর shape, আর inertia ; আর আছে উহার ভিতরে অণু পরমাণু ইলেকট্রনের ছুটাছুটি। বিজ্ঞান-বিদ্যা এইরূপে সমাকার আকাশে বিষমাকৃতি দিয়া কাজ চালাইয়া আসিতেছেন ; কিন্তু এরূপ না করিলেও চলিতে পারিত। আধুনিক জ্যামিতির এবং আধুনিক তাড়িতবিদ্যার উৎপত্তি হইতে দেখা যাইতেছে। বৈজ্ঞানিক আকাশকে সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ আকাশ মনে করিয়া উহার মধ্যে বক্রতাভেদ কল্পনা দ্বারা অথবা উহার মধ্যে নানাবিধ বিশিষ্ট লক্ষণ, বিশিষ্ট বিন্দু বা বিশিষ্ট রেখার সন্নিবেশে বিষমাকৃতি অর্পণ করিতে পারিতেন। অতএব বৈজ্ঞানিকের conceptual space একবিধ হইতে হইবে, এমন কোন হেতু নাই। উহা নানাবিধ হইতে পারে। যেমন করিলে ভাল কাজ চলিবে, সেইরূপই হইতে পারে।

এইবার থামিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের জড় জগৎ বাহ্য জগৎ, ইহা স্বীকার্য্য ; ইহা প্রথম postulate। যখনই বহু জীবের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছি, তখনই সেই বাহ্য জগৎ মানিয়া লইয়াছি। এই বাহ্যতা যে মূর্ত্তি লইয়া আমাদের প্রত্যেকের নিকট উপস্থিত হয়, উহাই প্রত্যক্ষ আকাশ। ঐ প্রত্যক্ষ আকাশ সীমাবদ্ধ ও বিষমাকার। আমাদের প্রত্যেকের অনুভূতি হইতে আমরা প্রত্যেকে উহা নিজের মত করিয়া গড়িয়া লইয়াছি। এই যে অনুভূতি, ইহা resistanceএর অনুভূতি। বিজ্ঞান-বিদ্যা প্রত্যক্ষ আকাশ লইয়া কারবার করিতে পারেন না। এই সকল প্রত্যক্ষ আকাশের সাধারণ অংশ অবলম্বন করিয়া তিনি একটা

মন-গড়া আকাশ তৈয়ার করেন। এই মন-গড়া আকাশ কাল্পনিক conceptual আকাশ। ইউক্লিড ইহাকে অসীম ও সমাকার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিউটন ও তাঁহার অনুবর্ত্তীরা সেই অসীম সমাকার আকাশ মানিয়া লইয়া, তাহাকে চিহ্নিত করিবার জন্য তন্মধ্যে নানা চিহ্ন প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রক্ষিপ্ত বস্তুর নাম দিয়াছিলেন জড় দ্রব্য। যে অঙ্কে প্রত্যেক জড় দ্রব্য চিহ্নিত হইয়াছিল, তাহা তাহার inertia। এই inertia একটা concept মাত্র; ইহা কোন বস্তু নহে, ইহার কোন resistance নাই। কেন না, resistanceএর নামান্তরই বস্তুমত্তা। উহা চেতন জীবের অনুভূত সত্য পদার্থ; বৈজ্ঞানিকের কল্পিত নহে। এইরূপে চিহ্নিত, অসীম এবং সমাকাররূপে কল্পিত আকাশ লইয়াই বর্ত্তমানে বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ চলিতেছে। চলিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। অন্যরূপে চিহ্নিত সীমাবদ্ধ আকাশেও যে কাজ চলিতে না পারে, এমন নয়। কিরূপে চিহ্ন কল্পনা করিতে হইবে, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার কল্পনা করিবেন। সে বিষয়ে তাঁহারা প্রভু। অন্যের তাহাতে হস্তক্ষেপে অধিকার নাই। আকাশ যেরূপেই কল্পিত হউক, উহা কাল্পনিক আকাশ, conceptual আকাশ হইবে। জ্যামিতিবিদ্যা উহার আলোচনা করিবে। আমাদের মত মাঝারি মানুষের জীবনযাত্রায়, মোটা জীবনযাত্রায় সঙ্কীর্ণ প্রত্যক্ষ আকাশই যথেষ্ট। সেই conceptual আকাশের তেমন প্রয়োজন নাই। এক কথায় যদি বৈজ্ঞানিকের আলোচ্য বাহ্য জগতের বিবরণ চাহেন, আমি বলিব—এই বাহ্য জগৎ আকাশ জুড়িয়া অবস্থিত। সেই আকাশ বিষমাকারে চিহ্নিত এবং সেই চিহ্নগুলি চলনশীল। অতএব সেই আকাশে থাকিল কেবল extension এবং motion। যাহাকে জড় জগৎ বলিতেছি, তাহা আকাশ জুড়িয়া আছে, অর্থাৎ তাহার extension আছে। এক-একটা জড় দ্রব্য এক-একটা conceptual বা কাল্পনিক চিহ্ন। আর সেই চিহ্নগুলি সেই আকাশমধ্যে হেলিয়া দুলিয়া, কাঁপিয়া, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাই হইল বৈজ্ঞানিকের জড় জগতের মুখ্য লক্ষণ। সমস্তটাই conceptual। প্রত্যেক conceptএর ভিত্তি অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই perceptএ পৌছিতে হয়। বৈজ্ঞানিকের এই conceptual জড় জগতের ভিত্তি কোথায়, ইহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি এইরূপে উত্তর দিব। যখনই আমি বহু জীব স্বীকার করিয়া লইয়াছি, তখনই

সেই বহু জীবের ব্যবহারার্থ যে ব্যাবহারিক জগৎ, তাহাকে একটা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অস্তিত্ব দিয়াছি। মনে করিয়াছি, উহা কোন জীবেরই অন্তরের জিনিস নহে, সকলেরই বাহ্য। চেতন জীবকে ছাড়িয়া উহার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছি এবং সেই স্বতন্ত্রতাই বাহ্যতারূপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই স্বতন্ত্রতাই বাহ্যতা, সেই স্বতন্ত্রতাই extension, সেই স্বতন্ত্রতাই আকাশ। অতএব আকাশের মূলে বহুজীববাদ। জগতে এক মাত্র জীব থাকিলে, সেই জীবের কোন ব্যবহার থাকিত না। তাহাকে কাহারও সহিত কোনরূপ ব্যবহার করিতে হইত না। তাহার পক্ষে কোন ব্যাবহারিক জগতের অস্তিত্ব আবশ্যক হইত না। তাহার পক্ষে কোন আকাশ থাকিত না এবং আকাশব্যাপী কোন বাহ্য জগৎও থাকিত না। এই কথাটুকু যদি আমি বুঝাইতে না পারিয়া থাকি, তবে আমার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে। যেখানেই বহু জীব এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার, সেইখানেই ব্যাবহারিক জগৎ এবং সেই ব্যাবহারিক জগৎ যখন তাহাদের সাধারণের জগৎ, যখন কাহারও উহা নিজস্ব নহে, তখন জগৎ। এই স্বতন্ত্রতাই বাহ্যতা। আবার বলি, ইহাই উহার স্বতন্ত্র extension। যিনি একজীববাদী, যিনি বহু জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহার নিকট এই ব্যাবহারিক জগতের অস্তিত্ব নাই। তাঁহার নিকট বাহ্য জগৎও অস্তিত্বহীন। তাঁহার জগৎটা সমস্তই প্রাতিভাসিক—সমস্তটাই আন্তরিক এবং নিজস্ব। যখনই তিনি নিজেকে ছাড়িয়া অতিরিক্ত অপর জীবের কল্পনা করিবেন এবং তাহার সহিত আদান-প্রদান ব্যবহার করিতে যাইবেন, তখনই এই নিজস্ব প্রাতিভাসিকের কিয়দংশে আপনার স্বত্বস্বামিত্ব ত্যাগ করিয়া অপরের জন্য অর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন। তখনই সেই অংশকে স্বতন্ত্র ভাবিয়া বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিতে বাধ্য হইবেন। অতএব এই বহু জীবের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার হইতেই বাহ্য জগতের সৃষ্টি। আবার এই ব্যবহার হইতেই বাহ্য জগতের বিষমাকৃতি। কেন না, এই যে ব্যবহার, তাহার নামান্তর বিরোধ। এই ব্যবহারটাই জীবনযাত্রা এবং জীবনযাত্রার নামান্তর বিরোধ। এই বিরোধের নানা মূর্তি এবং কাজেই বাহ্য জগতের বিষমাকৃতি। স্থূলভাবে দেখিলে ইহা অন্নের জন্য বিরোধ। যখনই আমি বহু জীব কল্পনা করিয়াছি, তখনই আমি বাহ্য জগৎ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই বাহ্য

জগতের কিয়দংশ আমার হেয়, কিয়দংশ আমার উপাদেয়। এই উপাদেয় অংশকে আমি আত্মসাৎ করিতে চাই। আমিও যেমন আত্মসাৎ করিতে চাই, অন্যেও সেইরূপ আত্মসাৎ করিতে চায়। স্থূলতঃ এই উপাদেয় অংশকে আমি অন্ন বলিতে চাহি এবং এই অন্নকে লাভ করিবার এবং আত্মসাৎ করিবার জন্য আমাদের যাবতীয় জীবনচেষ্টা। Biology-বিদ্যায় যাহাকে life বলে বা প্রাণ বলে, এই অন্নের অন্বেষণেই তাহা প্রতিষ্ঠিত। আমরা প্রত্যেকে অন্নের অন্বেষণ করি এবং অন্নের জন্য পরস্পর কাড়াকাড়ি করি। যাহা উপাদেয়, তাহা পরিমিত। এই পরিমিত উপাদেয়কে আত্মসাৎ করিবার জন্য প্রত্যেক জীব লালায়িত এবং তাহার ফলে জীবে জীবে বিরোধ। সমস্ত জীবনযাত্রাটাই বিরোধের ব্যাপার। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই বিরোধ ব্যাপার। বিরোধের নানা মূর্ত্তি। বায়লজি বা প্রাণবিদ্যা বিরোধের এই নানা মূর্ত্তির আলোচনা করে। জীবনের যাবতীয় চেষ্টাকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে,—আহারের চেষ্টা এবং প্রহারের চেষ্টা। অন্ন অন্বেষণ আহারের চেষ্টা এবং সেই অন্ন লইয়া কাড়াকাড়িতে প্রহারের চেষ্টা। এই উভয় চেষ্টা হইতেই আমাদের যাবতীয় কর্ম্ম, আমাদের সমুদয় activity। ইহার পদে পদে প্রয়াস, বাধা, বিঘ্ন, বিরোধ—নানাবিধ বিরোধ। সমস্ত জীবন ধরিয়া সেই নানা বিরোধ আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করি। এই বিরোধের অনুভূতি ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করে—নূতন বাধা, নূতন বিঘ্ন, নূতন বিরোধ উপস্থিত করে। এই বিরোধের অনুভূতি স্থূলতঃ activity বা muscular effortরূপে অনুভূত হয় এবং প্রত্যক্ষ জগতে substanceএর কল্পনা আনয়ন করে এবং বাহ্য জগৎকে বিষমাকৃতি করিয়া দেয়। বিরোধ যে ক্ষণে ক্ষণে নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করে, অনুভূতির ধারায় যে চাঞ্চল্য, যে চপলতা, যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, তাহাই conceptual-জগতে movement-রূপে—গতিরূপে কল্পিত হয়। অতএব বাহ্য জগতের যে বাহ্যতা এবং সেই বাহ্যতামধ্যে যে চাঞ্চল্য, তাহা সমস্তই এই বহু জীবের পরস্পর আদান-প্রদান হইতে উৎপন্ন। সমস্ত extension এবং সমস্ত motion সেই বহুজীবতা হইতেই উৎপন্ন। বহু জীব হইতেই বাহ্য জগতের উৎপত্তি এবং বহু জীবের কর্ম্ম হইতেই বাহ্য জগতে কল্পিত চাঞ্চল্যের উৎপত্তি। এইরূপে আমাদের জীবনযাত্রায় যে প্রত্যক্ষ বিরোধের অনুভূতি, সেই

perceptual ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই শেষ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকের বাহ্য জগৎ, কাল্পনিক conceptual বাহ্য জগৎ,—বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচ্য বাহ্য জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাকে সৃষ্টি না বলিয়া বিসৃষ্টি, বিসর্গ বা বিসর্জ্জন বলাই ভাল। জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি, চেতন জীবের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে যেন বাহিরে বিসর্জ্জন করা হইয়াছে, ছুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে। যাহা একান্তই অন্তরের জিনিস, তাহাকে নিতান্তই স্বতন্ত্র করিয়া শব্দরূপে, সংজ্ঞারূপে, conceptরূপে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই concept নিতান্তই মন-গড়া পদার্থ, কল্পিত পদার্থ, সৃষ্ট পদার্থ। সৃষ্টি করিয়া ইহাকে বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলাই ব্যাবহারিক জড় জগতের সৃষ্টি। conceptকে যদি শব্দ বলা যায়, উহার রূপ যদি বাঙ্ময় রূপ হয়, তাহা হইলে শব্দ হইতে বাহ্য জগতের সৃষ্টি এই অর্থে সত্য। বৈজ্ঞানিকের জড় জগতের মুখ্য লক্ষণ যে বাহ্যতা বা extension, যে বাহ্যতা বা extension আকাশরূপে আমাদের নিকট পরিচিত, আমাদের শাস্ত্রে সেই আকাশকে শব্দের প্রথম প্রকাশ বলা হয়, উহাও আমরা এই অর্থে গ্রহণ করিতে পারি। আমি বলিতে চাহি, এই যে ব্যাবহারিক জগৎ, এই যে বাহ্য জগৎ, এই যে জড় জগৎ, তাহা বহু জীবের অস্তিত্ব হইতেই কল্পিত। বহু জীবের মধ্যে আদান-প্রদান হইতেই উহার বিষমাকৃতি এবং সেই বিষমাকৃতির মধ্যে চাঞ্চল্য। এই যে আদান-প্রদান, ইহা বিরোধাত্মক। এই বিরোধটাই প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতে বস্তুরূপে, substanceরূপে কল্পিত হয় এবং একটা substantial জগতের বিভীষিকা লইয়া আমাদের প্রাণের উপর চাপিয়া বসে। প্রাণই এই আদান-প্রদান এবং প্রাণই এই বিরোধ। প্রাণবিদ্যা বা Biology ইহার আলোচনা করে। এই প্রাণ পদার্থটাকে আর একটুকু চাপিয়া না ধরিলে জগৎপ্রবাহের উৎস সন্ধান পাওয়া যাইবে না। আমরা সেই গোমুখীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। চলুন, আগামী বারে এই প্রাণের তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিব।

প্রাণময় জগৎ

পুরাণে না কি গল্প আছে, প্রজাপতির প্রাণী সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল, এবং তিনি কয়েকটি প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। উহারা জন্মিবা মাত্র খাই-খাই করিয়া উঠিল, এবং আর কিছু না পাইয়া, অবশেষে সৃষ্টিকর্ত্তাকেই খাইতে উদ্যত হইল। সৃষ্টিকর্ত্তা বিপদ্ দেখিয়া বহুতর প্রাণী সৃষ্টি করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন,—"তোমরা পরস্পরকে ভক্ষণ কর।" তদবধি প্রাণীরা পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া আসিতেছে, কেহ কাহাকেও খাতির করে না।

এবার প্রাণের তত্ত্ব আলোচনা করিব, এইরূপ আপনাদের নিকট প্রতিশ্রুত আছি। গণ্ডগোল পরিহারের জন্য গোড়ায় বলিয়া রাখি,—প্রাণী আর জীব, এই দুইটি শব্দ আমি একটু ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিব। ইংরেজীতে যাহাকে living being বা living organism বলে, প্রাণী বলিতে আমি তাহাই বুঝিব। উদ্ভিদ্ এবং জন্তু, vegetable and animal, সমস্তই প্রাণীর পর্য্যায়ে পড়িবে। আর জীব শব্দটি আমি কেবল চেতন জন্তু, conscious animal, এই সঙ্কীর্ণ অর্থে বাঁধিয়া রাখিব। উদ্ভিদের অথবা নিম্নশ্রেণীর জন্তুর চেতনা আছে কি না, এই উৎকট প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা না পাইয়াও মোটামুটি আমরা চেতন এবং অচেতন, এই দুই শ্রেণীতে যাবতীয় প্রাণীকে ফেলিয়া থাকি ; চেতন ও অচেতন বলিলে কি বুঝিব, তাহার স্থূল ধারণাও আমাদের একটা আছে। সেই স্থূল ধারণা লইয়াই এখন আমাদের কাজ চলিবে। ধরিয়া লইলাম,—প্রাণ এবং চেতনা, এই দুইটা স্বতন্ত্র concept। বহু প্রাণীর চেতনা আছে বটে, কিন্তু প্রাণী মাত্রেরই চেতনা না থাকিতে পারে। ইংরেজীতে প্রাণের তর্জ্জমায় life এবং চেতনার তর্জ্জমায় consciousness রাখা যাইতে পারে।

জড় জগৎ লইয়া আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি। প্রত্যক্ষতঃ উহা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাত্মক। তদ্ব্যতীত জড়ের সহিত কারবারে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের অতিরিক্ত একটা বিরোধের বা resistanceএর প্রত্যক্ষ অনুভূতি আমরা পাইয়া থাকি। এই resistanceএর অনুভূতিকেই পণ্ডিতেরা জড় পদার্থের মুখ্য লক্ষণ বলিয়া থাকেন। কেন না, যে ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়ে বঞ্চিত, যে দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, যাহার আস্বাদনের

বা ঘ্রাণের ক্ষমতা নাই, যে শীতোষ্ণতা বুঝিতে পারে না, তাহারও muscular sensation থাকিতে পারে এবং তদ্দ্বারা সে জড় পদার্থকে একটা resisting somethingরূপে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে। এই অনুভবের ক্ষমতাটুকু হারাইলে তাহার পক্ষে জড় পদার্থের কোন অস্তিত্বই থাকে না। ফলে আমাদের মত সাধারণ চেতন জীবের পক্ষে রূপ-রসাদির অতিরিক্ত এই প্রত্যক্ষ বিরোধের অনুভূতিই জড় পদার্থের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। বিজ্ঞান-বিদ্যা কিন্তু সর্ব্ববিধ প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে বর্জ্জন করিয়া, প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে অতিক্রম করিয়া, extension এবং motion, এই দুই মন-গড়া conceptএর সাহায্যে জড় পদার্থের বিবরণ দিয়া থাকেন। সে সকল কথার পুনরুত্থাপনের আর দরকার নাই। প্রত্যক্ষ perceptionএর দিক্ দিয়া, আর কল্পিত conceptionএর দিক্ দিয়া জড় পদার্থের স্বরূপ বুঝাইবার আমি চেষ্টা করিয়াছি; এবং আমার চেষ্টা যদি নিতান্তই ব্যর্থ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনাদেরও সে বিষয়ে কতকটা ধারণা জন্মিয়াছে। অতএব এ বিষয়ে বাগ্‌বাহুল্য করিয়া আপনাদিগকে আর বিরক্ত করিব না। আপনারা জানেন, প্রাণী মাত্রেই একটা দেহ ধারণ করে, এবং প্রাণীদের সেই দেহ জড় দ্রব্যেই নির্ম্মিত। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাবতীয় প্রাণীর দেহকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, চিরিয়া পোড়াইয়া নানারূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন ; কিন্তু পরিচিত জড় দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যের সন্ধান পান নাই। জড় জগৎ হইতেই মসলা সংগ্রহ করিয়া প্রাণিদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহে প্রাণী আছে কি না, জানি না ; থাকিলেও তাহাদের কথা কিছুই বলিতে পারিব না। কিন্তু পৃথিবীতে যে সকল প্রাণী আছে, তাহারা দেহ গড়িবার সময় জড় জগৎ হইতেই মসলা লয় ; তবে একটু বাছাই করিয়া লয়। এ-বিষয়ে তাহাদের একটু বিশিষ্ট রুচি আছে। আপনারা জানেন, যাবতীয় জড় দ্রব্যের মধ্যে তাহারা carbon বা কয়লা, আর হাইড্রোজন, অক্সিজন, নাইট্রোজন, এই চারিটি দ্রব্যকেই বাছিয়া লয়, এবং এই চারিটার সহিত যৎকিঞ্চিৎ গন্ধক বা ফস্ফরস্ বা আর কিছু যোগ করিয়া আপনাদের দেহ নির্ম্মাণের উপযোগী মসলা তৈয়ার করিয়া লয়। অন্য কোন সামগ্রী গ্রহণ করে না ; অথবা উপস্থিত হইলে, অন্য সামগ্রী বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করে। এই কয়টা জিনিসে যে মসলা প্রস্তুত

হয়, পণ্ডিতেরা তাহার নাম দিয়াছেন প্রোটোপ্লাজম্। এই প্রোটোপ্লাজম্ই প্রাণিদেহ গড়িবার মসলা, ইহাকেই প্রাণি-পদার্থ বলিব। এই জিনিসটা ইট, কাঠ, লোহার মত শক্তও নয়, আবার তেল জলের মত নিতান্ত তরলও নয়। উহা না কঠিন, না তরল ; পরন্তু কোমল, নমনীয়, flexible। আজকালকার রাসায়নিক পণ্ডিতেরা তাঁহাদের laboratoryতে বসিয়া নানা রকমের সামগ্রী তৈয়ার করিতেছেন, কিন্তু কয়লার সহিত হাইড্রোজন, অক্সিজন, নাইট্রোজন মিশাইয়া এই প্রোটোপ্লাজম্ এ পর্য্যন্ত তৈয়ার করিতে পারেন নাই। চেষ্টার অন্ত নাই ; কিন্তু যাবতীয় চেষ্টা এ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। কেহ বা এখনও আশা রাখেন, কেহ কেহ বা হাল ছাড়িয়া বলিতেছেন যে, laboratoryতে আমরা প্রোটোপ্লাজম্ কখনই প্রস্তুত করিতে পারিব না। প্রাণীরা কিন্তু স্বভাবতঃ প্রোটোপ্লাজম্ প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং প্রাণীদের মধ্যে যেগুলাকে vegetable বা উদ্ভিদ্ বলা যায়, তাহাদেরই আবার এই ক্ষমতা অত্যন্ত পরিস্ফুট। উদ্ভিদেরা জড় জগৎ হইতে কয়লা, আর অক্সিজন, হাইড্রোজন, নাইট্রোজন টানিয়া লয়, এবং তাহাদিগকে মিলাইয়া আপনাদের দেহ-নির্ম্মাণের উপযোগী মসলা,—ঐ যে প্রোটোপ্লাজম্,—তাহা প্রস্তুত করে। এই কাজের জন্য উদ্ভিদ্গুলাকে বাহির হইতে শক্তি সংগ্রহ করিতে হয়। সূর্য্যদেব নয় কোটি মাইল দূরে থাকিয়া যে রাশি রাশি উত্তাপ এবং আলো প্রায় সম্পূর্ণ অকারণে চারি দিকে ফেলা-ছড়া করিতেছেন, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আশ্রয় করিয়া উদ্ভিদেরা প্রোটোপ্লাজম্ প্রস্তুত করিয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা আপনাদের দেহ গড়িয়া, দেহের মধ্যে উহা সঞ্চিত রাখে। জন্তুগুলা চতুর ; তাহারা উদ্ভিদের নিকট ঐ প্রোটোপ্লাজম্ ধার করিয়া লয় অথবা কাড়িয়া লয়, সেই তৈয়ারী মসলাকেই একটু ঘাঁটিয়া লইয়া আপনাদের দেহ নির্ম্মাণ করে। ফলে আপনারা জানিয়া রাখুন যে, প্রাণী মাত্রেরই—উদ্ভিদ্ ও জন্তু, এই উভয়বিধ প্রাণীরই দেহ প্রোটোপ্লাজমে নির্ম্মিত। এই প্রোটোপ্লাজম্ জড় পদার্থ বটে, কিন্তু ইহা একটু বিশিষ্ট রকমের জড় পদার্থ। অন্যান্য দ্রব্যকে বর্জ্জন করিয়া কয়েকটা বিশিষ্ট দ্রব্যে এই প্রোটোপ্লাজম্ প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ কয়টা দ্রব্যই কেন বাছিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন। হার্বার্ট স্পেন্সার বলিতেন যে, ঐ কয়টা বিশিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে কার্ব্বন বা কয়লা অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য ; উহার তরলতাপাদন

দুঃসাধ্য। আর হাইড্রোজন, অক্সিজন, নাইট্রোজন—এই তিনটা দ্রব্যের কাঠিন্য সম্পাদন, এমন কি, তরলতাপাদনও অত্যন্ত দুঃসাধ্য। সে দিন পর্য্যন্ত উহারা permanent gas নামেই পরিচিত ছিল; সম্প্রতি অতি কষ্টে উহাদিগকে জমাট বাঁধান গিয়াছে। এই অতি কঠিন কয়লার সহিত এই অতি চঞ্চল গ্যাস কয়টিকে কোনরূপে মিলাইয়া যে না-কঠিন না-চঞ্চল প্রোটোপ্লাজম্ প্রস্তুত হয়, তাহাই প্রাণীদিগের কোমল কমনীয় দেহ নির্ম্মাণের জন্য সর্ব্বথা উপযোগী। স্পেন্সারের এই কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত না হইতে পারে।

মানুষ বুদ্ধিজীবী জীব; বুদ্ধিবলে কত অঘটন ঘটাইতেছে; এখনও কিন্তু এই প্রোটোপ্লাজম্ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। বুদ্ধিবলে ইহা ঘটাইতে পারা যায় নাই বটে, কিন্তু গাছপালার মত একেবারে বুদ্ধিহীন অচেতন প্রাণী কিরূপে সূর্য্যের আলোককে খাটাইয়া লইয়া এই প্রোটোপ্লাজম্ প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা বিজ্ঞান-বিদ্যার এখনও কল্পনায় আসে নাই। বিজ্ঞান-বিদ্যা কোনরূপ conceptual formulaয় উহার কোনরূপ বিবরণ বা description দিতে সমর্থ হন নাই। এই ঘটনা এখনও একটা রহস্যের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। মানুষের Reason বা প্রজ্ঞা এখানে অদ্যাপি প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। যাঁহারা প্রজ্ঞাদেবীর পরম ভক্ত, প্রজ্ঞার ক্ষমতার সীমানা টানিতে যাঁহারা কুণ্ঠিত, তাঁহারা আশা করিয়া বসিয়া আছেন যে, একদিন-না-একদিন এ রহস্যের ভেদ হইবেই। ক্রমাগত experiment করিতে করিতে এক দিন আমরা বাহির করিতে পারিবই যে, কিরূপ ঘটনাচক্র, কিরূপ ঘটনার পরিবেশ, কিরূপ circumstances, কিরূপ conditions উপস্থিত করিতে পারিলে কয়লা, হাইড্রোজন প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রোটোপ্লাজমের উৎপাদন করিবে। সেই ঘটনাচক্র কৌশলক্রমে উপস্থাপিত করিবা মাত্র ঐ দ্রব্যগুলা পরস্পর মিলিত হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ হইতেছে, সেই ঘটনাচক্রের আবিষ্কার। হাইড্রোজন ও অক্সিজন একত্রে মিশ্রিত করিয়া আগুন দিবা মাত্র উহা জলে পরিণত হয়। লোহাকে সোঁতা বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে, উহা মরিচায় পরিণত হয়। সেইরূপ সেই ঘটনাচক্র আবিষ্কার করিতে পারিলেই, উত্তাপ বা আলো বা তাড়িত বা X-ray বা আর কিছুর প্রয়োগ দ্বারা আমরা প্রোটোপ্লাজম্ প্রস্তুত করিতে পারিব।

কোন্ পথে চলিলে সেই ঘটনাচক্র আবিষ্কৃত হইবে, এখন খোঁজ সে পথ। এখন সম্পূর্ণ আঁধার দেখিতেছি; কিন্তু একদিন-না-একদিন পথ আবিষ্কৃত হইবেই। প্রজ্ঞা তখন আপনার দীপশিখা জ্বালিয়া সেই পথে চলিতে চলিতে প্রাণি-পদার্থ নির্ম্মাণের formula গড়িয়া লইবে এবং তৎসাহায্যে design করিয়া প্রাণি-দেহের মসলা বানাইবে এবং হয়ত সেই মসলা হইতে প্রাণিদেহ গঠনেরও উপায় উদ্ভাবন করিবে। অতএব হতাশ না হইয়া খোঁজ সেই পথ। ভূবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা ভূপৃষ্ঠের স্তর অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, অতীত কালে এমন এক দিন ছিল, যখন ভূপৃষ্ঠে কোন প্রাণী বিদ্যমান ছিল না। হয়ত ভূপৃষ্ঠ তখন এত তপ্ত ছিল যে, সেই তপ্ত অবস্থায় কোন প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভবপর হয় নাই। অথবা তখন বায়ুমণ্ডলের বা অন্তরীক্ষের এমন অবস্থা ছিল, যাহাতে কয়লার সহিত অক্সিজন, হাইড্রোজন প্রভৃতির সংযোগ-সাধন সম্ভবপর হয় নাই। অবশেষে ভূপৃষ্ঠের উত্তাপের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া, অথবা অন্তরীক্ষের অবস্থা-বিকৃতি ঘটিয়া এক দিন এরূপ ঘটনাচক্র উপস্থিত হইয়াছিল, যাহাতে আপনা হইতেই কয়লার সহিত অক্সিজন প্রভৃতির যোগ ঘটিয়া গেল এবং প্রাণিদেহের মসলা প্রস্তুত হইল। নতুবা ভূস্তর অন্বেষণ করিয়া এরূপ দেখা যায় কেন, যে পৃথিবীতে প্রাণী এক কালে ছিল না, সহসা এক দিন প্রাণীর আবির্ভাব হইল, এবং সেই আবির্ভাবের পর হইতে প্রাণের ধারা অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিল? তখন যে ঘটনাচক্র উপস্থিত হইয়াছিল, আমরা যদি laboratoryতে বসিয়া যন্ত্রযোগে, বুদ্ধিবলে সেইরূপ ঘটনাচক্র ঘটাইতে পারি, তাহা হইলে এখনই বা সেই প্রাণি-পদার্থ প্রস্তুত হইবে না কেন? অতএব খোঁজ খোঁজ, কেবলই পথ খোঁজ। হতাশ হইও না।

অপর পক্ষের লোক, যাঁহারা laboratoryতে প্রাণি-পদার্থ এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে না পারিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা বলিতে চাহেন, আমাদের যন্ত্র-তন্ত্রের যতই উন্নতি হউক, আমরা কৌশলে ও বুদ্ধিবলে কখনই প্রাণি-পদার্থ বা প্রোটোপ্লাজম্ প্রস্তুত করিতে পারিব না। এই প্রাণ বা life একটা কিম্ভূতকিমাকার অপরূপ পদার্থ—যাহা কখনও প্রজ্ঞার বশ্যতা স্বীকার করিবে না। কখনই আমরা বুদ্ধিবলে উহাকে আয়ত্ত করিতে পারিব না। যে প্রাণী, যাহার প্রাণ আছে, সেই প্রাণী,—প্রাণহীন জড় পদার্থকে, non-living dead matterকে, প্রাণি-পদার্থে—living

matterএ পরিণত করিবার স্বভাবতঃ ক্ষমতা রাখে। অতি সামান্য অচেতন উদ্ভিদ্‌কণিকার পক্ষে যাহা সাধ্য—স্বভাবতঃ সাধ্য, বুদ্ধিজীবী মানুষের বুদ্ধিকৌশলে তাহা সাধ্য নহে। আমাদের চোখের সামনে ছোট-বড় গাছগুলা—তৃণ হইতে বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত গাছগুলা আকাশের অভিমুখে সবুজ পাতা বিছাইয়া দিয়া, সূর্য্যের আলোকে খাটাইয়া লইয়া, বায়ু হইতে কয়লা সংগ্রহ করিয়া লইতেছে; এবং সোঁতা মাটির ভিতর শিকড় চালাইয়া লোণা জল সঞ্চয় করিতেছে; এবং সেই লোণা জলের সহিত কয়লা সংযোগ করিয়া প্রাণি-পদার্থ স্বভাবতঃ প্রস্তুত করিতেছে; এবং সেই মসলায় আপনাদের দেহ নির্ম্মাণ করিয়া লইতেছে। ঐ গাছগুলার যে ক্ষমতা আছে, এত চতুর জন্তুগুলার সে ক্ষমতা নাই। এমন কি, এত বড় বুদ্ধিজীবী বৈজ্ঞানিক মানুষের সে ক্ষমতা নাই। শুধু নাই নহে; সে ক্ষমতা তাহাদের পাইবারও কোন আশা দেখি না। তাহাদিগকে চিরকালই সেই গাছপালার নিকট হইতে খাদ্য সামগ্রী ধার করিয়া লইয়া, অথবা বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া লইয়া আপনাদের দেহ নির্ম্মাণ এবং দেহ রক্ষা করিতে হইবে। গাছপালার এই প্রাণ আছে বলিয়াই সে dead matterকে living matterএ পরিণত করিতে পারে। এই প্রাণের অদ্ভুত ক্ষমতা। ভূপৃষ্ঠে এক দিন এই প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না, এ বিষয়ে ভূবিদ্যার সাক্ষ্য মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। এক দিন সহসা কি-জানি কিরূপে ধরাতলে এই প্রাণের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং তদবধি ইহার স্রোত চলিতেছে, তাহাও দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু প্রাণের আকস্মিক আবির্ভাব কিরূপে হইল, কিরূপ ঘটনাচক্রে হইল, তাহা এখন জানি না। জানিয়াও বিশেষ লাভ হইবে না। আমরা laboratoryতে যন্ত্র-তন্ত্র-যোগে সেই ঘটনাচক্র ঘটাইতে পারিলেও, প্রাণহীন জড়ে প্রাণের সঞ্চার করিতে পারিব না। উহা একটা সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ, একটা অপরূপ অদ্ভুত পদার্থ, যাহা কিছুতেই আমাদের formulaর মধ্যে ধরা দিবে না, কিছুতেই আমাদের হুকুম মানিবে না। এই প্রাণের আবির্ভাব, ইহা হয়ত বিধাতা পুরুষের একটা খেয়াল, ইহা তাঁহার special creation। এক দিন হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যে, জড় পদার্থে প্রাণের সঞ্চার হউক, অমনই জড় পদার্থে প্রাণের সঞ্চার হইল। অমনই খানিকটা প্রাণহীন জড় দ্রব্য প্রাণময় প্রোটোপ্লাজম্ পদার্থের উৎপত্তি ঘটাইল। তদবধি সেই প্রোটোপ্লাজম্‌ই জড় জগৎ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া, তাহাকে হজম

করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া নূতন প্রোটোপ্লাজম্ তৈয়ার করিতেছে; তাহাতে প্রাণের ধারা অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে। বিধাতা পুরুষ নিরুদ্বেগ হইয়া আপনার কেরামতি দেখিতেছেন, অথবা স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতেছেন। অথবা এরূপও হইতে পারে যে, সেই creation কার্য্য এখনও চলিতেছে। বিধাতা পুরুষ ঘুমান নাই, এখনও তিনি আমাদের অজ্ঞাত দেশে, অজ্ঞাত উপায়ে প্রাণি-পদার্থের সৃষ্টি করিতেছেন, আমরা তাহার কোন সন্ধান রাখি না।

Creation-বাদীরা এইরূপে বিজ্ঞান-বিদ্যাকে নিরস্ত করিতে চাহেন। বিজ্ঞান-বিদ্যা যত দিন প্রাণ-পদার্থকে আয়ত্ত করিতে না পারিবেন, যত দিন laboratoryতে বসিয়া প্রাণহীন জড়ে প্রাণের সঞ্চার করিতে না পারিবেন, তত দিন প্রতিপক্ষকে একবারে নিরুত্তর করিতে পারিবেন না। তবে বিজ্ঞান-বিদ্যা আশা করিয়া বসিয়া আছেন যে, আমরা এত কাল খেজুরের রস এবং আখের রস হইতে চিনি পাইতাম, এখন যখন laboratoryতে বসিয়া চিনি তৈয়ার করিতে পারিতেছি, তখন এক দিন খেজুরের গাছ এবং আখের গাছ গড়িয়া তুলিতে পারিব না কেন? পরাজয় স্বীকার বিজ্ঞান-বিদ্যার স্বভাব নহে।

আপনারা Vitalist বা প্রাণবাদী এবং Mechanist বা জড়বাদী বা যন্ত্রবাদী, এই দুই দলের দন্দ্বের কথা শুনিয়া আসিতেছেন। এই দ্বন্দ্ব বহু কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং শীঘ্র মিটিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। British Association সভায় এক বৎসরের প্রেসিডেন্ট Mechanistic থিয়োরির জয় গান করেন। পর-বৎসরের সভাপতি Vitalismএর ধ্বজা তোলেন। উভয় পক্ষের বাগ্‌বিতণ্ডার অন্ত নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ঝগড়ার মূল কোথায়, তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। Mechanistরা বলেন, প্রাণি-দেহ একটা যন্ত্র মাত্র। ক্লক ঘড়ি বা ষ্টিম এঞ্জিন বা ডাইনামো যেমন একটা যন্ত্র, সেইরূপ একটা যন্ত্র মাত্র। ইহার জটিলতার অন্ত নাই বটে, কিন্তু তথাপি ইহা একটা যন্ত্র মাত্র। ঘড়ির কিম্বা এঞ্জিনের প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক অবয়ব কি কাজ করে এবং কিরূপে কাজ করে, তাহা আমরা জানি। প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক অবয়ব আমরা স্বহস্তে গড়িতে পারি এবং যথাস্থানে স্থাপন ও সন্নিবেশ করিয়া যন্ত্রকে কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিতে পারি। কিন্তু দেহ-যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি কোন্‌টায় কি কাজ করে, তাহা আমরা

সমস্ত বুঝিয়া উঠিতে আজিও পারি নাই। কিরূপে কাজ করে, তাহাও অধিকাংশ স্থলে বুঝিতে পারি নাই। আমাদের রাসায়নিক পণ্ডিতেরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি এখনও গড়িয়া তুলিতে পারেন না। যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া সাজান-গোছান, তাহাও এখন সার্জনদের পক্ষে অসাধ্য। কাজেই ঐ দেহ-যন্ত্র আমরা স্বহস্তে গড়িতে পারিতেছি না। কিন্তু Physiology এবং Chemistry বিদ্যা এই সকল তথ্য নির্ণয়ে নিযুক্ত আছেন। ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছি। কালে সমস্তই হয়ত বুঝা যাইবে। তখন এখন যাহা অসাধ্য, তাহা অসাধ্য থাকিবে না। এই যে গ্রহ-উপগ্রহ-সমন্বিত প্রকাণ্ড সৌর জগৎ, ইহা আমরা স্বহস্তে গড়ি নাই বা কখন গড়িতে পারিবও না। তথাপি ইহাও ত একটা যন্ত্র মাত্র। এই সৌর জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবিধি formulaর ভিতর ফেলিয়াছি। সেই formulaর প্রযোগে উহাদের গতিবিধির সূক্ষ্ম গণনা আমাদের সাধ্য হইয়াছে। সেইরূপ দেহ-যন্ত্র কখন আমরা গড়িতে না পারিলেও উহার যাবতীয় গতিবিধি আমাদের formulaর মধ্যে একদিন-না-একদিন নিশ্চয় ধরা দিবে। সৌর জগৎ যেমন Mechanics-বিদ্যার আয়ত্ত হইয়াছে, দেহ-যন্ত্রও সেইরূপ Mechanics-বিদ্যার আয়ত্ত হইবে। খাঁটি Mechanicsএর আয়ত্ত না হউক, Physics এবং Chemistry-বিদ্যার আয়ত্ত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় করিবার কোন হেতু দেখি না। প্রাণহীন জড় জগতেও সর্ব্বত্র আমরা mechanical description দিতে পারি নাই। একটা steam-engine বা একটা dynamoর আমরা সম্পূর্ণ mechanical description দিতে পারি না;—Physics এবং Chemistryর আশ্রয় লইতে হয়—তাপ-বিদ্যা, তাড়িত-বিদ্যা এবং রসায়ন-বিদ্যার আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু ঐ সকল বিদ্যাও নূতন নূতন স্বতন্ত্র formula গড়িয়া steam-engine-কে এবং dynamo-যন্ত্রকে আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। Physics এবং Chemistryর আরও উন্নতি হইলে প্রাণি-দেহের মত জটিলতর যন্ত্রকেও আয়ত্ত করিতে না পারিব কেন? এই কয় বৎসরের মধ্যেই Physiology-বিদ্যা প্রাণি-দেহের অনেক তথ্যকে mechanical, physical এবং chemical formulaয় ফেলিয়াছে। হতাশ হইও না, হাল ছাড়িও না, কেবল পথ খোঁজ। দেহ-যন্ত্রের জন্য কোনরূপ mysterious vital forceএর অবতারণা করিতে হইবে না।

গণ্ডগোল হয় এই vital force নামটা লইয়া। এক পক্ষ প্রাণের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া এই vital forceএর অবতারণা করেন; বলেন যে, mechanical, physical বা chemical forces প্রাণের স্বরূপ নির্ণয়ে কুলাইবে না। যেখানে কুলায় না, সেইখানেই তাঁহারা বলেন, 'ওঃ, এটুকু ত vital forceএর কাজ'। এই vital force নামটি তাঁহাদিগকে অত্যন্ত তৃপ্তি দেয়, তাঁহাদের মনে পরম শান্তি আনয়ন করে। 'এটা vital forceএর কাজ'—এই বলিলেই তাঁহারা যেন নিশ্চিন্ত হন। যেন আর কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন দেখেন না। বিজ্ঞান-বিদ্যা তাঁহাদের এইরূপ আচরণে ধৈর্য্য রাখিতে পারেন না। বিজ্ঞান-বিদ্যা vital force নামটা শুনিলেই চটিয়া যান; বলেন,—এ আবার কি উৎপাত? আমি mechanical, chemical, physical force বুঝি; এই কিম্ভূতকিমাকার vital forceএর উৎপাত আমার পক্ষে অসহ্য। প্রকৃত পক্ষে vital force নামটার উপর এরূপ চটিবার সম্যক্ হেতু দেখি না। জড় জগতের mechanical description দেওয়া বিজ্ঞান-বিদ্যার চরম লক্ষ্য বটে। গ্যালিলিও, নিউটন এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তীরা এই পথই দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান-বিদ্যা জড় জগতের যাবতীয় ঘটনাকে mechanical formulaয় ফেলিতে পারেন নাই। যখনই দরকার হইয়াছে, তখনই নূতন নূতন non-mechanical concept গড়িয়া নূতন নূতন forceএর আশ্রয় লইয়াছেন। Electric force, magnetic force, chemical force ইত্যাদি নূতন নূতন non-mechanical conceptএর আশ্রয় লইয়াছেন। সেইরূপ প্রাণের তথ্য বুঝাইতে গিয়া যদি একটা নূতন conceptএর আশ্রয় লইতে হয় এবং তাহার vital forceই নাম দেওয়া যায়, তাহাতে বিজ্ঞান-বিদ্যার চটিবার কোন কারণ নাই। বিজ্ঞান-বিদ্যা নিজেই তাহা করিয়া আসিতেছেন। আসল বিরোধটা নাম লইয়া নহে; বিরোধ—ভাব লইয়া, তাৎপর্য্য লইয়া। যাঁহারা প্রাণবাদী বা vitalist, তাঁহারা vital force বলিতে এমন একটা কিছু বোঝেন, যাহা কস্মিন্ কালে formulaর মধ্যে ধরা দিবে না, যাহা গণনার আমলে আসিবে না, যাহা Reasonএর বা প্রজ্ঞার বশীভূত হইবে না, মানুষের Intelligence যাহাকে খাটাইয়া কোন কাজে লাগাইতে পারিবে না; কোন কর্ম্মসাধনে প্রয়োগ করিতে পারিবে না। এইখানেই বিজ্ঞান-বিদ্যার আপত্তি। বিজ্ঞান-বিদ্যা

vital force নাম প্রয়োগ করিতে স্বচ্ছন্দে পারেন ; কিন্তু তিনি জানেন যে, electric force বা magnetic force বা chemical forceএর মত এই vital forceকেও এক দিন আমি formulaবদ্ধ করিতে পারিব। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত Matter এবং Motionএর অথবা extension ও inertiaর termsএ ইহার বিবরণ দিতে পারিব। আজি না পারি, শত বর্ষান্তে পারিব। আজিও আমি electric, magnetic ও chemical forceকে একটা mechanical formulaয় ফেলিতে পারি নাই। কিন্তু উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন non-mechanical formulaয় আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। সেইরূপ এই vital force একদিন-না-একদিন formulaয় বাঁধা পড়িবে। উহার দ্বারা প্রাণি-দেহরূপ জটিল যন্ত্রের যাবতীয় ঘটনা আমার গণনাসাধ্য হইবে। সৌর জগৎ বা ষ্টীম এঞ্জিন বা ডাইনামো যেমন আমার গণনার আমলে আসিয়াছে, দেহ-যন্ত্রেরও যাবতীয় ব্যাপার সেইরূপ আমার গণনার আমলে আসিবে।

এখন আপনারা দেখিতেছেন, Vitalist এবং Mechanistদের মধ্যে দ্বন্দ্বের মূল কোথায়। দ্বন্দ্বের মূল নামে নহে, দ্বন্দ্বের মূল নামের তাৎপর্য্যে। Vitalistরা বলেন, এই যে vital force, ইহা কখনও গণনার বশ হইবে না। Mechanistরা বলেন, যদি কখন গণনার বশ হয়, তবেই উহাতে আমার কাজ চলিবে, নতুবা এখন উহা আমার অগ্রাহ্য ; একটা মিছা নামে আমি লোকের চোখে ধূলা দিতে চাহি না। কথাটা ভাল করিয়া বুঝুন। কোন ঘটনা গণনাযোগ্য হইলেই যে, সর্ব্বদা আমরা উহা গণিতে পারি, এমন নহে। দৃষ্টান্ত লউন। মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়,—অন্তরীক্ষ সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা, atmospheric phenomena,—অন্তরীক্ষ-বিদ্যা বা meteorology-বিদ্যা ইহাদের গণনায় নিযুক্ত আছেন। প্রত্যেক রাজ্যে গবর্ণমেণ্ট বহুত টাকা খরচ করিয়া এক-একটা meteorological department পুষিতেছেন। বড় বড় পণ্ডিত গণনা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কত সূক্ষ্ম যন্ত্র লইয়া তাঁহারা দিবারাত্রি অন্তরীক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। অথচ meteorologistদের forecastএ—তাঁহাদের ভবিষ্যৎ গণনায় লোকে কতটুকু শ্রদ্ধা করে ? ইহার মানে কি ? অন্তরীক্ষ সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা জড় জগতের ঘটনা, physical phenomena। সমস্তই Mechanical এবং Physical Scienceএর আলোচ্য। ইহার অধিকাংশ formulaই

আমরা গড়িয়া ফেলিয়াছি। অথচ সেই সকল formula আমরা সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করিতে পারি না। বায়ুমণ্ডলে একখানা মেঘোৎপত্তির factor এতগুলা যে, সমুদয় factorএর হিসাব লইয়া formulaর প্রয়োগ করিয়া আমরা সমস্যার সমাধান করিতে পারি না। সমাধান করিতে পারি না বটে, কিন্তু ইহা সমাধানযোগ্য—fully determinate—সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ইহার কোন স্থলে কোন রহস্য কোন mystery নাই। সমস্ত factorগুলার সমস্ত dataগুলার হিসাব লইতে পারিলে, অন্তরীক্ষ-ঘটিত প্রশ্নের অঙ্কপাত করিয়া একটা-না-একটা উত্তর মিলিবে ; একটা বই দুটা উত্তর হইবে না। সমস্ত factorএর হিসাব লইতে পারি না বলিয়াই আমরা যে উত্তর পাই, তাহা অত্যন্ত মোটা হয়, অত্যন্ত approximate হয়। এত মোটা হয় যে, গণনা-ফলের সঙ্গে দৃষ্ট ফলের গরমিল দেখিয়া লোকে বিদ্রূপ করে। এটা বিজ্ঞান-বিদ্যার অপূর্ণতার এবং অক্ষমতার পরিচয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া অন্তরীক্ষ-বিদ্যাকে কেহ physical scienceএর বাহিরে ফেলিতে চাহিবেন না। বস্তুতই গণনা কার্য্যটা বড় বিষম কার্য্য। অধিকাংশ প্রাকৃতিক ঘটনা এত জটিল যে, উহার সমস্ত dataর, সমস্ত factorএর হিসাব লওয়া কঠিন। Formulaগুলাও এখনও সর্ব্বত্র পূর্ণতা লাভ করে নাই। তাহার উপর গণনা-বিদ্যা বা mathematics-বিদ্যা গণকের হাতে এক মাত্র অস্ত্র ; উহা অতি প্রচণ্ড অস্ত্র হইলেও অত্যন্ত জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় এখনও পরাঙ্মুখ। ধরুন না জ্যোতিষশাস্ত্র। দুইটা জড় দ্রব্য পরস্পর দূরে থাকিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহার formula নিউটন দিয়া গিয়াছেন। সে formulaটিতে কোন অপূর্ণতা আছে বলিয়াই মনে হয় না। যে-কোন দুইটা দ্রব্যের মধ্যে উহা অক্লেশে প্রয়োগ করা চলে ; এবং গণনাফলে ও দৃষ্ট ফলে কোন ভেদ হয় না। সূর্য্যের সম্মুখে পৃথিবীর গতিবিধি বা পৃথিবীর সম্মুখে চন্দ্রের গতিবিধি অক্লেশে গণিতে পারা যায়। যে-কোন স্কুলের ছেলের পাটীগণিতে একটু জ্ঞান আছে, সে-ই অক্লেশে ইহা গণিয়া দিতে পারে। কিন্তু দুইটার উপরে তিনটা দ্রব্য হইলেই,—সূর্য্যের পাশে পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়কে রাখিয়া হিসাব করিতে গেলেই গণনা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। তখন পাটীগণিতে কুলায় না, Problem of Three Bodies সমাধান করিতে লাপ্লাসের মাথা আবশ্যক হয়। আর Problem of Four Bodies, চারিটা দ্রব্যের পরস্পরের

সম্পর্কে গতিবিধি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে লাপ্লাসের মাথাতেও কুলায় না ; তখন approximate solutionএ—মোটা উত্তরেই তৃপ্ত থাকিতে হয়। অথচ formula সেই একটি, নিউটন যাহা বাঁধিয়া দিয়াছেন। ত্রুটি নিউটনের formulaর নহে ; ত্রুটি গণিত-বিদ্যার। এ-কালের গণিত-বিদ্যা অতি প্রচণ্ড অস্ত্র। কিন্তু জটিল জগদ্‌যন্ত্রের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিতে গিয়া উহাকেও পরাহত হইয়া আসিতে হয়। বিজ্ঞান-বিদ্যার বর্ত্তমান অবস্থায়, বর্ত্তমান অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম গণনা সর্ব্বত্র সাধ্য না হইলেও জড় জগতের ঘটনাবলী যে সম্পূর্ণ নিয়মবদ্ধ, উহার কোন স্থানে কোন ফাঁক নাই, উহাব সর্ব্বত্র determinism, সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ মাত্র করেন না। প্রাণের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া যাঁহারা Mechanist, তাঁহারা বিশ্বাস করেন এবং আশা করেন যে, প্রাণের সমুদায় তত্ত্বও fully determinate ; —সম্প্রতি আমরা formulaয় ফেলিতে পারি আর না পারি, গণনা করিতে পারি আর না পাবি, প্রাণসংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা জড় জগতের অন্যান্য ঘটনার ন্যায় সমাধানযোগ্য ; উহা স্বভাবতঃ indeterminate নহে। পক্ষান্তরে যাঁহারা Vitalist, তাঁহারা এইটুকু মানিতে চাহেন না। তাঁহারা জোরের সহিত বলিতে চাহেন,—প্রাণি-দেহ যখন জড় পদার্থে নির্ম্মিত, যখন উহাতে সাধারণ জড়-ধর্ম্মগুলি বিদ্যমান আছে, তখন উহার কিয়দংশ physical scienceএর বা mechanical scienceএর আলোচ্য হইতে পারে বটে ; এখনও আলোচ্য হইতেছে, এবং পরে আরও হইবে, ইহা স্বীকার করি বটে ; কিন্তু প্রাণের যাহা বিশিষ্টতা, যাহাতে প্রাণের প্রাণত্ব, তাহা কখনই physical scienceএর আমলে আসিবে না, কখন formulaয় ধরা দিবে না, কখনও গনণাযোগ্য হইবে না। উহা স্বভাবতই গণনার অযোগ্য, স্বভাবতই indeterminate এবং incalculable ; উহাতে কোন নিয়মের আবিষ্কার করিতে পারিবে না ; উহা চিরকালই খেয়ালের সামগ্রী থাকিবে। উহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম freedom। প্রাণবাদীরা এই গণনার অযোগ্য, বিধিবহির্ভূত ব্যাপারেরই নাম দিয়াছেন vital force ; তাঁহাদের মতে উহা বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচ্য অন্যান্য forceএর সজাতীয় নহে।

আপনারা creation আর evolution, এই দুইটা কথা শুনিয়াছেন। বাঙ্গালায় evolutionকে অভিব্যক্তি বা পরিণতি বলা যাইতে পারে,

এবং creationকে সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। আমি এ পর্য্যন্ত সৃষ্টি শব্দ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়াছি। সর্ব্বদা অতি সাবধানে প্রয়োগ করিয়াছি। সর্ব্বত্র উহাকে এই creation অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি। এই creation বা সৃষ্টি বস্তুতই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, nothing হইতে somethingএর উৎপত্তি। আপনি হয়ত বলিবেন, এই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি unthinkable, চিন্তার অগম্য। অতএব উহা বাজে কথা। বাজে কথা হোক আর না হোক, পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তি, অধিকাংশ মাঝারি মানুষ, আপনি যাহাকে চিন্তার অগম্য বলিতেছেন, তাহা অবলীলাক্রমে মানিয়া আসিতেছে। ইহুদীদের এবং খ্রীষ্টানদের সমুদয় শাস্ত্রটা এই creation তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিছুই ছিল না, বিধাতা পুরুষের খেয়ালে এক দিন সবই হইল, ইহাই ইহুদীদের এবং খ্রীষ্টানদের সৃষ্টিতত্ত্ব। সূক্ষ্মভাবে সন্ধান করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন, আমাদের ব্রাহ্মণের শাস্ত্রও এই সৃষ্টিতত্ত্ব মানিয়া লইয়াছে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব বা creation-তত্ত্বের পাশাপাশি evolution-তত্ত্ব বা পরিণতি-তত্ত্বও আছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ আছে। সৃষ্টিবাদে বলে,—অসৎ হইতে সৎ হইতে পারে ; পরিণতিবাদ বলে,—অসৎ হইতে সৎ হয় না ; সতের বিকারে, সতের পরিণতিতে সতের মূর্ত্তি বদল হয় মাত্র। যাহা ছিল, তাহাই থাকে ; তবে মূর্ত্তি বদল করিয়া রূপান্তরিত হইয়া থাকে। Evolution ব্যাপারটা যাহা ছিল, তাহারই নূতন করিয়া সাজান-গোছান ব্যাপার, একটা re-arrangementএর ব্যাপার মাত্র। বিজ্ঞান-বিদ্যা এই পরিণতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। উহার ধ্রুবত্বে সংশয় করিলে, বিজ্ঞান-বিদ্যা দিশাহারা হইয়া যায়, কক্ষভ্রষ্ট হইয়া যায়। Re-arrangement ব্যাপারে নিয়মের আবিষ্কার চলে—creation কেবলই খেয়ালের ব্যাপার। এই পরিণতিবাদ বুঝাইতে গিয়া বলা হয়, ব্যাবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা দ্বারা, chain of causationএর দ্বারা আবদ্ধ। ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যের বাঁধা সম্পর্ক দেখা যায়। পূর্ব্বতন কারণ হইতে পরবর্ত্তী কার্য্যকে উৎপন্ন দেখা যায়। উৎপন্ন হয় না-ই বা বলিলাম। কার্য্য, কারণকে অনুসরণ করে, এইরূপ দেখা যায়। কোন্ কারণের পর কোন্ কার্য্য উপস্থিত হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণে পাওয়া যাইবে। ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণে তাহার সন্ধান মিলিবে। প্রত্যুত দেখা যাইবে, আজি

যে কারণের পর যে কার্য্য উপস্থিত হয়, ভবিষ্যতেও সেই কারণের পর সেই কার্য্য উপস্থিত হয়। ইহাকেই ইংরেজীতে বলে uniformity of nature। আমাদের দেশে বলে নিয়তি। আর একটি সুন্দর নাম আছে, তাহার নাম ঋত; অর্থাৎ orderly sequence of phenomena in nature। অমুক কারণ হইতে অমুক কার্য্য কেন উৎপন্ন হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা বিজ্ঞান-বিদ্যা করেন না। তবে কোন্ কারণের পর কোন্ কার্য্য উপস্থিত হয়, তাহা অবধানের সহিত দেখিয়া, সেই কারণ ও কার্য্যের পরম্পরাকে সূত্রবদ্ধ, formula-বদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। এ কথাগুলা নূতন কথা নহে। পূর্ব্বেই আমি ইহার আলোচনা করিয়াছি এবং এই নিয়তির শৃঙ্খলা, এই determinism গোড়ায় মানিয়া লইতে বিজ্ঞান-বিদ্যা কেন বাধ্য, ইহা মানিয়া না লইলে ব্যাবহারিক বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ কেন অচল হয়, তাহা বুঝাইবারও চেষ্টা করিয়াছি। সে সকল কথার পুনরুত্থাপনের প্রয়োজন নাই। প্রাণের সমস্যা বৈজ্ঞানিকের formulaর মধ্যে ফেলিতে হইলে কিরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাচক্রে পরবর্ত্তী প্রাণের উৎপত্তি হয়, তাহার সন্ধান করিতে হইবে। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সেই ঘটনাচক্রের একবার সন্ধান পাইলে বৈজ্ঞানিক জোরের সহিত বলিতে পারিবেন, আমি বুদ্ধিবলে সেই ঘটনাচক্র উপস্থাপিত করিয়া প্রাণের উৎপাদন করিব। এক কথায় বিজ্ঞান-বিদ্যা বলিতে চাহেন, একবার আমাকে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রাণোৎপাদনের formulaগুলি গড়িতে দাও, এবং প্রাণ-প্রবাহের formulaগুলি গড়িতে দাও, এবং সমস্ত data সংগ্রহ করিতে দাও, তাহা হইলে কোন্ তারিখে, কোথায় প্রথম প্রোটোপ্লাজমের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা ত বলিবই। উপরন্তু কাইসার উইলিয়ম লড়াইয়ে হটিয়া কোন্ তারিখে prussic acid খাইয়া আত্মহত্যা করিবেন, তাহাও নিঃসংশয়ে বলিয়া দিব।

যাঁহারা creation-বাদী, তাঁহারা বলিবেন, হাঁ হাঁ, ব্যাবহারিক জগতের কিয়দংশ নিয়মবদ্ধ, সূত্রবদ্ধ করিতে পারিব, কিন্তু সমস্তটা পারিব না। ব্যাবহারিক জড় জগতের অভ্যন্তরেও স্থানে স্থানে খাপছাড়া miracle দেখা যাইবে। উহা কোন formulaয় আবদ্ধ হইবে না। কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার মাঝে মাঝে ছাঁট দেখা যাইবেই। আগাপিছার সহিত সেখানটার কোন স্থায়ী সম্পর্ক আবিষ্কার করিতে পারা যাইবে না। সমস্ত antecedents দেওয়া থাকিলেও ঐ consequent ঘটিবে, কি ঘটিবে না,

তাহা বলিতে পারা যাইবে না। তাঁহাদের মতে বস্তুতই ব্যাবহারিক জগতের স্থানে স্থানে ঐরূপ কাট-ছাঁট আছে। সেইখানেই miracle, সেইখানেই special creation, সেইখানেই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি। কেন না, উহার আবির্ভাব সম্পূর্ণ একটা অভিনব ঘটনা। কোনরূপ পূর্ব্বতন ঘটনা হইতে গণনা দ্বারা উহার নির্দ্দেশ হয় না। তাঁহাদের মতে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঐরূপ একটা special creation, বিধাতা পুরুষের সম্পূর্ণ একটা খেয়াল। কেবল আবির্ভাবটাই খেয়াল কেন, প্রাণের যেটুকু বিশিষ্টতা, তাহাও আগাগোড়া খেয়াল। সার্ অলিভার লজের মত ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিকও একঘ'রে হইবার ভয় পরিত্যাগ করিয়া ঐ রকমের কথা বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন,—হাঁ হা ; প্রাণীর দেহে যাবতীয় জড়-ধর্ম্ম বিদ্যমান বটে। ধর না কেন, conservation of energy। কোন দ্রব্য কোনরূপেই এই energyর পরিমাণে কণিকা মাত্র বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। প্রাণীরাও এক কণিকা energy উৎপাদন করিতে বা ধ্বংস করিতে পারে না। অথচ দেখা যায়, energyর পরিমাণে তারতম্য না ঘটাইয়াও energyকে ভিন্ন মুখে পরিচালন করিবার স্বাধীন ক্ষমতা প্রাণীর আছে। এই যে প্রাণ, ইহা স্বাধীনভাবে energyকে guide করিতে পারে, direct করিতে পারে, উহার গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে। এ বিষয়ে ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীন, সম্পূর্ণ free, কোনরূপ বাঁধা নিয়মের বশ নহে।

আপনারা মানুষের free will সম্বন্ধে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা শুনিয়াছেন। প্রুসিয়ার বিধাতা পুরুষ ইচ্ছা করিলে প্রুসিক এসিড খাইতে পারেন, অথবা না-ও পারেন। এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি খাইবেন, কি খাইবেন না, তাহা কেহ কস্মিন্ কালে কোনরূপে পূর্ব্বে গণিয়া বলিতে পারিবে না। আপনাদেরও বোধ করি তাঁহার এ বিষয়ে স্বাধীনতায় কোন সংশয় নাই। কিন্তু খাঁটি বিজ্ঞান-বিদ্যা এই স্বাধীনতা মানিতে চাহেন না। বিজ্ঞান-বিদ্যা বলিবেন, কাইসারের মাথার খুলির ভিতর অণুপরমাণু-ইলেক্‌ট্রনগুলা কিরূপ অবস্থায় কিরূপে ছুটাছুটি করিতেছে, তাহা জানিতে পারিলে আমি গণিয়া বলিব, তাঁহার স্নায়ুযন্ত্র তাঁহার মাংসপেশীকে সঞ্চালন করিয়া প্রুসিক এসিডের শিশি তাঁহার মুখে তোলাইবে কি না। তিনি প্রুসিক এসিড খাইবেন, কি না খাইবেন, তাহা তাঁহার মগজের তাৎকালিক অবস্থাসাপেক্ষ, এবং তৎকালে বাহির হইতে মগজে যেরূপ উত্তেজনার ধাক্কা

পড়িতেছে, তৎসাপেক্ষ ; সে বিষয়ে তাঁহার কোন স্বাধীনতা নাই। তাঁহার মগজের তাৎকালিক অবস্থা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নাই বলিয়া আমি এখন গণিতে পারিতেছি না। অবস্থা জানিলেও তদুপযোগী formula আজিও গড়িয়া উঠিতে পারি নাই। নতুবা কাইসারের চিত্তে হিরণ্যকশিপু দৈত্যের মত বিশ্বদ্রোহী বল থাকিলেও, নিয়তিনির্ম্মিত পাষাণস্তম্ভ হইতে কোন্ নরসিংহ নির্গত হইয়া তাঁহার কুক্ষি বিদারণ করিবে, তাহা কাগজে-কলমে কষিয়া গণিয়া দিতাম। বিজ্ঞান-বিদ্যার বর্ত্তমান অক্ষমতা সেই অপূর্ণতা-সাপেক্ষ। বিজ্ঞান-বিদ্যাকে পূর্ণ হইতে দাও, হতাশ হইও না। পথ খোঁজ। কোথাও কোন freedomএর অস্তিত্ব দেখিবে না।

আপনারা দেখিতেছেন, উভয় পক্ষের বিবাদ শেষ পর্য্যন্ত freedom এবং determinism লইয়া। প্রাণ-পদার্থ নিয়তির অধীন বটে কি না, তাহা লইয়াই ঝগড়া। যদি প্রাণ পদার্থ সর্ব্বতোভাবে নিয়তির অধীন না হয়, যদি উহাতে বিন্দু মাত্র স্বাধীনতা থাকে, তাহা হইলে প্রাণীর আবির্ভাব একটা creation, একটা miracle ; এবং ভূপৃষ্ঠে যে প্রাণের প্রবাহ, তাহাও একটা perpetual miracle। এখন দেখিতে হইবে, প্রাণে এমন কোন বিশিষ্টতা আছে কি না, যাহাকে জড়-ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না, যাহা স্বভাবতঃ জড়-ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, যাহাকে কখনও কোন formulaতে ফেলিতে পারা যাইবে না। আসুন, একবার সেই পথে চলি।

গোড়াতেই আমি বলিয়াছি, জগতে আবির্ভূত হইয়াই প্রাণীগুলা খাই খাই করিয়া উঠিয়াছিল। আমি যে প্রশ্ন তুলিয়াছি, যদি তাহার উত্তর সম্ভব হয়, হয়ত এইখানেই উত্তর মিলিবে। এই খাই-খাই করাটাই প্রাণের বিশিষ্ট লক্ষণ। বস্তুতই প্রাণ এই ক্ষুধা লইয়া জগতে আবির্ভূত হইয়াছে। এই ক্ষুধা—বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ; কিছুতেই ইহা মেটে না, এবং কোন কালেই ইহা মিটিবে না। যদি কখন মেটে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, প্রাণ তাহার বিশিষ্টতা হারাইয়াছে। ধরিয়া লইলাম, প্রাণ একদিন হঠাৎ জড় জগতে আবির্ভূত হইল। আবির্ভূত হইয়াই দেখিল যে, জড় জগৎ আপনার বিশাল প্রাণহীন কায় লইয়া সম্মুখে উপস্থিত আছে। প্রাণ সেই জড় জগৎকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে চায়। জড়েরই কিয়দংশ লইয়া আপনার দেহ নির্ম্মাণ করিয়া, সেই দেহে কতকগুলি বিশিষ্ট শক্তি অর্পণ করিতে চায়। প্রাণ প্রাণহীন জড় পদার্থকে প্রোটোপ্লাজমে পরিণত করে।

প্রোটোপ্লাজমের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নাই। উহাকে আমি প্রাণি-পদার্থ বলিয়া আসিতেছি। তদ্ভিন্ন জড় পদার্থকে আমি জড় পদার্থই বলিব। প্রাণ দেখিল,—এই জড় পদার্থকেই হজম করিয়া আত্মসাৎ করিতে হইবে, জড় পদার্থকেই প্রাণি-পদার্থে পরিণত করিতে হইবে। সেই ক্ষমতা সে রাখে। ইহাই তাহার বিশিষ্টতা। যদি miracleই বলিতে হয়, ইহাই miracle। প্রাণ সমস্ত জড় জগৎকে হজম করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া এই প্রাণি-পদার্থে পরিণত করিতে চায়; সমস্ত জড় জগৎকে আত্মসাৎ করিয়া একটা প্রাণময় জগতে পরিণত করিতে চায়;—ইহাই তাহার ক্ষুধা। এই ক্ষুধা মিটিলে তাহার অন্য কোন কাজই থাকে না। কাজেই এ ক্ষুধা মিটিবে না। সমস্ত জড় জগৎ যত ক্ষণ প্রাণময় না হইবে, তত ক্ষণ প্রাণীর এই ক্ষুধা মিটিবে না। আবির্ভূত হইয়াই প্রাণ এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; যেন সুপ্তোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে চায়। কিন্তু প্রবৃত্ত হইয়াই দেখে, একটা প্রকাণ্ড বিরোধ। সমস্ত জড় পদার্থকে সে হজম করিতে পারে না। জড় পদার্থের কিয়দংশ তাহাকে বাছিয়া লইতে হয়। কয়লা আর অক্সিজন, হাইড্রোজন আর নাইট্রোজন আদি তুচ্ছ পদার্থ। হীরা জহরত আপনি কোটি মূল্যে খরিদ করেন। অথচ বদরীদাস মোকিম বাহাদুরও হীরা জহরতকে সিন্ধুকের মধ্যেই রাখিয়াছেন—চুনি-পান্না উদরসাৎ করিতে সাহস করেন নাই। তুচ্ছ কয়লা আর অক্সিজন পাইবার জন্য তিনি চব্বিশ ঘণ্টা বদন ব্যাদান করিয়া বসিয়া আছেন। পৃথিবীর বাহিরে যদি কোথাও প্রাণ থাকে, তাহার আচরণ কিরূপ, আমি জানি না। মঙ্গল গ্রহে যদি প্রাণী থাকে, সে হীরা-জহরত হজম করিতে পারে কি না, তাহাও আমি জানি না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে যে প্রাণের সহিত আমরা পরিচিত, সে প্রাণের ক্ষমতা এখানে ঐরূপে সীমাবদ্ধ। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাণের ক্ষমতা এখানে যে সীমাবদ্ধ, তাহা স্বীকার্য্য। এই স্বাভাবিক সঙ্কীর্ণতা হেতু প্রাণ জড় জগতের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া আত্মসাৎ করিতে পারে। অপর অংশকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। কিয়দংশ গ্রহণ করিতেছে, তাহাই উপাদেয়। অপরাংশ বর্জ্জন করিতেছে, তাহাই হেয়। এই উপাদেয় গ্রহণে এবং হেয় বর্জ্জনে প্রাণের চেষ্টা চলিতেছে। বর্জ্জনীয় অংশ সমীপে উপস্থিত হইলে উহাকে চেষ্টাপূর্ব্বক বর্জ্জন করিতে হয়। এইখানে একটা বিরোধ। কিন্তু ইহার অপেক্ষায় আরও গুরুতর বিরোধ আছে। প্রাণ যেমন জড়কে

আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে, জড়ও তেমনই অবিরাম প্রাণি-পদার্থকে জড় পদার্থে পরিণত করিতে চাহিতেছে। উভয়ের মধ্যে নিরন্তর একটা যুদ্ধ চলিতেছে। এক দিকে জড় পদার্থের উপাদেয় অংশ প্রাণের কবলে আসিয়া নূতন প্রাণি-পদার্থ উৎপাদন করিতেছে। অন্য দিকে জড়ের চেষ্টায় প্রাণি-পদার্থ সর্ব্বদা জড় পদার্থে পরিণত হইতেছে। নিরন্তর এই যুদ্ধ চলিতেছে। এই বিরোধের ধারাই প্রাণের প্রবাহ। প্রাণি-পদার্থের জড়ত্বে পরিণতির নামান্তর মৃত্যু; এই মৃত্যুই প্রাণের পরাজয়। প্রাণ পরাজয় স্বীকার করিতে চাহে না। জড়ও ছাড়িবার পাত্র নহে; প্রাণকে এক দিন পরাজয় করিবেই। অন্ততঃ এ-কালের বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, শেষ পর্য্যন্ত প্রাণের পরাজয় হইবেই। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক দিন ছিল, যখন প্রাণ ছিল না। প্রাণ থাকিলেও তাহা গুপ্তভাবে ছিল। প্রাণের আবির্ভাবের হয়ত চেষ্টা ছিল, কোনরূপ গুপ্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত হইবার হয়ত চেষ্টা ছিল; কিন্তু জড় তাহাকে আবির্ভূত হইতে দেয় নাই। যেরূপেই হউক, সহসা এক দিন প্রাণের আবির্ভাব হইল; তদবধি উভয়ের যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। জড় উহাকে পিষিয়া মারিয়া লুপ্ত করিবার বা গুপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু প্রাণ সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিয়া, অবহিত থাকিয়া, সহস্র কৌশল উদ্ভাবন করিয়া, সহস্র অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া লড়াই চালাইয়া আসিতেছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক দিন আসিবে, যখন প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভবপর হইবে। সমুদয় প্রাণি-পদার্থ আবার প্রাণহীন জড়ে পরিণত হইবে। মৃত্যু আসিয়া সমস্ত প্রাণকে লুপ্ত করিবে। বিজ্ঞান-বিদ্যার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে পারে। পৃথিবীতে প্রাণ এক দিন ছিল না, অথবা থাকিলেও অস্পষ্ট বা গুপ্ত অবস্থায় ছিল,—ইহা যখন নিশ্চয়, তখন ভবিষ্যতে প্রাণ আবার থাকিবে না, অথবা পুনরায় গুপ্ত হইবে, ইহাতে চমকাইবার হেতু নাই। শেষ যাহাই হউক, শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন বিলম্বিত করিবার জন্যই প্রাণের যাবতীয় চেষ্টা। এই চেষ্টার ইতিহাসই প্রাণের ইতিহাস। এই ইতিহাসের ব্যাখ্যানই Biology বা প্রাণবিদ্যা। ব্যাপারটা কি, ভাল করিয়া বুঝুন। প্রাণ চায়—সমস্ত জড়কে আত্মসাৎ করিতে; আত্মসাৎ করিয়া প্রাণময় করিতে। সমস্তকে আত্মসাৎ করিতে পারে না। কতকটা গ্রহণ, বাকীটা বর্জ্জন করিতে

হয়। তজ্জন্য একটা প্রয়াস, একটা বিরোধ স্বীকার করিতে হয়। জড় কিন্তু প্রাণকে বিনাশ করিতে চায়। এ বিষয়ে সে একেবারে নিষ্ঠুর, তাহার করুণা মাত্র নাই। আমরা প্রাণী, পদে পদে সেই নিষ্ঠুরতার ভুক্তভোগী। প্রাণ বলে, আমি জড়কে প্রাণময় করিব। জড় বলে, তুমি আমাকে প্রাণময় করিবে কি, আমি তোমাকে পিষিয়া মারিব। প্রাণ বলে,—আচ্ছা, দেখা যাক; আমি থাকিব, আমি কিছুতেই যাইব না। প্রাণের যেন একটা সঙ্কল্প আছে, একটা will আছে। ইহা তাহার will to live; যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে থাকিতেই হইবে। কোন-না-কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। কাজেই প্রাণ ঘোর স্বার্থপর। আপনাকে রক্ষা করা, আপনাকে বাঁচান তাহার এক মাত্র স্বার্থ। তদ্ব্যতীত তাহার অন্য কোন অর্থ নাই। ইহাতেই তাহার সার্থকতা, ইহাই তাহার এক মাত্র কর্ম্ম। কাজেই প্রাণ ঘোর স্বার্থপর। এই স্বার্থপরতাই প্রাণের বিশিষ্টতা—এই কথাটুকু আপনাদিগকে আমি অত্যন্ত জোরের সহিত বলিতে চাহি। এইখানেই ডারুইন-তত্ত্বের ভিত্তি। জড়ের এই অবিরাম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রাণ আজ পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় নাই; প্রত্যুত আপনাকে সর্ব্বত্র বিচিত্ররূপে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে।

একবার জড়ে নামিয়া আসুন। জড় দ্রব্যের মধ্যেও পরস্পর বিরোধের মত কতকটা দেখিতে পাইবেন। একটা জড় দ্রব্য অন্যকে ধাক্কা দেয় এবং নিজে ধাক্কা লয়। যেখানে ঘাত, সেইখানে প্রতিঘাত। জড় দ্রব্য নিজে বিকৃত হয়, অন্যকেও বিকৃত করে। গ্রহ উপগ্রহ পরস্পর ঠেলাঠেলি করে, চুম্বকের কাঁটা পরস্পর ঠেলাঠেলি করে, অণু পরমাণু electron পরস্পর ঠেলাঠেলি করে। কাজেই জড় দ্রব্যের মধ্যেও পরস্পর একটা বিরোধের মত আছে। তা ত থাকিবেই। গোড়াতেই বলিয়াছি, জড়ের ধর্ম্ম impenetrability; একটা জড় দ্রব্য আর একটা জড় দ্রব্যে অনুস্যূত, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উভয়ে ষোল আনা মিশিয়া যাইতে পারে না। মিশিতে পারিলে তাহাদের অস্তিত্বই ব্যর্থ হইত। পূর্ব্বের কথা মনে করিয়া দেখুন। সমাকার আকাশকে বিষমাকারে চিহ্নিত করাতেই যখন উহাদের অস্তিত্বের সার্থকতা, তখন আকাশের এই চিহ্নগুলি পরস্পর মিশিয়া গেলে তাহাদের কোন চিহ্নত্বই থাকিত না। দুইটা জড় দ্রব্য যখন মিশিবে না, তখন পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধান থাকিবেই।

সেই ব্যবধানের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে তাহাদের গতিবিধি। সেই ব্যবধানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পাদনই উহাদের ঠেলাঠেলি, উহাদের বিরোধ। কিন্তু এই যে বিরোধ, ইহা formulaয় ফেলা চলে। কোন্ ক্ষেত্রে বিরোধের মাত্রা, ঠেলাঠেলির মাত্রা কতটুকু হইবে, ইহা গণিয়া বলা চলে। ইহা বাঁধা-ধরা আছে। ইহার মধ্যে অণু মাত্র element of incalculability বা uncertainty নাই। কোনরূপ chanceএর বা gamblingএর element নাই। আপনারা দুই পালোয়ানের কুস্তি দেখিতে বসিয়াছেন। তাহাদের উভয়ের মধ্যে গোপনে যদি বন্দোবস্ত থাকে যে, আমরা উভয়ে এইরূপে হাত-পা নাড়িব এবং আমাদের এতটুকু হার-জিত হইবে, সে লড়াইএ আপনার কোন কৌতূহল থাকে কি? তাহারা যে লড়াই করে, নিতান্তই উদাসীনের মত লড়াই করে। বাহিরে একটা লড়াইএর অভিনয় হয় বটে, কিন্তু ভিতরে কোন আন্তরিকতা থাকে না। যে হারে, সে নিতান্ত উদাসীনের মত হারে। যে জিতে, সে নিতান্ত উদাসীনের মত জিতে। জড় দ্রব্যের পরস্পর লড়াই সেইরূপ উদাসীনের লড়াই। একবারে ধরা-বাঁধা কাটা-ছাঁটা। ইহাতে কোনরূপ বৈচিত্র্য নাই। নতুবা ক্রিকেট বলের বা বিলিয়ার্ড বলের অঙ্ক Dynamicsএর বহিতে স্থান পাইত না। হিমাচল যখন ভূগর্ভের ঠেলা পাইয়া গা তুলিয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে উঠিয়াছিলেন। যতটুকু ধাক্কা পাইয়াছিলেন, তাহাতে যতটুকু উঠা উচিত, ঠিক ততটুকুই উঠিয়াছিলেন। যদি বা পাল্টা ধাক্কা দিয়া থাকেন, তাহাও ঠিক সমুচিত মাত্রামত। আবার তিনি যে বহু লক্ষ বা বহু কোটি বৎসর ধরিয়া ঝড় বৃষ্টি তুষারে বুক পাতিয়া বসিয়া আছেন, শত স্রোতস্বিনী বুক চিরিয়া তাঁহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিতেছে, তাঁহাকে গুঁড়া করিয়া মাটি করিতেছে, তাহাতে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই, কোন দুঃখ নাই, আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা নাই। যদি কিছু বাধা দেন, তাহার পরিমাণ পাটীগণিতের অঙ্কে ধরা পড়িবে। জড় দ্রব্যের মধ্যে যদি কোন বিরোধ থাকে, সেই বিরোধের মধ্যে এই ঔদাসীন্য। বিরোধটাকে যখন formulaয় ফেলা চলে, তখন এই ঔদাসীন্য না থাকিয়া পারে না। জড় দ্রব্যে আত্মরক্ষার, আপনার বিশিষ্টতা রক্ষার, আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিবার কোন উদ্যমেরই পরিচয় পাওয়া যায় না। বিকারের হেতু আছে, অথচ বিকৃত হইব না, এরূপ কোন স্পষ্ট উদ্যম জড় দ্রব্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আপনাদিগকে বলিয়াছি, প্রাণ জড়কে আত্মসাৎ করিতে চায় বটে, কিন্তু আত্মসাৎ করিতে গিয়া জড়ের কিয়দংশকে গ্রহণ করে, কিয়দংশকে বর্জ্জন করে। প্রাণের একটা বাছাই করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আছে; ইহা যেন preferential choice। জড় দ্রব্যেও এইরূপ একটা কিছু দেখা যায়। প্রত্যেক রসায়নবেত্তা পণ্ডিত তাহা জানেন। অক্সিজন হাইড্রোজনকে বাছিয়া লইতে চায়, নাইট্রোজনকে বর্জ্জন করিতে চায়। ইহাও একটা preferenceএর ব্যাপার, নির্ব্বাচনের ব্যাপার। এই বাছাই করিবার প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই জড়জগতে যৌগিক পদার্থের লক্ষ রকমের প্রকারভেদ। কিন্তু এখানেও সেই ঔদাসীন্য। এই choiceএর মাত্রাও সর্ব্বত্র পরিমিত; একবারে কাটা-ছাঁটা, formula-বদ্ধ; একটু এদিক্-ওদিক্ হইবার যো নাই। কোনরূপ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির পরিচয় নাই। অক্সিজনে হাইড্রোজন মিশাইয়া আগুন দিবা মাত্র উহাকে বিকৃত হইয়া জলে পরিণত হইতেই হইবে; কোনরূপ দ্বিধা করিলে চলিবে না; আট ভাগের সহিত এক ভাগকে মিলিতেই হইবে; দ্বিধা করিলে চলিবে না। এই বিকারে উহা সম্পূর্ণ ভাবে উদাসীন। জড় দ্রব্য অন্য জড় দ্রব্যকেও এক হিসাবে হজম করে এবং আত্মসাৎ করে। অন্য দ্রব্যকে বিকৃত করে এবং নিজেও বিকৃত হয়। জল চিনিকে এক রকম হজম করিয়া ফেলে। সাল্‌ফিউরিক এসিড তামা দস্তা হজম করে; আত্মসাৎ করে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু অন্যকে বিকৃত করিতে গিয়া আপনাকে অবিকৃত রাখিতে পারে না, আত্মরক্ষা করিতে পারে না, আপনার বিশিষ্টতা বজায় রাখিতে পারে না। কোন্‌টার কতটুকু বিকার হইবে, প্রত্যেক chemist তাহা জানেন; এবং জানেন বলিয়াই তাহাদের দ্বারা স্বকর্ম্ম সাধন করাইয়া লন। এখানেও formula বাঁধা আছে। জড়ের যে ক্ষুধার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা উদাসীনের ক্ষুধা। জড় পদার্থ উদাসীন সন্ন্যাসী;—মার তাহাকে, রাখ তাহাকে, তাহার কোন চাঞ্চল্য নাই—কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। যদি হাসে, তাহাও বাঁধা হাসি; যদি কাঁদে, তাহাও বাঁধা কাঁদা;—জড় পদার্থ একবারে উদাসীন মহাদেব।

আপনারা আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া-পরম্পরার কথা নিশ্চয় শুনিয়াছেন। বাহিরের উত্তেজনায় জন্তুর দেহে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। বাহির হইতে ডাক পড়িলে জন্তুদেহ সাড়া দেয়। উত্তেজনার

মাত্রাধিক্যে চাঞ্চল্য অবসাদে পরিণত হয়; অধিক অবসাদে মৃত্যু আনে। আচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, উদ্ভিদের দেহেরও ঠিক এইরূপ সাড়া দিবার ক্ষমতা আছে। উত্তেজনার ফলে চাঞ্চল্য; মাত্রাধিক্যে অবসাদ, অবশেষে মৃত্যু;—উদ্ভিদেরও এই সকল আছে। হয়ত নিতান্ত প্রাণহীন জড় ধাতু দ্রব্যেরও—তামা-দস্তার মত ধাতু দ্রব্যেরও এইরূপ চাঞ্চল্য, অবসাদ, মৃত্যু ঘটে। ক্লোরোফরমে, আল্‌কহলে, আফিমে যেমন আমাদের মগজের ভিতর কিলবিল করিয়া চাঞ্চল্য আনে বা অবসাদ আনে, উদ্ভিদেরও সেইরূপ ঘটে; হয়ত ধাতুখণ্ডেও ঘটে। এ সকল নূতন তথ্য আগে কেহ জানিত না। এখন হয়ত অনেকে বলিয়া উঠিবেন, প্রাণিদেহ যখন জড় পদার্থেই নির্ম্মিত, জড় দ্রব্য মাত্রই যখন আঘাতে প্রতিঘাত দেয়, তখন ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? ঠিক কথা; বিস্ময়ের বিষয় নাই বটে, কিন্তু জন্তুদেহে যে চাঞ্চল্য, যে ছটফটি, অতি সামান্য উত্তেজনায় যে ধুকধুকনি প্রতিনিয়তই আমাদের পরিচিত, দুই চারিটা স্থল ব্যতীত উদ্ভিদের দেহে এরূপ চাঞ্চল্য এ পর্য্যন্ত কে জানিত? পৃথিবীর যাবতীয় শরীরবিদ্যাবিৎ ইহার সন্ধানে ব্যাকুল ছিলেন; কই, কেহ ত এ পর্য্যন্ত সন্ধান পান নাই। ধাতুদেহেও ঐরূপ উত্তেজনায় যে ঐ-জাতীয় চাঞ্চল্য আসিতে পারে, তাহা বোধ করি কল্পনারও অগোচর ছিল,—এখন উহা প্রতিপন্ন না হইলেও অন্ততঃ আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িতেছে। ঐরূপ চাঞ্চল্য বা অবসাদ দেখিয়া যদি প্রাণের অস্তিত্ব আরোপ করিতে হয়, তাহা হইলে জড় দ্রব্যেও প্রাণ আছে কি না, তাহা আলোচনাযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি,—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যাবতীয় জড়দেহে চৈতন্যের আবিষ্কার করিয়াছেন,—লোকমুখে এইরূপ কথা শুনিয়া যাঁহারা নিরুপম তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এইখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, পূজনীয় আচার্য্য সেরূপ কিছুই করেন নাই। কোন দ্রব্যে চেতনা আছে কি না, বিজ্ঞান-বিদ্যা—Physical Science সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে পারে না; উহা বিজ্ঞান-বিদ্যার অধিকার-বহির্ভূত ও সাধ্যাতীত। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক;—তিনি প্রাণিদেহ ও জড়দেহ, এই দুইয়ের মধ্যে উত্তেজনার সহিত চাঞ্চল্যের ও অবসাদের সম্পর্ককে formula-বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেখানে কেহ formula বাঁধিতে পারে নাই, সেখানে তিনি formula

বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাণিদেহের অতিসূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যন্ত্রাঙ্গের মত তাঁহার আদেশ মাত্রে পরিচালিত হইতেছে। তিনি বাজিকর; বন-মানুষের হাড় ঠেকাইয়া তিনি যাহাকে যেরূপে নাচাইতেছেন, সে সেইরূপেই নাচিতেছে। তাঁহার আদেশে প্রাণ তাহার উগ্র স্বাধীনতা সংযত করিয়া জড়তার শিকলে বাঁধা পড়িতেছে; এবং আচার্য্য সেই শিকল ধরিয়া বসিয়া আছেন। এক দল পণ্ডিতে জন্তুদেহে ও উদ্ভিদের দেহে, প্রাণিদেহে ও জড়দেহের মধ্যে দেওয়াল তুলিয়া উভয়কে দুই স্বতন্ত্র কোঠার মধ্যে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি সেই দেওয়াল ভাঙ্গিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেরূপ কোন প্রাচীর তোলা চলিবে না; উভয়কেই শেষ পর্য্যন্ত এক কোঠায় রাখিতে হইবে। জড় দ্রব্যে চেতনার আবিষ্কার দূরের কথা, জড় দ্রব্যে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রাণের আরোপও তিনি করেন নাই; বরং প্রাণিদেহের সংযমহীন আচরণকে তিনি জড়তার শৃঙ্খলায় বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের কাজই তাহাই; যেখানে কোন শৃঙ্খলা ছিল না, সেখানে শৃঙ্খলা স্থাপন, যেখানে নিয়ম ছিল না, সেখানে নিয়মের প্রতিষ্ঠা। জড় দ্রব্যে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রাণ আছে কি না, বৈজ্ঞানিক তাহা দেখিবেন না; প্রাণের আচরণকে জড়তার শৃঙ্খলে কতটা বাঁধা যাইতে পারে, বৈজ্ঞানিক তাহাই দেখিবেন। বৈজ্ঞানিকের প্রতিজ্ঞা এই যে, শেষ পর্য্যন্ত তিনি প্রাণী মাত্রকে automaton বা স্বয়ঞ্চল যন্ত্ররূপে দেখিবেন; ইহার অভ্যন্তরে কোন mysterious পদার্থের স্থাপন করিতে দিবেন না। যাঁহারা প্রাণবাদী বা vitalist, তাঁহারা এ স্থানে আর একটা গুরুতর প্রশ্ন তুলিবেন। তাঁহারা বলিবেন, মানিয়া লইলাম যে, এক খণ্ড তামা বা দস্তা একটা জন্তুর মত বা একটা গাছের পাতার মত বাহিরের তাড়নায় চঞ্চল হইয়া উঠিতে পারে; উত্তেজনার আতিশয্যে অবসন্ন হইতে পারে; মদের নেশায় অভিভূত হইতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও গূঢ়তর প্রশ্ন এই যে, এইরূপ উত্তেজনা হইতে আত্মরক্ষার কোন প্রয়াস জড় দ্রব্যের পক্ষে আছে কি না? জন্তু এবং উদ্ভিদ্, অর্থাৎ প্রাণী মাত্র বাহিরের ধাক্কায় চঞ্চল হয় বটে এবং অবসন্ন হয় বটে, কিন্তু সেই উত্তেজনা এড়াইবার জন্য ভিতর হইতে তাহার একটা চেষ্টা দেখা যায়। সেই উত্তেজনা বা অবসাদ যদি তাহার পক্ষে হানিকর হয়, তাহা হইলে সেই উত্তেজনা বা অবসাদ এড়াইবার জন্য সে আপনাকে প্রস্তুত করে। তদুচিত নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবন করে। সঙ্গে সঙ্গে

এড়াইতে না পারিলেও ভবিষ্যতে এড়াইবার জন্য প্রস্তুত হয়। প্রাণী মাত্রেরই এটা সাধারণ ধর্ম্ম। বাহিরের উত্তেজনা যদি তার পক্ষে শুভ হয়, তাহা হইলে সে উত্তেজনা তাহার উপাদেয় হয়। যদি অশুভ হয়, তাহা হইলে তাহা হেয় হয়, সে তাহা এড়াইতে চায়। উত্তেজনা গ্রহণে বা বর্জ্জনে প্রাণী কখনও উদাসীন হয় না। উদাসীন হইলে প্রাণি-জগতে অভিব্যক্তি—evolution সম্ভবপর হইত না। এ প্রবৃত্তি প্রাণীর আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। প্রাণীর যেন একটা স্বার্থ আছে। আত্মরক্ষাই সেই স্বার্থ। তাহার যাবতীয় চেষ্টা সেই স্বার্থরক্ষার অনুকূল। প্রাণহীন জড় দ্রব্যে এইরূপ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি কিছু আছে কি না, তাহাই হইল গুরুতর প্রশ্ন। সহসা ইহার উত্তর দেওয়া চলে না। প্রাণীর একটা স্বার্থ আছে। খাঁটি জড়ে সেরূপ স্বার্থ বলিয়া কিছু আছে কি? প্রাণী আপনাকে বাঁচাইতে চায়। প্রাণহীন জড়ের পক্ষে সেরূপ উক্তি চলে কি? আঘাতে চঞ্চল হওয়া, আঘাতের মাত্রাধিক্যে অবসন্ন হওয়া, এটা খাঁটি জড়ধর্ম্ম, তাহাতে সংশয় নাই। যে-কোন স্থিতিস্থাপক দ্রব্যে—elastic bodyতে ইহা দেখা যায়। ধাক্কা খাইয়া elastic body স্বভাবচ্যুত হয়। উত্তেজনার অপগমে আবার স্বভাবে ফিরিয়া আসে। কিন্তু limit of elasticity পার হইলে আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। ইহাকেই জড় দ্রব্যের অবসাদ বা মৃত্যু বলা যাইতে পারে। ইহা জড় দ্রব্য মাত্রেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। Dynamics-বিদ্যা তাহা জানেন। জড়ধর্ম্মী প্রাণিদেহে বাহিরের উত্তেজনায় চাঞ্চল্য বা অবসাদ যতই জটিল হোক, তাহাতে বিস্ময়ের হেতু নাই। এই চাঞ্চল্যেই হয়ত তাহার প্রাণের স্ফূর্ত্তি এবং এই অবসাদই তাহার ব্যাধি। অবসাদটা স্থায়ী হইলেই তাহার মৃত্যু। প্রাণিদেহ চঞ্চল হয়, অবসন্ন হয়, পরিশেষে অগত্যা মরিয়া যায়, ইহা সত্য বটে। স্বীকার করিলাম, ইহার ষোল আনাই জড়ধর্ম্ম; চাঞ্চল্য এবং অবসাদ এবং মৃত্যু, সমস্তই নিয়মবদ্ধ জড়ধর্ম্ম। কিন্তু এই মরণকে এড়াইবার, এই মরণকে জয় করিবার যে একটা উৎকট চেষ্টা প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান আছে, তামার কি দস্তার টুকরায়, ইটে কি পাথরে তাহার কোন পরিচয় আছে কি? তাহার পরিচয় পাইবার আদৌ কোন সম্ভাবনা আছে কি? প্রাণিপদার্থে যে আছে, সে বিষয়ে ত কোন সংশয় নাই। আছে বলিয়াই ত প্রাণের এই বিচিত্র বিকাশ। এই প্রবৃত্তি যদি না থাকিত, তাহা হইলে Biology-বিদ্যার আলোচনযোগ্য

ত বিশেষ কিছু থাকিত না। সমস্ত জড় জগৎ প্রাণকে নষ্ট করিবার জন্য দিবানিশি অবিরাম নিযুক্ত আছে। অসংখ্য প্রাণী দিবানিশি মরিতেছে; কিন্তু প্রাণ ত লুপ্ত হইতেছে না। এ যে রক্তবীজ। এক ফোঁটা রক্ত-কণিকা হইতে সহস্র কণিকা উদ্গত হইয়া, সহস্র মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া, কত নূতন রকমের অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া, পুনরায় জড় জগতের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছে। প্রাণী মরিতেছে বটে, কিন্তু প্রাণ ত এ পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় নাই। এই যে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, এই যে আত্মবর্দ্ধনের প্রবৃত্তি, এই যে বিশ্বগ্রাসের প্রবৃত্তি, এই যে বিশ্বগ্রাসের ক্ষুধা, এই যে সমস্ত জড় জগৎকে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণময় জগতে পরিণত করিবার চেষ্টা, ইহা ত চোখের উপরে দেখিতেছি। প্রাণের সহিত জড়ের এই যে যুদ্ধ, ইহা ত প্রত্যক্ষ ঘটনা, ইহা ত অস্বীকারের উপায় নাই। উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধ ত আছেই। এই বিরোধটাই ত প্রাণের বিশিষ্টতা। জড়ের সহিত জড়ের ঘাত-প্রতিঘাত আছে বটে, কিন্তু সে ত formulaয় বাঁধা ব্যাপার। তাহাতে নিত্য নূতনত্ব কই? দূর অতীতে যাহা ছিল, দূর ভবিষ্যতেও ত ইহা সেইরূপ থাকিবে। ইহা ত সনাতন ব্যাপার। একবার যাহা ঘটিয়াছে, পুনঃ পুনঃ তাহা ঘটিতেছে, এবং পুনরায় তাহা ঘটিবে। ইহার History কোথায়? যাবতীয় Historyতে যে বৈচিত্র্য আছে, যে নিত্য-নূতনের অবতারণা আছে, যাহা formulaয় বাঁধিতে গেলেও পরক্ষণেই formula অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে, জড় জগতে সেই History কোথায়, সেই নিত্য-নূতনত্ব কোথায়? প্রশ্নটা অতি গুরুতর। মনে রাখিবেন, বিজ্ঞান-বিদ্যা যখনই অতীত ও ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানের সহিত গাঁথিয়া একই সূত্রে, এক formulaয় বাঁধিয়া ফেলেন, তখনই অতীত তাহার পুরাতন ইতিহাস হারাইয়া ফেলে, ভবিষ্যতের অভূতপূর্ব্ব নূতন কাহিনী শুনিবার জন্য কেহ কৌতূহলের সহিত প্রতীক্ষা করে না। সবই ত formulaর মধ্যে নিবদ্ধ আছে। কাজেই প্রশ্নটা গুরুতর। প্রশ্নটা তুলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইলাম। উত্তর দিতে আমি অক্ষম। প্রাণকে একবারে জড়তার নিগড়ে বাঁধিয়া ফেলিয়া উহার History লোপ করা চলিবে কি না, কোনরূপ *a priori* যুক্তিতে তাহার উত্তর মিলিবে না। কোনরূপ *a priori* যুক্তি আশ্রয়ের ধৃষ্টতা আমার নাই। আমি বৈজ্ঞানিকতার স্পর্দ্ধা রাখি না; কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিকতা-জীবী বিজ্ঞানভিক্ষু। পর্য্যবেক্ষণ ও

পরীক্ষালব্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ ব্যাবহারিক বিদ্যায় আমার নিকট অগ্রাহ্য। বিজ্ঞান-বিদ্যা ভবিষ্যতে কি উত্তর দিবেন, তাহার প্রতীক্ষায় আমি বসিয়া থাকিব। যিনি জগতের এতগুলি আঁধার কুঠরির মধ্যে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া আলোকিত প্রবেশ-পথ বাহির করিয়াছেন, হয়ত তাঁহার কাছেই ইহার উত্তর পাইব।

প্রাণবাদীদের মতে প্রাণের যেন একটা স্বার্থ আছে, একটা উদ্দেশ্য আছে, একটা purpose আছে, একটা will আছে। প্রাণ থাকিতে চায়, টিকিতে চায়, আপনাকে বর্দ্ধন করিতে চায়, আপনাকে প্রসারিত করিতে চায়, বিশ্বমধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে চায়, বিশ্বকে গ্রাস করিতে চায়। এ বিষয়ে সে পদে পদে বাধা পায়; পদে পদে বিরোধ পায়। কিন্তু সেই বিরোধকে সে এড়াইতে চায়, অতিক্রম করিতে চায়। বিরোধের মধ্য দিয়া আপনাকে বর্দ্ধিত করিতে চায়। বিরোধকেও আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিযুক্ত করিয়া আপনার স্বার্থ অব্যাহত রাখিতে চায়। এই স্বার্থ কেবল টিকিয়া থাকা। কেবল টিকিয়া থাকা নহে, বিরোধ সত্ত্বেও আপনাকে বর্দ্ধিত করা। বিশ্ব তাহার বিরোধী। কিন্তু বিশ্বগ্রাসে সে উদ্যত। এই বিশ্বগ্রাসের ক্ষুধা তাহার অতৃপ্ত। বোধ করি, কোন কালে তৃপ্ত হইবে না। হইলে, সে দিন আর প্রাণ বলিয়া কিছু থাকিবে না।

আপনি হয়ত বলিবেন যে, যন্ত্র মাত্রের মধ্যেই ত একটা উদ্দেশ্য আছে। অত্যন্ত প্রাণহীন যন্ত্রেরও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দেখা যায়। একটা প্রচলিত দৃষ্টান্ত—steam engineএর মধ্যে safety valve। বাষ্পের চাপ মাত্রা ছাড়াইয়া বাষ্পের হাঁড়িকে ফাটাইবার উপক্রম করিবা মাত্র হাঁড়ির কপাটখানা বাষ্পের চাপে আপনা হইতেই খুলিয়া যায়। খানিকটা বাষ্প বাহির হইয়া গেলে বাষ্পের চাপ কমিয়া যায়। এঞ্জিনটাও আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পায়। ইহাই ত সেই এঞ্জিনের আত্মরক্ষা। ব্যাপারটা আপনা হইতেই ঘটিয়া যায়। উহা সম্পূর্ণভাবে automatic। প্রাণি-দেহও সেইরূপ automatic যন্ত্র মাত্র। পার্থক্য কেবল জটিলতায়। বাহিরের শক্তির আক্রমণ হইতে প্রাণিদেহ সর্ব্বদা আপনাকে রক্ষা করিতেছে। তাহার দেহাবয়বে কতকগুলা automatic যন্ত্র আছে বলিয়াই সে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতেছে। কাজেই প্রাণিদেহে এবং যন্ত্রদেহে কোনরূপ জাতিগত পার্থক্য নাই। কিন্তু এখানেও আর একটু ভিতরে

প্রবেশ করিয়া তলাইয়া দেখা আবশ্যক। যন্ত্রের প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক যন্ত্রাঙ্গেরও প্রয়োজন আছে। যন্ত্রাঙ্গের প্রয়োজনও কতিপয় উদ্দেশ্য সাধন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কোন যন্ত্র এ পর্য্যন্ত আপনার প্রয়োজন সাধনের উপযোগী, আপনাকে রক্ষা করিবার উপযোগী যন্ত্রাঙ্গ আপনা হইতে উদ্ভাবিত করিয়াছে কি? আপনা হইতে গড়িয়া লইতে পারিয়াছে কি? যন্ত্রাঙ্গগুলি যন্ত্রের কর্ম্মসাধনের উপযোগী। কিন্তু সেই উপযোগিতা অনুসারে যন্ত্র আপনার অঙ্গগুলি আপনি নির্ম্মাণ করিয়া লইতে পারে কি? যন্ত্র আপনি আপনাকে মেরামত করিতে পারে কি? কোন ষ্টীম এঞ্জিন তাহার safety valve নিজে গড়িয়া লইতে পারিয়াছে কি? সেই safety valve উদ্ভাবনের জন্য বাহির হইতে একজন শিল্পীকে ডাকিতে হয় নাই কি? একজন intelligent designer এবং একজন intelligent artist ডাকিয়া আনিতে হয় নাই কি? Engine ত নিজের safety valve নিজে গড়িতে পারে না। নিজে মেরামত করিয়া লইতে পারে না। প্রাণিদেহ যন্ত্র বটে, কিন্তু কোন প্রাণীকে এ জন্য কোন বাহিরের লোকের সাহায্য ত লইতে হয় নাই। সে নিজের যন্ত্র নিজেই গড়িয়া লইয়াছে। নিজের আপন্নিবারণের উপায় নিজেই উদ্ভাবিত করিয়াছে। শিল্পী তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রমধ্যে যে কয়টি আপদ্ নিবারণের উপায় করিয়াছেন, তাঁহার হাতে-গড়া যন্ত্র সেই কয়টি আপদের অতিরিক্ত কোন নূতন আপদের প্রতীকার করিতে পারে না। তখন আবার শিল্পীকে নূতন যন্ত্রাঙ্গের উদ্ভাবন করিতে হয়। কিন্তু প্রাণিদেহ তাহা ত নিয়তই করিতেছে। নিত্য নূতন আপদের জন্য নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। আপনার ব্যাধির প্রতীকার আপনিই করিতেছে। প্রাণী ত কোন শিল্পীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। মজার কথা এই, যাঁহারা অবৈজ্ঞানিক, তাঁহারাই প্রাণে এই অদ্ভুত ক্ষমতা অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত। তাঁহারাই দেহযন্ত্র গড়িবার জন্য, দেহযন্ত্রে এই আপন্নিবারণের উপযোগী যন্ত্রাঙ্গ বসাইবার জন্য বাহির হইতে একজন শিল্পীকে ডাকিয়া আনিতে চান। একজন intelligent designerকে, একজন বিধাতা পুরুষকে এজন্য ডাকিয়া আনিতে চান, কল্পনা করিতে চান। আর যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা কোন কাল্পনিক বিধাতা পুরুষের নাম শুনিলেই আঁতকাইয়া উঠেন এবং খাঁটি জড়ে যে ধর্ম্ম দেখিতে পান না, প্রাণময় জড়ে সেই ধর্ম্ম

অর্পণ করিয়া প্রাণের এবং জড়ের মধ্যে একটা অলঙ্ঘ্য দেওয়াল গাঁথিয়া তৃপ্তি লাভ করেন।

Argument from Design বলিয়া একটা যুক্তি আছে। শিল্প মাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য আছে। বিশিষ্ট কর্ম্মে উপযোগিতা আছে। একখানা রূপার চাকৃতি হয়ত রূপার খনি হইতেই মিলিতে পারে। উহাতে কৃত্রিমতা না থাকিতে পারে। কিন্তু রূপার চাকৃতির এক পিঠে যদি রাজার মুখ অঙ্কিত দেখা যায়, অন্য পিঠে যদি তাহার মূল্য খোদাই করা থাকে, এবং সেই মূল্য অনুসারে সকলেই উহা গ্রহণ করিতেছে, এইরূপ দেখা যায়, তখন বুঝিতে হয়, উহা কৃত্রিম দ্রব্য। কোন খনির মধ্যে উহা পাওয়া যায় নাই। উহা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন intelligent designerএর দ্বারা উদ্ভাবিত এবং কোন শিল্পীর দ্বারা গঠিত হইয়াছে। এঞ্জিনের মধ্যে safety valve দেখিলে সেইরূপ শিল্পীর কৃতিত্ব মনে করিতে হয়। জন্তুর দেহে নানারূপ কর্ম্মসাধনোপযোগী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবস্থা দেখিয়াই অবৈজ্ঞানিকেরা একজন বাহিরের designer, বাহিরের artist কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর বৈজ্ঞানিকেরা সেরূপ কল্পনায় অনিচ্ছুক হইয়া প্রাণ-পদার্থেরই সেই ক্ষমতা অর্পণে বাধ্য হইয়াছেন। আমি কোন্ পক্ষ আশ্রয় করিব, সে কথা এখন নাই বা তুলিলাম। প্রাণে যে ক্ষমতা দেখিতে পাই, খাঁটি জড়ে তাহার পরিচয় পাই না, ইহা যেন উভয় পক্ষই মানিয়া লইতেছেন।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা Dynamics-বিদ্যার খোঁজ রাখেন, তাঁহারা principle of stability নামে একটা কথা শুনিয়া থাকিবেন। Stability অর্থে স্থিতিশীলতা—স্থাস্নুতা। স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কোন কারণে ভ্রষ্ট হইলেও যাহা পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ঘুরিয়া আসে, সেই জিনিসটা stable বা স্থিতিশীল। পেন্সিলটাকে তাহার ডগার উপর খাড়া করিয়া রাখা যায় না; ঐ অবস্থায় উহা স্থিতিশীল নহে। উহাকে শোয়াইয়া রাখিলে স্থিতিশীল হয়। ঘড়ির পেণ্ডুলামটা নাড়াইয়া দিলে স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। কয়েক বার দুলিয়া আবার স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়। অতএব পেণ্ডুলাম স্থিতিশীল। অবস্থাভেদে একই দ্রব্য বা দ্রব্য-সমষ্টি স্থিতিশীল হইতে পারে বা না-পারে। Dynamics-বিদ্যা সেই অবস্থাভেদের, সেই conditions of stabilityর নির্দ্ধারণ করিতে চান এবং তাহাকে

formula-বদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। সৌর জগতের stability সম্বন্ধে লাপ্লাস্ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রহ উপগ্রহ কক্ষাভ্রষ্ট হইয়া সৌর জগৎ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবার ভয় নাই। পক্ষান্তরে সার্ জর্জ্জ ডারুইন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই stability নির্দ্ধারণ দ্বারাই কোন্ কালে চন্দ্রমণ্ডলটা পৃথিবী হইতে ছট্‌কিয়া পড়িয়াছিল এবং কবে আবার উহা পৃথিবীতে আসিয়া ঢুসা দিবে, তাহার আলোচনা করিয়াছেন। Willard Gibbsএর পর হইতে রসায়ন-বিদ্যার ভাঙ্গা-গড়া, বিকৃতি-পরিণতি ঐ স্থিতিশীলতার আঁকে গণিত হইতেছে। সার্ জোসেফ টম্‌সন্ পরমাণুর ভিতরে electronগুলার conditions of stabilityর আলোচনা করিয়া রেডিয়ম প্রভৃতি ধাতুর পরমাণুর ভাঙ্গা-গড়া আলোচনা করিতেছেন। রেডিয়ম ধাতুর অস্থায়ী পরমাণুগুলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন stable configurationএ আসিয়া নূতন নূতন ধাতুর উৎপাদন করিতেছে, ইহা ত আজকাল আমরা চোখের উপরে দেখিতেছি। এই সমস্ত ঘটনা এখন বিজ্ঞান-বিদ্যার প্রায় আয়ত্ত অর্থাৎ প্রায় formula-বদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। জীয়ন্ত প্রাণিদেহেরও stability বা স্থিতিশীলতা সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা চলিতে পারে। প্রত্যেক প্রাণীকে আপনার environment বা পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করিতে হয়। এই পরিবেশ বা environment নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। প্রাণিদেহকেও আপনার stability অনুসারে সেই পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য আপনাকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নূতন মূর্ত্তি দিয়া, নূতন configurationএ আনিয়া বদলাইয়া লইতে হয়। প্রাণের এই বিবিধ মূর্ত্তিগ্রহণ জড় পরমাণুগুলার বিবিধ মূর্ত্তিগ্রহণের মত। সকল রকম মূর্ত্তির স্থায়িত্ব সমান নহে। যেগুলা conditions of stability মানিয়া চলে, সেইগুলাই টিকিয়া যায়। যেগুলা মানে না, সেগুলা হয় লোপ পায়, অথবা ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নূতন form, নূতন মূর্ত্তি গ্রহণ করে। পরিবেশের ব্যত্যয় ঘটায় প্রাচীন কালের ম্যামথ মাষ্টোডন আপনাকে বজায় রাখিতে পারে নাই। কিন্তু প্রাচীনতর আরস্বুলা বহুতর পরিবর্ত্তন মধ্যেও আপনাকে জীয়ন্ত রাখিয়াছে। প্রাণ-বিদ্যার আলোচ্য সমস্ত evolution ব্যাপারটা এইরূপে কেবল stability-ঘটিত অঙ্কে পরিণত করিতে পারা যাইবে কি না, এ-কালের অনেক বৈজ্ঞানিক তাহার স্বপ্ন দেখিতেছেন। যদি পারেন, তাহা হইলে সমস্ত evolution ব্যাপারটা

হয়ত Dynamics এর অঙ্কের মধ্যে আলোচিত হইবে। হয়ত এক দিন প্রাণ-পদার্থ stability-ঘটিত formulaয় বাঁধা পড়িবে—পৃথিবীর কোন্ অবস্থায় কোন্ প্রাণীর থাকা উচিত, কোন্ প্রাণীর থাকা উচিত নয়, কাগজে-কলমে আঁক কষিয়া আমরা বলিয়া দিব। কোটি বর্ষান্তে যখন পৃথিবীর অবস্থান্তর ঘটিবে, যখন ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা এতটা কমিবে, অথবা অন্তরীক্ষে কার্বানক এসিডের পরিমাণ এতটা বাড়িবে, তখন কোন্ নূতন প্রাণীর অবতারণা ঘটিবে, অথবা বর্ত্তমান প্রাণীকে কিরূপে মূর্ত্তি বদল করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাহাও আমরা কাগজে-কলমে কষিয়া দিব। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন, মেণ্ডেলের আবিষ্কৃত formula প্রয়োগে কোন্ পিতামাতার কয়টা সন্তান কিরূপ হইবে, আজকাল কাগজে-কলমে কষিয়া বলিবার চেষ্টা হইতেছে, এবং তদনুসারে প্রাণীর চাষ আরম্ভ হইয়াছে। আধুনিক Eugenics-বিদ্যা বা প্রাণি-উৎপাদন-বিদ্যা formula প্রয়োগে নূতন পরিবেশের অনুযায়ী নূতন প্রাণী উৎপাদনের স্বপ্ন দেখিতেছেন। হয়ত এক দিন মানুষের প্রজ্ঞা জয়ী হইবে ;—নূতন পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রাণিদেহের নূতন মূর্ত্তিদানে সমর্থ হইবে—প্রাণের প্রবাহকে ইচ্ছামত পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে এই যে, যদি কখনও সেই শুভ দিন আসে, সে দিন প্রাণের প্রাণত্ব থাকিবে কি না ? নিয়তির নিগড়ে প্রাণপদার্থ শৃঙ্খলিত হইলে প্রাণের প্রবাহই রুদ্ধ হইয়া যাইবে কি না ? প্রাণ তাহার বিশিষ্টতা হারাইবে কি না ? প্রাণ তাহার বিচিত্র ইতিহাস—তাহার history হারাইবে কি না ?

ভবিষ্যতে যাহাই হউক, সম্প্রতি আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রাণের প্রবাহ জড়তার বন্ধনে ধরা দিতে চাহিতেছে না। জড় অবিরাম নিয়মের বাঁধ বাঁধিয়া আপনার পাষাণ তটের মধ্যে প্রাণের স্রোতকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু উচ্ছ্বসিত প্রাণের প্রবাহ বাঁধ ভাঙ্গিয়া, কূল ছাপাইয়া, দুই কূল ভাসাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কখন্ কোন্ পথে চলিবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রাণের এই উচ্ছ্বাস বেগবান্, তরঙ্গিত, আবর্ত্তসঙ্কুল, ফেনিল। জড়কে ইহা যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ঐরাবতের বিশাল দেহ গঙ্গার স্রোতের বেগে ভাসিয়া যাইতেছে। জড়ের সহিত প্রাণের এই বিরোধ—উভয়ের মধ্যে এই টানাটানি ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি মারামারি। আমি পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি, প্রাণের ইতিহাস এই বিরোধেরই

ইতিহাস। প্রাণের এই সনাতন ক্ষুধা—এই খাই-খাই প্রবৃত্তি—সেই প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত এই বিরোধের ইতিহাস। আপনাকে সম্প্রসারিত করিয়া বিশ্ব গ্রাস করিবার যে প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত এই নিত্য বিরোধের ইতিহাস। সম্প্রতি প্রাণের এই বিচিত্র, নিত্য-নূতন, চমৎকার-জনক ইতিহাস বা history আছে। এই ইতিহাসই প্রাণের বিশিষ্টতা ;—এবং এ কালের জীববিদ্যা বা Biology এই বিরোধেরই কাহিনী।

এই ইতিহাসের মোটা কথাগুলা বলিতে হইবে। আমাকে এক নিশ্বাসে সাত কাণ্ড রামায়ণ আওড়াইতে হইবে। আজি এই পর্য্যন্ত। আপনারা সাহস দিলে বারান্তরে অগ্রসর হইব।

প্রাণের কাহিনী

প্রাণের সহিত জড়ের বিরোধের কথা বলিতেছিলাম। এই বিরোধে নিজের প্রাণ এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, বহু দিন আপনাদের সম্মুখে আসিতে সাহস করি নাই। আমার কথাগুলি সব আপনাদের স্মরণে আছে কি না জানি না। প্রাণ জড়কে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণি-পদার্থে পরিণত করিতে চাহিতেছে। অন্য দিকে জড় প্রাণের বিশিষ্টতা লুপ্ত করিয়া উহাকে জড়ত্বে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রাণি-পদার্থে ও জড় পদার্থে এই নিত্য বিরোধ। নানা প্রাণী,—নানা জন্তু ও নানা উদ্ভিদ্,—জড় পদার্থকে গ্রাস করিয়া, সেই জড়ে প্রাণের বিশিষ্ট ধর্ম্ম অর্পণ করিয়া আপনাদের দেহ নির্ম্মাণ করিতেছে; জড় কিন্তু প্রাণি-পদার্থের বিশিষ্টতা নষ্ট করিয়া পুনরায় জড়ত্বে নামাইতে সর্ব্বদা নিযুক্ত আছে। এই হইল নিত্য বিরোধ। এই বিরোধের কাহিনী লইয়া জীবনযাত্রা; এই বিরোধের যে দিন সমাপ্তি হয়, সেই দিন মৃত্যু। প্রাণীর পক্ষে এই মৃত্যু প্রায় অবশ্যম্ভাবী, জড়ের নিকট পরাজয়টাই অবশ্যম্ভাবী। অথচ প্রাণ এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে এড়াইতে গিয়াই নিত্য নূতন বিচিত্র আকৃতিতে, বিচিত্র মূর্ত্তিতে আপনাকে স্ফূর্ত্ত করিয়া, জড়ের সহিত বিরোধ চালাইয়া আসিতেছে।

'মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং'—ইহা আপনারা জানেন; অথচ আশ্চর্য্য এই যে, প্রাণী মরিয়া যায়, কিন্তু প্রাণ লুপ্ত হয় না। এক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রান্ত হইয়া জড়ের সহিত যুদ্ধ চালায়। অন্ততঃ আমাদের এই পৃথিবীতে যে দিন হইতে প্রাণের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই দিন হইতে এই ধারা চলিতেছে। প্রাণী কেবল মরিতেছে, কিন্তু প্রাণ এ পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় নাই। কোটি দেহাশ্রয়ে কোটি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জড়ের সহিত লড়াই চালাইতেছে। ইংরেজীতে যাহাকে protoplasm বলে, আমি তাহাকে প্রাণি-পদার্থ বলিয়া আসিতেছি। এই protoplasmএর কণিকা যে দিন ভিতরে একটি সূক্ষ্ম দানা বা nucleus বাঁধিয়া তাহার ক্ষুদ্র দেহ নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছে, অন্ততঃ সেই দিন হইতে প্রাণের এইরূপ আচরণ চলিয়া আসিতেছে। এই দানাওয়ালা প্রাণি-পদার্থ অর্থাৎ nucleus-বিশিষ্ট protoplasmএর কণিকাকে ইংরেজীতে cell বলা হয়, বাঙ্গালায় উহাকে কোষ বলা হইয়া

থাকে। এই কোষ নামটা আমি আদৌ পছন্দ করি না; কিন্তু অন্য নামের অভাবে অগত্যা ঐ নামই আমাকে ব্যবহার করিতে হইবে। এই কোষই এক হিসাবে ক্ষুদ্রতম প্রাণী; অথবা ঐ কোষটাই সেই ক্ষুদ্রতম প্রাণীর দেহ। উহার কাজই হইতেছে আশে-পাশে জড় পদার্থের সন্ধানে থাকা, এবং গ্রহণযোগ্য পদার্থের সন্ধান পাইলেই তাহাকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিয়া আপনার দেহের পুষ্টি সাধন করা। এই অতিক্ষুদ্র প্রাণীটি কেবলই আহারের সন্ধানে আছে, কেবলই খাইতেছে আর বাড়িতেছে। ইহার প্রবৃত্তিটাই হইতেছে আত্মপোষণের অভিমুখে। ইহার বাড়িবার প্রবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু কি জানি কেন, ইহা আপনাকে বড় করিয়া বিশ্বব্যাপী দেহ গ্রহণ করিতে পারে না। একটু বাড়িয়াই ইহা দুই টুকরা হইয়া যায়; একটা কোষ ভাঙ্গিয়া দুইটা কোষ হইয়া যায়। উহার দেহের ভিতর যে ক্ষুদ্র nucleus বা দানাটুকু থাকে, সেই দানাটাই প্রথমে ছিন্ন হইয়া দুই খণ্ড হয় এবং protoplasmটুকু ভাগ করিয়া লইয়া দুইটা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন কোষের উৎপাদন করে। ছিল দানাওয়ালা একটা কোষ—একটি প্রাণী; খণ্ডিত হইয়া উৎপাদন করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দানাওয়ালা দুইটি কোষ বা দুইটি প্রাণী। এই দুইটি প্রাণীর প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে আহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়; স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা আরম্ভ করে বলিলেই হয়। আবার একটু বড় হইয়াই প্রত্যেকটা আবার দুই টুকরা হইয়া যায়। একটি প্রাণী ভাঙ্গিয়া দুইটি হইয়াছিল, দুইটি ভাঙ্গিয়া চারিটি—এইরূপে চারিটি হইতে আটটি, আটটি হইতে ষোলটি;—এইরূপে ক্রমে বহু কোটি প্রাণীতে পরিণত হইয়া পড়ে। প্রত্যেকটাই স্বাধীন প্রাণী, কেহ কাহারও তোয়াক্কা রাখে না, স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিয়া আহারের অন্বেষণে বেড়ায়। পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাব হইতে আজ পর্য্যন্ত এই ব্যাপার আপনাদের চোখের উপর চলিয়া আসিতেছে, আপনারা তাহা দেখিয়াও দেখেন না, জানিয়াও জানেন না। আপনাদের হাঁচিতে কাশিতে, দাঁতের বেদনায় ও পেট-ফাঁপায়, আপনাদের প্রাত্যহিক জীবন-ধারণ ব্যাপারে ইহাদের কতটা হাত আছে, তাহা আপনারা জানেন না। যখন কলেরার বা প্লেগের আক্রমণে ও-পারের ডাক পড়ে, তখন এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলার কৃতিত্ব জাহির হয়। এক প্রাণীর বহু হইবার এই প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল এবং কেন আসিল, প্রাণ-বিদ্যার পক্ষে এ একটা সমস্যা বটে। প্রাণি-পদার্থ একটা একাকার বিশাল বিশ্বব্যাপী দেহ

ধারণে প্রবৃত্তি না রাখিয়া, এইরূপ অগণ্য কোটি কোটি কোটি ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবী ব্যাপিতে চাহে কেন, ইহা একটা সমস্যা বটে। বন্ধুবর অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের কলেজের পত্রিকায় আমার পঠিত এই প্রবন্ধগুলির আলোচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিতেছেন। এই হেঁয়ালিটা তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। একের এই বহু হইবার প্রবৃত্তি যে কেবল প্রাণি-পদার্থেই দেখা যায়, এমন নহে ; খাঁটি জড় পদার্থেও এই প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে। জড় পদার্থও একাকার অবস্থায় বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থানে সমর্থ হয় নাই ; আপনাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরায়, কোটি কোটি কোটি খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু এবং electron, atom, molecule ইত্যাদি নানা মূর্ত্তিতে জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রমথবাবু প্রশ্ন তুলিয়াছেন,—জড়েরই বা এরূপ খণ্ডিত হইবার প্রবৃত্তি কেন, প্রাণি-পদার্থেরই বা এরূপ খণ্ডিত হইয়া থাকার প্রবৃত্তি কেন ? একাকারে বৃহৎ ভাবে না থাকিয়া অগণ্য ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইবার প্রবৃত্তি কেন ? এই প্রশ্নটি জগৎতত্ত্বের একটা গোড়ার প্রশ্ন ; ইহার উত্তর দিতে পারি, সে সাহস আমার নাই। তবে আমি এই পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি, রাজপথে যেমন milestone,—electron, atom, moleculeগুলি, অথবা তারকা, গ্রহ, উপগ্রহগুলি সেইরূপ আকাশমধ্যে milestoneএর কাজ করে। মাইলষ্টোন বা তদ্বিধ খণ্ড চিহ্ন না থাকিলে, সরল রাজপথে পথিক যেমন তাহার পর্য্যটন-কাহিনীর হিসাব দিতে পারিত না, জড় পদার্থও খণ্ডাকারে আকাশে ছড়াইয়া না থাকিলে, আমরা আমাদের ব্যাবহারিক বাহ্য জগতের কোনরূপ হিসাব দিতে পারিতাম না। সম্ভবতঃ জীবনযাত্রাই আমাদের পক্ষে অসাধ্য হইত। অন্ততঃ যে প্রণালী মতে আমাদের জীবনযাত্রা চলিতেছে, সেই প্রণালী মতে জীবনযাত্রা অসাধ্য হইত। প্রমথনাথের প্রশ্নের উত্তরে জড় পদার্থের খণ্ড ভাব সম্বন্ধে ইহার অধিক আমি কিছু বলিতে পারিব না। প্রাণি-পদার্থের খণ্ড ভাব সম্বন্ধেও আমি ঐরূপ একটা উত্তর কল্পনা করিয়া পরিত্রাণ পাইতে চাই। জীবনের ইতিহাসটাকে আমি একটা বিরোধের ইতিহাস মাত্র বলিতে চাহি। এই বিরোধ না থাকিলে জীবন থাকিত না ; এই বিরোধই জীবন এবং জীবনই এই বিরোধ। প্রাণি-পদার্থ যদি আপনাকে এইরূপ কোটি খণ্ডে ভাগ করিয়া না লইত, তাহা হইলে এই বিরোধই বা চলিত কিরূপে, জীবনের অর্থ এবং তাৎপর্য্যই

বা কি হইত, তাহা আমি মনে করিতে পারি না। জীবনের অস্তিত্বটা যদি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে জীবনের সহিত অভিন্ন এই বিরোধটাকেও মানিয়া লইতে হইবে ; এবং বিরোধকে মানিতে হইলে পরস্পর বিরুধ্যমান বা বিরোধে লিপ্ত একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বীও মানিতে হইবে। যে সর্ব্বতোভাবে এক, অদ্বয় এবং অখণ্ড, সে আপনার সহিত আপনি বিরোধ করিতে পারে না। বিরোধ কল্পনা করিতে হইলে অন্ততঃ দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী আবশ্যক হয়। দুইয়ের অধিক প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিলে বিরোধটা আরও জমকাইয়া উঠে। জীবনের কাহিনীই বিরোধের কাহিনী—খুব জমকাল কাহিনী। প্রাণী যদি বহু না হইয়া এক হইত, তাহা হইলে জীবনের কাহিনী ত থাকিতই না, জীবন বলিয়াই কিছু থাকিত কি না, সে বিষয়েই আমার সংশয় জন্মিতেছে। আপনারা হয়ত ঘাড় নাড়িবেন বা হাসিবেন ; কিন্তু আমার মনে হয়, যেন আমাদের মত চেতন জীবের জীবনযাত্রার খাতিরেই, আদান-প্রদানের খাতিরেই, জড় জগৎ এবং প্রাণময় জগৎ—উভয় জগৎই আপনাকে খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন, discontinuous করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

কথাটা আর একটু খুলিয়া বলিতে চাহি। Continuity শব্দের বাঙ্গলায় সন্ততি শব্দ ব্যবহার করিতে পারি। যাহার খণ্ড নাই, কোথাও কোন বিচ্ছেদ নাই, ফাঁক নাই, যাহা বিচ্ছেদহীন একটানা, তাহাকেই সন্তত বলা যায়। পুত্র-কন্যা জন্ম লইয়া পিতৃ-পিতামহের জীবনের ধারা রক্ষা করে বা অবিচ্ছিন্ন রাখে ; সেই জন্য পুত্র-কন্যাকে সন্তান-সন্ততি বলা হয়। এই continuity বা সন্ততির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আপনাদের একটা মোটা ধারণা আছে। মোটা ধারণা বলিলাম এই জন্য যে, একটু চাপিয়া ধরিলে ইহার তাৎপর্য্য লইয়া নানা গণ্ডগোল উঠে। গণিতজ্ঞ পণ্ডিতেরা,—সূক্ষ্ম তর্ক উত্থাপনে যাঁহাদের সমকক্ষ কেহ নাই,—তাঁহারা এই সন্ততি ব্যাপারের তাৎপর্য্যের অন্ত পান নাই ; অন্ততঃ যে দিন হইতে তাঁহারা differential calculus নামক অস্ত্রের উদ্ভাবনা করিয়াছেন, তদবধি তাঁহারা এই হেঁয়ালিকে আরও ঘনাইয়া তুলিয়াছেন। মনে করুন জ্যামিতি-বিদ্যা,—জ্যামিতি-বিদ্যার কারবার বিচ্ছেদহীন সন্তত পদার্থ লইয়া। কিন্তু যখন জ্যামিতিবিৎ পণ্ডিতেরা একটা গোলাকার বাঁটুলের volume বা ঘনফল বাহির করিতে যান, তখনই বাঁটুলটাকে টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলেন, এবং প্রত্যেক টুকরার ঘনফল পৃথক্ ভাবে বাহির করিয়া,

তাহাদিগকে সঙ্কলন করিয়া গোটা বাঁটুলের ঘনফল বাহির করিতে বাধ্য হন। বাঁটুল দ্রব্যটা বিচ্ছেদহীন সন্তত দ্রব্য, কিন্তু কারবারের বেলায় এক টানে উহার ঘনফল বাহির হয় না, উহাকে শত কোটি খণ্ডে কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া, প্রত্যেক খণ্ডের ঘনফল বাহির করিতে হয়। ব্যাপারটা কৌতুককর—যেন বালির পাহাড়ে কত বালি আছে, তাহার পরিমাণ করিতে গিয়া বালির কণিকাগুলি গণিতে হইতেছে;—সমুদ্রের জলের পরিমাণ করিতে গিয়া, কত জলবিন্দু আছে, তাহা গণিতে হইতেছে। মনে রাখিবেন, ইহা কারবারের ব্যাপার—হিসাবের ব্যাপার। যেখানে হিসাব করিয়া কারবার চালাইতে হয়, সেইখানেই একটানা জিনিসে কাজ চলে না; টুকরা লইয়া কাজ চালাইতে হয়। মানুষের প্রাণযাত্রাটাই একটা প্রকাণ্ড কারবার,—একটানা, বিরামহীন, বিচ্ছেদহীন সন্ততিতে প্রাণ পরিত্রাহি রবে কাঁদিতে থাকে। প্রাণ একটা ছন্দোময় পদার্থ; উহার মাঝে মাঝে যতি ও বিরাম আবশ্যক;—গানের মত পদার্থ; মাঝে মাঝে তাল দিয়া, ফাঁক বসাইয়া উহার সুর রক্ষা করিতে হয়। অন্যের সহিত কারবারে আমরা কথা কহি—বাক্যের পর বাক্য বসাই, মাঝে ফাঁক থাকে; পদের পর পদ বসাইয়া বাক্য গড়িয়া লই; syllableএর পর syllable, অক্ষরের পর অক্ষর উচ্চারণ করিয়া পদ নির্ম্মাণ করি। লিখিবার সময় লিপিমধ্যে হরপের পর হরপ বসাই;—টেলিগ্রাফের সিগ্নালে একটানা রেখার পরিবর্ত্তে সারি বাঁধিয়া dotএর পর dash দিতে হয়। মানুষের প্রজ্ঞা—Reason যেন এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, একটানা সন্তত পদার্থকে উহা আয়ত্ত করিতে পারে না, আয়ত্ত করিতে গেলে মাঝে মাঝে হাঁফ ছাড়িতে হয়; হাঁফের সঙ্গেই বিরামের দরকার হয়। যেখানে বুদ্ধিবৃত্তির খেলা, সেইখানেই এইরূপ দেখিতে পাইবেন। মনে করুন, ইটের প্রাচীর আর কাদার দেওয়াল। ইটের উপর ইট সাজাইয়া, সহস্র খণ্ড ইটের সমষ্টিতে ইটের প্রাচীর গাঁথা হয়; দুইখানা ইটের মাঝে ফাঁক থাকিবেই। আপাততঃ মনে হয়, কাদার দেওয়াল যেন অন্যরূপ; কাদার পরিমাণ যেন ক্রমশঃ অবিরামে, অবিচ্ছেদে বাড়াইয়া কাদার দেওয়াল গড়া হইয়াছে; মাঝে ফাঁক বা বিচ্ছেদ রাখিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইটগুলা যদি পাথরের ইট হয়, ভাঙ্গা না চলে, তাহা হইলে প্রাচীর হইতে একখানা ইট খুলিয়া লওয়া চলে; ইটের ভগ্নাংশ, আধখানা

বা সিকিখানা খোলা চলে না। কিন্তু মাটির দেওয়াল হইতে যতটুকু ইচ্ছা মাটি খুঁটিয়া লইতে পারি; আপনি যত অল্প কাদা বাহির করুন, আমি তার চেয়েও অল্প পরিমাণ খুঁটিয়া বাহির করিতে পারি। অতএব আপাততঃ মনে হইতে পারে, ইটের প্রাচীর নির্ম্মাণ বিচ্ছিন্ন ঘটনার পরম্পরা, আর কাদার দেওয়াল গাঁথা একটানা বিচ্ছেদহীন ঘটনা। কিন্তু কার্য্যতও কি তাই? যে মজুর কাদার দেওয়াল গাঁথিয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিবেন যে, সে তিল তিল করিয়া ত কাদা তোলে নাই, তাল তাল করিয়া কাদা তুলিয়া, তালের উপর তাল চাপাইয়া দেওয়াল গড়িয়াছে; দুই তালের মাঝে তাহাকে হাঁফ লইতে হইয়াছে। পদার্থ-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা যখন তাঁহাদের বাঙ্ময় কাদার মসলা দিয়া জড় জগৎ নির্ম্মাণে প্রয়াসী হইয়াছেন, তখনই তাঁহাদিগকে সেই মজুরের মত হাঁফ ছাড়িতে হইয়াছে; ইটের উপর ইট চাপাইয়া তাঁহাদের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। বালুকণার উপর বালুকণা চাপাইয়া তাঁহারা বালির পাহাড় গড়িয়াছেন; জলবিন্দুর উপর জলবিন্দু চাপাইয়া তাঁহারা মহাসাগরের সৃষ্টি করিয়াছেন; moleculeএর পাছে molecule বসাইয়া জলবিন্দু গড়িয়াছেন; atomএর পাছে atom বসাইয়া জলের molecule গড়িয়াছেন; electronএর পাশে electron বসাইয়া atom গড়িবার চেষ্টায় আছেন। এমন কি, যে সকল পণ্ডিত আকাশব্যাপী সন্তত বিচ্ছেদহীন ঈথারের কল্পনা করিয়া, তদ্দ্বারা আকাশের ফাঁক পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। যখনই তাঁহারা আকাশব্যাপী ঈথারের সহিত কারবার করিতে গিয়া তাহার dynamical theory দিতে গিয়াছেন, তখনই সেই ঈথারেরও কণিকা বা molecule বা particle কল্পনা করিতে হইয়াছে; সেই ঈথারকে কোটি খণ্ডে খণ্ডিত করিতে হইয়াছে; একটা ঈথার-কণিকার পাছে আর একটা কণিকা বসাইয়া উভয়ের মধ্যে ক্রিয়ার ও প্রতিক্রিয়ার হিসাব দিতে হইয়াছে।

প্রমথনাথ যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, আমি এই জন্যই সেই প্রশ্নটিকে জগত্তত্ত্বের একটা গোড়ার প্রশ্ন বলিয়াছি। Continuity লইয়া আমাদের কারবার চলে না, discontinuity লইয়াই আমাদিগকে কারবার করিতে হয়। ইহা হয়ত মূলে আমাদের প্রজ্ঞাবৃত্তির—আমাদের Reasonএর একটা দুর্ব্বলতার বা সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেয়। জীবন-যুদ্ধে আমাদের প্রজ্ঞাবৃত্তি

এরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, আমাদিগকে ঐরূপে জীবনেরই কারবার চালাইতে হয়। ঐরূপেই জগতের অভিমুখে আমাদিগকে তাকাইতে হয় ;—দেবতার মত নির্নিমেষনেত্রে আমরা তাকাইতে পারি না, মাঝে মাঝে নিমেষ ফেলিয়া আমরা তাকাইতে বাধ্য হই। জাগতিক রহস্যের উপর-তলায় উঠিতে হইলে, আমরা গড়াইয়া গড়াইয়া উঠিতে পারি না—ধাপে ধাপে পা ফেলিয়া, সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিয়া থাকি। মানুষের মত চেতন জীবের পক্ষে বাহ্য জগতের সহিত কারবারে এই প্রজ্ঞা-বৃত্তিকেই মহাস্ত্র বা ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইতর অস্ত্রও আমরা যেরূপে প্রয়োগ করি, এই ব্রহ্মাস্ত্রকেও সেই রীতিতে প্রয়োগ করিতে বাধ্য আছি। আমরা যেন ঘায়ের পর ঘা দিয়া মুদ্গর প্রহার করি, চোটের পর চোট দিয়া তলোয়ার চালাই, খোঁচার পর খোঁচা দিয়া বল্লম প্রয়োগ করি, তীরের পর তীর, গুলির পর গুলি ছুঁড়িয়া জীবনের লড়াই চালাইতে বাধ্য হই। একটানে, অবিচ্ছেদে, সন্তত ভাবে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিকেও প্রয়োগ করিতে পারি না। বিজ্ঞান-বিদ্যা যেখানে ব্যাবহারিক বিদ্যা—practical applied science, সেখানে তাহার সমুদয় হাতিয়ারই ঐরূপ—সর্ব্বত্রই এইরূপ discontinuity বিরাম, বিচ্ছেদ। Atom, molecule, particle,—এ সমস্তই বিজ্ঞান-বিদ্যার উদ্ভাবিত হাতিয়ার—এ সবগুলিই যেন তূণীরমধ্যে অবস্থিত বাণ,—গোটা গোটা বাণ, চোখা চোখা বাণ ; গোটা গোটা বলিয়াই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা তাহাদের প্রয়োগে পটু এবং প্রয়োগ দ্বারা জগজ্জয়ী।

এই জন্যই বিজ্ঞান-বিদ্যায় atomistic theoryর—কণিকাবাদের জয়জয়কার। ব্যাবহারিক জগৎকে আয়ত্ত করিতে হইলেই, তাহাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া, খণ্ডে খণ্ডে ছিঁড়িয়া লইতে হয়—ইহাই হইল atomistic theory। জড় জগতের পক্ষে যাহা atom—পরমাণু, প্রাণি-জগতে তাহা কোষ—cell ; এক-একটা cellএর একটা খণ্ড গোটা জিনিস ; এক-একটা individual ; উহার ভগ্নাংশ নাই। আধখানা, সিকিখানা পরমাণু যেমন অর্থশূন্য, আধখানা, সিকিখানা কোষ সেইরূপ অর্থশূন্য। একটি একটি করিয়া কোষের সংখ্যা গণিতে হয়। বড় বড় প্রাণীর দেহ এইরূপ বহু কোষে নির্ম্মিত—উহা বহু কোষের সমূহ—বহু ইষ্টকে নির্ম্মিত এক-একখানা বাড়ী। এক-একখানা বাড়ী এক-একটা গোটা জিনিস ;—একখানা বাড়ীর পাশে আর একখানা থাকে—গ্রামের মধ্যে

বাড়ীর সংখ্যা পঞ্চাশখানা বা একান্নখানা হয়, সাড়ে পঞ্চাশখানা হয় না। বহু কোষে নির্ম্মিত বড় বড় প্রাণীও গোটা গোটা প্রাণী, তাহাদেরও ভগ্নাংশ হয় না। পঞ্চাশটা হাতী বা একান্নটা হাতী হয়, সাড়ে পঞ্চাশটা হাতী হয় না। একটা গোটা হাতী আর একটা গোটা হাতীর সহিত কারবার করে—আদান-প্রদান করে। এই আদান-প্রদানই হাতীর প্রাণযাত্রা—ইহা মূলে বিরোধাত্মক। আদান-প্রদানের নামই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ; দ্বন্দ্ব না থাকিলে অর্থাৎ অন্ততঃ দুইটা না থাকিলে একা একা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে না। অতএব প্রাণযাত্রা চালাইতে হইলে একের দ্বারা চলে না, বহুর প্রয়োজন হয়। প্রাণি-পদার্থ একাকারে জগদ্ব্যাপী হইলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই বিরোধ, এই প্রাণযাত্রা অসম্ভব হইত ; অতএব প্রাণযাত্রা যেখানে আছে, সেখানে এই বহুত্বের আবশ্যকতাও আছে। বহুর মধ্যেই বিরোধ, বহু লইয়াই প্রাণযাত্রা, নতুবা প্রাণময় জগতের প্রাণের স্ফূর্ত্তি, প্রাণের প্রকাশ কিরূপে হইত, তাহা আমাদের বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির গোচর হইত না। এই জন্য আমি এই প্রশ্নকে জগৎতত্ত্বের একটা গোড়ার কথা বলিয়া প্রমথনাথের প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আপনারা হয়ত ভাবিবেন, আমি চোখে ধূলা দিবার চেষ্টা করিলাম। আমি তাহা মনে করি না,—অন্ততঃ ঐ প্রশ্নের ঐ উত্তর ভিন্ন আমার নিকট এখন অন্য উত্তর নাই।

প্রসঙ্গক্রমে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি ; সেই বিরোধের কথাতেই আবার ফিরিয়া আসা যাক। প্রাণের সহিত জড়ের চিরন্তন বিরোধের কথাটাই পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি ; কিন্তু তদপেক্ষা তীব্রতর ভীষণতর বিরোধের এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করি নাই। এই বিরোধ প্রাণীর সহিত প্রাণীর বিরোধ। গোড়াতেই বলিয়া রাখিয়াছি, প্রাণের মত স্বার্থপর আর দ্বিতীয় নাই। একটা প্রাণিকোষ যখনই খণ্ডিত হইয়া দুইটা কোষে বিভক্ত হয়, তখনই ঐ দুইটা কোষ সম্পূর্ণ স্ব-তন্ত্র হইয়া আহার অন্বেষণে নিযুক্ত হয় ; কিন্তু একটা অন্যটার কিছু মাত্র অপেক্ষা রাখে না। উভয়েই যে এক সময়ে একই মাতৃকোষের মধ্যে প্রায় অভিন্ন দেহে বিদ্যমান ছিল, তাহার কোন পরিচয়ই এখন পাওয়া যায় না। প্রত্যেকে আপন জীবনযাত্রা লইয়া এতটা ব্যস্ত থাকে যে, অন্যটার প্রতি চাহিবার কোন অবকাশ থাকে না। এই শ্রেণীর একটি মাত্র কোষে নির্ম্মিত প্রাণীকে ইংরেজীতে unicellular organism

বলে। প্রাণময় জগতে ইহারা যে কত কাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে,—পঞ্চাশ বৎসর আগে, এমন কি, দশ বিশ বৎসর আগেও আমরা তাহার কিছুই জানিতাম না। সম্প্রতি ইহাদের আলোচনার জন্য Bacteriology নামে একটা বিপুলকায় বিজ্ঞান-বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। যে সকল প্রাণী সর্ব্বদা আমাদের নজরে পড়ে, তাহাদের দেহ unicellular নহে, multicellular ; একটা মাত্র কোষে নির্ম্মিত নহে, বহু কোষে নির্ম্মিত : ইহাদের দেহ বহু প্রাণীর দেহের সমবায়ে বা সমষ্টিতে নির্ম্মিত মনে করা চলিতে পারে। কীট পতঙ্গ হইতে হাতী, ঘোড়া, মানুষ পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর দেহ বহু কোষের সমষ্টি। অনেকগুলি মানুষে একটা দলভুক্ত হইয়া যেমন একটা সমাজ বাঁধে, কতকটা সেইরূপ। প্রত্যেক জন্তু এক-একটা প্রাণী নহে, এক-একটা প্রাণি-সমাজ। এই সমষ্টিবদ্ধ কোষগুলির মধ্যে আবার কাজের বাটোয়ারা হইয়া পড়িয়াছে। এক-এক দল কোষের উপর এক-একটা কাজের ভার পড়িয়াছে। হাড়, মাস, রক্ত প্রভৃতি বিবিধ ধাতু এবং নাক, চোখ, কান প্রভৃতি অবয়বই তাহার পরিচয়। এখানে সমাজ-রক্ষার বা সমষ্টি-রক্ষার অনুরোধে সমষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যষ্টি কোষকে তাহার স্বাতন্ত্র্য, তাহার স্বার্থপরতা একেবারে ত্যাগ করিয়া সমষ্টির স্বার্থের জন্য বিনিয়োগ করিতে হইয়াছে। এমন কি, প্রত্যেক অঙ্গকে ও অবয়বকে আপনার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অন্যান্য অঙ্গের মুখাপেক্ষা করিতে হইতেছে। পেট বসিয়া বসিয়া খায়, কোন মেহনত করে না,—পেটের বিরুদ্ধে হাত-পায়ের অভিযোগের প্রাচীন উপাখ্যান স্মরণ করিবেন। এখানে দেহের অন্তর্গত প্রত্যেক কোষকে আমরা প্রাণী বলি না,—কোষের সমষ্টিতে নির্ম্মিত নানা অবয়ববিশিষ্ট যে বৃহৎ দেহ, সেই দেহটাকেই প্রাণী বলি। জড় জগতে অণু-পরমাণুগুলি যেমন জমাট বাঁধিয়া গ্রহ উপগ্রহ, চন্দ্র-সূর্য্যাদির মত বৃহৎ জড় খণ্ডের উৎপাদন করিয়াছে, ইহাও যেন কতকটা সেইরূপ। জ্যোতিষী পণ্ডিতেরা গ্রহ উপগ্রহের মধ্যগত অণু-পরমাণুর প্রতি দৃষ্টি রাখেন না, গোটা গোটা গ্রহ উপগ্রহের হিসাব রাখেন ; প্রত্যেক গ্রহে, প্রত্যেক উপগ্রহে একটা individuality দেন। প্রাণি-বিদ্যাও সেইরূপ দেহের অন্তর্গত কোষগুলির পৃথক্ খবর না লইয়া, কোষের সমষ্টি যে দেহ, তাহাকেই একটা স্বতন্ত্র প্রাণী বলিয়া গণ্য করেন, এবং তাহাকেই একটা individuality দেন। এই হিসাবে আমি, আপনি, তিনি, রাম, হরি, শ্যাম, প্রত্যেকে একটি প্রাণী, একটি individual, একটি ব্যক্তি।

প্রমথনাথের প্রশ্ন এখানেও অন্য আকারে উঠিতে পারে। ছোট ছোট কোষগুলি কেন এরূপে জমাট বাঁধিয়া মোটা মোটা, বড় বড় কোষসমষ্টিতে অর্থাৎ multicellular প্রাণিদেহে পরিণত হইল? ইহার পাল্টায় আমি প্রশ্ন করিব—atom, moleculeগুলিই বা কোন্ গরজে জমাট বাঁধিয়া মোটা মোটা গ্রহ উপগ্রহের, চন্দ্র-সূর্য্য-তারকার উৎপাদন করিল? দার্শনিক তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে যেরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমি আগেই দিবার চেষ্টা করিয়াছি। আপনারা বলিবেন, উহা চোখে ধূলা দিবার চেষ্টা; দার্শনিক ফাঁকিতে তুষ্ট হইব না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা দার্শনিক তত্ত্বের বড়-একটা ধার ধারিতে চাহেন না, দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি বরং একটু বক্রদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি সাবধান করিয়া গিয়াছেন, "Physics, Beware of Metaphysics!" বেশ কথা, আমি বৈজ্ঞানিকের সাজে উপস্থিত হইতে ইচ্ছুক আছি। কাজেই দার্শনিকের হেঁয়ালি ত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিকোচিত ভাষায় আমি বলিব, স্বতন্ত্র কোষগুলি জমাট বাঁধিয়া বড় বড় প্রাণি-দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য—জীবন-সংগ্রামের সুবিধা। এই জীবন-সংগ্রামের কথাটা আজ-কালিকার বৈজ্ঞানিক মহলে খুব একটা বড় কথা। প্রাণময় জগতে কোন ঘটনা ঘটিতেছে কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায়, এই ঘটনায় জীবন-সংগ্রামের সুবিধা হয়, অতএব এই ঘটনা ঘটিতেছে,—অমনই বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী নিস্তব্ধ হইয়া, মাথা হেঁট করিয়া উত্তরটা মানিয়া লন। আমি যদি বলি, কোষগুলি দলবদ্ধ হইয়া এইরূপে জমাট বাঁধিয়া বড় বড় প্রাণিদেহ নির্ম্মাণ করিলে তাহাদের জীবন-যুদ্ধে, জীবনযাত্রায় সুবিধা হয়, জড়কে আত্মসাৎ করিবার সুবিধা হয়, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক ধাতের লোকে মাথা হেঁট করিয়া বলিবেন, তাই ত, উত্তরটা সঙ্গত হইতেও পারে। আপনারা জানেন, প্রাণময় জগতে এই জীবন-সংগ্রামের আবিষ্কর্ত্তা Charles Darwin। বাঘে ছাগল খায়, ছাগলে গাছ খায়, এমন কি, গাছের পাতাতেও পোকা ধরিয়া খায়, Darwinএর আগেও ইহা সকলে জানিত। এই ঘটনাটাই জীবন-সংগ্রাম। কিন্তু এই জীবন-সংগ্রামটা যে কিরূপ ভীষণ, এবং ইহার ফলাফল কিরূপ সূক্ষ্ম এবং কিরূপ দূরব্যাপী, Darwinএর আগে কেহ তাহা স্পষ্টভাবে দেখিতে পান নাই। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—সর্ব্বত্র কিরূপ ভীষণ কুরুক্ষেত্র ব্যাপার অহর্নিশি চলিতেছে, তাহা Darwinএর পর হইতে

আমাদের চোখে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখা দিয়াছে। প্রাণের সহিত জড়ের নিত্য বিরোধের কথা আগেই বলিয়াছি। সে বিরোধ ত ভয়ানক বটেই; কিন্তু প্রাণীর সহিত প্রাণীর এই যে বিরোধ, ডারুইন যাহা পট তুলিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার উগ্র ভীষণতার বর্ণনা দিতে আমি অক্ষম। ব্যাসের বা হোমারের কলমে বর্ণনা কুলায় কি না সন্দেহ। আপনাদের যদি সখ থাকে, ডারুইন-তন্ত্রীদের পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিবেন। কিন্তু ইহার ভিতরে একটা মস্ত কৌতুকের কথা আছে। প্রাণ-পদার্থ জড় পদার্থকে আত্মসাৎ করিতে চায়, protoplasm তাহার ভিতরে দানা বাঁধিয়া প্রাণিকোষে পরিণত হইয়া জড় জগৎ হইতে খাদ্য অন্বেষণ করে। বিশাল জড় জগৎটাকে সহজে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া, আপনাকে ছিন্ন করিয়া, খণ্ডিত করিয়া—শত খণ্ডে, কোটি খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করিয়া জড় জগৎমধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার উদ্দেশ্য বোধ করি, আহার অন্বেষণের সুবিধা। একাকী একত্র স্থির না থাকিয়া শত খণ্ডে ছুটিয়া বেড়াইলে জড়কে আত্মসাৎ করিবার, জড়ের সহিত বিরোধ চালাইবার হয়ত সুবিধা ঘটে। আবার unicellular কোষগুলি জমাট বাঁধিয়া multicellular প্রাণীতে পরিণত হইলেও বোধ করি, জড় জগৎ হইতে আত্মরক্ষার এবং জড়কে আত্মসাৎ করিবার সুবিধা ঘটে। উভয় স্থলেই মূল বিরোধ প্রাণের সহিত জড়ের। কিন্তু প্রাণী যখন প্রাণীর সহিত বিরোধ করিতে আরম্ভ করে, তখন যেন সেই গোড়ার বিরোধটা ভুলিয়া যায়। সাধারণ শত্রু যে জড়, তাহার সহিত বিরোধটা যেন ভুলিয়া গিয়া পরস্পর ঘরোয়া বিরোধে লিপ্ত হইয়া পড়ে। ফলে সমস্ত প্রাণী যেন দুইটা স্কন্ধাবার আশ্রয় করিয়া পরস্পর যুধ্যমান দুইটা দলের উৎপত্তি করিয়া ফেলিয়াছে। একটা দলের নাম উদ্ভিদ্; আর একটা দলের নাম জন্তু। জড়কে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণ-পদার্থে পরিণত করিবার ভারটা মুখ্যতঃ উদ্ভিদের উপরে পড়িয়াছে। আমাদের এই ভূপৃষ্ঠে প্রত্যেক উদ্ভিদ্ স্বস্থানে গট্ হইয়া বসিয়া, অর্ব্বুদ মাইল দূরে অবস্থিত সূর্য্যের দিকে পত্রপল্লবরূপী হাজার পেট পাতিয়া দিয়া, সূর্য্যের আলো এবং উত্তাপ হইতে বল সংগ্রহ করিয়া, বায়ুরাশি হইতে কয়লা আত্মসাৎ করিতেছে এবং ভূমির মধ্যে শিকড়রূপী সরু মুখ চালাইয়া দিয়া মৃত্তিকা হইতে লোনা জল সংগ্রহ করিতেছে; এবং সেই কয়লা ও লোনা জলের সহিত এটা-ওটা-সেটা মিশাইয়া প্রাণি-পদার্থ অর্থাৎ protoplasm

তৈয়ার করিতেছে। এইরূপে জড়কে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণি-পদার্থে পরিণত করিবার ভার লইয়াছে উদ্ভিদ্। আর একটা দল জন্তু। ইহারা জড় পদার্থকে আত্মসাৎ করিতে পারে না। কিন্তু উদ্ভিদ্‌কে আত্মসাৎ করিয়া উদ্ভিদের প্রস্তুত প্রাণি-পদার্থকে হজম করিয়া আপনাদের দেহের পুষ্টি করিয়া থাকে। মনে রাখিবেন, উদ্ভিদ্ ও জন্তু, উভয়কেই আমি প্রাণীর মধ্যে ফেলিয়াছি। উদ্ভিদেরা ধীর, স্থির, গম্ভীর, সঞ্চয়ী; আর জন্তুগুলি প্রকৃতপক্ষে ডাকাত। উদ্ভিদেরা আপনার নৈপুণ্যের বলে এবং মিতব্যয়িতার বলে সারাজীবন ধরিয়া যাহা সঞ্চয় করে, জন্তুগুলি অবলীলাক্রমে মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা অপহরণ করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। প্রাণি-পদার্থ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা জন্তুর নাই,—সে পটুতা আছে উদ্ভিদের। জন্তুরা জোর করিয়া পরের দ্রব্য লইয়া স্ফূর্ত্তি করিতেই মজবুত। এই যে স্ফূর্ত্তি, ইহা প্রাণেরই স্ফূর্ত্তি; উদ্ভিদের তুলনায় জন্তুব মধ্যে এই প্রাণের স্ফূর্ত্তি উৎকট ভাবে দেখা দেয়। উদ্ভিদেরা স্বস্থানে বসিয়া সঞ্চয় করিয়া যায়, আর স্ফূর্ত্তিমান্ জন্তুরা ছুটাছুটি করিয়া যেখানে উদ্ভিদের সন্ধান পায়, সেইখানে উপস্থিত হইয়া সেই সঞ্চিত ধন হরণ করিয়া থাকে। হরণ করিয়াও রাখিতে পারে না; অমিতব্যয়ীর মত খরচ করিয়া ফেলে, এবং আবার ডাকাতি করিতে বাহির হয়। এইরূপে একটা চিরন্তন বিরোধ, জন্তুর সহিত উদ্ভিদের বিরোধ। জন্তুদের মধ্যে সকলের আবার উদ্ভিদ্-ভোজনেও প্রবৃত্তি নাই। ছাগল ঘাস খায় বটে, কিন্তু বাঘ ঘাস হজমের পরিশ্রমটুকু স্বীকারে নারাজ। সে আস্ত ছাগলকেই আত্মস্থ করিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত বিচরণ করে। এখানে জন্তুর সহিত বিরোধ জন্তুর। দেখিতে পাইতেছেন, সমস্ত জগৎটাই একটা বিরোধের ক্ষেত্র। গোড়ায় বিরোধ—প্রাণের সহিত জড়ের; তাহার উপরে বিরোধ—প্রাণীর সহিত প্রাণীর; তাহার মধ্যে বিরোধ—উদ্ভিদের সহিত জন্তুর এবং এবং জন্তুর সহিত জন্তুর। এই যে সকল বিরোধ, ইহাও আবার মোটা বিরোধ; ইহার চেয়েও সূক্ষ্মতর বিরোধ আর একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। বাঘের সহিত ছাগলের বিরোধ আছে বলিয়া মনে করিবেন না যে, বাঘেদের মধ্যে পরস্পর পরম সম্প্রীতি রহিয়াছে। পৃথিবীতে ছাগলের সংখ্যা এত অধিক নহে, যাহাতে পৃথিবীর যাবতীয় বাঘ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পাইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে। সকল বাঘের উচিতমত আহার যোগাইতে হইলে পৃথিবীর

ছাগলে কুলায় না, ছাগলের উপর গরু ভেড়া প্রভৃতি যোগ করিলেও কুলায় না। ইহা অত্যন্ত সত্য কথা। এই কথাটার উপরে ডারুইন বিশেষভাবে জোর দিয়াছিলেন। কুলায় না বলিয়াই বাঘের সহিত বাঘের বিরোধ। ছলে বলে কৌশলে যে বাঘ আহার সংগ্রহ করিতে পারে, সে-ই টিকিয়া যায়, জিতিয়া যায় এবং তাহারই বংশ থাকে। অন্যে অকালে মরিয়া যায় এবং বংশ রাখিতে পারে না। প্রত্যেক বাঘ এইরূপে আপন জীবন রক্ষার জন্য অন্য সমুদয় বাঘের সহিত অবিরাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত আছে। এই যুদ্ধ সকল সময়ে মারামারি, কামড়াকামড়ি, রক্তারক্তিতে পরিণত না হইতে পারে। রক্তারক্তির সহিত যে লড়াই, তাহা মোটা লড়াই, তাহা সহজেই চোখের উপর ধরা পড়ে; কিন্তু ছল বল কৌশল প্রভৃতি যাবতীয় নীতি প্রয়োগ করিয়া এই যে অবিরাম গুপ্ত লড়াই, ইহা তাহার চেয়েও ভীষণ; ইহার ফলাফল তাহার চেয়েও সূক্ষ্ম এবং দূরগামী। বিংশ শতাব্দীর সভ্যসমাজের সাম, দান, ভেদ, দণ্ড সহকৃত যে রক্তারক্তি, তাহার ভীষণতার নিকট আটিলার বা জঙ্গিস খাঁয়ের খাঁটি রক্তারক্তি হারি মানে। Darwinএর পর হইতে যোগ্যের জয়, অযোগ্যের পরাজয় প্রভৃতি নানা কথা আপনারা শুনিয়া আসিতেছেন—তাহা এই জীবন-যুদ্ধেরই ফল। বস্তুতঃ এই বিরোধের ফল অতি সূক্ষ্ম এবং অতি দূরগামী। নির্ম্মমতায়, নিষ্ঠুরতায় কোন বিরোধের সহিত ইহার তুলনা হয় না। এখানে কেহ কাহারও আত্মীয় নাই, কোনরূপ আত্মীয়-পর বিচার নাই, স্বজাতি পরজাতি বলিয়া কোন পক্ষপাত নাই। এমন কি, পিতা-পুত্রের মধ্যেও এখানে কোনরূপ মমত্ববোধ নাই। পিতা যখনই অন্নের গ্রাস নিজের মুখে তুলিতেছেন, তখনই তিনি আপন পুত্রকে বঞ্চিত করিতেছেন। তাহা ত হইবেই। ইহা নিতান্ত সত্য কথা যে, পৃথিবীতে অন্নের মাত্রা পরিমিত। উদ্ভিদ্ জড় দ্রব্য আত্মসাৎ করে। কিন্তু পৃথিবীর জড় দ্রব্যের কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণযোগ্য; অধিকাংশই বর্জ্জনীয়। জন্তু উদ্ভিদ্‌কে আত্মসাৎ করে; কিন্তু যত জন্তু, তত উদ্ভিদ্ নাই। নতুবা এক জন্তু অন্য জন্তুকে আত্মসাৎ করিতে যাইবে কেন? অন্নের মাত্রা যখন নিতান্তই পরিমিত, তখন পিতা যখনই অন্নের গ্রাস নিজ মুখে অর্পণ করিলেন, পুত্রকে তখনই সেই গ্রাস হইতে বঞ্চিত করিলেন। আজি না হউক, ভবিষ্যতে কোন এক দিন পুত্রকে সেই বঞ্চনার ফল ভোগ করিতে হইবেই। প্রাণী মাত্রেই এই হিসাবে

ঘোর স্বার্থপর, এবং প্রাণের মত স্বার্থপর পদার্থ আর কিছুই নাই। গত বারে প্রাণের এই স্বার্থপরতার কথা আমি খুব ঘনাইয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; আপনারা হয়ত সে কথাটা তখন সম্পূর্ণ স্বীকার করেন নাই; কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এ-কালের প্রাণ-বিদ্যার পক্ষে এই কথাটাই সব চেয়ে বড় কথা এবং এই কথাটার সত্যতা অতি স্পষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন বলিয়া ডারুইনের এত মাহাত্ম্য।

প্রাণিগণের পরস্পরের মধ্যে এই যে বিরোধ, অন্নের জন্য যে বিরোধ, যে বিরোধের কথা ডারুইনই স্পষ্ট ভাবে উত্থাপন করিয়াছিলেন, সে বিরোধটা মোটা মোটা বহু কোষে নির্ম্মিত multicellular প্রাণীর মধ্যেই প্রবল ভাবে এবং তীব্র ভাবে দেখা যায়। এক কোষে নির্ম্মিত unicellular প্রাণীরা—যাহারা আমাদের চোখের আড়ালে থাকে, তাহাদের মধ্যে তত স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় না। ডারুইনও সেই মোটা মোটা প্রাণীর পরস্পর বিরোধই সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন। ডারুইনের সময়ে Bacteriology-বিদ্যার উৎপত্তি হয় নাই বলিলেই হয়। এই বিরোধের আলোচনা করিতে গেলেই, মৃত্যু তাহার সমস্ত বিভীষিকা লইয়া চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। একটা প্রাণী অতি তুচ্ছ কারণে অপর প্রাণীকে মারিয়া ফেলে,—হয় তাহার দেহটাকেই আত্মস্থ করে, নয় তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া তাহার মুখের অন্ন কাড়িয়া লয়। পরস্পরকে মারিবার জন্য প্রাণিজগতে যে নিরন্তর চেষ্টা, তাহাই জীবন-সংগ্রাম। এই জীবন-সংগ্রামে কে কোন্ সুবিধায় জিতিয়া যায়, তাহা বলা কঠিন। কেহ ছলে, কেহ বলে, কেহ কৌশলে জিতিয়া যায়। অন্যে অতি সামান্য ক্রটিতে পরাজিত হয়। সংগ্রামটা এত ভীষণ যে, কোন স্থানে, কোন মতে কোন একটুকু ক্রটি হইলেই পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, ফল অকালমৃত্যু। প্রাণী কেবলই মরিতেছে, অজস্র ভাবে মরিতেছে;—এত অজস্র ভাবে মরিতেছে যে, একটুকু হিসাব করিয়া দেখিতে গেলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মনে করুন দেখি, একটা মাছে কত ডিম পাড়ে। প্রত্যেক ডিম যদি বাঁচিয়া থাকিয়া পূর্ণাঙ্গ মাছে পরিণত হইত, এবং সেই প্রত্যেক পূর্ণাঙ্গ মাছ আবার পূর্ব্বের মত ডিম পাড়িবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে মৎস্য-বংশের স্থান হইতই বা কোথায়? আহার জুটিতই বা কিরূপে? লাখটা মাছের মধ্যে একটা মাছও হয়ত পূর্ণাঙ্গ হইবার অবকাশ পায় না—তৎপূর্ব্বে

অন্য জন্তুর উদরসাৎ হয়, অথবা জড় জগতের দৌরাত্ম্যে প্রাণ পরিত্যাগ করে। ভাগ্যে মৃত্যু ছিল, তাই পৃথিবীতে অন্য জন্তুর স্থান হইয়াছে; নতুবা মৎস্যপূর্ণ বসুন্ধরায় অন্য জন্তুর উপস্থিতির কোন সুযোগই ঘটিত না। মৎস্য-বংশ ধ্বংস করিবার জন্যই মৃত্যুর সহস্র পথ খুলিতে হইয়াছে, সহস্র শত্রুর উপস্থিতি আবশ্যক হইয়াছে। ফলে মাছের শত্রুসংখ্যা এখন এত বেশী এবং মাছের মৃত্যুর পথ সংখ্যায় এত অধিক যে, এখন মৎস্য বংশ রক্ষা করাই সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। এখন মৎস্য-বংশ রক্ষা করিবার জন্যই যেন মাছের মাকে লক্ষ ডিম্ব প্রসব করিতে হইতেছে। এ বড় কৌতুকের কথা। মৎস্য-বংশ ধ্বংস করিবার জন্যই মাছের বহু শত্রুর আবশ্যক; নতুবা পৃথিবী মাছেই ভরিয়া উঠে। আবার সেই শত্রু হইতে মৎস্য-বংশ রক্ষা করিবার জন্য মাছের জননীকে বহু সন্তানের প্রসবিনী হওয়া দরকার; নতুবা মৎস্য-বংশ পৃথিবীতে লুপ্ত হয়। এ অত্যন্ত কৌতুকের ব্যবস্থা নয় কি? এক দিকে বংশবৃদ্ধি নিবারণের জন্য মৃত্যুর আবশ্যকতা; অন্য দিকে মৃত্যু হইতে বংশ রক্ষার জন্য অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন। ইহাও ত একটা প্রকাণ্ড বিরোধ। বংশনাশের ব্যবস্থার সহিত বংশরক্ষার ব্যবস্থার বিরোধ—যেন জীবনের সহিত মৃত্যুরই বিরোধ। ব্যাপারটা যেন রক্তবীজের লড়াই। রক্তবীজকে যতই ধ্বংসের চেষ্টা হইতেছে, রক্তবীজ ততই বাড়িয়া যাইতেছে; প্রত্যেক ফোঁটা রক্ত হইতে কোটি রক্তবীজ জন্মিতেছে। প্রকৃতিদেবী নিষ্ঠুরা—নির্ম্মম খড়্গাঘাতে আপন সন্তানদিগকে বধ করিতেছেন; কিন্তু বধে কুলাইতেছে না; একের স্থানে কোটি আসিয়া দাঁড়াইতেছে। প্রকৃতি দেবীর যে মূর্ত্তি ডারুইন খুলিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা নিতান্তই উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি; তাহা সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্তধারা-বিস্ফুরিতাননা মূর্ত্তি।

মৃত্যু বলিতেছে, আমি জীবনকে নষ্ট করিব; জীবন বলিতেছে, আমি মৃত্যুকে ফাঁকি দিব। এই ফাঁকি দিবার জন্য জীবন যে কত কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অতি সামান্য ত্রুটিতে যখন মৃত্যু নিশ্চিত, তখন কোন-না-কোন রূপে সেই ত্রুটি সামলান দরকার। যে অযোগ্যতায় পরাজয়ের আশঙ্কা, সেই অযোগ্যতা কোন-না-কোন রূপে পরিহার করিতেই হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, যোগ্যেরই জয়—অযোগ্যেরই পরাজয়। যেখানে যেটুকু অযোগ্যতা আছে, সেটুকু দূর করিতে হইবে। মেরুদণ্ড শক্ত করিতে হইবে, দাঁত ধারাল করিতে হইবে,

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিতে হইবে, মাথার মধ্যে মগজ জমাইতে হইবে, দুই পায়ে ভর দিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, জলে সাঁতরাইতে অথবা হাওয়ায় উড়িতে হইবে, আঁধারে লুকাইতে হইবে অথবা রঙ বদলাইয়া অদৃশ্য হইতে হইবে, দল বাঁধিয়া পরস্পরের বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইবে, অথবা বুদ্ধি খেলাইয়া জড় দ্রব্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া, সেই বুদ্ধিকে আত্মরক্ষার অস্ত্রে পরিণত করিতে হইবে। ঘটিয়াছেও তাহাই ;—কোনও প্রাণী পাখী হইয়া হাওয়ায় উড়িতেছে, কেহ মাছ হইয়া জলে সাঁতার দিতেছে, কেহ সাপ হইয়া বিষ উদ্গিরণে শত্রু নাশ করিতেছে, কেহ ছুঁচা হইয়া গর্ত্তের ভিতর লুকাইয়া আছে, কেহ পোকা হইয়া গায়ের গন্ধে শত্রুরও অগ্রাহ্য হইতেছে, কেহ বাঘ হইয়া ঘাসের বনে আত্মগোপন করিয়া অসতর্ক শিকারের অপেক্ষায় ধারাল নখ এবং দাঁত লইয়া বসিয়া আছে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীই ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা Species। এই নানাজাতি প্রাণীর উৎপত্তি কেবলই ত আত্মরক্ষার জন্য এবং শত্রুবিনাশের জন্য। মানুষও যে তাহার খুলির ভিতরে একরাশি মগজ এবং সেই মগজের অনুযায়ী বুদ্ধিশক্তি সত্ত্বেও দল বাঁধিয়া, সমাজ বাঁধিয়া পরস্পরের বাধ্যবাধকতা স্বীকার করিয়াছে, তাহারও মূল কারণ ত সেইখানে। তাহার যখন বাঘের মত দাঁত নাই, নখ নাই, বা জলে ডুবিবার বা হাওয়ায় উড়িবার ক্ষমতা নাই, বহুরূপীর মত রঙ বদলাইয়া শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবার শক্তি নাই, সে যখন সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বল,—তখন এইরূপে সমাজ না বাঁধিলে পৃথিবীতে তাহার স্থান হইত কোথায়? সে আত্মরক্ষা করিত কিরূপে? মনে করিবেন না যে, পরের প্রতি প্রেমের বশীভূত হইয়া মানুষ সমাজ বাঁধিয়াছে ; মানুষ দল বাঁধিয়াছে স্বার্থ রক্ষার জন্য ; আপনাকে বাঁচাইবার জন্য ; পরকে নাশিবার জন্য। প্রাণবিদ্যা প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করে না ; প্রাণবিদ্যার এই নিগূঢ় তথ্য খুলিয়া বলিয়াছেন, জর্মনি দেশের Nietzche ; তাই জর্মনি আজ সমস্ত পৃথিবীর সহিত লড়াইয়ে মাতিয়াছে। প্রেমের কথা তাহাকে শুনাইতে যাইবেন কি? ফলে যে যেমনে পারে, সে সেইরূপে আত্মরক্ষার এবং শত্রুনাশের উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে ; এবং তাহারই ফলে এই প্রাণময় জগতে বিবিধ বিচিত্র প্রাণিজাতিসমূহের উদ্ভব ঘটিয়া গিয়াছে,—ইহাই হইল ডারুইনের Origin of Species।

প্রাণী জানিতেছে, মৃত্যু ত আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে, একটু ত্রুটি পাইলেই আমাকে গ্রাস করিবে ; কিন্তু মৃত্যুকে ত আমার ফাঁকি দেওয়া চাই। মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য সে একটা অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে। তাহার দেহের কিয়দংশ,—খানিকটা প্রাণি-পদার্থ—দেহের মধ্যে অতি সন্তর্পণে গুপ্ত করিয়া রাখে। নিজের একটু বয়স হইলেই সেই যত্নরক্ষিত প্রাণি-পদার্থকে দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া ছাড়িয়া দেয়। এই ব্যাপারের নাম অপত্যোৎপাদন। অপত্যরূপী প্রাণ-পদার্থ এইরূপে জন্ম লাভ করিয়া আপনার দেহ আপনি বানাইয়া লয় এবং সেই দেহের মধ্যে আপনাকে গোপনে লুকাইয়া রাখে। এইরূপে একটা নূতন প্রাণীর উৎপত্তি হয়। সময় উপস্থিত হইলে এই নূতন প্রাণী আপনাকে স্ব-দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া অপত্যের জন্ম দেয়। সেও আবাব নূতন করিয়া আপনার দেহ গড়িয়া লইয়া তৃতীয় প্রাণীর সৃষ্টি করে। এইরূপে অপত্য-পরম্পরায় প্রাণের ধারা প্রবাহিত হয়। প্রত্যেক প্রাণী মরিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার অপত্য তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া প্রাণের ধারা রক্ষা করে। অপত্য উৎপাদনের জন্য দেহমধ্যে যে প্রাণি-পদার্থটুকু গুপ্ত থাকে, সেইটুকু বীজ ; এবং যে দেহের মধ্যে উহা সযতনে রক্ষিত থাকে, সেইটুকু যেন সেই বীজের খোসা বা আবরণ। সেই বীজকে বাহিরের শত্রুর আক্রমণ হইতে, বাহিরের যাবতীয় আপদ্ হইতে রক্ষা করাই সেই দেহের, সেই আবরণভাগের এক মাত্র উদ্দেশ্য। প্রাণীর যে দেহ আমাদের চোখে পড়ে, সেটা কেবল খোসা মাত্র ; এবং সেই দেহের অভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্র কণিকাটুকু লুকান থাকে, সেই বীজটুকুই আসল প্রাণী। দেহরূপ কৌটার ভিতরে যেন এই অমূল্য রত্নকণা সংগোপনে রক্ষিত থাকে। সেই লুকান রত্নটির, সেই বীজটির যেন নাশ নাই। সে কেবল এক দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেহান্তরে আশ্রয় লয় ; এবং এইরূপে গুপ্ত থাকিয়া বাহিরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। এই আসল প্রাণীটুকু বস্তুতঃ অমর, ইহার ধ্বংস নাই। কিছু দিনের জন্য যে দেহের মধ্যে থাকিয়া সে আত্মরক্ষা করে, সেই দেহটাই ধ্বংসশীল। বাহ্য জগতের আক্রমণ এই দেহের উপর দিয়াই যায় ; এবং সেই দেহটাই কিছু কাল ধরিয়া বাহ্য জগতের সঙ্গে লড়াই চালাইয়া অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দেহের এই ধ্বংসকেই আমরা বলি মৃত্যু। আসল যে মাণিকটি, তাহার ধ্বংস হয় না ; মাণিকের কৌটাটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কৌটাটি মাঝে মাঝে বদলাইতে হয়।

যখনই তাহাব জীর্ণ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা জন্মে, তাহার পূর্ব্বেই তাহা পুরাণ কৌটা ত্যাগ করিয়া নূতন কৌটা আশ্রয় করে। নূতন কৌটা আশ্রয় করে বলিলে চলিবে না,—আপনার কৌটা আপনি গড়িয়া লয় বলিতে হইবে। ইহাই ত প্রাণের কারিকরি। জড় দ্রব্য কোনরূপে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না; কিন্তু জড় দ্রব্যে প্রাণের সঞ্চার হইবা মাত্র উহা প্রাণিপদার্থে পরিণত হয়, এবং সেই প্রাণিপদার্থ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবার শক্তি রাখে। প্রাণের ইহাই বিশিষ্ট ধর্ম্ম। প্রাণ আপনাকে যেরূপেই হউক, রক্ষা করিবেই। আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধে ইহাই খুব খোলসা করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আসল প্রাণীটার এই নূতন নূতন দেহ-পরিগ্রহ—এই খোলস ছাড়ার ব্যাপার,—ইহারই নাম বংশানুক্রম; এবং এই বংশানুক্রমের কৌশল উদ্ভাবন করিয়া বহু কোষে নির্ম্মিত multicellular প্রাণিগণ মৃত্যুকে এড়াইবার কৌশল সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, প্রাণী নিয়তই মরিতেছে; কিন্তু প্রাণের ধারা লুপ্ত হইতেছে না,—এক দেহ হইতে সহস্র দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ আপনাকে জীবন-সংগ্রামে আজি পর্য্যন্ত অপরাজিত রাখিয়াছে। Darwinএর পরবর্ত্তী Weismannএর নিকট আমরা এই তথ্যটির সন্ধান পাইয়াছি।

ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করুন। আমরা দেহটাকেই প্রাণীর সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করিয়া থাকি। অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস ইত্যাদি নানা ধাতুতে এই দেহ নির্ম্মিত। হাত, পা, মাথা, বুক, পেট, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি নানা অবয়ব—নাক, মুখ, চোখ ইত্যাদি নানা ইন্দ্রিয় এই দেহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। এই দেহটাকেই আমরা চোখের সামনে দেখিতে পাই, এবং ইহাকেই প্রাণীর সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করি। এই প্রকাণ্ড দেহের কোন্ অভ্যন্তরে আসল প্রাণীটি সংগোপনে চোখের আড়ালে রক্ষিত আছে, তাহার বড়-একটা খোঁজই রাখি না। অথচ এই দেহটা কেবল একটা আবরণ মাত্র, একটা আচ্ছাদন মাত্র, একটা কৌটা মাত্র, একটা ঢাক্না মাত্র, একটা খোলস মাত্র। প্রাণীকে রক্ষা করা এই খোলসের এক মাত্র উদ্দেশ্য; কাজেই জীবন-সংগ্রামে লড়াইয়ের ভারটা এই দেহের উপরেই পড়ে,—বাহ্য জগতের সমস্ত আক্রমণটাই এই দেহের উপর দিয়াই যায়। বাহিরের সমস্ত উপদ্রব, সমস্ত অত্যাচার এই দেহকেই সহিতে হয়; এবং এই সমস্ত উপদ্রব অত্যাচার সহিয়া জরাজীর্ণ অবস্থায় এই দেহকেই ধ্বংস পাইতে

হয়। ইহার অভ্যন্তরস্থ আসল প্রাণীটি অবিনাশী থাকে, অবিকৃত থাকে, বাহিরের কোন উপদ্রব তাহাকে স্পর্শ মাত্র করিতে পারে না। যত কিছু বিকার, বৈকল্য—তাহা সেই দেহের উপর দিয়া যায়। এই দেহ যেন দুর্গবিশেষ—শত্রুনিক্ষিপ্ত গোলা-গুলি সেই দুর্গটিকেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করে। দুর্গের যে মালিক, সে নিশ্চিন্ত হইয়া দুর্গমধ্যে আপনার কুঠরিতে নিশ্চিন্ত থাকিয়া অবিকারে নিদ্রা যায়। নিতান্তই যখন দুর্গটি আর টেকে না, তাহার পূর্ব্বেই দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, নূতন দুর্গ গড়িয়া লইয়া, তাহার ভিতরে আবার সুখসুপ্ত হয়। ফলে যাহাকে মৃত্যু বলা যায়, তাহা মৃত্যু নহে, তাহা খোলস ছাড়া ব্যাপার। জীবনযুদ্ধে সামর্থ্য পাইবার জন্য জীর্ণ খোলস ত্যাগ করার ব্যাপার,—ইহা প্রাণ রক্ষারই কৌশল। বস্তুতঃ প্রাণী মরে না। মৃত্যু—প্রাণ রক্ষার জন্য প্রাণী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত কৌশল মাত্র।

দেখা যায়, পুত্রের দেহ প্রায় সর্ব্বাংশেই পিতৃদেহের সদৃশ হয়। পুত্রের আকৃতি প্রকৃতি প্রায় সর্ব্বাংশেই পিতারই অনুরূপ হয়; অর্থাৎ নূতন খোলসটি প্রায় সর্ব্বাংশেই পুরাতন খোলসটির অনুরূপ হয়। মানুষের বাচ্চা মানুষই হয়, কুকুরের বাচ্চা কুকুরই হয়, আমের বীজে কাঁঠালগাছ জন্মে না, ইহাই নিয়ম। ইংরেজীতে ইহাকে বলে heredity; বাঙ্গলায় বলিব পিতৃক্রম। ইহাতে তত বিস্ময়ের কারণ নাই। একই প্রাণী যখন অবিকৃত থাকিয়া জন্মপরম্পরায় ভিন্ন ভিন্ন দেহ গড়িয়া লয়, তখন সেই পূর্ব্বজন্মের দেহ আর পরজন্মের দেহ সর্ব্বাংশে সদৃশ হইবে, ইহাতে বিস্ময় কি? যে বীজ পিতার দেহ গড়িয়াছিল, সেই বীজই যখন পিতৃদেহ হইতে চ্যুত হইয়া আসিয়া এবং বাহিরের আক্রমণ সত্ত্বেও অবিকৃত থাকিয়া পুত্রের দেহ নির্ম্মাণ করে, তখন পুত্র সর্ব্বাংশে পিতার অনুরূপ হইবে, ইহাতে বিস্ময় কি? সর্ব্বাংশে অনুরূপ না হইলেই বরং বিস্ময়ের কথা হইত। আপনারা প্রণিধান করিবেন, আমি একটুকু সাবধানে কথা কহিয়াছি। পুত্র সর্ব্বাংশে পিতার অনুরূপ হয়, ইহা আমি বলি নাই,—একটা "প্রায়" শব্দ বাক্যমধ্যে বসাইয়াছি; বলিয়াছি, "প্রায় সর্ব্বাংশে অনুরূপ হয়"। পুত্র পিতার মত হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে পিতার মত হয় না; একটু-না-একটু পার্থক্য থাকেই। এমন কি, এক পিতার বহু পুত্র থাকিলে, সেই পুত্রগণের মধ্যেও পরস্পর কিছু-না-কিছু ভিন্নতা থাকে। এই ভিন্নতাটুকুকে ইংরেজীতে বলে variation—বিকার, ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম। Herdityতে

বিস্ময়ের কথা নাই ; কিন্তু এই variationটাই বিস্ময়কর। বাহ্য জগতের সমস্ত উপদ্রবই দেহের উপর দিয়া যায়। ভিতরের বীজ যদি সর্ব্বতোভাবে অবিকৃতই থাকে, তাহা হইলে সেই অবিকৃত বীজ হইতে উৎপন্ন নূতন দেহের এই ভিন্নতা আসে কিরূপে ? এ বড় কঠিন সমস্যা। এ-কালের অনেক পণ্ডিত জোর করিয়া বলিতে চাহেন, বাহিরের আক্রমণে দেহেরই বিকার ঘটে ; কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে বীজকে সে আক্রমণ একেবারে স্পর্শ করে না, বীজ অবিকৃতই থাকিয়া যায়। তাহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই অবিকৃত বীজ হইতে যে নূতন দেহ অপত্যরূপে নূতন জন্ম গ্রহণ করে, এই নূতন দেহে ভিন্নতা বা বিকার আসে কোথা হইতে ? অথচ এ ব্যত্যয় অস্বীকারের উপায় নাই। বেটা বাপের সকল গুণ পায় না ; দুই ভাই, এমন কি—দুই যমজ ভাই সর্ব্বাংশে একরূপ হয় না, ইহা ত সত্য কথা। আবার এই ব্যত্যয় না থাকিলে ধরাপৃষ্ঠে এত চৈচিত্র্য ঘটিত না ; নূতন জাতি, নূতন species আবির্ভূত হইত না। Darwin গোড়ায় এই variation মানিয়া লইয়াছেন ; বলিয়াছেন, একই পিতার বহু পুত্রের মধ্যে সকলে জীবন-সংগ্রামে সমান যোগ্য হয় না। যাহার যোগ্যতা কোন-না-কোন কারণে একটু অধিক, তাহারই অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনাও অধিক ; তাহারই অপত্য রাখিয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক। আর যাহার যোগ্যতা অল্প, তাহারই অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা অধিক, তাহার অপত্য রাখিবার অবসর না ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক। কাজেই যে যোগ্য, তাহারই বংশ টিকিয়া যায় ; আর যে অযোগ্য, তাহার বংশ থাকে না। কিন্তু সকল অপত্যই যদি সর্ব্বাংশে পিতার সদৃশ হইত, তাহা হইলে সকলেরই যোগ্যতা সমান হইত ; যোগ্যতার তারতম্য থাকিত না ; জীবন-যুদ্ধে যোগ্যতমকে বাছিয়া লইয়া, ক্রমশঃ যোগ্যতা বৃদ্ধি ঘটাইয়া, নূতন জাতির—নূতন speciesএর উদ্ভাবনা সম্ভব হইত না। ফলে এই যে নানা speciesএর উদ্ভব, তাহা সেই variationএর ফলেই। খাঁটি heredity থাকিলে বাঘ বা হরিণ, সাপ বা ব্যাঙ—এইরূপ জাতিভেদ থাকিত না ; প্রাণী মাত্রই এক জাতি হইয়া পড়িত।

প্রাণীর দেহকে প্রাণরক্ষা ব্যাপারে কবচস্বরূপ মনে করা গিয়াছে। ভিতরে গোপনে রক্ষিত প্রাণীটি এই কবচ পরিয়া বাহ্য জগতের আক্রমণ প্রতিষেধ করে। কবচটি সেই আক্রমণ প্রতিষেধের উপযোগী হওয়া

আবশ্যক। তলওয়ারের আক্রমণ ঢালে ব্যর্থ হইতে পারে, বল্লমের খোঁচার পক্ষে ইস্পাতের সাঁজোয়া প্রশস্ত; কিন্তু গোলা গুলির আবির্ভাবের সঙ্গে ঢালও গিয়াছে, সাঁজোয়াও গিয়াছে। ধরাপৃষ্ঠ যুগে যুগে ভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। প্রাণীর প্রতি বাহ্য জগতের আক্রমণও যুগে যুগে ভিন্ন রূপ লইতেছে। এখন আমরা য়ুরোপকে শীতপ্রধান দেশ বলি। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আন্দাজ করেন, দেড় লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপ গ্রীষ্মপ্রধান ছিল; তখন য়ুরোপের মহারণ্যে অতিকায় হাতী, গণ্ডার ও সিংহ, শার্দ্দূল বিচরণ করিত। তার পর য়ুরোপে হিমের যুগ আসে; সমস্ত মহাদেশ বরফে ঢাকিয়া গিয়া প্রকাণ্ড বরফের ক্ষেত্রে পরিণত হয়; ইংরেজীতে সে যুগকে বলে glacial age—হিমানীযুগ। তখন গণ্ডারের বংশ, সিংহের বংশ য়ুরোপ ছাড়িয়া দক্ষিণে পলাইয়া আসিল; অতিকায় হাতীর বংশ, ম্যামথের বংশ হিমের আক্রমণ সহিতে না পারিয়া লুপ্ত হইল। এখন আবার য়ুরোপ গরম হইতেছে; বরফের ক্ষেত্র গলিয়া গিয়াছে; বরফ কেবল উত্তর মেরুর চারি দিকে খানিকটা দেশে বর্ত্তমান আছে, এবং Alps পর্ব্বতের মাথার উপরে আশ্রয় লইয়াছে। ফলে এই যুগ-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীকেও আপনার দেহ বদলাইয়া লইতে হইয়াছে। যে দেহ উৎকট গ্রীষ্মের উপযোগী, তাহা উৎকট হিমের উপযোগী নহে। Environmentএর সঙ্গে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকিলে কোন দেহই টিকিতে পারে না। এই সামঞ্জস্য লাভের যোগ্যতা না থাকিলে জীবন-যুদ্ধে পরাজয় ঘটে। খাঁটি heredity বা পিতৃক্রম স্থিতিশীল; উহাতে চলে না। Variation অর্থাৎ পিতৃক্রম হইতে ব্যত্যয় আবশ্যক হয়। প্রাণীর বীজ যদি বাহিরের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত থাকে, সেই আক্রমণ যদি তাহাকে একবারে স্পর্শ না করে, তাহা হইলে তাহার এই ব্যত্যয় লাভের, এই variationএর সম্ভাবনা আসে কোথা হইতে? এই প্রশ্নের আজিও মীমাংসা হয় নাই। পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন, জীবনযাত্রায় পিতার স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্ম পুত্রে সংক্রান্ত হয় না; acquired characters are not inherited। অথচ দেখা যায়, যখন সেই পুরাতন পৈতৃক বীজ হইতে অপত্যের দেহ গড়িয়া উঠে, তখন সেই অপত্যের দেহ সর্ব্বাংশে পিতৃদেহের সদৃশ হয় না; কিছু-না-কিছু ব্যত্যয়, বিকার বা ব্যতিক্রম ঘটেই। ঘটে বলিয়াই অপত্যগণের মধ্যে যোগ্যতা বিষয়ে

তারতম্য ঘটে। যে যোগ্যতর, সে-ই টিকিয়া যায়, তাহারই বংশ থাকে; যে যোগ্যতায় হীন, সে টেকে না; তাহার বংশ থাকে না। এক কালে পাঁচ আঙুলওয়ালা, চারি আঙুলওয়ালা ঘোড়া বিদ্যমান ছিল। যুগ-বিপ্লবে তাহাদের বংশ টিকে নাই; বংশপরম্পরায় যে ঘোড়া চারিটা আঙুল লুপ্ত করিয়া, বাকী একটা আঙুলকে মোটা ও শক্ত করিয়া খুরে পরিণত করিয়াছে, বর্ত্তমান যুগে তাহারই প্রাচুর্ভাব। বিশ্বাস না হয়, আমেরিকায় গিয়া যাতুঘরে প্রমাণ সাজান আছে, দেখিয়া আসুন। যে কারণেই হউক, বীজ অবিকৃত থাকে না। অবিকৃত থাকিলে, ধরাপৃষ্ঠে এত নূতন ধরণের উদ্ভিদ্‌, এত নূতন ধরণের জন্তুর আবির্ভাব হইত না। যুগ-বিপ্লবে যে সব জন্তু আপনাকে বিকৃত করিয়া, নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আপনার দেহের সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারে নাই, তাহারা ভূপঞ্জরের পাযাণস্তরে অস্থি-কঙ্কালের নিদর্শন রাখিয়া লোপ পাইয়াছে। অতএব প্রাণি-পদার্থের এই বিকার-প্রবৃত্তি এই যোগ্যতার্জ্জন-প্রবৃত্তি মানিতেই হইবে। প্রাণি-পদার্থ এবং প্রাণি-পদার্থে নির্ম্মিত প্রাণিদেহ ক্রমশঃ বিকৃত হয়। সেই বিকৃতি ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পায়, অথবা ধাপের পর ধাপ লাফ দিয়া বাড়ে, তিলে তিলে বাড়ে,—অথবা তাল তাল করিয়া বাড়ে,—তাহা লইয়া ডারুইনের শিষ্যেরা এবং De Vriesএর শিষ্যেরা বিতণ্ডা করুন। সে বিতণ্ডায় প্রবেশে আমার এখন দরকার নাই। কিন্তু এই বিকৃতি হিসাবের অঙ্কে ধরা যায় কি না, formulaয় বাঁধা যায় কি না, ইহা calculable বটে কি না, সে বিতণ্ডা আরও বড় বিতণ্ডা। তৎসম্বন্ধে দুটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

গোড়ার একটি কথা আপনাদের স্মরণে আছে কি না, জানি না। পদার্থ-বিদ্যা বা physical science যাহাকে জড় পদার্থ বলে, তাহার সমস্ত আচরণ formulaয় বাঁধা চলিতে পারে। দিলীপ রাজার প্রজা মনু-নির্দ্দিষ্ট বর্ত্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতেও পারিত; কিন্তু যাহা খাঁটি জড় পদার্থ, তাহা বৈজ্ঞানিকের সূত্র-নির্দ্দিষ্ট formulaয় বাঁধা পথ হইতে রেখা মাত্র ভ্রষ্ট হইতে পারে না; তাহার সমস্ত আচরণ একেবারে ধরাবাঁধা—determinate; কোন স্থানে কোনরূপ বিচ্যুতির বা freedomএর অবসর মাত্র নাই। খাঁটি জড় পদার্থে যে যন্ত্র নির্ম্মিত হয়, সেই যন্ত্রের প্রত্যেক আচরণ সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুনির্দ্দেশ্য; হউক তাহা নীরবে গগনচারী বিশাল

সৌর জগৎ, অথবা কানের কাছে টিক্‌টিক্‌কারী ক্ষুদ্র ঘটিকাযন্ত্র। হ্যালির ধূমকেতু কবে উঠিবে, তাহা সৌর জগতের গতিবিধি-ঘটিত formulaমধ্যে বাঁধা আছে; এবং ঘড়ির কাঁটা কখন্ কোথায় থাকিবে, তাহাও ঘড়ির গতিবিধি-ঘটিত formulaমধ্যে নিবদ্ধ আছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে— প্রাণিদেহ ঘড়ির মত একটা যন্ত্র মাত্র, অথবা যন্ত্রের অতিরিক্ত আর কিছু প্রাণিদেহে বিদ্যমান আছে? ঘড়ির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রচুর জটিলতা আছে;— উহার কাঠের খোল ও কাচের ঢাকনার ভিতর ছোট বড় দাঁতাল চাকা, স্প্রিং আর পেণ্ডুলম, ঘণ্টা মিনিটের কাঁটা, বাজিবার ঘণ্টা আর যথাসময়ে ঘুম ভাঙ্গাইবার আলারম্,—এই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উহার জটিলতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু প্রাণিদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জটিলতার তুলনায় ঘটিকাযন্ত্রের জটিলতা ছেলেখেলা মাত্র। এখন প্রশ্ন এই যে, প্রাণিদেহে জটিলতার চূড়ান্ত থাকিলেও, উহা যন্ত্র মাত্র কি না? এক জন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের ভাষা একটু বদলাইয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি;—"The living organism is a machine, but it is a self-stoking, self-repairing, self-preservative, self-adjusting, self-increasing, self-reproducing machine।" হাঁ, প্রাণিদেহ একটা যন্ত্র বটে; ঘড়ির মতই যন্ত্র বটে। তবে এই ঘড়ি নিজের দম নিজে দেয়, নিজের মরিচা-ধরা চাকায় নিজে তেল দেয়, নিজের স্প্রিং ছিঁড়িলে নিজেই বদলাইয়া লয়; নিজের পেণ্ডুলাম তুলিয়া নামাইয়া আপনাকে রেগুলেট করিয়া লয়; অপিচ ইহার নিজের কলেবর নিজে বাড়াইয়া ছোট্ট ওয়াচটি বড় ক্লক-ঘড়ির আকৃতি পায়; এবং পঞ্চাশ বৎসর চলিয়া ইহার কাঠামটা যখন নিতান্ত জীর্ণ হয়, তখন আর একটি ছোট্ট বাচ্চা ঘড়িকে জন্ম দিয়া আপনার যন্ত্রলীলা অবসান করে। ইহার উপরেও বলা যাইতে পারে যে, এই অদ্ভুত নবজাত বাচ্চা ঘড়িটি সর্ব্বাংশে পুরান ঘড়িটার মত হয় না। পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে গৃহস্থের যে রুচির বদল হইয়াছে, তদনুসারে নূতন ফ্যাসানের অনুবর্ত্তী হইবার জন্য, আপনার কাঠামটা একটু নূতন রকমের করিয়া লয়। গত তিন শত বৎসরে ঘড়ির কাঠামতে অনেক উন্নতি হইয়াছে। আগামী তিন শত বৎসরের মধ্যে আরও উন্নতি ঘটিয়া এই রকমের অদ্ভুত ঘটিকাযন্ত্র দোকানে কিনিতে পাওয়া যাইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে মানিয়া লইতে

হইবে, প্রাণীর দেহযন্ত্র ঐরূপ যন্ত্র মাত্র ; যন্ত্রের অতিরিক্ত আর কিছু উহাতে বিদ্যমান নাই। প্রাণিদেহের নির্ম্মাণে যে বহু উন্নতি ঘটিয়াছে, ভূপঞ্জর ঘাঁটিলেই তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় ; এবং এই উন্নতি, এই variation যে প্রাণের ধর্ম্মে নিষ্পাদিত হইয়াছে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। ঘড়িযন্ত্রের সমস্ত আচরণ mechanical formulaয় বাঁধা যায়, ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই প্রাণের আচরণ formulaয় বাঁধিতে পারা যায় কি না ? তাহাই হইল মূলগত সমস্যা।

Heredity বা পিতৃক্রম ব্যাপারটা ধরাবাঁধার ব্যাপার। পিতা যেমন ছিল, পুত্র ঠিক তেমনই হইবে, কোনরূপ বিচ্যুতি ঘটিবে না, ইহাই হইল খাঁটি heredity। ইহা এক রকম ছাঁছে-ঢালা ব্যাপার, অথবা মুদ্রাঙ্কনের ব্যাপার। এক ছাঁচের পুতুলগুলি ঠিক এক রকমেরই হয় ; টাকশালায় একই ছাঁদে একই রকমের মুদ্রা প্রস্তুত হয় ; ছাপাখানায় একই ছাপে সকল কেতাবই একই ভাবে মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়। heredityর ব্যাপারটা কতকটা সেই রকমের। ইহাকে formulaয় ফেলা সহজ বটে, formulaয় ফেলিবার চেষ্টাও হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে ডারুইনের gemmule theory এবং Weismannএর determinant theoryর উল্লেখ করিতে পারি। এই দুই theory কতকটা atomistic theoryর মত। আজিকার প্রবন্ধের আরম্ভেই আপনাদিগকে বলিয়াছি, ব্যাবহারিক জগতের কোনরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হইলেই আমাদিগকে কোন-না-কোনরূপ atomistic theoryর আশ্রয় লইতে হয়। পিতা-মাতার দেহধর্ম্ম কতকগুলা গোটা গোটা definite characterএর সমষ্টি মাত্র। এক-একটা character বা গুণ, একটা একটা গোটা জিনিস ; একটা characterএর যেন কোন ভগ্নাংশ নাই। পিতার দেহের মধ্যে যে বীজকোষটি অপত্যরূপে জন্ম গ্রহণের জন্য গোপনে সুরক্ষিত থাকে, সেই বীজকোষের মধ্যে অথবা তাহার অন্তর্গত nucleus বা দানার মধ্যে কতকগুলি গোটা গোটা কণিকা বিদ্যমান আছে, ইহা সচ্ছন্দে কল্পনা করা যাইতে পারে। ঐ কণিকার gemmule বা এরূপ একটা কিছু নাম দেওয়া যাইতে পারে। এক-একটি কণিকার সঙ্গে পিতার এক-একটা characterএর সম্পর্ক কল্পনা করা যাইতে পারে। পিতৃদেহে যতগুলি character, সেই দেহস্থিত বীজকোষের মধ্যে ততগুলি কণিকা ; এক এক কণিকা এক এক characterএর প্রতিনিধিস্বরূপ।

যেমন এক-একটা হরপ এক-একটা ধ্বনির প্রতিনিধি, সেইরূপ। বীজকোষটি যখন দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহিরে আসে, তখন তাহার সমস্ত কণিকা লইয়াই বাহিরে আসে, এবং অপত্য যখন সেই কোষ হইতে নূতন দেহ গড়িয়া তোলে, তখন প্রত্যেক কণিকা আপনার নির্দ্দিষ্ট character সেই দেহমধ্যে সংক্রান্ত করে। এইরূপে অপত্যের দেহ সর্ব্বাংগে পিতৃদেহের অনুরূপ হয়। এইরূপ একটা theory খাড়া করিয়া heredityর ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ডারুইন এবং ওয়াইজম্যান প্রভৃতি পণ্ডিতেরা পিতৃক্রম বুঝাইতে যে সকল থিয়োরি খাড়া করিয়াছেন, সে সকলই এই রকমের মোটা থিয়োরি। কিন্তু Variationএর ঐরূপ ব্যাখ্যা বড় কঠিন সমস্যা। চেষ্টা যে না হইয়াছে, তাহা নয়। যাঁহারা গ্যালটন এবং মেন্‌ডেল, এই দুইটা নাম শুনিয়াছেন, তাঁহারা এই Variation-তত্ত্ব কিছু শুনিয়া থাকিবেন। বড় বড় প্রাণীর অপত্য উৎপাদনে দুইটি কোষে সম্মিলনের প্রয়োজন হয়। একটি পিতৃকোষ বা পুংকোষ ও আর একটি মাতৃকোষ বা স্ত্রীকোষ। পিতৃকোষের অন্তর্গত কণিকাগুলি পিতার character বহন করে, এবং মাতৃকোষের কণিকাগুলি মাতার character বহন করে। উভয় কোষের সম্মিলনে যে অপত্য জন্মে, সে পিতা ও মাতা, উভয়েরই character পাইয়া থাকে। এই সম্মিলনের কতিপয় নিয়ম মেণ্ডেলের formulaয় বাঁধা পড়িয়াছে। পিতৃকোষ এবং মাতৃকোষের অন্তর্গত কণিকাগুলির নানাবিধ permutation এবং combinationএ অপত্য-দেহে কতকটা নূতনত্ব আসিবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় বটে। এইখানে রসায়ন-বিদ্যা হইতে তুলনা আনিয়া ব্যাখ্যার সুযোগ ঘটিতে পারে। হাইড্রোজেন-পরমাণুর সহিত অক্সিজেন-পরমাণুর যোগ হইয়া যে জলের অণু উৎপন্ন হয়, তাহাতে হাইড্রোজেনের ধর্ম্মও থাকে না, অক্সিজেনের ধর্ম্মও থাকে না ; নূতন ধর্ম্ম—জলের ধর্ম্ম তাহাতে আবির্ভূত হয়। Marsh gasএর অন্তর্গত হাইড্রোজেন-পরমাণু সরাইয়া তাহার স্থানে ক্লোরিন-পরমাণু বসাইলে, উহা আর marsh gas থাকে না ; উহা একটা নূতন gas হয়। রসায়নবিৎরা যাবতীয় যৌগিক পদার্থকে এইরূপে formulaয় গাঁথিয়া ফেলিয়াছেন। গোটাকতক মূল পদার্থের কণিকা বা পরমাণু আশ্রয় করিয়া অসংখ্য যৌগিক পদার্থের গঠন-প্রণালীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। সেইরূপ কতকগুলা মূল characterএর কণিকা অবলম্বন করিয়া

প্রাণিদেহের অসংখ্য বিকৃতির অসংখ্য প্রকার ভেদের ব্যাখ্যা চলিতে পারে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রাণিকোষ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার অন্তর্ভুক্ত nucleus বা দানাটিও দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়। দানাটি প্রথমে একগাছি সুতার মত হয়; সুতাগাছটি ছিঁড়িয়া কয়েকটি টুকরা হয়; টুকরার অর্দ্ধেকগুলি এক পাশে, অর্দ্ধেকগুলি অন্য পাশে লগ্ন হইয়া দুইগাছি নূতন সুতা উৎপন্ন হয়; দুই নূতন সুতার দুইটি নূতন দানা বাঁধে—এক এক দানাকে কেন্দ্রে লইয়া কোষটি দ্বিখণ্ডিত হয়।

অপত্যোৎপাদন ব্যাপারে পুংবীজের কোষের সহিত স্ত্রীবীজের কোষ মিলিত হয়; তৎপূর্ব্বে উভয় কোষেই এইরূপ ঘটনা ঘটে। দানার সুতাগাছটি ছিঁড়িয়া কতকগুলি টুকরা হয়। কিন্তু একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে। টুকরাগুলির অর্দ্ধেক মাত্র যুক্ত হইয়া নূতন দানা বাঁধে; অপর অর্দ্ধ সরিয়া পড়ে—দানা বাঁধে না। ফলে পুংকোষের পুরাতন দানার অর্দ্ধাংশ মাত্র থাকে, অপরার্দ্ধ নষ্ট হয়। স্ত্রীকোষেরও পুরাতন দানার অর্দ্ধাংশ থাকে, অপরার্দ্ধ নষ্ট হয়। পুংকোষের এই অর্দ্ধের সহিত স্ত্রীকোষের এই অর্দ্ধের মিলন ঘটিয়া পূর্ণ অপত্যকোষ উৎপন্ন হয়। পুরাতন দানাটি কেনই বা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হয়, আর কেনই বা সে খণ্ডগুলির অর্দ্ধেক লুপ্ত হয়, তাহার তাৎপর্য্য এখনও বুঝা যায় না। হয়ত ইহা হইতে একটা পূর্ণাঙ্গ atomistic theory ভবিষ্যতে খাড়া করা চলিবে। কিন্তু তাহা ভবিষ্যতের সমস্যা।

কিন্তু সেই সমস্যার সমাধান সাধ্য হইবে কি? ব্যাপারটা একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করুন। একটি অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষ জন্মে। সেই প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষের যাবতীয় ধর্ম্ম সেই বীজের মধ্যে নিহিত আছে; উহার প্রত্যেক ধর্ম্ম, প্রত্যেক character এক-একটি কণিকা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। যেন ভবিষ্যতের অশ্বত্থগাছটারই অতি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি সেই বীজের মধ্যে আবদ্ধ আছে। বীজ যখন বড় হইয়া গাছে পরিণত হয়, তখন নূতন ধর্ম্ম কিছুই আসে না। যাহা ক্ষুদ্র বীজের অন্তরালে গুপ্তভাবে ছিল, প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহাই ব্যক্ত হইয়া, বড় হইয়া প্রকাশ পায় মাত্র। অতএব বীজ হইতে গাছের উৎপত্তি, ইহাতে নূতনের সৃষ্টি নাই, ইহাতে পুরাতনেরই আবিষ্কার আছে। শুধু তাহাই কেন। সেই অশ্বত্থ-বৃক্ষ হইতে ভবিষ্যতে যত অশ্বত্থবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, সে সকলেরই সমস্ত ধর্ম্ম

সেই আদি বীজমধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে; সেই প্রথম বীজে যে কয়টি কণিকা ছিল, সেই কয়টিকেই সাজাইয়া গোছাইয়া, নানারূপে সন্নিবিষ্ট করিয়া অশ্বত্থ-বৃক্ষের বংশপরম্পরার উৎপাদন করা যাইতে পারে। ইহাকে atomic theory of life বলা যাইতে পারে। রসায়ন শাস্ত্রের পরমাণুবাদ আপনারা জানেন। ধরিয়া লওয়া হয়, আদি কালে বিশ্ব ব্যাপিয়া কতকগুলা পরমাণু ছিল; অদ্যাপি সেই পরমাণুগুলি বর্ত্তমান আছে; একটিও নষ্ট হয় নাই, অথবা একটিও নূতন আবির্ভূত হয় নাই। প্রাচীন কালের সেই পরমাণুগুলাই নানারূপে দল বাঁধিয়া, জমাট বাঁধিয়া যাবতীয় যৌগিক দ্রব্যের উৎপাদন করিয়াছে। সেইরূপ আদি কালে কতকগুলি প্রাণ-কণিকা ছিল। সেই প্রাণ-কণিকাগুলি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, একটিও নষ্ট হয় নাই, একটিরও নূতন সৃষ্টি হয় নাই। সেই পুরাতন প্রাণ-কণিকাগুলি নানারূপে সংহত হইয়া, জমাট বাঁধিয়া বর্ত্তমান প্রাণিগণের নানা মূর্ত্তি উৎপাদন করিয়াছে। সমস্ত প্রাণময় জগতে যদি একটা আদি পিতা অথবা আদি মাতা কল্পনা করা যায়, বর্ত্তমান কালের যাবতীয় বংশধর সেই আদি পিতার বা আদি মাতার মধ্যেই ছিল, গুপ্ত ছিল। কোন characterএর নূতন সৃষ্টি হয় নাই; যাহা ছিল গুপ্ত বা অব্যক্ত, এখন হইয়াছে তাহা ব্যক্ত। এই ব্যাপারকে অভিব্যক্তি বা Evolution বলা যাইতে পারে। এ-কালের পণ্ডিতেরা এই অভিব্যক্তিবাদের জয়ডঙ্কা বাজাইতেছেন। আদিতে যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। নূতন কিছুই হয় নাই। যাহা পুরাতন, তাহাই নূতন নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া আপনাকে প্রকাশ বা আবিষ্কৃত করিতেছে মাত্র। এই আবিষ্কার ঘটনার বা নূতন মূর্ত্তি-গ্রহণ ঘটনার formula নির্দ্ধারণ বিজ্ঞান-বিদ্যার কার্য্য। Formula বাহির করিয়া ফেলিতে পারিলে, প্রাণময় জগতের যাবতীয় ভবিষ্যৎ ঘটনা বৈজ্ঞানিকের গণনার আয়ত্ত হইয়া পড়িবে। আচার্য্য হক্সলী এই কথাটা অতি স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তিটা আপনাদিগকে শুনাইতে চাহি।

"If the fundamental proposition of evolution is true, namely, that the entire world, animate and inanimate, is the result of the mutual interaction according to definite laws of forces possessed by the molecules which made up the primitive nebulosity of the universe, then

it is no less certain that the present actual world reposed potentially in the cosmic vapour, and that an intelligence, if great enough, could from his knowledge of the properties of the molecules of that vapour have predicted the state of the fauna in Great Britain in 1888 with as much certitude as we say what will happen to the vapour of our breath on a cold day in winter." একটু ঘুরাইয়া এই উক্তির বাঙ্গালা তর্জ্জমা করিয়া বলা যাইতে পারে—আদি কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরমাণুগুলি ছড়াইয়া ছিল। সেই পরমাণুগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করিত। এখনও কোন বৈজ্ঞানিক সেই সমুদয় আকর্ষণ-বিকর্ষণকে সূত্রবদ্ধ করিতে পারেন নাই; আশা করি, এক দিন পারিবেন। যখন পারিবেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যৎ তাঁহার করতলস্থিত আমলকী ফলের মত আয়ত্ত হইবে। সেই আদি কালে কোন্ পরমাণু কোথায় ছিল এবং কি বেগে ছুটিতেছিল, তাহা বলিলেই তিনিও গণিয়া বলিবেন, কোন্ বর্ষের কোন্ মাসের কোন্ তারিখে 'ভারতবর্ষ' পত্রে আমার এই ভীষণ প্রবন্ধ বাহির হইবে। আচার্য্য টিণ্ডালও অতি সংক্ষেপে ও অতি স্পষ্ট ভাষায় পরমাণুর জয়গান করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "I see in the atom the promise and potency of all terrestrial life."

বিজ্ঞান-বিদ্যার তরফে ইহার অপেক্ষা স্পষ্টতর উক্তি আর হইতে পারে না। প্রাণময় জগতের সমস্ত ব্যাপার যদি গণনাসাধ্য হয়, তাহা হইলে প্রাণের আর বিশিষ্টতা কিছুই থাকে না। সমস্ত প্রাণময় জগৎটা জড় জগতেরই মূর্ত্তি-ভেদ হইয়া পড়ে, এবং প্রাণিদেহ মাত্রই জড় যন্ত্রে পরিণত হয়। বিজ্ঞানবিদ্‌দের এই দর্পের উক্তি নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা যাইবে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধে ইহা লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছি এবং আমার বক্তব্য প্রায় শেষ করিয়াছি। একটা কথা তখন আমি প্রসঙ্গক্রমে তুলিয়াছিলাম, আপনাদের মনে থাকিতে পারে। যাহা খাঁটি জড়, তাহার কোন history বা কাহিনী নাই। জড়ের গায়ে অতীতের কোন দাগ বসে না। অতীত তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়, কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না। একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু আদি কালে যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ আছে এবং দূর

ভবিষ্যতেও সেইরূপ থাকিবে। যে অঙ্গার-কণিকা আজি গাঁজার কলিকায় পোড়াইতেছি, তাহা শঙ্করাচার্য্যের মগজের ভিতর এক দিন কিলবিল করিত কি না, তাহার কোন চিহ্ন নাই। একটি মিছরি-দানার গুণাগুণ সম্বন্ধে আজিকার রসায়নের কেতাবে যে কথা লেখা থাকিবে, হাজার বৎসর পরের কেতাবেও ঠিক সেই কথাই থাকিবে। জড় দ্রব্য চির-পুরাতন। সৌর জগতের গ্রহ উপগ্রহ আজি কোথায় কি ভাবে আছে, বলিয়া দাও,—কলির শেষে কোথায় কি ভাবে থাকিবে, গণিয়া বলিব; অতীত ইতিহাস জানিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন হইবে না। অথবা সত্য যুগের আরম্ভে কে কোথায় কি ভাবে ছিল, তাহা বলিয়া দিলে যুগান্তে বা কল্পান্তে কোথায় কি ভাবে থাকিবে, তাহা হিসাব করিয়া বলা যাইবে; মাঝের অবস্থা জানিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন হইবে না। কেন না, প্রত্যেক গ্রহের, প্রত্যেক উপগ্রহের পথ সুনির্দ্দিষ্ট formulaবদ্ধ; সেই পথ হইতে তাহার ভ্রষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। জ্যামিতি-শাস্ত্রোক্ত সরল রেখার দুইটি মাত্র বিন্দু কোথায় আছে বলিয়া দিলে, সমস্ত সরল রেখাটাই বাঁধা পড়িয়া যায়। বৃত্ত রেখার তিনটি মাত্র বিন্দুর অবস্থান বলিয়া দিলে সমস্ত বৃত্ত রেখাটাই বাঁধা পড়িয়া যায়। এও কতকটা সেইরূপ। জড় দ্রব্য যে পথে চলে, সেই পথের কিয়দংশ বিজ্ঞানবিৎকে ধরিয়া ফেলিতে দাও, তাহার সমস্ত পথটাই বিজ্ঞানবিদের আয়ত্ত হইয়া পড়িবে। সেই পথ ছাড়িয়া বিপথে যাইবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। ইহার মানেই হইল এই যে, খাঁটি জড় দ্রব্যের history নাই। যে দ্রব্যের বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে পারিলেই তাহার সমস্ত অতীত এবং সমস্ত ভবিষ্যৎ চোখের উপরে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার history, তাহার পুরাতত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়োজন থাকে না। তাহার ভবিষ্যতের কাহিনী জানিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। কেন না, বর্ত্তমানের মধ্যেই তাহার সমস্ত অতীত এবং সমস্ত ভবিষ্যৎ নিয়মিত রহিয়াছে। এই জন্যই আমি historyর কথা তুলিয়াছিলাম। যাহা চির-পুরাতন, তাহার ইতিহাস নাই। অচিন্তিতপূর্ব্ব নূতনের আবির্ভাবেই পুরাতনত্বের ব্যত্যয় ঘটায়। জড় জগৎ চির-পুরাতন; উহাতে নূতনের আবির্ভাব সম্ভাব্য নহে। বিজ্ঞান-বিদ্যা একবার উহার গতিবিধি সূত্রবদ্ধ করিয়া ফেলিলে, আর নূতন observationএর, নূতন পর্য্যবেক্ষণের

আবশ্যকতা থাকে না। কোনরূপ নূতন experiment বা নূতন পরীক্ষার দরকার হয় না। নিউটন যে দিন Law of Gravitation দ্বারা সৌর জগতের গতিবিধি বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন, তদবধি আর নূতন পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন থাকে নাই। এখনও যদি জ্যোতিষীরা পর্য্যবেক্ষণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, নিউটনের নিয়মসূত্রে তাঁহাদের সন্দেহ আছে; কি জানি, যদি উহার কোথাও সংশোধন দরকার হয়। নেপচুন গ্রহকে আবিষ্কারের জন্য দূরবীন লাগাইবার দরকার হয় নাই; কাগজে-কলমে অঙ্ক কষিয়া উহাকে ধরা গিয়াছিল। জড় জগতের কোন ঘটনা যদি এখনও গণনাসাধ্য হইয়া না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহা বিজ্ঞান-বিদ্যার দোষ নহে, উহা বৈজ্ঞানিকের দোষ—বৈজ্ঞানিক এখনও সূত্রবদ্ধ করিতে পারেন নাই, সেই জন্যই গণনা চলিতেছে না; সেই জন্য এখনও প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে; কেবল কাগজে-কলমের হিসাবে কুলাইতেছে না।

আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা একটা কথা শুনিয়া থাকিবেন,—reversibility। পদার্থবিদ্যা যে সকল ক্রিয়াকর্ম্মের আলোচনা করে, তাহার কতকগুলা reversible, আর কতকগুলা reversible নয়,—irreversible। ইংরেজী reversion শব্দের অর্থ উল্টান বা পাল্টান, সাধু ভাষায় বিপর্য্যাস। যাহাকে উল্টান যায়, বিপর্য্যস্ত করা চলে, তাহা reversible, অন্যে irreversible। যে পথে আসিয়াছে, ঠিক সেই পথে যাহাকে ফেরান যায়, তাহাই reversible; যাহা ফিরিবার সময় অন্য পথ ধরে, তাহা reversible নয়। এক স্থান হইতে চলিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হইলে, যদি পথ অতিবাহনের কোন চিহ্ন না থাকে, তাহা হইলে বলা যায় যে, ঘটনাটা reversible; কেন না, চলার উল্টা ফেরা; যেমন লাভের উল্টা লোকসান। কেন না, চলিতে যেটুকু লাভ হয়, ফিরিতে সেইটুকু লোকসান ঘটে; স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলে লাভে-লোকসানে কাটাকাটি হইয়া পূর্ব্বাবস্থার প্রাপ্তি ঘটে; পথ চলার কোন নিদর্শনই থাকে না। আর যদি প্রত্যাবর্ত্তনের পর কিছু লাভের অঙ্ক অথবা ক্ষতির অঙ্ক স্থায়ী ভাবে দাঁড়াইয়া যায়, সেই লাভের অঙ্ক বা ক্ষতির অঙ্ককে আমরা পথ চলার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিতে পারি; তখন ঘটনাটা হয় irreversible; এই irreversible ঘটনা পথের চিহ্ন বহন

করে, যে পথে চলিয়াছে, সেই পথের দাগ তাহার গায়ে কাটিয়া বসে ; কোন্ পথে চলিয়াছে, তাহার তথ্য না জানিলে সেই দাগ কিরূপে আসিল, তাহা বুঝা যায় না। এই স্থলেই পথ চলার ইতিহাস জানা আবশ্যক হয়। যে ঘটনা reversible, তাহাতে পথ-চিহ্ন কিছুই থাকে না ; কাজেই পথ চলার ইতিহাস তাহার পক্ষে অনাবশ্যক। পদার্থবিদ্যামধ্যে এইরূপ reversible এবং irreversible—বিপর্য্যাসযোগ্য এবং বিপর্য্যাসের অযোগ্য বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য গোটাকতক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মনে করুন, ঘড়ির পেণ্ডুলম। উহা ক্রমাগত দোল খাইতেছে এবং প্রত্যেক দোলে ওলট-পালট হইতেছে। যেমন ওলট, তেমনি পালট। ঘড়িতে দম দেওয়ার পর উহা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত কত দোল খাইয়াছে, উহার গায়ে তাহার কোন চিহ্ন মাত্র নাই। আমাদের পৃথিবীটা একটা বৃহৎ পেণ্ডুলম। উহা সূর্য্যের চারি দিকে কেবলই পাক খাইতেছে। এক এক বৎসরে এক এক পাক। বৎসরান্তে যথাস্থানে ফিরিয়া আসে ; পূর্ব্ববৎসরের কোন চিহ্ন মাত্র রাখে না। চিহ্ন রাখিলে এত সহজে উহার গতিবিধির বিনির্ণয় জ্যোতির্ব্বিদের পক্ষে সাধ্য হইত না। এইখানে হয়ত আপনারা আমার ভুল ধরিবেন ;—ধূমকেতুগুলা পৃথিবীর মত একই নিয়মে সূর্য্যের চারি দিকে পাক খাইয়া ঘুরিয়া আসে ; কিন্তু দেখা গিয়াছে, কোন কোন ধূমকেতু একটু-না-একটু মূর্ত্তি বদলাইয়া ঘুরিয়া আসে : যে পথ অতিক্রম করিয়াছে, সেই পথের চিহ্ন লইয়া ফিরিয়া আসে। Encke সাহেবের ধূমকেতুর যে সময়ে ঘুরিয়া আসা উচিত, তার আড়াই ঘণ্টা আগে সে ফিরিয়া আসে ; পথিমধ্যে কিসে তাহাকে ঠেলিয়া দেয়, কে জানে! Biela সাহেবের ধূমকেতু ফিরিবার সময়ে নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। প্রত্যেক পাক ঘুরিয়া উহা শীর্ণ দেহ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। উত্তরে আমি বলিব, ধূমকেতুটার গতিবিধি ঠিক reversible ছিল না ; যে পথে চলিয়াছে, সে পথে এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে,—কোন জ্যোতিষী যাহার হিসাব লইতে পারেন নাই—নিউটনের formulaর মধ্যে তাহার হিসাব ছিল না। হয়ত পথে সে কোন রকম বিঘ্ন পাইয়াছিল। যে পথে চলিয়াছিল, সেই পথের সমস্ত ইতিহাসটা জানিলে, আমরা সেই বিঘ্ন-বিপত্তির তথ্য নির্ণয় করিতে পারিতাম। পৃথিবীর মত, চাঁদের মত বড় বড় জ্যোতিষ্কের চলাফেরায়

সেইরূপ বাধার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কাজেই তাহাদের গতিবিধি গণনায় জ্যোতির্ব্বিদ্যা মজবুত। কিন্তু ধূমকেতুর গণনায় জ্যোতির্ব্বিদ্যাকে হারি মানিতে হয়—তাহার formulaয় কুলায় না। দূরবীন হাতে করিয়া সমস্ত পথটার পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। পৃথিবীর গতিবিধিতেও যে ঐরূপ বাধাবিপত্তি একেবারে নাই, তাহা কিরূপে বলিব? পৃথিবী এঞ্জিনের চাকার মত ঘুরিতে ঘুরিতে, আবর্ত্তন করিতে করিতে চলিতেছে বটে, কিন্তু আড়াই লক্ষ মাইল দূর হইতে চাঁদ সেই পৃথিবীরূপ চাকার পিঠে ব্রেক কষিয়া বসিয়া আছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলবিনের পূর্ব্বে কেহ তাহার তথ্য জানিত না। মহাসাগরের জলরাশি সেই ব্রেক। চাঁদ সেই জলরাশিকে আপনার দিকে খেঁচিয়া ধরিয়া জোয়ারের উৎপাদন করিয়া পৃথিবীর আবর্ত্তনকে থামাইবার চেষ্টা করিতেছে; এ তথ্য লর্ড কেলবিনের আগে কেহ জানিত না। চাঁদ সর্ব্বদাই এই লাগাম ধরিয়া বসিয়া আছে। ছয় মাস ধরিয়া পৃথিবী আগে চলিতেছে, তখনও সেই লাগাম; আর পরবর্ত্তী ছয় মাসে পৃথিবী ঘুরিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে, তখনও সেই লাগাম। এই লাগামের টানে পৃথিবীর আবর্ত্তনের ব্যাঘাত বা ক্ষতি ঘটিতেছে; চলিতেও ক্ষতি; ফিরিতেও ক্ষতি; মোটের উপর খানিকটা ক্ষতি লইয়া পৃথিবী স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। এই ক্ষতিটাই তাহার পথশ্রমের চিহ্ন। এই ক্ষতির পরিমাণ যৎসামান্য; কিন্তু বৎসরের পর বৎসর এই ক্ষতির পরিমাণ জমিয়া যাইতেছে। দুই হাজার পাঁচ হাজার বৎসরে এই ক্ষতি নগণ্য হইলেও, দুই কোটি পাঁচ কোটি বৎসরে ইহা নগণ্য থাকিবে না। পৃথিবী এখন যে বেগে আবর্ত্তন করিতেছে, সেই বেগ ক্রমশঃ মন্দ হইবে। কোটি বৎসর পরে দিন রাত্রির পরিমাণ এখনকার ঘণ্টার চব্বিশ ঘণ্টা ছাড়াইয়া উঠিবে। কাজেই পৃথিবীর গতিবিধিকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যাসযোগ্য বলিতে পারি না। উহার মধ্যে এমন একটু ব্যতিক্রম আছে, নিউটনের formulaয় যাহা ধরা পড়িবে না; যাহার জন্য নূতন formula বাঁধিতে হইবে; যত দিন বাঁধিতে না পার, তত দিন ঘড়ি ধরিয়া আবর্ত্তনকাল মাপিয়া যাও। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। খানিকটা বাতাসে চাপ দিলে উহা সঙ্কুচিত হয়; চাপ তুলিয়া লইলে উহা পূর্ব্ববৎ প্রসার লাভ করে। বরফে যতটা উত্তাপ দিলে গলিয়া জল হয়, সেই জল হইতে ততটা উত্তাপ বাহির করিলে সেই বরফ ফিরিয়া পাওয়া যায়। চা-খড়িকে গরম করিলে

খানিকটা কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বাহির হইয়া যায় ; পড়িয়া থাকে খানিকটা চুন ; আবার ঠাণ্ডা করিলে সেই কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস চুনের সহিত মিলিত হইয়া চা-খড়ির উৎপাদন করে। এই সমস্ত ঘটনা বিপর্য্যাসযোগ্য—reversible। বরফে কোন চিহ্ন থাকে না, যাহাতে বুঝা যায় যে, উহা জলের অবস্থায় ছিল। চা-খড়িতে কোন চিহ্ন থাকে না যে, এককালে উহা চুনের অবস্থায় ছিল। উহাদের অতীত কাহিনী, উহাদের পথের খবর জানিবার কোন প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু অন্য দৃষ্টান্ত লউন। ইস্পাতের তলোয়ারে মোচড়ের পর ছাড়িয়া দিলে, উহা পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে ; উহার স্থিতিস্থাপকতা reversible ; কিন্তু লোহার দণ্ড মোচড় দিলে নুইয়া যায়, পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে না। ইস্পাতকে চুম্বকে ঘষিয়া সহজে উহাকে চুম্বকে পরিণত করা চলে, কিন্তু একবার চুম্বকতা পাইলে আর সহজে সেই চুম্বকতা নষ্ট করা যায় না। গরম দ্রব্যের উত্তাপ সহজেই বাহির হইয়া ঠাণ্ডা দ্রব্যে সঞ্চালিত হয় ; কিন্তু ঠাণ্ডা দ্রব্য হইতে সেই উত্তাপ ফিরিয়া গরম দ্রব্যে আসিতে চায় না ; তাহা সম্ভব হইলে বরফের উত্তাপে আমরা ভাত রাঁধিতে পারিতাম। এই সকল ঘটনা ওল্‌টান চলে না, ইহারা reversible নয়। একখানা তলোয়ারের আচরণ অন্য তলোয়ারের সমান নহে ; একখানা চুম্বক সর্ব্বাংশে অন্য চুম্বকের মত নহে ; লোহার ভিতরে উত্তাপের চলাচল, তামার ভিতরে উত্তাপের চলাচলের সদৃশ নহে ; এমন কি, দুইখানা তাম্রখণ্ডে উত্তাপ এক নিয়মে চলে না। একটা সাধারণ সূত্রে এক শ্রেণীর যাবতীয় দ্রব্যকে বাঁধা চলে না। প্রত্যেক দ্রব্যের আচরণ প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সেই দ্রব্যের জন্য একটি মোটা formulaয় সন্তুষ্ট থাকিতে হয় ; একটা দ্রব্যের আচরণে যে formula খাটে, তদ্রূপ অন্য দ্রব্যের আচরণে সে formula খাটে না। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের আচরণের ভিন্ন ভিন্ন পথ। প্রত্যেক দ্রব্যেরই যেন একটা গোঁ থাকে ; একটা মেজাজ থাকে ; সেই গোঁ অনুসারে বা মেজাজ অনুসারে সেই দ্রব্য চলিয়া থাকে ; সেই গোঁ বা মেজাজ আমাদিগকে মানিয়া চলিতে হয়। কোন্ দ্রব্যের গোঁ কিরূপ, তাহা পর্য্যবেক্ষণে দেখিতে হয় ; প্রত্যেকের আচরণের পৃথক্ ইতিহাস পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিতে হয়। বিশুদ্ধ গণিতবিদ্যায় বা খাঁটি mechanicsএ ইহা কুলায় না ; ইহার জন্য physicsএর দরকার হয়। Observation বা পর্য্যবেক্ষণ এবং experiment বা পরীক্ষা আবশ্যক

হয়। ইহারা যে পথে চলে, সে সমস্ত পথটা দেখিতে হয়; পথের একাংশ দেখিয়া অন্য অংশের নিরূপণ চলে না; এক অংশের বক্রতা দেখিয়া অন্য অংশের বক্রতা নির্দ্ধারণ চলে না।

এই সমুদায় দৃষ্টান্ত জড় জগৎ হইতে লইয়াছি। যে সকল জাগতিক ঘটনা পাল্টান চলে, পাল্টাইলে ঠিক পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে, পথের কোন চিহ্ন রাখে না, সেই ঘটনাগুলাই গণিত-বিদ্যার অধীন থাকে; একবার formulaয় ফেলিতে পারিলে আর ভাবিতে হয় না; কাগজে কলমে আঁক কষিয়া তাহার গতিবিধি, চালচলন নিরূপিত হয়। কিন্তু যে সকল ঘটনা পাল্টান চলে না, যাহা পূর্ব্বাবস্থায় কিছুতেই ফেরে না, যে পথে চলে, সে পথের চিহ্ন গায়ে লইয়া ফেরে, তাহাদের গতিবিধি গণনাযোগ্য হয় না, তাহাদের পথের কাহিনী মন দিয়া আদ্যন্ত শুনিতে হয়, পদে পদে তাহার দশার বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিতে হয়। জড় জগতের বহু ঘটনা এখনও এই অবস্থায় রহিয়াছে; এখনও বিজ্ঞানবিদের সম্পূর্ণ বশ হয় নাই; জড় জগতের mechanical description এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এমন কি, লর্ড কেলবিনই একদিন বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারই মোটের উপর irreversible; উহা একটা নির্দ্দিষ্ট পরিণতির অভিমুখে একটানে চলিতেছে; সে মুখ হইতে ফিরিয়া আসার কোন সম্ভাবনাই নাই; সেই চরম পরিণতিকে নিবৃত্তি বলা যাইতে পারে। বিশ্বজগতের বৃহৎ যন্ত্রটা চলিতেছে; বহু কাল হইতে চলিতেছে এবং এখনও বহু কাল ধরিয়া চলিবে; কিন্তু একদিন-না-একদিন এই যন্ত্রকে থামিতে হইবে; নিবৃত্তিতে ইহার সমাপ্তি হইবে; একবার থামিয়া গেলে আর ইহা চলিবে না, আর পাল্টাইবে না। কেলবিনের এইরূপ সিদ্ধান্তের একটি হেতু ছিল। জাগতিক ব্যাপারের সর্ব্বত্রই শক্তির অপচয় হইতেছে; dissipation হইতেছে। জগতের যাবতীয় শক্তি ক্রমশঃ উত্তাপে পরিণত হইতেছে; সমস্ত শক্তি একদিন উত্তাপে পরিণত হইবে। সেই উত্তাপ জগতের সর্ব্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পড়িবে। আপনাদিগকে বলিয়াছি, উত্তাপ গরম হইতে ঠাণ্ডায় যায়; ঠাণ্ডা হইতে গরমে যায় না; প্রদীপের উত্তাপে বরফ গলে; কিন্তু বরফের উত্তাপে প্রদীপ জ্বলে না। ষ্টিম এঞ্জিনের একটি স্থানে গরম জল সঞ্চিত থাকে, আর এক স্থানে থাকে ঠাণ্ডা জল; ঐ গরম জলের উত্তাপ ঠাণ্ডা জলে সংক্রান্ত হইবার সময় এঞ্জিন চলে; সেই উত্তাপের কিয়দংশ কাজে লাগে; দুই জল

সমান গরম হইলে অথবা সমান ঠাণ্ডা হইলে এঞ্জিন চলিত না। জড় জগৎটাও একটা বৃহৎ এঞ্জিন; উহার কোথাও গরম, কোথাও বা ঠাণ্ডা; উত্তাপ কোথাও ঘনীভূত হইয়া গরম হইয়া আছে; কোথাও ছড়াইয়া পড়িয়া ঠাণ্ডা হইয়া আছে। জগতের সমস্ত উত্তাপ যদি সর্ব্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে, কোথাও গরম, কোথাও ঠাণ্ডা না থাকে, তাহা হইলে জগৎযন্ত্র অচল হইয়া পড়িবে। জগৎযন্ত্র তখন আর চলিবে না; পরম নিবৃত্তিতে সমাপ্তি পাইবে। সেই চরম দশা হইতে ফিরিবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। কেলবিন বিশ্বজগতের শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর, এই কথা শুনাইয়া বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীকে চমকাইয়া দিয়াছিলেন। এই ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত হইলে জগৎযন্ত্র যখন নিরস্ত হইবে, বৈজ্ঞানিকের কোন formulaই তখন আর খাটিবে না। পরম নিবৃত্তির আবার formula কি? উহা ত একাকার নির্ব্বিকার অবস্থা। কেলবিন কর্ত্তৃক এই সিদ্ধান্তের প্রচার হইতে বৈজ্ঞানিকেরা কতকটা মূঢ়ের মত বসিয়া আছেন; কোন সঙ্গত উত্তর অদ্যাপি দিতে পারেন নাই; তবে তাঁহারা আশা করেন যে, কেলবিনের সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন একটা প্রমাদ নিশ্চয়ই রহিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন যে, জড় জগতের কোন ঘটনাই বস্তুতঃ irreversible নহে; এখন যে পাল্টাইতে পারি না, সে কেবল আমাদের অক্ষমতা মাত্র। আমাদের হাত পা প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলা মোটা; চোখ কান প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় মোটা; আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্র-তন্ত্র, সমস্তই স্থূল। জড় পদার্থের সূক্ষ্ম রহস্য আমরা ভেদ করিতে পারি না। সেই জন্যই আমরা ঐ সকল ঘটনাকে পাল্টাইতে পারিতেছি না। আমরা স্থূল দ্রব্য লইয়াই কারবার করি। এমন কি, অণু-পরমাণুগুলারও গতিবিধি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না। তাহাদিগকে ধরিয়া ছুঁইয়া তাহাদের সহিত কারবার করা ত দূরের কথা। সে ক্ষমতা থাকিলে, আমরা সমুদায় জাগতিক ঘটনাগুলাকেই পাল্টাইতে পারিতাম। অণু-পরমাণু বাছিয়া লইয়া স্বেচ্ছাক্রমে খাটাইতে পারিতাম। অণু-পরমাণুগুলিকে চাপিয়া ধরিতে পারিলে, যদৃচ্ছাক্রমে উল্টা পথে প্রেরণ করিতে পারিতাম। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা তাহা পারি না। কাজেই কতকগুলা ঘটনাকে আমরা irreversible—বিপর্য্যাসের অযোগ্য মনে করিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া আছি; কিন্তু বস্তুগত্যা আমাদের পক্ষে যাহা অসাধ্য, অন্য জীবের পক্ষে তাহা সাধ্য হইতে পারে; অন্ততঃ ক্লার্ক ম্যাক্স্ওয়েলের মানসপুত্র

demonগুলির পক্ষে তাহা অত্যন্ত সুসাধ্য। এই demonগুলির কথা আমি স্থানান্তরে বলিয়াছি; আপনাদের যদি কৌতূহল থাকে, আমার 'প্রকৃতি' নামক পুস্তকের পাতা উল্টাইলে তাহাদের পরিচয় পাইবেন। ফলতঃ জড় জগতে আপাততঃ যে irreversibility দেখিতে পাই, তাহা জড় পদার্থের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী বা essential নহে। কোন জাগতিক ঘটনাকে একেবারে পাল্টানর অযোগ্য মনে করিবার সম্যক্ হেতু নাই। বিশ্বজগতের কোথাও-না-কোথাও ক্লার্ক ম্যাক্স্‌ওয়েলের demonগুলি গুপ্তভাবে বসিয়া আছে, তাহারা সমুদায় ঘটনাকে পাল্টাইয়া দিতেছে অথবা পাল্টাইয়া দিবে। তাহারা যে বিজ্ঞান-বিদ্যা রচনা করিবে, তাহার কোথাও কোন irreversible ঘটনার উল্লেখ থাকিবে না। কেলবিনের বাণী শুনিয়া বিজ্ঞান-বিদ্যার একেবারে হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। বিশ্ব-জগতের শক্তিরাশির এক দিকে যেমন অপচয় হইতেছে, অন্যত্র সেই অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাই যদি হয়, তাহা হইলে বিশ্ব-জগতের পরিণাম ভাবিয়া শঙ্কিত হইবার হেতু নাই। জগৎযন্ত্র এখনও যেমন চলিতেছে, চিরকালই তেমনই চলিবে; জগৎ-প্রবাহ কস্মিন্ কালে একেবারে বন্ধ হইবে না। ম্যাক্স্‌ওয়েলের demonগুলাই এমন formula বাঁধিয়া দিবে, চিরকালের জন্য সেই সূত্র দ্বারা নির্দ্ধারিত পথে জগৎপ্রবাহকে চলিতেই হইবে; কখন কোথাও বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকিবে না; কখন থামিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে না। লর্ড কেলবিন বর্ত্তমান অবস্থায় জাগতিক শক্তির অপচয় দেখিয়া জগৎপ্রবাহের অন্ত কল্পনা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্যা আশা করেন যে, কোন-না-কোন স্থানে এই অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা আছে; তাহা এক দিন আবিষ্কৃত হইবেই। জগৎপ্রবাহের অন্ত কল্পনা করিয়া আতঙ্কিত হইতে হইবে না।

বিজ্ঞান-বিদ্যার পক্ষে ইহা এখন আশার বাণী। এই আশা কখন পূর্ণ হইবে কি না জানি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, এই irreversibility জড় পদার্থের পক্ষে একেবারে essential নহে। জড় জগতের অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এখনও আবদ্ধ আছে; জড় জগৎ আবহমান কাল ধরিয়া যে পথে চলিতেছে, তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশ বৈজ্ঞানিকের গোচর হইয়াছে। সেই পথ সরল পথ নহে; পক্ষান্তরে উহা বক্র পথ, কুটিল পথ। সরল রেখায় না চলিয়া উহা হিজিবিজি

রেখাক্রমে চলিতেছে। সেই রেখার অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র দেখিয়া অপর অংশের নির্দ্ধারণ বর্ত্তমান বিজ্ঞান-বিদ্যার পক্ষে অসাধ্য। কলিকাতা হইতে নৌকাপথে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত চলিয়া দিল্লীর পথের নির্দ্ধারণ কখন সাধ্য হয় না; এও কতকটা সেইরূপ ব্যাপার। জগতের পথ কুটিল পথ বটে; কিন্তু সেই কুটিলতা periodic হইতে পারে; ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার নিরূপণ হইবে কিরূপে? অতএব আমরা কতকটা সাহসের সহিত বলিতে পারি, জড়ধর্ম্মে এমন কিছু নাই, যাহা essentially irreversible; যাহা গণনাযোগ্য নহে বা কস্মিন্ কালে গণনাযোগ্য হইবে না। মানুষের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবের পক্ষে তাহা গণনাযোগ্য না হইতে পারে; কিন্তু ম্যাক্স্ওয়েলের demonএর মত অগাধবুদ্ধি জীবের পক্ষে তাহা গণনাযোগ্য হইবে। আচার্য্য হক্সলীর যে উক্তি আপনাদিগকে শুনাইয়াছি, তাহা আর একবার স্মরণ করুন। তাঁহার উক্তিমধ্যে আছে, "an intelligence if great enough"; আমাদের intelligence সেরূপ great enough না হইতে পারে; কিন্তু যে জীবের intelligence সেইরূপ great enough, তাহার পক্ষে জড় জগতের সমস্ত ইতিহাস আলোচনার কোন প্রয়োজন থাকিবে না। সেই ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদ মাত্র আলোচনা করিয়া, তাহা হইতে সমস্ত অতীত পরিচ্ছেদ তিনি আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন এবং সমস্ত ভবিষ্যতের কাহিনী গণিয়া বলিতে পারিবেন। যদি ত্রিকালদর্শী বলিয়া কিছু থাকে, বিজ্ঞান-বিদ্যাই ত্রিকালদর্শী।

আমি বলিতেছিলাম প্রাণময় জগতের কথা। হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া জড় জগতের আলোচনা করিতে বসিলাম; ইহাতে নিশ্চয়ই আপনারা রাগ করিয়াছেন; আপনারা আমার অপরাধ লইবেন না। জীবদেহে জড়ধর্ম্মের অতিরিক্ত কিছু আছে কি না, এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। এই প্রশ্ন এত দুরূহ এবং এত বিতণ্ডার বিষয় যে, আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধে ইহার আলোচনা থাকিলেও, পুনরায় সেই আলোচনা উত্থাপনে বাধ্য হইয়াছি। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য হয়ত এইখানে একটা উপায়, একটা criterion পাওয়া যাইতে পারে। বিশুদ্ধ জড়ের একটা লক্ষণ পাইয়াছি, উহা reversibility; যাহার সমস্ত আচরণই পাল্টানযোগ্য, অতএব গণনাযোগ্য। তাহা খাঁটি জড় পদার্থ। বর্ত্তমান অবস্থায় জড় পদার্থে যদি

কোন irreversibility দেখা যায়, উহা আমাদের দৃষ্টিহীনতারই পরিচয়; জড় পদার্থের পক্ষে উহা essential নহে। আজিকালি এক দল পণ্ডিত এই essential কথাটায় অত্যন্ত জোর দিতেছেন। আপনারা Bergsonএর নাম শুনিয়া থাকিবেন। ইঁহাকে আমরা এই দলের একজন অগ্রণী মনে করিতে পারি। তিনি প্রাণময় জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়াছেন। তিনি বলিতে চাহেন, প্রাণযাত্রা ব্যাপারটা essentially irreversible; জগতের মধ্যে এই এক মাত্র ব্যাপার—যাহাতে কেবল চলিতেই হয়, ফিরিবার কোন উপায় নাই। প্রাণযাত্রার অর্থই হইতেছে—একমুখে একটানা চলা; ফিরিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। মরণের দ্বার যে একবার অতিক্রম করিয়াছে, সে আর ফেরে নাই। বাল্যের পর যৌবন; যৌবনের পর জরা; ইহাতে ইহার পাল্টান কেহ দেখে নাই। পুরাণে আপনারা যযাতি রাজার উপাখ্যান শুনিয়া থাকিবেন। জরায় আক্রান্ত হইলে তাঁহার যৌবন ফিরিয়া পাইবার সখ হইল; পুত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার জরার সহিত তোমাদের যৌবন বদল কর। একজন পুত্র সম্মত হইল; তাহার উপর জরাভার চাপাইয়া তাহার যৌবন তিনি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ফলে কি হইল? পুরাণকার বলিতেছেন যে, যৌবনের ভার তাঁহার পক্ষে জরার ভার অপেক্ষাও দুর্ব্বহ হইয়া পড়িল; কিছু দিন পরেই তিনি পরিত্রাহি স্বরে পুত্রের যৌবন পুত্রকে ফিরাইয়া দিলেন। ব্যাপারটা যে অত্যন্ত অস্বাভাবিক; যযাতি রাজা স্বভাবের স্রোতের উল্টা পথে চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাণময় জগতের স্বভাবই এই যে, উহা একমুখেই চলে; কখন মুখ ফিরায় না; মুখ ফিরাইতে পারিলে উহার বিশিষ্টতা হারাইত। প্রাণ কেবলই চলে, এবং যে পথে চলে, সে পথের সমস্ত নিদর্শন কুড়াইতে কুড়াইতে চলে; সমস্ত অতীতের পথ চলিয়া যাহা কিছু কুড়াইয়া পায়, তাহা সমস্ত আঁকড়াইয়া জড়াইয়া ধরিয়া ঘাড়ে লইয়া চলে; পথ চলিতে চলিতে যেখানে যে আঘাত পায়, তাহার সমস্ত ক্ষতচিহ্ন গায়ে লইয়া চলে। ইহাই প্রাণের কাহিনী। প্রাণের ইতিহাস বিরোধের ইতিহাস; প্রাণের বোঝা দুর্ব্বহ বোঝা; কিন্তু এই দুর্ব্বহ বোঝা ঘাড়ে করিয়া প্রাণ চলিতেছে; যতই চলিতেছে, বোঝাও ততই বাড়িতেছে। যে-কোন প্রাণীর দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, উহার দেহের যে-কোন অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; যদি চোখ থাকে ত দেখিতে পাইবে যে, অতীতের সমস্ত ক্ষতচিহ্ন

উহাতে স্থায়িভাবে অঙ্কিত ও মুদ্রিত আছে; উহা কিছুতেই মুছিয়া ফেলিবার নহে। মিছরির দানার গায়ে তাহার অতীতের কোন চিহ্ন থাকে না; নির্ম্মল জলবিন্দুতেও তাহার অতীত ইতিহাসের কোন চিহ্ন থাকে না। নদীর ঘোলা জলে অতীতের চিহ্ন থাকিতে পারে বটে; নদী যে পথ বাহিয়া আসিয়াছে, সেই পথের সমস্ত কাদামাটি কুড়াইয়া বহন করিয়া আনিয়াছে বটে; কিন্তু সেই কাদামাটি জল হইতে নিঃশেষে ছাঁকিয়া ফেলা যায়। কিন্তু প্রাণি-দেহ হইতে তাহার অতীত ইতিহাসের চিহ্ন ধুইয়া মুছিয়া, ছাঁকিয়া ফেলিবার কোন উপায় নাই। প্রাণি-বিভায় পদে পদে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ যখন বর্দ্ধমান হয়, তখন সেই ভ্রূণদেহে অতীত পুরুষপরম্পরার ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্যাল্‌টন দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, প্রাণি-দেহে পিতার ও মাতার চিহ্ন ত বর্ত্তমান আছেই; তদ্ব্যতীত প্রত্যেক পিতৃপুরুষের পিতৃপরম্পরার ও মাতৃ-পরম্পরার এবং প্রত্যেক মাতার পিতৃপরম্পরার ও মাতৃপরম্পরার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। মনে করা যায় বটে, বাহ্য জগতের কোন উপদ্রব, আক্রমণ দেহরূপী দুর্গকে ভেদ করিয়া দেহস্থিত অপত্যকে স্পর্শ করে না; কিন্তু বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষিত হইয়াও সে অপত্য-কোষ আপনাকে বিকৃত করিয়া লয়; এবং সেই বিকারের ফলে নূতন জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবন-যুদ্ধে অধিকতর যোগ্যতা লাভে সমর্থ হয়। ইহাই ত variation; এই variationএর ফলেই জীবন-যুদ্ধে প্রাণিগণ যোগ্যতা লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। এই variation এখনও কোন formulaয় ধরা দেয় নাই। মেণ্ডেলের formulaর প্রয়োগক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ। এই variationএর ফলে প্রাণি-জগতে কেবলই নূতনের উৎপত্তি হইতেছে; নিতুই নব মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া প্রাণ আপনাকে সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছে। প্রাণ যতই অগ্রবর্ত্তী হয়, ততই পুরাতনকে আত্মসাৎ করিয়া চলে এবং ততই নূতনকে উপার্জ্জন করে; পুরাতন সঞ্চয়ের উপর নূতন পাথেয় ক্রমশঃ সংগ্রহ করিয়া পিছনের দিকে না চাহিয়া, কেবলই সম্মুখের দিকে চলিতে থাকে। জড় চিরপুরাতন, কিন্তু প্রাণ চিরপুরাতনের উপর নিত্য নূতন। এই নূতনকে কোনরূপ formulaর বাঁধে আয়ত্ত করিবার উপায় নাই। যেখানেই যেমন বাঁধ দাও, প্রাণের উচ্ছ্বাস সেই বাঁধকে লঙ্ঘন করিয়া চলিবেই। প্রাণের এই উচ্ছ্বাসকে ঠিক Evolution মাত্র বলা চলে না; যাহা খাঁটি Evolution বা

অভিব্যক্তি, তাহাতে নূতন কিছুই থাকে না ; পুরাতন যাহা ছিল, তাহাই নূতন সাজে ফুটিয়া বাহির হয় মাত্র। প্রাণ কিন্তু পুরাতনকে ফেলে না বটে ; কিন্তু পুরাতনের উপরে নূতনকে সংযুক্ত করে ; ইহা বিশুদ্ধ evolution নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে epigenesis—অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে উৎপত্তি বা সৃষ্টি। Bergsonএর ভাষায় ইহা creative evolution। প্রাণ চলিতেছে ; কেবল একমুখে ঊর্দ্ধমুখে চলিতেছে ; চলিবার কালে আপনাকে ফুটাইতেছে, প্রকাশ করিতেছে, বিকাশ করিতেছে ; আপনার ভিতরের তথ্য বাহিরে আনিতেছে ; কিন্তু কেবল তাহাতেই ক্ষান্ত নাই ; সঙ্গে সঙ্গে ইহা নূতনের সৃষ্টি করিতেছে ; যাহা ছিল না, কোথা হইতে তাহার উদ্ভাবনা করিতেছে। এই সৃষ্টি-ক্রিয়ার অন্ত নাই—ইয়ত্তা নাই, সীমা নাই।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমি mechanistic এবং vitalistic, এই দুই থিয়োরির তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছিলাম ; mechanistic theory আজিও আস্ফালন করিতেছে ; পরাজয় স্বীকার বিজ্ঞান-বিদ্যার স্বভাবই নহে। বিজ্ঞান-বিদ্যা জড়ধর্ম্মগুলিকে formula-বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবেই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, প্রাণিদেহে জড়ধর্ম্মের অতিরিক্ত কিছু আছে কি না? প্রাণের এমন বিশিষ্টতা কিছু আছে কি না, যাহা জড়ের নিয়মে বাঁধা পড়িতে চায় না ; যাঁহারা vitalist, তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, এইরূপ অতিরিক্ত একটা কিছু আছে, তাহাতেই প্রাণের বিশিষ্টতা। প্রাণ জড়কে আশ্রয় করে ; উহাকে প্রাণিপদার্থে পরিণত এবং সেই প্রাণিপদার্থকে ভিতর হইতে পরিচালিত করে। কোন্ পথে চলিতে হইবে, কে যেন ভিতর হইতে তাহা দেখাইয়া দেয়। এমন পথে চলিতে হয়, যাহাতে তাহার জড়কে আত্মসাৎ করিবার সুযোগ ঘটে ; যাহাতে আত্মরক্ষার সুবিধা হয়, যাহাতে আত্মরক্ষার জন্য যে বিরোধের প্রয়োজন, সেই বিরোধ চালাইবার সুবিধা হয়। খাঁটি জড়ের পক্ষে এইরূপ আত্মরক্ষা বলিয়া কিছুই নাই। খাঁটি জড়ের আচরণ লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন ; একেবারে উদাসীনের আচরণ। এ কথা আমি আগেই জানাইয়াছি। প্রাণের একটা লক্ষ্য আছে ; একটা উদ্দেশ্য আছে ; সর্ব্বদা সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, সেই লক্ষ্যের অভিমুখে সে চলিতেছে। সেই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া প্রাণ একমুখে চলিতেছে ; কখন মুখ ফিরাইবার অবসর পায় না, কখন পাল্টা মুখে চলে না। এই জন্য প্রাণের যাত্রা

essentially irreversible; চলিতে চলিতে যাহা অর্জ্জন করে, তাহা ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহে না। জড়ের সেরূপ কোন লক্ষ্য নাই। কেল্‌বিনের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন, কোনরূপ চরম লক্ষ্যের অভিমুখে চলা জড়ের পক্ষে একান্ত আবশ্যক—essential নহে। জড় ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতেছে; বাঁধা পথে চলিতেছে, কোন চিহ্ন রাখিয়া বা কোন চিহ্ন লইয়া চলিতেছে না। তাহার সমস্ত অতীতটিকে ধুইয়া মুছিয়া, বিস্মৃত হইয়া চলিতেছে। কিন্তু প্রাণ যখন জড়দেহ আশ্রয় করিয়া চলিতে থাকে, তখন তাহার সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলে; কিন্তু কোন্ পথে চলে, তাহা আগে হইতে বলিবার কোন উপায় নাই। এখানে তাহার স্বাধীনতা বা freedom রহিয়াছে। তাহার লক্ষ্য স্থির আছে বটে, কিন্তু পথের স্থিরতা নাই। পথের নিরূপণে সে একেবারে স্বাধীন। বিজ্ঞান-বিদ্যা সেই পথের অনুসরণ করিতে গিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে; সেই পথে কিছু দূর পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিতে পারে, কিন্তু পথ দেখাইতে পারে না। গঙ্গা যখন ভূতলে অবতরণ করিয়াছিলেন, সাগর তখন তাঁহার লক্ষ্য ছিল; সমস্ত বাধা কাটাইয়া আপনার পথ তিনি আপনি বাছিয়া লইয়াছিলেন; ভগীরথ বোধ করি তাঁহাকে পথ দেখাইতে পারেন নাই; তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। সেইরূপ কোন বৈজ্ঞানিক প্রাণের প্রবাহকে কোন নির্দ্দিষ্ট পথে চালাইতে পারিবেন কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। প্রাণের প্রবাহের জন্য বৈজ্ঞানিক যে খাতই নির্দ্দিষ্ট করুন, প্রাণের ধারা সেই খাত ছাড়িয়া কখন অন্য খাত আপনি কাটিয়া লইবে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। এইরূপে প্রাণ স্বাধীনভাবে আপন পথে চলে, এবং চলিবার সময় অতিক্রান্ত পথের সমস্ত নিদর্শন বহন করিয়া লইয়া যায়। সমস্ত কাদামাটি অঙ্গে মাখিয়া চলিতে থাকে। অতএব প্রাণের একটা কাহিনী আছে। সেই কাহিনী গণনা দ্বারা আবিষ্কারের বিষয় নহে। কেন না, প্রাণ আপনার পথ আপনি খুঁজিয়া লয়, অপরের নির্দ্দেশের অপেক্ষা করে না। প্রাণের কাহিনী যদি জানিতে চান, তাহা হইলে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ, অধ্যায়ের পর অধ্যায়, পর্ব্বের পর পর্ব্ব পড়িয়া যান। প্রাণ নিজের ইতিহাস নিজেই লিখিয়া যাইতেছে। কোন অধ্যায়, কোন পর্ব্ব হারায় নাই; যদি চোখ থাকে, তাহা হইলে প্রাণীর গায়ে তাহা লিখিত দেখিবেন। ইতিহাস সেখানে লিখিত আছে; hieroglyphic হরপে খোদাই করা আছে।

এ-কালের প্রাণিবিদ্যা ভূপঞ্জরের স্তরাবলী ঘাঁটিয়া, মাতৃকুক্ষিস্থ ভ্রূণের দেহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, দেহস্থিত প্রত্যেক কোষে অনুবীক্ষণ লাগাইয়া, সেই অতীত ইতিহাস পড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ভবিষ্যতের কাহিনী সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এখানে কোন জ্যোতিষের বচন ভবিষ্যৎ গণনায় সফল হইবে না; প্রাণপ্রবাহ কোন্ পথে চলিবে, ভবিষ্যতে প্রাণ কোন্ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে; এখন তাহার কোন হিসাব দেওয়া চলিবে না।

প্রাণের কাহিনী আছে এবং সেই কাহিনী বিরোধের কাহিনী,—নিরন্তর, অবিরাম, অবিশ্রাম বিরোধের কাহিনী। এই বিরোধেরই নাম জীবন-যুদ্ধ। এই জীবন-যুদ্ধের একটা লক্ষ্য আছে। সেই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া এই যুদ্ধ চলিতেছে; সেই লক্ষ্যের নাম প্রাণরক্ষা—প্রাণের বর্দ্ধন। প্রাণ আপনাকে রাখিবার জন্য, আপনাকে বাড়াইবার জন্য এই যুদ্ধে লিপ্ত আছে। সেই উদ্দেশ্যেই এই জীবন-যুদ্ধ চালাইতেছে। সেই যুদ্ধ চালাইবার জন্যই প্রাণ মৃত্যুর উদ্ভাবনা করিয়াছে। অতি নিম্নশ্রেণীর এক কোষে নির্ম্মিত unicellular প্রাণী মৃত্যু জানিত না, কিন্তু বহু কোষে নির্ম্মিত multicellular প্রাণী মৃত্যুর উদ্ভাবনা করিয়াছে; এবং সেই মৃত্যুকে এড়াইবার জন্য অপত্যোৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবনা করিয়াছে। প্রাণ আপনাকে রাখিতে চাহে, এবং রাখিবার জন্যই আপনাকে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া থাকে। এইরূপে প্রাণ যুদ্ধ চালাইতেছে; সেই যুদ্ধে প্রাণ কেবলই আপনাকে নষ্ট করিতেছে, কেবলই মৃত্যু স্বীকার করিতেছে; কিন্তু রক্তবীজের মত মরিয়াও মরিতেছে না; সহস্র নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া খড়্গহস্তে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতেছে। প্রাণ আপনাকে অজস্রভাবে নষ্ট করিতেছে, অজস্রভাবে অপচয় করিতেছে। এই অপচয় দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী যেন বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গের মত বিনা কারণে, বিনা বিচারে কেবলই মরিতেছে। মরণ ভিন্ন যেন তাহাদের অন্য কোন উদ্দেশ্যই নাই। ইংরেজী ১৮৯১ সালে গ্রীষ্মকালে বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে পঙ্গপাল দেখা দিয়াছিল। আমি তখন বাড়ীতে ছিলাম। এক দিন অপরাহ্নে আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে সাঁ-সাঁ, সোঁ-সোঁ শব্দ শুনিলাম। "প্রতাপোঽগ্রে ততঃ শব্দঃ"—এখানে কিন্তু আগে শব্দ, তার পর প্রতাপ। আকাশের কোণে যেন একখানা মেঘ দেখা দিল; মেঘখানা

ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আকাশ ছাইল ; সূর্য্য ঢাকিয়া গেল, দিনের আলো মন্দ হইল। মেঘখানা নামিয়া ভূমি স্পর্শ করিল। দেখিলাম পঙ্গপাল—ফড়িঙএর পাল। অবিলম্বেই এই ফড়িঙে ছাইল সকল ঘাট-বাট। গাছের মাথা, ঘরের চাল, দেওয়াল, উঠান, ময়দান, সমস্ত পঙ্গপালে ঢাকিয়া গেল। সন্ধ্যা আসিল। সেই পঙ্গসেনা রাত্রির মত গ্রামেই বিশ্রাম লইল। ভূমিতে নামিয়া গাছপালা, ক্ষেত আচ্ছাদন করিয়া বসিয়া রহিল। পরদিন প্রাতঃকালে আবার ঝাঁক বাঁধিয়া উত্তরমুখে চলিয়া গেল। দেখা গেল, বড় বড় গাছগুলা পত্রপল্লবশূন্য হইয়া কঙ্কালসার হইয়াছে, নারিকেল-গাছগুলা ন্যাড়া হইয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মত দাঁড়াইয়া আছে। এই পঙ্গপাল উত্তরমুখে চলিল ? কোন্ দেশে চলিল ? শুনিয়াছি, ক্রমাগত তাহারা উত্তরমুখে চলিয়া হিমাচলের তুষারক্ষেত্রে ঠেকিয়া গিয়াছিল। এবং সেইখানে প্রাণযাত্রা শেষ করিয়াছিল। এক-একটা ঝাঁকে কত ফড়িঙ ছিল, কে গণিবে ? কত কোটি ফড়িঙ একটা ঝাঁকের মধ্যে ছিল, কে তাহার তালিকা দিবে ? এই কোটি কোটি প্রাণী উত্তরমুখে চলিয়া হিমাচলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, ইহার তাৎপর্য্য কি ? ইহাকে প্রাণের অপচয় ভিন্ন আর কি বলিব ? জড় জগতে আপনারা শক্তির অপচয়ের কথা লর্ড কেল্‌বিনের নিকট শুনিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণের এই যে অপচয়, ইহা সর্ব্বদা চোখের উপরে ঘটিতেছে।

জীবন-যুদ্ধে প্রাণের এই অপচয় দেখিয়া বিস্মিত—ভীত হইতে হয় ; কিন্তু এই অপচয়ের একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি আপনাদিগকে জীবন-যুদ্ধের যে কাহিনী শুনাইলাম, তাহার মর্ম্ম যদি আপনারা বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে জানিতেছেন যে, এই অপচয়ের একটা উদ্দেশ্য আছে। প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণের এই অপচয়। এ বড় কৌতুকের কথা। যাহা রক্ষণীয়, তাহার অপচয় কখনও প্রার্থনীয় হইতে পারে না। সঞ্চয় আর অপচয় পরস্পর বিরুদ্ধ।

অপচয়ের দ্বারা সঞ্চয়, ইহা বোধ করি উন্মত্তপ্রলাপ। অথচ প্রাণময় জগতে ইহাই অহরহঃ চলিতেছে। প্রাণ যাহা সঞ্চয় করিতে চাহে, কল্পতরুর মত তাহা দুই হাতে বিলাইতেছে ; স্থান অস্থান, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া কেবলই নষ্ট করিতেছে ; যেন একটা উৎকট নেশার ঝোঁকে উন্মত্তের মত আপনাকে রিক্ত করিতেছে। এ বড় আশ্চর্য্য কথা। প্রাণ

চাহে অমরতা ; সেই অমরতা লাভের জন্যই প্রাণ কেবলই মরণকে আলিঙ্গন করিতেছে। প্রকৃতি দেবী প্রকৃতই শিবদূতী ; তিনি মৃত্যুঞ্জয়ের দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন ; সেই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি রণরঙ্গিণী সাজিতেছেন ; শ্মশানভূমিতে উন্মাদিনীর মত নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছেন। এ অতি আশ্চর্য্য নয় কি ?

আজিকার মত এইখানেই আপনাদিগকে বিরাম দিলাম। ইহার পরে আর এক ধাপ উঠিতে চাহি। প্রাণময় জগতের কাহিনী শুনাইলাম ; এইবার মনোময় জগতে যাইতে চাহি। আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

প্রজ্ঞার জয়

প্রাণের কাহিনী কহিতেছিলাম,—সেই কাহিনী বিরোধের কাহিনী। আশা করি, সেই বিরোধের উৎকটতা আপনাদের কাছে অনেকটা স্পষ্ট হইয়াছে। প্রাণী মাত্রই এই বিরোধে লিপ্ত আছে; অথবা ঘুরাইয়া বলিতে পারি, এক মাত্র প্রাণিপদার্থ আপনাকে কোটি কোটি কোটি খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া এই বিরোধ চালাইতেছে। প্রত্যেক খণ্ড আপন সুবিধামত আপনার মূর্ত্তি গড়িয়া লইয়াছে: বিরোধ চালাইতে যোগ্যতা লাভের জন্য যে যেমন সুবিধা পাইয়াছে, সে সেইরূপ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। বিরোধে সুবিধার জন্যই হয়ত প্রত্যেক প্রাণি-খণ্ড অন্য খণ্ড হইতে এইরূপে স্বাতন্ত্র্য লাভে বাধ্য হইয়াছে। এই স্বাতন্ত্র্য লাভের ফল হইয়াছে যে, জড় জগতের সহিত গোড়ার বিরোধ যেন ভুলিয়া গিয়া প্রাণিগণ পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিয়াছে এবং পরস্পরকে ধ্বংস করিয়া আপনার স্ব-তন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এখন আমরা ঐ বিরোধকেই প্রাণের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। যেখানে এই বিরোধ নাই, সেখানে প্রাণেরও অস্তিত্ব নাই, এরূপও মনে করিতে পারি। যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব নাই, আমার সংজ্ঞামতে তাহাই খাঁটি জড়। সেইরূপ প্রাণহীন খাঁটি জড় দ্রব্য পৃথিবীতে কোথাও আছে, কি না আছে, সে তর্ক এখানে তুলিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। খাঁটি প্রাণহীন জড় থাকুক আর নাই থাকুক, খাঁটি জড়ের এইরূপ conceptual সংজ্ঞা গ্রহণে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। ব্যাবহারিক জগতে ঐরূপ খাঁটি জড় না থাকিতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বাঙ্ময় জগতে উহার কল্পনা করিতে কোন অপত্তি চলিবে না। এই খাঁটি জড় যেখানেই প্রাণের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেইখানেই ঐ বিরোধ দেখিতে পাইব, ইহা আমি স্বীকার করিয়া লইলাম। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই যে বিরোধ, ইহা প্রাণীদের জ্ঞাতসারে ঘটিতেছে কি না? জ্ঞানপূর্ব্বক ঘটিতেছে কি না? প্রাণীরা সচেতন ভাবে,—knowingly, consciously এই বিরোধে লিপ্ত আছে, না কেবল মাত্র প্রাণধর্ম্মের বশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে যন্ত্রবৎ এই বিরোধে লিপ্ত হইয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন; কেন না, এখানে

চেতনার কথা আসিয়া পড়ে। কোন দ্রব্য চেতন, কি অচেতন, ইহা নিরূপণ করিবার কোন উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই। কিন্তু অপরের চেতনা কস্মিন্ কালে কোন উপায়ে প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। আমি স্বয়ং যে চেতন জীব, এ বিষয়ে আমার সংশয় মাত্রই নাই; কিন্তু আমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র কোথাও চেতনার অস্তিত্ব আছে কি না, ইহার প্রমাণ একেবারেই নাই। এমন কি, আপনি আমার প্রবন্ধের শ্রোতা, পাঠক, বন্ধু ও প্রতিবেশী,—আপনিও আমারই মত চেতন জীব, অথবা চেতনাহীন একটা কলের পুতুল মাত্র, তাহার কোন প্রমাণ আমার হাতে নাই। আপনার অঙ্গভঙ্গী ও চালচলন দেখিয়া এবং আমার অঙ্গভঙ্গী ও চালচলনের সহিত আপনার অঙ্গভঙ্গী ও চালচলনের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণে উপলব্ধি করিয়া, আমি আপনাকেও আমারই মত চেতন জীব মনে করিয়া লই বা অনুমান করিয়া লই। ইহাকে অনুমানও বলা চলে না;—ইহা একটা hypothesis বা কল্পনা মাত্র। কেন না, অনুমান মাত্রই প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একত্র যাহা প্রত্যক্ষ করি, অন্যত্র তুল্য স্থলে তাহা অনুমান করিয়া লই; সেই অনুমান হয়ত কোন কালে প্রত্যক্ষ প্রমাণে সমর্থিত হইতে পারে। কিন্তু আমা ভিন্ন অন্য কোন জীবে চেতনা আছে কি না, তাহা কোন কালে প্রত্যক্ষ হয় নাই; হইবেও না। অতএব এখানে অনুমানেরও কোন ভিত্তি নাই। তবে যে অন্যকে চেতন জীব বলিয়া স্বীকার করি, অন্যে কল্পিত সেই চেতনা নিতান্তই একটা hypothesis, নিতান্তই একটা কল্পনা; আমার জীবনযাত্রা চালাইবার জন্য এইরূপ কল্পনার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছি মাত্র। অতএব আমার চেতনা, যাহা আত্ম-চেতনা, যাহাতে আমার অণু মাত্র সংশয় নাই ও যাহা আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়, এবং অন্যে আরোপিত যে চেতনা,—যাহা নিতান্তই ব্যবহারার্থ কল্পিত, এই উভয় চেতনা কখনও এক পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। আমার চেতনাকে যদি চেতনা বলি, তাহা হইলে অপর জীবে আরোপিত চেতনাকে চেতনা নাম না দিয়া চেতনাভাস বলাই সঙ্গত। আমাকে যদি জীব বলি, অন্যকে জীব না বলিয়া জীবাভাস বলাই সঙ্গত। আমরা যখন প্রাণিবর্গকে চেতন ও অচেতন, এই দুই শ্রেণীতে ফেলাই, তখন বস্তুতঃ চেতনার কথা বলি না, চেতনাভাসের কথাই বলিয়া থাকি। সেই চেতনাভাস আমি আপনাতে

আরোপ করি, মনুষ্য মাত্রেই আরোপ করি ; এমন কি, কুকুর বিড়াল কীট পতঙ্গাদিতেও আরোপ করিয়া থাকি। কেহ বা এই চেতনাভাস গাছ-পালাতেও আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হন না। কোন প্রাণীতে এই চেতনাভাস খুব স্পষ্ট, কোথাও বা অত্যন্ত অস্পষ্ট। জন্তুতে আরোপিত চেতনাভাস অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট, আর উদ্ভিদে আরোপিত চেতনাভাস অত্যন্ত অস্পষ্ট,—এত অস্পষ্ট যে, গাছপালাকে একেবারে অচেতন মনে করিলেও ব্যবহারে কোথাও আটকায় না। বস্তুতঃ জন্তু এবং উদ্ভিদের মধ্যে কোনরূপ সীমারেখা টানা যায় কি না সন্দেহ। এমন কি, অতি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতেও এই চেতনাভাস এত অস্পষ্ট যে, তাহাদিগকেও এই হিসাবে অচেতন বলিলে কার্য্যতঃ বিশেষ কোন হানি হয় না। কেঁচো এবং জোঁকের মত প্রাণীতেও এই চেতনাভাস আছে কি না, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দিবার ক্ষমতা,—respond করিবার ক্ষমতা দেখিয়া আমরা স্থূলতঃ এই চেতনাভাসের মাত্রা স্থির করিয়া থাকি। একটা জোঁকের গায়ে খোঁচা দিলে সে আপনার দেহকে সঙ্কুচিত করিয়া লয়; আবার একটা লাজুকের গাছে খোঁচা দিলেও সে আপনার শাখাপল্লবগুলি সঙ্কুচিত করিয়া থাকে। বাহিরের উত্তেজনাতে উভয়েই সাড়া দেয় ; অতএব উভয়েই চেতন, কেহ কেহ এরূপ মনে করেন। ঘড়ির কাঁটা নাড়িয়া দিলে ঘড়িও টং টং করিয়া বাজিয়া উঠে, বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়; কিন্তু তাই বলিয়া ঘড়ি যে জ্ঞাতসারে সচেতনভাবে সাড়া দিতেছে, এরূপ ত মনে করা যায় না। ঘড়িকে ত কেহ চেতন মনে করে না। দিল্লীতে চুম্বক নাড়িয়া দিলে সহস্র মাইল দূরে হাবড়ায় লোহার কাঁটা সাড়া দেয় ; সূর্য্যবিম্বে কলঙ্ক দেখা দিলে অর্ব্বুদ মাইল দূরে পৃথিবীর মেরুদেশে অন্তরীক্ষ জ্যোতির্ম্ময় হয়। এই সকল দৃষ্টান্তেও কেহ মনে করে না যে, লোহার কাঁটা চেতন বা পৃথিবী চেতন। তবে লাজুকের গাছকে বা জোঁককে চেতন মনে করিব কেন? কাজেই কেবল এই সাড়া দিবার ক্ষমতা দেখিয়া চেতনার অর্থাৎ আমার ভাষায় চেতনাভাসের কল্পনা সর্ব্বত্র নিরাপদ্ নহে। আপনি হয়ত বলিবেন—ঘড়িকে, লোহার কাঁটাকে বা পৃথিবীকে চেতন মনে করিতেই বা হানি কি? যে সাড়া দেয়, তাকেই আমি চেতন বলিব। কিন্তু এরূপ তর্ক কুতর্ক,—কেবল কথার মা'র-প্যাঁচ মাত্র। এরূপ তর্কে আপনি চেতনা শব্দটাকে খুব ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ

করিতেছেন মাত্র ; উত্তেজনায় সাড়া দিবার ক্ষমতাকেই আপনি চেতনার লক্ষণ বলিতেছেন। চেতনার ঐ লক্ষণ ধরিলে মানুষ হইতে বালুকণা পর্য্যন্ত সমস্তই চেতন হইয়া পড়ে—অচেতন আর কিছুই থাকে না। বরং মানুষের চেয়ে বালুকণাই অধিক সচেতন হয় ; কেন না, বালুকণা সকল উত্তেজনাতেই সাড়া দিতে বাধ্য ; মানুষ ইচ্ছাপূর্ব্বক বহু স্থলে সাড়া দেয় না, মানুষ সর্ব্বত্র সাড়া দিতে বাধ্য নহে। ঐ কুতর্ক তুলিবেন না।

আমি আমা ভিন্ন আর কোথাও চেতনা স্বীকার করিতেই অসম্মত। ঘড়ির কাঁটা, লাজুক গাছ বা জোঁক ত দূরের কথা, অন্য মানুষেও আমি চেতনা স্বীকারে কুণ্ঠিত। অন্য মানুষে যাহা আরোপ করি, তাহা আমার নিকটে চেতনাই নহে, চেতনাভাস মাত্র। আমার নিকট চেতনা ও চেতনাভাস, এই উভয়ের পার্থক্য খুব বড় কথা ;—এত বড় কথা যে, আমার বক্তব্য খুব স্পষ্ট করিয়া না বুঝাইতে পারিলে আমার সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইবে। আমি জগত্তত্ত্বের মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং পরে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, যদি মূল কোথাও পাওয়া যায়, তাহা হয়ত এইখানে। কাজেই আমি এ বিষয়টা অস্পষ্ট রাখিতে চাই না। মনে করিবেন না, আমি একটা হেঁয়ালির সৃষ্টি করিয়া আপনাদের ধাঁধাঁ লাগাইবার চেষ্টা করিতেছি। আমি চেতনা শব্দে আমার চেতনাকেই বুঝিব ; যে চেতনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই, যাহা আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়। চেতনাভাস শব্দের অর্থ অন্য জীবে আরোপিত চেতনা —যাহা আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় নহে, যাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় কখনও হইবে না বা হইতে পারে না। ইহার মধ্যে কোন হেঁয়ালি—কোন mysticism নাই। সাদা কথায়, আমার মনের কথা আমি সমস্তই জানিতেছি ; কিন্তু আপনার মনের কথা—আপনার মনের ভিতর কখন্ কি আসিতেছে যাইতেছে, তাহা কিছুতেই জানিতে পারি না, জানিবার উপায় নাই। আপনার অঙ্গভঙ্গী, ইঙ্গিত ইসারা, মুখ চোখের অবস্থা প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাহা হইতে আপনার মনের কথা কতকটা আন্দাজ করিয়া লই মাত্র ; কিন্তু যাহা উপলব্ধির বিষয় ও যাহা আন্দাজের বিষয়, তাহাতে আকাশ-পাতাল ভেদ ; সেই দুই পদার্থকে এক পর্য্যায়ে ফেলা কখনই চলিতে পারে না। ফেলিতে গেলে সমস্ত বিচার-বিতর্কের অবসান হইয়া যাইবে। আপনি হয়ত thought-readerদের কথা আনিয়া ফেলিবেন ;

বলিবেন—কেন, একে অন্যের মনের কথা বলিতে পারে, ইহার ত প্রচুর প্রমাণ আছে। প্রমাণ থাকিতে পারে। কলিকাতায় চুম্বকের কাঁটা নাড়িলে যদি দিল্লীর চুম্বকের কাঁটা নড়িতে পারে, তবে আপনার মগজের ভিতর একটা কিলিবিলি আন্দোলন ঘটিলে আমার মগজের ভিতরেও তদনুরূপ একটা কিলিবিলি আন্দোলন না ঘটিবার কোন কারণ নাই। বিনা তারে টেলিগ্রাফির আবিষ্কারের পর ইহাকে অসম্ভব ঘটনা বলিতে কেহ সাহস করিবে না। বিশেষ আপনার মগজের ও আমার মগজের মাঝখানে যখন ঈথার রহিয়াছে, তখন আর ভাবনা কি? ঈথারের ভিতর দিয়া যখন এত আন্দোলন চলিতে পারে, তখন মগজের আন্দোলনই বা চলিবে না কেন? আর আপনার মগজ আর আমার মগজ যদি কোনরূপে এক সুরে বাঁধা থাকে, তখন আপনার মগজে গান ধরিলে আমার মগজ ঝঙ্কার দিয়া উঠিবেই। টেলিগ্রাফের কেরাণী যদি লোহার কাঁটার টকর-টক্ক শব্দ শুনিয়া অথবা dot ও dashএর সারি দেখিয়া দূরের তথ্য জানিতে পারে, তখন আমার মগজের টকর-টক্ক হইতে আপনার মগজের তথ্য জানিয়া লইব, তাহা বিচিত্র কি? এইরূপে আপনার মনের কথা আমি জানিয়া লইতে পারি; হয়ত এইরূপ thought-readingএর পক্ষে প্রচুর প্রমাণ আছে; তাহা মানিয়া লইতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহাতে আমার প্রশ্নের কোন সমাধান হইল না। লর্ড কিচেনারের মৃত্যু-সংবাদ টেলিগ্রাফের তার বাহিয়া সহস্র ক্রোশ দূরে উপনীত হইল। সহস্র ক্রোশ দূরে টেলিগ্রাফের কাঁটা টকর-টক্ক করিয়া উঠিল। কেরাণী সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেন সেই টকর-টক্ক মাত্র; কিচেনারের মৃত্যু-ঘটনা তাঁহার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইল না। সেই টকর-টক্ক সঙ্কেতের তিনি অর্থ গড়িয়া লইয়া পরে বলিলেন, কিচেনারের মৃত্যু ঘটিয়াছে। উপলব্ধির বিষয় হইল কতকগুলা সঙ্কেত; সেই সঙ্কেতের তাৎপর্য্যটা উপলব্ধির বিষয় হইল না, উহা গড়িয়া লইতে হইল। সেইরূপ আপনার মগজের চাঞ্চল্যে আমার মগজে যদি চাঞ্চল্য ঘটে, তাহা হইলে সেই চাঞ্চল্যের ফল আমার উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে; সেই চাঞ্চল্যের সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া আমি তাহার তাৎপর্য্য স্থির করিয়া বলিতে পারি—আপনার মনে দুঃখ হইয়াছে, কি হর্ষ হইয়াছে, আপনার ক্ষুধা হইয়াছে, কি পিপাসা হইয়াছে। সেই তাৎপর্য্য আমাকে বুদ্ধিপূর্ব্বক গড়িয়া লইতে হইবে। যিনি thought-reader,

তিনি টেলিগ্রাফের সঙ্কেতজ্ঞ কেরাণী; তাঁহার সে অভ্যাস বা সামর্থ্য থাকিতে পারে, অন্যের তাহা না থাকিতে পারে। ফলে আমি যখন আপনার মুখ চোখ দেখিয়া আপনার মনের কথার আন্দাজ করি, তখনও আমি সেইরূপ সঙ্কেত লইয়াই আন্দাজ করি। মগজে মগজে সঙ্কেত চালাচালি হইলেও তাহার বড় বেশী কিছু হইত না। আপনার হর্ষ ক্লেশ বা ক্ষুৎ পিপাসা আন্দাজ করা যাইতে পারে। কিন্তু আপনার হর্ষ ক্লেশ বা আপনার ক্ষুৎ পিপাসা কোন thought-readerএর প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় হইল, তাহা ত বলিতে পারিব না। মনে করুন, আমিই thought-reader; আপনার মনের কথা বলিবার জন্য আপনার সম্মুখে হাজির। আপনার ক্ষুৎপিপাসা হইবা মাত্র যদি আমারও ঠিক তদনুরূপ ক্ষুৎ পিপাসা জন্মে, তাহা হইলেও আমি বলিব, আমার যাহা প্রত্যক্ষ হইল, তাহা আমারই ক্ষুৎ পিপাসা—তাহা আপনার ক্ষুৎ পিপাসা নহে; যদিও আপনারই ক্ষুৎ পিপাসা হইতে কোন উপায়ে আমারও তদ্রূপ ক্ষুৎ পিপাসা প্রণোদিত হইয়াছে। কাজেই আপনার মনের অবস্থা—আপনার চিত্ত কখনও আমার সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি। কিন্তু আমার ক্ষুৎ পিপাসা, আমার হর্ষ ক্লেশ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব আমি যে অর্থে আমাকে চেতন বলিয়া জানি, সে অর্থে আপনাকে চেতন বলিয়া জানিতে পারি না। উভয়ের চেতনাকে এক পর্য্যায়ে ফেলা অনুচিত। উভয়কে এক নাম দেওয়াও উচিত নহে। অতএব আমি বলিতে চাহি, আমার চেতনাই চেতনা; আপনার চেতনা চেতনাভাস মাত্র। একটা প্রত্যক্ষ, অন্যটা কল্পনা; একটা আসল, অন্যটা নকল।

মনে করিবেন না যে, উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য আনিয়া আমি একটা আজগুবি তথ্যে উপনীত হইয়াছি। দুঃখের বিষয়, ইংরেজীতে উভয় চেতনাকেই consciousness বলা হয়;—উভয়কে পৃথক্ নামে অভিহিত করা হইলে দার্শনিক বিচারে বোধ করি এতটা গোলযোগ হইত না। দার্শনিক সাহিত্যে আমার কিছু মাত্র বিদ্যা নাই; তবে যতটুকু আছে, তাহাতে আমার মনে সংশয় আছে যে, উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য স্পষ্ট দেখা উচিত, পণ্ডিতেরাও ততটুকু পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া দেখান নাই। দেখাইলে হয়ত এতটা গণ্ডগোল হইত না। কেহই যে দেখান নাই, তাহা আমি বলিতে

পারিব না। দুই একটা নাম করিয়া দৃষ্টান্ত দিতে পারি,—তাহা হইলে অন্তত আমার বাঁচোয়া ঘটিতে পারে। বড় নামের আশ্রয় লইয়া নিজে তরিয়া যাইতে পারি। দার্শনিক পণ্ডিতের নাম না করিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের নাম করিব; কেন না, এ-কালে তাঁদের নামেরই জোর বেশী। অধ্যাপক Karl Pearsonএর Grammar of Science নামে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে। উহা হইতে আমি একটি বাক্য তুলিব,—"We *recognise* consciousness in our individual selves; we *assume* it to exist in others." দেখুন, এক ক্ষেত্রে বলা হইতেছে we recognise,—আমরা উপলব্ধি করি; অন্য ক্ষেত্রে বলা হইতেছে, we assume—আমরা মানিয়া লই। আমিও ঠিক ঐ কথা বলিতেছি; তবে আমি এ স্থলে বহুবচনান্ত We বা 'আমরা' না বলিয়া I বা 'আমি' এই একবচনান্ত শব্দ বসাইলাম। কেন না, আপনার ও অন্য লোকের চেতনা সম্বন্ধে যদি আমার এরূপ সংশয়েরই হেতু থাকে, তাহা হইলে এই 'আমরা' থাকে কোথায়? আমার উপর আমার জোর আছে, কিন্তু আপনার উপর সে জোর কোথায়? আপনারা আচার্য্য ক্লিফোর্ডের নাম নিশ্চয় শুনিয়াছেন;—তিনি এই বিষয় লইয়া বিশেষভাবে বিচার-বিতর্ক করিয়াছেন;—তাঁহার ভাষাও খুব স্পষ্ট—"When I come to the conclusion that *you* are conscious, and that there are objects in your consciousness similar to those in mine, I am not inferring any *actual* or *possible* feelings of my own, but *your* feelings, which are not, and *cannot by any possibility become*, objects in my consciousness." কার্ল পিয়ার্সনও আপনার উক্তিকে ফলাইয়া বলিয়াছেন—"Another man's consciousness, however, can never be directly perceived by sense-impression. I can only *infer* its existence from the apparent similarity of our nervous systems, from observing the same hesitation in his case, as in my own, between sense-impression and exertion, and from the similarity between his activities and my own." আমিও তাহাই বলিয়াছি; অন্যের ইঙ্গিত-ইসারা, মুখ-চোখ, ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া আমি

অন্যের চেতনা আন্দাজ করিয়া লই। কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ চেতনা ও অন্যের কল্পিত চেতনা, উভয়কে এক নাম দেওয়া উচিত নহে। ক্লিফোর্ড এ কথাটার যাথার্থ্য খুবই বুঝিয়াছিলেন। আমার চেতনাকে—আত্মচৈতন্যকে তিনি বলিয়াছেন object—প্রত্যক্ষ বিষয়; আর পরের চেতনাকে তিনি বলিয়াছেন eject—মৎকর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত বা কল্পিত চেতনা। আমি একক বলিয়াছি চেতনা,—অন্যকে বলিয়াছি চেতনাভাস। আমি ভিন্ন অন্য কোন জীবকে আমি চেতন জীব বলিতে রাজি নহি,—বলিতে গেলেই আমার উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত ঘটিবে;—আমি অন্য জীবের পক্ষে চেতনাভাসযুক্ত, এই বিশেষণ দিতে চাহি। কিন্তু চেতনাভাস শব্দটার গায়ে পণ্ডিতী গন্ধ আছে—পুনঃ পুনঃ উহার প্রয়োগে বমনোদ্রেক হইতে পারে। অতএব আমি চেতনাভাস শব্দটা প্রয়োগ না করিয়া, তাহার স্থলে কেবল জ্ঞান শব্দ প্রয়োগ করিব। মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যে সকল জন্তুর চেতনাভাস স্পষ্ট, তাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক, জ্ঞাতসারে কাজ করে,—তাহারা জ্ঞানী অথবা জ্ঞানবান্ প্রাণী। আর যে সকল নিম্নশ্রেণীর জন্তু বা যে সকল উদ্ভিদ্ জ্ঞানপূর্ব্বক কাজ করে না, তাহাদিগকে অজ্ঞানী বা জ্ঞানহীন প্রাণী বলিব। তাহা হইলে আমার বক্তব্য বুঝাইতে গণ্ডগোল হইবে না।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিয়া লই। কথায় কথায় আস্ফালন করিয়া বলা হয়, আমাদের ভারতবর্ষের শাস্ত্রে সমস্ত বাহ্য জগৎকে চৈতন্যময় বলা হইয়াছে। আমাতেও যে চেতনা আছে, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, তৃণ লতা, এমন কি, লৌহ কাষ্ঠেও সেইরূপ চেতনা আছে, আমাদের শাস্ত্রে না কি তাহাই বলা হইয়াছে, এবং ইহাই না কি ভারতবর্ষের শাস্ত্রের বিশিষ্টতা। আর আচার্য্য জগদীশচন্দ্রও না কি বৈজ্ঞানিক প্রমাণবলে আমাদের শাস্ত্রবাক্য সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতেই আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের গৌরব। আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সেরূপ কিছুই বলেন নাই; এবং বলেন নাই—তাহাতে তাঁহার গৌরবের এক কণিকারও হানি হইবে না। তিনি বিজ্ঞান-বিদ্যাবিৎ;—সেই বিজ্ঞান-বিদ্যা চৈতন্য সম্বন্ধে কোন কথা বলে না, বলিতে চাহে না, বলিতে পারে না। চৈতন্য দূরের কথা, তিনি জড় জগতে প্রাণের আরোপও করেন নাই;—বরং তিনি প্রাণি-দেহকে জড় যন্ত্রের formulaমধ্যে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া জড় জগতের ও প্রাণময় জগতের মধ্যে সীমারেখা লুপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

এমন কি, মৃত্যুকে পর্য্যন্ত জড়ের formulaয় বাঁধিবার চেষ্টায় আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছেন। তিনি জগতে যে একত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা mechanistic একত্ব,—অন্যরূপ একত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে তিনি বৈজ্ঞানিক হইতেন না। কোন বাহবার প্রত্যাশায় তিনি আপন পথ ছাড়িয়া বিপথে চলিয়াছেন মনে করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার হইবে—তাঁহার গৌরবের হানি হইবে। আমাদের শাস্ত্রেও যদি বাহ্য জগৎকে চৈতন্যময় বলিয়া থাকে, তাহারও তাৎপর্য্য আমি অন্যরূপ বুঝি। বাহ্য জগতে চেতনার স্বীকার দূরের কথা, আমাদের শাস্ত্র সম্পূর্ণ উল্টা পথে গিয়া বাহিরের সমুদয় চেতনাকে কল্পিত চেতনা বা চেতনাভাস বলিয়া জোরের সহিত ধরিয়াছে;—পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র যেখানে ভয়ে ভয়ে কথা কহিয়াছে, আমাদের দর্শনশাস্ত্র সেখানে নিঃসঙ্কোচে জোরের সহিত স্পষ্টরূপে সে কথা বলিয়াছে। অন্ততঃ আমার বিশ্বাস ইহাই। এক বই আর দ্বিতীয় চেতন জীব নাই এবং আমিই সেই চেতন জীব, আমাদের শাস্ত্রের একজীববাদের তাৎপর্য্য ইহাই, এ বিষয়ে আমার সংশয় মাত্র নাই। এক এবং অদ্বিতীয়, এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্যই ইহাই; এ বিষয়ে আমার সংশয় মাত্র নাই।

সে কথা আমাকে পরে বলিতে হইবে,—সে সব অত্যন্ত বড় কথা। এখন আমি ছোট কথাতেই ব্যাপৃত আছি। সেই ছোট কথাতেই আবার নামিয়া আসা যাক। আমি এখন প্রাণি-বিদ্যার তরফ হইতে প্রাণের তত্ত্ব আলোচনা করিতেছি। চেতনাই বলুন, আর চেতনাভাসই বলুন, আর কেবল জ্ঞানই বলুন, প্রাণি-বিদ্যার রঙিন চশমা চোখে দিলে এই জ্ঞানের সার্থকতা কি দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিতে চাহি।

কবে কোথায় কিরূপে এই জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, বিজ্ঞান-বিদ্যা বা Physical Science তাহা বলিতে অক্ষম; প্রাণি-বিদ্যা বা Biologyও তাহা বলিতে অক্ষম। প্রাণিবিদ্যার সে সমস্যার সমাধানে বোধ করি প্রয়োজনও নাই; অন্ততঃ ডারুইন-তন্ত্রীর এই বিষয়ে মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই। ডারুইন-তন্ত্রী কেবল দেখিলেন, এই জ্ঞান সঞ্চারে প্রাণীর জীবন-সংগ্রামে কোন লাভ আছে কি না। দূরে শত্রু আছে, অথবা দূরে আহার্য্য সামগ্রী আছে, ইহা কোনরূপে জানিতে পারিলে প্রাণীর লাভ আছে বৈ কি! ইহা তাহার পরম লাভ। জীবন-সংগ্রামে যাহাতে পরম লাভ,

প্রাণী যদি তাহা অর্জ্জন করিয়া থাকে, ডারুইন-তন্ত্রী তাহাতে কিছু মাত্র বিস্মিত হইবেন না। ধরিয়া লও, এমন এক দিন ছিল, যখন কোন প্রাণীতে জ্ঞান ছিল না, অথবা অত্যন্ত অস্পষ্ট জ্ঞান ছিল। অকস্মাৎ কোন প্রাণীতে জ্ঞানের লক্ষণ স্পষ্ট ভাবে দেখা দিল। পিতৃপিতামহে যাহা ছিল না, অপত্যে তাহা অকস্মাৎ দেখা দিল। অপত্যের পক্ষে ইহা একটা ব্যতিক্রম, ব্যত্যয়, variation। কোন্ ব্যত্যয় কিরূপে ঘটিল, সে সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই; ডারুইন-তন্ত্রী সমাধানের জন্য ব্যাকুলও নহেন। হঠাৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইল; অতি অল্প মাত্রায় হইল, কি একেবারে অনেকটা হইল, 'সে তর্কেও দরকার নাই। অল্পই হউক আর অধিকই হউক, জ্ঞান সঞ্চার ঘটিবা মাত্র সেই প্রাণীর জীবন-সংগ্রামে মস্ত একটা সুবিধা হইল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার বাহিরে খাদ্য সামগ্রী কোথায় কি আছে, শত্রু মিত্র কোথায় কে আছে, এই জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে জীবন-সংগ্রামে তাহার যোগ্যতা অতিমাত্রায় বাড়িয়া গেল, জীবনযুদ্ধে তাহার জয়লাভের সম্ভাবনা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল, আপনার মত সমর্থ অপত্য রাখিয়া বংশরক্ষার সুযোগ তাহার অতিমাত্রায় বাড়িয়া গেল। জীবনযুদ্ধে যোগ্যের জয়, অযোগ্যের পরাজয়, ইহাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। প্রকৃতি ঠাকুরাণী নিষ্করুণভাবে অযোগ্যকে সরাইয়া দেন, যোগ্যতরকে বাছিয়া লইয়া কোলে বসান। কাজেই ধরাধামে জ্ঞানবিশিষ্ট প্রাণীর আধিপত্য দেখিয়া ডারুইন-তন্ত্রী বিস্মিত হইবেন না। প্রাণিবিদ্যা এই জ্ঞানকে জীবনযুদ্ধে অস্ত্রস্বরূপ মনে করেন। উদ্ভিদেরা প্রাণী বটে; এমন কি, জড় পদার্থকে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণিপদার্থে পরিণত করিবার ভার উদ্ভিদেরাই লইয়াছে। উহারা যখন প্রাণী, তখন উহারাও আত্মরক্ষাপরায়ণ; প্রাণের প্রেরণায় উহারাও আত্মরক্ষার নানা ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। কোন গাছ ফুল ফুটাইয়া ফুলের গন্ধে, ফুলের রঙে, মধুর প্রলোভনে প্রজাপতিকে ডাকিয়া আনে; এবং সেই প্রজাপতির দ্বারা এক পুষ্পের পরাগরেণু পুষ্পান্তরে বহাইয়া লইয়া আপনার বংশ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লয়। কোন গাছ সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা গজাইয়া রাখে; জন্তুতে খাইতে আসিলে সেই কাঁটা বিঁধিয়া দেয়। কেহ বা আপন দেহে মাদক দ্রব্য বা বিষ সঞ্চয় করিয়া রাখে; যে জন্তু খাইতে আসে, সে নেশায় অথবা বিষে অভিভূত হইয়া পরাজয় স্বীকার করে। কিন্তু কোনও গাছ জানে না যে,

সে এইরূপে বংশরক্ষা করিতেছে বা আত্মরক্ষা করিতেছে বা শত্রুজয় করিতেছে। গাছ যাহা করে, তাহা স্বভাবের প্রেরণায় করে, প্রাণধর্ম্মের বশে করে। জ্ঞাতসারে করে, এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হইবে। জ্ঞানাস্ত্র থাকিলে উদ্ভিদেরও হয়ত সুবিধা থাকিত ; কিন্তু উদ্ভিদেব পক্ষে তাহা তেমন আবশ্যক হয় নাই। উদ্ভিদের মুখ্য কাজ হইতেছে আহার-সঞ্চয় ; হাওয়া হইতে ও ভূমি হইতে মশলা সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে প্রাণি-পদার্থের নির্ম্মাণ—প্রভূত পরিমাণে নির্ম্মাণ। এ জন্য তাহাকে এক স্থানে গট হইয়া বসিতে হয় ; কাণ্ড হইতে সহস্র শাখা প্রসার করিয়া, প্রত্যেক শাখা হইতে সহস্র পত্র পল্লব বাহির করিয়া বায়ু হইতে অঙ্গারকণা সংগ্রহ করিতে হয় ; ভূমির ভিতর সহস্র শাখাযুক্ত মূল চালাইয়া লোনা জল সংগ্রহ করিতে হয়। তাহার খাদ্য সামগ্রী তাহার পাশেই বিদ্যমান ;—হাত বাড়াইলেই পাওয়া যায় ও মুখ বাড়াইলেই পাওয়া যায় ;—তজ্জন্য দূর-দূরান্তে দৌড়িতে হয় না ;—এক স্থানে স্থির হইয়া হাজার হাত ও হাজার মুখ বাড়াইলেই কার্য্যসিদ্ধি ঘটে। কোন কোন গাছ এই জন্য প্রকাণ্ড দেহ ধারণ করে, এবং সেই প্রকাণ্ড দেহের ভর সহিবার জন্য জমিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। ঝঞ্ঝা-বায়ু তাহাকে উৎপাটন করিতে পারে না ; বড় বড় জন্তু তাহাকে নিঃশেষ করিয়া, নির্মূল করিয়া ধ্বংস করিতে পারে না। আত্মরক্ষার জন্য কোন সূক্ষ্ম অস্ত্রের তাহার প্রয়োজন হয় না। বরং যে গাছগুলা আকারে ছোট, তাহাদেরই শত্রুভয় অধিক : তাহাদিগকেই আত্মরক্ষার্থে গায়ে কাঁটা গজাইয়া বা পাতায় বিষ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। শত্রু নিকটে আসিয়া আক্রমণ করিলে তাহার প্রতিবিধান করিতে হয়। দূরের শত্রু হইতে উদ্ভিদের তত ভয় নাই। কাজেই সূক্ষ্মতর জ্ঞানাস্ত্র উদ্ভাবনায় উদ্ভিদের প্রয়োজনই হয় নাই। জন্তুর পক্ষে কিন্তু ভিন্ন ব্যবস্থা। জন্তু নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করিতে পারে না। উদ্ভিদ্‌কে বা অন্য জন্তুকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে বাঁচিতে হয় ; এক স্থানে স্থির থাকিলে তাহার চলে না ; উদ্ভিদ্ বা অন্য জন্তুকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। কাজেই জন্তুরা সাধারণতঃ অস্থির, চঞ্চল ; দৌড়িয়া গিয়া অন্যকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আহার সংগ্রহ করিতে হয় ; আবার অন্য জন্তু আক্রমণ করিতে আসিলে দৌড়িয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। দূরস্থিত আহার-সামগ্রীর সন্ধান পাওয়া তাহার প্রয়োজন ; দূরস্থিত শত্রুর সন্ধান পাওয়া

তাহার প্রয়োজন। এই সন্ধান ব্যাপারে জ্ঞানাস্ত্রের তুল্য অস্ত্র নাই। অতি দূরদেশ হইতে অতি সূক্ষ্ম উত্তেজনা,—গন্ধের, শব্দের, বর্ণের উত্তেজনা পৌঁছিবা মাত্র তাহাতে সাড়া দিয়া তদনুসারে আত্মরক্ষা-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার প্রয়োজন। জ্ঞানাস্ত্রের কাজ ইহাই। প্রাণিবিদ্যা বলিবেন, জন্তুরা এই উদ্দেশ্যেই জ্ঞানাস্ত্র অর্জ্জন করিয়াছে বা উদ্ভাবনা করিয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে যাহার প্রয়োজন হয় নাই, জন্তুর পক্ষে তাহার প্রয়োজন হইয়াছে। কাজেই জন্তুমধ্যে—বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর জন্তুমধ্যে আমরা স্পষ্টতঃ জ্ঞানের সঞ্চার দেখিতে পাই। কিন্তু এই জ্ঞানাস্ত্রেরও আবার প্রকার-ভেদ আছে, সামর্থ্য-ভেদ আছে। দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিব। প্রজাপতি বা মৌমাছি দূরে অবস্থিত ফুলে বর্ণের বা গন্ধের উত্তেজনা পাইবা মাত্র সেই ফুলের অভিমুখে দৌড়িয়া যায়; সম্পূর্ণ জ্ঞানপূর্ব্বকই দৌড়িয়া যায়। মৌমাছি সেই ফুলের মধু আনিয়া চাকের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া, চাকের যিনি সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, চাকের যিনি রাণী, তাঁহার বাচ্চাগুলির ভোজনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। মৌমাছিদের অধিকাংশই কেবল মজুরি করে; সহস্র কুঠরিতে বিভক্ত চাক গড়ে; সেই চাকের কারিগরি দেখিলে মানুষেরও তাক লাগিয়া যায়। সেই কুঠরিতে তাহারা মধু সঞ্চয় করে; আর চাকে রাণী কুঠরির মধ্যে ডিম পাড়েন। রাণী কেবলই বসিয়া বসিয়া ডিম পাড়িতেছেন, হাজার হাজার ডিম পাড়িতেছেন; সেই ডিমগুলি ফুকাইয়া যখন বাচ্চা মাছি নির্গত হইতেছে, চাকের মজুর-মাছিরা তখন তাহাদিগকে সযত্নে লালন পালন করিতেছে এবং সঞ্চিত মধু খাওয়াইয়া তাহাদিগকে পোষণ করিতেছে। যদি কোন শত্রু চাকের নিকটে আসে, অমনই তাহাদের গায়ে হুল ফুটাইয়া বিষ ঢালিয়া দেয়। মৌমাছির এই যে আত্মরক্ষাপর এবং বংশরক্ষাপর কর্ম্ম, ইহা জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম, ইহা স্বীকার না করিলে বুঝি চলে না। দূরাগত গন্ধের বা বর্ণের অতি সূক্ষ্ম উত্তেজনা পাইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক মৌমাছি ফুলের দিকে ছুটিতেছে, ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে, চাকের কুঠরির মধ্যে সঞ্চয় করিতেছে, নিজের চাক নিজেই গড়িতেছে, আবশ্যকমত চাক মেরামত করিতেছে, রাণী-মাছির ডিমগুলিকে এবং বাচ্চাগুলিকে সযত্নে পালন করিতেছে, চাকের শত্রু দেখিবা মাত্র তাহাকে আক্রমণ করিতেছে;—এত কাণ্ড সে জ্ঞানপূর্ব্বক করিতেছে, ইহা মানিতে পারি। জ্ঞানপূর্ব্বক করিতেছে বলিয়াই মৌমাছি উদ্ভিদের তুলনায় উচ্চ

প্রাণী। কিন্তু এখানেও উদ্ভিদের সহিত তাহার মিল আছে। মৌমাছি জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতেছে, ইহা মানি; কিন্তু কেন করিতেছে, কি উদ্দেশ্যে করিতেছে, তাহার কিছুই সে জানে না। করিতে হয়, তাই সে করিয়া যাইতেছে। কি যেন ভিতর হইতে তাহাকে করাইতেছে; সে বাধ্য হইয়া করিতেছে; তাহার না করিলে নয়, তাই সে করিতেছে: এই কর্ম্ম বিষয়ে তাহার কোনরূপ ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই, কোনরূপ স্বাধীনতা নাই, কোনরূপ বিচার-বিতর্কের অবসর নাই, করিব না বলিবার কোন অধিকার নাই। সে বিষয়ে মৌমাছির অবস্থা বাবলাগাছেরই সমান। বাবলাগাছ যথাকালে সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা বাহির করে; এই কাঁটা আত্মরক্ষার অস্ত্র বটে; কিন্তু বাবলা গাছ জানেও না যে, সে আত্মরক্ষার জন্য এই অস্ত্র বাহির করিয়াছে; এমন কি, সে জানেও না যে তাহার শত্রু আছে; এবং সেই শত্রু হইতে আত্মরক্ষার জন্যই সে যথাকালে কণ্টকাস্ত্র প্রস্তুত রাখিয়াছে। সে যথাকালে কাঁটা বাহির করিতে বাধ্য আছে; এ বিষয়ে কোন স্বাধীনতা তাহার নাই। মৌমাছিও সেইরূপ জানে না, কেন—কি উদ্দেশ্যে সে এইরূপে খাটিয়া মরিতেছে। নিজের জন্য যত না খাটুক, চাকের রাণীর জন্য এবং চাকের রাজপুত্র এবং রাজকন্যাদের জন্য খাটিয়া মরিতেছে। অথচ এ বিষয়ে মৌমাছিরও স্বাধীনতা নাই; ভিতরের প্রেরণায় তাহাকে বংশরক্ষার্থ ঐরূপ খাটিতে হয়; না খাটিলে তাহার চলে না, তাই বাধ্য হইয়া খাটে। এই বাধ্যতা বিষয়ে, এই স্বাধীনতার অভাবে মৌমাছির বাবলাগাছের সহিত মিল। বাবলাগাছের সহিত তাহার প্রভেদ এই যে, বাবলাগাছ নিজের কাঁটার অস্তিত্বও জানে না, বাহিরের শত্রুর অস্তিত্বও জানে না, শত্রুর গায়ে যখন কাঁটা বিঁধে, তাহারও কোন খবর রাখে না। মৌমাছি বোধ হয় সেইটুকু জানে। বাহির হইতে শব্দের উত্তেজনা, বর্ণের উত্তেজনা, গন্ধের উত্তেজনা আসিবা মাত্র সে জানিতে পারে এবং সেই উত্তেজনা আসিলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। বাবলাগাছ জ্ঞানহীন, তাহার জ্ঞানই নাই; মৌমাছি জ্ঞানবান্, তাহার কর্ম্ম জ্ঞানপূর্ব্বক। উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ। কিন্তু উভয়েই প্রাণধর্ম্মের সর্ব্বতোভাবে অধীন; প্রায় যন্ত্রবৎ অধীন।

মৌমাছির পক্ষে এই প্রাণ-ধর্ম্মের প্রেরণার ইংরাজী নাম instinct; বাঙ্গালায় বলা যাইতে পারে, সহজাত বা সহজ সংস্কার;—সহজাত; কেন না, মৌমাছি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমুদয় ক্ষমতা ষোল আনাই পাইয়া

থাকে; দেখিয়া, শুনিয়া বা ঠেকিয়া শিখিতে হয় না। কোন্ অবস্থায় কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহা তাহাকে শিখিয়া লইতে হয় নাই, কেহ তাহাকে শিখায় নাই। চাক নির্ম্মাণে, চাক রক্ষায়, মধু সঞ্চয়ে, অপত্য পালনে তাহার পটুত্ব একেবারে অশিক্ষিত-পটুত্ব। ইহা জন্মসহকারে লব্ধ, অতএব সহজাত বা সহজ। ঐ অশিক্ষিত-পটুত্ব,—ঐ সহজ সংস্কার চাক রক্ষার অনুকূল; মৌমাছির জাতিরক্ষার ও বংশরক্ষার অনুকূল। অতএব এই সংস্কারটা জীবন-সংগ্রামে অনুকূল, এই সংস্কারটা তাহাকে জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতা দিয়াছে। অতএব মৌমাছি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে এই সংস্কার অর্জ্জন করিয়াছে। অতীত ইতিহাসে যে সকল মাছির এইরূপ বংশরক্ষার প্রবৃত্তি ছিল না, তাহাদের বংশ কোন্ দিন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; ঘটনাক্রমে যাহাদের ছিল, তাহাদের বংশ আজ পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে। মৌমাছির চেয়ে উচ্চশ্রেণীর প্রাণী—বিড়াল, কুকুর হইতে মানুষ পর্য্যন্ত যাবতীয় উচ্চশ্রেণীর প্রাণী তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পরিচালনায় নানাবিধ এইরূপ সহজ সংস্কারের দাস। এরূপ ক্ষেত্রে এইরূপ দাসত্বই প্রাণরক্ষার অনুকূল; স্বাধীনতাই বিপজ্জনক। আত্মরক্ষার জন্য সদাসর্ব্বদা সে সকল কর্ম্মের প্রয়োজন, যে সকল বিপদ্ আপদ্ জীবনযাত্রায় প্রতিনিয়ত আসিয়া থাকে, সেই সকল বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে কর্ম্মের প্রয়োজন, তাহাতে সহজ সংস্কারের দাসত্বই অনুকূল। সে সকল স্থলে বিচার-বিতর্ক, দ্বিধা-সংশয় উপস্থিত হইলে জীবনরক্ষাই দুষ্কর হইত। প্রকৃতি ঠাকুরাণী এখানে বুদ্ধি-বিবেচনার উপর, সঙ্কল্প-বিকল্পের উপর নির্ভর করিতে সাহসী হন না; অথবা যাহারা এ সকল বিষয়ে সহজ সংস্কারের সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, তাহাদিগকেই বাঁচাইয়া রাখেন, অপরকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়া জীবনের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চিরদিনের জন্য সরাইয়া দেন। ব্যাপারটা বুঝুন। প্রাণরক্ষার ব্যবস্থায় কেমনে ধাপে ধাপে উঠিতে হয়, তাহা দেখুন। প্রথম ধাপে অজ্ঞানেই মঙ্গল; তার পর সংস্কার, তার পর বুদ্ধি বিবেচনা আবশ্যক হয়। মানুষের অবস্থাই মনে করুন না। আমাদের হৃৎপিণ্ড অহর্নিশ স্পন্দিত হইয়া দেহের সর্ব্বত্র নাড়ীযোগে রক্তের ধারা প্রবাহিত রাখিয়াছে; আমাদের শ্বাসযন্ত্র সর্ব্বদা নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলাইতেছে, এ বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞানেরই অবসর নাই। এখানে আমাদের অবস্থা প্রায় উদ্ভিদের মত। আমাদের দেহের মধ্যে

এইরূপ কাণ্ড ঘটিতেছে; তাহার আমরা কোন খোঁজই রাখি না। আমাদের অজ্ঞাতসারে, এমন কি ঘোর নিদ্রাবস্থাতেও রক্তচালনা এবং শ্বাস প্রশ্বাস ঘটিয়া থাকে; মুহূর্ত্তের জন্যও উহা রুদ্ধ হইলে প্রাণসঙ্কট হয়। কাজেই এ সকল কর্ম্ম আমরা জ্ঞানপূর্ব্বক করি না, নিতান্ত জ্ঞানহীন যন্ত্রের মতই করিয়া থাকি। এখানে সহজ সংস্কারের প্রভুত্ব পর্য্যন্ত আবশ্যক হয় না। যাহা চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া চলিবে, তাহাতে দূরাগত উত্তেজনার অপেক্ষা চলে না; তাহা অজ্ঞানেই করিতে হইবে। এখানে আমরা মৌমাছি অপেক্ষাও হীন। এখানে আমরা গাছপালার সমধর্ম্মী। ইহার উপরে আর কতকগুলি কর্ম্ম আছে; সেগুলি প্রাণযাত্রার জন্য নিত্য আবশ্যক নহে; তবে সময়মত আবশ্যক বটে। শত্রু আসিলে আমরা ক্রোধের বশে তাহাকে আক্রমণ করি, অথবা ভয় পাইয়া দূরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করি। যথাকালে অপত্য উৎপাদন করিয়া বংশরক্ষার প্রবৃত্তি আপনা হইতেই আসে। এই কাজগুলি আমরা জ্ঞানপূর্ব্বক করি, কিন্তু সহজ সংস্কারের বশে করি। এখানে আমাদের অশিক্ষিত-পটুত্ব। এ সকল কাজ আমাদিগকে শিখিতে হয় নাই, পিতৃপরম্পরাক্রমে ইহা আমরা স্বভাবতঃ লাভ করিয়াছি। এই সকল কর্ম্মে সহজ সংস্কার—instinct প্রভু। এখানে আমরা সংস্কারের দাস; এখানে আমাদের অবস্থা মৌমাছির মত; তাহার অপেক্ষা অধিক উচ্চ নহে। এখানে বুদ্ধি বিবেচনা খাটাইতে গেলে দ্বিধা সংশয় আসিত, তাহাতে প্রাণেরও সংশয় ঘটিত। কাজেই আমরা এখানে সংস্কারের দাসত্ব করিতেছি। ইহার উপরে উঠিলে তবে বুদ্ধি বিবেচনায়—intelligenceএ পৌঁছান যায়। এই intelligence বা বুদ্ধিবৃত্তি, instinct বা সহজ সংস্কারের অনেক উপরে। সংস্কারের প্রদর্শিত পথ ধরা-বাঁধা, কাটা-ছাঁটা; সেখানে একটু এদিক্ ওদিক্ চলিবার উপায় নাই। বুদ্ধি-দর্শিত পথ একাধিক। যে সকল বিপদ্ আপদ্ সদাসর্ব্বদা আসে না, সহজ সংস্কার সেখানে আত্মরক্ষার জন্য কোন পথই দেখাইতে পারে না। যে প্রাণী কেবল সহজ সংস্কারের দাস, তাহাকে সেখানে পড়িয়া প্রহার খাইতে হয়। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি সে সকল স্থলেও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে। এখানে শিক্ষা আবশ্যক, experience আবশ্যক, মগজের জোর আবশ্যক। কুকুর, বিড়াল, বাঘ, ভালুকে বুদ্ধিপূর্ব্বক কাজ করে। তাহাদের পক্ষে সংস্কারের প্রেরণা ত আছেই, তাহার উপরে বুদ্ধির

প্রেরণাও আছে। কুকুর তাহার মনিবকে চিনিয়া লইতে শিখিয়াছে। কোথায় কখন্ গেলে দুধ মাছ পাওয়া যাইবে, বিড়াল সে বিষয়ে অভিজ্ঞ। কখন্ কোথায় লুকাইয়া থাকিলে শিকার মিলিবে, বাঘ ভালুক তাহা বহু চেষ্টার ফলে শিখিয়া লইয়াছে। বুদ্ধি আছে বলিয়াই বাঁদরে ও ভালুকে বেদিয়ার কাছে নাচ শেখে। সকল প্রাণীর উপরে এ বিষয়ে মানুষের স্থান। এমন কি, মানুষের বুদ্ধি এতটা প্রবল যে, সে বুদ্ধির বলে সংস্কারের প্রেরণাকেও দমনে রাখিতে পারে। সংস্কারের প্রেরণা যেখানে কোন পথ দেখায় না, অথবা যে পথ দেখায়, তাহা প্রাণরক্ষার পক্ষে বিপথ, বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে পথ নির্দ্দেশ করে। সংস্কার যেখানে বলে—চল, বুদ্ধি সেখানে বলে—পলাও। সংস্কারের দাস পতঙ্গ নিঃসঙ্কোচে আগুনে ঝাঁপ দেয়। পশু পক্ষী একবার আগুনের ছেঁকা পাইয়া আর সে দিকে ঘেঁসে না। সংস্কারের প্রেরণা যেখানে প্রতিকূল, বুদ্ধির জোর সেখানে কাজ করে। এই বুদ্ধির প্রয়োগ কিন্তু অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ ; কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপে বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহা জীবন ব্যাপিয়া ঠেকিয়া শিখিতে হয়। এই অভিজ্ঞতা অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা। পশু পক্ষীর পক্ষে কিন্তু এই অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা যৎসামান্য—অতি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আপনার ক্ষুদ্র জীবনে পশু পক্ষী ঠেকিয়া শেখে ; কিন্তু যাহা শেখে, তাহাও স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতায় হউক বা অন্য কারণেই হউক, ধরিয়া রাখিতে পারে না। কাজেই তাহাদের বুদ্ধির দৌড় খুব অল্প। বুদ্ধির প্রেরণাও অতি দুর্ব্বল ;—সংস্কারের প্রেরণার কাছে উহার বল অকিঞ্চিৎকর বলিলেই হয়। তা হইবেই ত ? কুকুর তার মনিবের কাছে কখনও আদর পায়, কখনও বা তাড়না পায়। মনিবের ডাকে নিকটে আসিয়া কখনও বা রুটির টুকরা পায়, কখনও বা আবার চাবুকের ঘাও পায়। একই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন-ভিন্নরূপ ; কাজেই উহার বুদ্ধিবৃত্তি কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে গিয়া ফাপরে পড়ে—দ্বিধা আসে, সংশয় আসে। সংস্কারের প্রেরণায় এরূপ দ্বিধা নাই, সংশয় নাই ; উহা একবারে জোর হুকুম ; তামিল না করিলে উপায় নাই। প্রাণযাত্রার দৈনন্দিন ব্যাপারে প্রকৃতি যেখানে সংস্কারের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেখানে সংস্কারের প্রেরণা অমোঘ ও অব্যর্থ। প্রাণযাত্রায় যে সকল বিপদ্ আপদ্ দৈনন্দিন ঘটনা নহে, নিতান্ত নৈমিত্তিক ঘটনা মাত্র, সেইখানেই সংস্কার কোন পথ দেখায় না ;

যদি বা দেখায়, তাহা পতঙ্গের বহ্নিপ্রবেশ-প্রবৃত্তির মত হয়ত প্রাণযাত্রার প্রতিকূলই হয়। সেখানে অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিবৃত্তি আসিয়া সহায় হয়। সহায় হয় বটে, কিন্তু কেবলই দ্বিধা আনে, সংশয় আনে; জোরের সহিত পথ নির্দ্দেশ করে না। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, পশু পক্ষীর জীবনযাত্রায় সহজ সংস্কারের কর্তৃত্ব প্রবল, বুদ্ধিবৃত্তির কর্ত্তৃত্ব দুর্ব্বল।

অতীতের অভিজ্ঞতার উপরে ভর দিয়া বুদ্ধিবৃত্তি উপস্থিত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারে; কিন্তু ভবিতব্য হইতে রক্ষা করিতে পারে কি না, এই প্রশ্ন উঠিবে। ইতর জন্তু ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকে বটে; কিন্তু বোধ করি, সর্ব্বত্রই সংস্কারের প্রেরণায় করে। কীট পতঙ্গের ত কথাই নাই, উচ্চতর শ্রেণীর পশু পক্ষীতেও বোধ করি, সংস্কারের প্রেরণায় করে, বুদ্ধিপূর্ব্বক করে না। ভবিষ্যতে সন্তান জন্মিবে, এখনই তাহার জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া রাখা আবশ্যক; শীতকালে আহার মিলিবে না, অতএব শীত পড়িবার পূর্ব্বেই আহারসামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখা আবশ্যক,—এতটুকু বুদ্ধি যে পশু পক্ষীর আছে, তাহা স্বীকার করা যায় না। অথচ তাহারা যে, ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে, সেখানে সংস্কারের প্রেরণাই হেতু। তাহারা স্বভাবতঃ ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে উহা শিখিতে হয় নাই। মানুষের পক্ষে কিন্তু অন্যরূপ। অতীতে এইরূপ ঘটনাপরম্পরা ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতেও সেইরূপ ঘটনাপরম্পরা আসিবে; অতএব এখনই তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইতে হইবে, এই বিচারের ক্ষমতা মানুষের আছে। একটা যে ভবিষ্যৎ আছে, সেই জ্ঞানটুকুই ইতর প্রাণীর মধ্যে কতটুকু স্পষ্ট, তাহা বলা কঠিন। এমন কি, ভবিষ্যতে মরণের জ্ঞান পর্য্যন্ত তাহাদের আছে কি না, তাহাও বলা কঠিন। চোখের সামনে সকলেই মরিতেছে; অতএব জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ; অতএব আমাকেও এক দিন মরিতে হইবে; অতএব আমার মরণের পর আমার সন্তান-সন্ততির ব্যবস্থা এখনই করিয়া যাইতে হইবে, মানুষ এতটা ভাবিয়া জীবনযাত্রা চালায়। ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করা দূরের কথা, এক দিন মরিতে হইবে, ইতর প্রাণীর সে জ্ঞানটুকু আছে কি না, তাহাই বলা কঠিন। বলিদানের পাঁঠা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে; একটার পর একটা খড়্গাঘাতে ছিন্ন হইতেছে; যাহার পালা পরক্ষণেই আসিবে, সে চোখের সামনে এই হত্যাকাণ্ড দেখিতেছে; অথচ নির্ব্বিকারে পাতা

চিবাইতেছে ; তাহার বুদ্ধির দৌড়ের পরিচয় এইখানে। অতীতের সম্বন্ধেও ইতর প্রাণীর জ্ঞান কতটুকু স্পষ্ট, তাহা বলা কঠিন। মানুষ তাহার স্মরণশক্তির সাহায্যে অতীত জীবনের ঘটনাগুলিকে মনের মধ্যে পর পর সাজাইয়া গাঁথিয়া রাখিয়াছে ; কিন্তু পশু পক্ষী তাহাদের জীবনের ঘটনাপরম্পরাকে ঐরূপ পর পর সাজাইয়া একটা অতীত ইতিহাস মনের মধ্যে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছে কি? সে ক্ষমতা থাকিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর গ্রীষ্মের পর শীত আসিয়াছিল, এবারও গ্রীষ্মের পর শীত আসিবে, এই বুদ্ধিটুকু থাকা সম্ভব হইত, এবং বুদ্ধিপূর্ব্বক আগামী শীতের জন্য আয়োজন করাও সাধ্য হইতে পারিত। আবার স্মরণের অতীত যে একটা কাল ছিল, সে কালেও যে কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন পশু পক্ষীর কোন ধারণা আছে কি? জন্মের পূর্ব্বেও যে একটা অতীত কাল গিয়াছে, আমি যখন ছিলাম না, তখন আর কিছু ছিল, মরণের পরেও যে একটা ভবিষ্যৎ কাল আসিবে, আমি যখন থাকিব না, তখনও আর কিছু থাকিবে—এ ধারণাটুকু যে পশু পক্ষীর নাই, তাহা বোধ হয় নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে। ফলে যেটুকু প্রত্যক্ষ হইয়াছে বা হইতেছে, সেই প্রত্যক্ষের সীমা ছাড়াইয়া আর কিছু আছে কি না, সে সংশয়ও বোধ করি, কোন পশু পক্ষীর মনে এ পর্য্যন্ত উদিত হয় নাই। অথচ মানুষের এইখানে বিশিষ্টতা। এই যে কথাটা তুলিলাম, ইহার গুরুত্ব আছে। আপনারা অবধান করুন। মানিয়া লইলাম, পশু পক্ষীর স্মরণশক্তি আছে ; তদ্দারা সে অতীত জীবনে নানা বিপদে আপদে পড়িয়া কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে ; সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে উপস্থিত বিপদ্ হইতে সে বুদ্ধিপূর্ব্বক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। উপস্থিত বিপদের কথা বলিলাম ; কোন ভবিতব্য বিপদ্ হইতে পশু পক্ষী বুদ্ধিপূর্ব্বক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে, ইহা মানা কঠিন। ভবিতব্যের জন্য আয়োজনে পশু পক্ষীর পক্ষে সংস্কারই প্রভু। কিন্তু এই অতীতের অভিজ্ঞতাও পশু পক্ষীর পক্ষে কেবল নিজের প্রত্যক্ষমধ্যে সীমাবদ্ধ। যে ঘটনা সে নিজে প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহার সম্বন্ধে কোন সংশয়ই তাহার মনে থাকিতে পারে না। এক কালে মরণ হইবে, এ ধারণা তাহার ত নাই ; এক কালে জন্ম হইয়াছিল, সে ধারণাও যে আছে, ইহা মনে করিতে পারি না। জন্মের পূর্ব্বেও যে একটা অতীত কাল ছিল, তখন সে ছিল না, কিন্তু অন্য পশু পক্ষী ছিল, তখনও একটা বাহ্য জগৎ

ছিল, সে জগতে নানা ঘটনা ঘটিত, এই ধারণাটুকু পশু পক্ষীর থাকিতে পারে, ইহা মানিতে পারি না। কিন্তু মানুষের ইহাই বিশিষ্টতা। বয়ঃস্থ মানুষের স্পষ্ট বিশ্বাস আছে যে, এক সময়ে তাহার জন্ম হইয়াছে। তাহার জন্মের পূর্ব্বেও একটা অতীত কাল গিয়াছে, যে অতীত তাহার প্রত্যক্ষ হয় নাই; তথাপি তাহা ছিল। মানুষের স্পষ্ট ধারণা আছে যে, তাহার একটা ভবিতব্য আছে এবং সেই ভবিতব্য তাহার প্রত্যক্ষ হইবে। অতীতের ঘটনাপরম্পরা দেখিয়া সে ভবিতব্য ঘটনাপরম্পরা সম্বন্ধেও কতকটা অনুমান করিয়া লয়; এবং তাহার অনুমান বস্তুতই প্রত্যক্ষ প্রমাণে যথাকালে সমর্থিত হয়। একদিন মরণ আসিবে, সেই মরণের পরও একটা ভবিতব্য থাকিবে—উহা তাহার প্রত্যক্ষ না হইলেও নিশ্চয় আসিবে। এ বিশ্বাসও মানুষের আছে। সে বিশ্বাস এত দৃঢ় যে, মরণের পরবর্ত্তী সেই ভবিষ্যৎ কালের জন্যও সে আজি হইতে ব্যবস্থা করে;—নিজের জন্য না করুক, আপনার পুত্রপৌত্রাদির জন্য করিয়া থাকে। এক কথায় পশু পক্ষীর পক্ষে কাল নামক অদ্ভুত পদার্থটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; উহা নিজ জীবনের প্রত্যক্ষের দুই দিকের সীমানা মধ্যেই আবদ্ধ। অতীতের একখানা ছোট অস্পষ্ট পট তাহার জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে থাকিতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎ তাহার নিকটে একেবারে আঁধার। কিন্তু মানুষের পক্ষে কাল এরূপ সীমাবদ্ধ নহে; প্রত্যক্ষের সীমানাকে দুই দিকে—অতীতের দিকে ও ভবিতব্যের দিকে—দুই দিকেই অতিক্রম করিয়া মানুষ কালপদার্থকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে;—এতটা করিয়া ফেলিয়াছে যে, এখন সেই অতীত কালের আদি কোথায়, এবং ভবিষ্যৎ কালের অন্ত কোথায়, তাহার কল্পনা করিতেও মানুষ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। পশু পক্ষীর সহিত মানুষের এই যে প্রভেদ, ইহা অতি প্রচণ্ড প্রভেদ। ইহাতে মানুষকে পশু পক্ষীর পর্য্যায় হইতে একদমে অতি ঊর্দ্ধে তুলিয়া দিয়াছে। ইহার মানে কি? ইহার গোড়ার কথা কি?

ইহার মানে এই। মানুষ আপনাকে বহুর মধ্যে এক বলিয়া মনে করে; অপিচ সেই বহুকে সর্ব্বাংশে আত্মতুল্য মনে করে। কুকুরও যে আপনাকে বহু কুকুরের মধ্যে এক বলিয়া না জানে, এমন নহে। তাহারও স্বজাতির প্রতি বিশিষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। আপনার স্বজাতিভুক্ত অন্য কুকুরের ডাক শুনিলে সে যেমন দূরে থাকিয়াও ডাকিয়া উঠে, স্বজাতিভুক্ত

অন্য কুকুরকে নিকটে দেখিলে সে যেমন দাঁত খেঁচিয়া উহার অভ্যর্থনা করে, পরজাতিভুক্ত বিড়াল বা গরু ভেড়ার প্রতি তাহার সেরূপ ব্যবহার দেখা যায় না। তাহার স্বজাতি-পরজাতি ভেদ করিবার জ্ঞান আছে বটে; —স্বজাতির প্রতি তাহার ব্যবহার একরূপ, পরজাতির প্রতি ব্যবহার অন্য-রূপ। অতএব মানিয়া লইলাম, সে আপনাকে এক বৃহৎ সারমেয়-সমাজের অন্যতম সভ্য মাত্র বলিয়াই জানে, এবং তৎসহিত অন্যান্য সভ্যেরও অস্তিত্ব মানিয়া লয়। খুব সম্ভব, স্বভাবধর্ম্মে অর্থাৎ সংস্কারের প্রেরণাতেই সে ঐরূপ করে। কিন্তু অন্য .কুকুরও যে সর্ব্বাংশে তাহার মতই জ্ঞানবিশিষ্ট জীব; তাহার যেমন আত্ম-জীবনের অভিজ্ঞতা আছে, অন্য কুকুরেরও সেইরূপ অভিজ্ঞতা আছে; অন্যের সেই অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে পারিলে নিজেরও প্রাণযাত্রার উপকার হইতে পারে; এতটুকু বিচার-ক্ষমতা তাহার আছে কি না, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারিব না। মানুষ যেমন অন্য মানুষকে সর্ব্বাংশে আত্মতুল্য মনে করে, কুকুরও সেইরূপ অন্য কুকুরকে সর্ব্বাংশে আত্মতুল্য মনে করে কি না, বলিতে পারিব না। যখন অন্য মানুষেরই মনের ভিতর প্রবেশ করিতে পারি না, তখন কুকুরের মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঐ প্রশ্নের সমাধান করিতে আমি অশক্ত। কিন্তু মানুষ যেমন অন্য মানুষকে আত্মতুল্য মনে করিয়া, সেই অন্য মানুষের অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে শিখিয়াছে, কুকুর যে তাহা পারে নাই, তাহা জোরের সহিত বলিতে পারি। মানুষ অন্য মানুষকে আত্মতুল্য অভিজ্ঞ জীব বলিয়া মানে এবং অন্যের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে পারে। পারে বলিয়াই জীবনযুদ্ধে তাহার সামর্থ্য অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। এজন্য মানুষ যে ক্ষমতা উপার্জ্জন করিয়াছে, জীবনযুদ্ধে তাহা মানুষের পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র—উহার নাম প্রজ্ঞা বা Reason।

এই প্রজ্ঞার বিষয় আমি পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এখানে আবার পুনরুক্তি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পুনঃ পুনঃ একই কথা লইয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিতেছি, তজ্জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। বহু দিনের কথা, খুব সম্ভব আপনাদের স্মরণ নাই, অথচ আমার বক্তব্য ফুটাইবার জন্য তাহা মনে না করিয়া দিলেও নয়। মানুষের এই প্রজ্ঞা বস্তুতই সৃষ্টিকর্ত্রী—ইহা রূপের জগৎ অবলম্বন করিয়া একটা নামের জগৎ রচনা করিয়া ফেলে। প্রত্যক্ষ percept অবলম্বন করিয়া ইহা সাঙ্কেতিক

concept সৃষ্টি করে। এই conceptগুলা নিতান্তই কল্পিত পদার্থ,—প্রজ্ঞা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পদার্থ। এক-একটা কৃত্রিম সঙ্কেত আশ্রয় করিয়া এই conceptগুলা বাহিরে প্রকাশ পায়। এক-একটা conceptএর গায়ে এক-একটা নামের টিকিট আঁটিয়া বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই concept গড়া এবং প্রত্যেক conceptএর গায়ে এক-একটা নামের টিকিট বসান, ইহা একটা মস্ত কারিকরি; সহজ সংস্কার বা instinct এবং বুদ্ধিবৃত্তি বা intelligence, ইহাদের শক্তিতে এই কারিকরি কুলায় নাই। ইহার জন্য প্রজ্ঞার আবশ্যকতা হইয়াছে। প্রজ্ঞা স্বহস্তরচিত এই conceptগুলি বা নামগুলি লইয়া খেলায়; তাহাদের মধ্যে নানা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নানা formula বাঁধে, নানা সূত্রবদ্ধ নিয়মের ব্যবস্থা করে; এবং সেই সকল formula বা নিয়ম-সূত্রের সাহায্যে অতীতের সহিত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে বাঁধিয়া ফেলে। এমন করিয়া বাঁধিয়া ফেলে যে, অতীত হইতে বর্ত্তমানকে টানিয়া বাহির করা চলে, এবং অতীত ও বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যৎকে আকর্ষণ করিয়া গণিয়া বলা যায়। এইরূপ নিয়মসূত্রে আবদ্ধ যে নূতন জগৎ কল্পিত হয়, তাহাকেই আমি নামের জগৎ বা বাঙ্ময় জগৎ বলিয়াছি—উহা প্রত্যক্ষ রূপের জগতের একটা সাঙ্কেতিক প্রতিমা মাত্র;—প্রজ্ঞা এই বাঙ্ময় জগতের সাহায্য লইয়া,—প্রত্যক্ষ জগতে কিরূপে চলিলে ঠকিতে হইবে না, তাহা মানুষকে দেখাইয়া দেয়। এই বাঙ্ময় জগৎ নির্ম্মাণে মানুষকে অন্যের অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে হয়—অন্যের প্রত্যক্ষের সহিত আপনার প্রত্যক্ষের কতটা মিল আছে, তাহা জানিয়া লইতে হয়। কেন না, এই বাঙ্ময় জগৎ কোন মানুষেরই জগৎ নহে; ইহা সেই Mean Manএর জগৎ; কোটি কোটি মানুষের গড় করিয়া যে মাঝারি মানুষ কল্পিত হয়, সেই কৃত্রিম মাঝারি মানুষের জগৎ। বাঙ্ময় জগতের সাহায্যেই যখন পরস্পরের সহিত কারবার করিতে হইবে, তখন সকলের প্রত্যক্ষের সহিত সামঞ্জস্য না করিতে পারিলে চলিবে কেন? এই জন্য নিজের অভিজ্ঞতা অন্যকে জানাইতে হয় এবং অপরের অভিজ্ঞতা নিজে গ্রহণ করিতে হয়। তাহার ব্যবস্থাও প্রজ্ঞা করিয়া লইয়াছে; প্রত্যেক conceptএর গায়ে নামের বা শব্দের টিকিট বসাইয়া ভাষা নামক কৃত্রিম উপায়ের উদ্ভাবনা করিয়াছে এবং সেই ভাষার সাহায্যে একের অভিজ্ঞতা অন্যকে জানাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে।

মানুষের জীবনযাত্রায় প্রজ্ঞা এইরূপে এক প্রকাণ্ড খেলা খেলিতেছে; একের অভিজ্ঞতা অপরকে জানাইয়া, বহু কোটি মনুষ্যের অভিজ্ঞতা একত্র স্তূপীকৃত করিয়া, তদনুসারে এক প্রকাণ্ড বাঙ্ময় জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছে। সেই জগতে প্রতিষ্ঠাপিত নিয়মের সূত্র ধরিয়া ব্যাবহারিক জগতে কিরূপে চলিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। বর্ত্তমানে কিরূপে চলিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে কিরূপে চলিতে হইবে, তাহা দেখাইতেছে। কেন না, বাঙ্ময় জগতে বর্ত্তমান এক দিকে অতীতের সহিত, অন্য দিকে ভবিষ্যতের সহিত দৃঢ় নিয়মের সূত্রে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে;—প্রজ্ঞাই সেই নিয়মের সূত্র গড়িয়াছেন ও তদ্দ্বারা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই তিনকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। পশু পক্ষীর বুদ্ধির দৌড় দু-দিকে সীমাবদ্ধ; অতীত তাহার ক্ষুদ্র প্রত্যক্ষমধ্যে সীমাবদ্ধ; ভবিষ্যৎ ত একবারে অন্ধকার। কিন্তু মানুষের প্রজ্ঞার দৌড় কোন সীমা মানে না; অতীত ও ভবিষ্যৎ দুই দিকে দৌড়ায়; কোনরূপ বাধা বিঘ্ন আটক না মানিয়া দৌড়ায়। প্রত্যেক মানুষের স্বকীয় প্রত্যক্ষ পশু পক্ষীর প্রত্যক্ষের মতই সঙ্কীর্ণ ও সসীম;— অতীতের দিকে কিছু দূর গিয়াই অন্ধকার, ভবিষ্যৎও একবারে আঁধার; তথাপি মানুষের প্রজ্ঞা স্থির করিয়া আছে যে, অতীতেরও আদি নাই—ভবিষ্যতেরও অন্ত নাই। এমন কি, আমি যখন ছিলাম না, তখনও বিচিত্র ঘটনাপরম্পরা লইয়া অতি বিস্তীর্ণ অতীত ছিল; এবং আমি যখন থাকিব না, তখনও বিচিত্রতর ঘটনাপরম্পরা লইয়া ভবিতব্য আপনাকে ক্রমশঃ প্রকাশ করিবে। ইহা প্রজ্ঞারই খেলা। কিরূপে এরূপ হয়? আমি বলিতে চাহি যে, প্রজ্ঞা কেবল আত্মপ্রত্যক্ষে নির্ভর না করিয়া অপরের প্রত্যক্ষ সংগ্রহ করে, সঞ্চয় করে ও স্তূপীকৃত করে; এবং মানবজাতির স্তূপীকৃত অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া তাহার সুনিয়ত সুশৃঙ্খল বাঙ্ময় জগৎকে অসীম দেশে ও অনাদি অনন্ত কালে ছড়াইয়া দেয়। এই অসীম দেশের আলোচনা আমি পূর্ব্বে করিয়াছি; কিন্তু অনাদি অনন্ত কালের আলোচনা আমি পূর্ব্বে করি নাই। এখন সময় আসিয়াছে।

আমার প্রত্যক্ষলব্ধ দেশের মত আমার প্রত্যক্ষলব্ধ কালও আমার স্বোপার্জ্জিত; কিন্তু স্বোপার্জ্জিত বলিয়াই ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। সেই সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ কালে আমার স্বত্বাধিকার ত আছেই। তাহার উপর আমি আমার আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী, প্রত্যেকের স্বোপার্জ্জিত কালের বোঝা

চাপাইয়াছি। কেন চাপাইয়াছি? আমার জীবনযাত্রায় তাহাতে লাভ হইয়াছে বলিয়া চাপাইয়াছি। আমার আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী ইঙ্গিতে ইসারায়, সঙ্কেতে ভাষায় তাঁহাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা আমাকে জানাইয়াছেন; তাহা আমি বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করিয়াছি, এবং আমার ভাণ্ডারে তাহা সঞ্চয় করিয়া লইয়াছি। তদুপরি আমার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ—পিতৃপরম্পরা—যাঁহারা এখন বর্ত্তমান নাই,—তাঁহারাও আপন আপন অভিজ্ঞতার ফল ইঙ্গিতে ইসারায়, সঙ্কেতে ভাষায়, লিপিতে আমার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন; সে সকলও আমি আত্মসাৎ করিয়াছি;—বিশ্বাসের উপর করিয়াছি—তাহাতে জীবনযাত্রায় ঠকিতে হয় নাই; মোটের উপর জিতিয়াই যাইতেছি। দেখিয়াছি যে, এইরূপে আমার জ্ঞান-ভাণ্ডারের পরিসর ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে; আমার চিত্তক্ষেত্রের যে কুঠরিতে এই এই সমস্ত অভিজ্ঞতা স্তূপীকৃত করিতেছি, সেই কুঠরির পরিসর ক্রমেই বাড়িতেছে। এমন ভাবে বাড়িতেছে যে, কোথায় তাহার দেওয়াল গাঁথিব, তাহার ঠাহর না পাইয়া, শেষে হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছি; এবং মনকে বুঝাইতেছি, এখানে দেওয়াল তুলিয়া সীমা নির্দ্দেশের কোন উপায় নাই;—অতএব কাজ নাই কোন সীমা নির্দ্দেশে। অতএব আমি একটা মন-গড়া জগৎ গড়িয়া লইলাম;—তাহার কিয়দংশ মাত্র আমার প্রত্যক্ষ; অপর কিয়দংশ আমার প্রত্যক্ষ না হইলেও অন্যের প্রত্যক্ষ; এবং অবশিষ্ট অংশ সকলেরই প্রত্যক্ষের বাহিরে। এই শেষোক্ত অংশে কি আছে, কি নাই, কি ঘটিতেছে, কি ঘটিবে, তাহা জানি না; জানিতে হয়ত পারিবও না। জানি আর না জানি, সেই বৃহত্তর অংশ আছে, সেখানে যত ইচ্ছা ঘটনার স্থান মিলিবে। প্রজ্ঞা সেখানে নানাবিধ ঘটনা বসাইয়া দিবেন। এ যেন শাদা চেকে সহি করিয়া দেওয়া;—অঙ্কের জায়গাটা খালি থাকিল—সেখানে যে-কোন অঙ্ক লিখিয়া, তাহার উপর যত ইচ্ছা শূন্য বসাইয়া লইতে পার। এই যে কাল, ইহা প্রত্যক্ষ-বহির্ভূত, প্রত্যক্ষের উর্দ্ধে অবস্থিত। ইহা আমার কল্পনা, ইহা আমার রচনা। এই রচনাতে জীবন-সংগ্রামে আমার লাভ বই লোকসান হয় নাই। যে ক্ষমতার বলে এই রচনা, সেই ক্ষমতার নামই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা এইরূপে যেমন অসীম দেশের রচনা করিয়াছেন, সেইরূপ অসীম কালেরও রচনা করিয়াছেন। এই প্রজ্ঞানির্ম্মিত অসীম দেশমধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের প্রজ্ঞারচিত বাঙ্ময় জগৎকে

ছড়াইয়া দিয়াছেন, এবং সেই জগতের ঘটনাপরম্পরাকে সেই প্রজ্ঞা-রচিত কালমধ্যে নিয়মের বাঁধনে বদ্ধ করিয়া বিছাইয়া দিয়া, সেই ঘটনাপরম্পরার আদি কবে এবং অন্ত কবে, তাহার ঠাহর পাইতেছেন না। গ্যালিলিও, নিউটন হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাক্স্‌ওয়েল এবং টমসন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা এইরূপে যে বাঙ্ময় জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি আগে দিয়াছি। এই জগতে প্রতিষ্ঠিত নিয়মসূত্রগুলির প্রয়োগ দ্বারা বিজ্ঞান-বিদ্যা মনুষ্যজাতিকে জীবনযাত্রায় যে আশ্চর্য্য সফলতা দিয়াছে, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। বিজ্ঞান-বিদ্যা যে বাঙ্ময় জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে, সাধারণ মানুষে যে তাহার বিশেষ খোঁজ-খবর রাখে, তাহা আমি বলিতেছি না। আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্যার সূত্রপ্রয়োগে সকলের ক্ষমতাও নাই, অধিকারও নাই। কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যই ছোটখাট বৈজ্ঞানিক। সে আপনার প্রজ্ঞার বলে আপনার জন্য একটা ক্বচিৎ ছিন্ন ক্বচিৎ ভিন্ন বাঙ্ময় জগৎ গড়িয়া লইয়াছে; এবং তন্মধ্যে যে ক্বচিৎ ছিন্ন ক্বচিৎ ভিন্ন নিয়মের সূত্র প্রস্তুত করিয়াছে, তাহাই ধরিয়া আপনার প্রাণযাত্রা নিয়মিত করিতেছে। বলা বাহুল্য, তদ্দ্বারা সে জীবনযুদ্ধে প্রচুর সামর্থ্য লাভ করিয়াছে; কেবল সংস্কারের দাসত্ব এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগে এতটা সামর্থ্য লাভ কখনই ঘটিত না। মনুষ্য যে আজ প্রাণিসমাজের মধ্যে জীবনযুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ এবং অপরাজেয়, তাহার প্রধান কারণ মনুষ্যের এই প্রজ্ঞা বা Reason।

প্রাণি-বিদ্যার রঙিন চশমা এখনও আমার চোখে লাগান আছে। Instinct বা সহজাত সংস্কারের অশিক্ষিত-পটুত্ব, intelligence বা অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ ও শিক্ষালব্ধ বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ-কুশলতা, এবং Reason অর্থাৎ concept নির্ম্মাণ-পটু এবং নানাবিধ concept-মধ্যে সম্পর্কস্থাপন-পটু প্রজ্ঞা, এই তিনকেই আমি এখন জীবন-যুদ্ধে অস্ত্রমাত্র মনে করিতে চাহি। জ্ঞানবান্ জন্তু এই তিনকে অস্ত্রস্বরূপ করিয়া জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত আছে, এবং পরস্পরকে হটাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। এই তিনেই যখন জীবনযুদ্ধে সামর্থ্য দেয়, তখন ইহারা কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা নিরূপণের জন্য প্রাণি-বিদ্যা ব্যাকুল নহে। অন্য বিদ্যা ব্যাকুল থাকিতে পারে। সহজ সংস্কার প্রাণযাত্রার নিত্য আপদ্ নিবারণের জন্য নিত্য প্রযুক্ত হয়। এক হিসাবে ইহার পরাক্রম অধিক; কেন না, ইহার সন্ধান

অমোঘ এবং অব্যর্থ। বুদ্ধিবৃত্তি এবং intelligence—যাহা পশুধর্ম্ম মাত্র, তাহা উপস্থিত নৈমিত্তিক আপদ্ নিবারণের জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সংস্কার যেখানে আত্মরক্ষার পথ দেখায় না, অভিজ্ঞতার বলে, শিক্ষার বলে বলবান্ বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে পথ দেখাইয়া দেয়। ইহার প্রয়োগক্ষেত্র সংস্কারের প্রয়োগক্ষেত্র অপেক্ষা প্রশস্ত; কিন্তু ইহার সন্ধান সহজাত সংস্কারের সন্ধানের মত অমোঘ নহে। বুদ্ধিবলে কাজ করিতে গিয়া বহু স্থলে ঠেকিতে হয় এবং ঠেকিয়া আবার শিখিতে হয়। ইহাদের উপরে প্রজ্ঞা। এই অস্ত্র মানুষের নিজের অস্ত্র; ইতর প্রাণীর হাতে এই অস্ত্র নাই। ইহার প্রয়োগ অমোঘ ও অব্যর্থ না হইতে পারে; কিন্তু ইহার প্রয়োগক্ষেত্র এত প্রশস্ত এবং যেখানে ইহা প্রযুক্ত হয়, সেখানে এমন ভীম পরাক্রমে প্রযুক্ত হয় যে, ইহার সহিত অন্য দুই অস্ত্রের তুলনাই হয় না। ইহার সাহায্যে মানুষ আবশ্যকমত সংস্কারের প্রেরণাকে দমন করিতে বাধ্য হয়; বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত ও সংস্কৃত করিয়া কর্ম্মসাধনে নিয়োগ করে। বলা বাহুল্য, আত্মরক্ষা এবং স্বার্থসাধন সেই কর্ম্ম। প্রাণ তাহার নিজের উদ্ভাবিত যাবতীয় অস্ত্র স্বার্থসাধনেই নিযুক্ত করিয়া থাকে। স্বার্থপরতাই প্রাণের স্বভাব; পরার্থপরতার এখানে কোন স্থান নাই; এ কথাটা আমি আপনাদিগকে কিছুতেই ভুলিতে দিব না।

এখন দেখুন, আমি কোথায় আসিলাম। মানুষ মুখ্যতঃ প্রজ্ঞাজীবী এবং প্রজ্ঞাজীবী বলিয়াই জীবন-সংগ্রামে অপরাজেয়। এই প্রজ্ঞাবলেই মানুষ প্রত্যক্ষ অবলম্বন করিয়া concept সৃষ্টি করে এবং সেই conceptএর গায়ে এক-একটা সঙ্কেতের টিকিট বসায়; এক-একটা শব্দকে এক-একটা কৃত্রিম অর্থ দেয়। এইরূপে সে আপনার প্রত্যক্ষ অপরকে জানায় এবং অপরের প্রত্যক্ষ নিজে সংগ্রহ করে। এইরূপে প্রত্যক্ষকে স্তূপীকৃত করিয়া, সেই স্তূপীকৃত প্রত্যক্ষ হইতে প্রকাণ্ড বাঙ্ময় জগতের সৃষ্টি করে, এবং বাঙ্ময় জগৎকে আঁটাসাটা নিয়মবদ্ধ করিয়া, সেই নিয়মানুসারে বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লয়। পরের অভিজ্ঞতা এরূপে গ্রহণ করিতে না পারিলে, প্রজ্ঞার পক্ষে এতটা সাধ্য হইত না। কথাটার মানে বুঝুন। আমি পরের প্রত্যক্ষে আস্থা করি; এমন কি, নিজের প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও অনেক সময়ে অধিক আস্থা করি; আমার প্রত্যক্ষকে বহু স্থলে অবিশ্বাস করিয়া অপরের প্রত্যক্ষকে মানিয়া লই;

দশের অভিজ্ঞতার নিকট আপনার অভিজ্ঞতাকে খাটো করিয়া দেখি। ইহাতে আমাদের ঠকিতে হয় না; প্রাণযাত্রায় বরং জিতিয়াই যাই। ইহার দৃষ্টান্ত পদে পদে। পঞ্চতন্ত্রের সেই ব্রাহ্মণের গল্প আপনাদের মনে থাকিবে। ব্রাহ্মণ অমাবস্যায় পূজা দিবার জন্য পাঁঠা কাঁধে করিয়া যাইতেছেন; ধূর্ত্তেরা আসিয়া পর-পর বলিতে লাগিল,—ঠাকুর, তোমার কাঁধে কুকুর কেন? তখন সে নিজের প্রত্যক্ষে আস্থা হারাইয়া পাঁঠাটিকে ছাড়িয়া দিল। আমাদের প্রত্যেকের দশা ঐ ব্রাহ্মণের দশা। দশের কথায় আমরা 'হাঁ'কে না এবং 'না'কে হাঁ বলিতে প্রস্তুত। ব্রাহ্মণ সে ক্ষেত্রে ঠকিয়াছিল; আমরাও যে একবারে না ঠকি, তাহা নহে। অনেকে অনেক মিরাকলের গল্প করিয়া আমাদিগকে ঠকাইয়াছে; তাহা ইতিহাসে লেখে। কিন্তু মোটের উপর ইহাতে আমরা জিতিয়া যাই। দশের প্রত্যক্ষ মানিব না, এ পণ ধরিয়া বসিলে মানুষের পক্ষে প্রাণযাত্রা অসাধ্য হইত। অতএব প্রাণের দায়ে আমরা অন্যের প্রত্যক্ষে আস্থা করি। বাহিরের দশ জনের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া নিজের অভিজ্ঞতাকে সংশোধিত ও সংস্কৃত করিয়া লই। কেন লই? আমি মনে করি, অন্যেও ঠিক আমারই মত জীব। আমি যেমন চেতন জীব, অন্য মানুষও সর্ব্বাংশে মৎসদৃশ চেতন জীব। আমার যেমন একটা প্রত্যক্ষ জগৎ আছে, অন্য মানুষের ঠিক তেমনই একটা প্রত্যক্ষ জগৎ আছে। অন্যে তাহার প্রত্যক্ষ জগৎ সম্বন্ধে যে বিবরণ দেয়, আমার প্রত্যক্ষ জগতের অন্ততঃ কিয়দংশের সহিত তাহার মিল দেখিতে পাই। বহু লোকে তাহাদের প্রত্যক্ষ জগতের যে বিবরণ দেয়, আমার প্রত্যক্ষ জগতের কিয়দংশের সহিত তাহার মিল দেখিতে পাই। যে অংশের সহিত মিল দেখিতে পাই, সেই অংশটুকুকেই আসল জগৎ, খাঁটি জগৎ, সত্য জগৎ বলিয়া মনে করি এবং সেই জগৎটুকুতেই অন্যের সহিত আদান-প্রদান সম্ভব হয়। আমার প্রত্যক্ষ জগতের যে অংশের সহিত আর দশ জনের প্রত্যক্ষ জগতের মিল না দেখি, জগতের সেই অংশটুকুতেই আস্থা স্থাপনে সাহস করি না। সেখানে অপরের সহিত আদান-প্রদান ব্যবহার চালাইতে পারি না। সে অংশটাকে আপনার নিজস্ব খেয়াল মাত্র সাব্যস্ত করিয়া প্রাতিভাসিকের কোঠায় ফেলিয়া দিই। ফলে এই যে ব্যাবহারিক জগৎটাকে খাঁটি বাহ্য জগৎ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, এবং যেখানে অন্যের সহিত কারবার চালাইতেছি, প্রাণযাত্রা চালাইতেছি, জীবন-যুদ্ধ চালাইতেছি,

সেই জগৎ সর্ব্বতোভাবে অপরের অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত জগৎ। এই জগতেই আমার প্রাণযাত্রা চালাইতে হয়; অতএব আমি বলিতে পারি যে, প্রাণের দায়েই আমি ইহাতে আস্থা করি। অন্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহাতে আমি আস্থা করি। কৌতুক এই যে, প্রাণযাত্রা বিষয়ে আর সকলেই আমার শত্রু; সেই সকলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষাই প্রাণযাত্রা। অথচ সেই আত্মরক্ষার জন্যই আমি নিজের অভিজ্ঞতার অপেক্ষা সেই শত্রুমণ্ডলীর অভিজ্ঞতাতেই অধিক নির্ভর করিতে বাধ্য হই; তাহারা যে সাক্ষ্য দেয়, তাহাই মানিয়া লই; এমন কি, অনেক সময় নিজের প্রত্যক্ষকেও অবিশ্বাস করি। যাহারা আমার পরম শত্রু, তাহাদের সাক্ষ্যই আমার প্রাণরক্ষার বলবৎ উপায়। এ বড় কৌতুক বটে। এই বন্ধু শত্রুকে আমি খুব বড় করিয়া দেখি; যেহেতু তাহারা বহু, সেই জন্যই বড় করিয়া দেখি। সেই হেতু তাহাদের অভিজ্ঞতা-সমষ্টির তুলনায় আমার স্বোপার্জ্জিত অভিজ্ঞতার মূল্য অল্প মনে করি; কেন না, আমি ধরিয়া লইয়াছি, এই বহুর প্রত্যেকেই সর্ব্বাংশে আমার মত। আমিও যেমন চেতন জীব, তাহারাও সেইরূপ চেতন জীব; আমারও যেমন প্রত্যক্ষ জগৎ আছে, তাহাদের প্রত্যেকেরও সেইরূপ প্রত্যক্ষ জগৎ আছে। তাহাদের চেতনা সর্ব্বাংশে মৎতুল্য চেতনা। আমার চেতনাই যে আসল, আর তাহাদের চেতনা যে নকল, সেই গোড়ার কথাটাই ভুলিয়া যাই।

মজাটা দেখুন। আমি প্রত্যক্ষবাদী; প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। অন্য মানুষে যে চেতনার আরোপ করিয়াছি, তাহা কখনই আমার প্রত্যক্ষ বিষয় হইবার নহে, ইহা আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। অপরের চেতনাকে আমি চেতনা নাম দিতেই সম্মত নহি। উহার নাম দিয়াছি চেতনাভাস। উহা চেতনাই নহে; উহা নকল চেতনা; চেতনার ছদ্ম বেশ পরিয়া আমার নিকটে চেতনার মত দেখায় বটে। আমি যখন তত্ত্বান্বেষী, তখন আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত এই মতকে আঁকড়াইয়া থাকিব; কিছুতেই টলিব না; তখন আমার কাছে আমা ভিন্ন আর কোন চেতন জীব নাই; আমি এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু আমি আবার প্রাণী; যে কারণেই হউক, আমি প্রাণযাত্রা আরম্ভ করিয়াছি এবং সেই প্রাণরক্ষার চেষ্টায় বাধ্য আছি; আমার সমুদায় তত্ত্ব-পিপাসাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমার প্রাণের প্রেরণা আমাকে প্রাণযাত্রায় লিপ্ত রাখিয়াছে। এই

প্রাণের দায়ে আমি বহু জীব স্বীকার করিতেছি। শুধু তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি তাহা নহে ; তাহাদিগকে সর্ব্বাংশে আমারই মত চেতন জীব স্বীকার করিতেছি। সেই বহু চেতন জীবের নিকট আপনাকে অত্যন্ত খাটো করিতেছি। সেই বহু চেতন জীবের সাক্ষ্যের তুলনায় আমার প্রত্যক্ষকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র করিয়া লইয়াছি। ক্ষুদ্র করিয়া লইয়াছি বলিয়াই অন্যের সাক্ষ্য অনুসারে নিয়মবদ্ধ বাহ্বয় জগৎ রচনা করিয়াছি এবং বাহ্বয় জগতের নিয়ম অনুসারে বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছি। ইহাই প্রজ্ঞার কাজ ; এই প্রজ্ঞার বলেই আমি প্রাণযাত্রায় সমর্থ। এই প্রজ্ঞার বলেই মৎতুল্য বহু চেতন জীবের যুগপৎ আক্রমণ সত্ত্বেও আমি এ পর্য্যন্ত টিকিয়া আছি। আমি যখন তত্ত্বান্বেষী, তখন আমি একজীববাদী ; আমিই তখন এক মাত্র চেতন জীব। আমি যখন প্রাণী, তখন আমি বহুজীববাদী ; তখন আমি মৎতুল্য বহু জীবের অস্তিত্ব নির্ব্বিবাদে মানিয়া লই ; মানিয়া যে লই, সে প্রাণের দায়ে ; না মানিলে প্রাণ টেকে না। আমার সহজ সংস্কারের প্রেরণা দুর্ব্বল ; আমার স্বোপার্জ্জিত অভিজ্ঞতা অতি সঙ্কীর্ণ ; সেই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আমার বুদ্ধিবৃত্তিরূপ অস্ত্রের সন্ধান অধিকাংশ স্থলেই ব্যর্থ হয়। কিন্তু অপরের অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমি যে বৃহত্তর জগতে আমার প্রজ্ঞাস্ত্র প্রয়োগে সমর্থ হই, সেখানে আমার প্রজ্ঞাস্ত্র মহাপরাক্রমে বলীয়ান্। আমার আততায়ী বহু চেতন জীবের অভিজ্ঞতার ফল আদায় করিয়া তৎসাহায্যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া, সেই ক্ষেত্রমধ্যে আমি আমার প্রজ্ঞাস্ত্রকে পরিচালিত করিতে পারি ; নানারূপে তাহাকে খেলাইতে পারি। এখানে আমি প্রচণ্ড খেলোয়াড়। সেই খেলোয়াড়রূপে আমি জয়ী ;—জীবনযুদ্ধে আমার সমকক্ষ কেহ নাই।

প্রজ্ঞার বলে আমরা জয়ী ; প্রজ্ঞার জয় গান করিয়া আজিকার মত বিদায় লইব। প্রাণ আপনাকে রক্ষা করিতে চাহে ; প্রাণের ধর্ম্মে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। কিরূপে হইয়াছে, জানি না ; প্রাণের কাজ-কর্ম্মকে এখনও সূত্রবদ্ধ করিতে পারি নাই ;—পারিব কি না, তাহাও জানি না। জ্ঞান জীবনযুদ্ধে প্রাণের পশ্চাতে বিদ্যমান। এক হস্তে সংস্কার, অন্য হস্তে বুদ্ধি-বৃত্তি, এই দুই অস্ত্র লইয়া ব্যাবহারিক জগতে প্রাণের পশ্চাতে দণ্ডায়মান। সংস্কারের প্রয়োগ অমোঘ ও অব্যর্থ ; কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট ; সেই

নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রের বাহিরে যাইবার উপায় নাই। বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্র তেমন নির্দ্দিষ্ট নহে ; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিকে অতীতের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয় ;—অতীতের অভিজ্ঞতা যেখানে কেবল স্বকীয় অভিজ্ঞতা মাত্র, সেখানে উহা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ; সেখানে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগক্ষেত্রও অল্পায়তন। উপস্থিত আপদের নিবারণে সেখানে বুদ্ধিবৃত্তি কতকটা সমর্থ হয় বটে ; কিন্তু ভবিষ্যতের কোন সন্ধান করিতে পারে না। ভবিষ্যতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগের জন্য প্রজ্ঞাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। ইতর জীবের হাতে এই প্রজ্ঞাস্ত্র নাই। মানুষ ইহার উদ্ভাবনা করিয়াছে। তজ্জন্য সে আপনাকে ছোট করিয়া আপনার আততায়ীকেই বড় করিয়া মানিয়াছে এবং বহু আততায়ীর অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া আপন অভিজ্ঞতাকে সংস্কৃত ও বর্দ্ধিত করিয়াছে। আপনার অভিজ্ঞতার সহিত অন্যের অভিজ্ঞতা সঙ্কলিত করিয়া সে অতীতের সহিত বর্ত্তমানকে ও ভবিষ্যৎকে যোগসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া অসীম সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। এই প্রজ্ঞার অস্ত্র বিজ্ঞানময় অস্ত্র। বৈজ্ঞানিক এই বিজ্ঞানাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বাঙ্ময় জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং বাঙ্ময় জগতের অনুশাসনে প্রত্যক্ষ জগৎকেও আপনার বশীভূত করিয়াছেন। বিজ্ঞান-বিদ্যার এই জন্য এত স্পর্দ্ধা। মানুষের কারবার প্রত্যক্ষ জগতে। প্রজ্ঞাবলে সেই প্রত্যক্ষ জগৎ মানুষের বশীভূত। প্রজ্ঞাবান্ মনুষ্য প্রত্যক্ষ জগতের প্রভু ; অতএব প্রজ্ঞারই জয় ;—প্রজ্ঞার জয় গাইয়া আজিকার মত বিদায় লইতেছি।

চঞ্চল জগৎ

জগৎপ্রবাহের উৎস সন্ধানে চলিয়াছি। দেখুন, কত দূরে আসা গেল।

প্রথমে বাহ্য জগতের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। দেখিয়াছি, বিজ্ঞান-বিদ্যার বাহ্য জগৎ আর আমাদের প্রত্যক্ষ বাহ্য জগৎ,—এই দুই বাহ্য জগৎ এক নহে। বিজ্ঞান-বিদ্যার বাহ্য জগৎকে নামের জগৎ বলিয়াছি; আর প্রত্যক্ষ বাহ্য জগৎকে রূপের জগৎ বলিয়াছি। যেটা নামের জগৎ, তাহা কখনও কাহারও প্রত্যক্ষ হয় নাই বা হইবে না; এই হিসাবে উহা অসত্য জগৎ। বিজ্ঞান-বিদ্যা উহাকে রচনা করিয়া লইয়াছে; যদি উহার কোথাও অস্তিত্ব থাকে, বৈজ্ঞানিকদের মাথার ভিতরে সেই অস্তিত্ব আছে। আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্যা,—গ্যালিলিও নিউটন যাহার জন্মদাতা, সেই বিজ্ঞান-বিদ্যা এই বাহ্য জগৎকে কেমন করিয়া গড়িয়াছেন, তাহা আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি, আমার সেই প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। বিজ্ঞান-বিদ্যা একটা একটা একাকার, সমাকার, সীমাহীন আকাশ কল্পনা করিয়া, সেই আকাশে এই জগৎকে ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং একটা আদিহীন ও অন্তহীন, সন্তত ও বিচ্ছেদহীন কালের কল্পনা করিয়া সেই কালের মধ্যে জগতের ঘটনাপরম্পরাকে সাজাইয়া ফেলিয়াছেন। সেই ঘটনাপরম্পরাকে এমন নিয়মসূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে অতীত হইতে বর্ত্তমানকে আবিষ্কার করা চলে, বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যৎকে আকর্ষণ করিয়া বাহির করা চলে। এই আবিষ্কার ও আকর্ষণ-কর্ম্মের নাম গণনা। যে-কোন সময়ে সেই বাহ্য জগতের অবস্থা কিরূপ, তাহা বলিয়া দিলে, অন্য যে-কোন সময়ে তাহার অবস্থা নির্দ্ধারণের নামই গণনা। এই নিয়মসূত্রে বন্ধনের নামই কার্য্যকারণের শিকলে বন্ধন—causalityর শিকলে বন্ধন—এই কারণের পর এই কার্য্য আসিবে, অন্য কার্য্য আসিবে না, এই নিয়তির বন্ধন। জ্যামিতি-শাস্ত্রের সরল রেখা নিয়মবদ্ধ রেখা; উহার কিয়দংশ মাত্র নির্দ্দেশ করিলে অবশিষ্ট সমস্ত অংশ বাঁধা পড়িয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়; এ-পাশে ও-পাশে, দুই পাশে বাঁধা পড়িয়া যায়; এও সেইরূপ। বর্ত্তমানকে নির্দ্দেশ করিয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অতীতটা বাঁধা পড়ে ও সমস্ত ভবিষ্যৎটা বাঁধা পড়ে। যে শিকলে ঐ তিন কাল বাঁধা পড়িয়াছে,

সেই শিকলের একাংশ টানিলে সমস্ত শিকলটাই সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসে। একবার ঐ নিয়মের বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে আর বিচ্যুতির বা ব্যত্যয়ের বা ব্যতিক্রমের কোন সম্ভাবনা থাকে না; কোনরূপ স্বাধীনতার, কোনরূপ নূতনতার সম্ভাবনা থাকে না। এই নিয়মবদ্ধ জগৎ চিরপুরাতন জগৎ; ইহার কোথাও কোন নূতনতার আবির্ভাবের সম্ভাবনা মাত্র নাই; ইহার কোথাও কোন freedom নাই; সমস্তটাই determinate। মনে করিবেন না যে, এ-কালের বিজ্ঞান-বিদ্যা বস্তুতই তাহার স্বরচিত বাহ্য জগৎকে এইরূপে নিগড়বদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিজ্ঞান-বিদ্যা এখনও একগাছি শিকলে সমস্ত ঘটনাপরম্পরাকে বাঁধিতে পারে নাই; কয়েকগাছি শিকল গড়িয়াছে মাত্র; উহার মধ্যেও আবার দুই-চারিগাছি মাত্র শক্ত; অন্য কয়গাছা শিথিল ও দুর্ব্বল। এখনও শিকলে শিকলে জোড় লাগে নাই; ভাল করিয়া জোড় মিলে নাই; বহু স্থলে ঘটনাস্তূপ শিকলের বাহিরে ইতস্ততঃ অবিন্যস্তভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তা হউক, বিজ্ঞান-বিদ্যা চাহেন, শেষ পর্য্যন্ত একগাছি শিকল গড়িতে; সে শিকল এমন হইবে যে, তাহার দৃঢ় বন্ধনে তাঁহার রচিত জগতের সমস্তটা বাঁধা পড়িবে, কোথাও কোন শৈথিল্য থাকিবে না; কোথাও কিছু এড়াইয়া যাইবে না। বিজ্ঞান-বিদ্যা সেই আশাতেই বসিয়া আছেন; সেই আশাকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া আছেন। এরূপে আঁকড়াইয়া না থাকিলে তাঁহার ব্যবসায় মাটি হইবে। বিজ্ঞান-বিদ্যা সমস্ত জগৎকে এইরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে গিয়া, জগতের যাবতীয় ঘটনাকে দেশের মধ্যে ও কালের মধ্যে সাজাইয়া ফেলিয়াছেন; এটার পাশে ওটা, ওটার পাশে সেটা, এইরূপে দেশে সাজাইয়াছেন। অতীতে এটার পর ওটা, ওটার পর সেটা আসিয়াছিল, এবং ভবিষ্যতে এটার পর ওটা, ওটার পর সেটা আসিবে, এইরূপে কালে সাজাইয়াছেন। দেশে সাজাইয়া দিয়াছেন সাহচর্য্য এবং কালে সাজাইয়া দিয়াছেন পৌর্ব্বাপর্য্য। আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্যা যে আকাশের কল্পনা করিয়াছেন, তাহা একাকার ও সমাকার আকাশ; উহার কোথাও কোন বৈষম্য নাই। যে কালের কল্পনা করিয়াছেন, তাহাও সন্ততভাবে, একটানে, একমুখে চলিয়াছে; একটা সরল রেখার মত একমুখে চলিয়াছে; কোনরূপে হেলিয়া দুলিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া চলে নাই। আপনারা কবির বচন শুনিয়া থাকিবেন, নদী আর কালগতি উভয়ে সমান;—নদী যেমন একটানে উঁচু জমি হইতে নীচু জমির দিকেই

চলে, মুখ ফিরায় না, কালও সেইরূপ একটানে ভবিষ্যতের মুখেই চলে, মুখ ফিরায় না। এই হিসাবে বিজ্ঞান-বিদ্যার আকাশও যেমন সমাকার বিজ্ঞান-বিদ্যার কালও সেইরূপ সমাকার ; কোথাও কোন কুটিলতা নাই ; একাকার তন্তুমধ্যে যেন কোথাও কোন গ্রন্থি পড়ে নাই। কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্যাকে সেই সমাকার দেশ ও সমাকার কাল ব্যাপিয়া যে জগৎকে বসাইতে হইয়াছে, তাহা ত সেরূপ সমাকার জগৎ নহে ; তাহার সর্ব্বত্রই বৈষম্য, এবং সর্ব্বদাই বৈচিত্র্য। যাহা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা সমাকার, তাহা ত মহাশূন্য, তাহাকে আবার রচনা করিবেই বা কি, আর নিয়মের শিকলে বাঁধিবেই বা কি ? বিজ্ঞান-বিদ্যা তাঁহার বাঙ্ময় জগৎকে রচনা করিতেছেন ; রচনা করিয়া নিয়মে বাঁধিতেছেন ; উহা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমাকার হইলে বিজ্ঞান-বিদ্যার কোন কার্য্যই থাকিত না। আমি দেখাইয়াছি যে, সমাকার আকাশে এই বিষমাকার জগৎকে স্থাপন করিতে গিয়া এ-কালের বিজ্ঞান-বিদ্যা একটা কৃত্রিম পদার্থের কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উহার নাম দিয়াছেন জড় পদার্থ। ইহা বিজ্ঞান-বিদ্যার জড় পদার্থ ; প্রত্যক্ষ জগতের জড় পদার্থ ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান-বিদ্যার এই জড় পদার্থ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ, এ সমুদয়ে বর্জ্জিত জড় পদার্থ ; উহা কোনরূপ অনুভূতির বা উপলব্ধির সামগ্রী নহে ; এমন কি, কোনরূপ resistance —বিরোধানুভূতি জন্মাইবারও ক্ষমতা ইহার নাই। কিরূপে থাকিবে ? অনুভূতি মাত্রই ত প্রত্যক্ষ বিষয় ; আর এই যে বিজ্ঞান-বিদ্যার রচিত জগৎ, ইহার কোন অংশ ত কোনরূপে কাহারও প্রত্যক্ষ বিষয় হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ হইবেই বা কাহার ? চেতন জীবই ত প্রত্যক্ষ করিতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্যার রচিত এই যে জগৎ, ইহা ত চেতন জীবের কোন অপেক্ষাই রাখে না। বিজ্ঞান-বিদ্যা বলেন, জগতে চেতন জীব যখন ছিল না, তখনও এই জগৎ বিদ্যমান ছিল ; চেতন জীব কেহ না থাকিলেও ইহা বিদ্যমান থাকিবে ; অতএব বিজ্ঞান-বিদ্যার রচিত এই কৃত্রিম জগৎ চেতন জীবের অস্তিত্বনিরপেক্ষ জগৎ। বড় মজার জগৎ—সর্ব্বরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অতীত জগৎ, অথচ সাকার জগৎ—বিষমাকার জগৎ। এই জগৎকে বিষমাকৃতি দিতে গিয়া এ-কালের বিজ্ঞান-বিদ্যা তাঁহার সমাকার আকাশকে জড় পদার্থে পূর্ণ করিয়াছেন ;—সমস্ত আকাশটা ঈথারে পূর্ণ করিয়াছেন, এবং ঈথারের মাঝে মাঝে ইলেকট্রনের কণিকা

ছড়াইতেছেন, ছোট ছোট বড় বড় দলবাঁধা ইলেক্‌ট্রন-কণিকাগুলিকে ছড়াইতেছেন। ইলেক্‌ট্রনের এক একটা ঝাঁকের নাম দিয়াছেন পরমাণু বা atom ; পরমাণুর সমষ্টিকে নাম দিয়াছেন অণু বা molecule ; অণুর সমষ্টিকে নাম দিয়াছেন কণা বা particle ; আর কণাসমষ্টির নাম দিয়াছেন বালুকাখণ্ড, শিলাখণ্ড, উল্কাখণ্ড, উপগ্রহ, গ্রহ, তারকা ইত্যাদি। ঈথার আর ইলেক্‌ট্রন, এই দুই কল্পিত মশলাতে আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্যা তাঁহার জড় জগৎকে রচনা করিতে চাহিতেছেন। এই ঈথারটা কি, এই প্রশ্ন তুলিলে বিজ্ঞান-বিদ্যা থতমত হইয়া বলেন, তাই ত, তাই ত, ইহার রূপ-রস-গন্ধাদি ত কিছুই নাই—ইহা ত প্রত্যক্ষ নহে—তবে কিরূপে উত্তর দিব ? আচ্ছা, ইহা এমন একটা কিছু, যাহা সমাকার আকাশ ব্যাপিয়া আছে। ইহা অচল কি চঞ্চল, তাহা প্রশ্ন করিলে বিজ্ঞান-বিদ্যা বলেন, তাই ত, ঈথার সচল মনে করিবার কোন হেতু নাই ; ধর, ইহা আকাশে স্থির হইয়াই আছে, তবে একটু চাঞ্চল্য আছে বৈ কি ; ইহা স্বস্থানে স্থির থাকিয়াই চাঞ্চল্য দেখায় ;—ইহা সচল নহে, কিন্তু চঞ্চল ; ইহা চলে না, কিন্তু ইহা কাঁপে। বুড়া রাজমন্ত্রী লর্ড সালিসবরিকে একবার ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের সভাপতিত্ব গ্রহণের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা ডাকিয়াছিলেন ;—লর্ড সালিসবরি বৈজ্ঞানিক না হউন, তিনি চিন্তাশীল ও ভাবুক লোক ছিলেন এবং এ-কালের বিজ্ঞান-বিদ্যার খবর রাখিতেন। লর্ড সালিসবরি সভাপতির সম্বোধনে এই প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিয়াছিলেন, আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্যার নিকটে ঈথার কি, এই প্রশ্নের উত্তর চাহিয়া আমি সার বুঝিয়াছি যে, এই ঈথার কাঁপা-ক্রিয়ার কর্ত্তা। কথাটা নিতান্ত ব্যঙ্গ নহে। ঈথার এমন কিছু, যাহা চলে না, কেবলই কাঁপে। আর ইলেক্‌ট্রন কি, জিজ্ঞাসা করিলে বিজ্ঞান-বিদ্যা বলিবেন যে, ইলেক্‌ট্রন চলন-ক্রিয়ার কর্ত্তা ; ইলেক্‌ট্রন ঈথার ঠেলিয়া চলে ; অতি দ্রুত বেগেই চলে ; এমন কি, সেকেণ্ডে এক লাখ নব্বই হাজার মাইল পর্য্যন্ত বেগেও চলিতে পারে। ভাল, ঈথার কেবলই স্বস্থানে আসিয়াই কাঁপে, আর ইলেক্‌ট্রন ঈথারমধ্য দিয়া বেগে চলে, তাহা বুঝিলাম ; কিন্তু ঈথারের সহিত ইলেক্‌ট্রনের সম্পর্ক কিরূপ ? ইহার উত্তরে বলা হয়, তাই ত, তাই ত ; ঈথারই হয়ত স্থানে স্থানে জমাট বাঁধিয়া ইলেক্‌ট্রন জন্মিয়াছে—উহা ঈথারেরই এক একটা জমাট দানা। অথবা উহা এক একটা ঘূর্ণি, ঈথারের স্থির সমুদ্রে এক একটা ছোট ঘূর্ণি বা ভ্রমি।

অথবা ইলেক্‌ট্রন এক একটা ফাঁক—ঈথার-সমুদ্রে হয়ত এক একটা বুদ্বুদ। এই অথবা-পরম্পরার প্রাচুর্য্য দেখিয়া অবৈজ্ঞানিক ব্যক্তি নয়ন বিস্ফারিত করিয়া বলিতে বাধ্য হন, নমস্কার মহাশয়, আর 'অথবা'র দরকার নাই; বেশ বুঝিয়াছি—তৃপ্তোঽস্মি।

বেশ, বিজ্ঞান-বিদ্যার সমাকার আকাশে বিষমাকৃতি দেওয়া প্রয়োজন; সেই জন্য উহা ঈথারে পূর্ণ করিয়া, সেই ঈথারে ইলেক্‌ট্রন ছড়াইতে হইয়াছে। এই ঈথার এবং ইলেক্‌ট্রন লইয়া বিজ্ঞান-বিদ্যা তাঁহার যাবতীয় জড় দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতেছেন।

প্রশ্ন কর যে, এই ঈথার কি? বিজ্ঞান-বিদ্যা বলিবেন, যাহা চলে না, কেবলই কাঁপে, তাহাই ঈথার। প্রশ্ন কর, এই ইলেক্‌ট্রন কি? বিজ্ঞান-বিদ্যা বলিবেন, ইলেক্‌ট্রন ঈথারমধ্যে চলে, খুব বেগে চলে। এখন এই কাঁপার ও চলার তাৎপর্য্যটা বুঝিবার চেষ্টা করুন। হাতী চলে, ঘোড়া চলে, ইটপাটকেল, বালুকণা, ধূলিকণা, সবই চলে। আবার হাত কাঁপে, পা কাঁপে, বুক কাঁপে, ঝড়ের সময় ডালপালা সমেত গাছ কাঁপে, সেতারের তার কাঁপে, মেদিনীও থাকিয়া থাকিয়া কাঁপেন! এ সবই ত বস্তু; বস্তু মাত্রেই চলে ও কাঁপে। কোন অবস্তু কাঁপিতে বা চলিতে পারে কি? যিনি পদার্থবিদ্যায় পণ্ডিত, তিনি এখনই নানা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া বলিবেন, হাঁ, পারে বই কি? যথা,—উত্তাপ, উষ্ণতা, ঢেউ; পদার্থবিদ্যার মতে এই সকল পদার্থ অবস্তু; অথচ এই সকল অবস্তু এখান হইতে ওখানে চলে। আপনি জ্যামিতি-বিদ্যায় সুপণ্ডিত; আপনি দম্ভ করিয়া বলিবেন,—রহ, ও সকল দৃষ্টান্তে কাজ কি? এমন সব অবস্তু লইয়া আমার জ্যামিতি-বিদ্যা আলোচনা করে, যাহাতে প্রত্যক্ষের কোন বালাই নাই। যথা, জ্যামিতি-শাস্ত্রের বিন্দু,—ইউক্লিডের point; উহা ত একেবারে প্রত্যক্ষের অতীত নামলোকের পদার্থ; উহাকেও ত আমরা ইচ্ছামত চালাইতেছি। বিন্দুকে ইচ্ছা মাত্র এখান হইতে ওখানে চালাইতেছি; কখনও ধীরে, কখনও দ্রুত চালাইতেছি; এক বিন্দুকে অন্য বিন্দুর উপর চাপাইয়া মিলাইয়া দিতেছি; কেহ কোন আপত্তি করে না। আর ঐ রেখা,—যাহা বিন্দুর পথ মাত্র,—উহাও প্রত্যক্ষের অতীত নামলোকের পদার্থ; উহাকেও ইচ্ছামত চালাইতেছি, এক রেখাকে তুলিয়া অন্য রেখার উপরে চাপাইতেছি—superpose করিতেছি;—যে ইউক্লিড পড়িয়াছে, সেই ত তা জানে। অতএব বিজ্ঞান-

বিদ্যার আকাশকে যদি বিষমাকার দিতে হয়, তবে ইট-পাটকেল, ধূলিকণা, বালুকণা, ইলেক্‌ট্রন প্রভৃতির দরকার কি? কতকগুলা বিন্দু বা কতকগুলা রেখা কল্পনা করিয়া আকাশকে বিষমাকৃতি দিলেই ত চলিতে পারে। বস্কোবিচ তাহাই করিয়াছিলেন। মাইকেল ফ্যারাডের অনুবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরাও তাহাই করিতেছেন। বিজ্ঞান-বিদ্যা যে আকাশকে ঈথারে পূর্ণ করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা সেই আকাশের মধ্যে কতকগুলা রেখা—lines of force বসাইয়াছেন এবং সেই রেখাগুলাকে এ-দেশ হইতে ও-দেশে চালাইতেছেন। সমস্ত আকাশটাই এই সকল রেখায় পরিপূর্ণ,—রেখাগুলা আকাশে ছড়াইয়া আছে—সোজা, বাঁকা, কুঁজো, অসংখ্যেয় রেখা—কোথাও ঘন-সন্নিবিষ্ট, ঘেঁষাঘেঁষি ; কোথাও বা বিরল, ছাড়াছাড়ি,—এইরূপ অসংখ্যেয় রেখা। এই রেখাগুলা চলন্ত রেখা ; ইহা চলিতেছে, ছুটিতেছে, ঘুরিতেছে, কাঁপিতেছে—যে প্রদেশে তাহারা বিছাইয়া আছে, সেই প্রদেশটাই ঈথার ; আর ঈথারের মাঝে মাঝে যেখানে রেখাগুলা converge করিয়া মিলিবার, পরস্পর কাটাকাটি করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই স্থানগুলাই ইলেক্‌ট্রন। এইরূপ বস্তুহীন ঈথার এবং এইরূপ বস্তুহীন ইলেক্‌ট্রন দিয়া সমাকার আকাশকে বিষমাকার করা যাইতে পারে। এবং এইরূপ রেখার চলাচল কল্পনা করিয়া বিজ্ঞান-বিদ্যার জড় জগতের সমুদয় কাণ্ড-কারখানার বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে।

আপনারা আমার উপর খুব চটিবেন। এ সব কথা ত আগেই বলিয়াছি—পুনরুক্তি কেন? আমার এক মাত্র কৈফিয়ত এই যে, কথাগুলা নিতান্ত সহজ নহে। যাঁহারা এ-কালের বিজ্ঞান-বিদ্যা নিবিষ্ট হইয়া আলোচনা করেন নাই, তাঁহাদের কাছে কথাগুলা নূতন ;—তাঁহাদের মাথায় ঢোকান কঠিন। পুনঃ পুনঃ হাতুড়ির ঘায়ে মাথায় ঢোকাইতে হইবে, সেই জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ হাতুড়ির ঘা দিতে হইতেছে। যদি প্রবেশ করাইতে না পারি, আমার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। বিজ্ঞান-বিদ্যার জড় জগৎ যে ইউক্লিডের আলোচিত জগতের মতই একবারে প্রত্যক্ষাতীত কৃত্রিম জগৎ, তাহাই দেখান আমার উদ্দেশ্য। ইহা রূপের জগৎ নহে, কেবল নামের জগৎ। জ্যামিতিশাস্ত্রের জগৎও ঐরূপ নামের জগৎ। জ্যামিতিশাস্ত্রের রেখা, ভূমি, তল, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বর্ত্তুল, সমস্তই নামলোকে বিদ্যমান। কোন জীয়ন্ত মানুষ এ পর্য্যন্ত একটা সরল রেখা, একটা ত্রিভুজ বা বৃত্ত বা

বর্ত্তুল লইয়া কারবার করে নাই; মাষ্টার মহাশয় ছেলেদিগের সম্মুখে খড়ি দিয়া যে সরল রেখা বৃত্ত আঁকেন, তাহা সরল রেখাও নহে, বৃত্তও নহে। এ সকল পদার্থ আঁকিয়া দেখাইবার যো নাই; উহারা একবারে প্রত্যক্ষাতীত কৃত্রিম সামগ্রী। সেইরূপ বিজ্ঞান-বিদ্যার ইলেক্‌ট্রন, পরমাণু, অণু, এ সকলও ধরিয়া দেখাইবার যো নাই; সমস্তই প্রত্যক্ষাতীত কৃত্রিম পদার্থ। ইউক্লিড এক রকমের জ্যামিতি গড়িয়া গিয়াছেন; আমাদের ইস্কুল কালেজে তাহাই পড়ান হইতেছে। কিন্তু এ-কালের নব্য ইউক্লিডেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, জ্যামিতি-বিদ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে গড়া যাইতে পারিত; ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধগুলিকে একবারে অসিদ্ধ করিয়া এবং স্বীকার্য্য কয়টিকে একবারে অস্বীকার করিয়া, অন্য স্বতঃসিদ্ধ ও অন্য স্বীকার্য্য লইয়া নূতন জ্যামিতি গড়া যাইতে পারিত। বহু কালের প্রাচীন ইউক্লিড একটা বিদ্যা গড়িয়া দিয়া গিয়াছেন—তাহাতেই বেশ কাজ চলিতেছে; তাই সেটাকে ভাঙ্গিয়া নূতন জ্যামিতি পড়িবার প্রয়াস কেহ করিতে চায় না; ইস্কুল কালেজের কেতাবে করিতে চায় না। সেইরূপ গ্যালিলিও, নিউটন একটা ভিত্তির উপর বিজ্ঞান-বিদ্যাকে গড়িয়া গিয়াছেন; অন্য ভিত্তির উপরে অন্যরূপে গাঁথাও চলিত; কোন ক্ষতিই হইত না। তবে এত বড় পুরাতন মন্দিরটা ভাঙ্গিয়া আবার নূতন মন্দিরের নির্ম্মাণ কষ্টসাধ্য। বিজ্ঞান-বিদ্যায় জড় জগতের এখন যে প্রতিমা গড়া হইয়াছে, তাহাকেই এক মাত্র প্রতিমা মনে করিবার হেতু নাই। অন্য আকারে প্রতিমা গড়িলেও চলিত।

আপনারা বিজ্ঞান-বিদ্যাকে অত্যন্ত সত্যবাদী বলিয়া জানেন। বিশুদ্ধ সত্য লইয়া ইহার কারবার। বিজ্ঞান-বিদ্যার সত্যের মূল এখন বুঝিলেন। বিজ্ঞান-বিদ্যা বলেন, জড় জগৎ আকাশ ব্যাপিয়া আছে—সেই আকাশ সীমাহীন; তবে আকাশকে সীমাবদ্ধ মনে করিলেও হানি হইত না। সেই আকাশ সমাকার; তবে আকাশকে স্বভাবতঃ বিষমাকার মনে করিলেও ক্ষতি হইত না। আকাশ ঈথারে পূর্ণ এবং সেই ঈথারমধ্যে অণু পরমাণু ইলেক্‌ট্রন ছড়াইয়া আছে। না থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি হইত না। অন্যরূপ কল্পনাতেও বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ চলিতে পারিত। ইহাই বিজ্ঞান-বিদ্যার সত্য। এই সত্যকে প্রণাম করিয়া আপনারা তৃপ্ত থাকুন। ফলে গ্যালিলিও ও নিউটনের সময়ে, ইউক্লিডের আকাশ ভিন্ন অন্যরূপ আকাশ যে হইতে পারে, ইহা কাহারও কল্পনাতেও আসে নাই। যদি লবাচুস্কি ও

রীমানের পরে গ্যালিলিও নিউটন জন্মিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহারা অন্যরূপ আকাশে—সীমাবদ্ধ, বিম্বাকার, চতুর্দ্ধা বা বহুধা বিস্তৃত আকাশেই জড় জগৎকে স্থাপনা করিতেন। তাহা হইলে সেই জড় জগৎকে নিয়মবদ্ধ করিবার জন্য অন্যরূপ সূত্রের উদ্ভাবনার প্রয়োজন হইত। নিউটনের law of gravitation—মাধ্যাকর্ষণ-সূত্র তাহা হইলে হয়ত অন্য রূপ গ্রহণ করিত; conservation of matter—জড়ের নিত্যতা স্বীকৃত হইত কি না সন্দেহ; conservation of energy—শক্তির নিত্যতা স্বীকারেও হয়ত একান্ত প্রয়োজন হইত না।

আমি আগেই বলিয়াছি যে, বৈজ্ঞানিকের জড় জগতের বিবরণ দিতে গেলে আকাশকে নানা চিহ্নে চিহ্নিত করিতে হয়। এই চিহ্নগুলাই বৈজ্ঞানিকের জড় দ্রব্য—প্রত্যক্ষাতীত কল্পিত জড় দ্রব্য। একটা চিহ্ন নয়—বহু চিহ্নে আকাশকে চিহ্নিত করিতে হইয়াছে। বহু চিহ্নে আকাশকে বিচ্ছিন্ন করিতে হইয়াছে, অবিচ্ছেদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিতে হইয়াছে। বহুত্ব কেন? প্রমথ বাবুর প্রশ্নের প্রসঙ্গে ইহার আলোচনা করিয়াছি। সন্ততিতে—অবিচ্ছেদে আমাদের কাজ চলে না; বহুত্বই আবশ্যক; বিচ্ছেদই আবশ্যক। এই বহুত্বের কল্পনার সহিত দেশের কল্পনাকে ভিন্ন করিবার উপায় নাই; উভয় কল্পনা পরস্পরকে জড়াইয়া আছে। যখনই বলি, একের অধিক বা বহু, তখনই দেশের কল্পনা আসিয়া পড়ে; একটার পাশে আর একটা। সাধে কি বার্গসোঁ বলিয়াছেন, বহুত্ব আর দেশ একই জিনিস;—যেখানে বহুত্ব-বুদ্ধি, সেইখানেই দেশ-বুদ্ধি। কেবল এককে বসাইবার জন্য দেশের দরকার নাই। খাঁটি একত্বের সহিত দেশের সম্পর্ক থাকিতে পারে না। এক মাত্র অখণ্ড অংশহীন পদার্থকে বসাইতে হইলে দেশের প্রয়োজন হয় না; সমস্ত দেশ যেন শীর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া সেই খাঁটি একের ভিতরে লীন হইয়া পড়ে। যেখানে দেশ, সেইখানেই বহুতা; সেইখানেই ক্ষুদ্রতা ও বৃহত্তা;—বহু ক্ষুদ্রকে পাশাপাশি বসাইলে যাহা হয়, তাহাই বৃহৎ। কাজেই যেখানে দেশ, সেইখানেই বহুতা; সেইখানেই সংখ্যা গণনা ও পরিমাণ-কর্ম্ম পরস্পরকে জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞান-বিদ্যা বহু চিহ্নে আকাশকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন; এবং দুইটা চিহ্নের মাঝে আর কয়টা চিহ্ন পাশাপাশি বসান যাইতে পারে, তাহা দেখিয়া দূরত্বের পরিমাণ করিতেছেন। পরিমাণ-কর্ম্মে এইরূপ বহু খণ্ডে

খণ্ডনের দরকার হয়। বিজ্ঞান-বিদ্যার রচিত জগৎকে এইরূপ খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন না করিলে সে জগতে পরিমাণ-কর্ম্ম চলিত না ; তাহার কোনরূপ হিসাব রাখা চলিত না।

আপনারা প্রশ্ন তুলিবেন, বিজ্ঞান-বিদ্যার এত পরিশ্রমের সার্থকতা কি ? বিজ্ঞান-বিদ্যা যে কৃত্রিম জগৎকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষের বহির্ভূত জগৎ, তাহা মানিয়া লইলাম। কিন্তু আমাদের কারবার ত প্রত্যক্ষ জগতে। আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের কারবারে ঐ কৃত্রিম জগতের হিসাব লওয়ার সার্থকতা কি ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাকে বেগ পাইতে হইবে না। আপনারা সকলেই ত ইউক্লিডের প্রসাদে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, এইরূপ কত রকমের ক্ষেত্রের নিয়মসূত্র লইয়া পরিমাণ-কর্ম্ম করিতেছেন। এই বৃত্ত-ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ, সমস্তই ত প্রত্যক্ষের অতীত ; অথচ যাহারই দশ কাঠা জমি আছে, সেই জমির কালি কষিতে গেলেই তাহাকেই ইউক্লিডের শরণ লইতে হয়। ইউক্লিড তাঁহার কল্পিত বাঙ্ময় জগৎকে যে সকল নিয়মসূত্রে বাঁধিয়াছেন, আপনাদের প্রাণযাত্রার জন্য প্রত্যক্ষ জগতে কারবার করিতে গিয়া সেই সকল নিয়মসূত্রের প্রয়োগ করিতে হয়। সূত্র অনুসারে কালি কষিয়া যে ফল পান, তাহা বিশুদ্ধ হয় না ; কিছু-না-কিছু ভুল থাকিয়া যায় ; তবে মোটের উপর জীবনযাত্রার কাজ চলিয়া যায়। বিজ্ঞান-বিদ্যার পক্ষেও সেইরূপ। জ্যোতির্ব্বিদ্যা তাহার কাল্পনিক জগতে মাধ্যাকর্ষণের সূত্র প্রয়োগ করিয়া যে কাল্পনিক গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিল, প্রত্যক্ষ জগতে দূরবীন লাগাইয়া নেপ্‌চুন গ্রহের আবিষ্কার হইলে দেখা গেল যে, জ্যোতির্ব্বিদ্যার গণনার ফলের সহিত ঠিক মিলিল না বটে, কিন্তু কাজ-চলাগোছের মিল হইল। বিজ্ঞান-বিদ্যার গণনা যে প্রত্যক্ষ জগতে কাজে লাগে, তাহার দৃষ্টান্ত রাশি রাশি রহিয়াছে। তা হবেই ত। গোড়াতেই বলিয়া রাখিয়াছি, বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচিত কৃত্রিম জগতের রচনাকর্ত্রীর নাম প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা বহু চেতন জীবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া দেখিতে পায়, এক জনের অভিজ্ঞতা সর্ব্বতোভাবে অন্যের অভিজ্ঞতার সহিত মিলে না ; কেবল কিয়দংশ মিলে। এই জন্য সকলের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে অংশ মিলে না, তাহা ছাঁটিয়া ফেলিয়া, যে অংশ মিলে, সেই অংশের গড় করিয়া একটা কাল্পনিক অভিজ্ঞতা খাড়া করে ; একটা কাল্পনিক মাঝারি মানুষ খাড়া করিয়া তাহারই কাল্পনিক অভিজ্ঞতা অবলম্বনে একটা

কাল্পনিক জগৎ রচনা করিয়া লয়। সেই কাল্পনিক জগতের গতিবিধি গণনা করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, কোন জীয়ন্ত মানুষের প্রত্যক্ষের সহিত তাহার ষোল আনা মিলে না; কোথাও পৌনে ষোল আনা, কোথাও বা পনর আনা মিলিলেই তাহার জীবনের কাজ মোটামুটি চলিয়া যায়। আর যদি কোন হতভাগ্য থাকে, যাহার প্রত্যক্ষের সহিত পৌনে ষোল আনা অমিল হয়, তাহার জীবনযাত্রায় সেই গণনা কোনই কাজে লাগে না; সেই হতভাগ্যকে বাতুল নাম দিয়া, পাগলা গারদে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতে হয়। সৌভাগ্য যে, অধিকাংশ মানবই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ। অতএব এই অধিকাংশ মানবই বিজ্ঞান-বিদ্যার গণনাকে জীবনযাত্রায় প্রয়োগ করিয়া আত্মরক্ষায় সমথ। এইরূপ প্রয়োগে সমর্থ বলিয়াই মানুষ প্রজ্ঞাবলে জগজ্জয়ী। বিজ্ঞান-বিদ্যার এই যে জয়, ইহা প্রজ্ঞারই জয়।

মানুষের অবস্থাটা ভাবিয়া দেখুন। মোটা চোখে দেখিলে মানুষের মত অসমর্থ প্রাণী খুব বেশী নাই। গাছপালার মত জ্ঞানহীন প্রাণী আত্মরক্ষার জন্য কত উপায় স্বভাবতঃ করিয়া রাখিয়াছে; বাবলাগাছ তাহার গায়ে কাঁটা গজাইয়া রাখিয়াছে; কুঁচিলাগাছ তাহার দেহে বিষ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। যে শত্রু তাহাদিগকে আক্রমণ করে, সে আপনা হইতেই পরাজিত হয়। বাবলাগাছ বা কুঁচিলাগাছ জানিতেও পারে না যে, তাহার শত্রু এইরূপে পরাভূত হইয়া গেল। মানুষের দেহ শিরীষ-সুকোমল; মানুষ ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়; মানুষ আত্মরক্ষার জন্য স্বভাবদত্ত কোন অস্ত্র পায় নাই। মানুষের পিঠ কাছিমের পিঠের মত শক্ত নয়, দাঁত বাঘের মত ধারাল নয়, দৃষ্টি শকুনির মত তীক্ষ্ণ নয়, ঘ্রাণ কুকুরের মত তীব্র নয়; পাখীর মত উড়িয়া বা মাছের মত সাঁতরাইয়া বা ছুঁচার মত গর্ত্তে লুকাইয়া মানুষ আত্মরক্ষা করিতে পারে না। এমন কি, তাহার পূর্ব্বপিতামহ বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষায় যে সামর্থ্য পাইত, মানুষ সে সামর্থ্যও হারাইয়াছে। হরিণ বা শশকের মত শত্রু হইতে দূরে পলাইবার ক্ষমতা থাকিলেও কতকটা রক্ষা হইত। এই অতি দুর্ব্বল মনুষ্যকে অন্য উপায়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। যে সকল আপদ্ নিত্য উপস্থিত হয়, তাহা হইতে রক্ষার ব্যবস্থা মোটের উপর স্বভাবতঃ রহিয়াছে। কিন্তু নৈমিত্তিক আপদ্, বিশেষতঃ ভবিষ্যতের আপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য

বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক। আগে আপনাদিগকে বলিয়াছি, মৌমাছির মত ক্ষুদ্র জন্তু ভবিষ্যৎ আপদের জন্য আত্মরক্ষার এবং বংশরক্ষার কিরূপ আশ্চর্য্য ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মৌমাছির কোন জ্ঞানই নাই; ভবিষ্যতে কি আপদ্ আসিতে পারে, সে তাহা কিছুই জানে না; সে বিষয়ে তাহার আশঙ্কা মাত্রই নাই; অথচ সে কিরূপ অদ্ভুত কৌশলে, অদ্ভুত চাক বানাইয়া, সেই চাকের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য আহার-সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া, আত্মরক্ষার এবং বংশরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছে। কেন করিতেছে, কিছুই জানে না,—কেবল সংস্কারের প্রেরণায় করিতেছে। অনেক পশু পক্ষীও সংস্কারের প্রেরণায় ভবিষ্যতের জন্য কিরূপে প্রস্তুত থাকে, তাহার বহু দৃষ্টান্ত আপনারা শুনিয়াছেন। কোন পাখীই ভূগোল-বিবরণ পড়ে নাই; অথবা কোন্ দেশে কখন্ আহার-সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারে, তাহা কাহারও নিকট শুনে নাই। সে দেশে যাইবার পথ পর্য্যন্ত চিনে না; অথচ ঋতুপরিবর্ত্তনের সহিত যথাকালে ঝাঁক বাঁধিয়া সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী দেশে গিয়া উপস্থিত হয়,—কোনরূপ শিক্ষার অপেক্ষা করে না। এক জাতি কাদামাছ আছে,—মাঝ-আটলান্টিকের গভীর জলে তাহারা কোটি কোটি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি হইতে অতি ক্ষুদ্র বাচ্চা মাছ বাহির হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে। তাহার পর তাহারা ঝাঁক বাঁধিয়া পূর্ব্বমুখে যাত্রা করে। কেন যাইতেছে এবং কোথায় যাইতেছে, তাহা জানে না; অথচ তিন চারি হাজার মাইল ঘুরান পথ অতিক্রম করিয়া যথাসময়ে বাল্‌টিক সমুদ্রে উপস্থিত হয়। আসিতে আসিতে তাহারা যে বয়স পায়, সে বয়সে সমুদ্রের লোনা জল সহিতে পারে না; তখন উত্তর-সাগরে আর বাল্‌টিক সাগরে ইউরোপের যত নদী আসিয়া পড়িতেছে, সেই সকল নদীর মুখে প্রবেশ করে এবং উজানে চলিয়া নদী ছাইয়া ফেলে। কিন্তু নদীর প্রসন্ন জল ডিম পাড়িবার উপযোগী নহে; ডিম পাড়িবার পূর্ব্বে যথাকালে আবার সেই পূর্ব্বপথ অতিক্রম করিয়া আটলান্টিকের সেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। এই ব্যাপারে তাহাদের কিছু মাত্র বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন হয় না; খাঁটি সংস্কারের তাড়নায় তাহারা দূর ভবিষ্যতে আত্মরক্ষার এবং বংশরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাধ্য রহিয়াছে। মানুষের পক্ষে সংস্কারের প্রেরণা অত্যন্তই দুর্ব্বল। মৌমাছি বা কাদামাছের ত কথাই নাই,—পশু পক্ষীর তুলনায়ও তাহার সংস্কার অতিশয় দুর্ব্বল। অথচ সেই মনুষ্য

আজ প্রাণীর মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ ও শ্রেষ্ঠ ;—সে কিসের বলে ? উত্তরে বলিব, প্রজ্ঞার বলে। দুর্ব্বল মানুষ আত্মরক্ষার জন্য দল বাঁধিতে বাধ্য হইয়াছে ; এবং দলের মধ্যে থাকিয়া, দলের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, আপাততঃ আপনার স্বাভাবিক স্বার্থপরতাটাকে কথঞ্চিৎ সংযত করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু এই যে সংযম, ইহারও মূলে স্বার্থপরতা। বস্তুতঃ কোন প্রাণী পরার্থ চায় না, স্বার্থই তাহার সর্ব্বস্ব। অপরের আনুগত্য স্বীকার না করিলে আত্মরক্ষা হয় না বলিয়াই, সে দলের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য : দলস্থিত বহুর নিকট সে আপনাকে ছোট করিয়া, খাট করিয়া লইয়াছে। বহুর অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া, আপনার অভিজ্ঞতাকে সংশোধিত ও বর্দ্ধিত করিয়া লইয়াছে। অতীত পিতৃপরম্পরার সঞ্চিত স্তূপীকৃত অভিজ্ঞতা তাহার উপর চাপাইয়া, তন্মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া, গড় করিয়া, প্রত্যক্ষের অতীত একটা কাল্পনিক জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে, এবং সেই জগতের অতীত অবলম্বনে ভবিষ্যৎ ঘটনাপরম্পরার সূত্রবদ্ধ ধারা নির্ণয় করিতেছে। সেই সূত্র আপনার জীবনযাত্রায় প্রয়োগ করিয়া ভবিষ্যতের ঘটনাপরম্পরার জন্য, ভবিষ্যতের আপদ্ নিবারণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আমি বলিতে চাহি না যে, আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্যা যে সুনিয়ত সুশৃঙ্খল অথচ কৃত্রিম জড় জগতের রচনা করিয়াছেন, সাধারণ মানুষে তাহার খোঁজ রাখে। আমি এই মাত্র বলিতে চাহি যে, সুস্থ প্রকৃতিস্থ মনুষ্য মাত্রই—যাহার কিছু প্রজ্ঞাবল আছে, সেইরূপ মনুষ্য মাত্রই একজন ছোট-খাট বৈজ্ঞানিক। সে আপন প্রজ্ঞাবলে তাহার নিজের জন্য একটি কৃত্রিম জগৎ রচনা করিয়া লইয়াছে। সেই জগতের যেমন অতীত আছে, ভবিষ্যৎও তেমনই একটা আছে। সেই ভবিষ্যতের ঘটনাপরম্পরা তাহার প্রজ্ঞাচক্ষুর সম্মুখে কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও অস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে ; এবং সেই ভবিষ্যতের প্রতি চাহিয়া সে বর্ত্তমানে প্রাণযাত্রার কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। সংস্কার-প্রেরিত ইতর জীব ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে বটে, কিন্তু সেই ভবিষ্যতের কিছুই সে জানে না। তাহার জ্ঞানের সম্মুখে ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু বিদ্যমান নাই। কিন্তু প্রজ্ঞাজীবী মনুষ্যের জ্ঞানের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ভবিষ্যৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান। সে ভবিষ্যৎ তাহার প্রজ্ঞা-রচিত ; প্রজ্ঞাবলে সে সেই ভবিষ্যৎ গড়িয়া লইয়াছে। উহা যেন একখানা চিত্রপট ; কচিৎ ছিন্ন, কচিৎ ভিন্ন। চিত্রপট কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্টভাবে তাহা প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত। প্রজ্ঞাচক্ষু

মনুষ্য এইরূপে ভবিষ্যদ্দর্শী ; এবং এইরূপ ভবিষ্যদ্দর্শী বলিয়াই সে আত্মরক্ষায় সুপটু এবং জীবনযুদ্ধে জগজ্জয়ী।

বাহ্য জগতেব কথা বলিতেছিলাম। প্রজ্ঞারচিত বাহ্য জগৎ আর প্রত্যক্ষ বাহ্য জগৎ সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন, ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি। একটা কাল্পনিক এবং সেই হিসাবে অসত্য। অন্যটা প্রত্যক্ষ এবং সেই হিসাবে সত্য। এই প্রভেদটা আমার সাধ্যমত স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। স্পষ্ট করা দরকার, নতুবা আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আমার বিশ্বাস যে, এই প্রভেদটা স্পষ্ট করিয়া না দেখাতে অনেক বিচার-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপ করায় বড় বড় পণ্ডিতেও অনেক অনুচিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রজ্ঞারচিত বাহ্য জগতের কথা বলিলাম। এখন প্রত্যক্ষ জগতের কথা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। প্রত্যক্ষ জগৎ এক এক জনের পক্ষে এক এক রূপ ;—কাহার পক্ষে কিরূপ, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে অপরের চালচলন, ভাবভঙ্গী, ইঙ্গিত-ইসারা, কথাবার্ত্তা প্রভৃতির সঙ্কেতের আশ্রয়ে আমি অন্যের প্রত্যক্ষ জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লই বটে। টেলিগ্রাফের কেরাণী যেমন কাঁটা-নড়া দেখিয়া দূরের বার্ত্তা জানিতে পারে, কতকটা সেইরূপ। এইরূপে দেখিতে পাই যে, অন্যের প্রত্যক্ষ জগতের সহিত আমার প্রত্যক্ষ জগৎ সর্ব্বতোভাবে মিলে না ; হয়ত অধিকাংশই মিলে না। কিয়দংশে বা অতি অল্পাংশে মিলে। যে কিয়দংশে আমার প্রত্যক্ষ জগৎকে বহু লোকের প্রত্যক্ষ জগতের সহিত সমান দেখি, সেইটুকু সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষ জগৎ মনে করিয়া লই। ঐটুকুকে নিজস্ব জগৎ মনে করিতে পারি না। উহা সাধারণের জগৎ বলিয়াই মানিয়া লই। উহা কাহারও যখন নিজস্ব নহে, তখন উহা কাহারও অন্তরে নাই, সকলেরই বাহিরে আছে, এইরূপ মনে করি। উহা যখন কাহারও নিজস্ব নহে,—আমি না থাকিলে উহা রামের পক্ষে থাকিবে, রাম না থাকিলেও শ্যামের পক্ষে থাকিবে,—তখন উহা আমার এবং রাম শ্যাম, কাহারও অপেক্ষা করিতে পারে না। উহার অস্তিত্ব সকলেরই নিরপেক্ষ অস্তিত্ব এবং স্বাধীন অস্তিত্ব—এইরূপ মনে না করিলে চলে না। এই স্বাধীন অস্তিত্বই বাহ্যতা। এইরূপ স্বাধীন ভাবে থাকার নামই বাহিরে থাকা ;—বাহ্যতার অন্য কোন মানে নাই। অতএব আমার প্রত্যক্ষ জগতের কিয়দংশকে—অতি অল্প অংশকে এইরূপে আমার বাহিরে

দেখিতেছি এবং সেই অংশকে বাহ্য জগৎ নাম দিতেছি। এই যে প্রত্যক্ষ বাহ্য জগৎ,—ইহা বিজ্ঞান-বিদ্যার বাহ্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার এই প্রত্যক্ষ বাহ্য জগৎও দেশে বিস্তীর্ণ আছে এবং কাল ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছে; কিন্তু এই যে দেশ, ইহা আমার প্রত্যক্ষ দেশ, এবং এই যে কাল, ইহা আমার প্রত্যক্ষ কাল। বিজ্ঞান-বিদ্যার জগৎও দেশকালব্যাপী। কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্যার দেশ কাল্পনিক দেশ, অসত্য দেশ; কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ জগতের দেশ প্রত্যক্ষ, অতএব সেই হিসাবে সত্য দেশ। সেইরূপ বিজ্ঞান-বিদ্যার কালও কাল্পনিক কাল, অসত্য কাল; আমার বাহ্য জগতের কাল প্রত্যক্ষ, অতএব সেই হিসাবে সত্য কাল।

আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্যা তাহার স্বরচিত বাহ্য জগৎকে সীমাহীন ও সমাকার দেশে বসাইয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ বাহ্য জগৎ যে দেশে বর্ত্তমান, তাহা বস্তুতই সীমাবদ্ধ ও বিষমাকার, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার প্রত্যক্ষ জগতের প্রত্যক্ষ দেশ বস্তুতই সীমাবদ্ধ এবং বিষমাকার, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আমি চক্ষুষ্মান্ মানুষ, আমার প্রত্যক্ষ দেশ বরং খুব বৃহৎ; কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্ধ, তাহার প্রত্যক্ষ দেশ তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ বিজ্ঞান-বিদ্যার স্বরচিত জগৎ যে কাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, সেই কল্পিত কাল আদিহীন অন্তহীন এবং সর্ব্বতোভাবে সন্তত পদার্থ; উহার কোথাও কোন বিচ্ছেদ নাই। কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ জগতের প্রত্যক্ষ কাল অতি ক্ষুদ্র; উহার আদিও আছে, অন্তও আছে। আমার স্মরণশক্তি উহার আদি নির্ণয় করিয়া দিতেছে। তৎপূর্ব্বে আমার পক্ষে কোন কালই ছিল না। বর্ত্তমান ক্ষণে উহার অন্ত নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ইহার পরে উহা থাকিবে কি না, তাহা আমি জানি না। এখনই আমার জীবনান্ত ঘটিলে আমার প্রত্যক্ষ কালের শেষ হইবে। এই আদি এবং অন্তের মধ্যেও আমার প্রত্যক্ষ কাল একটানে অবিচ্ছেদে চলে নাই; যেখানেই আমার স্মরণশক্তি দুর্ব্বল হইয়াছে, সেখানেই সেই কালের প্রবাহে ছাঁট পড়িয়াছে। সুষুপ্তি বা নিদ্রা আসিয়া আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিবা মাত্র সেই কালের প্রবাহে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের একটানা জ্ঞানের তুলনায় আমার প্রত্যক্ষ কাল কখনও দ্রুত চলিতেছে, কখনও ধীরে চলিতেছে। বিরহের কাল ও মিলনের কাল তুলনা করিয়া প্রত্যেক প্রেমিক তাহার সাক্ষ্য দিবে। অতএব বিজ্ঞান-বিদ্যার দেশ ও কাল আমার প্রত্যক্ষ

দেশ ও কাল হইতে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন। এই দেশ এবং কালের তত্ত্ব লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে অনেক বিচার-বিতর্ক হইয়াছে; কিন্তু এই পার্থক্যটা স্পষ্ট করিয়া না দেখায় অবিচারেরও অন্ত হয় নাই।

এখন এই প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতের কথা কহিতে চাহি। আপনাদিগকে পুনরায় মিনতি করিয়া মনে রাখিতে বলিতেছি যে, এই প্রত্যক্ষ বাহ্য জগৎই আমার পক্ষে সত্য জগৎ; ইহাতেই আমি ব্যবহার চালাই, প্রাণযাত্রা চালাই। যে অপ্রত্যক্ষ জগতের বিবরণ বৈজ্ঞানিকেরা দিয়া থাকেন, সে জগতে আমাদের প্রাণযাত্রা চলে না। তবে অতীতের সহিত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে বাঁধিয়া ফেলিয়া আমাদের প্রাণযাত্রা-কর্ম্মে সাহায্যের জন্য আমাদের ঐ প্রজ্ঞা বিজ্ঞান-সম্মত জগতে গণনা-কর্ম্ম করিতেছে। প্রত্যক্ষ জগতে প্রজ্ঞার সেরূপ গণনা-কর্ম্মে ক্ষমতা নাই; কেন না, প্রত্যক্ষ জগৎ এক এক জনের পক্ষে এক এক রূপ; উহা অনিয়ত ও অনির্দ্দেশ্য; উহা কোন কঠিন নিয়মের বন্ধনে বাঁধা পড়িতে চাহে না। প্রত্যক্ষ জগৎ এই হিসাবে প্রজ্ঞার এলাকার বাহিরে; সেখানে ঘটনাপরম্পরা আপনা হইতে আসে, আপনা হইতে যায়,—কোন নিয়মের বন্ধনে বদ্ধ থাকিতে চায় না; কোনরূপ causality বা কার্য্য-কারণ-সূত্রের বশ হইতে চায় না। তবে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, একটা কাল্পনিক জগতে প্রতিষ্ঠাপিত নিয়মের সূত্র প্রত্যক্ষ জগতে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহে সাহায্য করে কিরূপে, ইহার উত্তর আমি আগেই দিয়া রাখিয়াছি। ইউক্লিডের রেখাগণিত ও ক্ষেত্রগণিত কাল্পনিক জগতের জন্যই প্রণীত হইলেও প্রত্যক্ষ জগতের কারবারে স্থূল ভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। কেন করে? উত্তরে বলিব যে, ঘটনাচক্রে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ সুস্থ মানুষের প্রত্যক্ষ জগৎ সর্ব্বাংশে একরূপ না হইলেও, স্থূলতঃ সদৃশ-রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কাজেই কাল্পনিক Mean Manএর বা মাঝারি সুস্থ মানুষের জন্য বিজ্ঞান-বিদ্যা যে কাল্পনিক জগতের রচনা করিয়াছে, তাহার সূত্রগুলির প্রয়োগ প্রত্যক্ষ জগতেও স্থূল ভাবে খাটিয়া যাইতেছে। এইরূপ খাটিতে পারে বলিয়াই সেই কাল্পনিক জগতের রচনা হইয়াছে। যেরূপে রচনা করিলে খাটিতে পারিবে, সেইরূপেই উহার রচনা হইয়াছে; নতুবা এত পরিশ্রমে একটা কৃত্রিম জগৎ গড়িয়া তুলিবার কোন প্রয়োজনই থাকিত না। ধানের জমি জরিপ করিতে গিয়া যদি জ্যামিতি-শাস্ত্রের সূত্রগুলির স্থূল ভাবেও প্রয়োগ করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে এত বড় জ্যামিতি-শাস্ত্র

গড়িয়া তোলার কোন দরকারই হইত না। অথচ জ্যামিতি-শাস্ত্র নিতান্ত কাল্পনিক জগতের শাস্ত্র ; প্রত্যক্ষ জগতে কোথাও কোন সরল রেখা, কোন ত্রিভুজ চতুর্ভুজ, কোন বৃত্ত ক্ষেত্রের অস্তিত্ব মাত্র নাই! আমি মিনতি করিতেছি, আমার এই কথাটি যেন কিছুতেই ভুলিবেন না।

এখন সেই প্রত্যক্ষ জগতের কথা কহিব। এই প্রত্যক্ষ জগৎ কাল ব্যাপিয়া অবস্থিত ; কিন্তু সেই কালের আদি আছে এবং অন্ত আছে ; আদি ও অন্ত, উভয় সীমার মধ্যে সেই কাল খণ্ডিত ও সহস্রধা ছিন্ন। এই প্রত্যক্ষ জগৎ দেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত ; কিন্তু সেই দেশও সীমাবদ্ধ ; চোখের সামনে দূরবীন লাগাইয়াও একটা-না-একটা সীমায় ঠেকিয়া দৃষ্টিশক্তিকে পরাহত ও নিরস্ত হইতে হয়। প্রত্যক্ষ কাল ও প্রত্যক্ষ দেশ, এই উভয়ই এইরূপে ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে কাল পদার্থটা একটানা—উহার গতি একমুখে ; উহার পূর্ব্ব আছে আর পর আছে, অথবা পশ্চাৎ আছে আর সম্মুখ আছে, কিন্তু আশ-পাশ নাই। কিন্তু দেশ পদার্থ ঘটনাক্রমে ত্রিধা বিস্তৃত হইয়াছে ; উহার সম্মুখ ও পশ্চাৎ আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাইন ও বাম আছে, অপিচ ঊর্দ্ধ ও অধঃ রহিয়াছে। ইংরেজীতে বলা হয়, কালের dimension একটা মাত্র, দেশের dimension কিন্তু তিনটা। আপনারা জানেন যে, জ্যামিতি-শাস্ত্রের আলোচ্য দেশের dimension একটা, দুইটা, তিনটা হইতে পারে। এমন কি—চারিটা, পাঁচটা বা ততোধিক যে হইতে পারে, তাহা আধুনিক পণ্ডিতেরা বলিতেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেশের dimension ঠিক তিনটা ; তিনটার কমও নহে, বেশীও নহে। এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। প্রত্যক্ষ জগতে অর্থাৎ কারবারের জগতে আমরা সকল দ্রব্যকেই ত্রিধা বা তিন দিকে বিস্তীর্ণ করিয়া দেখিতে বাধ্য আছি ;—বাধ্যবাধকতার ফলে এই অভ্যাস আমাদের ধাতুগত হইয়া পড়িয়াছে।

মনে রাখিবেন, এই বাধ্যবাধকতা কেবল কারবারের জগতে ; প্রজ্ঞা-রচিত কৃত্রিম জগতে এই বাধ্যবাধকতা নাই। জ্যামিতি-শাস্ত্র যে-কোন dimensionএর জগৎ কল্পনা করিবার শক্তি রাখে, এবং সেই জগতে নিয়মসূত্রের অবধারণ করিতে পারে। ইউক্লিড যে ত্রিধা-বিস্তৃত জগতের জ্যামিতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সে কাজটা ভাল হয় নাই। অকারণে তিনি আপনাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এ-কালের পণ্ডিতেরা আক্ষেপ

করিতেছেন যে, ইউক্লিডের প্রণীত জ্যামিতি-শাস্ত্র অতি সঙ্কীর্ণ শাস্ত্র ; উহা যথোচিত generalised শাস্ত্র নহে। ইউক্লিডকে দোষ দিব কি, ইউক্লিডের বহু শত বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াও গ্যালিলিও ও নিউটন বিজ্ঞান-বিদ্যার জন্য যে কৃত্রিম জগৎ নির্ম্মাণ করিতে বসিলেন, তাহাকেও সেই সঙ্কীর্ণ ত্রিধা-বিস্তৃত দেশে স্থান দিয়া ফেলিলেন। ইউক্লিডের অনুবর্ত্তী হইয়া বিজ্ঞান-বিদ্যার আকাশকেও তাঁহারা ত্রিধা-বিস্তৃতরূপে মানিয়া লইলেন ; যে বিষ্ণুপদ হইতে তাঁহাদের আকাশগঙ্গাকে নামাইয়া আনিলেন, সেই বিষ্ণুপদকেই তাঁহারা তিন দিকে আটকাইয়া ফেলিলেন। এই সঙ্কীর্ণতার কোন প্রয়োজনই ছিল না। এ-কালের বিজ্ঞান-বিদ্যার গতি যাঁহারা অবহিতভাবে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারা ইহা জানেন ; অন্যকে ইহা বুঝান কঠিন। ইউক্লিডের এবং নিউটন গ্যালিলিওর এই সঙ্কীর্ণতার ফল আজ পর্য্যন্ত আমরা ভোগ করিতেছি। প্রত্যক্ষ জগৎ ত্রিধা-বিস্তৃত বটে ; উহাকে ত্রিধা-বিস্তৃত মনে করিতে আমরা বাধ্য আছি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের জগৎকেও ত্রিধা-বিস্তৃত মনে করার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিয়াছে ; এখন আক্ষেপ নিষ্ফল। আমাদের সঙ্কীর্ণ প্রত্যক্ষ জগৎ যে ত্রিধা-বিস্তীর্ণ জগৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই ; উহা মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য। এই বাধ্যবাধকতা কিরূপে আসিল, তাহা লইয়া পণ্ডিতেরা ঝগড়া করুন। কেহ বলিবেন, এই ত্রিধা বিস্তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা intuition-লব্ধ বা স্বভাবদত্ত ; ঐরূপ মনে না করিলে আমাদের উপায় নাই। কেহ বা বলিবেন, উহা পুরুষপরম্পরাক্রমে লব্ধ ; কোটি পুরুষের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা হইতে উহা প্রাপ্ত। পৈতৃক উত্তরাধিকার স্বত্বে প্রত্যেক মানুষ জন্ম মাত্র উহা লাভ করিয়াছে। আমি সে বিতর্কে প্রবেশ করিব না ; সে পথেও চলিব না। আমি এখনও প্রাণিবিদ্যার সীমা ছাড়ি নাই ; প্রাণিবিদ্যার পক্ষ হইতে এই প্রশ্নটি কিরূপে দেখা যাইতে পারে, তাহারই আলোচনা করিব। আমাকে এখানে কোন নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিতে হইবে না ; পাশ্চাত্য গুরুঠাকুরেরাই জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়া, অর্থাৎ চোখে আঙুল দিয়া এখানে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ জগৎ ত্রিধা-বিস্তীর্ণ। সাদা কথায় ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমার সম্মুখে অবস্থিত প্রত্যক্ষ দেশের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে তিন মুখে চলিলেই পর্য্যাপ্ত হয়। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে, বাম হইতে দক্ষিণে, এবং

অধঃ হইতে উর্দ্ধে, কিছু দূর গেলেই প্রত্যক্ষ দেশের যে-কোন স্থান হইতে অন্য যে-কোন স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহাকেই আমি বলিতেছি—তিন মুখে চলা বা তিন মুখে পদক্ষেপ। ত্রিবিক্রম বামনদেবের মত আমরা তিন দিকে পদক্ষেপ করিয়া প্রত্যক্ষ জগৎকে আক্রমণ করিয়া থাকি। এই তিন মুখে চলা তিন স্বতন্ত্র মুখে চলা ;—এই তিন মুখ তিন রকমের মুখ। আপনারা প্রত্যক্ষ জানেন যে, এই তিন মুখ এক রকমের নহে, তিন রকমের। কলিকাতা শহরে যিনি বাস করেন, তাঁহাকে সিঁড়ি ভাঙিয়া তেতলা চৌতলায় উঠিয়া যখন হাঁপাইতে হয়, তখন তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জোরের সহিত বলে, যে, নীচে হইতে উপরে চলা অতি উৎকট চলা—প্রাণান্তক চলা ;—বিশেষতঃ যাঁহাদের দেহের ভার আড়াই মণকে অতিক্রম করিয়াছে, তাঁহারা এখনই এই উৎকটতার সাক্ষ্য দিবেন। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এই উৎকটতার হেতু। সমতল পথে বা সমতল ময়দানে চলিতে হইলে এতটা ক্লেশ হয় না ; কেন না, সে স্থলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের উপদ্রব ঘটে না। কিন্তু সেখানেও সম্মুখে চলা ও পাশ কাটিয়া চলার পার্থক্য সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হয়। বিশেষতঃ যদি সেই সময়ে একটা ঝড় বহে, এবং হাতে খোলা ছাতা থাকে, তাহা হইলে ঝড়ের প্রতিকূলে সম্মুখে চলায়, আর পাশ কাটিয়া আড়াআড়ি তির্য্যক্‌ভাবে চলায় যে পার্থক্য, তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আপনাদের সকলেরই আছে। তা হবেই ত! আপনার দেহের গড়নেই এই সমস্যার সমাধান রহিয়াছে। সম্মুখ হইতে দেখিলে আপনার দেহের উর্দ্ধভাগে একটা মাথা, নীচে দুইখানা লম্বা পা, আর বুকের ছাতির দুই দিকে দুইখানা আজানুলম্বিত বাহু দেখিতে পাই। আর পাশে দাঁড়াইলে কেবল একখানা পা, এক দিকের পাঁজর, আর মাথার একটা পাশ মাত্র দেখিতে পাই। সম্মুখে চলিতে বুকের উপরে হাওয়ার ধাক্কা লাগে একরূপ ; তির্য্যক্‌ভাবে আড়াআড়ি চলিতে পাঁজরে ধাক্কা লাগে অন্যরূপ। সম্মুখে চলিতে প্রয়াস বা প্রযত্ন একরূপ, তির্য্যক্ চলিতে প্রয়াস বা প্রযত্ন অন্যরূপ ; নীচে হইতে উর্দ্ধে গমনের প্রযত্ন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। আপনার দেহের কাঠামটার গড়নের ভেদে প্রযত্নেরও এই ভিন্নতা। আপনার দেহের কাঠামটা যদি বাঁটুলের মত হইত, অর্থাৎ ভীমের হাতে পড়িয়া কীচকের দেহের যে পরিণতি হইয়াছিল, কতকটা সেইরূপ হইত, তাহা হইলে এই সম্মুখে চলার আর পাশ কাটিয়া চলার প্রভেদ আপনি হয়ত

বুঝিতে পারিতেন না। অর্থাৎ আপনার দেহের গড়নটা যদি সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তুলাকৃতি হইত,—কেবল বাহিরের আকৃতিতে নহে, অভ্যন্তরে হৃৎপিণ্ডাদি অঙ্গের সন্নিবেশও যদি symmetrical হইত, তাহা হইলে সম্মুখ ও পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম চিনিবার কোন উপায় থাকিত না; তখন সম্মুখে চলা এবং তির্য্যক্ চলা, এ দুয়ে কোন ইতরবিশেষ থাকিত না। তবে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এড়াইবার উপায় নাই; কাজেই নীচে হইতে উপরে উঠার ক্লেশ উৎকটই থাকিয়া যাইত। যদি ঐরূপ আকারের কোন জ্ঞানবান্ জীব বস্তুতই পৃথিবীতে থাকে, তাহা হইলে সে উঠা-নামা বুঝিতে পারিবে; কিন্তু সমতল ভূপৃষ্ঠে যে মুখেই চলুক, কোনরূপ ভেদ বুঝিতে পারিবে না।

প্রাণি-বিদ্যার আশ্রয় লইয়া এখন আপনারা বুঝিতে পারিলেন, আমাদের প্রত্যক্ষ দেশ কিরূপে ত্রিধা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। চলিতে ফিরিতে আমরা প্রযত্ন অনুভব করি। সম্মুখে চলিতে যে রকমের প্রযত্ন হয়, তির্য্যক্ চলিতে সে রকমের হয় না;—দেহের ভার লইয়া ঊর্দ্ধমুখে উঠিতে গেলে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ প্রযত্ন অনুভূত হয়। আমাদের দেহের গঠনটা সর্ব্বতোমুখে symmetrical হইলে এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে, প্রযত্নের এই ভেদ থাকিত না। তিন রকমের প্রযত্ন, কাজেই তিন রকমের অনুভূতি এবং এই তিন রকমের অনুভূতি হইতেই প্রত্যক্ষ দেশের বিস্তার তিন মুখে। আপনারা চক্ষুষ্মান্ মানুষ; আপনারা মুখ্যতঃ দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে যাতায়াতের পথ নির্ণয় করিয়া থাকেন। আমার বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে আপনাদের একটু কষ্ট হইবে; কিন্তু জন্মান্ধের অবস্থাটা মনে করিয়া দেখিতে পারেন। পথনিরূপণে সে চোখের সাহায্য একেবারেই পায় না। পথ চলিবার সময় তাহার যে প্রযত্ন হয়, যে ক্লেশ হয়, যে পরিশ্রম হয়, তৎসম্পৃক্ত অনুভূতির সাহায্যে সে কোথা হইতে কোথায় যাইতেছে, তাহা নিরূপণ করিয়া লইতে বাধ্য আছে। ত্রিবিধ প্রযত্ন-বুদ্ধির সাহায্য লইয়াই সে ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করে। সেই ত্রিবিধ প্রযত্ন-বুদ্ধি হইতেই সে বুঝিতে পারে যে, সে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, কি সম্মুখে চলিতেছে, কি আড়াআড়ি পাশ কাটিয়া চলিতেছে। সে জানে যে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পৌঁছিতে এই ত্রিবিধ প্রযত্নের অতিরিক্ত কোন চতুর্থ প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না। জন্মান্ধ ব্যক্তিও স্থির করিয়া লইয়াছে যে, যে দেশের মধ্যে তাহাকে

বিচরণ করিতে হইতেছে, সে দেশটা তিনমুখো দেশ,—তাহার এক মুখ অন্য মুখের সদৃশ নহে ; সেই দেশ বস্তুতঃ তাহার পক্ষেও বিষমাকার দেশ।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে মনোবিজ্ঞান-ঘটিত বিচার আসিয়া পড়ে। রূপ-রস-শব্দাদি বোধের জন্য আমাদের পাঁচ-পাঁচটা ইন্দ্রিয় রহিয়াছে ; কেবল খাঁটি দেশ-বুদ্ধির জন্য কোন বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় আছে কি না, ঠিক জানি না। শুনিতে পাই যে, আমাদের কানের ভিতরে একটা কি যন্ত্র আছে, তাহাতে আমাদের দেশ-বুদ্ধির সাহায্য করে ; অন্ততঃ যখন আমরা ঘুরিয়া বেড়াই, তখন আমাদের দিক্‌নির্ণয়ের বোধ জন্মায়। সে কথা এখন থাক্‌। আপনাদের হয়ত ধারণা আছে যে, দৃষ্টিশক্তি এবং স্পর্শশক্তি, এই দুইটাই বুঝি আমাদের দেশ-বুদ্ধির প্রধান সহায় ; কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। ঐ দুই শক্তি গৌণভাবে দেশ-বুদ্ধিকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু মুখ্যভাবে করে না। আমাদের অঙ্গ চালনায় সমস্ত স্নায়ুযন্ত্রটা বিচলিত হয় ; সমস্ত মাংসপেশীগুলা সেই সঙ্গে খেঁচিয়া উঠে। এই মাংসপেশীগুলার কুঞ্চন ও প্রসারণের সহিত একটা বিশিষ্ট রকমের বেদনা-বুদ্ধি জন্মে। অন্য নামের অভাবে তাহাকে muscular feeling নাম দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালায় উহাকে প্রযত্ন-বুদ্ধি বলা যাইতে পারে। শরীরের সমস্ত পেশীযন্ত্রটা এই বুদ্ধির পক্ষে ইন্দ্রিয়স্বরূপ। পেশীগুলা খেঁচিয়া ধরিলেই একটা প্রয়াস বা প্রযত্ন বা চেষ্টা বা ক্লেশ অনুভূত হয় ;—সেই অনুভূতিটাই এই muscular feeling। অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই এই muscular feeling আসিয়া পড়ে। মুখ্যতঃ আমরা এই অনুভূতির সাহায্যেই দেশ-বুদ্ধি পাইয়া থাকি। ইংরেজীতে এই প্রযত্নকে effort, exertion, innervation ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়। এই বিশিষ্ট প্রযত্ন-বুদ্ধি যে মুখ্যতঃ দেশ-বুদ্ধি আনয়ন করে, তাহা আপনারা অল্পেই বুঝিতে পারিবেন। আবার সেই জন্মান্ধের কথা স্মরণ করুন। অঙ্গচালনা সহকৃত muscular feelingএ সে বঞ্চিত নহে। অঙ্গচালন সহকারে muscular feelingএর সাহায্যে তাহার দেশজ্ঞান জন্মিবে। বস্তুতই দেশবোধের জন্য কোন-না-কোন অঙ্গের সঞ্চালন আবশ্যক। দৃষ্টিশক্তির কথাই ধরুন না। দৃষ্টিশক্তি মুখ্যতঃ নীল-পীতাদি বর্ণজ্ঞান জন্মায়, এবং সেই সেই বর্ণের উজ্জ্বলতার জ্ঞাপন করে ; কিন্তু খাঁটি দেশ-বুদ্ধি দেয় না। বহির্জগতে দৃষ্টি ফেলিয়া চোখের সামনে আমরা একখানা বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত চিত্রপট দেখিতে পাই মাত্র ; কিন্তু

সেই পটের কোন্ অংশ নিকটে, কোন্ অংশ দূরে, দৃষ্টিশক্তি তাহা জ্ঞাপন করিতে অক্ষম। তারকাখচিত আকাশের দিকে চাহিলে মনে হয়, সমুদয় তারকাই আমাদের নিকট হইতে সম দূরে একখানি পটের গায়ে আঁকা রহিয়াছে; অথচ আপনারা শুনিয়াছেন যে, সকল তারকার দূরত্ব সমান নয়;—কোনটার আলো আসিতে চারি বৎসর, কোনটার আলো আসিতে চল্লিশ বৎসর দরকার হয়। বৈজ্ঞানিকেরা জানেন, দূরস্থিত কোন দ্রব্যের দূরত্ব নিরূপণ করিতে হইলে কেবল চোখে দেখায় কুলায় না, সেই দ্রব্যের parallax পাইতে হয়। এই parallax পাইবার জন্য কিছু-না-কিছু ভ্রমণের প্রয়োজন, কিছু-না-কিছু অঙ্গসঞ্চালনের প্রয়োজন। দূরে একটা গাছ থাকিলে, প্রথমে এক স্থানে দাঁড়াইয়া তাকাইতে হয়, পরে ডাইনে বা বামে কয়েক গজ সরিয়া গিয়া আবার তাকাইতে হয়; তবে তাহার parallax পাওয়া যায়; তবে তাহার দূরত্ব নিরূপিত হয়। গাছটা যত দূরে থাকে, তত অধিক দূরে সরিলে parallax পাওয়া যায়। খুব নিকটে থাকিলে সরিয়া যাওয়ারও দরকার হয় না; একটু ঘাড় নাড়িয়া তাকাইলেই চলিতে পারে। খুব নিকটের দ্রব্যের দূরত্ব নির্ণয়ে ঘাড় নাড়ারও দরকার হয় না; নাকের দুই দিকে দুটা চোখ আছে; সেই চোখ দুটাকে স্থির করিয়া সেই দ্রব্যের প্রতি তাকাইতে গেলেই মোটামুটি তাহার parallax পাওয়া যায়। চোখের কোটরের ভিতরেই চোখটাও ঘুরিয়া ফিরিয়া সঞ্চরণ করিতে পারে; তাহাতেও দূরত্ব নিরূপণের সাহায্য করে। ফলে ভ্রমণ বা অঙ্গসঞ্চালন ব্যতীত দূরত্ব নিরূপণ চলে না। আকাশের তারাই বল, আর চন্দ্র সূর্য্যই বল, আর দূরের বা নিকটের গাছপালাই বল, ঘুরিয়া ফিরিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দেখিবার সুযোগ না থাকিলে, কোন দ্রব্যেরই দূরত্ব নির্ণীত হয় না। এই ভ্রমণ, এই অঙ্গসঞ্চালন প্রযত্নসাপেক্ষ। প্রযত্নের সহকারে প্রযত্ন-বুদ্ধি আইসে। এই প্রযত্ন-বুদ্ধিই দূরত্ব নিরূপণের মুখ্য অবলম্বন।

উইলিয়ম জেমস্ বলিতে চাহেন যে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ ইত্যাদি যাবতীয় অনুভূতির সহিত দেশবুদ্ধিটাও জড়াইয়া থাকে। আমাদের যাবতীয় অনুভূতির সহিত—এমন কি, দন্তশূল ও পেটের বেদনার মত শারীরিক অনুভূতির সহিতও একটা বাহুল্য-বুদ্ধি, একটা বৃহত্তা বা ক্ষুদ্রতা-বুদ্ধি জড়াইয়া থাকে। শব্দবুদ্ধিই ধরুন না। কোন কোন ধ্বনি যেন ঘর-ভরা

ধ্বনি—যেন বৃহৎ দেশ পূর্ণ করিয়া উহা বিদ্যমান—যেমন শঙ্খধ্বনি। আবার কোন কোন ধ্বনি যেন অতি সঙ্কীর্ণ ধ্বনি,—যেন অতি সঙ্কীর্ণ স্থানমধ্যে উহা আটকান ছিল—কষ্টে বাহিরে আসিতেছে, এইরূপ ধ্বনি। যেমন ট্রাম গাড়ীর বাঁশীর কান-ছেঁড়া ধ্বনি। জেম্‌সের কথা অমান্য করিতে পারি না; কেহই করেন না। কিন্তু এই দেশ-বুদ্ধির মধ্যেও কতটা প্রযত্ন-বুদ্ধি law of association দ্বারা প্রচ্ছন্ন আছে, বলা কঠিন। শাঁখ বাজাইবার সময় গালভরা বাতাস জোরের সহিত বাহির করিতে হয়; আর বাঁশীতে ফুৎকার দিবার কালে মুখের বিবর সঙ্কুচিত করিয়া সঙ্কীর্ণ বায়ুপ্রবাহ দুই ঠোঁটের মাঝ দিয়া বাহির করিতে হয়। এই উভয়বিধ প্রযত্নের সহিত উভয়বিধ ধ্বনির নিত্য সম্পর্ক অজ্ঞাতসারে চিত্তের মধ্যে কাজ করে কি না, বলা কঠিন। ফল কথা, অঙ্গসঞ্চালন-জাত প্রযত্ন-বুদ্ধি আমাদের দেশ-বুদ্ধির মুখ্য সহায়, ইহা জোর করিয়া বলিতে পারি।

নিত্য প্রাণযাত্রায় আমরা এই অঙ্গসঞ্চালনে বাধ্য আছি। ধরাপৃষ্ঠে চরিয়া ফিরিয়া ঘুরিয়া না বেড়াইলে আমাদের প্রাণযাত্রা নিষ্পন্ন হয় না। গাছপালার মত অথবা প্রবালকীটের মত এক স্থানে আবদ্ধ থাকিলে উচ্চ-শ্রেণীর জন্তুর আহার জুটে না। দৌড়িয়া পলাইতে না পারিলে শত্রুর আক্রমণ এড়াইতে পারা যায় না। কাজেই দূরে আহারের সন্ধান পাইলেই, অথবা দূরে আহার থাকিতে পারে, এই আশা লইয়াই আমরা ধরাপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছি; দূরে শত্রুর আশঙ্কা হইলেই পলায়নপর হইতেছি। কথামালায় পড়া গিয়াছিল, কোন জন্তু আহারের চেষ্টায় দৌড়ায়; কেহ বা প্রাণের ভয়ে দৌড়ায়। যে কারণেই হউক, আমরা দৌড়িতে বাধ্য আছি।

এই দৌড়াদৌড়িই আমাদের জীবনের প্রধান কর্ম্ম। কিছুতেই আমরা স্থির থাকিতে পারি না। আসনে বসিয়া আমরা চঞ্চল;—কেবলই দুলিতেছি, কাঁপিতেছি, নাক চোখ ঘুরাইতেছি। কানের কাছে মশা ডাকিলেই আমরা ঘাড় ঘুরাই; উচ্চ শব্দ শুনিবা মাত্র আঁতকাইয়া উঠি; হঠাৎ ভয় পাইলেই আমাদের হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠে। প্রতি ক্ষণেই আমাদের অঙ্গসঞ্চালন এবং প্রত্যেক অঙ্গের সঞ্চালনে স্নায়ুযন্ত্রের আক্ষেপ, আর মাংসপেশীর আলোড়ন। প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালনে প্রযত্ন-বুদ্ধি। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর পক্ষে এই প্রযত্ন-বুদ্ধি আছে কি না আছে, তাহা জানি না;

কিন্তু উচ্চতর জ্ঞানবান্ জন্তুর এই প্রযত্ন-বুদ্ধি আছে, ইহা মানিতে হয়। এই অঙ্গসঞ্চালন দায়ে পড়িয়া; হয় আহারের চেষ্টায়, নয় প্রাণের ভয়ে। জ্ঞানহীন প্রাণীর অঙ্গসঞ্চালন জ্ঞানপূর্ব্বক সম্পাদিত হয় না; উহাদের কোনরূপ প্রযত্ন-বুদ্ধিও থাকিতে পারে না। উহাদের দেশ-বুদ্ধিও নাই। বৃক্ষ লতা আহার অন্বেষণে ভূমির দিকে মূল চালায়; আলোক অন্বেষণে আকাশের দিকে শাখা-পল্লব বাড়াইয়া দেয়; স্থিরত্ব প্রাপ্তির জন্য অন্য অবলম্বকে আকর্ষী দিয়া আঁকড়াইয়া ধরে; কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক কোন কাজ করে না। গাছপালার দেশ-বুদ্ধি আছে, এ কথা কেহ বলিবেন না। নিম্নশ্রেণীর জন্তুর মধ্যে যাহারা জ্ঞানহীন, তাহাদেরও এই দশা। এই সকল জ্ঞানহীন প্রাণীর পক্ষে বাহ্য জগৎ অবিদ্যমান। বাহ্য জগৎ কেবল জ্ঞানবান্ জীবের পক্ষেই বিদ্যমান, এ কথাটা যেন ভুলিবেন না। মৌমাছির মত যে সকল জন্তু আহারের অন্বেষণে সংস্কারের প্রেরণায় অতি দূর-দূরান্তে বেড়ায়, তাহাদের অঙ্গসঞ্চালনের অবধি নাই, কিন্তু তাহাদের পক্ষেও দেশ-বুদ্ধি কতটা স্পষ্ট, বলা কঠিন। জ্ঞান থাকিলেই যে দেশজ্ঞান থাকিবে, ইহা জোর করিয়া বলা চলে না। সংস্কারের প্রেরণায় যে সকল জন্তু দেশ-দেশান্তে ভ্রমণ করে, তাহাদেরও বাহ্য দেশ সম্পর্কে জ্ঞান কত স্পষ্ট, তাহা লইয়া তর্ক চলিতে পারে। ঋতুপরিবর্ত্তনে পাখীর ঝাঁক দেশান্তরে চলিয়া যায়; কিন্তু সেই দেশান্তরের কোন জ্ঞান তাহাদের আছে কি? আটলান্টিকের যে কাদামাছ বহু সহস্র মাইল অতিক্রম করিয়া যথাকালে বাল্টিক সাগরে উপস্থিত হয়, তাহাদেরও সেই দেশান্তর সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান আছে কি? স্বস্থান ছাড়িয়া অন্য দেশে চলিতেছি, এই জ্ঞানটুকুও তাহাদের আছে কি? কেতাবে পড়িয়াছি, পাটাগোনিয়াতে পিউমা নামে হিংস্র জন্তু আছে; উহা সে দেশের পশুরাজ। মৃত্যু আসন্ন হইবার কিছু পূর্ব্বে সে সকল কাজ ফেলিয়া নিতান্ত বানপ্রস্থ বৈরাগীর মত স্বস্থান হইতে বাহির হয়, এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাতপূর্ব্ব বরফে ঢাকা এক প্রান্তরে ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া সেইখানে দেহ ত্যাগ করে। সেই তুষারক্ষেত্র পিউমা জাতির সর্ব্বসাধারণের সমাধিক্ষেত্র। কেহ তাহাদিগকে সে দেশের কথা শেখায় নাই, কেহ পথ চিনাইয়াও দেয় নাই। এই অপূর্ব্ব সংস্কারের ফলে প্রত্যেক পিউমা মৃত্যুর পূর্ব্বেই সেই অজ্ঞাত দেশের পথ আপনা হইতে চিনিয়া লয়। সেই অজ্ঞাত দেশে যে তাহাদের সমাধিক্ষেত্র প্রস্তুত আছে, এই বুদ্ধি তাহাদের আদৌ

আছে কি ? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। বাহ্যতা জ্ঞানটাই কোন্ জন্তুর কতটুকু আছে না আছে, তাহা আন্দাজ করাই কঠিন। সেই দুরূহ প্রশ্নের আলোচনায় আমার এখন অবকাশ নাই।

সে যাই হউক, জ্ঞানবান্ মানুষের এই দেশ-বুদ্ধি আছে। সেই দেশমধ্যে মানুষ জ্ঞানপূর্ব্বক বিচরণ করে। সেই দেশ তাহার প্রত্যক্ষ দেশ ; প্রযত্ন-বুদ্ধি হইতে লব্ধ দেশ। এই প্রযত্ন-বুদ্ধি হইতেই মানুষ তাহার প্রত্যক্ষ জগতের এখান-ওখান-সেখান, দূর নিকট নিরূপণ করে। বৈজ্ঞানিকেরা কিরূপে সূক্ষ্মভাবে দূরত্বের পরিমাণ করেন, তাহা ঘাঁটিয়া কাজ নাই। আমাদের মত সাধারণ মানুষে দৈনিক জীবনযাত্রায় কিরূপে দূরত্বের পরিমাণ করি, তাহাই দেখুন। দেখিবেন, ইহার মূলে প্রযত্ন-বুদ্ধি। হাবড়া হইতে শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত ভ্রমণে কিছু প্রযত্ন আবশ্যক, কিছু ক্লেশ ঘটে ; শ্রীরামপুর হইতে হুগলি পর্য্যন্ত ভ্রমণে যদি সেই প্রযত্ন, সেই ক্লেশ ঘটে, তাহা হইলে বলা হয়, হাবড়া হইতে শ্রীরামপুর যত দূর, শ্রীরামপুর হইতে হুগলি তত দূর। প্রযত্নের বা ক্লেশের সমানতা আশ্রয় করিয়া আমরা দূরত্বের সমানতা নির্দ্দেশ করি। সর্ব্বত্রই ঐরূপ। যদু আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ; আমি হাত বাড়াইয়া তাহার গালে চড় দিলাম ; চপেটাঘাতের প্রযত্ন আমি ধরিতেছি না ; হাত বাড়াইবার প্রযত্নটাই ধরিব। কালান্তরে মধু আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। হাত বাড়াইয়া মধুর গালে চড় দিলাম ; এবারও হাত বাড়াইতে ঠিক পূর্ব্ববৎ প্রযত্ন অনুভব করিলাম। স্থির করিলাম, যদু আমার যত দূরে ছিলেন, মধুও তত দূরে আছেন।

বস্তুতই আমাদের প্রাণযাত্রা পরস্পর চপেটাঘাতের ব্যাপার ; পরস্পর কিলাকিলি ঠোকাঠুকি ঘুষোঘুষির ব্যাপার। এ বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছি। জীবনযুদ্ধ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রযত্নসাপেক্ষ। প্রযত্নের সহিত প্রযত্ন-বোধ, এবং প্রযত্ন-বোধ হইতেই দূরত্ব-বোধ। কেবল দূরত্ব-বোধ কেন, ইহা হইতেই ভ্রমণ-বোধ, অঙ্গসঞ্চালন-বোধ,—এক কথায় গতি-ক্রিয়ার বোধ। গতিক্রিয়ার ইংরেজী নাম movement ; ঐ প্রযত্ন-বুদ্ধিই movementএর বা গতিক্রিয়ার বুদ্ধি। যেখানে সেই প্রযত্ন-বুদ্ধি নাই, সেখানে movement-বুদ্ধি নাই। বৈজ্ঞানিকেরা প্রজ্ঞাবলে সেখানেও গতির কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সেখানে গতি-বুদ্ধি নাই। নৌকার উপর সুখে শয়ান ব্যক্তি নৌকার গতি বুঝিতে পারে না। পৃথিবী

একখানা প্রকাণ্ড নৌকা। যে ব্যক্তি পৃথিবীর উপর স্থিরাসনে আসীন, তাহার অঙ্গ মাত্র দোলে না। বৈজ্ঞানিকেরা মাথা খুঁড়িয়াও যদি বুঝাইতে চাহেন—পৃথিবী চলিতেছে, প্রত্যক্ষবাদী প্রত্যক্ষ প্রমাণের বলে বলিবে—না, তাহা মানিব না, পৃথিবী স্থির। পাঠশালার পণ্ডিত ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে স্পষ্ট বলিয়াছিল, আট টাকা মাহিনাতে পৃথিবীকে ঘুরাইতে পারিব না। ইন্‌স্পেক্টর বাবু ছাপার পুঁথির বাক্যকে বেদবাক্য মনে করিতেন; পণ্ডিত তাহাতে সায় দেয় নাই। কোপার্ণিকস পৃথিবীকে ঘুরাইয়াছিলেন; প্রত্যক্ষ-বলে নয়,—প্রজ্ঞার বলে। প্রজ্ঞাচক্ষু গ্যালিলিও পৃথিবীকে ঘুরিতে দেখিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষবাদীরা তাঁহাকে নির্য্যাতন করিয়াছিল।

ফলে যেখানে এই প্রযত্ন অনুভূত হয়, সেইখানেই আমরা এই movement বুঝিয়া লই। বুঝিয়া লই—আমরা সশরীরে চলিতেছি, অথবা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হইতেছে। এই অনুভূতিটাই প্রত্যক্ষ, এই প্রযত্ন-বুদ্ধিটাই প্রত্যক্ষ; আর গতি-ক্রিয়াটা প্রত্যক্ষ ঘটনা নহে। এই প্রত্যক্ষ প্রযত্ন-বুদ্ধি হইতে বাহ্য জগতে আমাদের চলাফেরা হেলাদোলা সমস্তই বুঝিয়া লই। যেখানে ঐ অনুভূতির অভাব, সেখানে আমরা স্থির; যেখানে ঐ অনুভূতি বর্ত্তমান, সেইখানেই আমরা চঞ্চল বা গতিশীল।

ফলে ঐ প্রযত্ন-বুদ্ধি আমার বুদ্ধি; প্রযত্ন-বুদ্ধি অনুসারে আমি আমাকে চঞ্চল মনে করি। এই চাঞ্চল্য আমার চাঞ্চল্য। কেন না, প্রযত্ন-বুদ্ধি আমারই নিজস্ব বুদ্ধি। যেখানে ঐ বুদ্ধি নাই, সেখানে চাঞ্চল্য নাই; সেখানে আমি স্থির। যেখানে ঐ বুদ্ধি আছে, সেখানে আমি চঞ্চল, অস্থির। এই অস্থিরতা আমারই অস্থিরতা। বাহ্য জগতে নানা দ্রব্যের অস্থিরতা দেখি; সেই অস্থিরতার মানে কি? এক একটা জড় দ্রব্য এক একটা চিহ্ন মাত্র; রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময় চিহ্ন মাত্র; এই চিহ্নগুলা আমার বহির্দ্দেশে ছড়াইয়া আছে; কোনটা নিকটে, কোনটা দূরে, কোনটা ডাইনে, কোনটা বামে, কোনটা উপরে, কোনটা নীচে ছড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ চিহ্নকেই অস্থির ও চঞ্চল দেখিতে পাই। এখন এখানে যাহা দেখিতেছি, পরক্ষণেই তাহা সরিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। এখনই কাছে, পরক্ষণেই দূরে; এখনই বামে, পরক্ষণেই ডাইনে। নিজের অস্থিরতা আমি আমার প্রযত্ন-বুদ্ধি হইতে বুঝিতে পারি। কিন্তু আমার বাহ্য জগতে এই অস্থিরতা বুঝি কিরূপে?

উত্তরে বলিব যে, বাহ্য দ্রব্যের যে অস্থিরতা, উহা আমারই অস্থিরতা। আমার স্বকীয় দেহের অস্থিরতা আমি বাহ্য দ্রব্যে আরোপ করিতেছি মাত্র। আমারই অস্থিরতা বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া, বাহ্য দ্রব্য হইতে প্রতিফলিত হইয়া, বাহ্য দ্রব্যে অস্থিরতা দিতেছে। উত্তরটা বুঝিবার চেষ্টা করুন। আপনি আমার ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি অন্ধ; আপনাকে দেখিতে পাই না; হাত বাড়াইয়া আপনাকে স্পর্শ করিলাম; এবং হাত বাড়াইবার প্রযত্ন হইতে বুঝিলাম, আপনি আমার দুই হাত দূরে রহিয়াছেন। পরক্ষণেই হাত বাড়াইয়া দেখি যে, আপনি সেখানে নাই। আমি ডানি দিকে কিছু দূর চলিলাম এবং চলিবার প্রযত্ন হইতে বুঝিলাম যে, আমি পাঁচ হাত চলিয়া আসিয়াছি। পূর্ব্ববৎ হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, আপনি পূর্ব্ববৎ আমার সম্মুখে দুই হাত দূরে বিদ্যমান। পূর্ব্বে আমার সম্পর্কে আপনি যত দূরে ছিলেন, এখনও আমার সম্পর্কে তত দূরেই রহিয়াছেন। কিন্তু এই অবসরে আমাকে পাঁচ হাত চলিয়া আসিতে হইয়াছে,—প্রমাণ আমার প্রযত্ন-বুদ্ধি। আমি আমার অস্থিরতা আপনাতে আরোপ করিলাম। বলিলাম, আপনিও ডানি দিকে পাঁচ হাত সরিয়া আসিয়াছেন। ফলে আপনি পাঁচ হাত চলিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য যে, আমি পাঁচ হাত চলিলে পুনর্ব্বার আপনার নাগাল পাইব। আমারই গতি-বুদ্ধি আপনাতে প্রতিফলিত হইয়া আপনার গতিরূপে আমার প্রতীয়মান হইতেছে।

মনে করুন, অকূল পাথারে দুইখানি নৌকা; একখানায় আমি দাঁড় বাহিতেছি, অন্যখানা সম্মুখে কিছু দূরে আছে। পরক্ষণে দেখি, দ্বিতীয় নৌকা সেখানে নাই, অন্যত্র। কোন্‌খানা চলিয়াছে? বিজ্ঞান-বিদ্যা বলিবে, কোন্‌খানা চলিতেছে, তাহা জানার প্রয়োজন নাই। যেখানাকে ইচ্ছা, সেইখানাকে স্থির মনে করিতে পার; তাহার অপেক্ষায় অন্যখানা চলিতেছে। গতিক্রিয়া মাত্রই আপেক্ষিক। আমি প্রত্যক্ষদর্শী—আমাকে দাঁড় বাহিয়া চলিতে হইতেছে; দাঁড় বহার পরিশ্রমে আমি ভুক্তভোগী। আমি বলিলাম—দ্বিতীয় নৌকাই চলিতেছে, আমার নৌকা স্থির আছে; প্রমাণ—আমার প্রযত্ন-বুদ্ধি হয় নাই, দাঁড় বহার পরিশ্রম আমার হয় নাই। অতএব আমি স্বস্থানে স্থির আছি, ঐ দ্বিতীয় নৌকাখানাই চলিতেছে।

ফলে আমার প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতে আমার গতিক্রিয়া আমার প্রত্যক্ষ বিষয়। অন্যের গতিক্রিয়া অন্যে আরোপিত গতিক্রিয়া মাত্র। অন্য

দ্রব্য কোন্ দিকে কত দূর চলিয়াছে, ইহার তাৎপর্য্যই এই যে, আমি কোন্ দিকে কত দূর চলিলে উহার নাগাল পাইব।

এখন আস্থন। আমি আমার বাহিরে বিস্তীর্ণ একটা জগতের অস্তিত্ব মানিয়া লই,—উহা আমার প্রত্যক্ষ প্রমাণে লব্ধ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই কয়টা সেই প্রমাণ। মনে করি, এই রূপ, রস, শব্দাদি আমার বাহির হইতে আসিতেছে। কেন মনে করি? আবার কি উত্তর দিতে হইবে? আমার রূপ-রসাদি অনুভবের সমকালে যদি আপনারাও তুল্যরূপ রূপ-রসাদি অনুভবের সাক্ষ্য দেন, তখন আমাকে বাধ্য হইয়া মনে করিতে হয়, এই রূপ-রসাদি আমার নিজস্ব নহে, উহা আপনাদেরও বটে,—উহা সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি—উহা আমা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লইয়া আমার বাহিরে আছে। এই স্বাতন্ত্র্যেরই নাম বাহ্যতা। এই রূপ-রসাদির অনুভবে যখন বহু জনে একসঙ্গে দাবি করিতেছে, তখন উহা সকলেরই বাহ্য। এই জন্য আমাদিগকে রূপ-রসাদির বাহ্যতা স্বীকার করিতে হয় এবং সেই বাহ্য রূপ-রসাদি লইয়া অন্যের সহিত আদান-প্রদান করিতে হয়। এই আদান-প্রদানের জন্য একটা স্বতন্ত্র ক্ষেত্র মানিয়া লই; সেই স্বাধীন ক্ষেত্রই বহির্দেশ। রূপ-রসাদির নানা মূর্ত্তি—রূপ নানা, রস নানা, শব্দ নানা। নানা রূপে, নানা রসে, নানা শব্দে সেই বহির্দেশ বৈচিত্র্যমণ্ডিত। এই নানাত্বের নাম বহুত্ব;—এই বহুত্বকে একসঙ্গে উপলব্ধি করিতে হইলেই উহাকে সেই দেশের মধ্যে ছড়াইতে হয়। নানাত্বের সহিত ও বহুত্বের সহিত বাহ্যতা-বুদ্ধি জড়িত রহিয়াছে; যেখানে যুগপৎ বহুতা, সেখানেই বাহ্যতা। এই নানা রূপ, নানা রস বাহিরের দেশে ছড়াইয়া পড়িয়া নানা চিহ্নে ঐ দেশকে চিহ্নিত করিয়াছে; ঐ এক একটা চিহ্নের নাম জড় দ্রব্য। এই জড় দ্রব্য বিজ্ঞান-বিদ্যার জড় দ্রব্য নহে; উহা আমার প্রত্যক্ষ জড় দ্রব্য। বৈজ্ঞানিকের জড় দ্রব্য রূপাদি-বর্জ্জিত জড় দ্রব্য। কিন্তু প্রত্যক্ষ জড় দ্রব্য রূপ-রসাদিময় জড় দ্রব্য;—এই রূপ-রসাদিই প্রত্যক্ষ সামগ্রী। উভয় জগৎকে এক নাম না দিলেই ভাল হইত। কিন্তু ঘটনাচক্রে দুই জগতেরই এক নাম দেওয়া হইয়াছে। তাহাতেই এত অনর্থপাত। বৈজ্ঞানিকের কৃত্রিম দেশে বৈজ্ঞানিকের কৃত্রিম জড় জগৎ বিদ্যমান; আর আমাদের প্রত্যক্ষ দেশে আমাদের প্রত্যক্ষ জড় জগৎ বিদ্যমান। বৈজ্ঞানিকের কৃত্রিম জড় দ্রব্য বৈজ্ঞানিকের দেশকে চিহ্নিত করে। আমাদের প্রত্যক্ষ

জড় দ্রব্যই আমাদের প্রত্যক্ষ জগৎকে চিহ্নিত করে। উভয় জড় দ্রব্য চিহ্ন মাত্র। বৈজ্ঞানিক যে চিহ্ন দ্বারা তাঁহার দেশকে চিহ্নিত করেন, সে চিহ্ন রূপ-রসাদি-বর্জ্জিত চিহ্ন; সে চিহ্নের এক মাত্র লক্ষণ inertia; ঐ inertia একটা অঙ্ক মাত্র। বৈজ্ঞানিকের প্রজ্ঞা সেই অঙ্ক দ্বারা তাঁহার জড় দ্রব্যকে চিহ্নিত করিয়াছেন। আর আমরা যে চিহ্নে প্রত্যক্ষ জগৎকে চিহ্নিত করিতেছি, তাহা প্রত্যক্ষ চিহ্ন; রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, এই পাঁচ-পাঁচটা প্রত্যক্ষ-বুদ্ধি সেই চিহ্নের লক্ষণ। এই পাঁচটার অতিরিক্ত আর একটা ষষ্ঠ লক্ষণ বিদ্যমান আছে। সেটা বিরোধের অনুভূতি—resistanceএর অনুভূতি। রূপ-রসাদি পাঁচটা লক্ষণ না থাকিলেও চলিতে পারিত, কিন্তু এই বিরোধাত্মক লক্ষণটা না থাকিলে বুঝি চলিত না। আমার পাঁচটা ইন্দ্রিয় একবারে শক্তিশূন্য হইলেও আমি ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি, ধাক্কাধাক্কি, এই সকল ব্যাপার-ঘটিত resistance বুদ্ধি দ্বারাই বাহ্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ চিহ্নিত করিয়া লইতে পারিতাম। রূপাদি পঞ্চ লক্ষণে বাহ্য জগৎকে চিহ্নিত করিবার খুবই সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু ঐ পাঁচটা না থাকিলেও চলিত। আবার সেই জন্মান্ধের কথা স্মরণ করুন। জন্মান্ধের রূপ-জ্ঞান নাই, কিন্তু সে বহির্জগতে চলিবার সময় পদে পদে ধাক্কা খাইয়া সেই আঘাত-বুদ্ধিতেই তাহার বাহ্য জগৎকে চিহ্নিত করিয়া লয়। জন্মান্ধ এই আঘাত খাইয়া খাইয়া তাহার বাহ্য জগতের একটা আঘাতাত্মক মূর্ত্তি চিত্তপটে আঁকিয়া লয়। ফলে প্রত্যক্ষ জড় দ্রব্যের নির্দ্দেশ ব্যাপারে এই রূপাদি পঞ্চ লক্ষণ গৌণ লক্ষণের কার্য্য করে;—এই পাঁচটা বুদ্ধি নিতান্তই উপরি লাভ। প্রত্যক্ষ জড় জগতের মুখ্য লক্ষণ resistance; সেই বিরোধের বুদ্ধি না থাকিলে বহির্জগতে কোন জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ। ভূপৃষ্ঠে চলিবার সময় যদি পদে পদে প্রতিহত হইতে না হইত, জলে সাঁতার দিবার সময় যদি জলের ধাক্কা না বুঝিতাম, দৌড়িয়া চলিবার সময় যদি হাওয়ার ধাক্কা না বুঝিতাম, ইট পাথর তুলিবার সময় যদি গুরুত্ব-বোধ না থাকিত, সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিবার সময় যদি দেহের ভারে কাতর না করিত, তাহা হইলে বাহ্য জগতে জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন উপায়ই থাকিত না। জড় জগৎ তাহা হইলে তাহার মুখ্য লক্ষণেই বঞ্চিত হইত। এই ঘাত-প্রতিঘাতের বোধ দিয়াই বাহ্য জগৎকে আমরা বিশেষ ভাবে চিনিয়া লই।

ফলে বৈজ্ঞানিকের জড় জগতে রূপ-রসাদির অস্তিত্ব নাই, কোন ঘাত-প্রতিঘাত-বুদ্ধিরও অস্তিত্ব নাই; উহাতে আছে কেবল extension আর inertia। প্রত্যক্ষ জড় জগতে রূপ-রসাদির অস্তিত্ব আছে; তদতিরিক্ত ঘাত-প্রতিঘাত-বুদ্ধি আছে। রূপ-রসাদি না থাকিলেও চলিতে পারিত; কিন্তু এই ঘাত-প্রতিঘাত না থাকিলে একেবারেই চলিত না। এই ঘাত-প্রতিঘাতের বোধ হইতেই আমরা প্রত্যক্ষ বাহ্য জগৎকে চিনিয়া লইতে পারি; এবং যেখানে এই ঘাত-প্রতিঘাতের অস্তিত্ব বুঝি, সেইখানেই একটা-না-একটা জড় দ্রব্য বসাই। এই ঘাত-প্রতিঘাত বাহির হইতে আসিতেছে, এইরূপই মনে করি; কেন না, অন্যান্য লোকেও এই ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে এক রকমেই সাক্ষ্য দেয়। আমিও যেখানে মাথা ঠুকিয়া বলি যে, কঠিন আঘাত পাইলাম, অন্যেও সেখানে মাথা ঠুকিয়া বলে যে, কঠিন আঘাত পাইলাম। অতএব এ কঠিন আঘাত বাহির হইতে আসিয়াছে মনে করি। অন্যের সাক্ষ্য লইয়া বলি, বহির্দ্দেশের এইখানে কাঠিন্য, এইখানে তারল্য, এইখানে গুরুত্ব, এইখানে লঘুতা, এইখানে কঠোরতা, এইখানে কোমলতা। অপরের সাক্ষ্য লইয়া যেখানে যেরূপ বেদনা পাই, সেখানে সেইরূপ জড় দ্রব্য বসাইয়া তদনুরূপ লক্ষণে চিহ্নিত করি। দেখিতে পাই, এই চিহ্নগুলি চঞ্চল, অস্থির; এখন যে চিহ্ন এখানে, পরক্ষণে সে চিহ্ন ওখানে। এই জড় দ্রব্য অবলম্বন করিয়াই অন্যের সহিত কারবার করিতে হয়। মনে রাখিবেন, অন্যের সহিত কারবারের জন্যই এই বাহ্য জগতের স্বীকার আবশ্যক হইয়াছে, এবং এই বাহ্য জগৎকে ঐরূপে চিহ্নিত করা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু অন্যের সহিত এই কারবার বিরোধাত্মক। এ কথা আমি শত বার, সহস্র বার বলিয়া আসিতেছি। এই বিরোধই প্রাণযাত্রা; এবং সর্ব্বদা বিরোধাত্মক। উহা ঠেলাঠেলি, কাড়াকাড়ি, ঘুষোঘুষি, কিলাকিলি, দন্তাদন্তি, রক্তারক্তির ব্যাপার; এবং প্রত্যেক ব্যাপারই বিরোধের ব্যাপার। প্রাণভয়ে ও আহারের চেষ্টায় প্রাণযাত্রা কেবলই দৌড়াদৌড়ির ব্যাপার;—এই দৌড়াদৌড়িও বিরোধের ব্যাপার। বিরোধের ব্যাপার বলিয়াই উহার নাম জীবন-যুদ্ধ। প্রাণরক্ষার জন্যই এই জীবন-যুদ্ধ,—এই বিরোধ। প্রাণকে ক্ষয় করিয়া, প্রাণকে অজস্রভাবে অপচয় করিয়া প্রাণের এই বর্দ্ধনই জীবন-যুদ্ধ। উহার ফলে যত কিছু আধিভৌতিক ক্লেশ আছে, তাহার নিদান এইখানে। অন্যের

সহিত কারবারের জন্য আমার জগৎকে বহির্দ্দেশে স্থাপনা করিলাম; সেই কারবারটাকে, কি জানি কোন্ কারণে বিরোধাত্মক করিয়া লইলাম। এই বিরোধে প্রাণের ক্ষয়; ক্ষয় হইতে রক্ষার জন্য বিরোধের নানা মূর্ত্তি। নানা মূর্ত্তি দেখিয়া বহির্দ্দেশকে নানা চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া ফেলিলাম। এক একটা চিহ্ন এক একটা জড় দ্রব্য। জীবন-যুদ্ধে এই জড় দ্রব্যগুলাই অস্ত্র। এই জড় দ্রব্যগুলি পরস্পরকে ছুড়িয়া মারি, ইহারই আঘাতে অন্যকে নাশের পথে প্রেরণ করিতে চাহি। স্বয়ং চেষ্টাপূর্ব্বক এইগুলিকে আহরণ করিতে হয়। আহরণ-কর্ম্মেই দৌড়াদৌড়ি, অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, ভ্রমণ, পর্য্যটন। চিহ্নগুলাকে আহরণ করিতে হয়—বহির্দ্দেশে খুঁজিয়া লইতে হয়। তাহাতে প্রযত্ন-বুদ্ধি হয়। প্রযত্ন-বুদ্ধির মাত্রানুসারে কোনটাকে দূরে, কোনটাকে নিকটে ফেলি। এখন যাহা নিকটে, পরে তাহা দূরে। প্রযত্ন-বুদ্ধিই ক্লেশ—কেন না, ইহা বিরোধের সহকারী। এই বিরোধে প্রাণের ক্ষয় হয়। প্রযত্ন-বুদ্ধি অনুসারে আমি আমার চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা নিরূপণ করি। অথচ আমার চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা বাহিরে আরোপ করিয়া বাহ্য জগৎকে চঞ্চল ও অস্থির দেখি। এইরূপে আমার এই বাহ্য জগৎ চঞ্চল জগৎ। আমার চাঞ্চল্য আমার বুদ্ধির চাঞ্চল্য; বাহ্য জগতের চাঞ্চল্য উহার প্রতিবিম্ব। আমার দেহটাও জড় দ্রব্য; উহা আমার সব চেয়ে নিকটের অস্ত্র। ওটাকে যখন ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি, যেন উহা আমার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না—সর্ব্বদা আমার গায়ে লাগিয়া আছে। এই দেহাস্ত্র আশ্রয় করিয়াই আমি অন্যকে আক্রমণ করি। কিন্তু এই দেহাস্ত্রও আমার পক্ষে ভারস্বরূপ,—আধিব্যাধি, পীড়া, যাতনা, জরা, মৃত্যু প্রভৃতিতেই তার পরিচয়। যে বহির্দ্দেশে আমি প্রাণযাত্রা চালাইতেছি, সেই বহির্দ্দেশ এইরূপ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরোধে আস্তীর্ণ—এখানে ওখানে সেখানে সর্ব্বত্রই বিরোধ। বিরোধই যেন জমাট বাঁধিয়া এক একটা স্থানে দানা বাঁধিয়াছে; বিরোধের সেই দানাগুলাই জড় দ্রব্য। আমার দেহটাও ঐরূপ একটা বিরোধের দানা; আমি সর্ব্বদা উহার ভার বহিতেছি। ভার বহিতেছি, কিন্তু ত্যাগ করিতে পারিতেছি না; কেন না, উহাই এক দিকে আমার প্রধান অস্ত্র, অন্য দিকে উহাই আমার রক্ষাকবচ।

আজিকার মত এইখানেই দাঁড়ি টানিতে চাহি। বাহ্য জগতের বিষয় বলিতেছিলাম। বাহ্য দেশে যে জগৎকে বিছাইয়া দিই, তাহাকেই জড়

জগৎ বলি। এই জড় জগৎ দ্বিবিধ ; একটা বৈজ্ঞানিকের বাহ্য জগৎ, অন্যটা আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ বাহ্য জগৎ। বৈজ্ঞানিকের বাহ্য জগৎ কাহারও প্রত্যক্ষ নহে, প্রত্যক্ষ হইবে না ; পাঁচ জন সুধী ব্যক্তি মিলিয়া মিশিয়া এই বাহ্য জগৎকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহার সৃষ্টির জন্য অন্য কোনও সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা আবশ্যক নহে। সুধী বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তি দিয়া ফেলিয়াছেন ; অসীম ত্রিধাবিস্তৃত আকাশকে ঈথারে পূর্ণ করিয়া, সেই ঈথারমধ্যে অণু পরমাণু ইলেকট্রন ছড়াইয়া দিয়া, সেই অণু পরমাণু ইলেকট্রনের সমন্বয়ে নানা জড় দ্রব্যের, গ্রহ উপগ্রহ, উল্কাপিণ্ড, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকার মূর্ত্তি গড়িতেছেন। কিন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তি দিতে পারিতেন। অসীমের বদলে সসীম, ত্রিধা-বিস্তৃতের স্থানে চতুর্ধা বা পঞ্চধা-বিস্তৃত আকাশ কল্পনা করিয়া বিনা ঈথারে বিনা ইলেকট্রনে তাঁহাদের জড় জগৎ নির্ম্মিত করিতে পারিতেন। এখনও যে করিবেন না, তাহা বলা যায় না। সেই জগৎকে তাঁহারা দৃঢ় নিয়মে শৃঙ্খলিত করিবার চেষ্টায় আছেন ; ক্রমশঃ সফল হইতেছেন। ধরিয়া লইয়াছেন, এই যে জগৎ গড়িব, ইহার কোথাও নিয়মের বন্ধন আল্‌গা থাকিবে না। একগাছি শিকল দিয়া ইহাকে বাঁধিয়া রাখিব, কোথাও ইহার স্বাধীনতা থাকিবে না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য—সুস্থ মাঝারি মানুষ এই জগতের বাসেন্দা হইবে এবং এই জগতের নিয়মসূত্র আশ্রয় করিয়া প্রজ্ঞাবলে আপনার প্রাণযাত্রা সম্পন্ন করিবে। এই জগতে কোথাও রূপ নাই, রস নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই ; এমন কি, ইহা কাহাকেও কোন আঘাত দিয়া কাতর করিতেও পারে না। ইহার কোথাও কোন বিরোধ মাত্র নাই। বৈজ্ঞানিক ইহার নক্সা করিয়াছেন, এবং বৈজ্ঞানিক সেই নক্সা অনুসারে ইহাকে অশরীরী বাঙ্ময় মশলা দিয়া গড়িয়াছেন। এই জগৎ সর্ব্বতোভাবে প্রজ্ঞা-নির্ম্মিত—প্রজ্ঞা কর্ত্তৃক পরিচালিত—সর্ব্বতোভাবে প্রজ্ঞার অধীন।

কিন্তু প্রত্যেক জীয়ন্ত মানুষের প্রত্যক্ষ জগৎ এরূপ কৃত্রিম পদার্থ নহে। প্রত্যেক জীয়ন্ত মানুষকে এই প্রত্যক্ষ জগতে প্রাণের খেলা খেলিতে হয়। প্রজ্ঞা-বল তাহাকে বল দেয় বটে ; কিন্তু এই প্রত্যক্ষ জগৎ প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞার এলাকার বাহিরে। এখানে জীয়ন্ত মানুষে জীবনের খেলা খেলে ; বহু বহু খেলার সাথী পাইয়া হাডুডুডু, দাণ্ডাগুলি, কপাটি প্রভৃতি নানা খেলা খেলে। নানাবিধ প্রযত্ন-বুদ্ধি সেই খেলায়

দাণ্ডা ও গুলির ব্যাট ও বলের কাজ করে। এই প্রযত্ন-বুদ্ধি হইতেছে বিরোধের অনুভূতি ;—প্রাণযাত্রায় পদে পদে বিরোধের অনুভূতি। খেলাটাই যখন হইতেছে বিরোধের খেলা, তখন বিরোধ-বুদ্ধি না থাকিলে সেই খেলা চলিবে কিরূপে? আমার প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়ের অস্তিত্ব আমি স্বীকার করিয়া লই,—তাহার আক্রমণ পাই বলিয়া, তাহার আক্রমণ এড়াইতে হয় বলিয়া। তাহার আক্রমণ এড়াইবার জন্য সদা জাগ্রত, সদা তৎপর, সদা সচেষ্ট থাকিতে হয় বলিয়াই এই প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্তিত্ব মানিয়া লই। রূপ-রস-গন্ধাদি এই বিরোধে সহায় হয় বটে, কিন্তু এগুলা নিতান্তই উপরি লাভ। ওগুলা আছে ভালই ; না থাকিলে যে চলিত না, এমন নহে। কিন্তু এই প্রযত্ন-বুদ্ধিটা—এই ক্লেশটা—এই দুঃখটা—এই বেদনাটা না থাকিলে চলিত না ; কেন না, এই যে খেলা, ইহা বিরোধেরই। কানার নিকট বাহ্য জগতে রূপ নাই, কালার নিকটে বাহ্য জগতে শব্দ নাই ; কিন্তু এই বিরোধের বেদনা সকলেরই আছে। যাহারা দল বাঁধিয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে উপস্থিত, তাহাদের সকলেরই আছে। আমি এক মাত্র খেলোয়াড় হইলে আমার নিকট এই বাহ্য জগৎ থাকিত না। কাহার সহিত আমি খেলিতাম? ক্রীড়াক্ষেত্রেরই বা তখন কি প্রয়োজন থাকিত? বহু খেলোয়াড়ের সহিত খেলিবার জন্যই এই বাহ্য জগতের অস্তিত্ব, এই বাহ্য জগতের উৎপত্তি, এই বাহ্য জগতের বাহ্যতা এবং এই বাহ্য জগতের সর্ব্বত্র বিরোধের অনুভব। বাহ্য জগৎকে কাজেই বাধ্য হইয়া বিরোধময় জগৎ, বিরোধাত্মক জগৎ মনে করিয়া লইয়াছি। ইহার সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিরোধ—বিরোধই যেন দানা বাঁধিয়া এই বাহ্য জগৎকে পূর্ণ রাখিয়াছে ; বিরোধই যেন নানা ভাবে ঘনীভূত হইয়া এই বাহ্য জগতে পরিণত হইয়াছে। একটা বিচিত্র বেদনা এই বাহ্য জগৎকে পূর্ণ করিয়া, ইহার স্থানে স্থানে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে,—ইহার নানা স্থানকে নানা ভাবে চিহ্নিত করিতেছে। সেই বিরোধের বেদনাই যেন এই বাহ্য জগতে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। মনে রাখিবেন, মূলে আমিই চঞ্চল ; আমার বেদনাটাই চঞ্চল ; আমার প্রাণযাত্রা যে বিরোধের বেদনায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমার এই বেদনার চাঞ্চল্য আমি আমার বাহ্য জগতে ছড়াইয়া দিই, এবং সেই চাঞ্চল্যে বাহ্য জগৎকে পূর্ণ করি। এই হেতু বাহ্য জগৎ সঞ্চরণশীল, গতিশীল, অস্থির, চঞ্চল। এই বিচিত্র চঞ্চল বেদনাবুদ্ধিকেই আমরা নাম দিয়াছি জড়

পদার্থ ;—ইহা বৈজ্ঞানিকের কল্পিত জড় পদার্থ নহে—ইহার কোথাও অণু-পরমাণু ইলেক্‌ট্রন নাই—ইহা আস্ত সত্য প্রত্যক্ষ পদার্থ—রূপ-রস-গন্ধাদি ইহার গৌণ লক্ষণ, ঐ বিরোধাত্মকতাই ইহার মুখ্য লক্ষণ। বাহ্য জগতে যে জড়ের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতেছি, সে এই বিরোধেরই অস্তিত্ব, এই বেদনারই অস্তিত্ব, জ্ঞানবান্ প্রাণীর বেদনারই অস্তিত্ব। এই প্রত্যক্ষ জড় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কে,—যদি আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি নিঃসঙ্কোচে বলিব, আমিই ইহা সৃষ্টি করিয়াছি ; অন্য সৃষ্টিকর্ত্তা আমি মানি না। যদি জিজ্ঞাসা করেন,—কি উদ্দেশ্য লইয়া আমি ইহার সৃষ্টি করিয়াছি ; তদুত্তরে আমি বলিব, আমার প্রাণের খেলা খেলিবার জন্য—বহু প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত খেলিবার জন্য—এই ক্রীড়াক্ষেত্র আমার বাহিরে স্থাপন করিয়া তাহাতে খেলা করিতে নিযুক্ত আছি। যখনই এই বহু প্রতিদ্বন্দ্বী মানিয়া লইয়াছি, তখনই এই বাহিরের ক্রীড়াক্ষেত্র মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি ; এই বহুতার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যতা আনিয়াছি। এই ক্রীড়াক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বাহ্য জগৎ, ব্যাবহারিক বাহ্য জগৎ ; কেন না, এইখানে সমস্ত ব্যবহার। ইহাই প্রত্যক্ষ জড় জগৎ ; কেন না, যেখানে এই বেদনানুভূতি, সেইখানেই জড়। আমার এই বেদনার চাঞ্চল্যই জড় জগতের চাঞ্চল্য—জড় জগতের সমস্ত অস্থির চঞ্চলতা। এই বেদনাই জড়তা ; এই বেদনাই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বহির্দ্দেশে জড় দ্রব্যরূপে ছড়াইয়া আছে।

আপনারা দেখিতেছেন, সম্প্রতি আমি প্রাণকেই প্রথম স্বীকার্য্য postulate করিয়া জগত্তত্ত্বের আলোচনায় উপস্থিত হইয়াছি। জড়বাদীরা জড়কে প্রথম স্বীকার্য্য ধরিয়া লন—জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি বুঝাইবার চেষ্টা করেন। আমি প্রাণকে প্রথম স্বীকার্য্য ধরিয়া লইয়াছি। প্রাণ হইতে জড়ের উৎপত্তি বা প্রাণ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি বুঝাইতে আমি পারিব না ; তবে প্রাণের সম্পর্কে জড়ের তাৎপর্য্য, প্রাণের সম্পর্কে জ্ঞানের তৎপরতা আমি বুঝাইতে চাহি। প্রাণি-বিদ্যার চশমা চোখে দিয়া আমি জগৎব্যাপারের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছি। এ একটা আমার বিশিষ্ট attitude মাত্র ; ইহার ভিতরে কোন বুজরুকি নাই। জড়-বিদ্যার attitude স্বতন্ত্র। আমি প্রাণকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। প্রাণ আছে। সেই প্রাণের লক্ষণ—আপনাকে বর্দ্ধন। প্রাণ আপনাকে রাখিতে চায়, আপনাকে বাড়াইতে চায়, আপনাকে বিচিত্র করিতে চায়। কেন চায়,

তাহা জানি না। ইহাই প্রাণের কামনা, এই কামনাই প্রাণের স্বরূপ লক্ষণ। প্রাণ সর্ব্বতোভাবে স্বার্থপর। প্রাণ এ বিষয়ে স্বাধীন। প্রাণীর স্বাধীনতা রোধে কাহারও ক্ষমতা নাই, কোন অধিকার নাই। কিরূপে আপনাকে রাখিতে হইবে, কিরূপে বাড়াইতে হইবে, প্রাণই তাহা বুঝে, অন্যের উপদেশ সে চাহে না। কাহার উপদেশই বা চাহিবে? এই প্রাণ এক হইয়াও আপনাকে বহু খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া বহু করিয়া লইয়াছে, এবং পরস্পর দ্বন্দ্বাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই দ্বন্দ্বাভিনয়টাই প্রাণযাত্রা। এই দ্বন্দ্বাভিনয় বড় বিচিত্র ব্যাপার। ইহা রক্তবীজের লড়াই। প্রাণ আপনাকে অজস্রভাবে বাড়াইতেছে, আর অজস্রভাবে অপচয় করিতেছে। এই অজস্রতার ইয়ত্তা নাই,—ইহা অতি বিপুল ব্যাপার। এই অজস্র উপচয় ও এই অজস্র অপচয়,—ইহা অতি বিপুল ব্যাপার—ইহা নিতান্ত নিষ্কারণ, অহেতুক, উদ্দেশ্যহীন বিপুল ব্যাপার মাত্র। ইহাকে খেলা মাত্র বলিতে পারি। আর কোন নাম দেওয়া চলে না। এই খেলা খেলিবার জন্য প্রাণী জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছে। কিরূপে করিল, জানি না। জ্ঞান প্রাণের ঊর্দ্ধ প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। জ্ঞানবান্ প্রাণীর সম্মুখেই বাহ্য জগৎ প্রসারিত;—জ্ঞানহীন প্রাণীর নিকটে কোনরূপ বাহ্য জগতের অস্তিত্ব নাই, বাহ্য জগতের কোন অর্থই নাই। এই জ্ঞান—রূপাদি পঞ্চকের জ্ঞান এবং তাহারও উপরে বিরোধের জ্ঞান। বিরোধের জ্ঞানই বেদনার জ্ঞান। রূপাদি পঞ্চক নহিলেও জ্ঞানবান্ প্রাণীর প্রাণযাত্রা চলিতে পারে, কিন্তু এই বেদনা-জ্ঞান না থাকিলে চলিতে পারে না।

আমার মূল কথা যদি আপনারা ধরিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্থির বুঝিবেন যে, এক মাত্র অদ্বিতীয় চেতন জীবের পক্ষে কোন ব্যবহার নাই, কোন ক্রীড়া নাই, কোন ক্রীড়াক্ষেত্র আবশ্যক নহে, কোন বাহ্য জগৎ থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমি যদি এক মাত্র চেতন জীব হই, তাহা হইলে আমার নিকট বাহ্য জগৎ অস্তিত্বহীন। আমার অন্তর্জগৎ আছে—সে জগৎ সর্ব্বতোভাবে প্রাতিভাসিক। কিন্তু যে কারণেই হউক, আমি প্রাণিরূপে আত্মতুল্য বহু চেতন জীবের কল্পনা করিয়া লইয়াছি এবং তাহাদের সহিত এই প্রাণের ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। যখনই তাহাদিগকে আত্মতুল্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তখনই আমাকে বাধ্য হইয়া এই বাহ্য জগৎ স্বীকার করিয়া ফেলিতে হইয়াছে, এবং সেই অন্য জীবের সহিত খেলায়

প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। এই খেলাকে কেন বেদনার খেলা করিয়া লইলাম, তাহা জানি না। উহাকে যে বেদনার খেলায় পরিণত করিয়া লইয়াছি, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। বাহ্য জগতের আমার এই অস্থির চঞ্চল বেদনাকে প্রেরণ করিয়া বাহ্য জগৎকে, ব্যবহারের জগৎকে, প্রাণযাত্রার জগৎকে বেদনাময়, দুঃখময় জগতে পরিণত করিয়াছি। যদি জিজ্ঞাসা করেন—কে ইহার নির্ম্মাতা,—আমি বলিব, আমিই ইহার নির্ম্মাতা। যখনই আমি আমার মত বহু জন মানিয়াছি, তখনই ইহার নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিয়াছি। বহু জন যদি অস্বীকার করি, তাহা হইলে বাহ্য জগৎও থাকে না, বাহ্য জগতের নির্ম্মাণও দরকার হয় না। তখন বাহ্য জগৎ কে গড়িল, এই প্রশ্নই অর্থশূন্য হইয়া পড়িবে। প্রাণের এই বিচিত্র বেদনা-রাশিকেই আমি বাহ্য জগৎ বলিতে চাহি। বেদনাখণ্ডই জড় দ্রব্য। যখনই আমি বহুজীববাদী হইয়াছি, তখনই আমি বেদনায় আপনাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছি। আপনার হাতে নিগড় নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। জড় জগতের ক্রীড়াক্ষেত্রকে হয়ত এরূপ বেদনাপূর্ণ না করিলেও চলিত—প্রতিদ্বন্দ্বী জীবের সহিত বিরোধের খেলা না খেলিয়া উল্লাসের খেলা খেলিলেও হয়ত চলিত। প্রাণ কেন সেরূপ খেলা খেলিল না, তাহা আমি বলিতে পারিব না। স্বাধীনতাই যখন প্রাণের স্বরূপ লক্ষণ ধরিয়া লইয়াছি, তখন প্রাণের উপর ঐরূপ জবরদস্তি হুকুম চালাইবার অধিকার আমার নাই। আমি প্রাণের এই বেদনারাশিকেই প্রাণের কাম্য পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। প্রাণ এই বেদনারাশির মধ্যে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়া আপনার কামনা চরিতার্থ করিতেছে, ইহাই আমি ধরিয়া লইলাম।

প্রাণিবিদ্যার আলোচনায় পরিশেষে আমি এই তত্ত্বে উপনীত হইলাম। আপনারা নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া আমাকে বলিবেন, বেশ করিলে; যে ডালে বসিয়া আছ, সেই ডালের মূলে কুঠার প্রয়োগ করিলে; এ যে আত্মদ্রোহীর কার্য্য হইল! এই দুঃখবাদেই যদি জগত্তত্ত্বের নিষ্পত্তি হয়, তাহা হইলে সেই নিষ্পত্তির দরকার নাই। প্রাণের স্বরূপ লক্ষণ হইল, আপনাকে বর্দ্ধন; আর সেই বর্দ্ধনের উপায় হইল বিশুদ্ধ বেদনা। বেদনা মারাত্মক পদার্থ। প্রাণ তবে শেষ পর্য্যন্ত আত্মঘাতী আত্মদ্রোহী পদার্থে দাঁড়াইল। এই স্ব-বিরোধী আত্মঘাতী তত্ত্বে প্রাণময় জগৎ প্রতিষ্ঠিত, ইহা কিরূপে মানিতে পারি?

উত্তরে আমি সবিনয়ে বলিব,—রহো—তিষ্ঠ। আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই। আমাকে অভয় দেন, আমি আবার অন্য কথা লইয়া আপনাদের সম্মুখে আসিব।

যজ্ঞ-কথা

[১৯২০ সনের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত]

যজ্ঞ—অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র

যজ্ঞের কথা বলিতে চাহি ; আপনারা অবধান করুন।

আমাদের যে সমাজের চলিত নাম হিন্দু-সমাজ, আমি সেই সমাজকে বেদপন্থী সমাজ বলিব। এই সমাজ বেদের শাসন মানে এবং বেদের আনুগত্য স্বীকার করে। বেদপন্থী সমাজের প্রধান অনুষ্ঠানই যজ্ঞানুষ্ঠান। এই যজ্ঞানুষ্ঠানেই বেদপন্থী সমাজ প্রতিষ্ঠিত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য না বুঝিলে বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসের যাহা বিশিষ্টতা, তাহা বুঝা যাইবে না। আমি কয়েকটি প্রবন্ধে সেই তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

এই বেদপন্থী সমাজে একটু সঙ্কীর্ণতা আছে। গোড়ায় সেটুকু মানিয়া লইব। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, আর্য্যজাতির এক শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া একটা নূতন বিশিষ্ট সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সেই সমাজতন্ত্রের নিজস্ব সাহিত্যই ছিল বেদ। সেই সমাজের ধর্ম্মকর্ম্ম এবং যাবতীয় অনুষ্ঠান বেদের বিধি-নিষেধ অনুসারেই সম্পাদিত হইত। ভারতবর্ষের যে সকল আদিম অনার্য্য অধিবাসী ছিল, তাহারা সকলে এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে পায় নাই। কেহ কেহ আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, খাঁটি বেদপন্থী আর্য্যেরাই আপনাদিগকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতেন ; আর যে সকল অনার্য্য তাঁহাদের আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদিগকে শূদ্র বলা হইত। ফলে, শূদ্রেরা বেদপন্থী সমাজের আশ্রিত হইলেও ঐ সমাজের সকল অধিকার পায় নাই। খাঁটি বেদপন্থী দ্বিজাতি-সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণে বিভক্ত হয়। আচারভেদে এবং বৃত্তিভেদে এই বিভাগের কল্পনা হইয়াছিল। আমি এটাকে একটা থিয়োরি মাত্র মনে করি। বস্তুতই যে এই তিনটা বর্ণের মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট রেখা টানা ছিল, এরূপ মনে না করিলেও চলিতে পারে। বৃত্তিভেদ এবং আচার-ভেদ এখনও যেমন নানারূপ আছে, তখনও হয়ত নানারূপ ছিল। তবে থিয়োরির খাতিরে দ্বিজাতি-সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটা-না-একটা বর্ণের কোঠায় ফেলা হইত। পরবর্ত্তী কালে যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে ঐ তিনটি মূল বর্ণকে পরস্পর মিশাইয়া নানা সঙ্কর

বর্ণের উৎপত্তি বুঝাইবার একটা উৎকট চেষ্টা দেখা যায়। এই চেষ্টাও আমার অনুমান কতকটা সমর্থন করিতে পারে। সে যাহাই হউক, বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং এই দ্বিজত্ব পরিচয়ে শূদ্র হইতে এবং অনার্য্য ম্লেচ্ছাদি হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেন। এই স্বাতন্ত্র্যই দ্বিজাতি-সমাজের সঙ্কীর্ণতা। অন্য সমাজের লোক সহজে দ্বিজাতি-সমাজে প্রবেশ করিতে, অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিতে পাইত না। একবারেই যে পাইত না, ইহা মনে করিতে পারি না। ইতিহাসে দেখিতে পাই, বহু অনার্য্য এবং বহু ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত কালক্রমে দ্বিজাতি-সমাজে প্রবেশ পাইয়াছে এবং দ্বিজাতির সকল অধিকার লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে অনেক খাঁটি দ্বিজ স্বেচ্ছাক্রমে দ্বিজাতির অধিকার ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আজি তাঁহারা সেই শূদ্রত্ব স্বীকারের জন্য অনুতপ্ত এবং পুনরায় দ্বিজত্বলাভের জন্য ব্যাকুল। তৎসত্ত্বেও বলিতে পারা যায়, আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে দ্বিজাতি-সমাজ অন্যান্য সমাজ হইতে কতকটা স্বতন্ত্র রহিয়াছে। বেদে অধিকার লইয়াই এই স্বাতন্ত্র্য। যে ব্যক্তি দ্বিজ, সে যে বর্ণের লোকই হউক না, বেদের আলোচনায় এবং বেদ-বিহিত কর্ম্মে তাহার ষোল আনা অধিকার আছে। যাহারা গোড়া হইতেই শূদ্র বলিয়া গণ্য আছে, অথবা দ্বিজত্ব ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব লইয়াছে, তাহারা এখন বেদপন্থী সমাজের অন্তর্গত থাকিলেও বেদের আলোচনায় এবং বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে ষোল আনা অধিকার পায় নাই।

এখন এই দ্বিজ শব্দটির তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাক।

আজকাল বিদ্যার্জ্জনের নামান্তর—লেখা পড়া শেখা। এ কালে প্রচুর পরিমাণে কালি কলম খরচ করিয়া লেখা অভ্যাস করিতে হয় এবং পুঁথি-পত্রের সাহায্যে পড়া অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপ লিখিতে এবং পড়িতে শিখিলে তবে বিদ্যা লাভ হয়। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন লিপির আবিষ্কার হয় নাই। অতএব তখন লেখাও ছিল না, পড়াও ছিল না। লেখা পড়া ছিল না, কিন্তু বিদ্যা ছিল। বিদ্যালাভের জন্য লেখা এবং পড়া একান্ত আবশ্যক, তাহা বোধ করি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন। অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Science বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন। লেখা পড়া ব্যতীতও বিদ্যালাভ হইতে পারে।

ভারতবর্ষেও এক সময়ে বিদ্যা ছিল এবং বিদ্যা অর্জ্জনের ব্যবস্থাও ছিল। বেদপন্থী সমাজের সেই অতি প্রাচীন বিদ্যার নামই বেদ। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, সেই অতিপ্রাচীন বেদবিদ্যা হইতেই এ দেশের প্রায় যাবতীয় বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বিজাতি-সমাজের প্রত্যেক বালককে এক সময়ে সেই বেদবিদ্যার অন্ততঃ কিয়দংশ অর্জ্জন করিতে হইত। প্রত্যেক বালককে এই জন্য বিদ্যাদাতা আচার্য্যের সমীপে যাইতে হইত। আচার্য্যের সমীপে যাওয়ার নাম উপনয়ন। এই উপনয়নব্যাপার এ কালের পাঠশালায় ভর্ত্তি হওয়ার অনুরূপ। কয়েক বৎসর আচার্য্যের বাড়ীতে বাস করিয়া আচার্য্যদত্ত বেদ-বিদ্যা গ্রহণ করিয়া আচার্য্যের অনুমতি লইয়া বাড়ী ফিরিতে হইত। এই বাড়ী ফেরার নাম সমাবর্ত্তন। এই সমাবর্ত্তন-ব্যাপার কতকটা এ কালের পাশের সার্টিফিকেট লইয়া বাড়ী ফেরার অনুরূপ। এই সমাবর্ত্তনের পর অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয় দত্ত সার্টিফিকেট পাওয়ার পর, গৃহী হইবার অধিকার জন্মিত। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এ সম্বন্ধেও একটা থিয়োরি খাড়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখনকার বেদবাক্যের নামান্তর ছিল ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দের অর্থই বেদবাক্য। আচার্য্যগৃহে যিনি বেদের আলোচনা করিতেন, তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী যে সকল আচার-নিয়ম পালন করিতেন, তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য। যে সকল ছাত্র বেদবিদ্যার আলোচনাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন, বেদের আলোচনা ছাড়িতে চাহিতেন না, তাঁহারা হয়ত গৃহী হইতেন না; যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য লইয়াই কাটাইতেন। আবার কোনও কোনও ছাত্র বেদের জ্ঞানকাণ্ডের চর্চ্চায় এতটা মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন যে, গৃহধর্ম্মে তাঁহাদের বিতৃষ্ণা জন্মিত। তাঁহারা জ্ঞানপথের পথিক হইয়া একবারে সন্ন্যাসী হইয়া পড়িতেন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন। এই আজীবন ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী ব্যতীত অধিকাংশ ছাত্রই সমাবর্ত্তনের পর গৃহে ফিরিয়া গৃহস্থ হইতেন। এই গৃহস্থদিগের সমষ্টি লইয়াই সমাজ। যে ব্যক্তি গৃহধর্ম্ম করে না, লোকালয় হইতে দূরে থাকিয়া চিরকাল বিদ্যাচর্চ্চা অথবা জ্ঞানচর্চ্চা লইয়াই জীবন কাটায়, সে সমাজের কেহ নহে। সমাজ তাহাকে পালন করে বটে, রক্ষা করে বটে, কিন্তু সে সামাজিক নহে।

সমাবর্ত্তনের পর তবে বিবাহের অধিকার জন্মে। বিবাহ না করিলে গৃহস্থ হয় না, গৃহপতি হয় না। যে বিবাহ করে নাই, তাহার গৃহ নাই।

মনে রাখিবেন, 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।' এই বিবাহ অনুষ্ঠানটা কৃত্রিম অনুষ্ঠান। Malthus সাহেবের Population ঘটিত প্রবন্ধ প্রচার হইতে বিবাহ অনুষ্ঠানের ঔচিত্য লইয়া অনেক জল্পনা হইয়াছে। অনেকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, দরিদ্রের পক্ষে বিবাহ অধর্ম্ম; আইনের জোরে তাহাদের বিবাহ বন্ধ করা উচিত। এখনও এক-শ বৎসর অতিক্রম হয় নাই, ইহারই মধ্যে হাওয়া ফিরিয়াছে। ইউরোপের উপস্থিত হাঙ্গামাটা থামিয়া গেলে হয়ত শোনা যাইবে যে, আইনের জোরে সকলকে বিবাহে বাধ্য করা উচিত। অন্ততঃ রাষ্ট্রের কল্যাণার্থ সকলকে বিবাহে বাধ্য করা উচিত। রাষ্ট্রের কল্যাণ দেখিয়াই এ-কালে ধর্ম্মাধর্ম্মের নিরূপণ হয়। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য বহু দেশে প্রত্যেক বালককে বিদ্যালাভে বাধ্য করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য হয়ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিবাহে বাধ্য করা হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রতন্ত্রের এত প্রভুত্ব ছিল না। তবে সমাজের কল্যাণ দেখিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের নিরূপণ হইত বটে। আইনের জোরে বাধ্যতা-প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের ধাতুগত নহে। তবে ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থা কার্য্যতঃ কয়েকটি বিষয়ে এই বাধ্যতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। যে স্বেচ্ছাক্রমে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী থাকিবে, অথবা ব্রহ্মচর্য্যের পরেই সন্ন্যাসী হইবে, সে ত বিবাহ করিবেই না। আইনের জোরে তাহাকে বিবাহে বাধ্য করা এ দেশের সমাজ-ব্যবস্থা স্বপ্নেও মনে আনিতে পারে না। কিন্তু যে গৃহস্থ হইবে, সে বিবাহে কার্য্যতঃ বাধ্য। বিবাহ না করিলে সে ষোল আনা সামাজিকতা পাইবে না। বেদ-বিহিত সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্মে তাহার অধিকার জন্মিবে না। কেন না, বেদ-বিহিত ধর্ম্মকর্ম্ম সপত্নীক অনুষ্ঠান করিতে হয়। যে পত্নী গ্রহণ করে নাই, মানবের মর্ত্ত্য জীবনের নিয়ামক দেবগণের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক ঘটিতে পারে না। দেবগণ মনুষ্য-প্রদত্ত যজ্ঞভাগের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। যাহার পত্নী নাই, সে দেবতাকে যজ্ঞভাগ দিতে পারে না; পিতৃগণের সহিতও তাহার মাখামাখি সম্পর্ক ঘটে না। পিতৃগণ পুরুষপরম্পরাদত্ত পিণ্ডভোজনের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। যে ব্যক্তির পত্নী নাই, সে বংশধারা রক্ষায় অশক্ত। পিণ্ডবিচ্ছেদ ভয়ে পিতৃগণ চোখের জল ফেলিতেছেন। যে ব্যক্তি পিতৃগণকে পিণ্ড দেয়, সে-ই পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারী। অতএব, যে ব্যক্তি বংশধারা রক্ষা করিতে পারিতেছে না, সে পৈতৃক সম্পত্তিতে

পূর্ণমাত্রায় অধিকার পাইতে পারে না। ফলে, অপত্নীক ব্যক্তি সামাজিকের পূর্ণ অধিকার পাইতে পারে না। সমাজভুক্ত অন্য লোকের সহিত তাহার ষোল আনা সম্পর্ক ঘটিতে পারে না। সামাজিক জীবনের পূর্ণতার জন্য বিবাহ আবশ্যক। জীবনের সংস্কারের জন্য বিবাহ আবশ্যক। বিবাহ জীবনের অন্তিম সংস্কার। এই হেতু দ্বিজাতি-সমাজে সামাজিক গৃহস্থ কার্য্যতঃ বিবাহে বাধ্য।

কিন্তু মনে রাখিবেন যে, আচার্য্য-গৃহ হইতে বেদ-বিদ্যা লাভ করিয়া সমাবর্ত্তনের পর তবে বিবাহে অধিকার জন্মে। এ-কালে পাশ করা ছেলের বিবাহের বাজারে দর বেশী; সে-কালে ছেলে পাশ করিয়া আসিতে না পারিলে বিবাহে অধিকারই পাইত না। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রাচীন কালে যে থিয়োরি খাড়া করিয়াছিল, এ-কালে তাহার বাঁধাবাঁধি নাই; তথাপি ব্রাহ্মণের ছেলে গলায় একগাছা পৈতা দেখাইতে না পারিলে বিবাহ করিতে পায় না। পৈতাগাছটায় বলিয়া দেয় যে, সে যতই মূর্খ হউক, অন্ততঃ বেদের গায়ত্রী মন্ত্রটি, বেদ-বিদ্যার যাহা সার মন্ত্র, সেই গায়ত্রী মন্ত্রটি অভ্যাস করিয়াছে। মনে করিতে পারি যে, সে-কালে শাস্ত্রের বন্ধন এতটা আলগা ছিল না। বেদ-বিদ্যার অন্ততঃ কিয়দংশ আয়ত্ত করিতে না পারিলে সমাবর্ত্তনে আচার্য্যের অনুমতি পাইত না এবং সমাবর্ত্তন না হইলে বিবাহ হইত না। অতএব যে একবারে গণ্ডমূর্খ, সে বিবাহ করিতে পাইত না, গৃহী হইতে পারিত না, সমাজে এক রকম অব্যবহার্য্য হইয়া থাকিত। ফলে, থিয়োরি অনুসারে দ্বিজাতি-সমাজে মূর্খের স্থান ছিল না। প্রত্যেক দ্বিজের পক্ষে বিদ্যালাভ এইরূপে একান্ত আবশ্যক—compulsory হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহীর পক্ষে বিবাহ যেমন compulsory, বিদ্যালাভও সেইরূপ compulsory; কেন না, মূর্খের বিবাহ নিষিদ্ধ। এ-কালে সাধারণ লোকশিক্ষা (mass education) বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব হইতেছে, কিন্তু কিরূপে compulsory করা যাইবে, তাহার উপায় হইতেছে না; রাষ্ট্রশক্তিকে এজন্য আহ্বান করা হইতেছে। সে-কালে শাস্ত্রকারদের ব্যবস্থায় বিদ্যালাভ compulsory করা হইয়াছিল; বেদবিদ্যা লাভে অর্থাৎ সে-কালের উচ্চতম বিদ্যা লাভে বাধ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিবাহ আটকাইয়া এ-কালের বিশ্ববিদ্যালয়

এ-কালের উচ্চশিক্ষালাভে সেরূপে বাধ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন কি না, মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলার মহোদয় তাহা বিবেচনা করিবেন।

ভারতবর্ষের এই যে অতি পুরাতন সমাজ, থিয়োরি অনুসারে যে সমাজে অশিক্ষিত ব্যক্তির স্থান ছিল না, যে সমাজে অশিক্ষিত ব্যক্তি গৃহী বা গৃহপতি হইতে পারিত না, গৃহস্থের অধিকার পাইত না, ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার পাইত না, সমাজমধ্যে পতিতপ্রায় হইয়া থাকিত, সেই সমাজই দ্বিজাতি-সমাজ। সেই সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিই দ্বিজ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনের যে-কোনও বর্ণেরই হউক, অথবা যে-কোনও মিশ্র-বর্ণেরই হউক, সে-ই দ্বিজ। যে একবার নৈসর্গিক মানবজন্ম পাইয়াছে; আর একবার বেদবিদ্যা লাভে সংস্কৃত হইয়া, বিশুদ্ধ হইয়া, পূত হইয়া দ্বিতীয় জন্ম, নূতন সামাজিক জন্ম পাইয়াছে, সেই ব্যক্তিই দ্বিজ। যে ব্রাহ্মণ অপরের ছেলে পড়ায়, অপরকে ধর্ম্মকর্ম্ম করায়, সে দ্বিজ। যে ক্ষত্রিয় রাজকার্য্য করে বা লড়াই করে, সে দ্বিজ। আর যে বৈশ্য গরু চরায়, লাঙ্গল ধরিয়া আপন জমিতে চাষ করে বা দোকান রাখে, সেও দ্বিজ। সমুদয় বেদবিদ্যায়, বেদের ষোল আনা কর্ম্মকাণ্ডে এবং জ্ঞানকাণ্ডে ইহাদের সকলেরই ষোল আনা অধিকার জন্মিয়াছে। সেই অধিকারে কেহ তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে না। সমাজস্থিতির জন্য ও লোকস্থিতির জন্য তাহাকে কতকগুলি সামাজিক বিধি মানিয়া চলিতে হইত, কতকগুলি কৃত্রিম অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে হইত। এই কৃত্রিম অনুষ্ঠানগুলির সাধারণ নাম যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের তাৎপর্য্য না বুঝিলে বেদপন্থী দ্বিজাতি-সমাজের নিগূঢ় তথ্য বুঝা যাইবে না, বেদপন্থী সমাজের জ্ঞানের ইতিহাস এবং কর্ম্মের ইতিহাস সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যাইবে না, ভারতবর্ষের ইতিহাসের যাহা বিশিষ্টতা, তাহা বুঝা যাইবে না। অতএব আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, আপনারা অবধান করুন; আমি যজ্ঞের কথা বলিব।

মনে রাখিবেন, সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে মনুষ্য-সমাজ একটা কৃত্রিম যন্ত্র। সর্ব্বত্রই কতকগুলি কৃত্রিম অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়া সমাজবন্ধনের চেষ্টা হইয়াছে। সমাজ-যন্ত্রের জটিলতা কোথাও অধিক, কোথাও অল্প। তদনুসারে এই সকল কৃত্রিম অনুষ্ঠানগুলিরও কোথাও বহুলতা, কোথাও অল্পতা। বহু স্থলে এই সকল অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। এক কালে হয়ত একটা তাৎপর্য্য ছিল, এখন তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া ঐ সকল অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করেন। আজকাল anthropology অর্থাৎ মানববিদ্যা একটা বিজ্ঞানবিদ্যায় দাঁড়াইয়াছে। মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বনে মানবসমাজের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য অন্বেষণ করেন। মুখ্যতঃ দুইটা পথ অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম, তুলনামূলক আলোচনা। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে যে সকল অনুষ্ঠান বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে একত্র করিয়া তুলনায় আলোচনা করিতে হয়। কোথায় সাদৃশ্য, কোথায় বৈষম্য আছে, কতটুকু সাদৃশ্য, কতটুকু বৈষম্য আছে, তাহা আলোচনা করিতে হয়। এইরূপ আলোচনায় অনেক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয়, ঐতিহাসিক আলোচনা। কোনও একটা সমাজে অতি প্রাচীন কালে কিরূপ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, সেই দেশের পুরাতন ইতিবৃত্ত থাকিলে, পুরাতন সাহিত্য থাকিলে, তন্মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। যে দেশে ধারাবাহিক সাহিত্য বা ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত আছে, সে দেশের পুরাতন অনুষ্ঠানগুলি কিরূপে ক্রমশঃ বিকৃতি বা পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা দেখিতে পারিলে অনুষ্ঠানগুলির তাৎপর্য্য বুঝা যায়। দেখা যায়, বর্ত্তমানে যে অনুষ্ঠানের কোনও মানে বুঝা যায় না, এক কালে তাহার একটা মানে ছিল। বর্ত্তমানে যাহা নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন এবং নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়, এক কালে তাহার একটা উদ্দেশ্য—একটা অর্থ ছিল। একটা প্রচলিত দৃষ্টান্ত দিব। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন, ইংরেজেরা বড়দিনের উৎসবে mistletoe নামক লতা দিয়া ঘর সাজাইয়া থাকেন। অন্য লতায় না সাজাইয়া মিসিলটো দিয়া কেন সাজান হয়, এখন তাহার কোনও মানে পাওয়া যায় না। কিন্তু অতীত ইতিহাসে ইহার তাৎপর্য্য পাওয়া যায়। ইংরেজের দেশে যখন ইংরেজের আবির্ভাব হয় নাই, তখন ব্রিটনেরা ওক গাছের পূজা করিত। মিসিলটো লতা ওক গাছে পরগাছা হইয়া জন্মে। সে-কালের ব্রিটনেরা সেই লতার অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিত। বড়দিনে সূর্য্য উত্তর মুখে ঘুরিলে নব বর্ষের উৎসবে ড্রুইডেরা সমারোহ সহকারে ওক গাছ হইতে সেই লতা কাটিয়া আনিত এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া যজমানদিগকে বিতরণ করিত। মিসিলটো ঘরে থাকিলে ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকিত। মিসিলটো সর্ব্বব্যাধিবিনাশক। অতএব উহা ঘরে ঘরে সযত্নে রাখা হইত। এখন সে ড্রুইডও নাই, সে ব্রিটনও

নাই ; মিসিলটোর মাহাত্ম্যেও কেহ বিশ্বাস করে না। কিন্তু ব্রিটন দেশ যাহারা দখল করিয়া বাস করিয়াছে, প্রাচীন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, সেই বিজেতা ইংরেজেরাও এখনও সেই বড়দিনের উৎসবে পরাজিত ব্রিটনদের সেই পুরাতন প্রথা ত্যাগ করিতে পারে নাই। এখন এই অনুষ্ঠান তাৎপর্য্যহীন ; কিন্তু এক কালে উহার বৃহৎ তাৎপর্য্য ছিল। ইতিহাস আলোচনায় তাহা আবিষ্কৃত হয়। ঐ বড়দিনের উৎসবটাই দেখুন না। তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, বড়দিনের উৎসব সকল জাতির মধ্যেই কোন-না-কোনও আকারে বিদ্যমান আছে। সূর্য্য দক্ষিণ মুখে চলিতে চলিতে একদিন উত্তর মুখে ফেরে ; অতি অসভ্য জাতিও সেই দিনটাকে লক্ষ্য করে। সেই দিন শীত ঋতুর অবসান সূচনা করে। সমস্ত পৃথিবী মূর্ত্তি বদলাইবার উদ্‌যোগ করে। সে দিনটা সকলেরই পক্ষে আনন্দের দিন, উৎসবের দিন। আমরাও উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে নানা পুণ্য কর্ম্ম করি। পৌষ মাস পুণ্য মাস। পৌষ মাসে লক্ষ্মীপূজা, পিঠাপার্ব্বণের উৎসব। যীশুখ্রীষ্টের কোন্ তারিখে জন্ম হইয়াছিল, কোনও খ্রীষ্টান তাহা জানে না। কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, মানব জাতির ইতিবৃত্তে একটা নূতন পরিচ্ছেদ প্রবর্ত্তন করিলেন। খ্রীষ্টানেরা কল্পনা করিয়া লইল, ঐ বড়দিনে চরাচর পৃথিবী যখন নব জীবনের উদ্যম করে, সেই দিনই খ্রীষ্টের জন্ম হইয়াছিল। খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বড়-দিনের উৎসবে যে উৎসব অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তাহাকেই বিকৃত এবং রূপান্তরিত করিয়া খ্রীষ্টের জন্মোৎসবে পরিণত করা হইল। যাহার তাৎপর্য্য ছিল একরূপ, তাহাতে তাৎপর্য্য দেওয়া হইল অন্যরূপ।

এই দৃষ্টান্ত হইতেই বৈজ্ঞানিক রীতির পরিচয় পাইবেন। বর্ত্তমান কালে anthropology বিদ্যাটা খুব বড় বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার মধ্যে যতটা আস্ফালন আছে, ততটা ফল ধরে নাই। এখনও উহার পদে পদে মতদ্বৈধ আর সংশয়। পণ্ডিতে পণ্ডিতে এত মতভেদ যে, কোনও সিদ্ধান্তকে একবারে চাপিয়া ধরা যায় না। তাহাতে দুঃখিত হইবার কোনও কারণ নাই। এ বিদ্যা এখন বিজ্ঞান-বিদ্যা। বিজ্ঞান-বিদ্যার ইহা দোষও বটে, গুণও বটে। কোন সিদ্ধান্তকে একবারে পাকা করিয়া ধরা বিজ্ঞান-বিদ্যার স্বভাব নয়। জ্ঞানের বিস্তারের সহিত প্রত্যেক সিদ্ধান্তকেই পূর্ণতার এবং পরিণতির দিকে লইয়া যাওয়াই বিজ্ঞান-

বিদ্যার কাজ। বিজ্ঞান-বিদ্যা যে পথে চলিতেছে, সেই পথেই তাহাকে চলিতে হইবে। বিজ্ঞান-বিদ্যার পক্ষে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। উহা সংশয়ের পথ, দ্বৈধের পথ। অথচ উহাই এক মাত্র পথ।

গোঁড়া খ্রীষ্টানকে যদি বলা যায় যে, তাঁহাদের বড়দিনের উৎসবের সহিত যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কোনও সম্পর্ক নাই, উহা খ্রীষ্টানের বিশিষ্ট উৎসব নহে, মনুষ্যসাধারণের উৎসব, তাহা হইলে তিনি হয়ত চটিয়া যাইবেন। তাঁহার আজন্ম বিশ্বাস যে, ঐ সময়েই খ্রীষ্টের জন্ম হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাসের অনুরোধেই তিনি ঐ উৎসব অনুষ্ঠানে সমস্ত শ্রদ্ধা অনুরাগ অর্পণ করিয়াছেন। সেই বিশ্বাসের মূল শিথিল করিয়া দিলে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গ্রন্থিও শিথিল হইয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকেরা সহস্র প্রমাণ উপস্থিত করিলেও তিনি ঐ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবেন। ফলে মানুষের conductএর উপর, কর্ম্মের উপর প্রজ্ঞার—Reasonএর প্রভুত্ব বড় অধিক নহে। সংস্কার এবং বিশ্বাস প্রকৃত পক্ষে মনুষ্য-জীবনের নিয়ামক। প্রজ্ঞা ভুল-ভ্রান্তি দেখাইয়া মানুষকে শাসনে আনিতে চায় বটে, সংযত করিতে চায় বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হয় না। কর্ম্মপথে বাহির হইয়া মানুষ সহজে প্রজ্ঞার শাসন মানিতে চায় না। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিজ্ঞান-বিদ্যার সহিত রিলিজনের যে একটা বিরোধ আছে, যে বিরোধ কখন মিটিবার নহে, তাহার মূল এইখানে। সামাজিক মনুষ্যের কর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে এ কথাটাকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। বিজ্ঞান-বিদ্যা যাহাই বলুন, মানুষ তাহার সংস্কারকে এবং বিশ্বাসকে আপনার ধাতুর সহিত, আপনার প্রকৃতির সহিত সমঞ্জস করিয়া বাঁধিয়া লয় এবং তদনুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে। অধিকাংশ সামাজিক অনুষ্ঠানের ইতিবৃত্ত জানা যায় না। অবৈজ্ঞানিক মানুষ তাহা জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রও নহে। কিন্তু সে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের একটা মনগড়া তাৎপর্য্য আরোপ করিয়া সেইটাকেই আঁকড়াইয়া থাকে। যে ব্যক্তির কল্পনার দৌড় নাই, সে অপরের প্রদত্ত অর্থ মানিয়া লইয়া তাহাকেই জড়াইয়া থাকে। যাঁহাদের কল্পনার দৌড় অধিক, তাঁহারা নানারূপ তাৎপর্য্যের আরোপ করেন এবং ইতর সাধারণে সেই সকল আরোপিত তাৎপর্য্য গ্রহণ করে।

আর্য্যজাতির যে শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া বেদপন্থী সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠানই ছিল যজ্ঞ। ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে আরও প্রাচীন কালে যাইতে হয়। ভারতীয় এবং পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থে তুলনামূলক আলোচনায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যেতর অন্যান্য জাতির মধ্যেও যজ্ঞানুষ্ঠান কোনও-না-কোনও প্রকারে বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে, তাহাও আপনারা জানেন। এ-সব আপনাদের জানা কথা। ইহা লইয়া আমি আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। ভারতবর্ষে বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠান কালক্রমে অত্যন্ত পল্লবিত হইয়া অত্যন্ত জটিলতা পাইয়াছিল। বহু অনুষ্ঠানের গোড়ার তাৎপর্য্য লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাৎপর্য্য আরোপ করিবার লোকের অভাব ছিল না। কল্পনা-শক্তিতে ভারতবর্ষের লোক কোনও দেশের লোকের নিকট কখনও হারি মানে নাই। আপনারা বেদের ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের নাম শুনিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি মুখ্যতঃ যজ্ঞের বিবরণে পরিপূর্ণ। কোন্ যজ্ঞে কি কি অনুষ্ঠান, তাহা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থমধ্যে বিবৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ যাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ছিল ব্রহ্মবাদী। তাঁহাদের কল্পনার দৌড় অসীম ছিল। কোনও স্থানেই তাঁহারা পিছ-পা হইতেন না। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন, তাঁহারা অনুষ্ঠানগুলির পর পর বিবরণ দিয়া যাইতেছেন এবং কোন্ অনুষ্ঠানের কি অর্থ, কি তাৎপর্য্য, তাহা অসঙ্কোচে দ্বিধাহীন চিত্তে নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেছেন; অত্যন্ত সরল ভাবে আপন আপন মত প্রকাশ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা বলিয়া যাইতেছেন; তাঁহাদের মুখ হইতে যে সকল বাক্য বাহির হইতেছে, তাঁহারা যেন তাহাদের জন্য আদৌ দায়ী নহেন। ঐ সকল বাক্যের অনুকূলে কোনও যুক্তি-তর্ক আছে কি না, ঐ সকল বিচারসহ হইবে কি না, ইহা বিবেচনা করিতে তাঁহাদের অবসর মাত্র নাই। ভিতর হইতে কে যেন তাঁহাদিগকে বলাইতেছেন, তাঁহারা বলিয়া যাইতেছেন। স্থানে স্থানে দেখা যায়, দুই জন ব্রহ্মবাদী দুই রকমের তাৎপর্য্য দিতেছেন। এক জন অপরের কথা খণ্ডন করিতেছেন। কিন্তু তাহাতেও কোনও পক্ষেরই কোনরূপ সঙ্কোচ নাই। উভয় পক্ষই আপনার কথা সমান জোরে বলিয়া যাইতেছেন। উভয়ের বাক্যই বেদবাক্য।

বেদ কাহাকে বলে, যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি তাহার উত্তর দিতে পারিব না। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও ইহার উত্তর দিতে পারেন নাই। তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদের দুই ভাগ—মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ, এই দুই লইয়াই বেদ। সামাজিকের পক্ষে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভয়ই তুল্যমূল্য, উভয়ই বেদবাক্য, উভয়ই নিত্য এবং অপৌরুষেয়; কোনও ব্যক্তিবিশেষের মন-গড়া বাক্য নহে। ব্যক্তিবিশেষে উহা প্রচার করিয়াছে মাত্র। যাঁহারা এই মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদেরই নাম ঋষি। বেদের মন্ত্রগুলিকে তিন শ্রেণীতে ফেলা হয়—ঋক্, যজুঃ, এবং সাম। ঋক্ মন্ত্রগুলি ছন্দে বাঁধা বাক্য, এ-কালে যাহাকে পদ্য বলে; ইংরেজীতে verse বলা যাইতে পারে। যজুর্মন্ত্রগুলি ছন্দে বাঁধা নহে। ওগুলি গদ্য মন্ত্র, ইংরেজীতে prose formula বলা হয়। সাম মন্ত্র বলিয়া পৃথক্ মন্ত্র নাই। ঋক্ মন্ত্রকে কোনও একটা সুর দিয়া গাহিলেই উহা সাম মন্ত্রে পরিণত হয়। কোনও একটা verseএর বা পদ্যের ছন্দ বজায় রাখিয়া আওড়াইলে হয় ঋক্, আর সুর দিয়া গাইলেই হয় সাম। যাজ্ঞিকেরা নিগদ মন্ত্র এবং প্রৈষ মন্ত্র বলিয়া আর এক শ্রেণীর মন্ত্রের উল্লেখ করেন। কিন্তু সেগুলিও গদ্যময় বাক্য। অতএব তাহাদিগকে যজুর্মন্ত্রের প্রকারভেদ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ফলে ঋক্, যজুঃ আর সাম, এই তিন শ্রেণীর মন্ত্র ব্যতীত আর চতুর্থ শ্রেণীর মন্ত্র নাই। এই জন্যই মন্ত্রাত্মক বেদ-বিদ্যাকে ত্রয়ী বিদ্যা বলে। বেদ তিনখানা না চারিখানা, এই লইয়া একটা তর্ক আছে। আপনারা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চারি বেদের কথা শুনিয়াছেন। এ-কালের অনেক পণ্ডিতেরা বলেন,—ঋক্, যজুঃ, সাম, এই তিন বেদই প্রাচীন বেদ। চতুর্থ অথর্ব্ব বেদকে পরবর্ত্তী কালে জোর করিয়া বেদের মধ্যে ফেলা হইয়াছে। এরূপ ভাবে ধরিলে উত্তরটা ঠিক হয় না। আসল কথা এই যে, বেদের মন্ত্র তিন শ্রেণীর, কিন্তু বেদমন্ত্রের সংহিতা চারিখানা। বেদমন্ত্রের সংগ্রহের নাম সংহিতা। অধিকাংশ ঋক্ (মন্ত্র) একত্র সংগ্রহ করিয়া যে গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাই ঋক্সংহিতা। ঐরূপ যজ্ঞে ব্যবহার্য্য যজুর্মন্ত্রের সংগ্রহ একত্র করিয়া যজুঃসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। যে সকল ঋক্ যজ্ঞানুষ্ঠানে গান করিতে হইত, সেইগুলিকে একত্র সংগ্রহ করিয়া সামসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। এইরূপে সঙ্কলিত মন্ত্র ছাড়া আরও কতকগুলি

অতিরিক্ত মন্ত্র ছিল, যেগুলি সাধারণ যজ্ঞকার্য্যে ব্যবহৃত হইত না, যেগুলি শান্তি স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। সেইগুলিকে একত্র করিয়া অথর্ব্বসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই অথর্ব্বসংহিতারও অধিকাংশ মন্ত্র ঋক্ মন্ত্র। ফলে ঋক্, যজুঃ, সাম ছাড়া আর চতুর্থ শ্রেণীর মন্ত্র নাই। বেদমন্ত্র তিন শ্রেণীর, কিন্তু বেদমন্ত্রের সংহিতা বা collection চারিখানি। প্রত্যেক মন্ত্র কোনও-না-কোনও সময়ে কোনও-না-কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। প্রচারিত হইয়াছিল বলিলাম ; কেন না, কোন ব্যক্তি কোন বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন, এ কথা বেদপন্থী কিছুতেই বলিতে চাহিবেন না। যিনি যে মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি। যে মন্ত্রে যে দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সেই মন্ত্রের সেই দেবতা। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মন্ত্রের কোনও-না-কোনও কর্ম্মে, কোনও-না-কোনও অনুষ্ঠানে, বিনিয়োগ হইত। যাজ্ঞিকদের মতে প্রত্যেক মন্ত্রই কোনও-না-কোনও কাজে লাগিবে, কোনও-না-কোনও অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইবে। অকেজো মন্ত্রের কোনও সার্থকতা নাই। অতএব শুধু মন্ত্রের সংহিতা লইয়া, মন্ত্রের সংগ্রহ-গ্রন্থ লইয়া সমাজের বিশেষ কোনও লাভ নাই। সামাজিকের জন্য বেদমন্ত্রগুলির সার্থকতা দেখাইতে হইবে। এই জন্য ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের আবশ্যকতা। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে দেখান হইয়াছে—কোন্ মন্ত্র কোন্ কর্ম্মে প্রযুক্ত হয় ; কখন্ কি ভাবে প্রযুক্ত হয় ; সেই কর্ম্মে সেই মন্ত্রের সার্থকতা কি ; অন্য মন্ত্রের প্রয়োগ না হইয়া সেই মন্ত্রেরই প্রয়োগ হইল কেন। এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে পাওয়া যায়। যে সকল ব্রহ্মবাদী এই সকল ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারাও ঋষি। তাঁহারাও যেন ভিতরের প্রেরণাবলে মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ এবং মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য জানিতে পারিয়াছিলেন এবং যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই সমাজের কল্যাণের জন্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই ভিতরের প্রেরণা, এই inspiration সকলের নাই। অতএব মন্ত্র যেমন বেদবাক্য, মন্ত্র সম্পর্কে যে ব্রাহ্মণ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও বেদবাক্য। অতএব মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ, এই উভয় লইয়াই বেদ।

ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, আমাদের বেদপন্থী সমাজের ভিত্তি এই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত বেদপন্থী সমাজ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিকে বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে এবং তদনুসারে সমাজের

ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে যে সকল বিধিনিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে, বেদপন্থী সমাজের সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল সেইখানে। এমন কি, স্পষ্ট করিয়া বলা হয়, বেদবাক্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থোক্ত বাক্য স্বতঃপ্রমাণ। উহাকে মানিয়া লইতেই হইবে। প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের কোনও বাক্যের সহিত যদি সেই বেদবাক্যের বিরোধ থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রের সেই সব বাক্য অগ্রাহ্য। আগেই আপনাদিগকে বলিয়াছি, ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের প্রচারকর্ত্তা ব্রহ্মবাদীদের মধ্যেও প্রচুর মতভেদ ছিল। একই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল। অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিধিনিষেধেরও ভিন্নতা ছিল। অথচ প্রত্যেকের উক্তিই বেদবাক্য। এই বেদবাক্যের সামঞ্জস্য সাধন করিবার জন্য পরবর্ত্তী পণ্ডিতদিগকে মাথা ঘামাইতে হইয়াছিল। পরস্পরবিরোধী বিধিনিষেধ-বাক্যের কোনরূপ সামঞ্জস্য সাধন না করিলে সামাজিক লোক কোন্ পথে চলিবে? এই সামঞ্জস্য সাধনের জন্য বেদবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া কর্ম্মমীমাংসার জন্য দর্শনশাস্ত্রের একটা বিপুল শাখার সৃষ্টি হইয়াছিল।

মীমাংসাদর্শন বলিলে আমরা এই দর্শনকেই বুঝি। পরস্পরবিরোধী বেদবাক্যের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য মীমাংসাদর্শন যে সকল rule বা canon প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সমস্ত বেদপন্থী সমাজ তাহা মানিয়া লইয়াছে। আমাদের সমাজে প্রচলিত Jurisprudenceএর ভিত্তিপত্তন ঐখানে। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে কর্ত্তব্য বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলেই মীমাংসা-দর্শনের দোহাই দিতে হয়, এবং মীমাংসাদর্শনের সূত্রগুলির প্রয়োগ করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হয়। সকল দেশে সকল সমাজে লোকস্থিতি কতকগুলি কৃত্রিম conventionএর উপর স্থাপিত। সামাজিক অনুষ্ঠান-সকলের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি যাহাই হউক, উহাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি কার্য্যতঃ কতকগুলি conventionএর উপর, কতকগুলা fictionএর উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজের অধিকাংশ লোকে যাহা মানিয়া লয়, তাহা বিজ্ঞানসম্মত হউক আর না হউক, তাহাই সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি। ব্যবহারশাস্ত্রবিদেরা অর্থাৎ আইনজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই সকল fictionএর কথা বেশ জানেন। এ বিষয়ে আমার বাগ্‌বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

যজ্ঞের কথায় ফিরিয়া আসা যাক। 'যজ্ঞ' শব্দটা কখন অতি সঙ্কীর্ণ এবং কখন অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত। যাজ্ঞিক পণ্ডিতেরা যজ্ঞ

শব্দের একটা অর্থ দিয়াছেন। দেবতার উদ্দেশে কোনও দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ। এখানে তিনটি শব্দ পাওয়া যাইতেছে। দেবতা, দ্রব্য এবং ত্যাগ। এই তিনটি শব্দেরই সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থ আছে, এবং অত্যন্ত ব্যাপক অর্থও আছে। আমি যজ্ঞের তাৎপর্য্য অন্বেষণে উপস্থিত হইয়াছি। সঙ্কীর্ণ এবং ব্যাপক উভয় অর্থই আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমে সঙ্কীর্ণ অর্থ ই গ্রহণ করিব; তার পর ক্রমশঃ ব্যাপক অর্থে আসা যাইবে। সঙ্কীর্ণ অর্থে দেবতা, দ্রব্য ও ত্যাগ বলিলে কি বুঝায়, স্থূলতঃ তাহা আপনারা জানেন। বেদে নানা দেবতার উল্লেখ আছে। ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বিষ্ণু, রুদ্র ইত্যাদি। এই সকল দেবতার উদ্দেশে কোনও-না-কোনও দ্রব্য ত্যাগ করা হইত। ত্যাগকর্ম্মের নাম আহুতি। যে দ্রব্য ত্যাগ করা হইত, তাহা হব্য। নানাবিধ দ্রব্য হব্যরূপে দেওয়া হইত। দৃষ্টান্ত, আজ্য অর্থাৎ যজ্ঞার্থ সংস্কৃত ঘৃত, চরু বা পায়সান্ন, দুধ, দই, পুরোডাশ বা রুটি, পশুমাংস, সোমলতার রস ইত্যাদি। এই দ্রব্য-ত্যাগকর্ম্মের নামই যাগ। যে গৃহস্থের হিতার্থে যাগ অনুষ্ঠিত হইত, তিনি যজমান। যিনি যজমানের হিতার্থে এই যাগকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন, তিনি যাজক বা ঋত্বিক্। যাগকর্ম্মের প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক করিতে হইত। প্রত্যেক কর্ম্মেরই নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র ছিল। আগেই বলিয়াছি, কর্ম্মে প্রযুক্ত হয় বলিয়াই মন্ত্রের সার্থকতা। যে মন্ত্র কোনও কাজে লাগে না, সে মন্ত্র নিরর্থক। মন্ত্র তিন শ্রেণীর,—ঋক্, যজু, সাম। যে সকল যজ্ঞে এই তিন শ্রেণীর মন্ত্রের ব্যবহার ছিল, সেখানে এক জন যাজকে কাজ চলিত না। একাধিক যাজক আবশ্যক হইত। কোন ঋত্বিক্ ঋক্ মন্ত্র আওড়াইতেন—স্পষ্ট ভাবে—উচ্চৈঃস্বরে। কেহ বা যজুর্ম্মন্ত্র আওড়াইতেন—নিম্নস্বরে। কেহ বা সাম মন্ত্র গান করিতেন। বড় বড় যজ্ঞে এই তিন শ্রেণীর যাজক বা ঋত্বিক্ আবশ্যক হইত;—ঋগ্‌বেদী, যজুর্ব্বেদী ও সামবেদী। ঋগ্‌বেদী প্রধান যাজকের নাম ছিল হোতা। ইনি ঋক্ মন্ত্র আওড়াইতেন। হোতা শব্দে আপনারা হোমকারী বুঝিবেন না। হোতা শব্দ আহ্বানার্থক হ্বে ধাতু হইতে উৎপন্ন। যিনি ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞস্থলে দেবতাকে আহ্বান করেন বা ডাকিয়া আনেন, তিনিই হোতা। হোতাকে আহুতি দিতে হইত না। যিনি আগুনে আহুতি দিতেন, তাঁহার নাম অধ্বর্য্যু। তিনি অগ্নিতে হব্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিতেন এবং তাঁহাকেই যজ্ঞের উপযোগী হব্য দ্রব্য প্রস্তুত

করিতে হইত। এই সকল কর্ম্মে তাঁহাকে যজুর্মন্ত্র আওড়াইতে হইত। কাজেই অধ্বর্য্যু যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্। বড় বড় যজ্ঞে আহ্বানকর্ত্তা হোতার এবং আহুতিদাতা অধ্বর্য্যুর অন্যান্য সহকারী থাকিতেন। সাম গানের জন্য প্রধান ঋত্বিকের নাম উদ্গাতা। যজ্ঞবিশেষে তাঁহারও সহকারী আবশ্যক হইত। ঋগ্বেদী, যজুর্ব্বেদী এবং সামবেদী, এই তিন শ্রেণীর ঋত্বিকের কর্ম্ম পরিদর্শনার্থ, তাঁহাদের ভুলভ্রান্তি সংশোধনার্থ আর একজন প্রধান ঋত্বিক্ থাকিতেন। তাঁহার নাম ব্রহ্মা। এক হিসাবে তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি সকলের কর্ম্ম পরিদর্শন করিবেন। অতএব তিন বেদেই তাঁহার অভিজ্ঞতা আবশ্যক। তিনি ত্রিবেদজ্ঞ হইবেন। ব্রহ্মা নামেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা হইতেছে। কেন না, সে-কালে বেদবাক্যের নামই ছিল ব্রহ্ম। ব্রহ্মবাক্যের তাৎপর্য্য যাহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বেদের সেই অংশের নাম ব্রাহ্মণ। যাঁহারা ব্রহ্মবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝাইতেন, তাঁহারা ব্রহ্মবাদী। বেদপন্থী সমাজে যে বর্ণের লোকের উপর এই ব্রহ্মবাক্য রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল, সেই বর্ণের নামও ব্রাহ্মণ। অতএব ঋত্বিক্দিগের মধ্যে যিনি ত্রিবেদজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ, তাঁহারই নাম ব্রহ্মা। যজ্ঞবিশেষে এই ব্রহ্মারও সহকারী আবশ্যক হইত।

যজ্ঞ মাত্রেই কর্ম্ম এবং প্রত্যেক কর্ম্মেরই কোনও-না কোনও ফল আছে। সেই ফল ইহলোকেও পাওয়া যাইতে পারে, পরলোকেও পাওয়া যাইতে পারে। কোন্ কর্ম্মের কি ফল, তাহা যুক্তির দ্বারা পাওয়া যায় না, তাহা বিচার করিয়া পাওয়া যায় না। কোন্ কর্ম্মের কোন্ ফল, তাহা ব্রহ্মবাদী ঋষিরা তাঁহাদের বিশিষ্ট শক্তির দ্বারা—inspirationএর দ্বারা জানিতে পারিতেন। যজমানের হিতার্থ যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। সপত্নীক যজমান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন; উভয়ে তুল্যরূপে ফলভাগী হইতেন। যজমানের পত্নী যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহাকে কোনও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত না। বেদমন্ত্র যথারীতি অভ্যাস করিতে হইলে আচার্য্যগৃহে গিয়া বহু বৎসর বাস করিতে হইত। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে সেরূপ আচার্য্য-গৃহবাসের সুবিধা বা সম্ভাবনা না থাকায় স্ত্রীজাতিকে ক্রমশঃ বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকারে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে দেখিতে পাই, নারীগণেও বেদমন্ত্র প্রচার করিতেছেন, নারীগণের মধ্যেও ঋষি আছেন, ব্রহ্মবাদিনী আছেন। এমন কি, আচার্য্যগৃহে উপনীত হইয়া বেদের

কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড আলোচনা করিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কিন্তু এ-কালে যেমন licensed residenceএ বাস না করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অধিকার জন্মে না, সেইরূপ বিনা উপনয়নে অর্থাৎ বিনা আচার্য্যগৃহবাসে বেদবিদ্যা লাভের সুযোগ না ঘটায় স্ত্রীলোকেরা ক্রমশঃ বেদাভ্যাসে সুযোগ ও বেদের উচ্চারণে অধিকার হারাইয়াছিলেন। বেদমন্ত্রের উচ্চারণ নিতান্ত সহজ কথা নহে। যথাযথ উচ্চারণ শিক্ষার জন্য 'শিক্ষা' নামে একটা বেদাঙ্গ বিদ্যারই উদ্ভব হইয়াছিল। বিশেষতঃ বেদের ভাষা যখন অপ্রচলিত হইয়া পড়িল, তখন আচার্য্যের বিনা উপদেশে বেদমন্ত্র যথাযথ উচ্চারণ হইতে পারিত না। আবার যথোচিত উচ্চারিত না হইলে বেদমন্ত্রের ফল পাওয়া যায় না। এমন কি, উলটা ফল হইবারও আশঙ্কা থাকে। 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দের উচ্চারণ-দোষে কিরূপ ফলবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, সে গল্প আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। যজমানের পত্নী বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে না পারিলেও বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মে তাঁহার পূরা অধিকার ছিল। কেন না, পত্নী উপস্থিত না থাকিলে যজ্ঞই চলিত না; পত্নীকেও কয়েকটি অনুষ্ঠান করিতে হইত; এবং যজমান-পত্নীও যজ্ঞফলের সমান ভাগ পাইতেন।

যজ্ঞের মধ্যে কতকগুলি নিত্য—কতকগুলি কাম্য। কাম্য কর্ম্ম স্বেচ্ছাধীন। যিনি বিশেষ কোনও ফল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি তদনুযায়ী কাম্য কর্ম্ম করিবেন; না করিলে কোনও হানি নাই। কিন্তু নিত্যকর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য; না করিলে প্রত্যবায় ঘটে। কিন্তু সেই নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য কোনরূপ রাজদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। সমাজে হয়ত নিন্দা হইত; সমাজে পাতিত্য হইত কি না, তাহা বলিতে পারি না। এদেশের সমাজবিধি কাহাকেও জোর করিয়া কোন কাজ করাইতে চাহে না। নিত্যকর্ম্ম না করিলে যে পাপ, কর্ম্মকর্ত্তা তার ফল ভোগ করিবে। অন্যের তাহাতে যায় আসে কি?

উপনয়নের পর ব্রহ্মচারী আচার্য্যের বাড়ীতে বাস করিতেন। আচার্য্যের বাড়ীতে অগ্নি থাকিত। উহা আচার্য্যের নিজস্ব অগ্নি। ব্রহ্মচারী প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আচার্য্যের সেই অগ্নিতে একখানি কাঠ ফেলিয়া দিতেন। ইহাই তাঁহার সমিৎহোম। যজ্ঞিয় কাঠের টুকরার নাম সমিৎ। আচার্য্যগৃহে বেদাধ্যয়ন শেষ হইলে সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে অথবা সমাবর্ত্তনের

পরে অগ্নি স্থাপন করিতে হইত; পত্নী-গ্রহণকালে এই অগ্নিতেই লাজ-হোমাদি সম্পন্ন করিতে হইত। এই অগ্নির নাম গৃহ্য অগ্নি, আবসথ্য অগ্নি বা স্মার্ত্ত অগ্নি। গৃহস্থাশ্রমের সমুদয় স্মার্ত্ত কর্ম্ম অর্থাৎ পাকযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান এই গৃহ্য অগ্নিতেই সম্পাদিত হইত।

এই পাকযজ্ঞ শব্দটির মানে বুঝা দরকার। এখনও গৃহস্থের ঘরে যাগ যজ্ঞ কিছু-না-কিছু অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্যামাপূজা প্রভৃতি তান্ত্রিক পূজায় হোমের অনুষ্ঠান হয়। এই হোম তান্ত্রিক হোম; ইহা বৈদিক যজ্ঞ নহে। হয়ত ইহা বৈদিক যজ্ঞের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কিন্তু এই তান্ত্রিক হোম ব্যতীত বৈদিক যজ্ঞ কিছু-না-কিছু আজিও প্রচলিত আছে। উপনয়ন, বিবাহাদি সংস্কারে যজ্ঞ করিতে হয়। বৃষোৎসর্গাদি ব্যাপারে যজ্ঞ করিতে হয়। বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয়প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পূর্ত্তকর্ম্মে যজ্ঞ করিতে হয়। এ-সকল যজ্ঞ বৈদিক অনুষ্ঠান। বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে এগুলির নাম গৃহ্য কর্ম্ম বা স্মার্ত্ত কর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর বৈদিক কর্ম্ম ছিল; সেগুলির নাম শ্রৌত কর্ম্ম। অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞের নাম আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। এই সকল যজ্ঞ শ্রৌত যজ্ঞ। শ্রৌত কর্ম্ম উপদেশের জন্য এক প্রস্থ শাস্ত্র আছে, সেইগুলি শ্রৌতসূত্র। আর গৃহ্য কর্ম্ম উপদেশের জন্য আর এক প্রস্থ শাস্ত্র আছে, সেইগুলি গৃহ্যসূত্র। গৃহ্যসূত্রে উপদিষ্ট গৃহ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান এখনও আমরা করিয়া থাকি; এখনও উহা সমাজে চলিত আছে। কিন্তু শ্রৌতসূত্রের উপদিষ্ট শ্রৌত কর্ম্মের অধিকাংশই এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এখন তাহাদের নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। খুব সম্ভব, বৌদ্ধ বিপ্লব এজন্য দায়ী। বৌদ্ধ বিপ্লবের সময়ে বড় বড় ক্ষত্রিয় রাজা, বড় বড় বৈশ্য শ্রেষ্ঠী বৈদিক কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন অথবা তাহাতে শ্রদ্ধা হারাইলেন। অনেকে গুরুগৃহে উপনয়নের পর বেদাভ্যাস ত্যাগ করিলেন; অর্থাৎ পৈতা ফেলিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় শূদ্রাচার অবলম্বন করিলেন। আগে বলিয়াছি, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অনেকে শূদ্রত্ব প্রাপ্তির জন্য দুঃখিত ও পুনরায় দ্বিজত্ব পাইবার জন্য সচেষ্ট; তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই তাঁহাদের এই শূদ্রত্বের জন্য সম্ভবতঃ দায়ী। এই বিপ্লবে যাজকতাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের জীবিকা-লোপের উপক্রম হইল। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, যাহারা বড় লোকের ঘরে যাজকতা করিয়া জীবিকা লাভ করিত, তাহাদের অন্ন-লোপের উপক্রম হইল। আচার্য্যগৃহে বহু বৎসর বাস করিয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ড অভ্যাসের

প্রয়োজন থাকিল না। বহু বৎসর ধরিয়া বেদাভ্যাস বা ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বে যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল, প্রয়োজনের অভাবে তাহা ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িল। উপনয়ন এবং সমাবর্ত্তন কর্ম্মের নাম মাত্র থাকিল না, সার্থকতা থাকিল না। ফলে অভিজ্ঞ যাজকের অভাবে জটিল শ্রৌত অনুষ্ঠানগুলিও অপ্রচলিত অথবা একবারেই লুপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু বেদপন্থী ব্রাহ্মণ বেদকে একবারে ত্যাগ করিতে পারিলেন না; অন্ততঃ গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত যজ্ঞ প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কুশণ্ডিকাদি গৃহ্য যাগ এখনও এখনকার দ্বিজাতি-সমাজে চলিত আছে।

গৃহ্য অগ্নির কথা বলিতেছিলাম। এই অগ্নিতে যাবতীয় গৃহ্য কর্ম্ম অর্থাৎ যাবতীয় গৃহ্যসূত্রোক্ত কর্ম্মের নির্ব্বাহ হয়। গৃহ্য অগ্নি সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার দরকার নাই। যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শ্রৌত অগ্নির কথা এবং শ্রৌত অগ্নিতে সম্পাদ্য শ্রৌত যজ্ঞের কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এই জন্য আপনাদের ধৈর্য্য ভিক্ষা করিতেছি।

এই শ্রৌত অগ্নির ব্যাপার বেদপন্থীর গার্হস্থ্য জীবনে একটা বৃহৎ ব্যাপার। গার্হস্থ্য জীবনের সম্পূর্ণতা লাভের জন্য এই শ্রৌত অগ্নির আবশ্যকতা। কিন্তু শ্রৌত অগ্নি বিবাহের পর স্থাপনীয়। যিনি অবিবাহিত, তাঁহার শ্রৌত অগ্নিস্থাপনে অধিকার নাই। বিবাহের পর গৃহস্থের নাম হইত গৃহপতি। বাড়ীর মধ্যে কোনও স্থানে অগ্নিশালা বা অগ্ন্যাগার স্থায়ী ভাবে নিৰ্ম্মিত হইত। সপত্নীক গৃহস্থ সেই অগ্ন্যাগারমধ্যে যথাবিধি শ্রৌত অগ্নি স্থাপন করিতেন। এই অগ্নিপ্রতিষ্ঠা কর্ম্মের নাম অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধেয়। সংক্ষেপে উহার বিবরণ দিতেছি।

আপনারা তিন অগ্নির নাম শুনিয়াছেন। গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি। এই তিন অগ্নিই শ্রৌত অগ্নি। অগ্নিশালায় চতুষ্কোণ বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার তিন দিকে তিন অগ্নির স্থাপন হইত। বেদির পশ্চিমে গার্হপত্যের স্থান, বেদির পূর্ব্ব দিকে আহবনীয়ের স্থান, এবং দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাগ্নির স্থান। মাটির বেড়া দিয়া অগ্নির স্থান নির্ম্মিত হইত। গার্হপত্যের স্থান চতুর্ভুজাকার, আহবনীয়ের স্থান বৃত্তাকার, দক্ষিণাগ্নির স্থান অর্দ্ধবৃত্তাকার। তিনেরই ক্ষেত্রফল বা area সমান। এক হাত দীর্ঘ, এক হাত বিস্তৃত ক্ষেত্রের সমান। গার্হপত্য অগ্নি গৃহপতির অগ্নি; উহা গৃহপতির

প্রতিনিধি-স্বরূপ। এই অগ্নিকে গৃহের কর্ত্তা বলা যাইতে পারে। আহবনীয় অগ্নি দেবতাদিগের অগ্নি: উহাতেই দেবতাদের উদ্দেশে যাবতীয় দ্রব্যের আহুতি হয়। আহুতি হয় বলিয়াই নাম আহবনীয়। দেবতারা পূর্ব্ব দিকের অধিবাসী, দেবতাদের রাজা ইন্দ্র পূর্ব্ব দিকের অধিপতি। আজিও আমরা পূর্ব্বমুখে বসিয়া দেবতাদের পূজা করি; এই জন্য আহবনীয়ের স্থান পূর্ব্ব দিকে। দক্ষিণ দিক্ পিতৃগণের। পিতৃগণের রাজা যম দক্ষিণ দিকের অধিপতি। দক্ষিণাগ্নিতে পিতৃগণের উদ্দিষ্ট দ্রব্য দেওয়া হয়। অগ্ন্যাধান কর্ম্মের পূর্ব্বদিনে দেহশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত এবং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়া যজমান কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হন। অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ বিহিত স্থান হইতে আগুন আনিয়া গার্হপত্যের স্থানে রাখিয়া দেন। সন্ধ্যাকালে গৃহস্থ ও তাঁহার পত্নী অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া সেইখানেই রাত্রিবাস করেন। এমন এক কাল ছিল, যখন কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন করিতে হইত। যজ্ঞকর্ম্মের সেই প্রাচীন প্রথা পরিত্যক্ত হয় নাই। ইহাকে বলে survival in culture; সামাজিক অনুষ্ঠানে, বিশেষতঃ সামাজিক ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোনও দেশেই লোকে প্রাচীন প্রথা সহজে ত্যাগ করিতে চাহে না। পুরাতনের মোহ কাটাইতে চায় না। শমীবৃক্ষের পরগাছারূপে যে অশ্বত্থ গাছ জন্মে, উহার কাঠ ঘষিলে সহজে আগুন জন্মে। ঐ কাঠে দুইখানি অরণি প্রস্তুত হয়। অরণিদ্বয় অগ্নিশালাতেই রাত্রির মত রক্ষিত হয়। গার্হপত্যে যে আগুন রাখা হইয়াছিল, তাহাতে সমিৎ অর্থাৎ কাষ্ঠখণ্ড প্রক্ষেপ করিয়া জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। যজমান রাত্রি জাগিয়া উহা জ্বালাইয়া-রাখেন। প্রাতঃকালে অধ্বর্য্যু সেই অগ্নি নিবাইয়া দেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরণি ঘর্ষণের দ্বারা নূতন আগুন উৎপাদন করিতে হয়। এই কর্ম্মের নাম অগ্নিমন্থন। অগ্নিমন্থনের পূর্ব্বে একটি ঘোড়া আনিয়া রাখিতে হয়। যজমান একখানি অরণি ধরিয়া বসেন। দ্বিতীয় অরণি দ্বারা প্রথমে তাঁহার পত্নী, পরে অধ্বর্য্যু অগ্নি উৎপাদন করেন। মাটির খাপরায় গোবরের ঘুঁটা রাখিয়া তাহাতেই সেই মন্থনোৎপন্ন অগ্নি গ্রহণ করা হয়। যজমান উহাতে ফুঁ দিয়া জ্বালাইয়া দেন। অধ্বর্য্যু সেই আগুনে যজ্ঞীয় কাঠ জ্বালাইয়া গার্হপত্যে রাখেন। ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ সেই সময়ে সাম গান করেন। গার্হপত্যের অগ্নি লইয়া অধ্বর্য্যু আহবনীয় স্থানে চলেন। ঘোড়াটি আগে আগে চলে। যজমান চলেন ঘোড়ার

পশ্চাতে। ব্রহ্মা সাম গাইতে থাকেন। আহবনীয়ের স্থানে একটি পা রাখিয়া ঘোড়াটি পশ্চিমমুখে দাঁড়াইয়া থাকে। ঘোড়ার সেই পায়ে সেই অগ্নি স্পর্শ করাইয়া অধ্বর্য্যু সেই আগুন আহবনীয়ে রাখিয়া দেন। ব্রহ্মা তখন আবার সাম গান করেন। এইরূপে গার্হপত্য এবং আহবনীয় অগ্নির স্থাপন হইলে অধ্বর্য্যু পুনরায় গার্হপত্য হইতে আগুন লইয়া দক্ষিণাগ্নির স্থানে রাখিয়া দেন। এইরূপে তিন অগ্নি স্থাপনের পর ব্রহ্মা তিন বারে তিনটি সাম গান করেন। তৎপরে সকলে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া ঘোড়াটিকে ছাড়িয়া দেন। তৎপরে পূর্ণাহুতি হোম। গার্হপত্যের আগুনে খানিকটা ঘি গরম করা হয়। অধ্বর্য্যু জুহূ নামক কাঠের হাতা দ্বারা সেই ঘি লইয়া আহবনীয়ের পার্শ্বে বসিয়া যজুর্মন্ত্র পড়িয়া আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দেন। যজমান তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকেন। ইহাই হইল পূর্ণাহুতি। এই পূর্ণাহুতিতেই অগ্ন্যাধান কর্ম্ম সমাপ্ত হয়। অগ্ন্যাধানের পর কয়েক দিন যজমান ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। গার্হপত্যের আগুন দিবারাত্রি জ্বলিতে থাকে। উহাকে নিবাইতে দেওয়া হয় না। উহা নিবাইলে প্রত্যবায় ঘটে। আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি দিবারাত্রি জ্বলে না, আবশ্যক মত গার্হপত্য হইতে আগুন আনিয়া ঐ দুই অগ্নি জ্বালান হয়, এবং তাহাতে দেবতাগণের উদ্দেশে বা পিতৃগণের উদ্দেশে যাগ হয়।

এই অগ্ন্যাধান কর্ম্ম যজমানের জীবনে অতি প্রধান কর্ম্ম। অগ্ন্যাধানের পর তাঁহার বিশেষণ হয় আহিতাগ্নি। আহিতাগ্নি গৃহস্থ ষোল আনা গৃহস্থ। অগ্ন্যাধানের পর তিনি যাবতীয় শ্রৌত কর্ম্মে, যাবতীয় দেবযজ্ঞে এবং পিতৃযজ্ঞে অধিকার লাভ করেন। দেবগণ এবং পিতৃগণ অলক্ষ্য ভাবে মানুষের মর্ত্ত্য জীবনের নিয়ামক, শুভাশুভ-ফলদাতা। আগেই বলিয়াছি, দেবগণ মনুষ্যদত্ত হব্য ভোজনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পিতৃগণ স্বধাভোজনের প্রয়াসী। দেবগণের নিকট এবং পিতৃগণের নিকট মানুষের ঋণ আছে, সেই ঋণ মোচন করিয়া না দিয়া যাইতে পারিলে মানবজীবন অসম্পূর্ণ থাকে। অতএব জীবনের সম্পূর্ণতা বিধানের জন্য দেবগণের এবং পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিতেই হইবে। অতএব গৃহস্থের পক্ষে আহিতাগ্নি হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ অগ্নির দ্বারা দেবগণের এবং পিতৃগণের প্রাপ্য পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। অগ্নি নিজেও এক জন দেবতা এবং তিনি দেবগণের পুরোহিত। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম ঋক্‌টিই স্মরণ করিবেন, অগ্নিম্ ঈড়ে

পুরোহিতম্, যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্, হোতারং রত্নধাতমম্। অগ্নি দেবগণের পুরোহিত, তিনিই হোতা নামক ঋত্বিক্ অর্থাৎ তিনিই দেবগণকে আহ্বান করিয়া যজ্ঞস্থলে ডাকিয়া আনেন; তিনিই দেবগণের মুখ; তাঁহার মুখে হব্য দান করিলে দেবগণকে দেওয়া হয়। তিনিই হব্যবহ; দেবগণের জন্য হব্য বহন করিয়া লইয়া যান। গার্হপত্য অগ্নি বস্তুতঃ এক পক্ষে গৃহস্থের, অন্য পক্ষে দেবগণের মধ্যবর্ত্তী। তিনিই গৃহস্থালীর এক রকম কর্ত্তা এবং শুভাশুভদাতা। অতএব গার্হপত্য অগ্নিকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এখানে বলিবেন, অগ্নির মাহাত্ম্য কেবল বেদপন্থী সমাজের একচেটিয়া নহে; অন্যান্য দেশে ও অন্যান্য সমাজেও অগ্নির দেবত্ব স্বীকৃত হয়। অগ্নিমুখেই যে দেবতারা খাদ্য গ্রহণ করেন, তাহা অনুমান করিবার প্রচুর কারণ আছে। দেবতারা সূক্ষ্মশরীরী, তাঁহারা স্থূল অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না। কোনও দ্রব্য আগুনে ফেলিলে তাহা ধূমে, বাষ্পে, বায়ুতে পরিণত হয়। এইরূপে সূক্ষ্মতা পাইলে উহা দেবতাদের সূক্ষ্মদেহের উপযোগী হয়। দেবতারা ঊর্দ্ধলোকে বাস করেন। অগ্নিশিখা স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধমুখী, উহা ধূম এবং বাষ্পরূপে ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া দেবতাদের খাদ্য দেবতাদিগকে পৌঁছাইয়া দেয়। বিশেষতঃ আর্য্যজাতির মধ্যে অগ্নির মাহাত্ম্য বিশেষ বলবৎ ছিল। পণ্ডিতেরা হয়ত বলিবেন, আর্য্যজাতি এক কালে শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী ছিলেন; সেই জন্য তাঁহাদের নিকট অগ্নির এত মাহাত্ম্য। বাল গঙ্গাধর টিলক মহাশয় হয়ত বলিবেন, এই অগ্নিমাহাত্ম্য আর্য্যজাতির সুমেরুপ্রদেশ বাসেরই সমর্থন করিতেছে। যেখানে ছয় মাস ধরিয়া রাত্রি, সেইখানে আগুনের সমাদর এবং চব্বিশ ঘণ্টা আগুন জ্বালিয়া রাখার বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে চলিবে কেন? কাস্পীয় সাগরের তীরে বহু প্রদেশে কেরোসীন তেলের আকর আছে। ভূগর্ভ হইতে সর্ব্বদা কেরোসীনের বাষ্প উদ্গত হয় এবং আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠে। সে দেশের লোকের পক্ষে অগ্নিপূজা স্বাভাবিক। এখনও সেই দেশে অগ্নি মন্দির দেখা যায়। যাঁহারা মনে করেন, আর্য্যজাতি এক কালে মধ্য এশিয়ায় বাস করিতেন, তাঁহারা এই অনুমানে খুসী হইবেন। গ্রীক এবং রোমানেরা আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যেও অগ্নিপূজার প্রচলন ছিল, তাহা আপনারা জানেন। প্রাচীন গ্রীকদের অগ্নিদেবতার নাম Hestia। প্রত্যেক গ্রীক গৃহস্থের ঘরে ঘরে অগ্নিশালা

থাকিত। সেখানে অগ্নি রক্ষিত হইতেন ও পূজা পাইতেন। গ্রীকেরা যখন নিজের দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিতে যাইতেন, তখন আপন গৃহস্থিত অগ্নি সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এইরূপে উপনিবেশের সহিত মাতৃভূমির সম্বন্ধ পাকা হইত। গ্রীকদের মধ্যে যিনি Hestia, রোমানদের মধ্যে তাঁহার নাম Vesta ; Vesta দেবতা রোম নগরের, রোমের রাষ্ট্রের রক্ষাকর্ত্রী ছিলেন। সাধারণ স্থানে তিনি পূজা পাইতেন। কয়েক জন কুমারী অগ্নিরক্ষার্থ নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদিগকে কৌমার ধর্ম্ম পালন করিতে হইত। তাঁহাদের কতগুলি বিশেষ অধিকার ছিল। সর্ব্বসাধারণের নিকট তাঁহারা বিশেষ সম্মান পাইতেন। পারস্যবাসী ইরাণীদের কথা বলা অনাবশ্যক। প্রাচীন ইরাণী সমাজের সহিত প্রাচীন বেদপন্থী সমাজের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাঁহারা আমাদের মত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, ইহা আপনারা সকলেই জানেন।

অগ্ন্যাধান অনুষ্ঠানে একটি ঘোড়ার দরকার হইত, ইহা বলিয়াছি। এই ঘোড়াটির তাৎপর্য্য কি, বলা কঠিন। মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহার কি তাৎপর্য্য বাহির করিবেন, তা জানি না। শুনিতে পাই, ঘোড়ার সহিত আর্য্যজাতির একটি বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। আর্য্যজাতি না কি প্রথমে বুনো ঘোড়াকে পোষ মানাইয়া মানুষের ব্যবহার্য্য করিয়াছিলেন, domesticate করিয়াছিলেন। মধ্যএশিয়ায় ক্যাস্পীয় এবং আরাল সাগরের তীরবর্ত্তী steppes জমিতে প্রচুর ঘাস হয়। এখনও হয়, পূর্ব্বে আরও হইত। সেই জমি অশ্বপালনের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। আর্য্যগণ ঘোড়ায় চড়িয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। ইউরোপে এবং অন্যান্য দেশে তাঁহারাই প্রথমে ঘোড়ার আমদানি করেন। ভারতবর্ষে তাঁহারা অশ্বারোহী হইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, মনে করা যাইতে পারে। তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবনের আরম্ভসূচক প্রথম অনুষ্ঠানে হয়ত এই জন্যই ঘোড়া আনিতে হইত। আমার এই অনুমানে আপনারা হয়ত হাসিবেন। ইহা নিশ্চয়ই একটা survival। অগ্ন্যাধানে ঘোড়ার উপস্থিতির একটা কিছু সার্থকতা অতি পূর্ব্বে ছিল। পরবর্ত্তী কালে তাহার তাৎপর্য্য লোকে ভুলিয়া গেল, কিন্তু প্রথাটা থাকিয়া গেল। পুরাতন বৈদিক সাহিত্যে সূর্য্যের সহিত ঘোড়ার তুলনা বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যাকডোনেল তাঁহার Vedic Mythologyতে বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ; আপনারা দেখিতে পারেন। সূর্য্য

বেদপন্থী সমাজের অতি প্রাচীন দেবতা। তিনি ত সাত ঘোড়ার রথে চড়িয়া দিগ্বিজয়ী বীর পুরুষের মত আকাশপথে ভ্রমণ করেন। তিনি নিজেই যেন ঘোড়া। সূর্য্যের অশ্বরূপ বর্ণনা প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। একবার ত্বষ্টার সহিত তাঁহার জামাতা সূর্য্যের ঝগড়া হইয়াছিল। ছায়া এবং সংজ্ঞাঘটিত সেই গল্প আপনারা জানেন। সূর্য্য সেখানে অশ্বমূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্য যখন ঋষিকে নূতন যজুর্ব্বেদ দান করিয়াছিলেন, তখনও তিনি বাজি বা অশ্বরূপে ঋষিকে দেখা দিয়াছিলেন। অগ্ন্যাধান-কর্ম্মে ঘোড়াটি প্রথমে পূর্ব্বমুখে চলে, তাহার পর আহবনীয়ে উপস্থিত হইয়া পশ্চিম মুখে দাঁড়ায়, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসে। অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই ঘোড়া সেখানে সূর্য্যেরই কল্পিত প্রতিনিধি, এবং ঘোড়াটির যাতায়াত সূর্য্যেরই দৈনিক আবর্ত্তনসূচক। এই অনুমানটাও আমি ছাড়িয়া দিলাম, আপনারা ইচ্ছা হয় লইবেন।

অগ্ন্যাধানের পর আহবনীয় অগ্নিতে প্রতি দিন অগ্নিহোত্র যাগ করিতে হইত। এই অগ্নিহোত্র যাগ নিত্যকর্ম্ম। ইহা না করিলেই নয়। আহবনীয় অগ্নিতে প্রাতে একবার এবং সন্ধ্যায় একবার আহুতি দিতে হইত। প্রাতঃকালে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে এবং সন্ধ্যায় অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দিতে হইত। ইহাই অগ্নিহোত্র। সূর্য্য এবং অগ্নি উভয়েই জ্যোতিঃস্বরূপ। যেন একই দেবতার দুই মূর্ত্তিভেদ। অগ্নির স্থল পৃথিবীলোক, এবং সূর্য্যের স্থল দ্যুলোক। এই দুই দেবতাকে আহুতি দিলে সকল দেবতাকেই একরকম তৃপ্ত করা হয়। কেন না, সকল বেদতাই জ্যোতিঃস্বরূপ। এইরূপে সূর্য্যের সহিত অগ্নির সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। অগ্ন্যাধান অনুষ্ঠানে ঘোড়ার পায়ে অগ্নি স্পর্শ করিয়া সেই অগ্নির প্রতিষ্ঠার মূল এইরূপে পাওয়া যাইতে পারে।

অগ্নিহোত্রের কথা বলিতে চাহি। আহিতাগ্নি গৃহস্থ প্রত্যহ সন্ধ্যায় ও প্রাতে শ্রৌত অগ্নিতে অগ্নিহোত্র সম্পাদন করেন। ইহা গৃহস্থের নিজের কাজ। অশক্ত পক্ষে প্রতিনিধির দ্বারা চলিতে পারে। পুত্র, ভ্রাতা, ভাগিনেয়, জামাতা প্রভৃতি প্রতিনিধি হইতে পারে। অধ্বর্য্যু দ্বারাও চলিতে পারে। স্বয়ং আহুতি দিলে যে ফল, প্রতিনিধির দ্বারা দিলে ফল তার চেয়ে অল্প। অগ্নিহোত্র সম্পাদনের জন্য গৃহস্থঘরে একটি গাভী থাকিত,

তাহার নাম অগ্নিহোত্রী গাভী। প্রাতে এবং সন্ধ্যায় সেই গাভীর দুগ্ধ লইয়া মাটির মালসায় রাখিয়া গার্হপত্যের আগুনে তপ্ত করিতে হয়। আহুতির জন্য দুইখানি কাঠের হাতা দরকার। একখানি ছোট হাতা, তাহার নাম স্রুব। একখানি বড় হাতা, তাহার নাম অগ্নিহোত্রহবনী। মালসার দুধ স্রুব দ্বারা চারি বারে অথবা পাঁচ বারে লইয়া অগ্নিহোত্রহবনীতে ঢালিতে হয় এবং সেই অগ্নিহোত্রহবনীর দুধ অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে পত্নীর সহিত গৃহস্থ অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া গার্হপত্য হইতে জ্বলন্ত অগ্নি লইয়া আহবনীয় অগ্নি এবং দক্ষিণাগ্নি জ্বালাইয়া দেন। পরে গার্হপত্যের আগুনে দুধ জ্বাল দিয়া সে দুধ যথাবিধি স্রুব দ্বারা অগ্নিহোত্র-হবনীতে গ্রহণ করেন। তার পর আহবনীয় অগ্নিতে একখানি সমিৎ বা কাঠ ফেলিয়া দেন। সে কাঠ জ্বলিয়া উঠিলে অগ্নিহোত্রহবনীর দুধ আহবনীয় অগ্নিতে দুই বার আহুতি দেন। প্রথম আহুতি অগ্নির উদ্দিষ্ট। উহার মন্ত্র ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ অগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা। দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি। প্রজাপতিকে ধ্যান করিয়া বিনা মন্ত্রে আহুতি দিতে হয়। সমস্ত দুধ আহুতি দিতে নাই। একটু হবিঃশেষরূপে থাকে। আহুতিদাতা তাহা ভক্ষণ করেন। আহবনীয়ে আহুতি হইলে গার্হপত্যে এবং দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। এবার অগ্নিহোত্রহবনীর দরকার হয় না। ছোট হাতাখানি দিয়া মালসা হইতে কিঞ্চিৎ দুধ লইয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে ফেলিতে হয়। গার্হপত্যে প্রথম আহুতির দেবতা অগ্নি গৃহপতি; দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি। দক্ষিণাগ্নিতে প্রথমাহুতির দেবতা অগ্নি অন্নপতি; দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি। প্রত্যেক আহুতি জ্বলন্ত সমিধের উপর অর্পণ করিতে হয়। আহুতিদানের পর হবিঃশেষ ভক্ষণ করিয়া প্রত্যেক অগ্নিতে তিন তিনটি সমিৎ ফেলিয়া এবং তিন অগ্নির উপস্থান করিয়া গৃহস্থ অগ্নিশালা হইতে বাহির হইয়া আসেন। এই হইল সায়ংকালের অগ্নিহোত্র। প্রাতঃকালের অগ্নিহোত্রের বিধি সায়ংকালেরই মত; কেবল দেবতা অগ্নির বদলে সূর্য্য। আহুতির মন্ত্র ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ সূর্য্যো জ্যোতিঃ জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা। সন্ধ্যার অনুষ্ঠান সূর্য্য অস্ত গেলে অনুষ্ঠেয়। প্রাতঃকালের অনুষ্ঠান কাহারও মতে সূর্য্যোদয়ের পর, কাহারও মতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনেক বিতণ্ডার পর সূর্য্যোদয়ের পরেই অগ্নিহোত্রের সমর্থন করিয়াছিলেন।

অগ্নিহোত্র নিত্যকর্ম্ম। ইহা না করিলেই নয়। গৃহস্থ প্রবাসে থাকিলেও তাঁহার প্রতিনিধি ইহা সম্পাদন করিবেন। এমন কি, বিপত্নীক গৃহস্থেরও অগ্নিহোত্র করিতে হইবে কি না, তাহা লইয়া তর্ক আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। পত্নীর মৃত্যুর পর অগ্নিহোত্র নষ্ট হয়। সেখানে অগ্নিহোত্রের কি ব্যবস্থা হইবে, এই প্রশ্ন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তুলিয়াছেন। উত্তরে বলিতেছেন, গৃহস্থ যদি পুনরায় বিবাহ না করেন, তাহা হইলে তিনি পুত্র, পৌত্র বা দৌহিত্রকে অনুমতি দিতে পারেন; সে অনুমতি পাইয়া তাহারাই অগ্নিহোত্র চালাইবেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আর এক স্থলে প্রশ্ন করিতেছেন, বিপত্নীক ব্যক্তি অগ্নিহোত্র আহরণ করিবে, কি করিবে না? উত্তরে বলিতেছেন, আহরণ করিবে। কেন না, ঋণ পরিহারের জন্য যাগ করিবে, এই শ্রুতিবচন রহিয়াছে। আপনারাও সেই শ্রুতিবাক্য শুনিয়া থাকিবেন। জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণঃ ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে। ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচারী। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ জন্ম মাত্রই তিনটা ঋণে আবদ্ধ হন। ঋষিগণের ঋণ ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের দ্বারা, দেবগণের ঋণ যজ্ঞের দ্বারা, পিতৃগণের ঋণ পুত্রোৎপাদনের দ্বারা শোধ করিতে হয়। এরূপে যাহার পুত্র আছে, যে যজ্ঞ করে এবং যে ব্রহ্মচারী, সে ঋণমুক্ত হয়। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সেই দেবঋণ মোচনের জন্য অত্যাবশ্যক।

অগ্নিহোত্র যজ্ঞ নিত্যকর্ম্ম; না করিলেই নয়। অতএব ইহা সকলের পক্ষে সুসাধ্য হওয়া উচিত। ইহাতে অধিক সময় লাগে না। অধিক সরঞ্জাম বা ব্যয়বিধান আবশ্যক হয় না। যৎকিঞ্চিৎ দুধ থাকিলেই আহুতির কাজ চলিয়া যায়। যদি কোনও কারণে দুধ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটু দধি বা দুটি চাউল বা অন্য কিছু আহুতি দিলেও চলে। যদি কোনও দ্রব্যই না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও অগ্নিহোত্র বর্জ্জন চলিবে না। অহং শ্রদ্ধাং জুহোমি—আমি শ্রদ্ধাই আহুতি দিতেছি, এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করিয়া শ্রদ্ধাহোম করিবে। এই শ্রদ্ধাহোমের নামান্তর ভাবনাহোম বা মানসিক অগ্নিহোত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এক স্থানে বলিতেছেন, শ্রদ্ধাই যজমানের পত্নীস্বরূপ এবং সত্যই যজমানস্বরূপ। শ্রদ্ধা এবং সত্য একযোগে মিথুন হয়। মানসিক অগ্নিহোত্রে শ্রদ্ধা এবং সত্য এই মিথুনের সাহায্যে স্বর্গলোক জয় করা হয়। শ্রদ্ধাহোমে কোনও পার্থিব দ্রব্যের

প্রয়োজন হয় না। কোনরূপ দক্ষিণাও দিতে হয় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, শ্রদ্ধাহোমে মনুষ্যগণ, দেবগণ—এমন কি, সমুদায় জাগতিক দ্রব্যই দক্ষিণাস্বরূপ। সন্ধ্যাকালে শ্রদ্ধাহোমে যজমান মনুষ্যগণকে দেবতার হস্তে দক্ষিণারূপে অর্পণ করেন। মনুষ্যেরাও তখন নিষ্ক্রিয় হইয়া দেবগণের অধীন হইয়া পড়ে। আর প্রাতঃকালে শ্রদ্ধাহোমে যজমান দেবগণকেই দক্ষিণারূপে মনুষ্যের হস্তে অর্পণ করেন, তাই দেবতারা দিনের বেলায় মনুষ্যের অধীন হইয়া মনুষ্যের হিত সাধন করেন।

ব্রহ্মবাদীদের এই উক্তি হইতে আপনারা অগ্নিহোত্রের মাহাত্ম্য কতকটা বুঝিতে পারিবেন। অগ্নিশালায় অগ্নি অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হইত এবং সেই অগ্নি যাহাতে নষ্ট বা অশুচি না হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। কোনরূপে অশুচি ঘটিলে তদনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। একবারে নষ্ট হইয়া গেলে পুনরায় নূতন করিয়া অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিতে হইত। অগ্ন্যাধ্যান অনুষ্ঠানের কথা আগে বলিয়াছি। অগ্নির পুনরাধান অনুষ্ঠানও তদনুরূপ। মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই অগ্নিভক্তির মূল অন্বেষণ করিতে গিয়া হয়ত বলিবেন যে, এই অনুষ্ঠান মানুষের আদিম অসভ্য অবস্থার পরিচয় দেয় মাত্র। যে কালে সহজে অগ্নি উৎপাদনের উপায় ছিল না, তখন সর্ব্বদা বাড়ীর মধ্যে আগুন রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে চলিত না। এখনও আমাদের পল্লীগ্রামে যেখানে দেয়াশলাইএর বাক্স এখনও প্রবেশ লাভ করে নাই, সেখানে আগুন রক্ষার জন্য মালসা জাগানর প্রথা আছে। মানুষের অসভ্য অবস্থায় এইরূপে অগ্নিরক্ষাটা প্রত্যেক গৃহস্থের religious duty করা হইয়াছিল। নতুবা হঠাৎ আগুনের দরকার হইলে আগুন পাওয়া যাইবে কিরূপে? অগ্ন্যাধান এবং অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের মূল এইরূপ হইতে পারে। তাহাতে লজ্জিত বা দুঃখিত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। মানুষ নিজে বানর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে যদি মানুষের লজ্জার বিষয় না থাকে, তাহা হইলে সভ্য মানুষের ধর্ম্মানুষ্ঠানও যদি অসভ্য মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে লজ্জার কারণ দেখি না। বেদপন্থী সমাজের যে অবস্থার কথা বলিতেছি, সে সময়ে বেদপন্থী মানুষ অসভ্য ছিল না, ইহা নিশ্চয়। সে সময়ের অনুষ্ঠানগুলির গোড়ার তাৎপর্য্য যাহাই হউক, তৎকালে অন্যরূপ তাৎপর্য্য আরোপিত হইয়াছিল, এবং তৎকালে যে

তাৎপর্য্য দেওয়া হইত, তাহাই সে কালের সামাজিক এবং গার্হস্থ্য জীবনের নিয়ামক ছিল। অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানকে সে কালের লোকে কি চোখে দেখিতেন, তাহার পরিচয় আপনারা পাইলেন। আপনারা দেখিলেন, এই গৃহস্থিত অগ্নি যেন সমস্ত গৃহস্থালীর একটা symbol। এই অগ্নিকে অবলম্বন করিয়া গৃহস্থালী ধৃত ছিল। তিন অগ্নির মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি গৃহপতির প্রতিনিধিস্বরূপ। এক পক্ষে গৃহস্থ এবং অন্য পক্ষে দেবগণ এবং পিতৃগণের মধ্যে তিনি মধ্যস্থতা করেন। গার্হপত্যের অগ্নি তুলিয়াই আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি জ্বালা হয়। আহবনীয় অগ্নি দেবগণের মুখ এবং দক্ষিণাগ্নি পিতৃগণের মুখ। এই মুখ দ্বারা তাঁহারা গৃহস্থের নিকট আপনাদের প্রাপ্য গ্রহণ করেন, এবং তদ্বিনিময়ে গৃহস্থের কল্যাণসাধনে তৎপর থাকেন। বেদপন্থী সমাজের থিয়োরি মতে সমাজ কতকগুলি গৃহের সমষ্টি মাত্র। গৃহটাই সমাজের unit। আর যিনি গৃহস্থ, তিনি সেই গৃহের সাময়িক রক্ষাকর্ত্তা মাত্র। গৃহস্থের পার্থিব জীবন দিন কয়েকের জন্য। তিনি সেই কয়েকটা দিন আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিয়া যান, পুত্রপৌত্রাদির উপর গৃহরক্ষার ভার পড়ে। গৃহটাই স্থায়ী। গৃহস্থ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে গৃহস্থালীর ধারা রক্ষা করেন। গৃহস্থের যে ধনসম্পত্তি, যাহা তিনি দেবগণের বা পিতৃগণের প্রসাদে ভোগ করিতেছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব নহে। তিনি তাহার রক্ষাকর্ত্তা মাত্র। পিতৃপিতামহ হইতে তিনি তাহা পাইয়াছেন, এবং পুত্রপৌত্রাদিকে তাহার অধিকার ছাড়িয়া দিতে তিনি বাধ্য আছেন। সেই ধনসম্পত্তি নষ্ট করিবার তাঁহার অধিকার নাই। কেন না, তিনি উহার রক্ষাকর্ত্তা মাত্র। সেই পৈতৃক সম্পত্তি নিজের জীবনে তিনি ভোগ করেন বলিয়াই তিনি অন্ততঃ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, এই তিন পুরুষকে পিণ্ড দান করেন এবং আপনার জীবনান্তে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, এই তিন পুরুষের নিকট পিণ্ডের দাবী করেন। এই দক্ষিণাগ্নিতে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে এই অগ্নির সাহায্যে গৃহের অবিচ্ছিন্ন ধারা রক্ষিত হইয়া থাকে। এই হিসাবে দেখিলে এই অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানকে গৃহস্থের পক্ষে কেবল ব্যক্তিগত ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া সঙ্কীর্ণ ভাবে লওয়া যাইতে পারে না। এই অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান প্রকৃত পক্ষে সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। অগ্নির দ্বারাই গৃহস্থের সহিত সমাজের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অগ্নি রক্ষা করেন বলিয়াই তিনি ধনসম্পত্তি

ভোগে অধিকারী এবং ধনসম্পত্তির অধিকারী বলিয়াই সমাজের অন্যান্য গৃহস্থের সহিত তাঁহার আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি তাঁহার নিকট সাহায্য পায়, এবং তাঁহাকে সাহায্য দেয়। এইরূপে রাষ্ট্রের সহিতও তাঁহার সম্পর্ক ঘটে। অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের এই symbolic তাৎপর্য্য থাকাতেই ইহা গৃহস্থ-জীবনের প্রধান অনুষ্ঠান এবং সর্ব্বপ্রধান নিত্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত, তাহাতে সংশয়ের হেতু দেখি না।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সকল প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে পারিব না। ধর্ম্মশাস্ত্রে আমার ততটুকু বিদ্যা নাই। সুধী জনের সম্মুখে সেই কয়েকটি প্রশ্ন আমি উপস্থাপিত করিয়া ক্ষান্ত থাকিব। আচার্য্যগৃহে বিদ্যালাভ করিয়া ঘরে না ফিরিলে গৃহধর্ম্মে অধিকার জন্মিত না এবং পত্নীগ্রহণে অধিকার জন্মিত না. ইহা নিশ্চয়। পত্নী গ্রহণ না করিলে অগ্ন্যাধানে অধিকার জন্মিত না, এবং অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্ম্মে অধিকার জন্মিত না। কিন্তু বিবাহ করিলেই অগ্ন্যাধান করিতেই হইবে, এরূপ নিয়ম ছিল কি না? পিতা বর্ত্তমানে পুত্র ঘরে ফিরিয়া বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর তিনি আপনার জন্য অগ্ন্যাধানে বাধ্য ছিলেন কি না? যদি ধরা যায় যে, পুত্রও পিতৃগৃহে থাকিয়া নিজের জন্য পৃথক্ অগ্নি স্থাপন করিতেন, তাহা হইলে একই গৃহমধ্যে একাধিক অগ্নিশালার প্রয়োজন হয়। একই গৃহে একাধিক অগ্নিশালা থাকিতে পারিত কি না? তাহা সম্ভব হইলে আমি উপরে যে থিয়োরি দিলাম, তৎসম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে। হইতে পারে, বিবাহিত পুত্রের পিতা বর্ত্তমানে স্বতন্ত্র অগ্ন্যাধানের কোনও প্রয়োজন ছিল না। হয়ত পিতা বর্ত্তমানে তাঁহাকে কোনও শ্রৌত কর্ম্মই করিতে হইত না। যদি বা কোনও কর্ম্ম করিতে হইত, তাহা পিতার অনুমতি লইয়া পিতার অগ্নিতেই সম্পাদন করিতে পারিতেন। পুত্র পিতার প্রতিনিধিরূপে পিতার অগ্নিতে অগ্নিহোত্র করিবেন, পিতা প্রবাসে থাকিলে অগ্নিহোত্র বিষয়ে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন, এরূপ যখন স্পষ্ট বিধান আছে, তখন মনে করা যাইতে পারে, পুত্র বিবাহিত হইলেও তাঁহার পক্ষে পৃথক্ অগ্নি স্থাপন না করিলেও চলিতে পারিত। তাহার পক্ষে পৃথক্ শ্রৌত কর্ম্ম না করিলেও চলিতে পারিত। আবার নিতান্তই যদি তিনি পৃথক্ অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহাতে পৃথক্ভাবে শ্রৌত কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে পিতৃগৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন

হইয়া পৃথক্ গৃহে পৃথক্ গৃহস্থালী পাতিতেন। সেইখানে অগ্নিশালা নির্ম্মাণ করিয়া আপনার জন্য অগ্নি-স্থাপনা করিতেন। পিতা বর্ত্তমানে পিতৃগৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এইরূপে পৃথক্ গৃহস্থালী পাতা সে কালে প্রথা ছিল কি না, এবং ঐ প্রথা বিধিসঙ্গত ছিল কি না, তাহা আমি জানি না। হিন্দু আইনে যাঁহারা পারদর্শী, তাঁহারা এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন। বর্ত্তমান কালে আমাদের সমাজে একান্নবর্ত্তী প্রথা প্রচলিত আছে। যে কালের কথা আমি কহিতেছি, সে কালে এরূপ একান্নবর্ত্তী গৃহস্থালী কিরূপে প্রচলিত ছিল, সে প্রশ্ন এই সঙ্গে উপস্থিত হয়। পিতা বর্ত্তমানে পুত্রগণ তাঁহার অধীন হইয়া তাঁহার সমীপেই বাস করিবেন এবং তাঁহার অধীন থাকিবেন; পিতার দেহান্তের পর তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়া প্রত্যেকে পৃথক্ গৃহস্থালী স্থাপন করিতে পারেন; একান্নবর্ত্তী পরিবারের ইহাই নিয়ম। আপনারা patriarchal familyর—পিতৃতন্ত্র গৃহস্থালীর কথা জানেন। এই প্রথামতে গৃহপতি পিতাই পুত্রগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। পুত্রগণ তাঁহার ভৃত্য মাত্র; সর্ব্বতোভাবে অধীন ভৃত্য মাত্র। পিতা ইচ্ছা করিলে পুত্রদের বধদণ্ড পর্য্যন্ত দিতে পারেন। আমাদের প্রাচীন সমাজে পিতার এতটা ক্ষমতা বোধ করি ছিল না। পুত্র জন্মিবা মাত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে তাহার একটা ভাবী স্বত্ব জন্মিত। পিতা সেই স্বত্বে তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারিতেন না। কেন না, পৈতৃক সম্পত্তি তাঁহার নিজস্ব নহে, উহা সেই গৃহের সম্পত্তি; তিনি তাহার রক্ষাকর্ত্তা—trustee মাত্র। কাজেই পুত্রগণের উপর পিতার ক্ষমতা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। এরূপ স্থলে পিতা বর্ত্তমানে পুত্র কতটা স্বাধীনতা পাইতেন, ইহা অনুসন্ধানের বিষয়। পিতা বর্ত্তমানে পৃথক্ ভাবে গৃহস্থালী পাতিয়া পৃথক্ ভাবে অগ্ন্যাধান করিয়া শ্রৌত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পুত্রের স্বাধীনতা কত দূর ছিল, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। যদি বা পুত্র সেইরূপ স্বাধীনতা পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পৈতৃক দায়াধিকারে কোনরূপ সঙ্কোচ ঘটিত কি না, তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়। অগ্নিহোত্র প্রসঙ্গে এই সকল প্রশ্ন আপনা হইতে উপস্থিত হয়। আমি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না। ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী দুই চারি জন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াও ভাল উত্তর পাই নাই। আপনাদের নিকটে প্রশ্ন কয়টি উপস্থিত করিয়া উত্তরের প্রত্যাশায় আমি ক্ষান্ত থাকিলাম।

অগ্ন্যাধান এবং অগ্নিহোত্রের বিবরণ দিয়া আজ আমি বিদায় লইলাম। ইষ্টিযাগ, পশুযাগ এবং সোমযাগ প্রভৃতি কয়েকটি শ্রৌত যজ্ঞের বিবরণ লইয়া পরে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করি। সর্ব্বশেষে যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়া বেদপন্থীর জাতীয় জীবনে ইহার তৎপরতা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ

এক শ্রেণীর শ্রৌত যজ্ঞের নাম ইষ্টিযাগ। আহিতাগ্নি গৃহস্থকে প্রত্যেক অমাবস্যায় এবং প্রত্যেক পূর্ণিমায় একটি ইষ্টিযাগ করিতে হইত। যাবজ্জীবন করাই বিধি; ন্যূন পক্ষে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া করিতে হইত। অমাবস্যার ইষ্টিযাগের নাম দর্শযাগ, আর পূর্ণিমার ইষ্টিযাগের নাম পূর্ণমাস-যাগ। উভয় যজ্ঞেরই বিধিবিধান প্রায় একরূপ। আমি কেবল পূর্ণমাস-যাগের বিবরণ দিব। পূর্ণমাস-যাগের অনুষ্ঠানটি আয়ত্ত হইলে যাবতীয় ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান বুঝিতে পারা যাইবে। যাজ্ঞিকের ভাষায় পূর্ণমাস-যাগ যাবতীয় ইষ্টিযাগের প্রকৃতি বা model; আর আর ইষ্টিযাগ তাহার বিকৃতি। পূর্ণমাস-যাগের বিধি সকল ইষ্টিযাগেই প্রযোজ্য; কেবল ক্ষেত্রভেদে বিশেষ বিধি রহিয়াছে।

পূর্ণমাস-যাগ প্রত্যেক পূর্ণিমায় সম্পাদ্য। এই যজ্ঞে প্রধান আহুতি দুইটি। প্রথম আহুতি অগ্নিদেবতার উদ্দিষ্ট; দ্বিতীয় আহুতি অগ্নি এবং সোম, এই উভয় দেবতার প্রতি একযোগে উদ্দিষ্ট। যে দ্রব্য আহুতি দেওয়া যায়, তাহার নাম পুরোডাশ। এই পুরোডাশ যবের অথবা চাউলের রুটি মাত্র। যব অথবা চাউল বাঁটিয়া আগুনে সেকিয়া এই রুটি প্রস্তুত হয়। অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ স্বহস্তে এই পুরোডাশ প্রস্তুত করেন। কয়েক মুঠা যব অথবা ব্রীহি ধান লইয়া তাহা উখলে রাখিয়া কাঁড়িতে হয়; তার পর কুলা দ্বারা ঝাড়িয়া তুষ ও ক্ষুদ গুঁড়া পৃথক্ করিয়া ফেলিতে হয়; তাহার পর শিলে বাঁটিয়া পিটুলি তৈয়ার হয়। এই পিটুলি আগুনে সেকিয়া রুটি বা পুরোডাশ তৈয়ার হইবে। সেকিবার জন্য কয়েকখানি ছোট ছোট মাটির খোলা বা কপাল থাকে। খোলাগুলি চতুষ্কোণ; কতকগুলির কোণ ভাঙ্গিয়া ও ঘষিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকার করিয়া লওয়া যায়। চতুষ্কোণ খোলা মাঝে রাখিয়া তাহার চারি পাশে কোণহীন খোলাগুলি সাজাইয়া বসাইতে হয়; মাঝে যেন ফাঁক না থাকে। অগ্নির উদ্দিষ্ট প্রথম পুরোডাশের জন্য আটখানি খোলা এইরূপে সাজাইতে হয়; ইহার নাম অষ্টাকপাল পুরোডাশ। অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট দ্বিতীয় পুরোডাশের জন্য এগারখানি খোলা সাজাইতে হয়; ইহার নাম একাদশকপাল পুরোডাশ। গার্হপত্যের

আগুনে খোলাগুলি তপ্ত করিয়া, তাহার উপরে সেই যবের বা চাউলের পিটুলি ঢালিয়া দিয়া গার্হপত্যের অঙ্গারেই সেকিতে হয়। এইরূপে পুরোডাশ তৈয়ার হইলে তাহাতে ঘি মাখাইয়া বেদির উপরে যথাস্থানে রাখিয়া দিতে হয়। যথাকালে এই পুরোডাশ আহুতি দিতে হইবে। সমুদয় কর্ম্ম অধ্বর্য্যু স্বহস্তে সম্পাদন করেন। প্রত্যেক কর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট যজুর্মন্ত্র থাকে।

প্রধান যাগের কথা বলিলাম। প্রধান যাগের পূর্ব্বে এবং পরে কর্ম্মাঙ্গ-স্বরূপে আরও কতকগুলি অপ্রধান যাগ করিতে হয়। কতকগুলি হোমও করিতে হয়। যাগের সহিত হোমের পার্থক্য আছে। যাগকালে আহুতি দেন অধ্বর্য্যু; কিন্তু মন্ত্র পাঠ করেন আর এক জন ঋত্বিক্, তাঁহার নাম হোতা। হোতা দেবতা আহ্বান করিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। মন্ত্রের পর বৌষট্ শব্দ উচ্চারণ করেন, ইহার নাম বষট্কার। বষট্কারের সঙ্গে সঙ্গে অধ্বর্য্যু আহুতির দ্রব্য অগ্নিতে অর্পণ করেন। তাঁহাকে কোনও মন্ত্র পড়িতে হয় না। ইহারই নাম যাগ। আর হোম অনেকটা সংক্ষিপ্ত ব্যাপার। ইহাতে হোতার দরকার হয় না। অধ্বর্য্যু অগ্নির পাশে বসিয়া নিজেই যজুর্মন্ত্র পাঠ করেন; মন্ত্রের পর স্বাহা উচ্চারণ করেন। ইহার নাম স্বাহাকার। স্বাহাকারের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিতে আহুতি দেন। ইহাই হইল হোম। পূর্ণমাস-যজ্ঞে প্রধান যাগের পূর্ব্বে বা পরে যে সকল অপ্রধান যাগ বা হোম করিতে হইত, যথাক্রমে তাহার উল্লেখ করিব।

পূর্ণমাস-যাগে চারি জন ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। প্রথম অধ্বর্য্যু; পুরোডাশ প্রস্তুত করা হইতে আহুতি দান পর্য্যন্ত সমুদায় কাজই অধ্বর্য্যুর। মুখ্যতঃ যজুর্মন্ত্র-সাহায্যে ইহাকে কাজ করিতে হইত; এই জন্য ইনি যজুর্ব্বেদে অভিজ্ঞ। এই হিসাবে অধ্বর্য্যু ঋত্বিক্গণের মধ্যে প্রধান। তিনি অধ্বরের অর্থাৎ যজ্ঞের যেন দেহ নির্ম্মাণ করেন। দ্বিতীয় ঋত্বিকের নাম হোতা। ইনি মন্ত্র পড়িয়া আহুতির পূর্ব্বে দেবতাকে আহ্বান করেন। হোতা শব্দ হ্বে ধাতু হইতে উৎপন্ন। দেবতাকে আহ্বান করেন বলিয়া ইহার নাম হোতা। হোতার পাঠ্য অধিকাংশ মন্ত্রই ঋক্মন্ত্র। এই জন্য হোতার ঋগ্বেদে বিশেষজ্ঞ হওয়া দরকার। ইষ্টিযাগে সাম গানের প্রয়োজন হয় না। সে জন্য উদ্গাতার বা অন্য সামগায়ী ঋত্বিকের দরকার হয় না। তৃতীয় ঋত্বিকের নাম ব্রহ্মা। ইনি অধ্বর্য্যু এবং হোতা উভয়েরই উপরে। উভয়ের কর্ম্ম পরিদর্শন করেন; ভ্রান্তি ঘটিলে সংশোধনের ব্যবস্থা দেন।

চতুর্থ ঋত্বিকের নাম অগ্নীৎ ; ইনি ব্রহ্মার সহকারী। এই চারি জন ঋত্বিক্‌কে পূর্ব্ব হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পূর্ণমাস-যাগ আরম্ভ করিতে হয়।

যাগের পূর্ব্বদিন পূর্ব্বাহ্লের ক্রিয়া অন্বাধান এবং অপরাহ্লের ক্রিয়া ব্রতগ্রহণ। পূর্ব্বাহ্লে যজমান গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি, এই তিন অগ্নিতে এক-একখানি সমিৎ ফেলিয়া যজ্ঞের জন্য অগ্নিকে অনুকূল করিয়া রাখেন। অগ্নিকে যেন বলিয়া রাখা হয়, কাল আমি যাগ করিব, এখন হইতে তুমি প্রস্তুত হইয়া থাক। অপরাহ্লে যজমান ক্ষৌরকার্য্যের পর স্নানান্তে কিছু খাইয়া লন ; পরে অগ্নির পাশে দাঁড়াইয়া আমি সত্য কথা কহিব ইত্যাদি কতিপয় নিয়ম পালনের প্রতিজ্ঞা করেন। এই কর্ম্মের নাম ব্রত-গ্রহণ। পত্নীর সহিত যজমান অগ্নিশালাতেই শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করেন।

পরদিন প্রাতে অগ্নিহোত্র সমাপনের পর ইষ্টিযাগ। যজমানের প্রথম কাজ ব্রহ্মার বরণ। বরণের পর ব্রহ্মা আহবনীয়ের দক্ষিণে আসন গ্রহণ করেন, এবং সেখানে বসিয়াই সর্ব্বকর্ম্ম পরিদর্শন করেন। ব্রহ্মার বাম দিকে যজমানের বসিবার স্থান। যজমানের পত্নী গার্হপত্যের দক্ষিণে বসেন। তিনি যখন গৃহিণী, তখন গার্হপত্যের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ। বেদির উত্তর দিকে হোতার এবং অগ্নীতের আসন। অধ্বর্য্যু যাগকালে বসিতে পান না ; তাঁহাকে নানা কর্ম্মে এখানে ওখানে ঘুরিতে হয়।

বরণের পর ব্রহ্মা স্বস্থানে বসিলে প্রণীতা-প্রণয়ন কর্ম্ম হয়। প্র উপসর্গের অর্থ সম্মুখে—পূর্ব্বমুখে ; প্র-ণয়ন শব্দের অর্থ পূর্ব্বমুখে লইয়া যাওয়া। খানিকটা জল পূর্ব্বমুখে লইয়া আহবনীয়ের পার্শ্বে স্থাপন করা হয়। আগে বলিয়াছি, বেদির পূর্ব্ব দিকে আহবনীয়ের স্থান। এই জলের নাম প্রণীতা। সংস্কৃত ভাষায় অপ্‌ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, সেই জন্য প্রণীত বিশেষণটা স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত। যাগশেষ পর্য্যন্ত সেই জল সেইখানে থাকে। তাৎপর্য্য, উহা স্বস্থানে থাকিয়া যজ্ঞকে রক্ষা করিবে। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, জল অসুর ও রাক্ষসগণের পক্ষে বজ্রস্বরূপ ; উহারা সেই বজ্র দেখিলে যজ্ঞভূমিতে আসে না। এদিকে অধ্বর্য্যু যজ্ঞের সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ করিয়া গোছাইয়া রাখেন এবং যথাকালে বেদির উপর সাজাইয়া রাখেন। ইষ্টি-যাগে অনেকগুলি সরঞ্জামের দরকার হয়। কতকগুলি সরঞ্জামের নাম জানা আবশ্যক। শ্রেণী বিভাগ করিয়া তাহাদের উল্লেখ করিতেছি।

(১) যজ্ঞীয় কাঠের কতকগুলি টুকরা দরকার হয়, এই কাষ্ঠখণ্ডের নাম সমিৎ। তিনখানি সমিধে আহবনীয় অগ্নিকে ঘিরিয়া বেড়া দিতে হয়। এই তিনখানির নাম পরিধি। আর কয়খানি সমিৎ যাগের পূর্ব্বে আগুন জ্বালাইবার জন্য পৃথক্ থাকে। আগুন জ্বালানর নাম সমিন্ধন। অধ্বর্য্যু একখানি সমিৎ আহবনীয় অগ্নিতে ফেলিয়া দেন, আর হোতা এক-একটি ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করেন। অগ্নি-সমিন্ধনের জন্য প্রযুক্ত হয় বলিয়া এই মন্ত্রের নাম সামিধেনী ঋক্। (২) কয়েক আঁটি দর্ভের বা কুশের প্রয়োজন। বেদির উপরে এই কুশগুলি বিছাইয়া, তাহার উপর যাগের সরঞ্জামগুলি সাজাইয়া রাখিতে হয়। কুশের একটা আঁটি পৃথক্ বাঁধা থাকে, তাহার নাম প্রস্তর। যে হাতায় আহুতির দ্রব্য লইয়া আহুতি দেওয়া হয়, তাহার নাম জুহূ। জুহূখানি ঐ প্রস্তরের উপরে রাখিতে হয়। এই প্রস্তর নিতান্ত সামান্য বস্তু নহে। উহার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, সে কথা পরে বলিব। (৩) পূর্ণমাস-যজ্ঞে প্রধান যাগে পুরোডাশ আহুতি হয়। তাহার পূর্ব্বে এবং পরে অপ্রধান যাগগুলিতে আজ্যাহুতি হয়। যজ্ঞে ব্যবহার্য্য সংস্কৃত ঘৃতের নাম আজ্য। একটা মাটির মালসায় এই আজ্য থাকে, তাহার নাম আজ্যস্থালী। আজ্যস্থালী হইতে আজ্য গ্রহণের জন্য চারিখানি কাঠের হাতার দরকার। একখানির নাম ধ্রুবা। বেদির উপর স্থিরভাবে থাকে বলিয়া উহার নাম ধ্রুবা। আজ্যস্থালীর আজ্য ধ্রুবাতে ঢালিতে হয় এবং যাগের সময়ে সেই ধ্রুবা হইতেই আজ্য লওয়া হয়। ধ্রুবা হইতে আহুতির জন্য আজ্য গ্রহণের একখানি ছোট হাতা থাকে; সেখানির নাম স্রুব। আর একখানি বড় হাতা থাকে, সেইখানি জুহূ। জুহূর নাম আগেই উল্লেখ করিয়াছি। আহুতির সময় অধ্বর্য্যু ছোট স্রুবের দ্বারা ধ্রুবা হইতে আজ্য তুলিয়া লন এবং জুহূতে ঢালিয়া দেন। চতুর্থ হাতার নাম উপভৃৎ; ইহা জুহূর চেয়ে ছোট। যাগের সময় অধ্বর্য্যু ডানি হাতে জুহূ এবং বাম হাতে উপভৃৎ গ্রহণ করেন। উপভৃৎখানি জুহূর নীচে থাকে। উদ্দেশ্য যে, জুহূস্থিত আহুতি-দ্রব্য যেন ভূমিতে না পড়ে; দৈবাৎ পড়িলে যেন উপভৃতেই পড়ে। (৪) পুরোডাশ প্রস্তুত করিবার জন্য কতকগুলি সরঞ্জাম আবশ্যক। যথা (ক) অগ্নিহোত্রহবনী—ইহার কথা অগ্নিহোত্র প্রসঙ্গে বলিয়াছি; ইষ্টি-যাগে সেই অগ্নিহোত্রহবনী পুরোডাশার্থ যব বা ধান আনিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। (খ) উদূখল মুষল—সেই যব বা ধান উখুলে রাখিয়া মুষল প্রয়োগে

কাঁড়া যায়। (গ) সূর্প বা কুলা,—ধান ঝাড়িয়া তুষ পৃথক্ করিবার জন্য আবশ্যক। (ঘ) দৃষৎ ও উপল অর্থাৎ শিল ও নোড়া, চাউল বাঁটিবার জন্য আবশ্যক। (চ) শম্যা, একখানা কাঠ; চাউল বাঁটিবার সময় নীচে এই কাঠখানা পাতিলে শিলখানা ঢালু হয় ও চাউল বাঁটার সুবিধা হয়। (ছ) কৃষ্ণাজিন অর্থাৎ কাল হরিণের চামড়া; চাউল ফাঁড়িবার সময় উদূখলের নীচে ও বাঁটিবার সময় শিলের নীচে পাতা থাকে।

অধ্বর্য্যু বেদির উপর কুশ বিছাইয়া ঐ সকল সরঞ্জাম সাজাইয়া ফেলেন। তার পর যাগের জন্য আহবনীয় অগ্নি ভাল করিয়া জ্বালিতে হয়—ইহাই অগ্নি-সমিন্ধন; ইহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হোতা এক একটি সামিধেনী ঋক্ পাঠ করেন, আর অধ্বর্য্যু এক একখানি সমিৎ আহবনীয়ে ফেলিয়া দেন; আহবনীয় অগ্নি জ্বলিয়া উঠে।

যজ্ঞের সরঞ্জাম সাজান হইয়াছে; পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়া বেদির উপরে যথাস্থানে রাখা হইয়াছে; আহবনীয় অগ্নি জ্বালান হইয়াছে; এখন যাগের জন্য দেবতাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে। দেবতাদের আহ্বান হোতার কাজ। কিন্তু হোতা সামান্য মানুষ; তাঁহার ডাকে দেবতারা আসিবেন কেন? আগেই বলিয়াছি, অগ্নি স্বয়ং দেবগণের হোতা। অগ্নি স্বয়ং ডাকিলে তবে দেবতারা আসিবেন; অগ্নিকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু অগ্নিকেই বা ডাকিবে কে? অধ্বর্য্যু ডাকিবেন; হোতাও ডাকিবেন। তাঁহাদের আহ্বানই বা অগ্নি শুনিবেন কেন? প্রাচীন ঋষিগণ মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন; অলৌকিক ক্ষমতাবলে মন্ত্র লাভ করিয়া সেই মন্ত্রে তাঁহারা অগ্নিকে ডাকিতেন; তাঁহাদের ডাক অগ্নি শুনিতেন। যজমান যে গোত্রে জন্মিয়াছেন, সেই গোত্রে পূর্ব্বকালে যে কয় জন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আপন আপন মন্ত্রে আপন আপন অগ্নিকে ডাকিতেন। অগ্নি নিশ্চয়ই তাঁহাদের ডাক শুনিতেন। সেই ঋষিগণের অগ্নির নাম আর্ষেয় অগ্নি বা ঋষিসম্বন্ধীয় অগ্নি; নামান্তর প্রবর অগ্নি। দেবতা আহ্বানের জন্য তৎপূর্ব্বে হোতাকে বরণের নাম প্র-বরণ। যজমানের নিযুক্ত হোতা মানুষ হোতা মাত্র; কিন্তু অগ্নি দেবহোতা। মানুষ হোতাকে যেমন পূর্ব্বে বরণ অথবা প্রবরণ করিতে হয়, দেবহোতা অগ্নিকেও সেইরূপ প্রবরণ করিতে হয়। যজমানের গোত্রের প্রবর্ত্তক প্রাচীন ঋষিদের দোহাই দিয়া ডাকিলে সেই ঋষিদিগের অগ্নি সেই ডাক শুনিতে পারেন। অতএব সেই ঋষিদিগের

নামানুসারে দেবহোতা অগ্নিকে ডাকিয়া, পরে সেই অগ্নিরই প্রতিনিধিস্বরূপে মানুষ হোতাকে বরণ করা হয়। এইরূপে নিয়োগ পাইয়া মানুষ হোতা সেই পূর্ব্বঋষিগণের অগ্নিকে আহ্বান করেন এবং সেই অগ্নিকেই মন্ত্রদ্বারা দেবতা আহ্বানের জন্য অনুরোধ করেন। বরণান্তে হোতা বেদির উত্তরে স্বস্থানে আসন গ্রহণ করেন।

এখন প্রকৃত পক্ষে যাগ আরম্ভ হয়। যাগগুলির নাম একে একে করিব। (১) প্রযাজ যাগ, প্রধান যাগের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম প্রযাজ। আহুতির দ্রব্য আজ্য। অধ্বর্য্যু ঘৃতধারা দ্বারা আঘার হোম করিয়া পরে প্রযাজ যাগ করেন। পাঁচ দেবতার উদ্দেশে পাঁচটি আহুতি দেওয়া হয়। দেবতাদের নাম শুনিলে আপনারা চমকিয়া উঠিবেন। এখনও আমরা বেদপন্থী বলিয়া পরিচয় দিই বটে ; কিন্তু এই দেবতাদের নাম একবারে ভুলিয়া গিয়াছি। প্রথম দেবতা সমিৎ ; দ্বিতীয় দেবতা তনূনপাৎ, অথবা যজমানের গোত্রভেদে নরাশংস ; তৃতীয় দেবতা ইড়ঃ ; চতুর্থ দেবতা বর্হিঃ ; পঞ্চম দেবতা স্বাহাকার। (২) পঞ্চ প্রযাজের পর অগ্নির উদ্দেশে একবার এবং সোমের উদ্দেশে একবার আজ্য আহুতি, ইহার নাম আজ্যভাগ দান। (৩) আজ্যভাগ দানের পর প্রধান যাগ। অগ্নির উদ্দেশে প্রথম পুরোডাশ, এবং তৎপরে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে দ্বিতীয় পুরোডাশ দান। দুইয়ের মাঝে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে একটু ঘৃতাহুতি দিতে হয়। উপাংশু অর্থাৎ অনুচ্চ স্বরে মন্ত্র পাঠ হয় বলিয়া এই ঘৃতাহুতির নাম উপাংশুযাগ। (৪) তৎপরে স্বিষ্টকৃৎ যাগ। পুরোডাশ দুইখানির সমস্তটা আহুতি দিতে হয় না ; খানিকটা রাখিতে হয়। ইহারই কিয়দংশ কাটিয়া লইয়া অগ্নি স্বিষ্টকৃতের উদ্দেশে দেওয়া হয়। অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ রুদ্রদেবতার মূর্ত্তি। এই রুদ্রদেবতাটিকে লোকে ভয় করিত। ইঁহার বাণকে সকলে ভয় করিত। এমন কি, স্পষ্ট করিয়া ইঁহার নাম উচ্চারণে সকলে সাহসী হইত না। উগ্র, ভীম, কপর্দ্দী প্রভৃতি বিশেষণে ইঁহার স্বভাবের পরিচয় পাইবেন। ইঁহাকে খুসী রাখিবার জন্য কখন কখন শঙ্কর বলা হইত। ফলে বেদপন্থীদের অন্যান্য দেবতাদের সহিত ইঁহার পার্থক্য ছিল। ইনি একবার দেবতাদের অনুরোধে স্বয়ং প্রজাপতিকে লক্ষ্য করিয়া বাণ ছুঁড়িয়াছিলেন। দেবতারা খুসী হইয়া ইঁহাকে পশুগণের আধিপত্য দিয়াছিলেন। তদবধি ইনি পশুপতি হইয়াছেন। অতি পূর্ব্বে ইনি যজ্ঞের ভাগ পাইতেন না ; জোর করিয়া

যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করেন। তদবধি স্বিষ্টকৃৎ যাগের প্রচলন। স্বিষ্টকৃৎ যাগে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা রুদ্রদেবই অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ মূর্ত্তিতে গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে দক্ষযজ্ঞ-ঘটিত পৌরাণিক উপাখ্যান আপনাদের মনে আসিবে। (৫) স্বিষ্টকৃৎ যাগের পর অনুযাজ যাগ। প্রধান যাগের পূর্ব্বে যেমন প্রযাজ, পরে তেমনই অনুযাজ। প্রযাজ যাগের পাঁচ দেবতা; অনুযাজের তিন দেবতা—বর্হিঃ, নরাশংস, এবং পুনরায় অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ। আহুতির দ্রব্য আজ্য।

প্রধান ও অপ্রধান এই সমুদায় যাগের সম্পাদনে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। আগে বলিয়াছি—অধ্বর্য্যুই যাগকর্ত্তা; হোতা দেবতার আহ্বানকারী মাত্র। আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দিয়া যাগ হয়। অধ্বর্য্যুর আসন আহবনীয়ের উত্তরে; সেইখানে তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন। যে-কোনও যাগের পূর্ব্বে তিনি ডানি হাতে জুহূ এবং বাম হাতে উপভৃৎ লইয়া বেদির উত্তর হইতে দক্ষিণে চলিয়া আসেন। দক্ষিণে দাঁড়াইয়া তিনি অগ্নীৎ নামক ঋত্বিক্‌কে আদেশ দেন—"ওঁ শ্রাবয়" অর্থাৎ দেবতাদিগকে মন্ত্র শুনিতে অনুরোধ কর। অগ্নীৎ বেদির উত্তরে একখানি কাঠের তলওয়ার তুলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। এই তলওয়ারখানির নাম স্ফ্য। তিনি উত্তরে বলেন—"অস্তু শ্রৌষট্" অর্থাৎ আচ্ছা, দেবতারা শুনিতেছেন। তখন অধ্বর্য্যু হোতাকে দেবতার আহ্বানে আদেশ দেন। হোতাকে দুইটি মন্ত্র পড়িতে হয়। প্রথমটির নাম অনুবাক্যা; ইহা ঋক্‌মন্ত্র। এই মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে অনুকূল করা হয়। দ্বিতীয় মন্ত্রের নাম যাজ্যা; এই মন্ত্র কখন ঋক্, কখন যজুঃ। ইহাই যাগের মন্ত্র, এই জন্য নাম যাজ্যা। মনে করুন, যাগের দেবতা অগ্নি। হোতা মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে যে "যজামহে অগ্নিং দেবম্"—বলিয়া আরম্ভ করেন, এইটুকুর নাম আগুঃ। তৎপরে যাজ্যা মন্ত্র পড়িয়া বলেন—"অগ্নে বীহি বৌষট্"—অগ্নি ইহা ভক্ষণ করুন এবং দেবতার নিকট বহন করুন। ঐ বৌষট্ উচ্চারণই বষট্‌কার। ঐ বষট্‌কারের সঙ্গে সঙ্গে অধ্বর্য্যু আহুতির দ্রব্য আজ্যই হউক, আর পুরোডাশই হউক, অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। যজমান অধ্বর্য্যুকে স্পর্শ করিয়া থাকেন; যজমান আহুতির পর ত্যাগমন্ত্র বলেন—"ইদম্ অগ্নয়ে—ন মম"—এই দ্রব্য অগ্নিকে দেওয়া হইল, আমার থাকিল না—ইহাই ত্যাগমন্ত্র। দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগের নামই যাগ। যজমান এইরূপে দ্রব্য ত্যাগ করিলেন। ত্যাগমন্ত্র পাঠের পর অধ্বর্য্যু

অগ্নির দক্ষিণ হইতে আবার উত্তরে অর্থাৎ স্বস্থানে ফিরিয়া আসেন। প্রত্যেক যাগেরই এই সাধারণ বিধি।

একটা বড় কথা বলিতে বাকী আছে। উহা হবিঃশেষ ভক্ষণ। হবিঃশেষ না খাইলে কোনও যজ্ঞই সম্পূর্ণ ও সার্থক হয় না। অগ্নিহোত্র প্রসঙ্গে বলিয়াছি, সমস্ত দুধটা আহুতি দেওয়া হয় না; একটু শেষ থাকে, তাহা খাইতে হয়। পূর্ণমাস-যাগেও সমস্ত পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হয় না। খানিকটা পুরোডাশ রাখিয়া দিতে হয়। যজমান এবং ঋত্বিকেরা উহা ভক্ষণ করেন। এই জন্য পুরোডাশের শেষ অংশকে কয়েক খণ্ডে ভাগ করিতে হয়। এক খণ্ডের নাম প্রাশিত্র; ইহা ব্রহ্মা ভক্ষণ করেন। আর এক খণ্ডের নাম ষড়বত্ত; এই খণ্ড অগ্নীতের। আর এক খণ্ড চারি টুকরা করিয়া অধ্বর্য্যু, হোতা, ব্রহ্মা, অগ্নীৎ, এই চারি জনে প্রত্যেকেই ভক্ষণ করেন। পুরোডাশের আর দুই খণ্ড রাখিয়া দেওয়া হয়। সকল অনুষ্ঠান শেষ হইলে ব্রহ্মা এবং যজমান ঐ দুই খণ্ড ভক্ষণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় পুরোডাশের কিয়দংশ ঘৃতাক্ত করা হয়। এই অংশের নাম ইড়া। যজমান এবং চারি জন ঋত্বিক্, সকলে মিলিয়া এই ইড়া ভক্ষণ করেন। এই ইড়া-ভক্ষণ একটা বিশিষ্ট ব্যাপার। এখন আমি ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কিন্তু আপনারা এই ইড়াকে মনে রাখিবেন। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আমাকে পরে বলিতে হইবে। ইড়া-ভক্ষণের তাৎপর্য্য না বুঝিলে যজ্ঞের তাৎপর্য্য বুঝা হইবে না। এই ইড়ারই আবার একটি অংশ হোতা পৃথক্ ভাবে ভক্ষণ করেন। এই অংশের নাম অবান্তর ইড়া। এই হবিঃশেষ-ভক্ষণ অনুষ্ঠান স্বিষ্টকৃৎ যাগের পরে এবং অনুযাজ যাগের পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়া যায়। কেবল ব্রহ্মা ও যজমানের ভাগ যজ্ঞসমাপ্তির জন্য রক্ষিত থাকে।

অনুযাজ যাগের সহিত পূর্ণমাস-যজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠানগুলি এক রকম সম্পন্ন হইয়া গেল। এখন সমাপ্তিতে পৌঁছিতে হইবে। প্রস্তর নামক দর্ভমুষ্টির কথা আপনাদের মনে থাকিবে। এক মুষ্টি কুশ বাঁধিয়া বেদির উপর রাখা হইয়াছিল, উহারই নাম প্রস্তর। কিন্তু এই প্রস্তর কেবল কুশের গোছা নহে। ইহাতে যজমানের শরীর কল্পনা করা হয়। অনুযাজ যাগের পর প্রস্তর আহবনীয়ের আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হয়। প্রস্তর যখন আগুনে পুড়িতে থাকে, যজমান তখন স্বর্গে যাইতেছেন বুঝিতে হইবে। প্রস্তর পুড়িয়া গেলে বুঝিতে হইবে, যজমান স্বর্গে গিয়া দেবতাদের সহিত

মিশিয়াছেন। প্রস্তর পুড়িবার সময় অধ্বর্য্যুর অনুজ্ঞা লইয়া হোতা কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করেন। উহার নাম সূক্তবাক্। প্রস্তর পুড়িয়া গেলে আশীর্ব্বাদসূচক আর কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করেন। উহার নাম শংযুবাক্। আপনাদের মনে থাকিবে, যজ্ঞের আরম্ভে তিনখানি সমিৎকাষ্ঠ দিয়া আহবনীয় অগ্নিকে ঘিরিয়া ফেলা হইযাছিল। এই সমিৎ কয়খানির নাম পরিধি। মানুষ হোতা দেব-হোতা অগ্নিকে আহবনীয় স্থানে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, আপনাদের মনে আছে। এই পরিধি তিনখানি সেই দেব-হোতার শরীর। এখন এই পরিধি কয়খানি অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া হয়; দেবহোতা যজ্ঞস্থল হইতে চলিয়া যান। এই সময়ে অধ্বর্য্যু বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে একটু আজ্য দিয়া হোম করেন; ইহার নাম সংস্রব হোম। ইহা যাগ নহে—হোম। এই হোমের সহিতই যজমানের পক্ষে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

এত ক্ষণে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে। আমিও এখানে সমাপ্তি দিয়া আপনাদিগকে অব্যাহতি দিতে পারিতাম, কিন্তু যাজ্ঞিকেরা অব্যাহতি দিবেন না। যজমানের পক্ষে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। কিন্তু যজমানের পত্নীর পক্ষে এখনও সমাপ্ত হয় নাই। আগেই বলিয়াছি, গার্হপত্য অগ্নির সহিত যজমানের পত্নীর বিশেষ সম্পর্ক। গার্হপত্যের পাশে তিনি এত ক্ষণ বসিয়া আছেন। এ পর্য্যন্ত যত যাগ হইয়াছে, সমস্তই আহবনীয় অগ্নিতে হইয়াছে; গার্হপত্যে কোনও যাগ হয় নাই। এখন ব্রহ্মা ছাড়া আর তিন জন ঋত্বিক্ যজমানপত্নীর নিকটে আসিয়া কয়েকটি আহুতি দেন; গার্হপত্য অগ্নিতে আহুতি দেন। আহুতির দ্রব্য আজ্য। দেবতা যথাক্রমে সোম, ত্বষ্টা, দেবপত্নীগণ এবং অগ্নি গৃহপতি। অগ্নি গৃহপতি ত গার্হপত্য অগ্নির দেবতা। অগ্নি গৃহপতি যজ্ঞভাগে বঞ্চিত হইলে, গৃহিণী তাহা সহিবেন কেন? আর দেবপত্নীগণকেও বঞ্চিত হইতে তিনি দিবেন কেন? প্রধান যাগের পর যেমন হবিঃশেষ ভক্ষণ হইয়াছিল, গৃহপত্নীর পক্ষে এই যাগের পরও হবিঃশেষ ভক্ষণ করিতে হয়। ভক্ষণের পর সূক্তবাক্ পঠিত হয় না বটে, তবে শংযুবাক্ পাঠ করিতে হয়, এবং সংস্রব হোমও করিতে হয়। যজমানপত্নীর পক্ষে এই যাগের নাম পত্নী-সংযাজ।

দক্ষিণাগ্নি এ পর্য্যন্ত কোন আহুতিই পান নাই। অধ্বর্য্যু দক্ষিণাগ্নিতে এখন একটু আজ্য হোম করেন। পুরোডাশ তৈয়ার করিবার সময় পিটুলির

যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে আগুনে দেওয়া হয়। দেবহোতার আহ্বানে যে সকল দেবতা যজ্ঞভাগ পাইবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও যজ্ঞস্থল হইতে যান নাই। অধ্বর্য্যু ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের সকলের জন্য আহবনীয় অগ্নিতে একটু আজ্য অর্পণ করেন। তখন তাঁহারা চলিয়া যান। ইহার নাম সমিষ্ট-যজুর্হোম। বেদির উপরে যজ্ঞের সরঞ্জামগুলি রাখিবার জন্য যে সকল কুশ বিছান হইয়াছিল, তাহাও আহবনীয়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যজ্ঞারম্ভে প্রণীতা নামক জল প্রণয়ন করিয়া যজ্ঞরক্ষার জন্য আহবনীয়ের পূর্ব্ব দিকে রাখা হইয়াছিল; যজ্ঞ সমাপ্ত হইল, এখন সেই জল বেদির উপর ঢালিয়া দেওয়া হয়। পুরোডাশের জন্য চাউল ঝাড়িয়া যে তুষ ও ক্ষুদের গুঁড়া অবশিষ্ট ছিল, তাহা রাক্ষসদের প্রাপ্য। ইহাতেই তাহারা খুসী হইবে। রাক্ষসদের উদ্দেশে ইহা ফেলিয়া দেওয়া হয়।

এইবারে যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। যজমান এখন দেবত্ব পাইয়াছেন; এমন কি, দেবগণের মধ্যে পরম দেবতা যে বিষ্ণু, তিনি সেই বিষ্ণুপদের প্রার্থী। আপনারা জানেন, বিষ্ণু ত্রিপাদ দ্বারা তিন লোক আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য বিষ্ণুর এই ত্রিপাদাক্রমণের মাহাত্ম্য-বর্ণনায় পূর্ণ। তদনুকরণে যজমান তিন পা ফেলিয়া পূর্ব্বমুখে আহবনীয় পর্য্যন্ত যজ্ঞস্থল প্রক্রমণ করেন, ইহার নাম বিষ্ণুক্রম-প্রক্রমণ। পূর্ব্বদিকে দেবতাদের স্থান; যজমান পূর্ব্ব দিকে তাকাইয়া বলেন, আমি জ্যোতিতে গমন করিয়াছি; জ্যোতির সহিত আমি মিলিত হইয়াছি। পরে যজমান সূর্য্যের এবং গার্হপত্য অগ্নির উপস্থান করিয়া প্রার্থনা করেন,—"হে গৃহপতি অগ্নি, আমি যেন তোমা দ্বারা সুগৃহপতি হই।" পুত্রের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন,—"আমার এই পুত্র এই বীরকর্ম্মকে অনুক্রমে বিস্তারিত করুক।" তৎপরে আহবনীয় অগ্নির উপস্থান করিয়া যজ্ঞের পূর্ব্বদিন যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিসর্জ্জন করেন। বিসর্জ্জনের পর যজ্ঞশালার বাহিরে আসিয়া যজমান এবং ব্রহ্মা পুরোডাশের যে ভাগ তাঁহাদের জন্য রক্ষিত ছিল, তাহা ভক্ষণ করেন। সর্ব্বশেষে ব্রহ্মা আহবনীয়ে সমিৎ দিয়া পূর্ণমাস ইষ্টি সমাপ্ত করিয়া দেন। যজ্ঞান্তে ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণা দিতে হয়। পূর্ণমাস-যজ্ঞ প্রত্যেক গৃহীর পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধনী দরিদ্র সকলকেই ইহা করিতে হইবে। দক্ষিণা ব্যয়সাধ্য হইলে চলিবে না। যজ্ঞের আরম্ভে

দক্ষিণাগ্নিতে চারি জন ঋত্বিকের উপযুক্ত ভাত চড়াইয়া দেওয়া হয়। উহা দক্ষিণাগ্নিতেই পক্ব হয়। এই অন্নই দক্ষিণা; যজ্ঞশেষে ঋত্বিকেরা এই অন্ন ভোজন করেন; ইহাতেই যজ্ঞ দক্ষিণান্ত হয়।

পূর্ণমাস-যজ্ঞের বিবরণ দিলাম। ইহাতেই ইষ্টিযাগ জিনিসটা কি, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিবেন। এখন পশুযাগের কথা বলিতে চাহি। পশুযাগ নানাবিধ। তাহার মধ্যে একটি পশুযাগ অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহার নাম নিরূঢ়-পশুবন্ধ। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায় এই যাগ কর্ত্তব্য। কাহারও মতে বৎসরে দুই বার কর্ত্তব্য; উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে। এই পশুযাগ অন্য যাবতীয় পশুযাগের প্রকৃতি। ইহারই বিবরণ দিলে সকল পশুযাগেরই মোটামুটি জ্ঞান জন্মিবে।

ইষ্টিযাগে চারি জন ঋত্বিক্ আবশ্যক। অধ্বর্য্যু, হোতা, ব্রহ্মা এবং অগ্নীৎ। পশুযাগে আরও দুই জন আবশ্যক। এক জন অধ্বর্য্যুর সহকারী; তাঁহার নাম প্রতিপ্রস্থাতা। আর এক জন হোতার সহকারী; তাঁহার নাম মৈত্রাবরুণ। এই ছয় জন ঋত্বিক্ লইয়া পশুযাগ আরম্ভ করিতে হয়। ইষ্টিযাগে যজ্ঞের সরঞ্জাম রাখিবার জন্য যে বেদি থাকে, সেই বেদির পশ্চিমে থাকে গার্হপত্য এবং পূর্ব্বে থাকে আহবনীয়। পশুযাগে আরও একটি বেদি নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহার নাম পাশুক বেদি। আহবনীয় অগ্নিরও পূর্ব্ব দিকে এই বেদি নির্ম্মিত হয়। এই পাশুক বেদিরও উপরে আরও একটি ছোট বেদি তুলিতে হয়; তাহার নাম উত্তরবেদি। যজ্ঞশালার উত্তর দিকে মাটি তুলিয়া সেই মাটিতে উত্তরবেদি গড়া হয়। মাটি তুলিলে যে গর্ত্ত হয়, সে গর্ত্তের নাম চাত্বাল। চাত্বালের কাছে পাশুক বেদির ধূলি আবর্জ্জনা স্তূপাকৃতি করিয়া রাখা হয়। ঐ স্তূপের নাম উৎকর। উত্তর-বেদির মধ্যস্থলের নাম নাভি। আহবনীয় হইতে অগ্নি আনিয়া এই নাভিতে রাখা হয়। নাভিস্থিত সেই অগ্নিতে আবার নূতন অগ্নি নিক্ষেপ করিতে হয়। অরণি ঘর্ষণ করিয়া অগ্নিমন্থন দ্বারা এই নূতন অগ্নি উৎপাদিত হয়। নাভিতে এই দুই অগ্নি মিশাইলে তদবধি এই অগ্নিই নূতন আহবনীয়রূপে গণ্য হইয়া থাকে। পুরাতন আহবনীয় আপনার মর্য্যাদা হারাইয়া তদবধি গার্হপত্যের কাজ করে। পাশুক বেদির উপরে পশুযাগের উপযুক্ত সরঞ্জাম এবং আহুতির দ্রব্য রাখিতে হয়।

পশুবন্ধনের জন্য যূপের দরকার। এই যূপ কাঠের স্তম্ভ মাত্র। অধ্বর্য্যু স্বয়ং ছুতারের সহিত বাহিরে গিয়া গাছের ডাল কাটিয়া আনেন। উহার ডালপালা ছাঁটিয়া অষ্টকোণ স্তম্ভ বা খুঁটি প্রস্তুত করা হয়। যূপ অন্যূন পাঁচ হাত দীর্ঘ হয়; হাতখানেক মাটির নীচে পোঁতা থাকে। পাশুক বেদির পূর্ব্ব দিকে যূপ পোঁতা হয়। আটকোণা যূপের মাথায় একটা মুকুট থাকে; তাহার নাম চষাল। যূপের গায়ে ঘি মাখাইতে হয়; এই কর্ম্মের নাম যূপাঞ্জন। তার পর দড়ি জড়াইতে হয়, এই দড়ির নাম রশনা। রশনার ভিতর এক খণ্ড কাঠ পরাইতে হয়, এই কাষ্ঠখণ্ডের নাম স্বরু। প্রত্যেক কর্ম্ম অধ্বর্য্যু সম্পাদন করেন, আর হোতা প্রত্যেক কর্ম্মের অনুকূলে ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করেন। এইরূপে যূপ পশুবন্ধনযোগ্য হয়।

বন্ধনের পূর্ব্বে পশুকে দুইগাছি কুশ দ্বারা স্পর্শ করিতে হয়; ইহার নাম উপাকরণ। পশুর দুই শিঙের মাঝে দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি যূপের রশনায় বাঁধিতে হয়। এইরূপ পশুবন্ধনের নাম পশুনিয়োজন। পশুর কপালে ঘি মাখান হয়।

নিয়োজনের পর যাগের আয়োজন। যাগের আরম্ভ অনেকটা ইষ্টি-যাগের আরম্ভেরই মত। উত্তরবেদির নাভিতে যে নূতন আহবনীয় অগ্নি স্থাপিত হইয়াছে, সামিধেনী মন্ত্রের সহিত তাহাতে সমিৎ প্রক্ষেপ করিয়া আগুন জ্বালান হয়। পরে সেই আগুনে আঘার হোম করিয়া দেবহোতা অগ্নির বরণ এবং তৎপরে মানুষ হোতার বরণ ইষ্টিযাগেরই মত। বরণ পাইয়া দেবতারা যজ্ঞস্থলে আসেন। এখন প্রধান যাগের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রযাজ যাগ। ইষ্টিযাগে পাঁচটি মাত্র প্রযাজ; পশুযাগে প্রযাজের সংখ্যা এগারটি। এই এগার যাগের দেবতাও এগার জন। ইষ্টিযাগের পাঁচ জন ত আছেনই; তাহার অতিরিক্ত আরও ছয় জন দেবতা পশুযাগে প্রযাজ আহুতি পাইয়া থাকেন। এই এগার জন দেবতার নাম যথাক্রমে (১) সমিৎ, (২) তনূনপাৎ অথবা নরাশংস, (৩) ইড়ঃ, (৪) বর্হিঃ, (৫) দুরঃ, (৬) উষাসানক্তৌ, (৭) দৈব্যৌ হোতারৌ, (৮) ত্রিস্রঃ দেব্যঃ (ইড়া, সরস্বতী এবং ভারতী, এই তিন দেবী। ইহারা তিনে এক এবং একেই তিন; এই তিন দেবতার কথা আপনারা মনে রাখিবেন; ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে), (৯) ত্বষ্টা, (১০) বনস্পতি, (১১) স্বাহাকার। প্রত্যেক প্রযাজ যাগের পূর্ব্বে মৈত্রাবরুণের আদেশ পাইয়া হোতা যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন। পশুযজ্ঞে প্রযাজ যাগের

যাজ্যামন্ত্রের একটু বিশিষ্টতা আছে। এই যাজ্যামন্ত্রের নাম আপ্রীমন্ত্র। দেবতাকে প্রীত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় বলিয়া মন্ত্রের নাম আপ্রীমন্ত্র। ঋগ্বেদসংহিতামধ্যে অনেকগুলি আপ্রীসূক্ত আছে। প্রত্যেক সূক্তে ঐ এগার দেবতার উদ্দেশে এগারটি আপ্রীমন্ত্র পাওয়া যায়। এক একটি সূক্ত এক এক ঋষির প্রচারিত। কোনও সূক্ত বশিষ্ঠের, কোনটি বিশ্বামিত্রের, কোনটি জমদগ্নির ইত্যাদি। যজমান যে ঋষির গোত্রে উৎপন্ন, সেই ঋষির মন্ত্র তাঁহার আপ্রীমন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে হয়। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন যজমানের পক্ষে প্রযাজ যাগে যাজ্যামন্ত্র বা আপ্রীমন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এগার প্রযাজের মধ্যে প্রথম দশটিতে আহুতির দ্রব্য আজ্য। শেষ প্রযাজে আজ্যাহুতি হয় না। সেখানে পশুর বপা আহুতি দিতে হয়। পেটের উপরে নাভির পাশে মেদের নাম বপা। এই বপার দ্বারা অন্তিম প্রযাজের দেবতা স্বাহাকৃতির উদ্দেশে যাগ হয়। কাজেই প্রথম দশ প্রযাজ সম্পন্ন করিয়া, শেষ প্রযাজের পূর্ব্বেই পশুবধের আয়োজন করিতে হইবে।

যে ব্যক্তি পশু বধ করে, তাহার নাম শমিতা। পাশুক বেদির উত্তরে চাত্বালের কাছে পশুবধের স্থান। সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেই-খানে পশুর অঙ্গ পাকের জন্য আগুন জ্বালিতে হয়। সেই অগ্নির নাম শামিত্র অগ্নি। একজন ঋত্বিকের নাম অগ্নীৎ, ইহাকে ইষ্টিযাগেও পাওয়া গিয়াছে। ইনি উল্মুক অর্থাৎ আগুনের উল্কা জ্বালিয়া পশুর চারি দিকে ঘুরাইয়া দেন। উদ্দেশ্য এই যে, রাক্ষসেরা পশুকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। রাক্ষসেরা আগুনকে ভয় করে। এই অগ্নিভ্রামণ কর্ম্মের নাম পর্য্যগ্নিকরণ। এই সময়ে হোতা পশুবধের জন্য শমিতাকে নিযুক্ত করেন। যে মন্ত্র দ্বারা নিয়োগ করা হয়, তাহার ব্যাখ্যা যিনি জানিতে চাহেন, তিনি আমার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বাঙ্গালা অনুবাদ দেখিবেন। মন্ত্রমধ্যে দুই একটা কথা আপনাদের কৌতুক জন্মাইতে পারে। মন্ত্রমধ্যে বলা হয়,—এই পশুর বধকর্ম্মে ইহার মাতা অনুমতি দিক, পিতা অনুমতি দিক, সহোদর ভ্রাতা অনুমতি দিক, ইহার সখা এবং দলস্থিত অন্যান্য পশুও অনুমতি দিক। আবার বলা হয়,—ইহার পা উত্তর দিক্ আশ্রয় করুক; চক্ষু সূর্য্যকে আশ্রয় করুক, প্রাণ বায়ুকে, জীবন অন্তরিক্ষকে, শ্রোত্র দিক্‌সকলকে, এবং শরীর পৃথিবীকে আশ্রয় করুক। শেষে বলা হয়,—অহে বধকর্ত্তা, এই পশুকে হনন কর—হনন কর—হনন কর; অপাপ—অপাপ—অপাপ। এই কর্ম্মে যে সুকৃত হইল, তাহা

আমাদের উপরে অর্পিত হউক। যে দুষ্কৃত হইল, তাহা অন্যের উপর অর্পিত হউক। মন্ত্র পাঠের পর অগ্নীৎ উল্মুকহস্তে আগে আগে চলেন। শমিতা দড়ি ধরিয়া পশুকে লইয়া চলেন। তৎপশ্চাৎ প্রতিপ্রস্থাতা, অধ্বর্য্যু এবং যজমান চলেন। শামিত্র দেশে অর্থাৎ বধস্থানে উপস্থিত হইয়া অধ্বর্য্যু ভূমিতে একগাছি তৃণ ফেলিয়া দেন এবং যজমান এবং ঋত্বিক্ সকলে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মুখ ফিরাইয়া বসেন, যেন হত্যা কর্ম্মটা দেখিতে না হয়। বধের রীতিটা বলিতে না হইলেই ভাল হইত। শ্বাস রোধ করিয়া বধ করা হয়। এইরূপ বধের নাম সংজ্ঞপন। বধের পর যজমান, যজমানের পত্নী এবং অধ্বর্য্যু জল ঢালিয়া পশুকে ধুইয়া দেন। অধ্বর্য্যু পেট চিরিয়া বপা বাহির করিয়া লন। তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা দুইখানা কাঠে সেই বপা লইয়া শামিত্র অগ্নিতে তপ্ত করেন; পরে উত্তরবেদির নাভিস্থিত আহবনীয় অগ্নির উপরে ধরিয়া থাকেন। অগ্নির উত্তাপে বপা গলিয়া বিন্দু বিন্দু আগুনে পড়িতে থাকে। অধ্বর্য্যু সঙ্গে সঙ্গে বপার উপর ঘি ঢালেন। সেই বপার কিয়দংশ যথাবিধি আপ্রীমন্ত্র পাঠের পর আগুনে ফেলিয়া অন্তিম প্রযাজ যাগ সম্পন্ন হয়। বপার অবশিষ্ট প্রধান যাগের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়।

আমি নিরূঢ়পশুবন্ধ নামক অবশ্যকর্ত্তব্য পশুযাগের কথা বলিতেছি। এই যাগের প্রধান দেবতা ইন্দ্র এবং অগ্নি। প্রযাজ যাগের পর অধ্বর্য্যু তাঁহাদের উদ্দেশে প্রথমে বপাহুতি দেন। বপাহুতির পর পুরোডাশ আহুতি এবং পশুর অঙ্গ আহুতি। পূর্ণমাস প্রসঙ্গে বলিয়াছি, সেখানে পুরোডাশই প্রধান আহুতি। পশুযাগের আহুতির দ্রব্য পশুর বপা এবং পশুর মাংস। কিন্তু পশুমাংসের সহিত পুরোডাশের আহুতি না দিলে পশুযাগও সম্পন্ন হয় না। ইষ্টিযাগে অধ্বর্য্যু যেমন পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়া রাখেন, এখানেও সেইরূপ তাঁহাকে পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। বপাহুতির পর এক দিকে শামিত্রাগ্নিতে পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাক হইতে থাকে। অন্য দিকে অধ্বর্য্যু পুরোডাশযাগ করিতে থাকেন।

পশুর সকল অঙ্গ মেধ্য অর্থাৎ আহুতিযোগ্য নহে। হৃদয়, জিহ্বা প্রভৃতি এগারটি অঙ্গ প্রধান দেবতার আহুতিযোগ্য। পশুর রক্ত রাক্ষসের প্রাপ্য। উহা উৎকরে অর্থাৎ যজ্ঞশালার বাহিরে আবর্জ্জনাস্তূপে ফেলিয়া

দেওয়া হয়। যিনি পশুবধকর্ত্তা শমিতা, তিনিই ছুরি দিয়া পশুর অঙ্গগুলি কাটিয়া লন, এবং তিনিই পশুমাংস হাঁড়িতে চাপাইয়া জলে সিদ্ধ করেন।

পুরোডাশ আহুতি শেষ হইলে শমিতা খবর দেন—পশুর অঙ্গ পাক হইয়াছে। অধ্বর্য্যু আসিয়া প্রধান দেবতা ইন্দ্রের ও অগ্নির উদ্দেশে পশুর অঙ্গ আহুতি দেন। অনুবাক্যা পাঠ করেন মৈত্রাবরুণ এবং যাজ্যা পাঠ করেন হোতা স্বয়ং। পাকের হাঁড়িতে মাংস সিদ্ধ করিবার সময় খানিকটা চর্ব্বি ভাসিয়া উঠে। সেই চর্ব্বিতে দধি এবং ঘি মাখাইয়া বনস্পতি-দেবতার উদ্দেশে এই সময়ে আহুতি দিবার প্রথা আছে।

প্রধান যাগের পর স্বিষ্টকৃৎ যাগ। আগে বলিয়াছি, ইহা রুদ্র দেবতার প্রাপ্য। পশুর কয়েকটি অঙ্গ এজন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে।

তৎপরে হবিঃশেষ ভক্ষণ। ঋত্বিকেরা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ভাগ ভক্ষণ করেন, এবং যজমান এবং ছয় জন ঋত্বিক্ একযোগে ইড়া ভক্ষণ করেন। পূর্ণমাস প্রসঙ্গে বলিয়াছি, এই ইড়া ভক্ষণের একটা গভীর তাৎপর্য্য আছে; সে তাৎপর্য্যের কথা পরে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে; নতুবা যজ্ঞের তাৎপর্য্যই বুঝান হইবে না।

প্রধান যাগ সমাপ্ত হইল। তৎপরে অনুযাজ। ইষ্টিযাগে অনুযাজের সংখ্যা তিনটি, কিন্তু পশুযাগে অনুযাজের সংখ্যা এগারটি। প্রযাজ যেমন এগারটি, অনুযাজও তেমনি এগারটি। প্রযাজের দেবতাদের অধিকাংশই অনুযাজেরও দেবতা। দধিমিশ্রিত আজ্য দ্বারা এই এগারটি আহুতি দেওয়া হয়। অধ্বর্য্যু আহুতি দেন, আর তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা অন্যত্র আগুন জ্বালিয়া পশুমাংস দ্বারা উপযাজ হোম করেন। এই উপযাজ হোম পশুযাগেই আছে, ইষ্টিযাগে নাই। ইহা যাগ নহে, হোম মাত্র। যাগের ও হোমের পার্থক্য আগে বলিয়াছি। যূপের গায়ে স্বরু নামে যে কাষ্ঠখণ্ড বাঁধা ছিল, তাহা এই সময়ে আগুনে দেওয়া হয়।

ইহার পর পত্নীসংযাজ। যজমানের পত্নীর পক্ষে ইহা গার্হপত্য অগ্নিতে অনুষ্ঠেয়। আহুতির দ্রব্য পশুর লাঙ্গুল। ইহাতেই যাগ সমাপ্ত হইল। সূক্তবাক্, শংযুবাক্ প্রভৃতির পাঠ হইতে যজমানের বিষ্ণুক্রম-প্রক্রমণ এবং ব্রতবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত যাগ-সমাপ্তিসূচক কর্ম্ম ইষ্টিযাগের মতই। পুনরুল্লেখ আবশ্যক নহে।

যাবতীয় শ্রৌত যজ্ঞকে ইষ্টিযাগ, পশুযাগ এবং সোমযাগ, এই তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সোমযাগের কথা আগামী বারে বলিব। ইষ্টিযাগ এবং পশুযাগের দুইটি নমুনা দিলাম। ইহাতেই নিশ্চয় আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে। ইষ্টিযাগের ও পশুযাগের যে নমুনা দিলাম, তাহা শুনিয়া শ্রৌত কর্ম্মের উপর আপনাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে কি না, তাহা বলিতে পারি না। আপনাদের শ্রদ্ধা হউক আর না হউক, এক কালে বেদপন্থী সমাজে এই সকল কর্ম্ম পরম শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইত। আপনারা উপহাস করিয়া বলিবেন, এ সমস্ত অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ irrational; মানুষের প্রজ্ঞা, মানুষের সুস্থ বিচারবুদ্ধি, কিছুতেই এ-সকলের সমর্থন করিতে পারে না। তাহা হইতে পারে। ইংরেজীতে যাহাকে রিলিজন বলে, তাহা সর্ব্বতোভাবে Reasonএর এলাকার বাহিরে। সভ্য অসভ্য সকল সমাজের লোকেই এইরূপ অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা রাখে; প্রভেদ কেবল মাত্রাগত। অতএব যিনি মানবতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে মানবপ্রকৃতির এই অংশের আলোচনায় নিবৃত্ত থাকিলে চলিবে না। ইহাকে মানবের দুর্ব্বলতা বলিতে হয় বলুন, কিন্তু ইহাকে পাশবিকতা বলিতে পারিবেন না। কেন না, পশুর মধ্যে এই সকল অনুষ্ঠান নাই। পশুর পক্ষে এ দুর্ব্বলতা নাই। কোনও পশু কোনও রিলিজনের ধার ধারে না। ইহা মানবিকতা বটে, ইহা কখনই পাশবিকতা নহে।

দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা মতের আজকাল খুব প্রাদুর্ভাব। উহাকে Animism বলে। পণ্ডিতেরা বলেন, এই Animism হইতে যাবতীয় রিলিজনের উৎপত্তি। অসভ্য লোকে সমস্ত পৃথিবীকে দেবতাময় দেখে। সকল দ্রব্যেরই এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। এই সকল দেবতা সূক্ষ্মশরীরধারী হইলেও মানুষের মতই রাগদ্বেষাদির অধীন। তাঁহাদের ক্ষমতা মানুষের চেয়ে অনেক অধিক। অনেক জাগতিক ঘটনা তাঁহারাই পরিচালনা করেন। মানুষের শুভাশুভ অনেক স্থলে ইহাদের হাতে। বৈজ্ঞানিকেরা জগৎব্যাপারকে যন্ত্র হিসাবে দেখিতে চাহেন। যন্ত্রের ভিতরে খেয়াল নাই। উহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন। অবৈজ্ঞানিক অসভ্য মানুষ সে সকল নিয়মের অস্তিত্ব জানে না; সে সর্ব্বত্রই দেবতার খেয়াল দেখে। ইহাই Animism. বিজ্ঞান-বিদ্যার উন্নতির সহিত মানুষে animism হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হয়। ক্রমশঃ হয়, একবারে হয় না। আপনারা জানেন,

সৌর জগতের গ্রহ উপগ্রহ বাঁধা নিয়মে চলিতেছে। নিউটনের পূর্ব্বে কেপ্‌লার এই নিয়মগুলির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে কেপ্‌লারের স্থান খুব উচ্চে। এমন কি, পূর্ব্বে কেপ্‌লার না জন্মিলে নিউটন তাঁহার কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু এহেন কেপ্‌লারও animismএর উপদ্রব এড়াইতে পারেন নাই। গ্রহগুলি কেন এইরূপ বাঁধা পথে ঘুরিতেছে, ইহা বুঝিতে গিয়া কেপ্‌লার বলিয়া ফেলিলেন, প্রত্যেক গ্রহের এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁহারাই চক্রান্ত করিয়া আপনাদের বাহন গ্রহগুলিকে ঐরূপে ঘুরাইতেছেন। ইহাই animism. এই সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কার কতটুকু শক্তি, তাহা জানা নাই। অগত্যা সকলকেই খুসি রাখিতে হয়। দেবতাকে খুসি রাখিবার চেষ্টা হইতে রিলিজনের উৎপত্তি। পণ্ডিতেরা বলেন, ইহা হইতেই পূজা অর্চ্চনা, যাগ যজ্ঞের উৎপত্তি। ইহার মূলে মানুষের স্বার্থান্বেষণ। ক্রমশঃ সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত মহত্তর উদ্দেশ্য আরোপ করা হয়। সভ্যতা বৃদ্ধি হইলেও পুরাতন অনুষ্ঠানগুলি ত্যাগ করা হয় না, কিন্তু তাহাতে নূতন উদ্দেশ্য আরোপ করা হয়। ই. বি. টাইলার একজন প্রসিদ্ধ মানবতত্ত্ববিৎ। তিনি Animism theoryর এক জন প্রধান প্রচারক। তিনি সভ্য অসভ্য নানা সমাজের অনুষ্ঠানের সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিশ্লেষণ এবং আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূলে কোনরূপ ethical element থাকে না বলিলেই হয়। যদি থাকে, তাহা scanty এবং rudimentary. উন্নত সমাজে আসিয়া তাহাই কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠানের vital point হইয়া দাঁড়ায়। টাইলার এক স্থলে যাগ যজ্ঞ সম্বন্ধে বলিতেছেন ;— Sacrifice has passed in the course of religious history into transformed conditions, not only of the rite itself, but of the intention with which the worshipper performs it. অনুষ্ঠান যাহাই হউক, এই intentionটাই বড় কথা। যে উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করা হয়, ধর্ম্মের ইতিহাসে তাহাই বড় কথা। টাইলার সাহেব ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানের অভিব্যক্তিতে তিনটা স্তর বাহির করিয়াছেন। তিন স্তর সম্বন্ধে তিনটা theory খাড়া করিয়াছেন। প্রথম হইল gift theory, তার পরে homage theory, এবং সকলের উপরে abnegation theory. এক-একটা থিয়োরি বুঝিবার চেষ্টা করুন।

Gift theoryমতে ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ স্বার্থমূলক। দেবতা যাহা পাইলে খুসী হইবেন, দেবতাকে তাহাই দাও। পাদ্য অর্ঘ্য, ধূপ দীপ, বস্ত্র অলঙ্কার, মানুষ যাহাতে খুসী হয়, দেবতাও তাহাতে খুসী হইবেন। টাইলার সমস্ত পৃথিবী হইতে নানা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের দেশেও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দেবতাকে যে যাহা দিতে পারে, দিয়া খুসী রাখে। বিশেষতঃ উদর পূরণের ব্যবস্থাটা ভাল করিলে সকলেই খুসী হয়। নইলে এ দেশের বড় লোকেরা সাহেবদিগকে খানা দিতে এত ব্যস্ত কেন? দেবতাদের ভাল করিয়া খানার ব্যবস্থা করিতে হয়। পশুমাংস অনেক দেবতাই ভালবাসেন্। কোন্ দেবতা কোন্ পশু ভালবাসেন, প্রত্যেক যজ্ঞে তাহার নির্দ্দেশ আছে। যাজ্যামন্ত্রে দেবতাকে ডাকিয়া যখন বলা হয়, অগ্নে বীহি বৌষট্—তাহার অর্থই যে, অগ্নি, তুমি খাও এবং দেবতার নিকট খাদ্য বহিয়া লইয়া যাও। বৌষট্ শব্দটা মূলে বহ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহাই হইল টাইলরের gift theory. তাহার পরে homage theory, এখানে দেবতার লাভের জন্য দেবতাকে উপহার দেওয়া হয় না; যে উপহার দেওয়া যায়, দেবতা তাহা না লইতেও পারেন; কিন্তু আমি যে দেবতাকে দিতে প্রস্তুত আছি, ইহাই জানাইয়া আপনার অধীনতার বা বশ্যতার পরিচয় দেওয়া হয়। ইহারই নাম homage। এ দেশে রাজাকে, জমিদারকে নজর দেওয়া রীতি আছে; রাজা নজরের টাকা গ্রহণ করেন, অথবা স্পর্শ মাত্রই ফিরাইয়া দেন; প্রজা তাহাতেই কৃতার্থ হয়। দেবতাও সেইরূপ গ্রহণ করুন, আর না করুন, কোনও দ্রব্য উপহার দিয়া বা উপহারের অভিনয় করিয়া দেবতার বশ্যতা স্বীকার করা হয়। এই অনুষ্ঠানে একটু ধর্ম্মভাব, একটু ethical element আছে। জেহোবার মন্দিরে ইহুদীরা মহা আড়ম্বরে পশু বলি দিত। মন্দিরের উঠান গরু এবং ভেড়ার পালে পরিপূর্ণ থাকিত। উচ্চ বেদির উপর সর্ব্বদা আগুন জ্বলিত। বেদির নীচে নর্দ্দমায় রক্তের স্রোত বহিত। আড়ম্বরের অন্ত ছিল না; অথচ য়িহুদিরা তাহাদের জেহোবাকে খুব বড় দেবতা মনে করিত। তিনি যে কেবল উদর পূরণের জন্য এত উপহার লইতেছেন, এরূপ মনে করা বোধ হয় তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাহাদের একটা প্রধান পূজার নাম sin-offering. য়িহুদী সর্ব্বদাই আপনাকে পাপী মনে করিত। তাহাদের যত কিছু দুঃখ তাপ, তাহা সেই পাপেরই ফল মনে করিত। এই sin-offeringএর দ্বারা জেহোবার

নিকট সেই পাপ স্বীকার করিয়া পাপ ক্ষালনের কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিত মাত্র। ইহা দেবতাকে ঘুষ দেওয়া নহে; দেবতার নিকট দৈন্য স্বীকার বা বশ্যতা স্বীকার মাত্র। ইহারও উপরে abnegation theory. Abnegation শব্দের অর্থ স্বার্থত্যাগ। এখানে উদ্দেশ্য স্বার্থলাভ নহে; উদ্দেশ্য বরং তাহার বিপরীত। ইহার ভিতরে মানুষের ধর্ম্মভাবটা আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবতার লাভ হউক বা না হউক, দেবতা ফল দেন বা না দেন, আমাকে কিছু ত্যাগ করিতেই হইবে। আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়া যাই; কর্ম্মফলে দৃষ্টি রাখিবার আমার দরকার নাই। এরূপ স্থলে ধর্ম্মানুষ্ঠানে দেবতার উদর পূরণের চেষ্টা থাকে না; তবে এমন কোনও দ্রব্য দিতে হয়, যাহাতে আমার স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়; যাহার ত্যাগে বস্তুতই আমার সমূহ ক্ষতি আছে। নরবলির কথা আপনারা জানেন। এখনও বহু সমাজে নরবলি চলিত আছে; এক কালে হয়ত সকল সমাজেই ছিল। যাহারা নরমাংস উপাদেয় বলিয়া ভক্ষণ করে, তাহারা দেবতাকে সেই উপাদেয় মাংস ভোজনের জন্য দিবে, তাহাতে বিস্ময় কি! কিন্তু যাহারা নরমাংস ভোজন করে না, তাহাদের মধ্যেও নরবলির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। য়িহুদী, গ্রীক, রোমান, সকলেই এক কালে নরবলি দিত, তাহা আপনারা জানেন। আইফিজিনিয়ার গল্প, জেফথার দুহিতার গল্প আপনারা জানেন। ফিনিক প্রভৃতি সেমিটিক জাতিরা সুসভ্য জাতি ছিল; অথচ তাহাদের মধ্যে এই ভীষণ প্রথা বহুল ভাবে চলিত ছিল। দেবতাকে দিবার জন্য বড় ঘরের ছেলে পছন্দ করা হইত। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পছন্দ করা হইত। পিতার এক মাত্র পুত্রকে পছন্দ করা হইত। রোম-সাম্রাজ্যের যখন খুব পরাক্রম, তখন সম্রাট্ এলাগাবেলাস নূতন করিয়া নরবলির প্রচলন করেন। সাম্রাজ্যের বড় বড় ঘরের ছেলে ধরিয়া আনিয়া বলি দেওয়া হইত। ব্যাপারটা ভীষণ এবং লোমহর্ষকর। কিন্তু ইহার ভিতর কিঞ্চিৎ ধর্ম্মভাবও আছে। দেবতা নরমাংস খাইতে ভালবাসেন, এরূপ তাৎপর্য্য নয়; তাৎপর্য্য ত্যাগস্বীকার; যাহা সব চেয়ে মূল্যবান্, যাহা সব চেয়ে প্রিয়, তাহাকেই উৎসর্গ করিতে পারিলে তবেই ত ত্যাগস্বীকার হয়। আপনারা শুনঃশেফের বৈদিক আখ্যায়িকা শুনিয়া থাকিবেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং কৌষীতকি ব্রাহ্মণে এই আখ্যায়িকা আছে। ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা হরিশ্চন্দ্রের শত পত্নী সত্ত্বেও পুত্র হয় নাই। তিনি বরুণের নিকট মানসিক করিলেন,

আমাকে পুত্র দাও ; সেই পুত্রই তোমাকে দিব। বরুণের বরে পুত্র জন্মিল। রাজা কিন্তু পুত্র দিতে পারিলেন না, নানা ওজর বাহির করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। বয়স হইলে পুত্র বনে পলাইল। দেবতার ক্রোধে রাজার উদরী রোগ হইল। পুত্র রোহিত বনের মধ্যে অজীগর্ত্ত নামক এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন। তাহার তিন পুত্র ছিল। রোহিত মনে করিলেন, অজীগর্ত্তের একটি পুত্রকে খরিদ করিয়া পিতার নিকট পাঠাইয়া দিই। আমার বদলে তাহাকে দিলেই বরুণ খুসী হইবেন। ইহাকেই বলে নিষ্ক্রয়। তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠকে তাহার বাপ ছাড়িয়া দিল না ; কনিষ্ঠকে মা ছাড়িল না। অবশেষে মধ্যম শুনঃশেফকে রোহিত খরিদ করিয়া লইলেন। রাজা শুনঃশেফকে পশুরূপে পাইয়া যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। যজ্ঞের পর্য্যগ্নিকরণ পর্য্যন্ত হইয়া গেল, কিন্তু শুনঃশেফকে বধ করিবার লোক পাওয়া যায় না। নরপশু-বধে কেহ রাজি হয় না। পিতা অজীগর্ত্ত উপস্থিত ছিল। সে মূল্য পাইয়া পুত্রকে বেচিয়াছিল ; আর কিছু মূল্য পাইয়া খড়্গহস্তে পুত্রবধে উপস্থিত হইল। পুত্র তখন অগত্যা দেবতাদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। নানা দেবতার উদ্দেশে তাঁহার মুখ দিয়া ঋক্‌মন্ত্র বাহির হইতে লাগিল। এই ঋক্‌মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলে পাওয়া যায়। দেবতারা খুসী হইলেন ; শুনঃশেফের বন্ধন খুলিয়া গেল। অজীগর্ত্ত তখন বলিলেন, বাবা শুনঃশেফ, আমার কাছে ফিরে এস। ঋত্বিক্‌দিগের মধ্যে একজন ছিলেন স্বয়ং বিশ্বামিত্র। তিনি শুনঃশেফকে কোলে লইয়া বলিলেন, শুনঃশেফ, তুমি এই পিশাচ বাপটার কাছে যাইও না, আমি তোমাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলাম। আমার পুত্রগণের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ হইবে। শুনঃশেফের মুখ দিয়া ইতিপূর্ব্বেই ঋক্‌মন্ত্র বাহির হইয়াছিল ; তদবধি তিনি ঋষি দেবরাত নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বিশ্বামিত্রের অনুগ্রহে তিনি জহ্নু-বংশের আধিপত্য এবং গাধিবংশের দৈব কর্ম্মের অধিকারী হইয়া উভয় বংশের গৌরব বাড়াইলেন।

বেদপন্থী সমাজের যে যুগের কথা বলিতেছি, সে সময়ে নরযজ্ঞ প্রচলিত ছিল কি না, এ প্রশ্ন উঠে। শুনঃশেফের উপাখ্যান পড়িয়া প্রথমেই সন্দেহ জন্মে, তখন নরযজ্ঞ হয়ত প্রচলিত ছিল। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা বৈদিক সাহিত্যের যথোচিত আলোচনা করিয়াছেন ; কিন্তু বেদপন্থী সমাজের কোন দোষ বা ত্রুটি পাইলে তাহা ঢাকিবার জন্য বিশেষ আগ্রহের পরিচয় দেন

নাই। তাঁহারাও প্রায় একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, সে সময়ে নরযজ্ঞ চলিত ছিল না। শুনঃশেফের গল্প, গল্প মাত্র। উহা ইতিহাস নহে। পণ্ডিতেরা প্রায় একবাক্যে বলেন, শুনঃশেফের উপাখ্যানটি পরবর্ত্তী কালের কাল্পনিক উপাখ্যান। নরযজ্ঞ চলিত থাকিলে শুনঃশেফকে বধের জন্য লোকের অভাব হইত না। বিশ্বামিত্র, যিনি যজ্ঞের ঋত্বিক্ ছিলেন, তিনি ত শুনঃশেফের বাপের উপর চটিয়াই আগুন হইয়াছিলেন, যজ্ঞ পণ্ড হওয়ায় তিনি খুসীই হইয়াছিলেন। শুনঃশেফও পিতাকে বলিয়াছিল—তুমি আমার বাপ নহ; তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, শূদ্রেও তাহা পারে না। অতএব এই উপাখ্যান হইতে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় না যে, নরযজ্ঞ সে সময়ে প্রচলিত ছিল। বেদে পুরুষমেধের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও নরযজ্ঞ নহে। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, ইহা symbolical sacrifice. প্রাচীন বেদপন্থী সমাজে নরযজ্ঞ ছিল না, সে বিষয়ে মতভেদ নাই বলিলেই হয়।

সে সব কথা এখন থাক। শুনঃশেফের উপাখ্যানে আপনারা দেখিলেন, রাজপুত্র রোহিত আপনার বদলে শুনঃশেফকে অর্পণ করিয়া দেবতাকে তৃপ্ত করিতে চাহিতেছেন। এইরূপ একের বদলে অন্যকে প্রদান, একের প্রতিনিধিরূপে অন্যকে প্রদান—ইহার নাম নিষ্ক্রয়—vicarious offering. যজ্ঞানুষ্ঠানে এই নিষ্ক্রয়ের প্রথা বহু দেশে প্রচলিত আছে। টাইলর সাহেবই নানা দেশ হইতে নানা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এই নিষ্ক্রয়ের থিয়োরির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মানবজাতি বাবা আদমের পাপে পাপী। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য sacrifice দরকার। য়িহুদীদের মধ্যে পাপ-ক্ষালনার্থ পশুবলির প্রথা প্রচলিত ছিল। জেহোবার মন্দিরে সহস্রে সহস্রে পশু বলি হইত। খ্রীষ্ট আসিয়া বলিলেন, পশু বলির আর প্রয়োজন নাই। মানুষ আপনাকে বলি না দিলে বিধাতার ক্রোধ যাইবে না; নরবলি আবশ্যক। কিন্তু বিধাতা করুণাময়; তিনি দেখিলেন, আমি নিজে দয়া না করিলে মানুষের পরিত্রাণ নাই। অতএব তিনি পুত্রকে মর্ত্ত্যলোকে পাঠাইলেন। এই পুত্রই খ্রীষ্ট; পিতাপুত্রে কোনও ভেদ নাই; পিতাপুত্রে উভয়েই একাত্মা। ঈশ্বর এক বই দুই নহেন। কিন্তু পিতাও যেমন ঈশ্বর, পুত্রও ঠিক তেমনই ঈশ্বর। এ একরকম অচিন্ত্য ভেদাভেদের ব্যাপার। ভেদ সত্ত্বেও ভেদ নাই, এ হেঁয়ালি মানুষের অধিগম্য নহে। যাহাই হউক, খ্রীষ্ট মানবদেহ ধরিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তিনি একাধারে যোল আনা

ঈশ্বর এবং ষোল আনা মানুষ ; পরিপূর্ণ ঈশ্বর এবং পরিপূর্ণ মানুষ। পরিপূর্ণ মানুষ বলিয়াই তিনি সমস্ত মানবজাতির প্রতিনিধি। তিনি আপনাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যজ্ঞীয় পশুরূপে অর্পণ করিলেন। তাঁহার রক্তে মানবজাতির পাপ একেবারে ধুইয়া গেল। ইহা নিষ্ক্রয়ের ব্যাপার। মানুষ আপনাকে অর্পণ করিতে পারিল না ; ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হইয়া নিষ্ক্রয়স্বরূপ মানবজাতির প্রতিভূরূপে আত্মোৎসর্গ করিলেন ; ক্রুসে চড়িয়া প্রাণ দিলেন। ইহা হইল vicarious sacrifice. ইহা এক মহাযজ্ঞ। এই এক মাত্র যজ্ঞে মানুষের পাপ মোচন হইয়া গেল। আর কোনও যজ্ঞের আবশ্যকতা থাকিল না ; জেহোবার মন্দিরে আর পশুবলিরও আবশ্যকতা থাকিল না।

বেদপন্থী সমাজে নরযজ্ঞ প্রচলিত ছিল না ; তবে নরযজ্ঞের স্মৃতি বোধ করি তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। একের বদলে অন্যকে নিষ্ক্রয়স্বরূপে অর্পণ করা যাইতে পারে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আখ্যায়িকা দ্বারা তাহা বুঝাইতেছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, পুরাকালে দেবগণ মনুষ্যকে পশুরূপে আলম্ভন অর্থাৎ যজ্ঞার্থ বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই মনুষ্য হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল এবং অশ্বে প্রবেশ করিল। অশ্ব তখন মেধ্য হইল। মেধ্য শব্দের অর্থ যজ্ঞযোগ্য, দেবতাকে অর্পণযোগ্য। যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে সেই মনুষ্যকে দেবতারা বর্জ্জন করিলেন ; সেই মনুষ্য তখন কিম্পুরুষ হইল। দেবতারা অশ্বের আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই অশ্ব হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল, এবং গরুতে প্রবেশ করিল ; তদবধি গরু মেধ্য হইল। যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অশ্বকে দেবতারা বর্জ্জন করিলেন ; অশ্ব তখন গৌর মৃগ হইল। দেবতারা গরুর আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। গরু হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিয়া মেষে প্রবেশ করিল ; তদবধি মেষ মেধ্য হইল। যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত গরুকে দেবতারা বর্জ্জন করিলেন ; সে গরু গবয় হইল। দেবতারা মেষের আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই মেষ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল এবং ছাগে প্রবেশ করিল। সেই ছাগ মেধ্য হইল। যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মেষকে দেবতারা বর্জ্জন করিলেন ; সেই মেষ উষ্ট্র হইল। যজ্ঞভাগ সেই ছাগে বহু কাল ধরিয়া অবস্থিত ছিল। সেই জন্য পশুমধ্যে ছাগ, পশু-যজ্ঞার্থ শ্রেষ্ঠ। দেবতারা ছাগের আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই ছাগ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল এবং পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। তদবধি পৃথিবীই মেধ্য হইল। যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ছাগকে

দেবগণ বর্জ্জন করিলেন; সে শরভ হইল। যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় এই সকল পশু অমেধ্য অর্থাৎ যজ্ঞের অনুপযুক্ত। ইহাদের মাংস ভোজন করিবে না। দেবতারা পৃথিবীতে প্রবিষ্ট যজ্ঞভাগের অনুগমন করিয়াছিলেন। তখন সেই যজ্ঞভাগ ব্রীহি ধান্য হইল। সেই জন্য ব্রীহি ধান্য হইতে প্রস্তুত পুরোডাশ দান করা হয়। ইহাতে পশুদানেরই ফল পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যেও এই আখ্যায়িকা প্রায় এই আকারেই আছে।

এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করুন। ইষ্টিযাগে—এমন কি, পশুযাগে এবং সোমযাগেও পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হয়। অধিকাংশ বৈদিক যজ্ঞেই পুরোডাশ আহুতির প্রথা চলিত হইয়াছিল। পশুমাংসের আহুতি ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইতেছিল; পূর্ণমাসাদি ইষ্টিযাগে পশুমাংস একবারেই আবশ্যক হইত না। পশুযাগে বা সোমযাগে পুরোডাশও ছিল; পশুও একবারে বর্জ্জিত হয় নাই। কিন্তু পশুর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কয়টি পশু দিতে হইবে, তাহার সংখ্যা বাঁধা ছিল। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অধিক দিবার উপায় ছিল না। নিরূঢ়পশুবন্ধ যাগ—যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য হইলেও বৎসরের মধ্যে এক বারেব, জোর দুই বারের অধিক করিতে হইত না, তাহাতেও একটির অধিক পশুর দরকার হইত না। দেবতার প্রীতির জন্য কাম্য কর্ম্মে যাহারা পশু বলি দেয়, তাহারা ইচ্ছামত সংখ্যা বাড়াইতে পারে। এ-কালের দেবীপূজায় গরিব লোকে একটা বলি দেয়; সম্পন্ন লোকে বহু বলি দেয়। বৈদিক যজ্ঞে কিন্তু ইচ্ছামত পশুর সংখ্যা বাড়াইবার উপায় ছিল না। বড় বড় ধনী লোকের কাম্য যজ্ঞে—অশ্বমেধাদি মহা আড়ম্বরের যজ্ঞে বহু পশু আবশ্যক হইতে পারিত; কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের নিত্যযজ্ঞে বহু পশুর দরকার হইত না। বৈদিক যজ্ঞের পশুহত্যায় একটা মহামারী হইত, এইরূপ মনে করিবার সম্যক্ হেতু নাই। সেই সময়ে পশুবধে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিতেছিল, ইহা মনে করাই সঙ্গত। প্রাচীন প্রথা একেবারে ত্যাগ করা যায় না—বিশেষতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠানে। তখন পশুবধ যাহা হইত, তাহা আরও প্রাচীন কালের survival মনে করা যাইতে পারে। পশুর বদলে রুটি দেওয়ার তাৎপর্য্যই এই। ব্রহ্মবাদীরা বলিতেছেন—পশুমাংসের বদলে কৃষিজাত যব বা চাউল দিলেই পশু দেওয়ার ফল হইবে। ইহাই নিষ্ক্রয়; পশুর পরিবর্ত্তে নিষ্ক্রয় পুরোডাশ। আমি যে উপাখ্যান শুনাইলাম, তাহাতে

ব্রহ্মবাদী স্পষ্ট বলিতেছেন, হয়ত এক কালে যজ্ঞে নরমাংস দেওয়াই প্রথা ছিল; কিন্তু ক্রমশঃ তাহা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। নরপশুর বদলে ক্রমশঃ ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ছাগল, অবশেষে ধান ও যব চলিত হইয়াছে। ইহাই নিষ্ক্রয়।

যজ্ঞের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনটা পণ্ডিতী মতের উল্লেখ করিয়াছি; সমাজের অভিব্যক্তির তিনটা স্তরে তিনটা মত। প্রথম স্তরে দেবতার স্বার্থসাধন করিয়া, দেবতার খোরাক যোগাইয়া তাঁহার প্রীতিসাধন এবং তদ্দ্বারা নিজের স্বার্থসাধন। দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য—কোনও কিছু অর্পণ করিয়া দেবতার নিকট বশ্যতা স্বীকার। এখানে দেবতার লাভালাভ দেখার দরকার হয় না। কেজো জিনিসের বদলে অকেজো জিনিস দিলেও বিশেষ হানি নাই; নিষ্ক্রয়স্বরূপে অল্প মূল্যের জিনিস দিলেও চলিতে পারে। মাংসের পরিবর্ত্তে রুটি দিলেও চলিবে। আরও উন্নত তৃতীয় স্তরে স্বার্থ অন্বেষণের স্থানে একবারে স্বার্থত্যাগ আসিয়া পড়ে। ত্যাগটাই তখন মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে এই অভিপ্রায়টা খুব স্পষ্ট হইয়াছিল দেখা যায়। বেদপন্থীরা এই ত্যাগটাকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। যাজ্ঞিকের পরিভাষামতে কোনও দ্রব্য ত্যাগেরই নাম যজ্ঞ। অগ্নি, সোম, ইন্দ্র প্রভৃতির উদ্দেশে যে-কোনও যাগে অধ্বর্য্যু যজমানের পক্ষ হইতে আহুতি দিতেন; যজমান তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিতেন এবং আহুতির পর ত্যাগমন্ত্র পড়িতেন। ত্যাগমন্ত্র—ইদম্ অগ্নয়ে—ন মম, ইদং সোমায়—ন মম, ইদম্ ইন্দ্রায়—ন মম, এইরূপ আকারের। তাৎপর্য্য এই যে, দেবতাকে সর্ব্বস্ব দিতে হইবে; যাহা কিছু প্রিয়তম, তাহাই দিতে হইবে। সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলেই চলিবে না। তবে মানুষে সর্ব্বস্ব দিতে পারে না, আত্মসমর্পণ করিতে পারে না; আপনাকে দিতে পারে না; কাজেই নিষ্ক্রয়রূপে অন্য কিছু দিতে হয়। এই নিষ্ক্রয় ব্যাপারের কথা বেদের অনেক স্থানে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক স্থানে আছে, যে যজমান সোমযাগে দীক্ষিত হয়, সে সকল দেবতার নিকটেই আপনার আলম্ভনে (অর্থাৎ আত্মসমর্পণে) প্রবৃত্ত হয়। সে সকল দেবতার নিকটেই আপনার বদলে পশুকে নিষ্ক্রয় করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নিষ্ক্রয় শব্দটিই স্পষ্ট ভাবে ব্যবহার

করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে, ঐ যাগে যে পশু দেওয়া যায়, সেই পশু যজমানেরই প্রতিনিধি।

আগেই বলিয়াছি, হবিঃশেষ ভক্ষণ না করিলে কোন যজ্ঞই সম্পূর্ণ হয় না। অগ্নিহোত্র যাগের পর যে দুধ আহুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহার শেষাংশ খাইতে হয়। পূর্ণমাসযাগে পুরোডাশের কিয়দংশ যাগের পর খাইতে হয়। পশুযাগেও পশুমাংস খানিকটা খাইতে হয়। সোমযাগের পূর্ব্বে অগ্নি ও সোমকে যে পশু দেওয়া হইত, তাহার মাংস খাওয়া চলিবে কি না, তাহা লইয়া একটা তর্ক উঠিয়াছিল। সংশয়ের একটা কারণ ছিল। এই পশু ত যজমানেরই প্রতিনিধি: যজমান আপনার বদলে এই পশু দিতেছেন, তাহা হইলে পশুর মাংস ত নরমাংস ; এই নরমাংস খাওয়া উচিত হইবে কি না? কোনও কোনও ব্রহ্মবাদী এই আপত্তি তুলিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সেই আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নিষ্ক্রয় থিয়োরির সমর্থক হইলেও এখানে অগত্যা তাঁহাকে অন্য থিয়োরির আশ্রয় লইতে হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, অগ্নির ও সোমের সাহায্যে ইন্দ্র বৃত্রবধ করিয়াছিলেন। তিনি বৃত্রবধের পর তুষ্ট হইয়া অগ্নি ও সোমকে বর দিয়াছিলেন যে, সোমযাগের পূর্ব্বদিন যে পশু দেওয়া হইবে, তাহা তোমরাই পাইবে ; ইহাই তোমাদের পুরস্কার হইবে। এক নিশ্বাসে নিষ্ক্রয় থিয়োরিটা উল্টাইয়া গেল। ঐ পশু দেবতাদের ভক্ষ্য দ্রব্য মাত্র ; উহা নরের প্রতিনিধি নহে ; অতএব উহার মাংস ভক্ষণে কোনও দোষ হইবে না। আসল কথা যে, হবিঃশেষ ভক্ষণ না করিলেই নয়। কেন নয়, সে গুরুতর কথা ; সে প্রসঙ্গ পরে তুলিব। এখন বলিয়া রাখি, ব্রহ্মবাদীদের এই তর্ক শুনিয়া আপনারা হাসিবেন না। সমস্ত খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ঠিক এইরূপ একটা মতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঠিক এইরূপ তর্ক উঠায় খ্রীষ্টীয় সমাজ শত সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আগেই আপনাদিগকে বলিয়াছি, যীশুখ্রীষ্ট একাধারে ষোল আনা ঈশ্বর এবং ষোল আনা মানুষ। দেবত্ব এবং মানবত্ব তাঁহাতে মিশিয়া গিয়াছে। তাঁহার মত পূর্ণমনুষ্যত্ববিশিষ্ট মানবই যাবতীয় মানবের নিষ্ক্রয় বা প্রতিনিধি হইতে পারে। যজ্ঞে আত্মসমর্পণ ব্যতীত ঈশ্বরের তুষ্টি হইবে না। যজ্ঞে মানুষের আত্মসমর্পণ আবশ্যক। তাই যীশু সমস্ত মানবজাতির নিষ্ক্রয়রূপে আত্মসমর্পণ করিলেন। ক্রুসে চড়িয়া মৃত্যুই তাঁহার আত্মসমর্পণ। ক্রুসে চড়িবার পূর্ব্বরাত্রিতে তিনি আপনার

অনুগত শিষ্যদিগকে লইয়া ভোজনে বসিয়াছিলেন, ভোজনের জন্য রুটি আর মদ ছিল; শিষ্যদের প্রত্যেককে একটু করিয়া মদ দিলেন, এবং সেই রুটি ভাঙ্গিয়া প্রত্যেককে বিতরণ করিলেন; বলিলেন, এই যে রুটি দিলাম, ইহা আমার মাংস; আর এই যে মদ, ইহা আমার রক্ত। ইহা খাইলেই আমার মাংস এবং আমার রক্ত ভোজন করা হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমি যজ্ঞীয় পশুরূপে আপনাকে বলি দিলাম; যজমানের পক্ষে হবিঃশেষ ভক্ষণ আবশ্যক—আমার রক্ত মাংস ভক্ষণ আবশ্যক। আমার তিরোভাবের পর তোমরা এইরূপে রুটি এবং মদ উৎসর্গ করিয়া ভক্ষণ করিও। ইহাতেই তোমাদের দৈনন্দিন যজ্ঞ সাধন হইবে। জেহোবার মন্দিরে আর পশু বলির প্রয়োজন হইবে না। তদবধি পৃথিবীর যাবতীয় খ্রীষ্টান এই অনুষ্ঠান পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা রুটি ও মদ উৎসর্গ করিয়া তাহা ভক্ষণ করেন। যথাবিধি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক উৎসর্গের দ্বারা ঐ রুটি খ্রীষ্টের মাংসে এবং মদ খ্রীষ্টের রক্তে পরিণত হয়। উহা খাইলে খ্রীষ্টেরই রক্ত এবং মাংস খাওয়া হয়। খ্রীষ্টসম্পাদিত মহাযজ্ঞের অনুকরণে তাঁহার আশ্রিতেরা এই যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ইহার নামই হইল eucharistic sacrifice. ইহা বস্তুতই হবিঃশেষ ভক্ষণের ব্যাপার। ইহা দ্বারা খ্রীষ্টের সহিত খ্রীষ্টানের একাত্মতা সম্পাদিত হয়। এই জন্য এই অনুষ্ঠানের নাম Holy Communion। এ দেশের ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে যেমন তর্ক উঠিয়াছিল, অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট পশুর মাংস নরমাংস কি না, সেইরূপ খ্রীষ্টানদের মধ্যেও তর্ক উঠিয়াছিল, বস্তুতই রুটি ও মদ খ্রীষ্টের মাংস ও রক্তে পরিণত হয় কি না? বস্তুতই উহা রক্ত মাংসে পরিণত হয়, তাহা কোনও কেমিষ্ট বলিতে পারিবেন না। অথচ সমস্ত খ্রীষ্টান এক সময়ে একযোগে বলিতেন যে, উৎসর্গের পর রুটি রুটি থাকে না, মদ মদ থাকে না; সত্য সত্যই রক্ত মাংসে পরিণত হয়। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেন, উৎসৃষ্ট রুটি হইতে রক্তবিন্দু ক্ষরিত হইতেছে। মদের ও রুটির এইরূপে রক্ত মাংসে পরিণতির নাম transubstantiation. রোমান এবং গ্রীক চার্চের সকল লোকেই অর্থাৎ বারো আনা খ্রীষ্টান এই বিংশ শতাব্দীতেও এই অলৌকিক পরিণতি ব্যাপারে বিশ্বাস করেন। গুরুকল্প ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এখনই রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবেন যে, রুটির মধ্যে কেবলই starch আছে; উৎসর্গ দ্বারা উহা proteidএ পরিণত হয় নাই। তাঁহার

শিষ্যস্থানীয় আমাকেও সেই কথায় সায় দিতে হইবে। অথচ ইউরোপের অধিকাংশ লোক এখনও বিশ্বাস করে, ঐ রুটি আর রুটি থাকে না; মদ মদ থাকে না। এই বিশ্বাসে আঘাত করিলে তাহাদের জীবনের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইবে।

আর বাহুল্যে কাজ নাই। এ বিষয়ে আবার আমাকে আসিতে হইবে। খ্রীষ্টীয় সমাজে এবং বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য যে একই রকম, তাহা দেখাইবার জন্যই এ প্রসঙ্গ আমি তুলিয়াছি। খ্রীষ্টানের দেবতা ইহুদীর দেবতারই রূপান্তর। ইহুদীর দেবতা রক্ত মাংস দুই চাহিতেন; তাই খ্রীষ্ট রক্ত মাংস দুই দিয়াছিলেন। মদ হইল রক্ত; রুটি হইল মাংস। আমাদের দেশে আধুনিক কালে মহাদেবী রক্তমাংসবলিপ্রিয়া। কিন্তু বৈদিক দেবতারা রক্তপ্রিয় ছিলেন না। পশুর রক্ত রাক্ষসেরা পাইত; দেবতারা কেবল মাংসেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। পুরোডাশ বা রুটি মাংসের স্থানীয়। খ্রীষ্টানের রুটি যেমন মাংসস্থানীয়, আমাদের রুটিও তেমনই মাংসস্থানীয়। রক্তটা গেল কোথায়? ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাহার উত্তর দিতেছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—নিঃসঙ্কোচে বলিতেছেন,—এই যে পুরোডাশদান, এতদ্দারা পশুরই আলম্ভন হয়। যে যব বা ধান হইতে পুরোডাশ প্রস্তুত হয়, তাহাতে যে কিংশারু বা খড় লাগিয়া থাকে, তাহাই পশুর লোম। যে তুষ থাকে, তাহাই পশুর চর্ম্ম। যে রুটি প্রস্তুত হয়, তাহাই মাংস। যে ক্ষুদ ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহাই রক্ত। কুলায় ঝাড়িয়া তুষের এবং ক্ষুদের কণা রাখিয়া দেওয়া হইত এবং যাগশেষে উহা রাক্ষসদিগকে দেওয়া হইত, ইহা পূর্ণমাসযাগ প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এইরূপে রাক্ষসেরা তাহাদের প্রাপ্য রক্তের ভাগ পাইত।

আমাদের দেবতারা রক্ত চাহিতেন না। খ্রীষ্টানের যজ্ঞে রক্তের স্থলে মদ দিতে হয়। বৈদিক যজ্ঞে দুই একটা স্থলে সুরার প্রচলন দেখা যায়। সৌত্রামণি যাগে সুরার প্রচলন ছিল। ক্ষত্রিয় রাজাদের রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞে সুরার প্রচলন দেখা যায়। সাধারণতঃ যজ্ঞে সুরা চলিত না। কিন্তু আর একটা মাদক দ্রব্য চলিত। উহা সোমলতার রস। সোমযাগের কথা এইবার বলিতে চাহি। আপনারা ধৈর্য্য ধরিয়া প্রস্তুত থাকুন।

সোমযাগ

সোমযজ্ঞ অতি বৃহৎ ব্যাপার। ইহার অনুষ্ঠানগুলি অত্যন্ত জটিল। অনেক সরঞ্জাম আবশ্যক; বহু ঋত্বিক্ আবশ্যক; ব্যয়-বিধানও যথেষ্ট। সকলের পক্ষে ইহা সাধ্য ছিল না। সেই জন্য ইহা নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইত না। তবে ব্রাহ্মণের ঘরে পর পর তিন পুরুষের মধ্যে কেহ সোমযাগ না করিলে নিন্দা হইত। সেই ব্রাহ্মণকে দুর্ব্রাহ্মণ বলিত। সোমযজ্ঞ আর্য্যজাতির অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। আর্য্যজাতির ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশের পূর্ব্বেই ইহা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ইরাণীদের মধ্যে সোমযজ্ঞ চলিত ছিল। সোম স্বয়ং একজন দেবতা। দেবতাদের মধ্যে একজন রাজা। পরবর্ত্তী কালে দেবতাদের মধ্যে চারি জন রাজার কথা শুনা যায়। এক এক রাজা এক এক দিকের অধিপতি। রাজা ইন্দ্র পূর্ব্ব-দিকের, রাজা যম দক্ষিণ দিকের, রাজা বরুণ পশ্চিম দিকের, রাজা সোম উত্তর দিকের অধিপতি। দেবতা সোম দ্যুলোকে অবস্থান করেন। পার্থিব সোম মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ। এই পার্থিব সোম একজাতীয় পার্ব্বত্য উদ্ভিদ্। হিমালয়ের উত্তরে মূজবান্ পর্ব্বতে ইহা পাওয়া যাইত। মূজবান্ পর্ব্বত কোথায় বলা যায় না। হয়ত ইহাই পরবর্ত্তী কালে কৈলাস পর্ব্বতে দাঁড়াইয়াছে। কেন না, মূজবান্ পর্ব্বতে রুদ্র দেবতার বাস ছিল। বেদের মধ্যেই তাহার উল্লেখ আছে। এই রুদ্র দেবতা পরবর্ত্তী কালে আমাদের মহাদেবে পরিণত হইয়াছেন। সোম সেই মহাদেবের চিহ্ন। মহাদেব ললাটে বা মস্তকে সোমকলা ধারণ করেন। এখন আমরা সোম অর্থে চন্দ্র বুঝি। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থেও সোম এবং চন্দ্রকে এক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা সকলে ইহা মানিতে চান না। তাঁহারা বলেন, বৈদিক সাহিত্যের অতি প্রাচীন স্তরে সোমের সহিত চন্দ্রের কোন সম্পর্কই ছিল না; বেদের সোম গোড়ায় সোমলতা মাত্র; উদ্ভিদ্ মাত্র। সোম পান করিলে মত্ততা জন্মিত এবং লোকে স্ফূর্ত্তি ও বল পাইত; এই জন্য সোমকে দেবতা করিয়া লইয়াছিল। ইরাণীরা সোমকে হৌমা বলিত। আমাদের দেশে সোমযাগ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু বোম্বাইয়ের পার্সীরা এখনও সোমযাগ করিয়া থাকেন। এখন যে উদ্ভিদের

রস তাঁহারা এজন্য ব্যবহার করেন, তাহাকে হুম বলে। মার্টিন হৌগ নামক পণ্ডিত মূল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এবং বোম্বাইয়ে থাকিয়া পার্সীদের প্রাচীন এবং আধুনিক ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি এই হুম রস পান করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, উহা অত্যন্ত বিস্বাদ। উহাতে কোন দেবতার বা কোন মানুষের তৃপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। ফলকথা, পুরাকালে যে সোম যজ্ঞার্থ ব্যবহৃত হইত, সে সোম কোন্ উদ্ভিদ্, তাহা কেহ এখন জানে না। বেদপন্থী সমাজে যখন সোমযাগের বহুল প্রচার ছিল, তখনও ইহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিতেছিল। পর্ব্বত হইতে সোম আনিয়া যজ্ঞের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখা এক দল লোকের ব্যবসায় দাঁড়াইয়াছিল। যজ্ঞের সময় সোমবিক্রেতা যজ্ঞশালার বাহিরে আসিয়া বসিত। যজমান মূল্য দিয়া তাহা খরিদ করিয়া লইতেন। সোম ক্রমশঃ দুর্লভ হওয়াই সোমযজ্ঞ অপ্রচলিত হওয়ার একটা মুখ্য কারণ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও বেদপন্থী দ্বিজাতি-সমাজে সোমযজ্ঞের বহুল প্রচার ছিল। নানাবিধ সোমযাগ তখন প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয় রাজারা যে অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি মহা আড়ম্বরের যজ্ঞ করিতেন, তাহাও সোম-যাগ। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা কালক্রমে সোমপানের অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। সোমপানে অধিকার ব্রাহ্মণেরা নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য যজমানেরা সোমযজ্ঞ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে সোমরসের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য পান করিতে হইত। ক্ষত্রিয়েরা বট, অশ্বত্থ, প্লক্ষ বা যজ্ঞডুমুরের রস পান করিতেন ; বৈশ্যের পক্ষে দধির ব্যবস্থা ছিল ; ইহাতেই তাঁহাদের সোমপানের ফল হইত। ক্ষত্রিয়েরা সোমপান করিতে পাইবেন কি না, তাহা লইয়া কিছু দিন ধরিয়া তর্ক-বিতর্ক, গণ্ডগোল চলিয়াছিল। ক্ষত্রিয়েরা সহজে অধিকার ছাড়িতে চাহেন নাই। ইহা লইয়া যজ্ঞের সময় হাতাহাতি মারামারি পর্য্যন্ত হইত। যাঁহারা এ বিষয়ে কুতূহলী, তাঁহারা আমার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বাঙ্গালা অনুবাদের পঁয়ত্রিশ অধ্যায় পড়িয়া দেখিবেন। যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের সোমপানের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা একটা খুব বড় নজির দেখাইতেন। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছিলেন ; বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন ; আরও অনেক অনুচিত কাজ করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ এবং বৃত্র, উভয়েই দেবতাদের

মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইন্দ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইন্দ্র এইরূপে ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত হইলে দেবতারা বিদ্রোহী হইয়া ইন্দ্রের সোমপান বন্ধ করিয়া দেন। দেখাদেখি ক্ষত্রিয়দেরও সোমপান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বেদপন্থী সমাজে নানাবিধ সোমযাগের অনুষ্ঠান ক্রমশঃ পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন যজ্ঞ এক দিন, কোন যজ্ঞ একাধিক দিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইত। এক দিনের যজ্ঞকে ঐকাহিক যজ্ঞ বলিত। দুই হইতে বারো দিনে সম্পাদ্য যজ্ঞের নাম অহীন। বারো বা বারোর অধিক দিন লাগিলে নাম হইত সত্র। কোন কোন সত্র সংবৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইত। আমি কেবল আপনাদিগকে ঐকাহিক অর্থাৎ এক দিনে সম্পাদ্য সোমযাগের বিবরণ দিব। এই শ্রেণীর সোমযাগের সাধারণ নাম জ্যোতিষ্টোম। জ্যোতিষ্টোম অন্ততঃ সাত রকমের ছিল; অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, অত্যগ্নিষ্টোম, অপ্তোর্য্যাম এবং বাজপেয়। ইহার মধ্যে অগ্নিষ্টোমই প্রকৃতি, অন্যগুলি তাহার বিকৃতি মাত্র। অগ্নিষ্টোমের প্রয়োগপদ্ধতি জানিলে অন্যগুলিরও পদ্ধতির মোটা জ্ঞান জন্মিবে।

ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে যজ্ঞের পদ্ধতি ঠিক পাওয়া যায় না। পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য, মন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং তৎসম্পর্কে উপাখ্যানাদি নানা কথা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে রহিয়াছে। খাঁটি পদ্ধতিটুকু বুঝিবার জন্য শ্রৌতসূত্র নামক স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অবলম্বন করিয়া আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্র এবং শতপথ ব্রাহ্মণ অবলম্বনে কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্র রচিত হইয়াছিল। আমি ঐতরেয় এবং শতপথ, এই দুই ব্রাহ্মণ এবং আশ্বলায়ন এবং কাত্যায়ন, এই দুই শ্রৌতসূত্রের সাহায্য লইয়া অগ্নিষ্টোমের বিবরণ সংকলন করিয়াছি। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ অত্যন্ত জটিল। উহার যথাযথ বিবরণ দিতে গেলে পরম সহিষ্ণু শ্রোতারও ধৈর্য্য থাকিবে না। সেই জন্য অনেক কাটছাঁট করিয়া যাহাতে একটা মোটা জ্ঞান জন্মিতে পারে, এইরূপ বিবরণ উপস্থাপিত করিতে চাহি।

গৃহস্থের অগ্নিশালায় সোমযাগের স্থান সংকুলান হইত না। গ্রামের বাহিরে গিয়া যজ্ঞভূমি পছন্দ করা হইত। উহার নাম দেবযজনভূমি। সেখানে দুইটি বেদি নির্ম্মাণ করিতে হইত। একটি ঐষ্টিক বেদি, সোমযাগের আনুষঙ্গিক ইষ্টিযাগগুলির জন্য। তাহার পূর্ব্ব দিকে আর একটা বড় বেদি, ইহার নাম সৌমিক বেদি বা মহাবেদি; এই মহাবেদি অনেকটা পাশুক

বেদির মত। ঐষ্টিক বেদির পার্শ্বে যথাস্থানে আহবনীয়াদি তিন অগ্নির এবং ব্রহ্মাদি ঋত্বিকের স্থান থাকিত; সমস্তই ইষ্টিযাগের মত। এই বেদিকে ঘিরিয়া খুঁটির উপর আচ্ছাদন দিয়া যে যজ্ঞশালা নির্ম্মিত হইত, তাহার নাম প্রাগ্‌বংশশালা; খুঁটির উপরের বাঁশগুলি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে খাটান হইত, সেই জন্য নাম প্রাগ্‌বংশশালা। মহাবেদির উপরেও ঐরূপ কয়েকটি শালা বা মণ্ডপ তৈয়ার করিতে হইত। পশ্চিমাংশের মণ্ডপটির নাম সদঃশালা; মাঝখানে হবির্দ্ধান মণ্ডপ; আর বেদির দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট মণ্ডপ, নাম আগ্নীধ্রীয় ও মার্জ্জালীয়। সদঃশালার ভিতরে এক সারি অগ্নি থাকিত, অগ্নিস্থানগুলির নাম ধিষ্ণ্য। ধিষ্ণ্যের পার্শ্বে বসিয়া ঋত্বিকেরা সোমযাগের মন্ত্র পাঠ করিতেন। মাঝখানে একটি ডুমুরের ডালের খুঁটি পোঁতা থাকিত; নাম ঔদুম্বরী শাখা—উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারীরা ঐ ঔদুম্বরী স্পর্শ করিয়া সাম গান করিতেন। দুই পাশের দুই কুঠরিতেও দুইটি ধিষ্ণ্য বা অগ্নিস্থান থাকিত। মহাবেদির পূর্ব্বাংশে উত্তর-বেদি ও তাহার নাভি পাশুক বেদির মতই; উহার পূর্ব্ব দিকে পশু বন্ধনের জন্য যূপের স্থান, এবং ভিতরে চাত্বাল, উৎকর ও শামিত্রভূমি পশুযাগেরই অনুরূপ।

ইষ্টিযাগে চারি জন, পশুযাগে ছয় জন, কিন্তু সোমযাগে ষোল জন ঋত্বিকের দরকার হয়। সকলের নাম জানার দরকার নাই। জন কয়েকের নাম জানা আবশ্যক। অধ্বর্য্যু, হোতা, ব্রহ্মা এবং অগ্নীৎ ত আছেনই; তাহার উপরে অধ্বর্য্যুর সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা এবং হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ, ইঁহারাও আছেন। হোতার আর দুই জন সহকারীর নাম ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক্‌। নাম দুটি কষ্ট করিয়াও মনে রাখিবেন। ইষ্টিযাগে ও পশুযাগে সামগান নাই; সোমযাগে সামগান নহিলে চলে না। সেই জন্য উদ্গাতা এবং তাঁহার সহকারী প্রস্তোতা ও প্রতিহর্ত্তা, এই তিন জন সামগায়ী ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। এই এগার জন ছাড়া আরও পাঁচ জনের দরকার। এইরূপে সর্ব্বসমেত ষোল জন ঋত্বিক্‌ আবশ্যক হয়। ষোল জন ঋত্বিক্‌ ছাড়া চমসাহুতির জন্য দশ জন চমসাধ্বর্য্যুর প্রয়োজন। ইঁহারা ঋত্বিক্‌ নহেন, তবে সোমযাগে সহকারিতা করেন। যাগের পূর্ব্বে সোমপ্রবাক নামক ব্যক্তি ষোল জন ঋত্বিক্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন এবং যজমান তাঁহাদিগকে বরণ করেন। দেবগণের যজ্ঞে অগ্নি হোতা, আদিত্য

অধ্বর্য্যু, চন্দ্রমা ব্রহ্মা, পর্জ্জন্য উদ্গাতা এবং অপ্‌সমূহ অন্যান্য ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন। যজমান প্রথমে দেবঋত্বিক্‌দিগকে বরণ করিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপে মানুষঋত্বিক্‌দের বরণ করেন। আপনাদিগকে বলিয়াছি, অগ্নিষ্টোম এক দিনের যজ্ঞ। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কতকগুলি ইষ্টিযাগ এবং অন্যান্য কর্ম্ম না করিলে সোমযজ্ঞে অধিকারই জন্মে না। ফলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ এক দিনের যজ্ঞ হইলেও উদ্যোগ আয়োজন করিয়া যজ্ঞ সমাধা করিতে পাঁচ দিন সময় লাগে। যথাক্রমে বিবরণ দিতেছি।

প্রথম দিন।—প্রথম দিনে যজমান দীক্ষিত হন। ইষ্টিযাগে বা পশুযাগে দীক্ষার প্রয়োজন নাই। এই দীক্ষা এবং দীক্ষার অনুকূল ইষ্টিযাগ প্রথম দিনের প্রধান অনুষ্ঠান। আগেই বলিয়াছি, ইষ্টিযাগের জন্য ঐষ্টিক বেদি এবং সোমযাগের জন্য মহাবেদি আবশ্যক। যজমানের বাড়ীতে পূর্ণমাসাদি যাগের জন্য অগ্নিশালা থাকে। কিন্তু এখানে গ্রামের বাহিরে নূতন যজ্ঞশালায় নূতন ঐষ্টিক বেদি গড়িয়া লইতে হয়। যজমানের বাড়ীতে যে গার্হপত্য সারা দিন জ্বলে, সেই আগুনে দুইখানা অরণি তপ্ত করিয়া আনা হয়। ইহার নাম অগ্নিসমারোপণ। সেই অরণি ঘর্ষণে নূতন যজ্ঞশালায় নূতন গার্হপত্য জ্বালা হয়। যজমানের বাড়ীর গার্হপত্য এবং এই নূতন গার্হপত্য যে একই অগ্নি, তাহা এতদ্দ্বারা বুঝান হইল। এই নূতন গার্হপত্য হইতে নূতন আহবনীয় ও নূতন দক্ষিণাগ্নি যথাবিধি জ্বালান হয়। সোমযাগের আনুষঙ্গিক সমস্ত ইষ্টিযাগ এই অগ্নিতেই সম্পাদ্য। এইরূপ অগ্নি স্থাপনের পর যজমানের দীক্ষা গ্রহণ। যজ্ঞশালার বাহিরে বসিয়া সপত্নীক যজমান ক্ষৌরকার্য্যান্তে স্নান করিবেন। স্নানান্তে কাপড় ছাড়িয়া কুশের উপর দাঁড়াইয়া নবনী মাখিবেন, চোখে কাজল পরিবেন, কুশের দ্বারা গা মাজিয়া দেহশুদ্ধি করিবেন, আঙ্গুল গুটাইয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিবেন; যজ্ঞান্ত পর্য্যন্ত বাহিরে আসিবেন না। সেইখানে একটি ইষ্টিযাগ করিতে হইবে। এই ইষ্টিযাগের নাম দীক্ষণীয় ইষ্টি। দীক্ষার অনুকূল বলিয়া নাম দীক্ষণীয়। যাগের পর যজমান কৃষ্ণাজিন পাতিয়া তদুপরি বসিবেন। তৃণ ও শণে নির্ম্মিত মেখলা পরিবেন; মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিবেন; কাপড়ের খুঁটায় একটা হরিণের শিঙ বাঁধিয়া হাতে ডুমুর-শাখার দণ্ড গ্রহণ করিবেন। ইহাই যজমানের পরিচ্ছদ। যজমানপত্নীর বেশভূষা প্রায়ই তদ্রূপ; উষ্ণীষের বদলে তিনি মাথায় জাল পরেন। এই

সকল বেশভূষার একটা তাৎপর্য্য আছে। দীক্ষাকর্ম্মে যজমান নূতন জন্ম গ্রহণ করেন। যজ্ঞশালাটাই তাঁহার পক্ষে মাতৃগর্ভস্বরূপ। সেইখানে ভ্রূণস্বরূপে তাঁহাকে যজ্ঞকাল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে হয়। যজ্ঞান্তে তিনি সেই গর্ভ হইতে নূতন মানুষ হইয়া বা নব জীবন পাইয়া নিষ্ক্রান্ত হন। তাঁহার বেশভূষার কোন্‌টার কি তাৎপর্য্য, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বুঝাইয়াছেন। যথা, গর্ভমধ্যে ভ্রূণ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া থাকে, এই জন্য যজমানও মুষ্টি বদ্ধ করেন, ইত্যাদি। দীক্ষা উপলক্ষে যে ইষ্টিযাগ হয়, তাহার দেবতা অগ্নি এবং বিষ্ণু। অগ্নি সকল দেবতার নিম্নে এবং বিষ্ণু সকলের উর্দ্ধে; অতএব উঁহাদের দুই জনের যাগ করিলেই সকল দেবতার উদ্দেশে যাগ হয়। এই দুই দেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি প্রায়ই পূর্ণমাসযাগের মতই। দীক্ষিত যজমানকে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। তিনি সত্য কহিবেন, ক্রোধ করিবেন না, মৃদু বাক্য বলিবেন, সূর্য্যের উদয় বা অস্তগমন দেখিবেন না; জলে প্রবেশ করিবেন না; বৃষ্টিতে ভিজিবেন না। ভোজন সম্বন্ধেও কয়েকটি নিয়ম আছে। দীক্ষার পূর্ব্বে পেট ভরিয়া ইচ্ছামত খাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু তার পর হইতে নিয়মের বাঁধাবাঁধি। তদবধি দুই বেলা কেবল দুধ খাইতে হইবে। এই দুগ্ধের নাম ব্রত এবং সেই দুগ্ধপানের নাম ব্রতপান। এক বার শেষ রাত্রিতে, এক বার মধ্যাহ্নে দুগ্ধপান চলে। দুধের মাত্রা ক্রমশঃ কমাইতে হয়। পঞ্চম দিনে অর্থাৎ আসল সোমযাগের দিনে সেই দুগ্ধপানও নিষিদ্ধ। সেই দিন যজ্ঞের হবিঃশেষই এক মাত্র ভক্ষ্য।

দ্বিতীয় দিন।—এই দিন প্রাতে যজ্ঞের আরম্ভসূচক একটি ইষ্টিযাগ; ইহার নাম প্রায়ণীয় ইষ্টি। প্রায়ণ শব্দের অর্থ আরম্ভ। এই ইষ্টির দেবতা পথ্যা, অগ্নি, সোম, সবিতা এবং সর্ব্বশেষে অদিতি। দেবতারা অদিতিকে এক সময়ে বর দিয়াছিলেন, তোমাকে লইয়াই যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। তদবধি সোমযজ্ঞের আরম্ভে অদিতির উদ্দেশে যাগ। অদিতিকে চরু দিতে হয়; আর চারি জনকে আজ্য দিতে হয়।

এই যাগের পর সোমক্রয়। যজ্ঞশালার বাহিরে সোমবিক্রেতা সোম লইয়া বসিয়া থাকে; তাহার নিকট মূল্য দিয়া সোম ক্রয় করিতে হয়। আগে বলিয়াছি, সোমলতা দুষ্প্রাপ্য; পর্ব্বত হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া যজ্ঞের জন্য বিক্রয় একদল লোকের ব্যবসায় দাঁড়াইয়াছিল।

সোমবিক্রেতা যজ্ঞশালার বাহিরে বসিয়া সোমলতা বেচিত। এই সোম-ক্রয় ব্যাপারে একটু কৌতুক আছে। সোম এক কালে গন্ধর্ব্বদের নিকট ছিলেন ; দেবতারা কৌশল করিয়া সেই সোম আনিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রীপ্রিয়। দেবগণ কুমারী বাগ্দেবীকে গন্ধর্ব্বদের নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি গন্ধর্ব্বদিগকে ভুলাইয়া সোম লইয়া আসেন এবং নিজেও পলাইয়া আসেন। সোমক্রয় অনুষ্ঠানে সেই ঘটনার অভিনয় হয়। ঋত্বিক্দের সহিত যজমান একটি ছোট বৎসতরী লইয়া সোমবিক্রেতার কাছে উপস্থিত হন। ঐ সোমবিক্রেতা গন্ধর্ব্বস্থানীয় এবং বাছুরটি বাগ্দেবতা। কিছু ক্ষণ দর-দস্তুর করিয়া বাছুরটিকে মূল্যস্বরূপ দিয়া সোম খরিদ করা হয়। সোম হস্তগত হইলে হঠাৎ লাঠি বাহির করিয়া সোমবিক্রেতাকে খেদাইয়া দেওয়া হয় এবং বাছুরটি কাড়িয়া লওয়া হয়। গন্ধর্ব্বটার সবই গেল ; সোমও গেল, বাগ্দেবীকেও সে পাইল না। যজমান সোমলতা কাপড়ে জড়াইয়া মাথায় লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দেন। যজমান এবং অধ্বর্য্যু গাড়ীর উপর বসিয়া থাকেন ; হোতা ঋক্মন্ত্র আওড়াইতে থাকেন এবং সুব্রহ্মণ্যা নামক ঋত্বিক্ গাড়ী চালাইয়া প্রাগ্বংশশালা ঘুরিয়া ভিতরে উপস্থিত হন। সেখানে গাড়ী হইতে সোমকে নামাইয়া ঐষ্টিক বেদির পূর্ব্ব দিকে আহবনীয়ের পার্শ্বে কাষ্ঠাসনে রাখিয়া দেওয়া হয়।

সোম দেবতাগণের এক জন রাজা। রাজা অতিথিরূপে বাড়ী আসিলে তাঁহার সমাদর করিতে হয়। রাজা সোম অতিথিরূপে যজমানের যজ্ঞশালায় আসিয়াছেন ; এখন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি ইষ্টিযাগ করিতে হইবে। ইহার নাম আতিথ্য ইষ্টি। এই যাগের দেবতা বিষ্ণু ; হব্য দ্রব্য পুরোডাশ। ইহাতে একটু বিশেষ বিধি আছে যে, যাগের পূর্ব্বে মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া আহবনীয় অগ্নিতে মিশাইতে হয়। পূর্ণমাসাদি ইষ্টিযাগে অগ্নিমন্থনের দরকার হয় না। আতিথ্য ইষ্টির পর প্রবর্গ্য যজ্ঞ আর উপসৎ ইষ্টি। এই সময়ে যজমান এবং সমস্ত ঋত্বিক্ একযোগে ঘৃত স্পর্শ করিয়া শপথ করেন যে, এই যজ্ঞে আমরা সকলে একমত হইয়া কর্ম্ম করিব, পরস্পর বিরোধ করিব না। এই অনুষ্ঠানের নাম তানূনপত্র। অসুরদের সহিত যুদ্ধকালে দেবতারা এইরূপে ঘৃত স্পর্শ করিয়া পরস্পর সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন। এখন যেমন ইউরোপের মিত্র-রাষ্ট্রগুলি জর্ম্মনির বিরুদ্ধে সন্ধিবন্ধন করিয়াছেন, কতকটা তদ্রূপ। উপসৎ ইষ্টির সমকালে সোমলতাকে টাটকা রাখিবার

জন্য সোমে জলের ছিটা দেওয়া হয়। ইহার নাম সোমের আপ্যায়নকর্ম্ম। আপ্যায়নের পর সোমের নিহ্নব বা পূজা। প্রস্তরের নাম আপনাদের মনে থাকিতে পারে। ইষ্টিযোগে বেদির উপরে এক আঁটি কুশ থাকে; ইহাই প্রস্তর। যজমান কয় জন ঋত্বিকের সহিত প্রস্তরের উপরে হাত রাখিয়া নিহ্নবমন্ত্র বলেন। দ্যাবাপৃথিবীকে ঐ মন্ত্রে প্রণাম করা হয়। রাজা সোম দ্যাবাপৃথিবীর অপত্যস্বরূপ; তাঁহাকে প্রণাম করিলে সোমেরই পূজা হয়।

আতিথ্যেষ্টির পরে প্রবর্গ্য, আর উপসৎ ইষ্টি। তন্মধ্যে প্রবর্গ্যের কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক। ইহা যজ্ঞের মধ্যে কতকটা থাক-ছাড়া। এই কর্ম্মে আহুতির দ্রব্যের নাম ঘর্ম্ম। তপ্ত ঘৃতে ছাগলের ও গরুর দুধ মিশাইয়া গরম করিলে ঘর্ম্ম প্রস্তুত হয়। দেবতার নামও ঘর্ম্মদেবতা। সংস্কৃত ঘর্ম্ম শব্দ হইতেই আমাদের বাঙ্গালা গরম শব্দ আসিয়াছে। দুধ গরম গরম দিতে হয় বলিয়া উহার নাম ঘর্ম্ম। মাটির ভাঁড়ে ঘর্ম্ম পাক হয়; সেই ভাঁড়ের নাম মহাবীর। পুরোডাশও দিতে হয়, এই পুরোডাশের নাম রৌহিণ পুরোডাশ। ঘর্ম্ম পাকের জন্য পৃথক্ অগ্নিস্থান থাকে। গার্হপত্যের আগুন আনিয়া সেই আগুন জ্বালা হয়। অধ্বর্য্যু আর দুই জন ঋত্বিকের সহিত আগুনে হাওয়া দেন; প্রস্তোতা নামক সামগায়ী ঋত্বিক্ সাম গান করেন। হোতা ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করেন; অধ্বর্য্যু আগুনের উপরে তপ্ত মহাবীরে ঘি ঢালেন। তার পর রৌহিণ পুরোডাশ আহুতি দিয়া আসিয়া অধ্বর্য্যু গাভী দোহন করেন; প্রতিপ্রস্থাতা ছাগী দোহন করেন। প্রস্তোতা আর এক প্রস্থ সাম গান ও হোতা আর এক প্রস্থ ঋক্ পাঠ করেন। একখানি প্রকাণ্ড কাঠের হাতা থাকে, তাহার নাম উপযমনী। এই হাতায় তপ্ত মহাবীর নামাইয়া রাখিতে হয় এবং মহাবীরের তপ্ত ঘৃতে সেই ছাগদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ ঢালিয়া দিলে ঘর্ম্ম প্রস্তুত হয়। অধ্বর্য্যু এই ঘর্ম্ম লইয়া অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে একটা আহুতি দেন; এবং অগ্নির উদ্দেশে আর একটা আহুতি দেন। হোতা যথাবিধি যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন। তবে ঘর্ম্মের কিয়দংশ হবিঃশেষরূপে ভক্ষণ করিতে হয়। হবিঃশেষ ভক্ষণের পূর্ব্বে আর একখানি রৌহিণ পুরোডাশের আহুতি হয়। ইহাই প্রবর্গ্য কর্ম্ম। এই প্রবর্গ্য কর্ম্ম যজমানের নূতন জন্মলাভে সাহায্য করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, এই ঘর্ম্মাহুতির দ্বারা যজমান দেবযোনি অগ্নি হইতে দেবতারূপে উৎপন্ন হন। প্রবর্গ্য কর্ম্মের পর উপসৎ। উপসৎ

ইষ্টিযাগ; দেবতা অগ্নি, সোম এবং বিষ্ণু। আহুতি আজ্য। অসুরেরা তিন লোক জয় করিয়া ঐ তিন লোককে সোনা, রূপা ও লোহার প্রাকার-বেষ্টিত করিয়া পুরীতে বা দুর্গে পরিণত করিয়াছিল। দেবতারা ঐ তিন পুরীর সমীপে আসন্ন হইয়া পুরী তিনটিকে অবরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অসুরদিগের প্রতি যে বাণ ছুঁড়িয়াছিলেন, তাহাই উপসদ্—উপ অর্থাৎ সমীপে, সদ্ ধাতুর অর্থ আসন্ন হওয়া। ঐ বাণে অগ্নি, সোম এবং বিষ্ণু, এই তিন দেবতা অবস্থিত ছিলেন। তাহাতেই অসুরদের পরাজয় হয়। এই ত্রিপুর-জয়-কাহিনী আপনাদিগকে পৌরাণিক ত্রিপুর জয়ের কথা স্মরণ করাইবে।

দ্বিতীয় দিন পূর্ব্বাহ্ণেই এই প্রবর্গ্য এবং উপসৎ অনুষ্ঠিত হয়; দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণেও আর একবার প্রবর্গ্য এবং উপসৎ হইবে। উপসৎ করিতে হইলেই অসুর জয়ে দেবগণের সন্ধিবন্ধনের অনুরূপ তনূনপ্ত্র করিতে হইবে এবং জলের ছিটা দিয়া সোমের আপ্যায়ন করিয়া সোমের নিহ্নব বা পূজাও করিতে হইবে। তৃতীয় দিনের পূর্ব্বাহ্ণে প্রবর্গ্য এবং উপসৎ এবং অপরাহ্ণে আর একবার প্রবর্গ্য এবং উপসৎ। উপসদের সঙ্গে তনূনপ্ত্র, সোমের আপ্যায়ন এবং নিহ্নব দ্বিতীয় দিনের মতই। এই তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে সোমযাগের জন্য মহাবেদি নির্ম্মাণ করিতে হয়।

চতুর্থ দিন। চতুর্থ দিন পূর্ব্বাহ্ণেই দুই বার প্রবর্গ্য ও দুই বার উপসৎ সারিয়া ফেলিয়া অন্য আয়োজন করিতে হইবে। প্রথম কাজ অগ্নিপ্রণয়ন। ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় হইতে আগুন আনিয়া উত্তরবেদির নাভিতে রাখিতে হইবে। তদবধি এই নূতন অগ্নিই সোমযজ্ঞের আহবনীয়রূপে গণ্য হয়; পুরাতন আহবনীয়টা গার্হপত্য হইয়া যায়। অগ্নিকে লইয়া যাইবার সময় হোতা মন্ত্র পাঠ করেন। তার পরের কাজ হবির্দ্ধান-প্রবর্ত্তন। দুইখানি টপ্পর-দেওয়া গরুর গাড়ীর নাম হবির্দ্ধান; সোমযজ্ঞে প্রধান হবিঃ সোম; সেই সোম এই গাড়ীর উপরে রাখা হয় বলিয়া গাড়ীর নাম হবির্দ্ধান। যজমানের পত্নী গাড়ীর ধুরায় ঘি মাখাইয়া দেন; অধ্বর্য্যু এক গাড়ীতে, প্রতিপ্রস্থাতা অন্য গাড়ীতে চাপিয়া মহাবেদির দিকে চালাইয়া দেন। গাড়ী ঘর্-ঘর্ করিয়া চলিতে থাকে; হোতা এবং যজমান মন্ত্র পাঠ করেন। মহাবেদির উপরে পৌঁছিলে, গাড়ী দুইখানি পাশাপাশি রাখিয়া তাহার উপরে চালা বাঁধা হয়; এই চালারই নাম হবির্দ্ধানমণ্ডপ। তার পশ্চিম দিকে

আর একটি চালা তৈয়ার হয়; উহারই নাম সদঃশালা; মহাবেদির দুই পার্শ্বে দুইখানি ছোট ঘর তৈয়ার হয়, উহাই আগ্নীধ্রীয় ও মার্জ্জালীয়। সদঃশালায় ছয়টি, আর আগ্নীধ্রীয়ে একটি, এই সাতটি ধিষ্ণ্য তৈয়ার করিতে হইবে; ধিষ্ণ্যের অর্থ অগ্নিস্থান; ইহার পাশে ঋত্বিকেরা সোমাহুতি-কালে মন্ত্র পাঠ করিবেন। এই ধিষ্ণ্যের জন্যও ঐষ্টিক বেদির আহবনীয় হইতে অগ্নি আনিয়া আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে রাখিতে হইবে; পরদিন সেই অগ্নি হইতে আর আর ধিষ্ণ্য জ্বালান হইবে। ধিষ্ণ্যার্থ অগ্নি আনয়নের পর সোমের আনয়ন। আপনাদের মনে থাকিবে, দ্বিতীয় দিবসে সোম ক্রয় করিয়া ঐষ্টিক বেদির পূর্ব্বে কাঠের আসনে রাখা হইয়াছিল; দুই বেলা জলের ছিটা দিয়া তাহাকে টাটকা রাখা হইয়াছিল। আজ সেই সোমকে সেখান হইতে তুলিয়া পূর্ব্বমুখে আনিয়া হবির্দ্ধানমণ্ডপে গাড়ীর উপরে রাখিতে হয়। ধিষ্ণ্যার্থ অগ্নির ও সোমের আনয়নের নাম অগ্নিষোম-প্রণয়ন। সকল কর্ম্মেই হোতাকে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

অগ্নি এবং সোম উভয়কেই মহাবেদিতে স্থাপন করা হইল। ইহারা উপস্থিত না হইলে সোমযাগ হইতে পারে না। অগ্নি এবং সোম উভয়েই দেবতা; এখন ইহাদের উদ্দেশে একটি পশুযাগ আবশ্যক। এই চতুর্থ দিনেই সেই পশুযাগ করিতে হইবে; কেবল ইষ্টিযাগে কুলাইবে না। অগ্নি এবং সোমের উদ্দিষ্ট এই পশুটির নাম অগ্নীষোমীয় পশু। পশুটি মোটাসোটা হওয়া আবশ্যক। এই পশুর মাংস ভক্ষণ করিলে নরমাংস ভক্ষণ হইবে কি না, তাহা লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল। গত বারে তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। পশুযাগের বিবরণ পূর্ব্বেই দিয়াছি—যূপচ্ছেদন হইতে যাগসমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানই করিতে হয়। পশুযাগ সমাপ্ত করিতে অপরাহ্ন আসিয়া পড়ে। পরদিন প্রকৃত সোমযাগের দিন—এ কয় দিন তাহার আয়োজন উদ্যোগেই গেল। সোমযাগের জন্য সোমলতা ছেঁচিয়া সোমরস বাহির করিতে হয়—তার জন্য জলের দরকার। এই চতুর্থ দিনেই সন্ধ্যাকালে সেই জল আনিয়া রাখিতে হইবে। স্রোতের জল হইলেই ভাল হয়। বাজনা বাজাইয়া সমারোহে নদী বা জলাশয় হইতে জল আনিয়া রাখা হয়। এই জলেরও একটা নাম আছে—নাম বসতীবরী। অপ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; অতএব তাহার বিশেষণ বসতীবরীও স্ত্রীলিঙ্গ। এই বসতীবরী জল এবং

হবির্দ্ধানে স্থিত সোমলতাকে রাত্রিকালে অগ্নীধ্রীয় মণ্ডপমধ্যে রাখা হয় এবং যজমান রাত্রি জাগিয়া পাহারা দেন।

পঞ্চম দিন।—উদ্যোগ আয়োজনে চারি দিন গেল। পঞ্চম দিনে প্রকৃত সোমযাগ। সোমলতা ছেঁচিয়া তাহার রস জলে মিশাইয়া আহুতি দিতে হইবে। সোম ছেঁচিয়া রস বাহির করার নাম অভিষব। পূর্ব্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, তিন বার সোমের অভিষব এবং সোমের আহুতি হয়। সোমাভিষব এবং সোমাহুতি ও তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় অনুষ্ঠান, একযোগে সমুদায় কর্ম্মের নাম সবন। পূর্ব্বাহ্নে প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্নে মাধ্যন্দিন সবন, অপরাহ্নে তৃতীয় সবন। সোমযাগের সঙ্গে সঙ্গে একটি পশুযাগও বিহিত। ইহার পূর্ব্বদিন একটি পশুযাগ হইয়া গিয়াছে,—অগ্নীষোমীয় পশুযাগ;—এ দিন আর একটি পশুযাগ হয়। এই পশুযাগের নাম সবনীয় পশুযাগ। তিন সবনে তিনটি পশুযাগ হয় না। সারা দিনে একটি। একই পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভাগ করিয়া তিন সবনে আহুতি দেওয়া হয়। আগে বলিয়াছি, পশুযাগের সঙ্গে পুরোডাশ-যাগও থাকে। সবনীয় পশুযাগে পুরোডাশ ত থাকেই, তা ছাড়া আরও কয়েকটি দ্রব্যের আহুতি হয়। যথা—ধানা, করম্ভ, পরিবাপ এবং পয়স্যা। ধানা অর্থে ঘিয়ে-ভাজা যব; করম্ভ ঘৃতপক্ব যবের ছাতু; পরিবাপ ঘৃতপক্ব চালভাজা। দুধে দই মিশাইয়া পয়স্যা প্রস্তুত হয়। সোমরস, পশুমাংস, এবং যবভাজা প্রভৃতির নাম শুনিয়া ভৈরবীচক্রের পঞ্চ মকারের অন্তর্গত মদ্য, মাংস ও মুদ্রা আপনাদের মনে আসিবে। আপনারা দেবতাদের রুচির প্রশংসা করিবেন।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় বসতীবরী জল আনিয়া রাখা হইয়াছে, এবং যজমান পাহারা দিয়া জাগিয়া আছেন। অতি প্রত্যূষে তিনি ঋত্বিক্‌দিগকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া তোলেন। হোতা প্রাতরনুবাক্ নামক ঋক্‌মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। অগ্নি, ঊষা এবং অশ্বিদ্বয় এই সকল মন্ত্রের দেবতা। বহু ঋক্ পাঠ করিতে হয়। পাখী ডাকিলে মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত হয়। কাজেই আবশ্যকমত শতাধিক বা সহস্রাধিক মন্ত্র পড়িতে হয়। বহু মন্ত্র পাঠে যজ্ঞেশ্বর প্রজাপতি সন্তুষ্ট হন। মন্ত্রপাঠ শেষ হইলে যজমান ও তাঁহার পত্নী কয়েক জন ঋত্বিক্ এবং পরিচারক সঙ্গে জলাশয় হইতে জল আনিতে যান। কলসীতে করিয়া জল আনেন। এই জলের নাম একধনা। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় বসতীবরী আনা হইয়াছিল; অদ্য প্রত্যূষে একধনা আনা হইল। এই দুই জল

খানিকটা মিশাইয়া তৃতীয় জল হয়, তাহার নাম নিগ্রাভ্য। বসতীবরী, একধনা এবং নিগ্রাভ্য, এই তিন জলই সোমরস প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক।

এইবার সোমাভিষবের অর্থাৎ সোম ছেঁচিয়া রস নিষ্কাশনের আয়োজন। পূর্ব্বদিনে হবির্দ্ধান গাড়ীর নীচে চারিটি গর্ত্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই গর্ত্তের নাম উপরব। গর্ত্তের উপর কাষ্ঠফলক চাপাইয়া তদুপরি গোচর্ম্ম বিছাইয়া তাহার উপর সোমলতার টুকরা রাখিতে হয়; পাষাণের আঘাতে থেঁতলাইয়া রস বাহির করিতে হয়। পাষাণের আঘাত হয়, আর উপরবের গর্ত্ত হইতে গম-গম শব্দ হইতে থাকে। অধ্বর্য্যু, আর তিন জন ঋত্বিক্ পাষাণ হাতে করিয়া রস বাহির করেন। সোমের টুকরাগুলি মাঝে মাঝে নিগ্রাভ্য জলে ডুবাইয়া সরস করিয়া লইতে হয়। যত ক্ষণ ছিবড়া বাহির না হয়, তত ক্ষণ রস বাহির করিতে হয়। তিন সবনেই এইরূপ করিতে হয়। প্রাতঃসবনে এবং মাধ্যন্দিন সবনে প্রচুর রস আবশ্যক। সেই জন্য প্রাতঃসবনে সোমের প্রায় অর্দ্ধাংশ ছেঁচিতে হয়। মাধ্যন্দিনেও প্রায় বাকী অর্দ্ধেক ছেঁচিতে হয়। একখানা বড় টুকরা তৃতীয় সবনের জন্য রাখা হয়। সেইখানী ছেঁচিয়া যে রসটুকু পাওয়া যায়, তৃতীয় সবনের পক্ষে তাহাই প্রচুর। এইরূপে নিষ্কাশিত সোমরস বসতীবরী এবং একধনা, এই দুই জলে মিশাইলে আহুতির জন্য রস প্রস্তুত হয়। রস রাখিবার জন্য তিনটি বড় বড় কাঠের গামলা বা কলস থাকে। একটির নাম আধবনীয়, একটির নাম দ্রোণকলস, আর একটির নাম পূতভৃৎ। আধবনীয়ে বসতবরী এবং একধনা, দুই জল ঢালিয়া তাহাতেই নিষ্কাশিত সোমরস মিশান হয়। এইরূপে প্রস্তুত রস ছাঁকিয়া লওয়া দরকার। দ্রোণকলসের মুখে মেষলোমের ছাঁকনি রাখিয়া আধবনীয়ের জল ঢালিয়া ছাঁকিতে হয়। এইরূপে ছাঁকিলে সোমরস পূত অর্থাৎ শুদ্ধ হয়। ছাঁকা সোমের নাম হয় পবমান সোম। এই বিশুদ্ধ সোমরসের অর্দ্ধেক দ্রোণকলসে এবং অর্দ্ধেক পূতভৃতে রাখা হয়। পূতভৃতে রাখিবার সময় একটু আড়ম্বর আছে; পরে বলিব। সোমযাগে বহু দেবতাকে আহুতি দিতে হয়। এক এক আহুতিতে যতটুকু সোমরস গ্রহণ করা হয়, তাহার নাম গ্রহ। সোমরস ছোট ছোট পাত্রে লইয়া আহুতি দেওয়া হয়। প্রত্যেক পাত্রে একবারে যাহা লওয়া হয়, তাহাই গ্রহ। তিন শ্রেণীর পাত্র

আবশ্যক। প্রথম শ্রেণীর পাত্রকে পাত্রই বলে ; সংখ্যা এগারখানি। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাত্রের নাম স্থালী ; সংখ্যায় চারিখানি। তৃতীয় শ্রেণীর পাত্রের নাম চমস ; সংখ্যায় দশখানি। এইবার যাগের আরম্ভ।

(১) প্রথমে প্রাতঃসবন। প্রথমাহুতি সূর্য্যের উদ্দিষ্ট। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অধ্বর্য্যু একখানি পাত্রে কিঞ্চিৎ রস লইয়া উত্তরবেদির নাভিস্থিত আহবনীয় অগ্নিতে ঢালিয়া দেন। ইহা যাগ নহে, হোম। অধ্বর্য্যু নিজেই একটি যজুর্মন্ত্র পড়িয়া আহুতি দেন। উপাংশু অর্থাৎ অনুচ্চ স্বরে মন্ত্র পড়া হয় বলিয়া হোমের নাম উপাংশু হোম। যে রসটুকু দেওয়া হয়, তাহা উপাংশু গ্রহ। যে পাত্রে করিয়া দেওয়া হয়, তাহা উপাংশু পাত্র। সূর্য্যোদয়ের পর পুনরায় সূর্য্যেরই উদ্দেশে অন্তর্যাম হোম। ইহাও হোম। অন্তর্যাম পাত্রে অন্তর্যাম গ্রহ লইয়া যজুর্মন্ত্র সহিত আগুনে দেওয়া হয়। এই হোমের পর ঋত্বিকেরা মহাবেদির বাহিরে আসিয়া পূতভৃতে ঢালিবার জন্য সোম ছাঁকেন। দ্রোণকলসে সোম আগেই ছাঁকিয়া রাখা হইয়াছে। পূতভৃতে সোম ছাঁকায় আড়ম্বর আছে। এক দিকে সোম ছাঁকা হইতেছে, অন্য দিকে সেই পবমান সোমের উদ্দেশে উদ্গাতা, প্রস্তোতা এবং প্রতিহর্ত্তা, এই তিন জন সামগায়ী ঋত্বিক্ সাম গান করিতেছেন। এই গানের নাম বহিষ্পবমান-স্তোত্র গান। পবমান সোমের উদ্দেশে গীত হয় বলিয়া নাম পবমান-স্তোত্র। মহাবেদির বাহিরে আসিয়া গীত হয় বলিয়া নাম বহিষ্পবমান-স্তোত্র। তৎপরে তিনটি দ্বিদেবত্য গ্রহাহুতি তিন জোড়া দেবতার উদ্দিষ্ট। প্রথম আহুতি ঐন্দ্রবায়ব অর্থাৎ ইন্দ্র এবং বায়ুর উদ্দিষ্ট। দ্বিতীয় আহুতি মৈত্রাবরুণ অর্থাৎ মিত্র ও বরুণের উদ্দিষ্ট। তৃতীয় আহুতিটি আশ্বিন অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়ের উদ্দিষ্ট। অধ্বর্য্যু যথাক্রমে এই তিন গ্রহ আহুতি দেন। এবার হোম নহে ; রীতিমত যাগ। হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ অনুবাক্যামন্ত্র এবং হোতা স্বয়ং যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন। বষট্কারের পর অধ্বর্য্যু আহুতি দেন। যাগের পর হবিঃশেষ ভক্ষণ। আহুতিদাতা অধ্বর্য্যু এবং বষট্কর্ত্তা হোতা, উভয়ে একযোগে প্রত্যেক গ্রহের শেষাংশ পান করেন। পান অনাবশ্যক ; ঘ্রাণ মাত্রেই ভক্ষণ হয় ; বড়-জোর ঠোঁট ভিজাইতে হয়। তৎপরে শুক্র গ্রহ এবং মন্থি গ্রহের আহুতি। উভয়ই ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট ; অধ্বর্য্যু শুক্র গ্রহ এবং প্রতিপ্রস্থাতা মন্থি গ্রহ গ্রহণ করিয়া পাশাপাশি দাঁড়ান ; এবং অনুবাক্যা ও যাজ্যা পাঠের পর বষট্কারের সময় আগুনে

দেন। হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তা একত্র গ্রহশেষ পান করেন। এবার ঘ্রাণ মাত্রে চলে না ; রীতিমত পান করিতে হয়। শুক্র এবং মন্থি, এই দুই গ্রহ আহুতির পর বলা হয় "নিরস্তঃ শণ্ডঃ নিরস্তো মর্কঃ।" তাৎপর্য্য, এতদ্দারা শণ্ড এবং মর্ক, এই দুই অসুরকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। আপনারা অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের শণ্ডামার্ক নামে দুই পুত্রের পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়াছেন। সেই কাহিনীর মূল এইখানে পাওয়া যায়। শুক্র শব্দের অর্থ উজ্জ্বল ; উহা সোমরসের চলিত বিশেষণ। শুক্র পাত্রে রক্ষিত সোম-রসকে বিশেষতঃ শুক্র গ্রহ বলা হয়। কোনরূপে এই শুক্র গ্রহের সহিত আকাশস্থ শুক্র গ্রহের—planet Venusএর একীকরণ হইয়া থাকিবে। Planet Venus আকাশস্থ planetগণের সকলের চেয়ে উজ্জ্বল। তাহা হইলে মন্থি গ্রহ কে হয়? মহাত্মা গঙ্গাধর টিলক অনুমান করেন, একই planetএর দুই নাম—শুক্র এবং মন্থি। একটি morning star, আর একটি evening star.

সোমাহুতির জন্য তিন রকম পাত্রের কথা বলিয়াছি। এক শ্রেণীর পাত্রের নাম চমস। যজমান এবং ষোল জন ঋত্বিকের মধ্যে নয় জন, এই দশ জনের জন্য দশখানি চমস নির্দ্দিষ্ট থাকে ; ইহাদের নাম এই জন্য চমসী। এক একখানি চমস এক এক জন চমসাধ্বর্য্যুর জিম্বায় থাকে। চমসাধ্বর্য্যু সোমরসে চমস পূর্ণ করিয়া চমসীদের হাতে দেন। ধিষ্ণ্য নামক অগ্নিস্থানের কথা বলিয়াছি—সেই ধিষ্ণ্যগুলি আজ জ্বালান হইয়াছে। এক একটি ধিষ্ণ্য এক এক জন চমসীর নির্দ্দিষ্ট। চমসীরা আপন আপন ধিষ্ণ্যে বসিয়া অনুবাক্যা এবং যাজ্যা পাঠের পর বষট্‌কার করেন। অধ্বর্য্যু তাঁহাদের প্রত্যেকের হাত হইতে চমস লইয়া সেই চমসের সোম অগ্নিতে ঢালিয়া দেন। হবিঃশেষ ভোজনের জন্য রক্ষিত হয়। তার পর সেই হবিঃশেষ পানের ধুম লাগিয়া যায়। যজমান ও ঋত্বিকেরা সদঃশালায় প্রবেশ করিয়া হুতাবশিষ্ট সোমরস পান করেন। সোমপান বিষয়ে অনেক খুঁটিনাটি আছে। সকল কথা তুলিয়া আপনাদিগকে ত্যক্ত করিব না।

সোমাহুতির পাত্রের মধ্যে দুইখানি পাত্রের নাম ঋতুপাত্র ; একখানি অধ্বর্য্যুর জন্য ; একখানি প্রতিপ্রস্থাতার জন্য। ঋতুপাত্র পূর্ণ করিয়া অধ্বর্য্যু ছয় দেবতার উদ্দেশে ছয় বার এবং প্রতিপ্রস্থাতা ছয় দেবতার উদ্দেশে ছয় বার সোমাহুতি দেন। যাজ্যা পাঠ করেন কোন বার হোতা,

কোন বাব অন্য ঋত্বিক্। আহুতির পর আহুতিদাতা ও বষট্‌কর্ত্তা হবিঃশেষ পান করেন।

আপনারা বিরক্ত হইতেছেন। কিন্তু বিরক্ত হইলে চলিবে না। প্রাতঃসবনের প্রধান আহুতির কথাই এখনও বলা হয় নাই। এই প্রধান আহুতি তিনটি; নাম যথাক্রমে ঐন্দ্রাগ্ন, বৈশ্বদেব এবং উক্থ্য আহুতি। আহুতিকালে যাজ্যামন্ত্রের পূর্ব্বে একটি ঋক্‌মন্ত্র,—অনুবাক্যামন্ত্র পাঠ করাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু এই তিন আহুতিতে যাজ্যার পূর্ব্বে বহু ঋক্‌মন্ত্র পড়িতে হয়। এই ঋক্‌সমূহের নাম শস্ত্র। ঐ সকল মন্ত্রে দেবতার শংসন বা প্রশংসা হয়, সেই জন্য মন্ত্রসমূহের নাম শস্ত্র। হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এবং অচ্ছাবাক্, এই চারি ঋত্বিকের শস্ত্রপাঠে অধিকার আছে। প্রত্যেক শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে উদ্গাতা, প্রস্তোতা এবং প্রতিহর্ত্তা, এই তিন জন সামগায়ী ঋত্বিক্ সাম গান করেন; ইহার নাম স্তোত্রগান। আগে স্তোত্রগান, তার পর শস্ত্রপাঠ। সদঃশালায় একটা ডুমুরের ডাল পোঁতা থাকে, আগে বলিয়াছি—উহার নাম ঔদুম্বরী। স্তোত্রগানের সময় গায়কেরা ঔদুম্বরী স্পর্শ করিয়া গান করেন। স্তোত্রগানের এবং শস্ত্রপাঠের কতকগুলি খুঁটিনাটি নিয়ম আছে। যিনি শস্ত্র পাঠ করিবেন, তিনি আপনার ধিষ্ণ্যের পাশে পূর্ব্বমুখে বসেন। আর যিনি আহুতি দিবেন, তিনি শস্ত্রপাঠককে পিছনে রাখিয়া দুই হাতে ও দুই পায়ে ভর দিয়া চতুষ্পদের মত অগ্নির সম্মুখে বসিয়া থাকেন। শস্ত্রপাঠক প্রথমে "সু মৎ পদ্ বক্ দে পিতা মাতরিশ্বা" ইত্যাদি একটি মন্ত্র মনে মনে জপ করেন। তার পর তিনি আহুতিদাতাকে আহ্বান করিয়া আহাব মন্ত্র পাঠ করেন। প্রাতঃসবনের আহাব মন্ত্র "শোংসাবোম্"। অর্থ, আমরা উভয়ে শংসন করি বা শস্ত্র পাঠ করি। আহুতিদাতা তাহার উত্তরে বলেন—"শংসামোদৈবোম্" অর্থাৎ তুমিই শংসন কর, তাহাতে আমোদ হইবে। এই উত্তরের নাম প্রতিগর। তাহার পর শস্ত্রপাঠক তূষ্ণীংশংস নামক আর একটি মন্ত্র মনে মনে জপ করেন। প্রাতঃসবনে তূষ্ণীংশংস "ভূরগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ"। তার পর শস্ত্রপাঠক শস্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হন। শস্ত্রের অন্তর্গত মন্ত্রগুলি ঋক্‌মন্ত্র; কিন্তু তদতিরিক্ত কতকগুলি যজুর্মন্ত্রও সেই সঙ্গে পড়িতে হয়। এইগুলির নাম নিবিৎ মন্ত্র। শস্ত্র পাঠের পর তিনি বলেন, "উক্থং বাচি"; অর্থাৎ আমার বাক্যে উক্থ বা শস্ত্র পাঠ হইল। অধ্বর্য্যু তাহার উত্তরে বলেন,

"উক্‌থশাঃ যজ সোমস্য"—উক্‌থ পাঠ হইয়াছে, এখন সোমাহুতির যাজ্যা পাঠ কর। অধ্বর্য্যুর এই আদেশ পাইয়া শস্ত্রপাঠক যাজ্যা পাঠ করেন। "যে যজামহে" বলিয়া যাজ্যা পাঠ আরম্ভ হয়, তাহার পর বৌষট্‌ উচ্চারণ করিতে হয়। অধ্বর্য্যু এই সময়ে খানিকটা সোমরস আহুতি দেন। শস্ত্রপাঠক আবার বলেন, "সোমস্য অগ্নে বীহি বৌষট্‌"—অগ্নি, তুমি সোম ভক্ষণ কর ও বহন কর। এই দ্বিতীয় বার বৌষট্‌ উচ্চারণের নাম অনুবষট্‌কার। অনুবষট্‌কারের পর অধ্বর্য্যু আবার খানিকটা সোম আহুতি দেন। আহুতির পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আহুতিদাতা এবং শস্ত্রপাঠক উভয়ে মিলিয়া পান করেন। ইহাই শস্ত্রপাঠের পর সোমাহুতির সাধারণ নিয়ম। প্রত্যেক আহুতির পরে চমসীরা সোমাহুতি দেন ও চমসস্থ সোম পান করেন।

ঐন্দ্রাগ্ন, বৈশ্বদেব এবং উক্‌থ্য, এই তিনটি আহুতির কথা বলিয়াছি। প্রথম দুই গ্রহের আহুতিদাতা অধ্বর্য্যু; শস্ত্রপাঠক হোতা। উক্‌থ্য গ্রহ তিন অংশে আহুতি দেওয়া হয়। শস্ত্রপাঠক যথাক্রমে মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক্‌। ইহারা তিন জনেই হোতার সহকারী।

প্রাতঃসবন সমাপ্ত হইল। পরে মাধ্যন্দিন সবন। মাধ্যন্দিন সবনের অনুষ্ঠান প্রাতঃসবনের চেয়ে সংক্ষিপ্ত। ইহাতে উপাংশু হোম নাই, অন্তর্যাম হোম নাই, দ্বিদেবত্য যাগ নাই, ঋতুগ্রহ যাগও নাই। শুক্র গ্রহ ও মন্থি গ্রহের যাগ আছে। উহার সঙ্গে চমসাহুতি আছে। এই সব আহুতির পর তিন প্রধান আহুতি—তজ্জন্য যথারীতি শস্ত্রপাঠ ও স্তোত্রগান। প্রথম দুই আহুতির নাম মরুত্বতীয় ও মাহেন্দ্র—স্তোত্রগানের পর হোতা শস্ত্র পাঠ করেন, অধ্বর্য্যু আহুতি দেন। তৃতীয় আহুতি উক্‌থ্য তিন অংশে দেওয়া হয়। শস্ত্র পাঠ করেন মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক্‌। মাঝে মাঝে চমসাহুতি পূর্ব্ববৎ।

তৃতীয় সবন আরও সংক্ষিপ্ত। ইহাতে উপাংশু ও অন্তর্যাম হোম নাই। দ্বিদেবত্য নাই, ঋতুগ্রহ নাই, শুক্র, মন্থি পর্য্যন্ত নাই। এই সকলের পরিবর্ত্তে আদিত্য ও সাবিত্র গ্রহের এবং পাত্নীবত গ্রহের আহুতি আছে। স্তোত্রগান এবং শস্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রধান আহুতি দুইটি; বৈশ্বদেব এবং আগ্নিমারুত। তাহার মাঝে মাঝে চমসাহুতি।

এই সকল আহুতিতে সোমরস প্রায়ই ফুরাইয়া আসে। যে একটু অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে ধানা বা যবভাজা মিশাইয়া মাথায় লইয়া উন্নেতা নামক ঋত্বিক্ আহুতি দেন; হোতা যাজ্যা পাঠ করেন। ইহার নাম হারিযোজন গ্রহ। ইহাতে শস্ত্রপাঠ নাই। এইখানে সোমাহুতি সমাপ্ত হইল। পশুযাগের যে সকল অঙ্গ অবশিষ্ট ছিল, তাহা শেষ করিয়া তৃতীয় সবন সমাপ্ত করা হয়। যজমানের সহিত ঋত্বিকেরা এখন সামগান শুনিতে শুনিতে অবভৃথ স্নানের জন্য জলাশয়ে গমন করেন। সোমযাগের সরঞ্জামগুলি জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। বরুণ দেবতাকে একটা পুরোডাশ দিয়া সপত্নীক যজমান স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করেন, এবং দীক্ষাকালে যে সকল বেশভূষা করিয়াছিলেন, তাহাও ত্যাগ করেন। যজমান এখন সোমযজ্ঞে পুনর্জন্ম পাইলেন। এখনও কিন্তু খালাস পান নাই। অবভৃথ স্নানের পর যজ্ঞশালায় ফিরিয়া আসিয়া আর একটি ইষ্টিযাগের প্রয়োজন। দীক্ষার পরদিন প্রায়ণীয় ইষ্টিযাগে কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছিল। উদয়নীয়ে কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে হয়। প্রায়ণ শব্দের অর্থ আরম্ভ; উদয়ন শব্দের অর্থ সমাপ্তি। উদয়নীয় যাগের পদ্ধতি সর্ব্বাংশে প্রায়ণীয়েরই মত। যজ্ঞের আরম্ভ এবং শেষ এক রকমের করা হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, সমস্ত যজ্ঞটা একগাছা লম্বা দড়ি; প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয়, এই দুই ইষ্টিযাগের দ্বারা এই দড়ির দুই প্রান্তে গিঁঠ দিয়া দড়িকে শক্ত করা হয়।

আপনারা মনে করিতেছেন, এইবার অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু এখনও অব্যাহতি পাইবেন না। ইষ্টিযাগের পর আর একটি পশুযাগ করিতে হইবে। বন্ধ্যা গাভী, তদভাবে একটি বৃষ দ্বারা পশুযাগ হইবে। ইহার নাম অনুবন্ধ্য পশুযাগ। পশুযাগের পর নূতন করিয়া মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া সেই অগ্নিতে আবার একটি ইষ্টিযাগ। ইহার নাম উদবসানীয় ইষ্টিযাগ। এই যাগে অগ্নির উদ্দেশে পুরোডাশ দিতে হয়। এইবার সত্য সত্যই অব্যাহতি। যজমান ঐ ইষ্টিযাগ সমাপনের পর সন্ধ্যাকালে দেবযজনভূমি হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসেন।

অগ্নিষ্টোমের যে বিবরণ দিলাম, তাহাতে তাহার ক্রম মনে রাখা আপনাদের কঠিন হইবে। আর একবার অতি সংক্ষেপে আওড়াইব; তাহাতে মনে রাখিবার সুবিধা হইতে পারে।

অগ্নিষ্টোমে সোমাহুতি এক দিনে সম্পাদ্য; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে চারি দিন যজ্ঞাঙ্গ কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিতে হয়; সমুদয় কার্য্যে পাঁচ দিন লাগে। প্রথম দিনে সপত্নীক যজমানের দীক্ষা এবং সেই প্রসঙ্গে দীক্ষণীয় ইষ্টিযাগ। দ্বিতীয় দিন পূর্ব্বাহ্নে যজ্ঞের আরম্ভ সূচনায় প্রায়ণীয় ইষ্টিযাগ। পরে সোম ক্রয় করিয়া যজ্ঞশালায় সোমের আনয়ন, এবং সোমের সম্বর্দ্ধনার্থ আতিথ্য ইষ্টিযাগ। আতিথ্যের পর পূর্ব্বাহ্নেই প্রবর্গ্য যজ্ঞ এবং উপসদিষ্টিযাগ। এই সময়ে তানূনপত্র দ্বারা যজমান ও ঋত্বিক্‌দের সন্ধিবন্ধন। উপসদের সঙ্গে সোমে জলের ছিটা দিয়া আপ্যায়ন ও সোমের পূজার জন্য নিহ্নব পাঠ। সে দিন অপরাহ্নেও প্রবর্গ্য ও উপসৎ এবং অপরাহ্নেও প্রবর্গ্য ও উপসৎ। তৃতীয় দিন পূর্ব্বাহ্নে প্রবর্গ্য ও উপসৎ এবং অপরাহ্নেও প্রবর্গ্য ও উপসৎ। মাঝে মহাবেদি-নির্ম্মাণ। চতুর্থ দিনে পূর্ব্বাহ্নেই দুই বার প্রবর্গ্য এবং দুই বার উপসৎ সারিয়া উত্তরবেদিতে অগ্নিপ্রণয়ন। এই অগ্নিতে সোমাহুতি হইবে। অগ্নি প্রণয়নের পর সোম রাখিবার গাড়ী দুইখানির—হবির্দ্ধান শকট দুইখানির প্রবর্ত্তন অর্থাৎ মহাবেদির উপরে আনয়ন। তার পর অগ্নি ও সোমের প্রণয়ন; অর্থাৎ ধিষ্ণ্য জ্বালিবার জন্য অগ্নি আনয়ন এবং ঐষ্টিক বেদি হইতে সোমের আনয়ন। এই অগ্নি ও সোমের সম্বর্দ্ধনার্থ অগ্নীষোমীয় পশুযাগ। সন্ধ্যার পর বসতীবরী জল আনয়ন। পঞ্চম দিন সোমযাগের দিন। ভোরের বেলায় হোতা প্রাতরনুবাক্‌ মন্ত্র পড়েন; এবং ঋত্বিকেরা একধনা জল আনেন, তার পরে সবন আরম্ভ হয়। প্রত্যেক সবনে সোমের অভিষব হয় অর্থাৎ নিগ্রাভ্যের জলে সোম ছেঁচিয়া বসতীবরী ও একধনার সহিত মিশাইতে হয়; পরে ছাঁকিয়া লইয়া দ্রোণকলস ও পূতভৃৎ পূর্ণ করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে বা স্থালীতে এবং চমসে করিয়া এই সোমের আহুতি দেওয়া হয়। অনেক আহুতি হয়;—অন্যান্য আহুতি সংক্ষিপ্ত; কিন্তু প্রধান আহুতিগুলিতে আড়ম্বর আছে। প্রধান আহুতির পূর্ব্বে সামগায়ী ঋত্বিকেরা একযোগে স্তোত্র গান করেন, আর হোতা বা তাঁহার সহকারী ঋত্বিকে শস্ত্র পাঠ করেন। এক এক শস্ত্রমধ্যে বহু ঋক্‌ থাকে। শস্ত্র পাঠের পর সোমাহুতি ও সোমপান হয়; তৎপরে চমসাহুতি ও চমসপান হয়। তিন সবনেই এইরূপ; তবে প্রাতঃসবনের চেয়ে মাধ্যন্দিন সংক্ষিপ্ত; তৃতীয় সবন আরও সংক্ষিপ্ত। তিন সবন ব্যাপিয়া একটি পশুযাগ হয়—উহার নাম সবনীয় পশুযাগ।

তিন সবনের পর সপত্নীক যজমানের অবভৃথ স্নান। সেখানে বরুণকে পুরোডাশ দিয়া যজ্ঞশালায় ফিরিয়া যজ্ঞসমাপ্তিসূচক উদয়নীয় ইষ্টিযাগ। তৎপরে অনূবন্ধ্য পশুযাগ। পশুযাগের পর মন্থন দ্বারা নূতন অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাতে উদবসানীয় ইষ্টিযাগে যজ্ঞ সমাপ্ত করা হয়।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ব্যয়সাধ্য, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্ততঃ এক শত গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। ঋত্বিক্‌দের ভাগ এইরূপ—ব্রহ্মা, উদ্‌গাতা, হোতা, অধ্বর্য্যু, এই চারি জন প্রধান ঋত্বিকের প্রত্যেকে বারটি করিয়া আটচল্লিশটি। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, প্রস্তোতা, মৈত্রাবরুণ, প্রতিপ্রস্থাতা, প্রত্যেকে ছয়টি করিয়া চব্বিশটি। পোতা, প্রতিহর্ত্তা, অচ্ছাবাক্‌ ও নেষ্টা, প্রত্যেকে চারিটি করিয়া ষোলটি। অগ্নীৎ, সুব্রহ্মণ্যা, গ্রাবস্তুৎ, উন্নেতা, প্রত্যেকে তিনটি করিয়া বারটি। সমুদয়ে এক শতটি গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। তদ্ব্যতীত কিছু সোনা, ঘোড়া, বস্ত্র, ছাতু, তিল ইত্যাদিও ঐ অনুপাতে দক্ষিণা দেওয়া হয়। চমসাধ্বর্য্যুরাও যথাসম্ভব দক্ষিণা পান। মাধ্যন্দিন সবনের সময় দক্ষিণা দিতে হয়। অগ্নিষ্টোমের বিবরণ এইখানে সমাপ্ত করিলাম। আপনারা ধীরভাবে শুনিলেন; আপনাদের জয় হউক।

অগ্নিষ্টোমের নানা বিকৃতি আছে; তন্মধ্যে উক্‌থ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্র, এই তিনটির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে চাহি। ইহাদের পদ্ধতি অগ্নিষ্টোমেরই মত; তবে কিছু কিছু বিশেষ বিধি আছে। প্রথমে উক্‌থ্য যাগ। অগ্নিষ্টোমের প্রাতঃসবনে পাঁচটি শস্ত্র,—হোতার দুইটি, তাঁহার তিন সহকারীর তিনটি; মাধ্যন্দিন সবনেও পাঁচটি শস্ত্র,—হোতার দুই ও সহকারীদের তিন। তৃতীয় সবনে শস্ত্রসংখ্যা দুইটি—হোতাই দুই শস্ত্র পাঠ করেন; সহকারীদের শস্ত্র নাই। কাজেই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে তিন সবনে মোটের উপর শস্ত্রসংখ্যা বার। প্রত্যেক শস্ত্রের পূর্ব্বে স্তোত্রগান হয়; অতএব স্তোত্রসংখ্যাও বার। আনুষঙ্গিক সবনীয় পশুযাগে একটি মাত্র পশু; উহাই সবনীয় পশু; অগ্নির উদ্দেশে একটি ছাগ দিতে হয়। এই হইল অগ্নিষ্টোম। উক্‌থ্য যজ্ঞের প্রাতঃসবন ও মাধ্যন্দিন সবন অগ্নিষ্টোমেরই মত। তৃতীয় সবনে হোতার দুই শস্ত্র ব্যতীত হোতার তিন সহকারীর, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক্‌, এই তিন জনের তিন শস্ত্র আছে। কাজেই প্রত্যেক সবনে শস্ত্রসংখ্যা পাঁচ; তিন সবনে পনর। শস্ত্র যখন পনর, স্তোত্রও তখন পনর। সবনীয় পশু দুইটি—

অগ্নির উদ্দেশে একটি ছাগ এবং ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়ের উদ্দেশে আর একটি ছাগ। তার পর ষোড়শী যজ্ঞ। ইহাতে উক্থ্য যজ্ঞে বিহিত পনেরটি শস্ত্র ত আছেই ; তাহার উপর অতিরিক্ত আর একটি শস্ত্র আছে। কাজেই শস্ত্রসংখ্যা ষোল। অতএব স্তোত্রসংখ্যাও ষোল। ষোল বলিয়া যজ্ঞের নাম ষোড়শী। সবনীয় পশু এবার তিনটি ; অগ্নির ছাগ, ইন্দ্রাগ্নির ছাগ এবং ইন্দ্রের মেষ। তার পর অতিরাত্র যজ্ঞ ; পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞগুলি দিনের বেলাতেই সম্পন্ন হয় ; রাত্রিতে কোন কাজ থাকে না। অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শীর উপরে অতিরিক্ত রাত্রিকৃত্য থাকে। এই জন্য নাম অতিরাত্র ; রাত্রিকালে তিন পর্য্যায়ে সোমাহুতি। প্রতি পর্য্যায়ে চারিটি শস্ত্র ; হোতার একটি, তাঁহার সহকারী তিন জনের তিনটি—এইরূপে তিন পর্য্যায়ে বারটি শস্ত্র। রাত্রিশেষে আরও একটি শস্ত্র হোতার পাঠ্য। কাজেই ষোড়শীর ষোল শস্ত্রের উপরে এই তেরটি যোগ করিলে মোটের উপর উনত্রিশটি শস্ত্র হয়। অতএব অতিরাত্র যজ্ঞে সমুদায়ে উনত্রিশটি শস্ত্র। অতএব উনত্রিশটি স্তোত্র। সবনীয় পশু চারিটি। অগ্নির ছাগ, ইন্দ্রাগ্নির ছাগ, ইন্দ্রের মেষ এবং তদ্ব্যতীত সরস্বতীর উদ্দেশে একটি ছাগ।

অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, এই সকল সোমযজ্ঞ এক দিনেই শেষ হইবে। দীক্ষা এবং উদ্যোগ আয়োজনে ও আনুষঙ্গিক ইষ্টিযাগাদিতে কয়েক দিন যায় বটে ; কিন্তু প্রকৃত সোমযাগ এক দিনের অনুষ্ঠান ; এক দিনেই তিন সবন। কিন্তু বড় বড় সোমযজ্ঞে একাধিক দিন লাগিত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বারো দিন অথবা তাহার অধিক দিন ধরিয়া যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, তাহাকে সত্র বলিত। দ্বাদশাহ নামক সত্র বারো দিনের অনুষ্ঠান ; গবাময়ন নামক সত্র সংবৎসরের অনুষ্ঠান। নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক বহুবৎসরব্যাপী সত্রানুষ্ঠান করিতেন, এইরূপ পৌরাণিক কাহিনী আপনারা শুনিয়াছেন। এই সকল বহুদিনব্যাপী সত্রানুষ্ঠানে প্রত্যহই সোমযজ্ঞ হইত ; প্রত্যহই সোমের অভিষব, সোমের আহুতি ও তৎসহিত পশুযাগাদি হইত। দ্বাদশাহ যজ্ঞে প্রথম দিনে অতিরাত্র ও শেষ দিনেও অতিরাত্র যজ্ঞ ; মাঝে কয়েক দিনের কোন দিন বা অগ্নিষ্টোম, কোন দিন উক্থ্য, কোন দিন বা ষোড়শী ইত্যাদি যজ্ঞ হইত। সংবৎসরব্যাপী গবাময়ন সত্রও ঐরূপ—প্রথম দিনে অতিরাত্র, শেষ দিনে অতিরাত্র, অন্যান্য দিনে অগ্নিষ্টোমাদি যাগ। সংবৎসরকে দুই ভাগে ভাগ করা হইত ; প্রথম ছয়

মাসে যজ্ঞগুলির যে পর্য্যায় ছিল, দ্বিতীয় ছয় মাসে তাঁহার পর্য্যায় বিপরীত ক্রমে উল্টাইয়া বৎসরের দুই ভাগকে বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপে symmetrical করা হইত। এ সকলের আলোচনায় আর প্রয়োজন নাই। আর কথা বাড়াইলে আমাকে গালি দিবেন। সোমরসে মাদকতা ছিল, কিন্তু আমি সোমযজ্ঞের যে বিবরণ দিলাম, তাহাতে আপনাদের অবসাদ বই উন্মাদনা কিছুই হয় নাই। দুইটা রোচক কথা বলিয়া আমি আজি ছুটি লইব।

আগে আপনাদিগকে বলিয়াছি যে, সোমলতা যে কোন্ লতা, এ কালে তাহা কেহই জানে না। বেদ এবং আবেস্তা, উভয় শাস্ত্রের বিবরণে বুঝা যায় যে, উহা এক জাতি ওষধি। ওষধি শব্দে বর্ষজীবী উদ্ভিদ্ বুঝায় ;—যে সকল গাছ বৎসরের মধ্যেই জন্মে, বাড়ে ও মরিয়া যায় ; পর-বৎসর আবার নূতন করিয়া জন্মে, বাড়ে ও মরে। সোমকে ওষধিপতি বলা হয়। সোমের বা সোমরসের বর্ণ ছিল অরুণ, পিঙ্গল ; সোমের একটা প্রসিদ্ধ বিশেষণ শুক্র ; শুক্র অর্থে উজ্জ্বল। উহার রসে মিষ্টতা ছিল ; উহার নামান্তর মধু—বেদে ইহাকে বহু স্থলে মধু বলা হইয়াছে ; উপরন্তু ইহা মাদকতা জন্মাইত, বাক্যে স্ফূর্ত্তি দিত, গায়ে বল দিত। দেবতারা ইহা পান করিতেন ; ইন্দ্র সোম পান করিয়া বৃত্রকে পরাজয় ও বধ করিয়াছিলেন। শুধু বল কেন, সোমরস ব্যাধি দূর করিত। অধিক কি বলিব, বেদের ভাষায় সোম অমরতা দিত। দেবতারা সোম পান করিয়াই অমর হইয়াছিলেন ; ঋষিরাও অমরত্ব পাইবার জন্য সোম পান করিতেন। অমরতা দিতে পারে বলিয়াই সোমযজ্ঞের মাহাত্ম্য। সোমের নামান্তরই এই জন্য অমৃত। এই যে সোম, মর্ত্ত্যে তিনি ওষধির রাজা ; স্বর্গে তিনি দেবগণেরও একজন রাজা ; ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে দেখিবেন, সোমকে ভূয়োভূয়ঃ রাজা সোম বলা হইয়াছে। রাজা সোম যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলে উহার সম্মানার্থ আতিথ্য ইষ্টিযাগের বিধি। এক কালে দেবগণের নিকটেও ইনি দুর্লভ ছিলেন। দেবতারা ইঁহার জন্য লালায়িত ছিলেন ; ইঁহার সন্ধান পাইয়া কৌশল আশ্রয়ে ইঁহাকে আনিয়াছিলেন। সোম আনয়নের আখ্যায়িকাতে বৈদিক সাহিত্য পূর্ণ। স্বর্গের কোন উচ্চ দেশে সোম গুপ্ত ছিলেন ; সুপর্ণ বা শ্যেন পাখী সেখান হইতে দেবতাগণের জন্য, ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদসংহিতায় বহু স্থলে এই উপাখ্যানের

উল্লেখ দেখিবেন। পুরাণে ইহা গরুড় কর্ত্তৃক অমৃতহরণের আখ্যানে পরিণত হইয়াছে। বেদে দেখিবেন, সোম জলের মধ্যে, সমুদ্রের মধ্যে ছিলেন; পুরাণেতিহাসে দেখিবেন, সোম বা অমৃত উদ্ধারের জন্য সমুদ্র মন্থন আবশ্যক হইয়াছিল—দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই অমৃতপ্রার্থী হইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে নানা নিধি উঠিয়াছিল; সর্ব্বশেষে উঠিয়াছিলেন সোম বা অমৃত। দেবতারা অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া সেই অমৃত লাভ করেন; কেবল মহাদেবের ভাগে পড়িয়াছিল বিষ। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থেও সর্ব্বত্র এই আখ্যায়িকা নানারূপে দেখিবেন। সোম গন্ধর্ব্বদের নিকট লুক্কায়িত ছিলেন; কোন পাখী, শ্যেনী বা সুপর্ণী সেই সোম আনয়ন করে; সেই সুপর্ণী আর কেহ নহে, স্বয়ং গায়ত্রী। আবার দেখিবেন, গন্ধর্ব্বদের নিকট সোম ছিলেন; দেবতারা বাগ্‌দেবীকে সেই সোম আনিবার জন্য পাঠাইতেছেন; স্ত্রীপ্রিয় গন্ধর্ব্বেরা নগ্না কুমারী বাগ্‌দেবীর লোভে সোম ছাড়িয়া দিল; বাগ্‌দেবী সোম লইয়া চলিয়া আসিলেন। সোমযজ্ঞের আরম্ভে সোম ক্রয় উপলক্ষে এই ঘটনার অভিনয় হইত, তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছি। এই বাগ্‌দেবী এবং গায়ত্রী অভিন্ন; কেন না, গায়ত্রী ছন্দোগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। বেদের মন্ত্রই বাক্। এবং বেদের সারভূতা গায়ত্রীমন্ত্র বেদের শ্রেষ্ঠ বাক্য; গায়ত্রীই বাগ্‌দেবতা। স্বয়ং বাগ্‌দেবতাকে সোম আনয়ন করিতে হইয়াছিল—তিনি সোম আনিয়া দেবগণকে অমৃতত্ব দান করিয়াছিলেন। দেবতারা সোমযাগ করিতেন; স্বয়ং প্রজাপতি সোমযাগ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিবস্বান্ এবং ত্রিত আপ্‌ত্য দেবগণের পানের জন্য সোমরস প্রস্তুত করিতেন। আবেস্তা শাস্ত্রেও সোমের এই সমুদয় মাহাত্ম্য, এই সমুদয় আখ্যায়িকা কোনও না কোনও আকারে পাওয়া যায়; আবেস্তা শাস্ত্রেও বিবস্বান্ এবং ত্রিত আপ্‌ত্যের নাম প্রায় অবিকৃত অবস্থাতেই পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের মধ্যেও উপাখ্যান আছে, দেবরাজ Zeusএর জন্য ঈগ্‌ল পক্ষী মধু আনিয়াছিল; জর্ম্মাণদের মধ্যেও উপাখ্যান ছিল, দেবরাজ Odhin ঈগ্‌ল রূপ ধারণ করিয়া মধু আনিয়াছিলেন। এই ঈগ্‌ল পক্ষী শ্যেন বা সুপর্ণ; এই মধুই সোম। এই সোম কেবল বেদপন্থীর প্রধান দেবতা নহেন; সমস্ত আর্য্য জাতিরও অতি প্রধান এবং অতি প্রাচীন দেবতা। সোমযজ্ঞ আর্য্য জাতিরই প্রাচীনতম জাতীয় অনুষ্ঠান। সর্ব্বত্র

ইহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে; কেবল বোম্বাই প্রদেশে কয়েক জন পার্সী ঔপনিবেশিক এখনও এই প্রাচীন অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন নাই।

এই সোম দেবতাটি কে? আপনারা সোমলতা কখনও চোখে দেখেন নাই। সোম শব্দের অর্থ কি, প্রশ্ন করিলে আপনারা বলিবেন, সোমের অর্থ চন্দ্র। ঐতরেয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে সোমকে চন্দ্রই বলা হইয়াছে—পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, সোম আর চন্দ্র অভিন্ন। ঋগ্বেদসংহিতার মন্ত্র-মধ্যেও কয়েক স্থলে সোম অর্থে যে চন্দ্র, তাহা মনে করিতেই হয়। ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলে একটি প্রসিদ্ধ সূক্ত আছে; সূর্য্যকন্যা সূর্য্যাকে তাহার ঋষি বলা হইয়াছে। ঐ সূক্তমধ্যে সূর্য্যারই বিবাহের বর্ণনা রহিয়াছে। অত্যন্ত গুরু গম্ভীর ভাষায় ঐ সূক্তের আরম্ভ হইয়াছে। "পৃথিবী সত্য দ্বারা উত্তম্ভিত রহিয়াছে, দ্যুলোক সূর্য্য দ্বারা ধৃত রহিয়াছে, আদিত্যগণ ঋতকে আশ্রয় করিয়া দ্যুলোকে রহিয়াছেন; সোমও ঋতের আশ্রয়ে ধৃত রহিয়াছেন। সোমের বলেই আদিত্যগণ বলীয়ান্, সোমের বলেই পৃথিবী মহীয়সী। অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ—নক্ষত্রগণের সন্নিধানেই সোম অবস্থিত রহিয়াছেন।" নক্ষত্রগণের নিকটে যে সোম, সে সোমকে চন্দ্রের সহিত অভিন্ন মনে করা যাইতে পারে। লতা সোমকে সেই চন্দ্রের পার্থিব মূর্ত্তিও মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ঋষি পরক্ষণেই সাবধান হইয়া বলিতেছেন, "সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সংপিষন্তি ওষধিম্, সোমং যং ব্রাহ্মণা বিদুঃ ন তস্যাশ্নাতি কশ্চন"—ওষধি সোমকে পেষণ করিয়া লোকে মনে করে যে, সোম পান করিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যে সোমের নিগূঢ় তথ্য জানেন, সে সোমকে কেহই পান করিতে পায় না। পুনরায় জোরের সহিত বলা হইতেছে, "ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ"—পৃথিবীর কেহই সোমকে পান করিতে পায় না। আবার বলা হইয়াছে, "যৎ ত্বা দেব প্রপিবন্তি তত আপ্যায়সে পুনঃ"—দেব সোম, তোমাকে যে পান করা যায়, তাহাতে তোমার ক্ষয় হয় না, তোমার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। এই সোম দেবতা কোন্ দেবতা?

ব্যাপারটা একটা হেঁয়ালির মত। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা এখনও এই হেঁয়ালির রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই। জর্ম্মান পণ্ডিত হিলিব্রান্ত জোরের সহিত বলেন, চন্দ্রই আর্য্য জাতির প্রধান দেবতা ছিলেন, চন্দ্রই সোম; ঋক্‌সংহিতায়ও সর্ব্বত্র সোম অর্থে চন্দ্র। অন্য পণ্ডিতেরা বলেন,

ঋক্‌সংহিতায় সোম সোমলতা মাত্র; ক্রমশঃ তাহাতে চন্দ্রত্ব আরোপিত হইয়াছে; ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ প্রচারের সময় তিনি একবারে চন্দ্র হইয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতে পণ্ডিতে যখন বিতণ্ডা, তখন আমাদের মত মূর্খের নিরস্ত থাকাই উচিত। কিন্তু চন্দ্রের সহিত পার্থিব সোমলতার এই সম্পর্ক কিরূপে কল্পিত হইল, মানববিজ্ঞানের পক্ষ হইতে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক।

প্রশ্ন এই যে, চন্দ্রের ও সোমলতার সাদৃশ্য কোথায়? নিতান্ত আন্দাজের উপর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু স্থলে উল্লেখ আছে যে, সূর্য্য অস্তমিত হইলে সূর্য্যের তেজের কতকটা চন্দ্রে প্রবেশ করে; কতকটা ওষধিমধ্যে প্রবেশ করে; তাই রাত্রিকালে চন্দ্র উজ্জ্বল হন, কোন কোন ওষধিও উজ্জ্বল হয়। কোন কোন ওষধি—বন্য লতা বা বন্য উদ্ভিদ্ রাত্রিতে উজ্জ্বল হয়; অর্থাৎ phosphoresce করে। কথাটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক নহে। বস্তুতই চাঁদের আলো এবং বুনো লতার phosphorescence সূর্য্যরশ্মিরই পরিণতি মাত্র। হিমালয় পর্ব্বতে এইরূপ phosphorescent ওষধি আছে, কালিদাসের সময় হইতে কবিগণ তাহা বলিয়া আসিতেছেন। পার্ব্বত্য লতাগুল্মের এই দীপ্তি কালিদাসের কবিচিত্তে বেশ একটা ধাক্কা দিয়াছিল। কুমারসম্ভবের আরম্ভেই "ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যাম্ অতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ" এই শ্লোকটি স্মরণ করিবেন। ওষধিপতি সোমলতা এ পর্য্যন্ত কেহ identify করিতে পারেন নাই; কিন্তু খুব সম্ভব, ইহা রাত্রিকালে phosphoresce করিত। লোকে দেখিত, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশে চাঁদ নিষ্প্রভ থাকে, সন্ধ্যার পর আঁধার ঘনীভূত হইলে আকাশে চাঁদ উজ্জ্বল হইয়া উঠে; একের সঙ্গে যেন অন্যের সম্পর্ক বাঁধা আছে। আকাশের চাঁদ ক্রমে ক্ষয় পায়, অমাবস্যার দিন যেন একবারে লুপ্ত হয়; কিন্তু দু দিন পরে আবার ক্ষীণ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণিমার দিনে পূর্ণ চাঁদ আকাশ আলো করে। এই চাঁদ কোথায় যায়? দেবগণ ইহাকে পান করেন, তাহাতেই ইহা ক্রমে ক্ষয় পায়। কিন্তু ইহা একবারে ক্ষীণ হইবার বস্তু নহে; ইহা আবার বৃদ্ধি পায়, ইহার আপ্যায়ন ঘটে। বস্তুতঃ ইহা লুপ্ত হইবার নহে; ইহা অমৃতস্বরূপ। সোমলতা ওষধি, অর্থাৎ বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। বৎসরমধ্যে জন্মে, বাড়ে, মরে, আবার পর-বৎসর যথাকালে গজাইয়া উঠে; আরণ্য উদ্ভিদ্, কেহ রোপণ করে না, কেহ যত্ন করে না, অথচ মরিয়াও যেন মরে না। আকাশের চাঁদ

যেমন লুপ্ত হইয়াও লোপ পায় না ; পৃথিবীর লতাও তেমনই মরিয়াও মরে না। উভয়েই স্বরূপতঃ এক ; উভয়েই অমৃতস্বরূপ। আকাশে যে গ্রহপতি, পৃথিবীতে তাহা ওষধিপতি। উভয়ই স্বরূপতঃ এক ; উভয়েই সোম। আকাশের নক্ষত্রগুলি দেবতাদের গৃহ ; দেবগৃহাণি বৈ নক্ষত্রাণি। দেবতারা আপন আপন ঘরে বসিয়া থাকেন ; সোম সেই ঘরে ঘরে বিচরণ করে ; দেবতারা তাহা পান করেন ; পানের পর সোমপাত্র রিক্তপ্রায় হইলে সোমের আবার আপ্যায়ন হয় বা পূরণ হয়। আকাশে নক্ষত্রমধ্যে বিচরণকালে ছোট ছোট গ্রহগুলিও—planetগুলিও হয়ত ছোট ছোট সোমপাত্র ; ঐ পাত্রও অমৃতপূর্ণ ; দেবতারা ঐ গ্রহ পূর্ণ করিয়া সোম পান করেন। পৃথিবীতে ওষধি সোম দ্যুলোকে স্থিত সেই সোমেরই প্রতিরূপ। যজমান ও ঋত্বিকেরা পাত্র পূর্ণ করিয়া সোমরসের গ্রহ পান করেন। সেই সোমও ফুরায় না ; সেই জন্য তাহার আপ্যায়ন অনুষ্ঠান।

এই যে সোম দেবতা, তিনি মূলে দ্যুলোকবিহারী চন্দ্রই ছিলেন, অথবা পার্ব্বত্য লতা মাত্র ছিলেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাহার বিচার করুন। বেদপন্থী যাজ্ঞিকের এবং যজমানের সে বিচারে বিশেষ প্রয়োজন নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টাইলারের স্বীকারোক্তি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে শুনাইয়াছি। Sacrifice has passed in the course of religious history into transformed conditions, not only of the rite itself, but of the intention with which the worshipper performs it. কোন অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হউক, যজমানের পক্ষে ও যাজ্ঞিকের পক্ষে ঐ intentionটাই বড় কথা এবং এক মাত্র কথা। সোম দেবতা মূলে যিনিই হউন, যাজ্ঞিক ও যজমান তাঁহাকে কোন্ চোখে কিরূপে দেখিতেন, তাহাই বড় কথা। যাজ্ঞিকের নিকট এই সোম "এষো দেব অমর্ত্ত্যঃ" ; ইঁহার স্তুতি-গানে বেদসাহিত্য পরিপূর্ণ এবং মুখর। যজ্ঞকালে হোতা ও তাঁহার সহকারিগণ ইঁহার প্রশংসার্থ মন্ত্র পাঠ করিতেন, ঋক্‌মন্ত্রের আবৃত্তি করিতেন, উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারিগণ সামমন্ত্রে ইঁহার স্তুতি গান করিতেন। ঋক্‌সংহিতার নবম মণ্ডলটাই ইঁহার স্তুতিগীতে পরিপূর্ণ—ঋক্‌সংহিতা ব্যাপিয়া ইঁহার প্রশংসাবাক্য ছড়াইয়া আছে। ঋষিগণ পরস্পর স্পর্দ্ধার সহিত ইঁহার গুণ গান করিতেছেন ; বাক্যে তাহা কুলাইতেছে না। এই অমর্ত্ত্য দেব, এই

চিরনবীন শিশু, এই জ্যোতির্ম্ময় গন্ধর্ব্ব, আকাশের উর্দ্ধভাগে অবস্থিত ছিলেন ; সেখান হইতে জগৎ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ; ইহার শুভ্র তেজ দীপ্তি পাইতেছিল ; দ্যুলোক ও ভূলোককে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া দীপ্তি পাইতেছিল। ইনি স্তম্ভের মত দ্যুলোককে ধারণ করিয়া আছেন, তিনি ভূলোককে দ্যুলোকের সহিত যুক্ত করিয়াছেন ; তিনি সপ্ত সিন্ধু হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত ঘিরিয়া আছেন। এই নবীন যুবা বিশ্ব জয়ের জন্য জন্মিয়াছেন, ইনি দিব্যরূপে রূপবান্, ইনি নরের প্রতি কৃপাবান্, ইনি জগতের আয়ুঃস্বরূপ। দিবোদাসপুত্র প্রতর্দ্দন বলিতেছেন, ইনি দেবগণমধ্যে ব্রহ্মা, বিপ্রগণমধ্যে ঋষি, মৃগগণমধ্যে মহিষ, গৃধ্রগণমধ্যে শ্যেন পক্ষী। ইনি "ঋতস্য গোপা"—সত্যের রক্ষাকর্ত্তা। ইনি বিদ্বান্ ; উর্দ্ধ হইতে ইনি বিশ্বভবনে দৃষ্টি করেন। "ঋতস্য তন্তুর্বিততঃ পবিত্রে, আ জিহ্বায়া অগ্রে বরুণস্য মায়য়া"—ইহারই মায়াবলে বরুণদেবের জিহ্বাগ্রে সত্যধর্ম্মের তন্তুসূত্র পবিত্রোপরি বিস্তৃত রহিয়াছে। ঋষি কশ্যপের সহিত আমরাও তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি—

ঋতং বদন্ ঋতদ্যুম্ন
সত্যং বদন্ সত্যকর্ম্মন্
শ্রদ্ধাং বদন্ সোমরাজন্
ধাত্রা সোম পরিষ্কৃতঃ।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥

হে ঋতদ্যুম্ন, তুমি ঋত বাক্য বলিয়া থাক ; হে সত্যকর্ম্মা, তুমি সত্য বাক্য বলিয়া থাক ; হে সোম রাজা, তুমি শ্রদ্ধাবাক্য বলিয়া থাক ; ধাতা কর্ত্তৃক পরিষ্কৃত হইয়া ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

সত্যমুগ্রস্য বৃহতঃ
সং স্রবন্তি সংস্রবাঃ,
সং যন্তি রসিনো রসাঃ
পুনানো ব্রহ্মণা হরে।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥

সত্য তুমি উগ্র ; তুমি বৃহৎ ; তুমি রসস্বরূপ ; তোমার রসধারা সর্ব্বত্র মিলিত হইতেছে ; অহে হরি, ব্রহ্মবাক্যে পূত হইয়া তুমি ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

যত্রানুকামং চরণং
ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ,
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তঃ
তত্র মামমৃতং কৃধি।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥

উর্দ্ধস্থিত সেই তৃতীয় নাকে, সেই তৃতীয় দ্যুলোকে, যেখানে যথাকাম মুক্তভাবে বিচরণ করা যায়, যেখানে লোকসকল জ্যোতিষ্মান্, সেইখানে আমাকে অমৃতপদ দাও ; ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

যত্র রাজা বৈবস্বতো
যত্রাবরোধনং দিবঃ,
যত্রামূর্য্যহ্বতীরাপঃ
তত্র মামমৃতং কৃধি।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥

যেখানে বৈবস্বত রাজা আছেন, যেখানে দ্যুলোকের অবরোধ দ্বার, যেখানে অপ্ সমূহ প্রবহমাণ, সেইখানে আমাকে অমৃতপদ দাও ; ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

যত্র জ্যোতিরজস্রং
যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্,
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমান
অমৃতে লোকে অক্ষিতে।
ইন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥

যেখানে অজস্র জ্যোতিঃ, যেখানে স্বর্গলোক অবস্থিত, হে পবমান সোম, সেই অক্ষয় অমৃতলোকে আমাকে লইয়া যাও ; ইন্দ্রের জন্য তুমি ক্ষরিত হও।

খ্রীষ্ট-যজ্ঞ

খ্রীষ্টানেরা আপনাদের দেবতা খায়, খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধে এইরূপ একটা বিদ্রূপ প্রচলিত আছে।

এই দেবতা খাওয়ার কথা আমি তুলিয়াছি। Eucharistic Sacrifice উপলক্ষে যে রুটি ও মদ উৎসর্গ করা হয়, উহা খ্রীষ্টের মাংস ও রক্ত—উহা খাইলে খ্রীষ্টকেই খাওয়া হয়। এতদ্দ্বারা খ্রীষ্টের সহিত খ্রীষ্টানের একাত্মতা সম্পাদিত হয়; খ্রীষ্টান খ্রীষ্ট হইয়া যায়; মানুষ দেবতা হইয়া যায়। আপনারা হাসিবেন ও বলিবেন, একাত্মতা সম্পাদনের এমন সহজ উপায় আর নাই; চিবাইয়া আত্মসাৎ করার মত একাত্মতা পাইবার উপায় আর নাই।

হাসিলে চলিবে না; মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা নানা দেশের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন, দেবতার সহিত একাত্মতা লাভের এই উপায়টি কেবল খ্রীষ্টানের আবিষ্কার নহে। দেবতাকে আত্মস্থ করিবার এমনই একটা উপায় বহু দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এক জন মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে শুনাইতে চাহি।

> "Sacrifice is primarily a sacramental meal at which the communicants are a deity and his worshippers, and the elements the flesh and blood of the sacred victims. Primitive tribes everywhere seem to regard themselves as related to their gods by the bond of kinship and every tribe has certain sacred animals which it regards as related to the tribal god by precisely the same bond. These sacred animals are probably a survival of the totem-stage through which all civilised races seem to have passed."

আপনারা এই totemএর কথা শুনিয়াছেন। বহু অসভ্য জাতি আপনাকে কোন-না-কোন জন্তুর বংশধর বলিয়া মনে করে। সেই জন্তুকে আপনার জ্ঞাতি মনে করে; তাহার পূজা করে; এমন কি, আচারে ব্যবহারে

সেই জন্তুর অনুকরণ করে। সেই জন্তুটার নাম টোটেম; জন্তু না হইয়া গাছপালা বা অন্য কিছু টোটেম হইতে পারে। পুরাণে বর্ণিত নাগ জাতির, পক্ষী জাতির কথা আপনাদের মনে পড়িবে; বাসুকি, তক্ষক ইত্যাদি নাগের কথা মনে পড়িবে; সম্পাতি, জটায়ু প্রভৃতি পাখীর কথা মনে পড়িবে; বালী, সুগ্রীব প্রভৃতি বানরের, জাম্ববান্ প্রভৃতি ভালুকের কথা মনে পড়িবে। বংশপ্রতিষ্ঠা যে পশু হইতে, বংশধরগণের পূজা পাওয়া সেই পশুর পক্ষে সহজ; পণ্ডিতেরা বলেন, এইরূপে বহু স্থলে পশু দেবতা হইয়া গিয়াছে। পশু এইরূপে দেবত্ব পায়, আবার অন্য দিকে মানুষ ও দেবতা জ্ঞাতি-সম্পর্কে সম্বদ্ধ হইয়া যায়। ঐ পণ্ডিত বলিতেছেন, যজ্ঞানুষ্ঠান একটা sacramental meal মাত্র; যজ্ঞের পর যাবতীয় লোকে যজ্ঞে নিহত পশুর মাংস ভক্ষণ করে। ইহাতে তাহারা দেবতার সহিত এক হইয়া যায়। পশুবধটা যজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠান নহে; সকলে মিলিয়া পশুমাংস ভক্ষণটাই প্রধান অনুষ্ঠান—"The significant part of a sacrifice is not the slaying of the victim, but the sacrificial meal which follows. During this meal the life of the sacrificial animal with its mysterious nature is supposed to pass physically into the communicants, whereby the natural bond of union between the god and his clients is sacramentally confirmed and sealed. The object is always to renew and strengthen the ties of kinship and friendship between the god and his worshippers."

যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে এ-কালের পণ্ডিতদের এই একটা থিয়োরি—এই থিয়োরির সমর্থনের জন্য বহু দেশ হইতে তাঁহারা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন; চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত বেড়াইয়াছেন। মতভেদেরও অন্ত নাই। এই টোটেম সম্বন্ধেই কোন পণ্ডিত বলেন, অসভ্য জাতি মাত্রেই টোটেম মানে; এ-কালে যাহারা খুব সভ্য, তাহাদের অসভ্য পূর্ব্বপুরুষেরাও এক কালে টোটেম মানিত। অন্য পণ্ডিতে টোটেমের প্রসার সঙ্কীর্ণ করিতে চাহেন। বিখ্যাত পণ্ডিত ফ্রেজার বলিতেছেন,—"We may say broadly that totemism is practised by many savage peoples, whose complexion shades off from coal black through dark brown

to red. With the somewhat doubtful exception of a few Mongoloid tribes in Assam, no yellow and no white race is totemic." অর্থাৎ কালা, পিঙ্গলা ও রাঙা মানুষে টোটেম মানে, ধলা ও হল্‌দে মানুষে মানে না। টোটেমের কথা এখন থাক; দেবতা খাওয়ার দৃষ্টান্ত দুই একটা আলোচনা করিব।

মেক্সিকোতে এক কালে নরযজ্ঞ হইত। উহাদের প্রাচীন দেবতাদের নাম উচ্চারণ ভীষণ ব্যাপার। তাহাদের একটি দেবতার নাম ছিল—তেজকাৎলি পোকাস বা ঐরূপ একটা কিছু। বড় লোকের ছেলে ধরিয়া সেই দেবতার নিকট বলি দেওয়া হইত। কিছু কাল ধরিয়া বেচারাকে দেবতা বলিয়া মান্য করা হইত; সে একাধারে মানুষ ও দেবতা হইত; অবশেষে তাহাকে বধ করিয়া তার মাংস সকলে বাঁটিয়া খাইত। মেক্সিকোতে হুইজি-পুজলি নামে আর একটি দেবতা ছিল; তাহার ময়দার মূর্ত্তি গড়িয়া সকলে খাইত; মনে করিত, দেবতার মাংস খাওয়া হইতেছে। মিশর দেশের প্রধান দেবতা অসিরিসের নাম আপনারা শুনিয়াছেন। পশুমধ্যে বৃষ অসিরিসের পার্থিব মূর্ত্তি বলিয়া পূজা পাইত। আমাদের গাভী যেমন ভগবতী, মিশর দেশের বৃষ সেইরূপ ভগবান্ ছিলেন। তবে মিশর দেশে এই দেবতাটিকে বধ করিয়া তাহার মাংস সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করিত। Encyclopædia of Religion and Ethics এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "From a very early stratum of religion comes the idea of feeding on the God." গ্রীকদের মধ্যে, রোমানদের মধ্যে এইরূপ দেবতা খাওয়া প্রথা প্রচলিত ছিল কি না, তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ ঘটিয়াছে। বাদানুবাদের হেতু আছে; কেন না, গোঁড়া খ্রীষ্টানেরা জোরের সহিত বলিতে চাহেন যে, এই দেবতা খাওয়া ব্যাপারটা আমাদের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিশিষ্ট অনুষ্ঠান; আর কোন ধর্ম্মে দেবতা খাওয়া নাই। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক আলোচনার পক্ষপাতী, তাঁহারা ইহা মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, উহা সকল দেশে সকল সমাজেই আছে। কাজেই দুই দলে গণ্ডগোল বাধিয়া যায়; সেই গণ্ডগোলের অন্ত হয় না। দেবতার উদ্দেশে পশুবধ, এবং সেই পশুর মাংস ভক্ষণ বহু দেশেই আছে। কিন্তু সেই পশুটা দেবতা কি না, সেই পশুর মধ্যে দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন কি না, উহার মধ্যে দেবতার real presence আছে কি না, সেই পশু খাইলে দেবতাকে খাওয়া

হয় কি না, দেবতাকে আত্মসাৎ করিয়া দেবতার সহিত একতাপ্রাপ্তি ঘটে কি না, ইহা লইয়াই তর্ক উঠে। খ্রীষ্টানেরা বলিতে চাহেন, এইরূপে দেবত্বলাভের প্রার্থনা করি—কেবল আমরা। অন্যে কেবল পশুমাংস খায়—উদর পূরণের জন্য ; বড় জোর দেবতার প্রসাদ পাইয়া নিজের উদর পূরণের ব্যবস্থা করে মাত্র। খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই ব্যাপারটা একটা গূঢ় রহস্য, একটা mystery ; অন্য জাতির ধর্ম্মানুষ্ঠানে যদি ইহার অনুরূপ কিছু থাকে, তাহা হইলে খ্রীষ্টানেরা বলিবেন, উহা শয়তানের কারসাজি।

আজি কালি Mithraism লইয়া খুব আলোচনা হইতেছে। এই মিথ্র দেবতা প্রাচীন পারসীদিগের খুব প্রাচীন দেবতা ; বেদপন্থীদের প্রাচীন দেবতা মিত্রের সহিত ইনি অভিন্ন। বেদে যিনি মিত্র, আবেস্তা শাস্ত্রে তিনিই মিথ্র। আমি ইঁহাকে মিত্রই বলিব। বেদে ইনি আদিত্যগণের মধ্যে অন্যতম ; ঋগ্বেদসংহিতায় ইঁহাকে প্রায় সর্ব্বত্রই বরুণ দেবতার চিরসহচররূপে দেখিতে পাওয়া যায় ;—মিত্র এবং বরুণ যেন এক জোড়া দেবতা। ভট্টিকাব্যের "ইতঃ স্ম মিত্রাবরুণৌ কিমেতৌ" এই শ্লোকটি মনে করুন। বনবাসী রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া লোকে বলাবলি করিত, এ কি মিত্র এবং বরুণ কি স্বর্গ হইতে নামিয়া বনে বেড়াইতেছেন ? সোমযজ্ঞের প্রাতঃসবনে একটা সোমাহুতি মিত্র ও বরুণ এই জোড়া দেবতাকেই দেওয়া হইত, এ কথা আগে বলিয়াছি। তাঁহারা মাদকপ্রিয় ছিলেন না ; মাদকতা নাশের জন্য তাঁহাদের সোমরসে দধি মিশাইতে হইত। আমরা বরুণকে বরং স্মরণে রাখিয়াছি ; তিনি এখন জলাধিপতি ও পশ্চিম দিকের অধিপতি ; কিন্তু মিত্রকে আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মে মিত্র এবং বরুণের স্থান আরও উচ্চে—বরুণ স্বয়ং অহুর মজদ্—অসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; মিত্র তাঁহার সহচর, মর্য্যাদায় প্রায় বরুণের সমান। মিত্রদেবের মর্য্যাদা পারসী সমাজে ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি বরুণদেবের পুত্র ও চিরসহচর ;—পতিত মানবের প্রতি তিনি করুণাময়—মিত্র নামেই তাঁহার পরিচয় ;—তিনি মানবের ত্রাণকর্ত্তা—Saviour, Redeemer, এবং Mediator হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। খ্রীষ্টের সহিত মিত্রদেবতার আপনারা তুলনা করিবেন।

এই মিত্র দেবতার পূজা পারসী সমাজের সীমা ছাড়াইয়া রোম সাম্রাজ্য-মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আজকাল তাহার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত

হইয়াছে। ফিলাডেলফিয়া সহরের অধ্যাপক Groten, Christian Eucharist সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়াছেন। তিনি রোম সাম্রাজ্যে মিত্রপূজার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন, "We can almost trace its progress along the southern and western shores of the Black Sea, up the Danube, into the forests of Germany, then down into Italy, then westward through Gaul across the Channel into the land of the Britons. It followed the Roman army and through the missionary zeal of Roman officers made its triumphant headway. The remarkable parallelism between its tenets and the doctrines of Christianity has awakened deep surprise and has led somo modern students mistakenly to view Christianity as simply a revamping of Mithraism." লেখক খ্রীষ্টীয় Divinity শাস্ত্রের অধ্যাপক; তিনি বলিতেছেন, "mistakenly"; কিন্তু অনেক পণ্ডিতে জোরের সহিত বলিতে চাহেন যে, রোম-সাম্রাজ্যমধ্যে খ্রীষ্টপূজার তুলনায় মিত্রপূজার প্রসার-প্রতিপত্তি অধিক ছিল; সম্রাট্ কনষ্টাণ্টাইনও প্রথমে মিত্রপূজার পক্ষপাতী ছিলেন; পরে তিনি খ্রীষ্টান হন। তিনি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাটেরা আইনের জোরে, গায়ের জোরে মিত্রপূজা বন্ধ করিয়া দেন। মিত্রপূজা বন্ধ করিয়া দেন বটে, কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম্ম মিত্রপূজার বহু অনুষ্ঠান, বহু তত্ত্ব আত্মসাৎ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠে; নতুবা জনসাধারণ মিত্রকে ছাড়িয়া খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিত না।

এই মিত্রপূজায় খ্রীষ্টানদের 'eucharistic অনুষ্ঠানের অনুরূপ অনুষ্ঠান ছিল। প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মে ঋত্বিকেরা রুটি ও সোমরস উৎসর্গ করিতেন। মিত্রপূজার প্রতিপত্তির সময়ে সোমরস দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার বদলে আঙ্গুরের রস জলে মিশাইয়া দেওয়া হইত। এই দ্রাক্ষারসই ফেনাইলে মদ হয়। "They placed before the mystic a loaf and a cup full of water over which the priest pronounced the sacred formulas. This oblation of bread and water, with which they mingled wine, is compared by the Christian apologist with the Christian communion."

মিত্রপূজায় এই খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠান দেখিয়া সেকালের খ্রীষ্টান ফাদারেরা চটিয়া আগুন হইতেন। তাঁহাদের দুই এক জনের কথা শুনুন। জষ্টিন মার্টার বলিতেছেন, "The wicked devils have imitated the Christian institution in the mysteries of Mithras, commanding the same thing to be done. For, bread and a cup of water are placed with certain incantations in the mystic rites of one who is being initiated." টার্টুলিয়ান বলিতেছেন, "The devil, by the mysteries of his idol, imitates even the main parts of the divine mysteries. Mithra even celebrates the oblation of bread."

যীশুখ্রীষ্ট কথায় কথায় আপনার রক্ত-মাংসকে খাদ্যের সহিত, অন্নের সহিত তুলনা করিতেন; এবং সেই অন্ন যে অমৃতস্বরূপ, তাহাও ঘুরাইয়া বলিতেন। আমাদের শাস্ত্রোক্ত অন্নব্রহ্মের কথা আপনাদের স্মরণে আসিবে। খ্রীষ্টের উক্তি—I am the bread of life—আমি প্রাণের অন্নস্বরূপ। He that eateth my flesh and drinketh my blood, dwelleth in Me and I in him—যে আমার মাংস ভক্ষণ করে এবং আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে অবস্থান করে এবং আমি তাহাতে অবস্থিত হই—উভয়ের একতা সম্পাদিত হয়। Except ye eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, ye have no life in you.—যে এই মানব-সন্তানের মাংস ভক্ষণ করে নাই বা রক্ত পান করে নাই, সে মৃত। খ্রীষ্ট এখানে আপনাকে মানবরূপী,—জীবরূপী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। পুনশ্চ "Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life."—যে আমার মাংস ভক্ষণ করিয়াছে, আমার রক্ত পান করিয়াছে, সে অমরতা পাইয়াছে।

আর পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। খ্রীষ্টানেরা যে রুটি আর মদ উৎসর্গ করিয়া ভক্ষণ করেন, তাহা খ্রীষ্টের মাংস আর রক্ত; উহা খাইলে খ্রীষ্টকেই খাওয়া হয়; খ্রীষ্ট তাঁহাদের দেবতা; জনকেশ্বরে আর তনয়েশ্বরে কোন ভেদ নাই; উভয়েই এক আত্মা। গোঁড়া খ্রীষ্টানেরা মনে করেন, ইহা আমাদের নিজস্ব অনুষ্ঠান; অন্য কোন সমাজে যদি উহার অনুরূপ কোন অনুষ্ঠান থাকে, তাহা শয়তানের কারসাজি—diabolical parody. প্রশ্ন

উঠে, আমাদের বেদপন্থী সমাজে ঐরূপ অনুষ্ঠান ছিল কি না? আবেস্তাপন্থী সমাজে নিশ্চয় ছিল; বেদপন্থী সমাজে ছিল কি না?

এই আলোচনার পূর্ব্বে আমার একটা কৈফিয়তের প্রয়োজন। আপনারা মনে করিবেন না, খ্রীষ্টান সমাজের অনুরূপ অনুষ্ঠান আমাদের বেদপন্থী সমাজের মধ্যেও ছিল, এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়া আমি বৈদিক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছি; ইহাতে আমাদেরও গৌরব বাড়িবে। সেরূপ দুরভিসন্ধি আমার কিছুই নাই। তবে আমি এখানে তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; বৈদিক ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কোন সাদৃশ্য যদি থাকে, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান আমি কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। সেটা না দেখাইলে বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে না। সেই সাদৃশ্য কোথা হইতে আসিল, কিরূপে ঘটিল, আপনারা তাহার বিচার করিবেন। আমি এই সাদৃশ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। বৈদিক অনুষ্ঠানে পুরোডাশ বা রুটি দেওয়া হইত, আর সোমরস দেওয়া হইত। রুটিটা পশুমাংসেরই বদলে দেওয়া হইত; সেই পশুমাংসে কোন দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কি না, তাহা দেখিতে হইবে। রক্ত দেওয়া বেদপন্থীর পক্ষে নিষিদ্ধ; কেন না, বেদপন্থীর দেবতা রক্ত খাইতেন না; রক্ত রাক্ষসের প্রিয়। খ্রীষ্টের রক্ত অমরত্ব দিতে পারে; কিন্তু আমাদের সোমরস রক্ত নহে; উহা একবারে অমৃত। উহা পান করিলে অমর হওয়া যায়—দেবত্ব পাওয়া যায়। কণ্বের পুত্র প্রগাথ ঋষি বলিতেছেন, "অপাম সোমমমৃতা অভূম, অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্"—আমি সোম পান করিয়া অমর হইয়াছি; আমি জ্যোতি লাভ করিয়াছি ও দেবগণকে জানিয়াছি। এই পুরোডাশ আর সোমরস দেবতাকে দিতে হইত, আর ঋত্বিকেরা যজমান সহিত ইহা ভক্ষণ করিতেন। সোমরস পান ত অমৃত পান; পুরোডাশ ভক্ষণের তাৎপর্য্য কি, তাহা আমাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, এবং খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্যের সহিত ইহার কোন মিল আছে কি না, তাহাও বুঝিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানটার তাৎপর্য্য স্পষ্ট করিয়া বুঝা আবশ্যক।

খ্রীষ্টজন্মের পর শওয়া তিন শ বৎসর অতীত হইয়াছে। সমস্ত রোম-সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টপূজা ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু এখনও মিত্রপূজাকে ঠেলিয়া ঠতে পারে নাই। খ্রীষ্টানেরা সমস্ত সাম্রাজ্যকে কতকগুলি এলাকায়

ভাগ করিয়া ফেলিয়াছেন; এক এক এলাকা এক এক বিশপের অধীন। রোমের সম্রাট্ কাইসার কন্ষ্টাণ্টাইন এত দিন 'সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান' ছিলেন; তুলাদণ্ডের এক পাল্লায় মিত্রকে, অন্য পাল্লায় খ্রীষ্টকে বসাইয়া তুলনা করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি খ্রীষ্টের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। খ্রীষ্টপূজা রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে তর্ক উঠিযাছে, এই খ্রীষ্টটি কে? ঈশ্বরের সহিত ইঁহার সম্পর্ক কি? ইনি ঈশ্বরের পুত্র বটে, কিন্তু পিতা পুত্রের সমান কি না? উভয়ে তুল্যমূল্য কি না? পুত্র ষোল আনা ঈশ্বর হইলে একেশ্বরবাদ থাকে কোথায়? খ্রীষ্টীয় সমাজে ইহা লইয়া দলাদলি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে। কাইসার কন্ষ্টাণ্টাইন নাইসিয়া নগরে খ্রীষ্টীয় সঙ্গীতি আহ্বান করিলেন—বহু পূর্ব্বে অশোক যেমন বৌদ্ধ সঙ্গীতি ডাকিয়াছিলেন, সেইরূপ। নানা দেশ হইতে খ্রীষ্টান যাজকেরা আসিলেন; হাজার দুই যাজক আসিলেন, তার মধ্যে তিন শতাধিক বিশপ। রাজপ্রাসাদের বড় হলে তাঁহারা সারি দিয়া বসিলেন; হলের মাঝখানে উচ্চাসনে বাইবেল রক্ষিত হইল—রত্নখচিত purple robe পরিয়া স্বয়ং কাইসার সিংহাসনে বসিলেন;—আজি তিনি রোমের রাষ্ট্রগোপঃ পুরোহিতঃ—pontifex maximus. যাজকগণের ভোট লইয়া তিনি খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব মঞ্জুর করিবেন। এক দিকে Ariusএর দল; ইঁহারা খ্রীষ্টকে ষোল আনা ঈশ্বর বলিতে নারাজ; অন্য দিকে Athanasius-এর দল; ইহাদের মতে খ্রীষ্ট ষোল আনা ঈশ্বর। আথানেসিয়সের জয় হইল। উপস্থিত যাজকগণের কোলাহলে এরায়সের দলের ক্ষীণ স্বর ডুবিয়া গেল। রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাহা অনুমোদন করিলেন। খ্রীষ্টের পূর্ণ ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। কাইসারের আদেশ রোমসাম্রাজ্যে প্রচারিত হইল—রোমের কাইসার মানিয়া লইয়াছেন, খ্রীষ্ট পরিপূর্ণ ঈশ্বর; যে রোমান ইহা মানিবে না, সে রাষ্ট্রের শত্রু। এরায়সের রচিত পুঁথিপত্র চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়ান হইল; তাঁহার দলের যে দুই জন বিশপ স্বীকারপত্রে সহি দেন নাই, তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইলেন। তদবধি আজি পর্য্যন্ত জন কয়েক ইউনিটেরিয়ান ছাড়া সমস্ত খ্রীষ্টান খ্রীষ্টকে পরিপূর্ণ ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন। যে ইহাতে সংশয় করে, সে খ্রীষ্টান নহে।

নাইসিয়া নগরে প্রচারিত খ্রীষ্টীয় সমাজের এই স্বীকারোক্তির নাম Nicene Creed ; সমস্ত খ্রীষ্টীয় সমাজ ইহা মানিয়া থাকেন। আপনারা জানেন, ইংরেজেরা রোমের বিশপের এলাকার বাহিরে ; ইহারা পোপের অধীনতা কাটিয়া প্রোটেষ্টাণ্ট হইয়াছিলেন। রাণী এলিজাবেথের আমলে Church of Englandএর ধর্ম্ম সম্পর্কে মতামত বাঁধা যায়। ৩৯টি ধারায় তাহা বিধিবদ্ধ। উহাই ইংরেজের চার্চের বিখ্যাত Thirty-nine Articles। বিশপেরা এই ধারাগুলি সঙ্কলন করেন ; এবং রাণী এলিজাবেথ পার্লেমেণ্টে মঞ্জুর হইলে উহা অনুমোদন করেন। মনে রাখিবেন, ইংরেজদের রাজাও ইংরেজের দেশে রাষ্ট্রগোপ পুরোহিত—Defender of the Faith ; তবে ইংরেজদের রাজা প্রজাপ্রতিনিধিদের সম্মতি না লইয়া কিছু করিতে পারেন না। তাই এই ধারাগুলি পার্লেমেণ্টে মঞ্জুর করাইয়া লওয়া দরকার হইয়াছিল। পার্লেমেণ্টে ভোটের দ্বারা জনকেশ্বরের সহিত তনয়েশ্বরের সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে, এবং আজি পর্য্যন্ত সেই সম্পর্ক বাহাল আছে।

Nicene Creed স্বীকার করিতেছেন—We believe in one God, the Father almighty, maker of all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the word of God, God from God, Light from Light, Life from Life, true God from true God, the only begotten Son, begotten not made, of the same essence with the Father, the firstborn of every creature, begotten of God the Father before all ages, through whom also all things were made, who for our salvation took flesh and lived amongst men, and suffered, and rose again on the third day, and ascended unto the Father, and will come again in glory.

Church of England মানিয়া লইতেছেন—There is but one living and true God, everlasting, without body, parts or passions, of infinite power, wisdom and goodness, the maker and preserver of all things both visible and invisible ; And in unity of this Godhead there be three persons of one substance, power and eternity, the Father, the Son and the Holy Ghost. The Son, which is the

Word of the Father, begotten from everlasting of the Father, of one substance with the Father, took man's nature, so that two whole and perfect natures, that is to say, the Godhead and manhood, were joined together in one Person, never to be divided, whereof one is Christ, very God and very man, who truly suffered, was crucified, dead, and buried, to reconcile his Father to us and to be a sacrifice, not only for original guilt, but also for all actual sins of men.

আপনারা দেখিলেন, ইংলিশ চর্চ্চ অনেকগুলি বিশেষণ স্পষ্টভাবে দিয়াছেন, যাহা Nicene Creedএ নাই বা অস্পষ্টভাবে আছে। Nicene Creed প্রচারিত হইবার পর উহা আরও পল্লবিত হইয়াছিল; এইরূপ পল্লবিত আর একটা creedএর নাম Athanasian Creed; Church of England এই creedটিও মানিয়া লইয়াছেন; কাজেই উহা এতটা স্পষ্ট হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রকারদের মতে প্রত্যেক বিশেষণের গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। অখ্রীষ্টানের পক্ষে সেই তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন। আমি যথাশক্তি আমাদের ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা করিব। ইংলিশ চর্চ্চ বলিতেছেন, There is but one God—ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়; তিনিই God the Father—যো নঃ পিতা জনিতা;—তিনি living god—তিনি প্রাণস্বরূপ, স উ প্রাণস্য প্রাণঃ; তিনি everlasting—অজ বা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত; without body—অমূর্ত্ত বা মূর্ত্তিরহিত;—without parts, কলাহীন বা নিষ্কল, নিরবয়ব, অখণ্ড; without passions—শুদ্ধ, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন। এই বিশেষণগুলি একত্র করিলে আমাদের ভাষাতে পাওয়া যায়—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ"—এই বাক্যের প্রায় সকল বিশেষণই খ্রীষ্টানের ভাষায় আছে। নিষ্ক্রিয় বিশেষণটা নাই। খ্রীষ্টানের ইহাতে আপত্তি থাকিতে পারে। দিব্য বা জ্যোতির্ম্ময় বিশেষণটাও এখানে নাই, কিন্তু Nicene Creed মধ্যে আছে। বাহ্যাভ্যন্তরঃ বা সর্ব্বব্যাপী—এটাও নাই। খ্রীষ্টান ইহাতে আপত্তি করিবেন কি না জানি না। তাহার পর বলিতেছেন, "of infinite power"—সর্ব্বশক্তি; "of infinite wisdom"—সর্ব্বজ্ঞ

—এই দুইটি বিশেষণ আমাদের সর্ব্বশাস্ত্রে সুপরিচিত। তার পরের বিশেষণ —of infinite goodness—এখানে goodnessএর অর্থ kindness—it denotes the Divine will realising itself in imparting happiness to creatures—ইহার নামান্তর Grace, কৃপা বা করুণা। অদ্বয়বাদী তাঁহার পরব্রহ্মে এই বিশেষণ অর্পণে কুণ্ঠিত হইতে পারেন; কিন্তু রামানুজ স্বামী তাঁহার ব্রহ্মে, তাঁহার বাসুদেবে অকুতোভয়ে এই বিশেষণ আরোপ করিয়াছেন—"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ," "জগতামুপকারায় চেষ্টা তস্যাপ্রমেয়স্য"; তিনি "অপার-কারুণ্যসৌশীল্য-বাৎসল্য-ঔদার্য্য-মহৌষধি।" তৎপরে বলা হইতেছে, তিনি maker and preserver of all things, visible and invisible—তিনি যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভূতগণের সৃষ্টিকর্ত্তা ও স্থিতিবিধাতা; অর্থাৎ তিনি ভূতযোনি—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি।

জনকেশ্বরের বিশেষণগুলি আপনারা শুনিলেন। ঈশ্বরের সহিত খ্রীষ্টের সম্পর্ক স্থির করিবার জন্য খ্রীষ্টান সমাজে অনেক গণ্ডগোল হইয়াছে। খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব পূর্ণ, না আংশিক, ইহা লইয়াই বিরোধ। Nicene Creed যে সম্পর্ক চিরকালের জন্য ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন, তাহাই বিখ্যাত Trinity তত্ত্ব বা ত্রিপুরুষতত্ত্ব। প্রথম পুরুষ জনকেশ্বর, দ্বিতীয় পুরুষ তনয়েশ্বর, তৃতীয় পুরুষ Holy Spirit. Trinity-তত্ত্বমতে ঈশ্বর এক হইয়াও এই তিন পুরুষরূপে বিদ্যমান; ইঁহারা প্রত্যেকেই পূর্ণ ঈশ্বর, অথচ ঈশ্বর তিন জন নহেন, একজন। "The three Persons are of the same essence, power and eternity. Each is God; in each dwells the whole fullness of the godhead." প্রত্যেকেই নিত্য, প্রত্যেকেই সর্ব্বশক্তিমান্। এইখানে এক দল বলিতেন, পুত্র পিতার সমান; আর এক দল বলিতেন, পুত্র পিতার সদৃশ। এক দলের মতে সম্পর্কের নাম homo-ousia—সমাত্মকতা, অন্য দলের মতে নাম homoi-ousia সদৃশাত্মকতা। পিতা ও পুত্র উভয়ের একই essence, substance বা বস্তু। অথচ উভয়ের মধ্যে একটা উপাধিগত ভেদ আছে। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর হইতে জাত; সকলের অগ্রে জাত; begotten of the Father, first begotten of the Father. পিতা ঈশ্বর যাবতীয় ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা—maker of all things; কিন্তু পুত্রের পক্ষে তিনি

maker নহেন ; সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন ; তিনি begetter মাত্র, জন্মদাতা মাত্র ; ইহার মানে এই যে, যাবতীয় ভূতের তিনি নিমিত্ত-কারণ মাত্র, কিন্তু পুত্রের পক্ষে তিনি নিমিত্ত-কারণও বটে, উপাদান-কারণও বটে। কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত-কারণ, সে মাটি দিয়া ঘট গড়ে ; কিন্তু পিতা পুত্রের পক্ষে নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ ; তিনি আপনার উপাদান হইতেই পুত্রকে জন্ম দেন।

পিতা পুত্রের জন্ম দিয়াছেন, সকলের অগ্রে জন্ম দিয়াছেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, কবে কোন্ কালে জন্ম দিয়াছেন ? খ্রীষ্টান উত্তরে বলেন, before all ages অর্থাৎ যখন কাল পর্য্যন্ত ছিল না, সেই কালে। ইহার অর্থ পুত্র পিতার মতই অনাদি ও নিত্য। পিতা যে তারিখে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টানেরা সেই তারিখের হিসাব দেন, কিন্তু পুত্রের জন্মের কোন তারিখ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। ফলে তিনি কালাতিগ, কালাতীত, beyond time ; যখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, সেই কালে তিনি জন্মিয়াছিলেন।

এইখানে পিতা পুত্রে যৎকিঞ্চিৎ ভেদ। পিতা অনাদি ও নিত্য ; পুত্রও অনাদি নিত্য, অথচ পুত্র পিতা হইতে জাত। পিতার যত কিছু উপাধি বা বিশেষণ, সমুদয়ই পুত্রে বিদ্যমান ; একটা অতিরিক্ত বিশেষণ পুত্রে আছে ;—তিনি পিতা হইতে জাত।

খ্রীষ্টের এই বিশেষণটি দেখিয়া আপনাদের হিরণ্যগর্ভকে মনে পড়িবে। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ"—হিরণ্যগর্ভ জাত হইয়াছিলেন ; অথচ তিনি সকলের অগ্রে বর্ত্তমান ছিলেন ; তিনি অগ্রজন্মা ঈশ্বর। জন্ম মাত্রেই তিনি ভূতসকলের পতি হইয়াছিলেন, ভূতপতি আর প্রজাপতি যদি এক অর্থে লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রজাপতিও অগ্রে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা আমাদের শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। এই প্রজাপতিই ভূতসকলের স্রষ্টা—তিনি কামনা করিলেন, আর ভূতসকলের ও প্রজা-সকলের সৃষ্টি হইল। খ্রীষ্ট সম্বন্ধে খ্রীষ্টান বলেন, তিনি অগ্রজন্মা পুত্র এবং তাঁহার দ্বারাই পিতা ঈশ্বর ভূতসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন—through Him all things were made ; খ্রীষ্টের জন্মেই সৃষ্টির আরম্ভ—His everlasting birth is the first step towards creation, and the universe of things owes its origin to Him. হিরণ্যগর্ভ

যেমন ভূতসকলের পতি, খ্রীষ্টানেরাও খ্রীষ্টকে সেইরূপ ভূতসকলের পতি বলিয়া থাকেন। খ্রীষ্টের চলিত বিশেষণ our Lord ; আর একটা বিশেষণ King,—King of Kings or Lord of Lords ; far above all authority and power and every name which is named.

আপনারা দেখিলেন, পিতা ও পুত্র সর্ব্বতোভাবে ও তুল্যরূপে পরিপূর্ণ ঈশ্বর ; তবে উভয়ের মধ্যে উপাধিভেদ আছে। উভয়ে অনাদি ও নিত্য হইলেও পিতা জন্মরহিত বা অজ ; পুত্র পিতা হইতে জাত এবং অগ্রে জাত। এই ভেদ সত্ত্বেও অভেদ স্পষ্ট করিবার জন্য আরও কয়েকটি বিশেষণের প্রয়োগ হয়। পুত্র পিতা হইতে জন্মিয়াছেন : কে কাহা হইতে জন্মিয়াছেন ? উত্তরে বলা হয়, God from God—ঈশ্বর হইতে ঈশ্বর জন্মিয়াছেন ; very God from very God—পূর্ণ ঈশ্বর হইতে পূর্ণ ঈশ্বর জন্মিয়াছেন। অতঃপর বলা হয়, Light from Light—পিতা জ্যোতিঃস্বরূপ, পুত্রও জ্যোতিঃস্বরূপ। Life from Life—পিতা প্রাণস্বরূপ, পুত্রও প্রাণস্বরূপ। ব্রহ্মসূত্রের সেই সূত্র তিনটি মনে করুন—"জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ," "প্রাণস্তথানুগমাৎ," "অতএব প্রাণঃ"। ছান্দোগ্য ও কৌষীতকি উপনিষদের বাক্য অবলম্বনে এই সূত্র তিনটি। ছান্দোগ্য বলিতেছেন,—"অথো যদ্ অতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে, বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু, সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু, অনুত্তমেষু উত্তমেষু লোকেষু, যদিদং বাব তদ্, যদিদং অন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ"—যে জ্যোতিঃ দ্যুলোকের উপরে, বিশ্বের পৃষ্ঠে, সর্ব্বলোকের পৃষ্ঠে দীপ্তিমান্, পুরুষের অন্তঃশরীরে যে জ্যোতিঃ দীপ্তিমান্, সেই পরজ্যোতিই এই জ্যোতিঃ। ঈশ্বরকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলা হয় ; কেন না, "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—তাহার প্রভায় আর সকলে প্রভা দেয়, তাঁহার প্রভায় আর সকলে প্রভান্বিত হয়। কৌষীতকি বলিতেছেন,—"প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতং ইত্যুপাস্ব"—আমি প্রাণস্বরূপ ও প্রজ্ঞাস্বরূপ, আয়ুঃস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ ; আমাকে উপাসনা কর। ছান্দোগ্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন,—"কতমা সা দেবতা ?" উত্তরে বলিতেছেন, "প্রাণ ইতি হোবাচ" —তিনি প্রাণ। এর চেয়ে স্পষ্ট ভাষা আর হইতে পারে না।

এই খ্রীষ্টকে যেমন Son of God বলা যায়, তেমনই ইহাকে Son of Man বলা হয়। Nicene Creed এই Son of Man সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে বলিতেছেন, Who for our salvation became flesh, and

lived amongst men, and suffered, and rose again on the third day and ascended unto the Father. এইরূপে সংক্ষেপে খ্রীষ্টের মনুষ্য-জীবনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তিনি মানবের পরিত্রাণের জন্য মানববিগ্রহ ধরিয়া মানবের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, এবং মানবের জন্য প্রাণ দিয়া তৃতীয় দিনে সমাধি হইতে উত্থান করেন ও পিতার সমীপে উপস্থিত হন। এই জন্য তাঁহাকে Saviour বলা হয়। Saviour শব্দের অনুবাদ আপনারা শুনিতে চাহেন? তারাসার উপনিষদে ইহার অনুবাদ পাইবেন—অত্যন্ত পরিচিত ভাষায় অনুবাদ পাইবেন—Saviourএর অনুবাদ তারক ব্রহ্ম।

মানবরূপে বা জীবরূপে ঈশ্বরের অবতরণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তি। যিনি ঈশ্বররূপে অমূর্ত্ত, জীবরূপে তিনি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ঈশ্বরত্ব যেমন পরিপূর্ণ, তাঁহার জীবত্বও সেইরূপ পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের সহিত তিনি যেমন একাত্মা, জীবের সহিতও তিনি তেমনই একাত্মা। একাধারে তিনি পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ জীব। মনে করিবেন না, মেরীগর্ভে জন্মগ্রহণেই তিনি জীবত্ব পাইলেন; তিনি অনাদি জীব। মেরীগর্ভে জন্মগ্রহণের নাম Incarnation বা মানববিগ্রহ ধারণ; কিন্তু তৎপূর্ব্ব হইতেই তিনি জীব—কেন না, "He was in the flesh, as before the Incarnation, in the bosom of the Father." তিনি মানবজন্ম গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই জীবরূপে পিতার সহিত যুক্ত ছিলেন। মর্ত্ত্যভূমি হইতে তিরোভাবের পরেও তিনি এই জীবত্ব ত্যাগ করেন নাই। এইরূপে পূর্ণ ঈশ্বরত্ব ও পূর্ণ জীবত্ব তাঁহাতে চিরতরে মিলিত হইয়া আছে। "Two whole and perfect natures, the Godhead and the manhood, were joined together in one Person, never to be divided." এই পূর্ণ ঈশ্বরত্ব এবং পূর্ণ জীবত্বের সম্মিলনে একই Christ; ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব তাঁহাতে একাধারে মিলিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে। কখনও তাহাতে বিচ্ছেদ ঘটে নাই বা ঘটিবে না।

ইতর জীবের সহিত এই খ্রীষ্টের সম্পর্ক কিরূপ? জীব মাত্রই ঈশ্বরের পুত্রস্থানীয় হইয়াও পুত্রের অধিকারে বঞ্চিত; জীবের অপরাধে উভয়ের মধ্যে একটা দারুণ ব্যবধান দাঁড়াইয়াছে। এই অপরাধের খ্রীষ্টানী নাম Sin—পাপ। অধ্যাপক ডয়সেন দেখাইয়াছেন, খ্রীষ্টান যেখানে বলেন

পাপ, বেদপন্থী সেখানে বলেন অবিদ্যা। খ্রীষ্টান বলেন, এই অপরাধে জীব তাহার অধিকারচ্যুত হইয়াছিল—এমন কি, ঈশ্বরের সহিত জীবের একটা শত্রুতা সম্পর্ক—enmity দাঁড়াইয়াছিল। পিতা করুণাময়—তিনি পুত্রগণকে কোলে টানিয়া লইতে চাহেন—নতুবা তাঁহার সোয়াস্তি নাই। জীবের পাপ এমন ভীষণ পাপ যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ তাহা মোচন করিতে পারে না; বেদপন্থী বলিবেন, "ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকং অবিদ্যায়াঃ পারং তারয়তি"—তুমিই আমাদের পিতা, তুমিই আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে তারণ করিতে সমর্থ, অন্যে নহে। খ্রীষ্টান বলিতেছেন,—Man's sin was so great that God only could pay it; therefore one must pay it who is God and Man. Hence the necessity of the Incarnation. The son of God died for man in his own nature and thus wrought out a perfect satisfaction for his sin. Being originally in the absolute form of God, He emptied Himself of the invisible splendours of the Deity and took upon Him the form of a *bondman* and appeared in the likeness of man. জীবের তারণার্থ খ্রীষ্ট স্বয়ং জীব সাজিলেন, যাবতীয় জীবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, গর্ভাবাস, জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, দৈন্য, সমুদয় জীবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি জানিতেন, আমি স্বয়ং ঈশ্বর; I and my Father are one—আমার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য; তথাপি তিনি আপনার সমুদয় ঐশ্বর্য্য হইতে আপনাকে রিক্ত করিয়া ক্ষুদ্র জীব হইলেন। তিনি বড় হইয়াও ছোট হইলেন; তিনি মুক্ত পুরুষ হইয়াও বদ্ধ জীব—bondman সাজিলেন। এই বদ্ধ জীব বিশেষণটা আপনারা মনে রাখুন। ক্ষুদ্র জীব সাজিয়া তিনি দীন দরিদ্রের মধ্যে জন্মিলেন। তাঁহার গৃহ ছিল না, তাঁহার উপজীবিকা ছিল না; তাঁহার স্বজনেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল; তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন; রাজপুরুষেরা তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিল; ইতর জনে তাঁহার অঙ্গে থুৎকার দিল; তাঁহার শিষ্য তাঁহাকে ধরাইয়া দিল; অপর শিষ্যেরা অন্তিম কালে তাঁহাকে ত্যাগ করিল;—অবশেষে দুই চোরের মাঝে ক্রুসে চাপিয়া মরণযাতনা ভোগ করিতে করিতে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইতর মানবের মত দারুণ যাতনা ও দারুণতর অপমান সহিয়া এই যে মরণ, ইহাই হইল খ্রীষ্টের আত্মদানরূপ মহাযজ্ঞ। তিনি পূর্ণ জীবধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন; জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমুদয় মানবের তিনি প্রতিভূ ছিলেন; অতএব সমস্ত মানবজাতির নিষ্ক্রয়রূপে তিনি আপনাকে নরপশুরূপে এই পুরুষযজ্ঞে আহুতি দিলেন। এ যজ্ঞে তিনিই পশু; মেষের মত তিনি যজ্ঞভূমিতে যথার্থ আনীত হইয়াছিলেন। তিনি আপনাকে Lamb of Godরূপে—ঈশ্বরের উদ্দিষ্ট মেষরূপে পরিচিত করিয়াছিলেন; বহু স্থলে তাঁহাকে মেষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। জেহোবার উদ্দেশে মেষ দেওয়া হইত; তিনি সেই মেষপশুরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি যজ্ঞীয় পশু। তিনি আপনাকে আপনি আহুতি দিয়াছিলেন—অন্য যাজকের প্রয়োজন হয় নাই। অতএব তিনি একাধারে ঋত্বিক্ এবং পশু,—Priest এবং Victim. সমস্ত মানব তাঁহার যজমান; তিনি তাঁহাদের ঋত্বিক্ সাজিয়া আপনাকে পশুতে পরিণত করিয়া আত্মাহুতি দিলেন। এই আত্মাহুতি কাহার উদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিলেন? তাঁহার পিতার উদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিলেন—যে পিতা-ঈশ্বরের সহিত তিনি ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। মৃত্যুর পরে তিনি উত্থিত হইয়াছিলেন; মৃত্যু তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই; মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া তিনি তৃতীয় দিনে সমাধি হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। পিতা-ঈশ্বরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মানবের সেই পুরোহিত মানব-যজমানের পক্ষ হইতে সেই আহুতি পিতার নিকট অদ্যাপি অর্পণ করিতেছেন—চিরকাল অর্পণ করিবেন। এই আহুতি দ্বারা জীবের পাপ মোচন হইল;—ঈশ্বরের ও জীবের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তাহা দূর হইল—জীব পুনরায় পিতার নিকট পুত্ররূপে গৃহীত হইল। উভয়ের মধ্যে atonement হইল; এই atonement অর্থে at-one-ment অর্থাৎ making at one. খ্রীষ্টানে বলিবেন, ইহা reconciliation; জীবেশ্বরের সন্ধি স্থাপন; বেদপন্থী বলিবেন, ইহা কেবল সন্ধি স্থাপন নহে, ইহা একাত্মতা স্থাপন। যজমান ইহাতে দেবতা হইল; জীব শিব হইল। মনে রাখিবেন, এই যজ্ঞ দ্বারাই জীবের সহিত শিবের মিলন ঘটিল। এ যজ্ঞের ঋত্বিক্ স্বয়ং ঈশ্বর, আহুতির দ্রব্য স্বয়ং ঈশ্বর, এবং উদ্দিষ্ট দেবতাও স্বয়ং ঈশ্বর। প্রকৃতই ইহা ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্—ব্রহ্ম স্বয়ং ব্রহ্মাগ্নিতে ব্রহ্মরূপ হব্যকে ব্রহ্মের উদ্দেশে অর্পণ করিলেন।

বাইবেলের বর্ণনামতে মৃত্যুর তৃতীয় দিনে খ্রীষ্ট সমাধি হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন; লোকে দেখিয়াছিল, তাঁহার সমাধি শূন্য; কোন কোন ভক্তকে তিনি এই অবসরে সশরীরে দেখাও দিয়াছিলেন। তার পরে তিনি তিরোধান করেন—স্বর্গে আরোহণ করেন। এই ঘটনার নাম Resurrection বা পুনর্জন্মলাভ। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে এই ঘটনা টিকে না—এই ঘটনার পক্ষে যে সকল প্রমাণ দেওয়া হয়, কোন ঐতিহাসিক তাহাতে তুষ্ট হইবেন না; কিন্তু খ্রীষ্টীয় সমাজ ইহাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া আছে—এই ঘটনাকে অমূলক বলিলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূল উৎপাটিত হয়। এই ঘটনাতে প্রতিপন্ন হইল যে, খ্রীষ্ট মৃত্যুঞ্জয়। যে মৃত্যু জীবের পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল, সেই মৃত্যুকে তিনি জয় করিলেন; যিনি অমর, তিনি ত অমর রহিলেন; মরণধর্ম্মী জীবকেও তিনি অমরতা দান করিলেন। ঈশ্বরে যে অমরতা স্বভাবতঃ বিদ্যমান, ইতর জীবও তাহাতে অধিকার পাইল। এই অমরতার প্রাপ্তি খ্রীষ্টানের salvation বা মুক্তি। এতদ্দ্বারা জীব ঈশ্বরের সমীপস্থ হইল। আমাদের ভাষায় সালোক্য বা সামীপ্য লাভ ঘটিল। ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য লাভ বা একবারে ঈশ্বরত্বলাভ খ্রীষ্টানের পক্ষে হয়ত বাঞ্ছনীয় নহে;—আমাদের দেশে ভক্তিপথের পথিকেরাও যেমন সাযুজ্য চাহেন না, কতকটা সেইরূপ। অমরতাপ্রার্থী খ্রীষ্টানেরা স্বর্গে বা ঈশ্বরের সমীপে যাইতে চান,—একবারে সশরীরে স্বর্গে যাইতে চান। কোনরূপ সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বনে স্বর্গে যাইয়া তাঁহাদের তৃপ্তি হয় না। মর্ত্ত্যভূমির জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়া বিদেহমুক্তিতে তাঁহাদের পোষায় না—তাঁহারা একবারে কলার নেকটাই সমেত সশরীরে ঈশ্বরের সালোক্য বা সামীপ্য প্রার্থনা করেন। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার কথা আমাদের পৌরাণিক আখ্যায়িকামধ্যেও আছে—যযাতি, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতির সশরীরে স্বর্গগমন চেষ্টার কথা আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। যুধিষ্ঠির প্রায় নির্ব্বিঘ্নে সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন। বেদপন্থীর এই স্বর্গ কিন্তু নিকৃষ্ট লোক; ইহা ব্রহ্মলোক নহে। বেদের ভাষায় ইহা দেবগণের প্রিয় ধাম; যিনি মোক্ষার্থী, তিনি ইহা প্রার্থনা করেন না। যুধিষ্ঠির সশরীরে এই স্বর্গে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও একবার নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। জীবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে জীবধর্ম্ম পরিহার সম্ভবপর নহে। যীশুখ্রীষ্টও ক্রুসে মরণের পরে এবং সমাধি হইতে উত্থানের পূর্ব্বে একবার

অধোভুবনে বা নরকে গিয়াছিলেন—Athanasian Creed ইহা স্পষ্টবাক্যে মানিয়া লইয়াছেন। সত্যই তিনি নরক দর্শনে গিয়াছিলেন—নতুবা তাঁহার জীবত্ব পরিপূর্ণ হইত না। ক্ষুদ্র জীবকে যাহা কিছু সহিতে হয়, ঈশ্বরও জীব সাজিয়া সে সমস্তই সহিয়াছিলেন।

খ্রীষ্ট দেবতাটি কে, এখনও তাহা বুঝিতে বাকী আছে কি? খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে খ্রীষ্টের যে সকল বিশেষণ আরোপ করা হয়, আমি যথাশক্তি তাহা এ দেশের ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিলাম—অনুবাদ দেখিয়া আপনারা হয়ত চমকিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলে খ্রীষ্টানের ও বেদপন্থীর ভাষায় অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখিলেন। ফলে আমি স্পষ্টভাবে আপনাদিগকে বলিতে চাহি, আমাদের শাস্ত্রে যাঁহাকে জীব বলা হয়, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে তিনিই খ্রীষ্ট। খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক। আমাদের দেশে এই সম্পর্ক বুঝাইতে গিয়া যেমন অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানা বাদ প্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, খ্রীষ্টীয় সমাজেও সেই সম্পর্ক বুঝিতে গিয়া সেইরূপ নানা বাদ প্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল—কয়েক বৎসর ধরিয়া সমস্ত খ্রীষ্টীয় সমাজ সেই বাদ প্রতিবাদের আলোড়নে কম্পিত হইয়াছিল। আপনারা দেখিলেন, খ্রীষ্টীয় সমাজ শেষ পর্য্যন্ত যে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহা একবারে বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ না হইলেও অদ্বয়বাদকে ঘেঁষিয়া চলিয়াছে। খ্রীষ্টান মানিয়া লইয়াছেন, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা—তিনি সঙ্কল্প মাত্রে সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন—God said Let there be light, and there was light ইত্যাদি। বেদান্তেও 'স ঐক্ষত,' 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদি বাক্য সৃষ্টিপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। পঞ্চদশী এই সকল আলোচনা করিয়া বলিতেছেন,—"সঙ্কল্পেনাসৃজৎ লোকান্"—সঙ্কল্প দ্বারাই তিনি লোকসকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাইবেলে বলে, He made man after his own image—আমরাও বলি, ঈশ্বরই জীব হইয়াছেন; উভয়ের সম্পর্ক বিম্ব-প্রতিবিম্বের সম্পর্কের মত। Image শব্দের বাঙ্গালাই প্রতিবিম্ব। খ্রীষ্ট এক দিকে Son of God হইয়াও স্বয়ং true God, very God, perfect God বা মহেশ্বর বা পরমেশ্বর; অন্য দিকে তেমনই তিনি Son of Man হইয়াও perfect Man, sinless Man বা পুরুষোত্তম। উভয়েই অনাদি নিত্য, উভয়েই সর্ব্বেশ্বর, উভয়েরই ঈশ্বরত্ব পূর্ণ। খ্রীষ্ট ও ঈশ্বর দুই ভিন্ন পুরুষ হইলেও এবং উভয়ে সমানভাবে ঈশ্বর হইলেও ঈশ্বর এক বই দুই নহে।

There is but one God, but not two Gods. খ্রীষ্টে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব একাধারে মিশিয়া রহিয়াছে, খ্রীষ্ট একাকী পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ জীব। অদ্বয়বাদ আর কাহাকে বলে? খ্রীষ্টীয় সমাজে নানা বাদ প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়াছি। Arius বলিলেন, খ্রীষ্ট যখন পুত্র, তখন তিনি পিতার পরে জন্মিয়াছেন; তিনি অনাদি নিত্য হইতে পারেন না। Apollonarius বলিলেন, খ্রীষ্ট একাকী এক জন পুরুষ; তিনি হয় পুরাপুরি ঈশ্বর, না হয় পুরাপুরি জীব; একা তিনি উভয় হইবেন কিরূপে? বৃহদারণ্যকে তিনি উত্তর পাইতে পারিতেন—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং"; উনিও পূর্ণ, ইনিও পূর্ণ; "পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে"—পূর্ণ হইতেই পূর্ণ বাহির হইয়া থাকে—"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"—পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাহির হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও পূর্ণ। Nestorius বলিলেন, খ্রীষ্ট যখন ঈশ্বর, অপিচ খ্রীষ্ট যখন জীব, তখন তিনি এক জন পুরুষ নহেন; এক খ্রীষ্টের মধ্যে দুই জন পুরুষ বিদ্যমান। Eutychius বলেন, খ্রীষ্ট এক পুরুষ; তিনি হয় ঈশ্বর, নয় জীব; একাধারে উভয় হইতে পারেন না। খ্রীষ্টীয় সমাজ পরিশেষে এ-সকল মতই ত্যাগ করিল; বলিল,—না, খ্রীষ্ট একই পুরুষ; তিনি যুগপৎ ঈশ্বর এবং জীব। যিনি ঈশ্বর, তিনিই জীব—জীবেশ্বরে কোন ভেদ নাই। অদ্বয়বাদ আর কাহাকে বলিব? ইহার পর যখন খ্রীষ্ট নিজমুখে বলেন, আমি আর আমার পিতা অভিন্ন;—I and my Father are one.—তখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনিই তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া গেল, ইহা কিরূপে অস্বীকার করিব?

এই যে ঈশ্বর, যিনি অনাদি, নিত্য, কালাতীত; যিনি চিরমুক্ত, তিনি বদ্ধ হইয়াছিলেন, bondman সাজিয়াছিলেন; তিনি বস্তুতঃ ভূমা হইয়াও ক্ষুদ্র হইয়াছিলেন; আপনাকে দেশ কালে পরিচ্ছিন্ন করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়াছিলেন; তিনি নরদেহ ধারণ করিয়া দুঃখ তাপের অধীন হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই নরদেহেও, সেই বদ্ধ অবস্থাতেও তাঁহার ঈশ্বরত্বের অণু মাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। খ্রীষ্টান বলেন, Though he humbled Himself, He never for one moment ceased to be God. আমরাও বলি, জীব চিরমুক্ত, তাঁহার বন্ধন একটা অভিনয় মাত্র।

আপনারা ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবগণের চতুর্ব্যূহবাদের কথা শুনিয়াছেন। এই ভাগবত মত খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা লাভ

করিয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহাভারতে এই মতের সবিশেষ উল্লেখ আছে; মহাভারতের ঐ অংশ খ্রীষ্টজন্মের পরে মহাভারতমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এ কথাটা আর জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই। এই ভাগবত মতের নাম চতুর্ব্যূহবাদ; রামানুজ স্বামী ইহাকে চাতুরাত্ম্য উপাসনা বলিয়াছেন। ইহা খ্রীষ্টসমাজের Trinity বা ত্রিব্যূহবাদের অনুরূপ। উভয়ের মধ্যে এতটা সাদৃশ্য যে, কে কাহার নিকট ধার করিয়াছে, এই গণ্ডগোলের কথা আপনা হইতেই উঠে। খ্রীষ্টানেরা বলেন, একই ঈশ্বর ত্রিধা অবস্থিত; তিন পুরুষরূপে অবস্থিত—Father, Son এবং Holy Ghost; অথচ এই তিন পুরুষই সমানভাবে ঈশ্বর। তিন জনই সমানভাবে নিত্য ও শাশ্বত, co-eternal, অথচ পিতা পুত্রকে জন্ম দিয়াছেন, beget করিয়াছেন, এবং Holy Ghost পিতা পুত্র উভয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন—proceed করিয়াছেন। তর্ক উঠে যে, পুত্র যদি পিতা হইতে জন্ম লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উভয়ে নিত্য—co-eternal হন কিরূপে? উভয়ে সমান ও পূর্ণ ঈশ্বর হন কিরূপে? Arius ও তাঁহার অনুগামীরা এই তর্ক তুলিয়া পুত্রকে পিতা হইতে খাট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—বহু বৎসর ধরিয়া তজ্জন্য বিবাদ চলিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত তিন পুরুষেরই একাত্মতা ও পূর্ণতা স্বীকৃত হইয়াছিল। পাঞ্চরাত্র-মতে এক বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম চতুর্ধা অবস্থিত—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ, এই চারি ব্যূহরূপে অবস্থান করেন; ইহারা সকলেই পূর্ণ ঈশ্বর, পরব্রহ্মস্বরূপ; অথচ এক জন অন্য জন হইতে জাত। কে কোথা হইতে জন্মিলেন, তৎসম্বন্ধে বলা যাইতেছে—"পরমকারণাৎ পরব্রহ্মভূতাদ্‌-বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনো জায়তে, তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞোঽহঙ্কারো জায়তে।" পরব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ জন্মেন, এই সঙ্কর্ষণই জীব। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন জন্মেন, এই প্রদ্যুম্ন মন; প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ জন্মেন, এই অনিরুদ্ধ অহঙ্কার। প্রদ্যুম্ন আর অনিরুদ্ধকে লইয়া আমাদের এখন প্রয়োজন নাই; বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের সম্পর্ক দেখুন। বাসুদেব পরব্রহ্ম, কিন্তু সঙ্কর্ষণ জীব। পরব্রহ্ম হইতে জীব জন্মিয়াছেন, অথচ সেই জীবও পরব্রহ্ম। রামানুজ স্পষ্ট বলিতেছেন, "সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধানামপি পরব্রহ্মভাবে সতি," এক জন জীব, অন্য জন ঈশ্বর, জীব ঈশ্বর হইতে জন্মিতেছেন, অথচ উভয়েই ব্রহ্ম, এই একটা মস্ত

হেঁয়ালি। খ্রীষ্টানদের মধ্যে যে হেঁয়ালি উঠিয়াছিল, ঠিক সেই হেঁয়ালি। বেদবাক্য এই হেঁয়ালিকে আরও ঘনাইয়া তুলিয়াছেন। বেদশাস্ত্র ও বেদের অনুগত অন্যান্য শাস্ত্রও একবাক্যে জীবকে নিত্য ও জন্মরহিত বলিয়া মানিয়াছেন। জীবের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ," "অজো নিত্যঃ শশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ," "স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অজঃ অজরোঽমৃতোঽভয়ঃ ব্রহ্ম" ইত্যাদি। বেদপন্থী রামানুজ এই সকল বেদবাক্য ও স্মৃতিবাক্য অবজ্ঞা করিতে পারেন না। তিনি বলিতেছেন, জীবরূপী সঙ্কর্ষণ যে নিত্য, সে বিষয়ে সংশয় করি না। বাসুদেব হইতে উৎপন্ন হইলেও তিনি নিত্য। তবে পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণের যে উৎপত্তি বলা আছে, তাহা অচেতন ভুতোৎপত্তির মত উৎপত্তি নহে। "বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্মৈব আশ্রিতবৎসলং স্বাশ্রিত-সমাশ্রয়ণীয়ত্বায় স্বেচ্ছয়া চতুর্দ্ধা অবতিষ্ঠতে," বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম আশ্রিতবৎসল, তিনি আশ্রিতগণের আশ্রয় হইবার জন্যই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। রামানুজ পরম বৈষ্ণব ; পাঞ্চরাত্র মতকে রক্ষা করিতে তিনি বাধ্য। শঙ্করাচার্য্যের ভাগবত মতে অনুরাগ ছিল না। তিনি এক নিঃশ্বাসে ভাগবত মত উড়াইয়া দিলেন—বলিলেন, বেদমতে জীব নিত্য, এবং পাঞ্চরাত্র মতে জীব বাসুদেব হইতে উৎপন্ন ; যাহার উৎপত্তি আছে, সে নিত্য হইতে পারে না ; অতএব পাঞ্চরাত্র মত বেদবিরুদ্ধ ও অগ্রাহ্য। এরায়সও খ্রীষ্ট সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য।

আপনারা দেখিলেন, খ্রীষ্টানদেব জনকেশ্বরের স্থলে বাসুদেবকে ও তনয়েশ্বরের স্থলে সঙ্কর্ষণকে বসাইলে পাঞ্চরাত্র মতে আর খ্রীষ্টীয় মতে কোন ভেদ থাকে না। জনকেশ্বর বাসুদেব স্বয়ং ; তিনি আশ্রিতবৎসল ; আশ্রিতগণের উদ্ধারের জন্যই তিনি পুত্র খ্রীষ্টকে জন্ম দিয়াছেন। তনয়েশ্বর সঙ্কর্ষণ স্বয়ং, তিনি বাসুদেব হইতে জাত, অথচ বাসুদেব হইতে অভিন্ন। তিনি আবার Son of man, Perfect Man, অতএব তিনিই জীব। জীব ঈশ্বর হইতে জাত, অথচ ঈশ্বরের মতই নিত্য।

খ্রীষ্টের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। খ্রীষ্টানের ভাষা দিলাম, অপিচ বেদপন্থীর ভাষায় তাহার অনুবাদ দিলাম। কিন্তু খ্রীষ্টের একটা বড় বিশেষণ সম্পর্কে এখনও কিছু বলি নাই। যাবতীয় খ্রীষ্টান একবাক্যে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলিতেছেন—তিনি Word of God. Church of England ইহা মানিয়া লইয়াছেন—the Son which is the Word of the

Father. এই বিশেষণটির মূল জোহন-প্রচারিত সুসমাচারমধ্যে পাওয়া যায়—সেটা আপনারা জানেন; তথাপি আমি আপনাদিগকে শুনাইতে চাহি। "In the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word was God. All things were made by him; and without Him was not any thing made that was made." পুনরায় বলা হইতেছে, And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.

মিশনারিদের বাঙ্গালা অনুবাদ "আদিতে বাক্য ছিলেন" লইয়া আপনারা বিদ্রূপ করিয়াছেন; আমি Wordএর বাঙ্গালায় বাক্য বলিব না—আমি বলিব বাক্ বা শব্দ। অমনই আপনারা স্তব্ধ হইবেন। জোহনের অনুবাদে যদি আমি বলি—"অগ্রে বাক্ ছিলেন অথবা শব্দ ছিলেন," অমনই আপনারা চমকিয়া উঠিবেন এবং বলিবেন, এই খ্রীষ্ট তবে ত আর কেহ নহেন; ইনি আমাদের চিরপরিচিত সেই শব্দব্রহ্ম বা বাগ্‌দেবতা। বেদপন্থীর সাহিত্য শব্দব্রহ্মের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে পরিপূর্ণ; জোহনের বাক্যে আপনাদের কোনরূপ হেঁয়ালি ঠেকিবে না। শব্দই ব্রহ্ম; শব্দ হইতে লোকসকল সৃষ্ট হইয়াছে; শব্দই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জীবরূপে উৎপন্ন হইয়াছে; এ সকল আমাদের পক্ষে অত্যন্ত পরিচিত কথা। জোহনের সুসমাচার গ্রীক ভাষায় লিখিত হইয়াছিল; ইংরেজী Word শব্দের লাটিন অনুবাদ Verbum; গ্রীক অনুবাদ Logos. স্বর্গে তিনি অমূর্ত্ত Logos; মর্ত্ত্যভূমিতে তিনি বিগ্রহবান্ Logos—Word made flesh.—শব্দব্রহ্ম স্থূল দেহ লইয়া অবতীর্ণ। এই Logos নামের পিছনে পাঁচ শত বৎসরের ইতিহাস আছে। খ্রীষ্টের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক পণ্ডিত হীরাক্লিটসে এই Logosকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে যাহাকে ঋত বলে, ঐ পণ্ডিত Logos শব্দে তাহাই বুঝিতেন; এই ঋত দ্বারা জগৎ ধৃত আছে, উত্তম্ভিত আছে; ইহাই সেই Cosmic Law, যদ্দ্বারা নক্ষত্রগণ স্বস্থানে ধৃত আছে, গ্রহগণ আপন আপন পথে চলিতেছে। বেদপন্থীর ভাষায় ইহা ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন। বৌদ্ধেরাও ইহাকে ধর্ম্ম নাম দিয়া ত্রিরত্নের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। ইহার অন্য নাম Psyche বা Principle of Life. ষ্টোয়িকদের হাতে ইনি Reasonএ বা প্রজ্ঞায়

পরিণত হইয়াছেন, যে প্রজ্ঞা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। বৌদ্ধেরাও কালে ধর্ম্মকে প্রজ্ঞায় বা প্রজ্ঞাপারমিতায় পরিণত করিয়াছেন। আলেকজান্দ্রিয়া সহরে ইহুদীদের জমকাল আড্ডা ছিল। সেখানকার ইহুদীরা গ্রীকভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহুদীদের একটা পুরাতন সৃষ্টিতত্ত্ব ছিল; ঈশ্বর বলিলেন,—জগৎ হউক, আর জগৎ হইল; এখানে ঈশ্বরের বাক্য হইতে বা শব্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি। এই শব্দকে তাহারা Memra বলিত। আলেক্জান্দ্রিয়া নগরে ইহুদীদের এই Memra গ্রীকদের Logosএর সহিত মিশিয়া গেলেন। এই তত্ত্বের পরিণতি হইল, Philo নামক গ্রীকভাবাপন্ন ইহুদীর হাতে। শব্দের সহিত ধর্ম্ম এবং প্রজ্ঞা মিশিয়া গেলেন; এবং জগতের কর্ত্তৃত্ব ও বিধাতৃত্ব এই প্রজ্ঞাত্মা শব্দব্রহ্মে আরোপিত হইল। Philoর ভাষায় এই শব্দ ঈশ্বর হইতে জাত, সকলের অগ্রে জাত; তিনি আদি জীব, ইতর জীব তাঁহার প্রতিবিম্বরূপী; তিনি ঈশ্বরের সহিত অবস্থান করিয়া জগদ্বিধান নিয়মিত করেন; প্রজ্ঞা তাঁহার জননী; কোথাও বা তিনি স্বয়ং প্রজ্ঞাত্মা। সুসমাচার-প্রচারক জোহন যে আলেক্জান্দ্রিয়া হইতে তাঁহার শব্দব্রহ্মকে পাইয়াছিলেন, তাহাতে কেহ সংশয় করেন না। Philo খ্রীষ্টান ছিলেন না। জোহন খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিতে বসিয়াছেন, তিনি খ্রীষ্টকেই শব্দব্রহ্মরূপে প্রচার করিলেন, এবং শব্দব্রহ্মের সমুদয় বিশেষণই খ্রীষ্টে আরোপ করিলেন। ঈশ্বর যে নরদেহ ধারণ করিতে পারেন, কোন জীব যে ঈশ্বর হইতে পারেন, ইহুদীর পক্ষে ইহা কল্পনাতীত। জোহন কিন্তু খ্রীষ্টের সেই দিক্‌টাতেই জোর দিলেন। তিনি অগ্রে শব্দরূপে বিদ্যমান ছিলেন; তিনি নরদেহ গ্রহণ করিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র করিলেন; জীবের মঙ্গলের জন্য আপনি জীবলীলার অভিনয় করিলেন; খ্রীষ্টের ক্রুসে আরোহণটাই যজ্ঞ বা আত্মোৎসর্গ, সে বিষয়ে ত সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ; কেন না, ঈশ্বরের জীবত্ব গ্রহণই আত্মোৎসর্গের ব্যাপার। যে বড়, সে ছোট হইলেই তাহার আত্মোৎসর্গ হইল। খ্রীষ্টের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ। ইহা কোন আকস্মিক ঘটনা নহে; সৃষ্টির আদি হইতেই ইহার ব্যবস্থা হইয়া আছে। খ্রীষ্টানের ভাষায় the Incarnation and the Passion, as the Sacrament of the divine Self-sacrifice, were parts of the counsels of God from all eternity. The Logos before Incarnation was man. ঈশ্বর

যে জীব হইবেন, যিনি নিত্যমুক্ত, তিনি যে বদ্ধ সাজিবেন, ইহা জগৎ-সৃষ্টিরই নিগূঢ় তাৎপর্য্য ; ইহাই তাঁহার জগতে আত্মপ্রকাশের নিগূঢ় রহস্য।

আমি তুলনামূলক আলোচনায় বসিয়াছি—পুঁথি ঘাঁটিয়া খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের যে তাৎপর্য্যটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। খ্রীষ্টানের মতে খ্রীষ্ট শব্দস্বরূপ, বাক্যস্বরূপ,—বেদপন্থীর ভাষায় তিনি শব্দব্রহ্ম, এবং বাগ্‌দেবতা। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, আবার তিনি স্বয়ং জীব। তিনি একাধারে ঈশ্বর এবং জীব। মুক্ত জীবে এবং ঈশ্বরে কোন ভিন্ন ভেদ নাই। তিনি চিরমুক্ত হইয়া বদ্ধ হইয়াছিলেন—তাঁহার সৃষ্ট জগতে আত্মপ্রকাশার্থ বদ্ধ জীবরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইহাতে তাঁহাকে খাট হইতে হইয়াছিল—যিনি মহৎ, তাঁহাকে ক্ষুদ্র হইতে হইয়াছিল, জগতের সম্মুখে আপন ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের জন্যই তিনি এইরূপে ক্ষুদ্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। আমাদের ভাষায় ইহা লীলাকৈবল্য। ইহা জাগতিক বিধান—জগৎসৃষ্টিই এই আত্মবিসর্জ্জন। যে সকল ইতর ক্ষুদ্র জীব বর্ত্তমান,—ঈশ্বরের প্রতিবিম্বরূপ ধরিয়া যে সকল ক্ষুদ্র জীব বর্ত্তমান—যাহারা স্বকৃত পাপের ভরে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে রহিয়াছে, যাহারা সেই পাপের ভরে মৃত্যুর বশ হইয়াছে, অমরতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে,—সেই অগ্রজন্মা আদি জীব এই আত্মবিসর্জ্জন দ্বারা তাহাদের পাপ নাশ করিয়া দিলেন। তাহাদিগকে দেখাইলেন যে, পাপ চিরস্থায়ী নহে ; খ্রীষ্টকে জানিলেই, খ্রীষ্টের স্বরূপ জানিলেই জীবেশ্বরের প্রকৃত সম্বন্ধ জানিলেই এই পাপ থাকিবে না, তখন সে অমরতার অধিকার পাইবে—তাহার স্বেচ্ছাকৃত বন্ধন খুলিয়া যাইবে। যে নিত্যমুক্ত হইয়াও আপনাকে বদ্ধ মনে করে, বদ্ধবৎ আচরণ করে, সে মুক্ত হইবে। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে যে দারুণ ব্যবধান সে স্বেচ্ছাক্রমে কল্পনা করিয়াছে, সে ব্যবধান লুপ্ত হইবে। এজন্য খ্রীষ্টের সহিত তাহার একাত্মতা স্থাপন আবশ্যক। খ্রীষ্ট মানবলীলায় ক্রসের উপরে মরণাভিনয় করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন ; তিনি মরণাভিনয় দ্বারা মরণজয়ের অভিনয় দেখাইয়াছেন ; মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। সেই যজ্ঞকে অঙ্গীকার করিয়া সেই যজ্ঞের হবিঃশেষ তাহাকে ভক্ষণ করিতে হইবে। এই যজ্ঞটা, এই মৃত্যু স্বীকারটা একটা অভিনয়, মিথ্যাজ্ঞান-উৎপন্ন অভিনয়, উহা অবিদ্যা। বিদ্যা বা সত্যজ্ঞান লাভে মৃত্যু থাকে না। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"—অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুর পারে আসিয়া

বিদ্যার দ্বারা অমরতা পাওয়া যায়। এ খ্রীষ্ট যে যজ্ঞীয় পশু সাজিয়াছিলেন, সেই পশুর রক্ত মাংস ভক্ষণ করিয়া খ্রীষ্টের সহিত একাত্মতা—communion প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই জন্য প্রত্যেক খ্রীষ্টান খ্রীষ্টের রক্ত মাংস খায়—eucharist খায়, খ্রীষ্টের অন্তিম আদেশ অনুসারে উৎসৃষ্ট রুটি ও মদ লইয়া খ্রীষ্ট-সম্পাদিত যজ্ঞের পুনরভিনয় করে—যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ দ্বারা খ্রীষ্টকে আত্মসাৎ করে, আত্মস্থ করে, খ্রীষ্টের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হয়। বদ্ধ জীব এইরূপে মুক্তির পথে প্রেরিত হয়।

খ্রীষ্টানেরা আপনাদের দেবতা খায়, এই কথা লইয়া আমি আরম্ভ করিয়াছি। ক্রুসে আরোহণের পূর্ব্বরাত্রিতে তিনি শিষ্যগণের সহিত ভোজনে বসিয়াছিলেন। টেবিলের উপর রুটি ও মদ ছিল। খ্রীষ্ট বলিলেন, এই রুটি আমার মাংস, এই মদ আমার রক্ত; ইহা তোমরা খাও। এই বলিয়া তিনি শিষ্যদিগকে ঐ রুটি ও মদ বাঁটিয়া দিলেন। পরদিনে তিনি পশুরূপে ঈশ্বরের নিকট আপনাকে আহুতি দিলেন। পূর্ব্বদিনের ঐ অনুষ্ঠান পরদিনের যজ্ঞাভিনয়ের rehearsal স্বরূপ। খ্রীষ্টানেরা তদবধি ঐ রুটি ও মদ খাইয়া আসিতেছে; উহাতে সেই যজ্ঞীয় পশুর রক্ত মাংস খাওয়াই হইতেছে—ঐ যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণই হইতেছে। এই ভক্ষ্য দ্রব্যের নাম eucharist; eucharist ভক্ষণ খ্রীষ্টের সহিত একাত্মতা প্রাপ্তির অনুকূল, বদ্ধ জীবের মুক্তি প্রাপ্তির অনুকূল, পশুর পক্ষে পশুপতিত্ব প্রাপ্তির অনুকূল। মনে রাখিবেন, খ্রীষ্ট যজ্ঞে পশু হইয়াছিলেন; ক্রুসটাই সেই যজ্ঞের যূপ। যিনি স্বয়ং পশুপতি, তিনি পশু সাজিয়া যূপবদ্ধ হইয়াছিলেন, পশুরূপে মৃত্যু স্বীকার করিয়া মৃত্যু জয় করিয়াছিলেন; ইতর পশুরা সেই পশুমাংস ভক্ষণ করিয়া পশুপতির সহিত একাত্মতা লাভ করিবে; এইরূপে পশুজন্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। আশ্চর্য্য যে, আমাদের দেশেও পাশুপত দর্শনের ভাষায়, শৈবসম্প্রদায়ের ও শাক্তসম্প্রদায়ের ভাষায় পশু শব্দের অর্থ বদ্ধ জীব, পশুপতি অর্থে ঈশ্বর; পশুজন্ম হইতে অব্যাহতির নাম মুক্তি। খ্রীষ্টানের eucharist সম্বন্ধে খ্রীষ্টানের কথা না শুনিলে আপনারা হয়ত মানিয়াও মানিবেন না; তাই পুনরায় একজন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রবিদের কথা শুনাইতেছি—"The sacrifice of Christ was once offered on the cross"—ক্রুসে আত্মদান করিয়াই খ্রীষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন—ইতিহাসে এই এক মাত্র যজ্ঞানুষ্ঠান। "It is offered, to the Father, and to the son,

and in it our Lord offers and is offered and receives the sacrifice." ঐ যজ্ঞের দেবতা জনকেশ্বর, ঐ যজ্ঞের দেবতা তনয়েশ্বর ; ঐ খ্রীষ্ট স্বয়ং একাধারে ঋত্বিক্, পশু এবং দেবতা। তিনি আপনাকেই আপনার উদ্দেশে আহুতি দিয়াছেন ; আবার বলি, ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। "On the Cross and in the Eucharist there is one Sacrifice"—ক্রসের উপর যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, eucharist ভক্ষণকালেও সেই যজ্ঞেরই পুনরভিনয় হয়—উভয়ই এক যজ্ঞ। "He unites man with Himself and this means of reconciliation is in the Eucharist." এই হবিঃশেষ ভক্ষণেই মানব খ্রীষ্টের সহিত মিলিত হয়—জীবেশ্বরে একতা সম্পাদিত হয়। "It is not a symbol of a sacrifice, but really a sacrifice, in which that which is offered in sacrifice is the body of Christ, and in which the moment of sacrifice is when the bread and wine are changed into His body and blood."—মন্ত্রোচ্চারণের পর যখন রুটি ও মদ খ্রীষ্টের রক্ত মাংসে পরিণত হয়, ঠিক তখনই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। "He has not ceased from His priestly office and exercises an abiding ministry in our behalf as a priest for ever."—ক্রসের উপর মহাযজ্ঞে তিনি নিজেই ঋত্বিক্ ছিলেন।—কিন্তু সেই ঋত্বিক্‌কর্ম্ম হইতে এখনও তিনি নিবৃত্ত হন নাই ; তাঁহার পিতার নিকট সেই যজ্ঞ আজিও অর্পিত হইতেছে, এবং চিরদিন অর্পিত হইবে।

আজিকার মত আমি এইখানেই ছুটি লইতে চাহি। আজ বৈদিক যজ্ঞের কথা একেবারে তুলি নাই বলিলেই হয়। আজ এক ঘণ্টা ধরিয়া খ্রীষ্টযজ্ঞের কথা বলিলাম। আমি আর এক বার মাত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব। বেদপন্থী সমাজে বৈদিক যজ্ঞের তাৎপর্য্য কি, তাহা আমি দেখাইতে চাহি। আমি দেখাইতে চাহি, এই যজ্ঞানুষ্ঠান লইয়া বেদপন্থী সমাজ ধৃত ছিল ; ধৃত ছিল কেন, এখনও ধৃত আছে। এখন শ্রৌত যজ্ঞগুলির নাম পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়াছি ; যজ্ঞের দেবতাদের নাম পর্য্যন্ত আমরা ভুলিয়াছি ; অথচ আমাদের প্রায় অজ্ঞাতসারে আমরা যজ্ঞকে ধরিয়া আছি ; যজ্ঞের তাৎপর্য্য ঠিক রাখিয়া অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে যজ্ঞকে ধরিয়া আছি। আমাদের সামাজিক জীবন, আমাদের গার্হস্থ্য জীবন, আমাদের লোকস্থিতি ও

লোকযাত্রা আজি পর্যান্ত যজ্ঞের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই তাৎপর্য্যটি ধরিতে না পারিলে বেদপন্থী সমাজে লোকস্থিতির গূঢ় রহস্যটি বুঝা যাইবে না। ভারতবর্ষে বেদপন্থী সমাজের আগাগোড়া যে একটি অবচ্ছেদহীন সূত্র ধরিয়া দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত আছে, সেটি ধরিতে পারিবেন না। যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ ব্যাপারটি একটা symbol; সমাজমধ্যে আমাদিগকে কোন্ পথে চলিতে হইবে, কোন্ উদ্দেশ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে, তাহারই symbol. ঐ হবিঃশেষ ভক্ষণ অনুষ্ঠানটির গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে কয়েক বারে নানা যজ্ঞের বিবরণ আপনাদিগকে সংক্ষেপে শুনাইয়াছি—অগ্নিহোত্র, ইষ্টিযাগ, পশুযাগ, সোমযাগ প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ শুনাইয়াছি। অগ্নিহোত্র যজ্ঞে দুধের আহুতি দিয়া সেই দুধ কিঞ্চিৎ খাইতে হয়; পূর্ণমাসাদি ইষ্টিযাগে পুরোডাশ আহুতি দিয়া তাহার অবশেষ খাইতে হয়। পশুযজ্ঞে পশুমাংস আহুতি দিয়া তাহার কিয়দংশ খাইতে হয়; সোমযজ্ঞে সোমরস দেবতাকে দিয়া সোমরসের অবশেষ পান করিতে হয়। ইহাই হবিঃশেষ ভক্ষণ। যজমান একা খাইলে চলে না; ঋত্বিক্ ও যজমানে একযোগে খাইয়া থাকেন। এই একযোগে খাওয়াই communion. ইহা একটা সামাজিক অনুষ্ঠান। গৃহস্থের সহিত এক দিকে সমাজের, অন্য দিকে দেবতার মিলন সাধনই এই communion. এই অনুষ্ঠান বিনা যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না—ধরিতে গেলে এই অনুষ্ঠানেই যজ্ঞের সমাপ্তি। এই সঙ্কীর্ণ অনুষ্ঠানের একটা ব্যাপক তাৎপর্য্য আছে। সামাজিক জীবনে সেই তাৎপর্য্য প্রয়োগ করিতে হইবে। সেই তাৎপর্য্য অনুসারে সমাজমধ্যে জীবনযাত্রা চালাইতে হইবে। আমি দেখাইলাম, এই অনুষ্ঠান এক হিসাবে মানব-সাধারণ অনুষ্ঠান। নানা জাতির মধ্যেই ইহার অনুরূপ অনুষ্ঠান আছে। খ্রীষ্টীয় সমাজে এই হবিঃশেষ-ভক্ষণ অনুষ্ঠান eucharist ভক্ষণ। খ্রীষ্টানদের মতে এই eucharist ভক্ষণের তাৎপর্য্য আমি যথাশক্তি আজ বুঝাইয়াছি। বেদপন্থী সমাজে এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝিতে আগামী বারে চেষ্টা করিব।

খ্রীষ্টীয় সমাজ যে তাৎপর্য্য দিয়াছেন, এবং তাহার বহু পুরাতন বেদপন্থী সমাজ যে তাৎপর্য্য দিয়াছেন, তাহার তুলনা করিলে আপনারা বিস্মিত হইবেন। এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট ধার করিয়াছেন কি না, সে প্রসঙ্গ আমি আদৌ তুলিব না। আমি সাদৃশ্য দেখাইয়াই নিরস্ত হইব। তার পরে আমি দেখাইতে চাহি, এই অনুষ্ঠান অথবা এই অনুষ্ঠানের এই তাৎপর্য্য

আমাদের বেদপন্থী সমাজ কিরূপ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমি যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এই ব্যাপকতা বুঝিবার সুবিধা হইবে। সুবিধা হইবে বলিয়াই আমি খ্রীষ্টযজ্ঞ সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিলাম ; নতুবা খ্রীষ্টযজ্ঞের কথা উত্থাপনের কোন প্রয়োজনই ছিল না। খ্রীষ্টানের নিকট যাহার নাম eucharist, বেদপন্থীর নিকট তাহার নাম ইড়া। এই ইড়ার অর্থ বুঝিতে হইবে। আপনারা জানিবেন, সঙ্কীর্ণ অর্থে এই ইড়া-ভক্ষণে যজ্ঞের সমাপ্তি ; কিন্তু ব্যাপক অর্থে এই ইড়া-ভক্ষণে মানবজীবনের সম্পূর্ণতা। মানবের গার্হস্থ্য জীবন এবং সামাজিক জীবন, এমন কি, মানবের আধিভৌতিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবন, মানবের পার্থিব জীবন এবং অপার্থিব পারমার্থিক জীবন—এক কথায় সমগ্র মানব-জীবনের এই ইড়া-ভক্ষণেই সম্পূর্ণতা এবং সমাপ্তি এবং সার্থকতা। ইহাই আমাদের religion এবং ইহাই আমাদের ethics. এই ইড়া-ভক্ষণের অর্থ এবং তৎপরতা বুঝাইয়া বেদপন্থী সমাজের ভিত্তি কোথায়, বেদপন্থী সমাজের গাঁথনী কোথায়, তাহা আমি বাহির করিতে চাহি। আর একবার মাত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমি এই পরম তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য আমার ক্ষুদ্র শক্তি অর্পণ করিব। আপনাদিগকে তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ করিতেছি।

পুরুষ-যজ্ঞ

খ্রীষ্ট-যজ্ঞের কথা বলিয়াছি। খ্রীষ্ট-যজ্ঞে হবিঃশেষের নাম ইউকেরিষ্ট। যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণের পর রুটিতে ও মদে দেবতার আবির্ভাব হয়; উহা খাইলে দেবতাকেই খাওয়া হয়; দেবতাকে আত্মস্থ করিলে দেবতার সহিত ঐক্য ঘটে। ঐ দেবতাটি কে? ইনি স্বয়ং ঈশ্বর—ঈশ্বরের অগ্রে জাত পুত্র হইলেও অনাদি নিত্য পরিপূর্ণ ঈশ্বর; তিনি শব্দব্রহ্ম বা বাগ্‌দেবতারূপে অনাদি, নিত্য ও পরিপূর্ণ ঈশ্বর। তিনি আবার পরিপূর্ণ জীব—যিনি ঈশ্বর, তিনিই জীব। তিনিই যজমানরূপে যজ্ঞ করিয়াছেন; এবং সেই যজ্ঞে আপনাকেই পশুরূপে—মেষরূপে কল্পনা করিয়া জীবহিতার্থ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ইউকেরিষ্ট সেই পশুর রক্ত ও মাংস—উহা খাইলে ইতর যজমান দেবতার সহিত একত্ব পায়, মৃত্যু জয় করিয়া অমরতা পায়। কেন না, খ্রীষ্টের রক্ত ও মাংস অমৃতস্বরূপ।

এখন বেদপন্থীর যজ্ঞে আসিব। বেদপন্থীর যজ্ঞে পশুমাংস দেওয়া হইত—ইষ্টিযাগে মাংসের বদলে পুরোডাশ বা রুটি দেওয়া হইত। সোমযজ্ঞে সোমরস দেওয়া হইত; যজ্ঞবিশেষে সোমরসের বদলে সুরা বা আর কিছু দেওয়া হইত। এখন প্রশ্ন যে, এই সকল দ্রব্যে কোন দেবতার অধিষ্ঠান হয় কি না? সে কোন্ দেবতা? সে দেবতার সহিত যজমানের সম্পর্ক কি?

প্রথমে সোমরসের আলোচনা করিব। ইহুদীর দেবতা জেহোবা রক্তপ্রিয় ছিলেন। খ্রীষ্ট মেষস্বরূপ হইয়াছিলেন; মেষরূপেই আপনার রক্ত দিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানেরা যে সুরা পান করেন, ঐ সুরা খ্রীষ্টের রক্ত। সোমরস কিন্তু দেবতার রক্ত হইতে পারে না; কেন না, বেদপন্থীর দেবতা রক্তপ্রিয় ছিলেন না। পশুযজ্ঞে পশুর রক্ত রাক্ষসের প্রাপ্য; রাক্ষসদের জন্য উহা বেদির পার্শ্বে উৎকরে ফেলিয়া দেওয়া হইত। সোমরস রক্ত নহে, তবে উহা অমৃতস্বরূপ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সোমযজ্ঞ প্রসঙ্গে ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। সোমপানে অমরতা পাওয়া যায়। আগেই বলিয়াছি, সোমরসের পরিবর্তে ক্ষত্রিয়েরা বট, অশ্বত্থ প্রভৃতির রস পান করিতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে সোমপানই হইত। কেন না, এই যে বটবৃক্ষ, ইহা পরোক্ষভাবে সোমেরই

স্বরূপ। ক্ষত্রিয় "সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই সেই বটের রস পান করিতেন। রাজসূয় যজ্ঞে অভিষেকের পর ক্ষত্রিয় রাজা সুরা পান করিতেন। রাজার হাতে সুরাপূর্ণ কাংস্যপাত্র দেওয়া হইত। "স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোমধারয়া, ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ" এই মন্ত্রে রাজার হাতে দেওয়া হইত। এই মন্ত্রে সুরাকেই সোম বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে। বলা হইতেছে—অহে সোম, ইন্দ্রের পানের জন্য তোমার অভিষব হয়; তোমার স্বাদু ও মাদক ধারার দ্বারা এই রাজাকে পূত কর। পানান্তে রাজা সেই সুরাশেষ তাঁহার কোন বন্ধুর হাতে দিতেন। এক পাত্রে সুরাপানে উভয়ের মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইত। সৌত্রামণি যজ্ঞে সুরা দেওয়া হইত; বিধিমতে সন্ধান বা fermentation দ্বারা সুরা প্রস্তুত করিয়া সেই সুরা দেওয়া হইত। এই যজ্ঞের দেবতা ছিলেন অশ্বিদ্বয়, সরস্বতী, আর ইন্দ্র সুত্রামা। অধ্বর্য্যু আগুনে দুধ ঢালিয়া দিতেন; তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা সেই সঙ্গে সুরা ঢালিয়া দিতেন। সুরাহুতির মন্ত্র—"যস্তে রসঃ সম্ভৃত ওষধীষু, সোমস্য শুষ্মঃ সুরয়া সুতস্য, তেন জিন্ব যজমানং মদেন, সরস্বত্যশ্বিনাবিন্দ্রমগ্নিং স্বাহা"—এই মন্ত্রে সুরাকে স্পষ্টতই সোমস্থানীয় বলা হইয়াছে। কালক্রমে এই যজ্ঞেও সুরাপান অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। আপস্তম্ব ব্যবস্থা দিয়াছেন, সুরার পরিবর্ত্তে দুধ চলিবে। দ্বিজাতিসমাজে—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাপান নিষিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বৃহস্পতির পুত্র কচের হত্যাপরাধে শুক্রের অভিশাপে সুরা অপেয় হইয়াছে, এই পৌরাণিক কাহিনী প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তন্ত্রশাস্ত্র কিন্তু সুরাকে গ্রহণ করিলেন। মন্ত্র দ্বারা সুরাকে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত করিয়া সুরাপানের ব্যবস্থা করিলেন। সুরা-শোধনের জন্য একেবারে ব্রহ্মের দোহাই দেওয়া হইল। "বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি, তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতু"—এইরূপে দোহাই দিলে আর কি ব্রহ্মহত্যার পাপ থাকিতে পারে? তান্ত্রিকদিগের সুরাশোধনের আসল মন্ত্রটি বৈদিক মন্ত্র—"হংসঃ শুচিষৎ বসুরন্তরীক্ষসৎ, হোতা বেদিষৎ অতিথির্দুরোণসৎ, নৃষৎ বরসৎ ঋতসৎ ব্যোমসৎ, অব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্।" এই মন্ত্রটি ঋগ্‌বেদসংহিতার চতুর্থ মণ্ডলে আছে। ইহার ঋষি স্বয়ং বামদেব, যিনি মাতৃগর্ভে থাকিতেই ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছিলেন। এই ঋকের নাম হংসবতী ঋক্‌। যাবতীয় ঋক্‌মন্ত্রমধ্যে গায়ত্রী মন্ত্রের পরেই

বোধ হয় এই মন্ত্রটির প্রসিদ্ধি। তান্ত্রিক হংসমন্ত্রের বা অজপামন্ত্রের মূল এই হংসবতী ঋক্। ঐ মন্ত্রে যে হংসের কথা উল্লেখ হইতেছে, সেই হংস এক কালে হয়ত আদিত্য ছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে প্রায় একবাক্যে তিনি ব্রহ্ম অর্থে গৃহীত হইয়াছেন। পুরাণে এই হংস ব্রহ্মার বাহন হইয়াছেন। মন্ত্রটির অর্থ,—এই যে হংস বা ব্রহ্ম, তিনি দ্যুলোকে আছেন, অন্তরিক্ষে বাস করিতেছেন, হোতারূপে বেদিতে উপবিষ্ট আছেন, অতিথিরূপে গৃহে গৃহে বিচরণ করিতেছেন, মনুষ্যের মধ্যে আছেন, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, সেখানে রহিয়াছেন, ব্যোমে অবস্থিত আছেন, সত্যে অবস্থিত আছেন, অপ্‌সমূহ হইতে ইহার জন্ম, গো অর্থাৎ বাক্য হইতে ইহার জন্ম, অদ্রি হইতে ইহার জন্ম, সত্য হইতে ইহার জন্ম, ইনি সত্যস্বরূপ। তান্ত্রিকেরা এই মন্ত্রে সুরাশোধন করিলে সুরা একেবারে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। খ্রীষ্টান যাজক মন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিবা মাত্র সুরা যেমন খ্রীষ্টের রক্তে পরিণত হয়, সেইরূপ। সোম যেমন অমরতা দেন, সুরাও তেমনই অমরতা দিয়া থাকেন।

এখন আপনারা খ্রীষ্টপন্থীর সুরাপানের সহিত বেদপন্থীর সোমপানের, আর তন্ত্রপন্থীর সুরাপানের সম্পর্ক বুঝিতে পারিলেন। খ্রীষ্টানেরা যেমন দেবতাকে আত্মসাৎ করেন, বেদপন্থীও সেইরূপ করেন। এই যে সোম, ইনি স্বয়ং এক জন দেবতা, দেবগণের মধ্যে ইনি এক জন রাজা। সোম-যজ্ঞে সোম ক্রয় করিয়া যখন যজ্ঞশালায় আনা হয়, তখন তাঁহাকে রাজোচিত সম্মানই দেওয়া হয়। যজ্ঞশালায় তাঁহাকে রাজার মত উচ্চ আসনে রাখা হয়। রাজা অতিথিরূপে যজ্ঞশালায় আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য আতিথ্য ইষ্টিযজ্ঞ করা হয়। সোমযাগের পূর্ব্ব-দিনে যখন তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া মহাবেদির উপরে হবির্ধান মণ্ডপে রাখা হয়, তখন তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য পশুযাগ করিতে হয়। সোমযজ্ঞে এই দেবগণের রাজা সোমকেই ভক্ষণ করা হইতেছে। স্পষ্টই বলা হইতেছে—"সোমং রাজানম্ ইহ ভক্ষয়ামি।" এখন আপনারা খ্রীষ্টানের দেবতা ভক্ষণের সহিত বেদপন্থীর দেবতা ভক্ষণের তুলনা করুন।

খ্রীষ্টানের খ্রীষ্ট ত অনাদি নিত্য বাগ্‌দেবতা। সোমের সহিত বাগ্‌দেবতার সম্পর্ক কি? আমার সঙ্গে আসুন; চমকাইবেন না। আমাদের বেদ-সাহিত্যে সোমের সহিত বাগ্‌দেবতার সম্পর্ক পূর্ব্বেই আপনাদিগকে

জানাইয়াছি। বাগ্‌দেবতাই সোম আনিয়াছিলেন। ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যে নানা স্থানে সোম আহরণের আখ্যায়িকা আছে। কোন পাখী দেবতাদের জন্য সোম আনিয়াছিল; সেই পাখীকে শ্যেন বা সুপর্ণ বলা হইতেছে। কোথাও বলা হইতেছে, শ্যেনের পুত্র সুপর্ণ দূরদেশ হইতে সোম আনিয়াছেন। কোথাও বলা হইতেছে, তাক্ষ্য পক্ষী সোম আনিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, গায়ত্রী সুপর্ণী হইয়া সোম আনিয়াছেন; তার্ক্ষ্য অগ্রণী হইয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছিলেন। বেদের এই তার্ক্ষ্য পুরাণের গরুড়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্যত্র বলা হইতেছে, দেবতারা সোম আনিবার জন্য বেদের ছন্দগুলিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই ছন্দেরাই পাখী বা সুপর্ণ সাজিয়া সোম আনিতে উপরে উঠিলেন। প্রথমে জগতী উঠিলেন, পরে ত্রিষ্টুপ্‌ উঠিলেন; তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে শেষে গায়ত্রী উঠিলেন। সোম গন্ধর্ব্বদের মধ্যে ছিলেন। কৃশানু নামক গন্ধর্ব্বের বাণে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও গায়ত্রীরূপা সুপর্ণী দুই পা এবং মুখ দিয়া সোমকে চাপিয়া ধরিয়া লইয়া আসিলেন। অতএব যে পাখী সোম আনিলেন, তিনি গায়ত্রী; আর কেহ নহেন। এই গায়ত্রী কিন্তু ছন্দের মধ্যে প্রধান; তিনি ছন্দসাং মাতা। এই অর্থে তিনি বেদবাক্যের প্রধান, স্বয়ং বাগ্‌দেবতা। সোম ক্রয় উপলক্ষে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, রাজা সোম গন্ধর্ব্বদের নিকট ছিলেন। বাগ্‌দেবী দেবগণকে বলিলেন, গন্ধর্ব্বেরা স্ত্রীপ্রিয়, আমাকেই তোমরা পাঠাও, আমি গন্ধর্ব্বদিগকে ভুলাইয়া সোম আনিব। এই বলিয়া বাগ্‌দেবী নগ্না কুমারীরূপে সোম আনিতে গেলেন এবং গন্ধর্ব্বদিগকে বঞ্চনা করিয়া সোম লইয়া আসিলেন। এই ঘটনার অভিনয়ে সোমাযজ্ঞে একটি ছোট গাভী দিয়া সোম ক্রয় করা হইত। সেই গাভীটি বাগ্‌দেবীর স্থানীয়। মনে রাখিবেন, 'গো' শব্দের একটা অর্থ 'বাক্য' বা 'বাক্‌'। সোমাহরণ সম্বন্ধে কতকগুলি উপাখ্যান পাইলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা এই কয়েকটি উপাখ্যানকে মিলাইয়া দিয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা বলিতেছেন, কদ্রু এবং সুপর্ণী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতেন। বেদের এই সুপর্ণী পুরাণে বিনতা হইয়াছেন। এই বিনতারই পুত্র গরুড়। কদ্রুর জয় হইয়াছিল। সুপর্ণী তাঁহার দাসী হইয়াছিলেন। কদ্রু বলিলেন, তৃতীয় দ্যুলোকে যে সোম আছেন, তাঁহাকে যদি আনিতে পার, তাহা হইলে তোমার দাসীত্ব মোচন করিব। বেদের ছন্দগুলি এই সুপর্ণীর সন্তান। মায়ের আদেশে ছন্দেরা সোম আনিতে

উঠিল ; জগতী পারিল না, ত্রিষ্টুপ্‌ও পারিল না, কনিষ্ঠা গায়ত্রী সমর্থ হইলেন। দুই পা এবং মুখ দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সোমকে নামাইয়া আনিলেন। পথিমধ্যে গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু সোমকে আটকাইলেন। তখন দেবতারা বাগ্‌দেবীকে পাঠাইলেন। বাগ্‌দেবী গন্ধর্ব্বদিগকে ভুলাইয়া সোম আনিলেন। গায়ত্রী এই সময় রোহিণী বা রক্তবর্ণ মৃগীর রূপ ধরিয়াছিলেন ; তদনুসারে রক্তবর্ণের গাভী দিয়া সোম ক্রয় করা হয়। এখানে বাগ্‌দেবী ও গায়ত্রীকে ভিন্ন করা হইয়াছে ; কিন্তু উভয়েই সোম আনয়ন কর্ম্মে লিপ্ত আছেন। শেষ পর্য্যন্ত বাগ্‌দেবীই সোম আনেন। এখন বাগ্‌দেবীর সহিত সোমের সম্পর্ক আপনারা বুঝিতে পারিলেন। অমৃতস্বরূপ সোমকে পূর্ব্বে কেহ জানিত না ; স্বয়ং বাগ্‌দেবতা তাঁহাকে দেবগণের জন্য আনয়ন করেন। তাহার পর মনুষ্যেরাও তাঁহাকে পাইয়াছে। খ্রীষ্টানদিগের খ্রীষ্ট স্বয়ং বাগ্‌দেবতা—Word become flesh. তিনিও স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে অমৃত আনিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপন্থী যজমান যেমন সুরা পান করিয়া অমরতা লাভ করেন, বেদপন্থী যজমানও সেইরূপ সোম পান করিয়া অমরতা পান। সোমপানকালে তিনি বলেন, "বাগ্‌দেবী জুষাণা সোমস্য তৃপ্যতু"—বাগ্‌দেবী প্রীত হইয়া সোমরসে তৃপ্ত হউন ; আবার বলেন,—"দেবকৃতস্য এনসোঽবযজনমসি, মনুষ্যকৃতস্য এনসোঽবযজনমসি, পিতৃকৃতস্য এনসোঽবযজনমসি"—দেবকৃত পাপের তুমি বিনাশ কর, মনুষ্যকৃত পাপের বিনাশ কর, পিতৃকৃত পাপের বিনাশ কর। পুনরায় বলেন,—"অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম, অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্, কিং নূনমস্মান্ কৃণবৎ অরাতিঃ, কিমু ধূর্ত্তিরমৃত মর্ত্ত্যস্য"—আমরা সোম পান করিয়া অমর হইয়াছি, জ্যোতি পাইয়াছি ও দেবগণকে জানিয়াছি ; আমরা অমর ; মর্ত্ত্য পাপে আর আমাদের কি করিবে ? যিনি সোম পান করেন, স্বয়ং বাগ্‌দেবী আসিয়া তাঁহাকে অমরতা দেন। তিনিই ত সোমকে প্রকাশ করিয়াছেন।

সোমের কথা বলিলাম। এবার পুরোডাশের কথা বলিব। পুরোডাশ আহুতির পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা খাইতে হয়। কয়েক খণ্ডে ভাগ করিয়া খাইতে হয়। এক এক ভাগ এক এক ঋত্বিকের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই সকল ভাগের নাম ইষ্টিযাগ প্রসঙ্গে বলিয়াছি। পুরোডাশের একটা খণ্ড থাকে, যাহা যজমান ও ঋত্বিকেরা একযোগে খাইয়া থাকেন। এই ভাগের নাম ইড়া। আমি আপনাদিগকে জানাইয়া রাখিয়াছি,

ইড়া ভক্ষণই যজ্ঞের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান। এই ইড়া ভক্ষণেই যজ্ঞ সমাপ্তি লাভ করে, যজ্ঞ সার্থক হয়। খ্রীষ্টানের ইউকেরিষ্ট ভক্ষণে নানাবিধ খুঁটিনাটি আছে। দুইটি উল্লেখযোগ্য। প্রথম breaking of the bread; খ্রীষ্ট শিষ্যদিগের সহিত ভোজনকালে রুটি ভাঙ্গিয়াছিলেন ও সেই ভাঙ্গা রুটির টুকরা শিষ্যদিগকে বাঁটিয়া দিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, This is My body which is broken for many for the remission of sins. তদনুসারে খ্রীষ্টান যাজক বেদির উপরে রুটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন ও পরে যজমানদিগকে বাঁটিয়া দেন। খ্রীষ্টানেরা এই রুটি ভাঙ্গার গভীর তাৎপর্য্য দিয়াছেন। জীবহিতের জন্য খ্রীষ্ট আপনাকে ভাঙ্গিয়া খণ্ডিত করিয়া বিলাইয়া দিয়াছেন—the breaking of the bread is a symbol of the suffering and death of the Lord on the cross. পুনশ্চ—Broken and divided is the Lamb of God, who is broken and not severed. দ্বিতীয় অনুষ্ঠান, Consecration and Invocation—ভক্ষণের পূর্ব্বে মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে আহ্বান করিয়া রুটি উৎসর্গ করিতে হয়। সম্প্রদায়-ভেদে মন্ত্রের ভিন্নতা আছে; কেহ বা বাগ্‌দেবতারূপী খ্রীষ্টকে আহ্বান করেন, কেহ বা Holy Ghostকে আহ্বান করেন; কেহ বা Trinityকে আহ্বান করেন। অনেকের মতে এই আহ্বানমন্ত্র পাঠের পরই দেবতার আবির্ভাব হয় ও রুটি মাংসে পরিণত হয়। খ্রীষ্টপন্থীর যজ্ঞে যেরূপ, বেদপন্থীর যজ্ঞেও ঠিক তদনুরূপ অনুষ্ঠান আছে। প্রধান দেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ আহুতি দিয়া যাহা অবশেষ থাকে, তাহাকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করিতে হয়। এক খণ্ডের নাম প্রাশিত্র, উহা ব্রহ্মা ভক্ষণ করেন। আর এক খণ্ড অগ্নীৎ ভক্ষণ করেন; ইহার নাম ষড়বত্ত। আর এক খণ্ড চারি অংশে ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু ও অগ্নীৎ, এই চারি জনে ভক্ষণ করেন; ইহার নাম চতুর্দ্ধাকৃত ভাগ। আর দুই খণ্ড ব্রহ্মা ও যজমান যজ্ঞসমাপ্তির পর ভক্ষণ করেন, উহা ব্রহ্মার ভাগ ও যজমানের ভাগ। এইরূপে পুরোডাশকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করার নাম পুরোডাশের অবদান; ইংরাজীতে fraction বা breaking. এই সকল ভাগ ব্যতীত যজমান ও ঋত্বিক্, সকলের একযোগে ভক্ষণের জন্য একটা ভাগ থাকে, ইহার নাম ইড়া। ইহা রাখিবার জন্য একখানি কাঠের পাত্র থাকে; উহার নাম ইড়াপাত্র। পূর্ণমাস যাগে অধ্বর্য্যু পুরোডাশের খণ্ড কাটিয়া লইয়া সেই ইড়াপাত্রে রাখেন।

প্রথমে ইড়াপাত্রে একটু ঘি ঢালা হয় ; সেই ঘিয়ের উপরে দুইখানা পুরোডাশ হইতে দুই খণ্ড কাটিয়া রাখা হয় ; আবার একটু ঘি ঢালা হয়। এইরূপে নীচে উপরে ঘি-মাখান পুরোডাশখণ্ডের নাম ইড়া। অধ্বর্য্যু হোতার আঙুলে ঘি মাখাইয়া দেন। হোতা সেই আঙুল দিয়া আপনার ঠোঁট মাজেন। অধ্বর্য্যু হোতাকে ইড়াপাত্র ধরিতে দেন। যজমান ও ঋত্বিকেরা সকলে ইড়াপাত্র স্পর্শ করিয়া থাকেন। হোতা কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করেন। এই মন্ত্রে ইড়া-দেবতাকে সমীপে আহ্বান করা হয়; মন্ত্র পাঠের নাম ইড়ার উপহ্বান ; ইংরেজীতে Invocation. এই আহ্বানের পর ইড়াদেবী পুরোডাশখণ্ডে আবির্ভাব করেন। তৎপরে আর কয়েকটি অনুষ্ঠানের পর সকলে মিলিয়া ইড়া ভক্ষণ করেন। ইড়া-দেবতাকেই ভক্ষণ করা হয়। খ্রীষ্টপন্থীর ও বেদপন্থীর অনুষ্ঠানে কতটা মিল, তাহা দেখিলেন।

এই ইড়া-দেবতাটি কে ? ইউকেরিষ্টের খ্রীষ্ট স্বয়ং যজমান, স্বয়ং পশু, স্বয়ং দেবতা—বাগ্‌দেবতা—Word of God. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, "যজমানো বৈ পুরোডাশঃ"—এই যে পুরোডাশ, ইহা যজমানই ; পুরোডাশ আহুতির দ্বারা যজমান আপনাকেই আহুতি দিতেছেন। আপনার নিষ্ক্রয়রূপে তিনি পশু দিতে পারিতেন ; কেন না, "পশবঃ পুরুষঃ," পশুগণই পুরুষস্বরূপ অর্থাৎ মনুষ্যস্থানীয়। এখানে যজমান সেই পশুর পরিবর্ত্তে পুরোডাশখণ্ড দিতেছেন। অতএব সেই পুরোডাশখণ্ড বা ইড়া পশুস্থানীয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণই আবার বলিতেছেন,—"পশবো বৈ ইড়া"—এই যে ইড়া, ইহা ত পশু। খ্রীষ্টানের রুটি যেমন খ্রীষ্টরূপী পশুর মাংস, এই ইড়াও সেইরূপ যজমানরূপ পশুর মাংস। ভাল কথা, হোতা তবে মন্ত্রের দ্বারা কোন্ দেবতাকে আহ্বান করিলেন ? এই দেবতারও নাম ইড়াদেবী। আপনারা এই ইড়াদেবীকে চেনেন কি ? আশ্চর্য্য হইবেন, ইড়াদেবী স্বয়ং বাগ্‌দেবতা ; সমস্ত বৈদিক সাহিত্য এক কালে ইহার মাহাত্ম্য-বর্ণনায় পূর্ণ ছিল। যে মন্ত্রে ইড়াকে আহ্বান করা হয়, সেই মন্ত্রটি শুনুন ; হোতা ইড়াদেবীকে ডাকিতেছেন ঃ—

"সুরূপবর্ষবর্ণে এহি"—অয়ি দেবি, তোমার রূপ সুন্দর, বর্ণ সুন্দর, বর্ষণ-শক্তি (বা উৎপাদন-শক্তি) সুন্দর ; তুমি এখানে এস। "ইমান্ ভদ্রান্ দুর্য্যান্ অভ্যেহি"—আমাদের এই সজ্জিত যজ্ঞগৃহের অভিমুখে এস। "মামনুব্রতা নি উ শীর্ষাণি মৃড্ঢ়্ম্"—আমরা যে ব্রত লইয়াছি, তাহার প্রতি অনুকূল হইয়া আমাদের শীর্ষে কল্যাণ অর্পণ কর। "ইড়ে এহি, অদিতে

এহি, সরস্বতি এহি”—ইড়া তুমি এস, অদিতি তুমি এস, সরস্বতি তুমি এস। “রন্তিরসি, রমতিরসি, সূনরীরসি,”—তুমি আনন্দময়ী, তুমি আনন্দদায়িনী, তুমি সুন্দরী। “জুষ্টে জুষ্টিং তে অশীয়”—তোমার পূজা করি, তুমি আমাদিগকে প্রীতি দাও। “উপহুতে উপহবং তে অশীয়”—তোমাকে আমরা ডাকিতেছি, তুমি আমাদিগকে ডাকিয়া লও। “সত্যা আশীরস্য যজ্ঞস্য ভূয়াৎ”—এই যজ্ঞে যে আশিস্ চাহিতেছি, তাহা সত্য হউক। “অরেড়তা মনসা তচ্ছকেয়ম্”—স্থিরমনে তাহার শক্তি লাভ করিব। “যজ্ঞো দিবং রোহতু, যজ্ঞো দিবং গচ্ছতু, যো দেবযানঃ পন্থা তেন যজ্ঞো দেবান্ অপ্যেতু”—এই যজ্ঞ দিব্য লোকে আরোহণ করুক, দিব্য লোকে গমন করুক, দেবগণের যে পথ আছে, সেই পথে দেবগণের সমীপে চলুক। “অস্মান্ ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু”—যিনি বলবিধাতা ইন্দ্র, তিনি আমাদের বল বিধান করুন। “অস্মান্ রায় উত যজ্ঞাঃ সচন্ত”—আমরা শ্রেষ্ঠ ধন লাভ করি, আমরা যজ্ঞ লাভ করি। “অস্মাসু সন্তু আশিষঃ, সা নঃ প্রিয়া সুপ্রতূর্ত্তিঃ মঘোনী”—অয়ি ইড়ে, তুমি আমাদের প্রিয়া, তুমি বিঘ্নঘাতিনী, তুমি কল্যাণদায়িনী ; আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হউক।

এই মন্ত্র হইতে ইড়াদেবীর মাহাত্ম্যের কিছু পরিচয় পাইলেন। ইঁহার আর দুইটি নাম পাইলেন—অদিতি এবং সরস্বতী। দেখা যাক, ইড়াদেবীর আর কোন নাম আছে কি না? ঋগ্বেদসংহিতামধ্যে ইড়ার নাম ছড়াইয়া আছে। পশুযাগ প্রসঙ্গে আপ্রীমন্ত্রের কথা বলিয়াছি। প্রধান যাগের পূর্ব্বে প্রযাজ যাগ করিতে হয়। পশুযাগে এগার জন দেবতার উদ্দেশে এগারটি প্রযাজ যাগ হয়। প্রত্যেক প্রযাজের পূর্ব্বে হোতা যে মন্ত্র পড়েন, তাহার নাম আপ্রীমন্ত্র। দেবতা এগার জন, কাজেই মন্ত্রও এগারটি। ঋগ্বেদের যে সূক্তমধ্যে এইরূপ এগারটি আপ্রীমন্ত্র থাকে, তাহার নাম আপ্রী-সূক্ত। ঋক্‌সংহিতার মধ্যে দশটি আপ্রীসূক্ত আছে। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি প্রভৃতি বড় বড় ঋষি আপ্রীসূক্ত প্রচার করিতেছেন ; আপ্রীসূক্তের প্রচারে যেন বিশেষ বাহাদুরি আছে। যে যজমান যে ঋষির গোত্রে উৎপন্ন, তিনি তাঁহারই আপ্রীসূক্ত ব্যবহার করিতেন, অন্যের করিতেন না। ইহাতেও আপ্রীসূক্তের মাহাত্ম্য বোঝা যায়। আপ্রীসূক্তের এগার মন্ত্রের এগার দেবতা। অষ্টম দেবতার বেলায় কিন্তু তিনটি নাম একযোগে দেখা যায়—ইড়া, ভারতী, সরস্বতী। গোটাকয়েক আপ্রীমন্ত্র শুনুন। “ইড়া সরস্বতী

মহী, ত্রিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ, বর্হিঃ সীদন্তু অস্রিধঃ”—এই মন্ত্রটি মেধাতিথির। “ভারতীড়ে সরস্বতি, যা বঃ সর্ব্বা উপব্রুবে, তা নশ্চোদয়ত শ্রিয়ে”—এইটি অগস্ত্যের। “আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা, ইড়াদেবৈর্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ, সরস্বতি সারস্বতেভিরর্বাক্, তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্তু”—এটি বশিষ্ঠের। এইরূপ দশটি মন্ত্র আছে। প্রত্যেক মন্ত্রেই ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী, এই তিনটি নাম পাইতেছেন। ইঁহাদিগকে “তিস্রো দেব্যঃ” বলা হইতেছে, অথচ ইঁহারা তিনে এক। কেন না, এক একটি মন্ত্র এক এক দেবতারই উদ্দিষ্ট। ইহার মধ্যে ভারতীর এবং সরস্বতীর নাম আজি পর্য্যন্ত আপনাদের সুপরিচিত। এই দুই নামই বাগ্‌দেবীর নাম। ইড়াদেবীকে আপনারা ভুলিয়াছেন, কিন্তু ভারতী ও সরস্বতী যদি বাগ্‌দেবী হন, তাহা হইলে ইড়াও বাগ্‌দেবী। অতি প্রাচীন কালে হয়ত ইঁহারা পৃথক্ দেবতা ছিলেন ; কালে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদে সরস্বতী বহু স্থলে নদীর নাম। এখন সরস্বতী নদী লুপ্ত, কিন্তু এক কালে ইনি বেগবতী ছিলেন। এ কালে যেমন গঙ্গার মাহাত্ম্য, সেকালে সেইরূপ সরস্বতীর মাহাত্ম্য ছিল। ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে সরস্বতীতীরে ব্রহ্মবাদীরা বেদের কর্ম্মকাণ্ড-প্রতিষ্ঠার সহিত বেদপন্থী সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গল্প আছে যে, একদা ঋষিগণ সরস্বতীতীরে সত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। কবষ নামে একটি লোক সেখানে উপস্থিত ছিল ; সে দাসীপুত্র এবং অব্রাহ্মণ। ঋষিরা তাহাকে মরুভূমিতে খেদাইয়া দিলেন। পিপাসার্ত্ত কবষের মুখ হইতে ঋক্‌মন্ত্র বাহির হইতে লাগিল। মন্ত্র শুনিয়া স্বয়ং সরস্বতী মরুভূমিতে স্রোত ফিরাইয়া তাঁহার কাছে আসিলেন এবং কবষের পিপাসা শান্তি করিলেন। তদবধি কবষ ঋষি হইলেন। কবষের মন্ত্রগুলিও সোমযজ্ঞে স্থান পাইল। এই মন্ত্রগুলির নাম অপোনপ্ত্রীয় মন্ত্র। সোমযজ্ঞের দিন প্রত্যূষে যখন ‘একধনা’ নামক জল আনা হয়, তৎপূর্ব্বে হোতা এই মন্ত্রগুলি পাঠ করেন। যে সরস্বতীর এই মাহাত্ম্য, সেই সরস্বতী উত্তর কালে বেদবাক্যের দেবতা বা বাগ্‌দেবতা বলিয়া গৃহীত হইবেন, তাহাতে বিস্ময় নাই। তাহার পর ভারতী। ইনি হয়ত ভরতবংশের কুলদেবতা ছিলেন। এই ভরতবংশের কীর্ত্তিবর্ণনায় আমাদের সাহিত্য পূর্ণ। কালিদাসের প্রসাদে দুষ্মন্তপুত্র সর্ব্বদমন ভরতের নাম কে না জানে ! ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিবেন, ঋষি দীর্ঘতমা দুষ্মন্তপুত্র ভরতকে রাজসূয় যজ্ঞে অভিষেক করিয়াছিলেন।

আরও দেখিবেন, তিনি পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া এক শ ত্রিশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কালিদাসের দিলীপ মহাবল পুত্র রঘুর সাহায্যেও শতক্রতু হইতে পারেন নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, মনুষ্য যেমন হস্ত দ্বারা দ্যুলোক স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ ভরতের কৃত মহাকর্ম্ম পূর্ব্বে বা পরে কেহ করিতে পারেন নাই। এই ভরতবংশের কীর্ত্তিকাহিনী লইয়াই মহাভারত। অধিক কি বলিব, এই ভরতের নাম হইতেই আমাদের ভারতবর্ষ। এই ভরতবংশের কুলদেবতা ভারতী ক্রমে বেদপন্থীর প্রধান দেবতা হইয়াছেন। সরস্বতীর ও ভারতীর পরে ইড়াদেবী। ঋগ্বেদে ইঁহার একটা বিশেষণ মনুষ্বতী বা মানবী। এই বিশেষণটি কিরূপে আসিল, তাহার সন্ধানের জন্য শতপথ ব্রাহ্মণে যাইতে হইবে। শতপথ ব্রাহ্মণের গল্পটি বলিব।

আপনারা বৈবস্বত মনুর নাম জানেন। কালিদাসের ভাষায় ছন্দের মধ্যে যেমন প্রণব, রাজাদের মধ্যে তিনি সেইরূপ আদ্য রাজা ছিলেন। সেই মনু একদিন প্রাতঃকালে হাত-মুখ ধুইতেছিলেন। হাতের কাছে একটি মাছ আসিল। মাছ বলিল, মাছে মাছ খায়, তুমি আমাকে রক্ষা কর, অসময়ে আমি তোমাকে রক্ষা করিব। মনু মাছটিকে তুলিয়া জলের জালায় রাখিলেন। মাছ ক্রমে বড় হইল। জালায় যখন কুলায় না, তখন একটা খালে ফেলিলেন। খালে যখন কুলায় না, তখন সমুদ্রে ফেলিলেন। কিছু কাল পরে পৃথিবীতে জলপ্লাবন ঘটিল। মাছের উপদেশে মনু নৌকার আশ্রয় লইলেন। মাছ নৌকার নিকট ভাসিতেছিল; তাহার শিঙে তিনি নৌকা বাঁধিলেন। মাছ নৌকা টানিয়া উত্তরগিরিতে উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, এই মাছই পুরাণের মৎস্যাবতার। জলপ্রবাহে সমস্ত প্রজা নষ্ট হইল; মনু একা বাঁচিলেন। কালে জল নামিয়া গেলে মনু জলের উপরেই যজ্ঞ করিলেন। যজ্ঞে যাহা আহুতি দিলেন, তাহা হইতেই বৎসরের মধ্যে একটি কন্যা জন্মিল। এই কন্যার নামই ইড়া। মনুকন্যা বলিয়া ইঁহার নাম মনুষ্বতী বা মানবী। ইড়া মনুকে বলিলেন, আমি তোমারই কন্যা, তোমার যজ্ঞেই আমি জন্মিয়াছি। অতঃপর তুমি আমাকেই যজ্ঞে আহুতি দিবে। সেই যজ্ঞ হইতে নূতন প্রজা জন্মিবে। মনু তাঁহাকে যজ্ঞে প্রয়োগ করিলেন। তাঁহা হইতে নূতন প্রজা জন্মিল; মনুর বংশ রক্ষা হইল। এই বংশই মানব বংশ। তদবধি যজ্ঞে ইড়ার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। যজ্ঞে

যে পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হয়, সেই পুরোডাশের অংশই ইড়া। তাহাতে ইড়াদেবী বর্ত্তমান থাকেন; মানবেরা তাহা ভক্ষণ করে। মনুকন্যা ইড়ার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। বেদে তাঁহার নাম ঐড় পুরূরবা। পুরাণের মতে পুরূরবার পিতা বুধ; বুধের পিতা সোম। এই সোম সেই রাজা সোম, যিনি দেবগণের অমৃত। অতএব এই ইড়াদেবী হইতেই সোমবংশের বা চন্দ্রবংশের উৎপত্তি, যে বংশে দুষ্মন্তপুত্র ভরত জন্মিয়াছিলেন। ভরতবংশের প্রতিষ্ঠাত্রী ইড়াদেবী যে সেই বংশের কুলদেবতা ভারতীর সহিত মিলিয়া যাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

ইড়াদেবীর কয়েকটি নাম পাইলেন। ইড়া আহ্বানের মন্ত্রে পাইয়াছেন অদিতি এবং সরস্বতী। আপ্রীমন্ত্রে পাইলেন ভারতী ও সরস্বতী। বেদপন্থী তাঁহার দেবতাকে শত নামে, সহস্র নামে ডাকিয়াও তৃপ্ত হন না। ইড়াদেবীর আর নাম আছে কি? যাস্কের 'নিরুক্ত' খুঁজিয়া দেখুন। এই নিরুক্তখানি বৈদিক ভাষার dictionary। ইহার আরম্ভে নিঘণ্টু মধ্যে অনেকগুলি বৈদিক শব্দের প্রতিশব্দ বা synonym দেওয়া আছে। 'বাক্' শব্দে আসিয়া দেখুন; সাতান্নটি প্রতিশব্দ দেখিবেন। সাতান্নটি লইয়া আমাদের প্রয়োজন নাই। গোটাকতক বাছিয়া লইব। 'বাক্' বা বাক্যের প্রতিশব্দ—শব্দ, স্বর, ঘোষ, বাণী ইত্যাদি। তাহার পরে দেখুন—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী। আপ্রীমন্ত্রে এই তিন নাম একযোগে পাইয়াছেন। তাহার পরে দেখুন—সুপর্ণী; এই সুপর্ণী গায়ত্রী বা বাগ্‌দেবীরূপে সোম আনিয়াছিলেন। অতঃপর ইড়া যে বাগ্‌দেবী, তাহাতে আপনাদের সন্দেহ থাকিল না। তাহার পর কয়েকটি নাম দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। একটি নাম অদিতি। ইড়ার এই নাম আগেই ইড়ার আহ্বানমন্ত্রে পাইয়াছেন, অথচ এই অদিতি এখন দেবগণের মাতা। তাহার পর শচী—ইনি এখন ইন্দ্রপত্নী, বেদে ইনি যজ্ঞক্রতুরূপিণী। তাহার পর স্বাহা— ইনি অগ্নির পত্নী। তাহার পরে দেখুন গৌরী—ইনি এখন মহেশ্বরপত্নী। কেনোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী বহুশোভমানা উমা হৈমবতীকে দেখা যায়। এই উমা হৈমবতী হিমালয়কন্যা পার্ব্বতীতে পরিণত হইয়াছেন, এবং ইহারই নামান্তর গৌরী। নিরুক্তকার গৌরীতে আসিয়া থামেন নাই; আর একটি নাম দিয়াছেন মেনা বা মেনকা; ইনি গৌরীর জননী। সর্ব্বশেষে নাম মহী বা পৃথিবী, গো এবং ধেনু। পৃথিবী যে গাভী, তাহা প্রসিদ্ধ; কালিদাসের

'দুদোহ গাং স যজ্ঞায়,' এবং 'দুদোহ গো-রূপ-ধরামিবোর্ব্বীম্' মনে করুন। বাগ্‌দেবীও যে গাভীরূপিণী, তাহা বহু দিন হইতে স্বীকৃত হইতেছে। চলিত ভাষাতেই গো শব্দে বাক্য বুঝায়। সোমযজ্ঞে একটি গাভী দিয়া সোম কিনিতে হয়, আগেই বলিয়াছি। সেই গাভীটি বাগ্‌দেবী। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—"বাচং ধেনুম্ উপাসীত। তস্যাঃ চত্বারঃ স্তনাঃ, স্বাহাকারো বষট্‌কারো হন্তকারঃ স্বধাকারঃ।"—বাগ্‌দেবতাকে ধেনুরূপে উপাসনা করিবে; তাঁহার চারিটি স্তন—স্বাহাকার, বষট্‌কার, হন্তকার এবং স্বধাকার। স্বাহাকার এবং বষট্‌কার দেবগণের উপজীব্য; হন্তকার মনুষ্যের এবং স্বধাকার পিতৃগণের। প্রাণ তাহার পক্ষে বৃষস্থানীয় এবং মন বৎসস্থানীয়। বাগ্‌দেবতার মূর্ত্তি বলিয়াই গাভী আমাদের ভগবতী হইয়াছেন। স্বয়ং বাক্‌পতি গো-পতি বা গো-পালরূপে গো-গোপ-সংঘাবৃত হইয়া গো-লোক বা বাঙ্‌ময় বিশ্বভুবন জুড়িয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। স্থানান্তরে ইহা আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

আপনারা দেখিলেন, এই বাগ্‌দেবতা সর্ব্বদেবময়ী এবং সর্ব্বময়ী। বেদপন্থী ইহাকে ভুলিতে বা ছাড়িতে পারেন না। আরও উচ্চে উঠিয়া আমাদের শাস্ত্র প্রায় একবাক্যে বলিতেছেন,—'বাগ্‌বৈ ব্রহ্ম'—বাক্‌ই ব্রহ্ম—"The word is God." পশ্চিমের পণ্ডিতেরা এইখানে একটু খটকায় পড়িয়াছেন। উপনিষদে অর্থাৎ বেদান্তমধ্যে ব্রহ্ম শব্দ ঈশ্বরবাচক; বাক্যকে একবারে অনাদি নিত্য ঈশ্বরে পরিণত করা অখ্রীষ্টানের পক্ষেও সম্ভব, ইহা মনে করিতেই বোধ করি খ্রীষ্টান পণ্ডিতদের খটকা লাগে। ঐ পণ্ডিতেরা বলেন, বেদের মন্ত্রমধ্যে—এমন কি, ব্রাহ্মণমধ্যে ব্রহ্ম শব্দে বেদবাক্যই বুঝায়, স্পষ্টরূপে ঈশ্বর বুঝায় না। সুসমাচার-প্রচারক জোহনের এত পূর্ব্বে ব্রহ্ম নামক বাক্যকে ব্রহ্মরূপী ঈশ্বরে পরিণত করা হইয়াছে, ইহা মনে করিতে তাঁহাদের সঙ্কোচ হয়। ফলে কিন্তু বাক্‌ই যে ঈশ্বর, শব্দই যে ব্রহ্ম, ইহা বেদপন্থীর পক্ষে অত্যন্ত পরিচিত এবং অত্যন্ত পুরাতন কথা। হীরাক্লিটসের বহু শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বেদপন্থীর নিকট ইহা অত্যন্ত পরিচিত কথা। বেদপন্থী সমাজের সমস্ত ইতিহাসটা ব্যাপিয়া, অন্ততঃ ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডল সঙ্কলনের পূর্ব্ব হইতে আজি পর্য্যন্ত এই তত্ত্ব বেদপন্থীর অধ্যাত্ম জীবনকে নিয়মিত করিয়া আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রধান দেবতা প্রজাপতি; কিন্তু মন্ত্রসংহিতার মধ্যে প্রজাপতির

তেমন প্রতিষ্ঠা দেখা যায় না। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলে চারি বার মাত্র প্রজাপতির নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদসংহিতায় কিন্তু আর একটি দেবতাকে পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়, তাঁহার নাম বৃহস্পতি—নামান্তর ব্রহ্মণস্পতি—ব্রহ্মের অর্থাৎ বেদবাক্যের পতি। উত্তর কালে ইঁহার নাম হইয়াছে বাচস্পতি। তাহাতে বুঝাইল যে, বাক্ বা বেদবাক্যই ব্রহ্ম। ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলে একটি সূক্ত আছে, তাহাতে বৃহস্পতি স্বয়ং বলিতেছেন, যেন অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিতেছেন, এই যে বাক্, যাহা সৃষ্ট পদার্থের নামকরণে প্রথমে আবির্ভূত হয়, তাহা কোন্ গুহার মধ্যে নিহিত ছিল! কোন্ প্রেমের বলে সেই গুহা হইতে সে বহির্গত হইল? "উত ত্বঃ পশ্যন্ অদদর্শ বাচম্, উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্"—লোকে ইহাকে দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না। "উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে, জায়েব পত্যে উশতী সুবাসাঃ"—পত্নী যেমন শোভন বাস পরিয়া পতির নিকট যায়, ইনিও তেমনই প্রেমভরে নিজের দেহ প্রকাশ করেন। বৃহস্পতি স্বয়ং বাকের পতি, তাঁহার পক্ষে এইরূপ ভাষাই সমুচিত। এই যে বাক্, ইহা বিশেষতঃ বেদবিদ্যা। বৃহস্পতিই বলিতেছেন,—"ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে-পুপুষ্বান্, গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্করীষু, ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ"—এই বাক্ হোতার মুখে ঋক্‌রূপে বাহির হইয়া যজ্ঞকে পুষ্ট করেন; উদ্গাতার মুখে শক্করী সামরূপে গীত হন; অধ্বর্য্যুর মুখে যজুর্মন্ত্ররূপে যজ্ঞের শরীর নির্ম্মাণ করেন; ব্রহ্মা এই বিদ্যাকে যজ্ঞকর্ম্মে নিয়োগ করেন। অতএব এই বাক্ অর্থে বিশেষতঃ বেদবাক্যকেই বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যকের ভাষায় এই বেদবাক্য "মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্" অর্থাৎ সেই মহাভূত ঈশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ। শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষায় প্রজাপতি প্রজারূপে বহু হইবার কামনা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং তপস্যার দ্বারা প্রথমে ব্রহ্মরূপ ত্রয়ী বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বেদবাণী পুরাণ কবি বিশ্ববিধাতার চতুর্মুখ হইতে প্রথমে সমীরিত হইয়াছিল, বেদপন্থী ইহা মানিয়া লইয়াছেন। বলা হইয়াছে, "অনাদিনিধনা নিত্যা বাগ্ উৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা"—স্বয়ম্ভু কর্তৃক উৎসৃষ্ট হইলেও এই বাক্ নিত্য; ইঁহার আদিও নাই, নিধনও নাই। খ্রীষ্টানদিগের জনকেশ্বর হইতে উৎপন্ন তনয়েশ্বরের—খ্রীষ্টের বা শব্দরূপী ঈশ্বরের নিত্যত্বের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করুন। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য প্রত্যেক অধ্যায়ের আরম্ভেই "যস্য

নিঃশ্বসিতং বেদাঃ" বলিয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়াছেন ; পরন্তু বলিয়াছেন, "যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ নির্ম্মমে"—যিনি বেদবাক্য দ্বারা অখিল জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। খ্রীষ্টানেরাও বলেন, পিতা ঈশ্বর শব্দরূপী পুত্র খ্রীষ্টের দ্বারায় সমস্ত লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বেদপন্থীও বলেন, শব্দ হইতেই সমস্ত জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের আচার্য্যগণ কোনরূপ শরীরধারী দেবতা মানেন না, চলিত অর্থে ঈশ্বরও মানেন না অথচ তাঁহারা এই বেদবাক্যকে নিত্য এবং অপৌরুষেয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। বেদবাক্য মূর্ত্তিহীন শব্দরূপে চিরকাল বিদ্যমান আছেন ; এই শব্দ ঋষিদিগকে দেখা দেন এবং মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ঋষিমুখে আত্মপ্রকাশ করেন। বেদবাক্যই বাগ্‌দেবতা বা ব্রহ্ম। বেদমন্ত্রের সারভূত যে গায়ত্রী মন্ত্র, উহাকেই বিশেষতঃ বাগ্‌দেবীর মূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ গায়ত্রী একটি ছন্দের নাম ; এই ছন্দ সুপর্ণীরূপ ধরিয়া সোম বা অমরতা আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ছন্দের মধ্যে প্রধান, তিনি "ছন্দসাং মাতা"। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত আমরা প্রাত্যহিক সন্ধ্যোপাসনার সময়ে "আয়াতু বরদা দেবী অক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতং, গায়ত্রী ছন্দসাং মাতা ইদং ব্রহ্ম জুষস্ব নঃ" এই মন্ত্রে গায়ত্রীকে 'ছন্দসাং মাতা' এবং ব্রহ্মরূপিণী বলিয়া আবাহন করিয়া থাকি। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ জোরের সহিত বলিতেছেন, "গায়ত্রী বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ ; বাগ্ বৈ গায়ত্রী, বাগ্ বৈ ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ"—সমস্ত ভূত যাহা কিছু বিদ্যমান, এ সমস্তই গায়ত্রী ; গায়ত্রীই বাক্, বাক্ই সমস্ত ভূত ; গায়ত্রীই বাক্‌রূপে সকল ভূতের নাম দেন এবং সকলকেই রক্ষা করেন। গায়ত্রী ছন্দের যে মন্ত্রটিকে আমরা বেদবাক্যের সার মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সেই মন্ত্রের দেবতা সবিতা, এই জন্য উহাকে সাবিত্রী মন্ত্র বলা হয়। এই জন্য গায়ত্রীর নামান্তর সাবিত্রী। বিশ্বামিত্র ঋষি উহা প্রচার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তদবধি আজি পর্য্যন্ত উহাই বেদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক বালক উপনয়নকালে আচার্য্যের নিকট এই মন্ত্র গ্রহণ করে এবং তদবধি যাবজ্জীবন এই মন্ত্রের জপে বাধ্য থাকে। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—"স যামেব অমূং সাবিত্রীম্ অন্বাহ এব এষ সা"—সেই আচার্য্য বালককে যে সাবিত্রী মন্ত্র দান করেন, সেই সাবিত্রী মন্ত্রই বিশেষতঃ গায়ত্রী। "এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা"—এই গায়ত্রী আত্মার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই

গায়ত্রীতে সমস্ত জগৎই প্রতিষ্ঠিত। বিষ্ণুর ত্রিপাদ দ্বারা জগৎ আক্রমণের উপাখ্যান ঋক্‌সংহিতামধ্যে পুনঃ পুনঃ আছে। উহার গোড়ার তাৎপর্য্য যাহাই হউক, বিষ্ণুর তিন পদ এই লোকত্রয়কে বা সমস্ত প্রত্যক্ষ জগৎকে ব্যাপিয়া আছে, এই তাৎপর্য্য এখন দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই তিন পদ ব্যতীত বিষ্ণুর আর একটি চতুর্থ পদের বা পরম পদের কথা ভূয়োভূয়ঃ শুনা যায়, যে পদ পরম ব্যোমে অবস্থিত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অতীত লোকে বিদ্যমান। এইরূপে ব্রহ্মরূপী বিষ্ণু চতুষ্পদ। গায়ত্রী ছন্দের কিন্তু তিনটি মাত্র চরণ; গায়ত্রীর ব্রহ্মরূপ দৃঢ় করিবার জন্য বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—ভূমি, অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক ইহাই গায়ত্রীর প্রথম পদ; ঋক্, যজুঃ, সাম, ইহাই গায়ত্রীর দ্বিতীয় পদ; প্রাণ, অপান, ব্যান, ইহাই গায়ত্রীর তৃতীয় পদ; কিন্তু ইহার উপরেও আর একটি তুরীয় বা চতুর্থ পদ আছে, যাহা "পরোরজা" অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অতীত।

এই বাগ্‌দেবতার ব্রহ্মস্বরূপত্ব সম্বন্ধে যদি এখনও আপনাদের সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডল হইতে একটি সূক্ত আপনাদিগকে আমি শুনাইতে চাহি। এই সূক্তটির নাম দেবীসূক্ত। আজি পর্য্যন্ত শরৎকালের দেবীপূজায় উহা আমাদের গৃহে গৃহে পঠিত হয়। ফলে আমাদের দেবীপূজা বা শক্তিপূজা ঐ সূক্তটির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ সূক্তের ঋষির নাম বাক্। তিনি অম্ভৃণ ঋষির কন্যারূপে কল্পিত হইয়াছেন। তিনি যিনিই হউন, খ্রীষ্টের সুসমাচার-প্রচারক জোহনের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে, এমন কি, হীরাক্লিটাসের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি আপনাকে বাক্ অথবা শব্দব্রহ্মরূপে পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের এই পুরাতনী ঋষিকন্যা বাক্ জোরের সহিত বলিতেছেন—

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি,
অহম্ আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ,
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি,
অহম্ ইন্দ্রাগ্নী অহম্ অশ্বিনোভা,—

আমি রুদ্রগণের ও বসুগণের সহিত বিচরণ করি; আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ করি; মিত্র এবং বরুণ উভয়কেই আমি ধরিয়া রাখিয়াছি; ইন্দ্রকে, অশ্বিদ্বয়কেও আমি ধরিয়া রাখিয়াছি।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি,
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ,
অহং জনায় সমদং কৃণোমি,
অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ,—

আমি ব্রহ্মদ্বেষীর নাশের জন্য রুদ্রের ধনু বিস্তার করি, আমি জনহিতার্থে সংগ্রাম করি, আমিই দ্যাবাপৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট আছি।

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্,
মম যোনিরপ্‌সু অন্তঃ সমুদ্রে,
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা,
উতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি,—

আমি ঊর্দ্ধভাগে পিতা দ্যৌকে প্রসব করিয়াছি; সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে আমার গর্ভ রহিয়াছে; বিশ্বভুবনে আমি অনুপ্রবেশ করিয়াছি; দ্যুলোককেও আমি স্বদেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছি।

অহম্ এব বাত ইব প্রবামি,
আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা,
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা,
এতাবতী মহিমা সম্বভূব,—

বিশ্বভুবন নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া আমি বায়ুর মত সর্ব্বত্র প্রবাহিত হই; পৃথিবীর পরে, দ্যুলোকের পরে যাহা কিছু বিদ্যমান, সর্ব্বত্র আমি আমার মহিমাদ্বারা সম্ভূত হই।

ইহার চেয়ে জোরের ভাষা হইতে পারে না; ইহার চেয়ে স্পষ্ট কথা হইতে পারে না। মেরীগর্ভে জীবরূপে অবতীর্ণ শব্দরূপী খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, আমি ও আমার পিতা এক। তাহার বহু শত বৎসর পূর্ব্বে অম্ভৃণ-কন্যারূপে অবতীর্ণা বাগ্‌দেবীও স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছিলেন,—আমিই বিশ্বভুবনের নির্ম্মাণকর্ত্রী—অহং ব্রহ্মাস্মি। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদের মন্ত্রমধ্যে দার্শনিক অদ্বৈতবাদ খুঁজিয়া পান নাই; এই সূক্তটি তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়াছে।

ইড়াদেবীকে আপনারা চিনিলেন। ইনি বেদপন্থীর সনাতনী বাগ্‌দেবী। শ্রৌত কর্ম্মের সহিত ইড়াভক্ষণ এখন অপ্রচলিত; ইড়াভক্ষণে ইড়াদেবীকে—বাগ্‌দেবীকে ভক্ষণ করিয়া আত্মস্থ করা হইত। ইড়া সর্ব্বদেবময়ী; সকল

যজ্ঞেই ইড়াভক্ষণ বিহিত ছিল। যজ্ঞান্তে যজমান বিষ্ণুপদ পাইতেন। ইড়াদেবীর নাম পর্য্যন্ত আপনারা ভুলিয়াছেন। কিন্তু বাগ্‌দেবীকে বেদপন্থী ভুলিতে পারেন না। তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া বেদপন্থীর সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে। বেদপন্থীকে আমি মোটের উপর nominalist বলিয়া জানি। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের আচার্য্যগণ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, দেবতার স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন শরীর নাই; কোন রূপ নাই। যে-কোন পদার্থের, যে-কোন conceptএর বা ideaর একটা নাম দেওয়া যাইতে পারে, সেই পদার্থ ই দেবতা। যাহা কিছু object of thought, তাহাই দেবতা। যে বাক্যে সেই conceptএর তাৎপর্য্য বা connotation পাওয়া যায়, সেই বাক্যই—সেই predicationই দেবতার মন্ত্র; অতএব দেবতা মন্ত্রাত্মক। ইহা চূড়ান্ত nominalism, জগতে যাহা কিছু মননযোগ্য বা object of thought আছে বা থাকিতে পারে, তাহাই দেবতা এবং যে দেবতাকে যে নাম দেওয়া যায়, সেই নামই সেই দেবতার শরীর। এই অর্থে দেবতা মাত্রই শব্দময়ী, বর্ণময়ী। যাঁহারা ভক্তিপথের পথিক, তাঁহারা দেবতার নামকেই দেবতার তুল্যমূল্য ধরিয়া লইয়াছেন। এমন কি, সত্যভামা ঠাকুরাণী তুলাদণ্ডে তাঁহার হরির মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া ফাঁপরে পড়িলে, রুক্মিণী তাঁহাকে দেখাইয়া দেন, হরির চেয়ে হরির নামের গুরুত্ব অধিক। বেদপন্থীর এই nominalism শ্রীচৈতন্যকর্ত্তৃক নামমাহাত্ম্য প্রচারে চরম সার্থকতা পাইয়াছে। ওঁ এই একাক্ষর শব্দটির প্রাচীন অর্থ—হাঁ; আছে কি নাই, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইত—ওঁ অর্থাৎ হাঁ,—আছে। ব্রহ্ম আছেন, এ বিষয়ে যাঁহাদের সন্দেহ ছিল না, তাঁহারা এই ওঁ অক্ষরটিকেই ব্রহ্মের সব চেয়ে ব্যাপক ও প্রসিদ্ধ নাম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য ওঙ্কারের মাহাত্ম্য সর্ব্বোপরি। তন্ত্রপন্থী দার্শনিকও বেদপন্থীর এই nominalism গ্রহণ করিয়াছেন। ওঙ্কারের অনুকরণে তিনিও x, y, z, বা ক খ গ বা হিং টিং ছট্ ইত্যাদি অর্থশূন্য সাঙ্কেতিক নাম বা বীজমন্ত্র দ্বারা দেবতার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ করিতে চাহেন। অর্থশূন্য সাঙ্কেতিক নামের সুবিধা এই যে, সাধক নিজের স্বভাব ও মেজাজ অনুসারে যে-কোন সঙ্কেতে যে-কোন সঙ্কীর্ণ তাৎপর্য্য আরোপ করিতে পারেন—আপনার মনের মত করিয়া আপনার দেবতা গড়িয়া লইতে পারেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি তৃপ্ত হন না। তন্ত্রপন্থী একাধারে দার্শনিক ও সাধক; তিনি প্রত্যেক

নামকে একটা রূপ দিয়া realise করিতে চাহেন, রূপের জগতে টানিয়া আনিয়া দেবতার সহিত মেলা-মেশা কারবার করিয়া রস সম্ভোগ করিতে চাহেন। তিনি এখানে আর্টিষ্ট। প্রত্যেক নামের, প্রত্যেক দেবতার তিনি একটা রূপ কল্পনা করিয়াছেন; সেই নামের যে তাৎপর্য্য বা connotation তিনি দিতে চাহেন, তদনুযায়ী রূপ কল্পনা করিয়াছেন। সেই রূপ ধ্যান করিয়া তিনি তৃপ্তি পান। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত ঝগড়ায় কোন লাভ নাই। তন্ত্রশাস্ত্র বেদপন্থীর বাগ্‌দেবীকে শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছেন; তন্ত্রে তাঁহার নাম মাতৃকা সরস্বতী। ইনি শব্দাত্মিকা—অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণে ইহার দেহ নির্ম্মিত; প্রতি অঙ্গে কতকগুলি বর্ণ বা অক্ষর বসাইয়া ইহার শব্দময়—বর্ণময় দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে; অতএব ইনি পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলা। ইনি ভাস্বন্মৌলি-নিবদ্ধচন্দ্রশকলা—ইহার মস্তকে সোমকলা নিবদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছে। এ সেই সোমকলা, বাগ্‌দেবী স্বয়ং যাহা আবিষ্কার করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার এক হাতে মুদ্রা, এক হাতে অক্ষমালা, এক হাতে বিদ্যা, চতুর্থ হাতে সুধাঢ্য কলস,—অমৃতপূর্ণ কলস—ইহাও সেই সোমকলস, যাহা অমৃতরসে পূর্ণ। ইনি ত্রিনয়না—বিশদপ্রভা—আপীনতুঙ্গস্তনী। এমন রূপ আর হয় না। এই বাগ্‌দেবতা সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বময়ী;—যে-কোন দেবতার পূজায় বসিয়া যিনি পূজক, তিনি আপনাকে এই মাতৃকা সরস্বতীর সহিত অভিন্ন মনে করেন—আপনার প্রতি অঙ্গে অ আ ক খ ইত্যাদি বিবিধ বর্ণ বিন্যাস করিয়া আপনার স্থূল দেহকে বাগ্‌দেবতার বাঙ্‌ময় দেহরূপে কল্পনা করেন; আপনার অন্তঃশরীরেরও চক্রে চক্রে ঐরূপ বর্ণ বিন্যাস করিয়া অন্তর্দেহকেও বাগ্‌দেবীর বাঙ্‌ময় দেহরূপে কল্পনা করেন। তন্ত্রমতে পূজাকালে ভূতশুদ্ধির পরে এইরূপে মাতৃকা ন্যাস করিতে হয়। বাহিরের দেহে ও অন্তর্দেহে বর্ণ বিন্যাস দ্বারা বাগ্‌দেবীর শব্দময় বাঙ্‌ময় দেহ রচনার নামই মাতৃকান্যাস। এইরূপে পূজায় বসিলে পূজকের সহিত বাগ্‌দেবতার অভিন্নতা কল্পিত হয়; জীবের সহিত ঈশ্বরের ঐক্য কল্পিত হয়। বৈদিক যজ্ঞে ইড়াভক্ষণের অভিপ্রায় যজমানের সহিত বাগ্‌দেবতার—শব্দব্রহ্মের ঐক্য সম্পাদন। তান্ত্রিক পূজারও সেই একই অভিপ্রায়। খ্রীষ্টান তাঁহার বাগ্‌দেবতাকে গ্রীকদের নিকট ধার করিয়া লইয়াছেন; তাঁহাকে মূর্ত্তি দিয়া খ্রীষ্টবিগ্রহে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই শব্দব্রহ্মতত্ত্বকে অধিক দূর

ফলাইতে পারেন নাই। বেদপন্থী যাহা ধরেন, তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়া দেন।

এত ক্ষণে আপনারা ইড়াভক্ষণের তাৎপর্য্য বুঝিলেন। হাসিবেন না, ইড়াভক্ষণ খ্রীষ্টানের দেবতা-ভক্ষণের অনুরূপ অনুষ্ঠান। ইড়াভক্ষণে বাগ্‌দেবতাকে আত্মস্থ করা হয়, বাগ্‌দেবতার সহিত সাযুজ্য স্থাপন হয়, অমৃতভোজন ঘটে। সোমপানেও যে ফল, ইড়াভক্ষণেও সেই ফল। ইড়াভক্ষণের তাৎপর্য্য না বুঝিলে যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না—ইড়াভক্ষণেই যজ্ঞের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা। পুরাকালে বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠান কতটা স্থান জুড়িয়া ছিল, এখন তাহা বুঝিতে পারিবেন। যজ্ঞের বিবরণ দিতে গিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানকে আমি এ পর্য্যন্ত খুব সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু এখন খুব ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থের মধ্যে কথায় কথায় যজ্ঞ সম্বন্ধে উপাখ্যান দেখিবেন। সকলেই যজ্ঞ করিতেছে। রাজারা করিতেছেন, ঋষিরা করিতেছেন, অঙ্গিরোগণ করিতেছেন, আদিত্যগণ করিতেছেন, পিতৃগণ, সাধ্যগণ, দেবগণ, সকলেই যজ্ঞ করিতেছেন। এমন কি, গাভীগণ ও বৃক্ষগণও যজ্ঞ করিতেছে। যজ্ঞ লইয়া দেবগণের সহিত অসুরগণের কেবলই বিবাদ হইতেছে। যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ অসুরগণকে পরাজয় করিতেছেন। দেবতারা যজ্ঞকে খুঁজিয়া পাইতেছেন না, যজ্ঞ আপনি আসিয়া ধরা দিতেছেন; দেবগণের সকল কামনা পূর্ণ করিতেছেন। মনু যজ্ঞ করিয়া লুপ্ত মানববংশ রক্ষা করিতেছেন। সংবৎসররূপী অর্থাৎ কালরূপী প্রজাপতি স্বয়ং যজ্ঞ করিতেছেন; ঋতুগণ ও মাসগণ সেই যজ্ঞে ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতেছেন। প্রজাপতির ইচ্ছা হইল, আমি একা আছি, বহু হইব। তিনি তপস্যা করিলেন; তপস্যা করিয়া আপনার প্রাণের মধ্যে দ্বাদশাহ যজ্ঞ দেখিতে পাইলেন। সেই দ্বাদশাহ যজ্ঞকে আবিষ্কার করিয়া তিনি সেই যজ্ঞ করিলেন; তাহাতেই তিনি বহু হইলেন ও প্রজাপতি হইলেন। দেখাদেখি ইন্দ্র দ্বাদশাহ যজ্ঞ করিলেন; তাহাতে তিনি দেবগণের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইলেন। প্রজাপতি এক কালে গৃহপতি হইয়াছিলেন; দেবগণও যজমান হইয়া প্রজাপতির সহিত একযোগে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তাঁহাদের চিত্তি স্রুক্ হইয়াছিল, চিত্ত আজ্য হইয়াছিল, বাক্য বেদি হইয়াছিল, ধ্যান বর্হিঃ বা কুশ হইয়াছিল, জ্ঞান অগ্নি হইয়াছিল, বিজ্ঞান অগ্নীৎ হইয়াছিল, প্রাণ হব্য হইয়াছিল, সাম অধ্বর্য্যু

হইয়াছিল, বাচস্পতি হোতা হইয়াছিলেন, মন মৈত্রাবরুণ হইয়াছিল। অধিক কি বলিব, এই বিশ্বসৃষ্টিরূপ ব্যাপারই একটা যজ্ঞ। স্বয়ং বিরাট্‌ পুরুষ স্বেচ্ছায় এই যজ্ঞ করিয়াছেন। মনে রাখিবেন, যাজ্ঞিকের পরিভাষা মতে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ। এই জগৎসৃষ্টি ব্যাপারে বিরাট্‌ পুরুষ আপনাকেই ত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনাকেই আহুতি দিয়াছিলেন। কোন্‌ দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিয়াছিলেন? যজ্ঞদেবতার উদ্দেশেই আহুতি দিয়াছিলেন। প্রজাপতি নিজেই যজ্ঞপুরুষ—যজ্ঞদেবতা, ইহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহার কোন ইষ্টলাভ থাকিতে পারে না; তিনি সৃষ্টির জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন—ত্যাগের জন্যই ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা লীলাকৈবল্য। আপনারা বিখ্যাত পুরুষসূক্তের কথা শুনিয়াছেন—সেই পুরুষসূক্তে সৃষ্টিকর্ত্তার অনুষ্ঠিত এই আদিম যজ্ঞের—এই পুরুষ-যজ্ঞের সবিশেষ বিবরণ আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা এক জন পুরুষ—এক জন Person, যাঁহার সঙ্কল্প মাত্রে, কামনা মাত্রে, তপস্যা মাত্রে এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। এই যে পুরুষ, তাঁহার সহস্র শীর্ষ, সহস্র অক্ষি, সহস্র পদ। বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া তিনি আছেন এবং তাহার উপরেও আরও দশ অঙ্গুলি ব্যাপিয়া আছেন। সমস্ত বিশ্বভূত তাঁহার এক পদ মাত্র, তাঁহার অন্য তিন পদ বিশ্বভূত অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান। যাহা কিছু আছে, যাহা ছিল বা হইবে, তাহা লইয়াই এই পুরুষ। অথচ এই সমস্তই তাঁহার এক পদ মাত্র, তাঁহার আর তিন পদ এ সমস্তকে অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে অবস্থিত। তিনি বিরাট্‌রূপে জন্মিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন; এবং জাত হইয়াই সম্মুখে এবং পশ্চাতে সমস্তকে আক্রমণ করিলেন, এবং অতিক্রম করিয়া রহিলেন। তিনিই অগ্রজন্মা পুরুষ; তখন কোথাও কোন দেবতা ছিল না, ঋষি ছিল না, মনুষ্য ছিল না, অথচ সেই ভাবী পুরুষেরা কোথা হইতে আসিয়া সেই অগ্রজন্মা বিরাট্‌ পুরুষকে লইয়াই যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন? ইহাতে চমকাইবেন না; সৃষ্টিঘটনা কালাতিগ ঘটনা; এখানে অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সহিত মিশিয়া থাকে। যজ্ঞে পশু আবশ্যক; সেই পুরুষকেই তাঁহারা পশু করিলেন। "তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্‌ পুরুষং জাতমগ্রতঃ, তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে"—ঋষিগণ, সাধ্যগণ, দেবগণ সেই অগ্রে জাত পুরুষকেই পশুরূপে প্রোক্ষিত করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। "দেবা যদ্‌ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্‌ পুরুষং পশুম্‌"—দেবগণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া

সেই পুরুষকেই পশুরূপে বন্ধন করিলেন। সেই যজ্ঞ সর্ব্বহুত যজ্ঞ। যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই সেই পুরুষ; সেই সর্ব্বরূপ পুরুষকেই যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইল; সেই পশুকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া আহুতি দেওয়া হইল। তাঁহার নাভি হইতে অন্তরিক্ষ, মস্তক হইতে দ্যুলোক, পদ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্‌সকল উৎপন্ন হইল। তাঁহার মন হইতে চন্দ্র, চক্ষুঃ হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্রাগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু জন্মিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে জন্মিল। আরণ্য এবং গ্রাম্য পশুগণও উৎপন্ন হইল। ভাবী জীবগণের হিতার্থ বিরাট্ পুরুষ স্বয়ং এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন—আপনাকে আহুতি দিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন;—ভাবী জীবেরা, ভাবী দেবগণ ও ভাবী ঋষিগণ, যজমান ও ঋত্বিক্ হইয়া তাঁহার সহিত একযোগে তাঁহাকেই পশু করিয়া এই যজ্ঞের সম্পাদন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট-যজ্ঞের কথাটা এই প্রসঙ্গে মনে রাখিবেন। ইহাই বিশ্বমধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম যজ্ঞ; কেবল যজ্ঞের জন্যই, অন্য কামনা বর্জ্জন করিয়া কেবল যজ্ঞের জন্যই এই প্রথম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ, তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্"—এখন যে যজ্ঞ করা হয়, সে সেই আদিম যজ্ঞেরই অনুকরণে।

বিরাট্ পুরুষের এই বিশ্বসৃষ্টিরূপ মহাযজ্ঞ ঋষিদিগের কল্পনাকে অভিভূত করিয়াছিল। বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করা হইতেছে,—"কাসীৎ প্রমা প্রতিমা কিং নিদানম্"—এই যে যজ্ঞ হইয়াছিল, ইহার পরিমাণ কি ছিল, প্রতিমা কি ছিল, উহার সঙ্কল্প কি ছিল? "আজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ, ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুক্থম্; যদ্ দেবা দেবম্ অযজন্ত বিশ্বে"—বিশ্বমধ্যে দেবতারা যজ্ঞ-পুরুষের যে যাগ করিয়াছিলেন, তাহার আজ্য কি ছিল, পরিধি কি ছিল, ছন্দ কি ছিল, শস্ত্রই বা কি ছিল? বলা হইতেছে, "যো যজ্ঞো বিশ্বতস্তন্তুভিস্তত একশতং দেবকর্ম্মেভিরায়তঃ"—বিশ্ব ব্যাপিয়া এই যে যজ্ঞরূপ বস্ত্র বয়ন করা হইতেছে, দেবগণের যাবতীয় কর্ম্ম তাহাতে তন্তুস্বরূপ হইয়াছে। "ইমে বয়ন্তি পিতরো য আযযুঃ, প্র বয় অপ বয় ইত্যাসতে ততে"—সম্মুখের দিকে বয়ন কর, বিস্তারের দিকে বয়ন কর বলিতে বলিতে পিতৃগণও আসিয়া সেই বয়ন কার্য্যে যোগ দিতেছেন। "চাকৢপ্রে তেন ঋষয়ো মনুষ্যাঃ, যজ্ঞে যাতে পিতরো নঃ পুরাণে"—সেই পুরাতন যজ্ঞ সম্পাদিত হইলে তাহারই অনুকরণে আমাদের পিতৃগণ, মনুষ্যগণ এবং ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। "পশ্যন্ মন্যে মনসা

চক্ষসা তান্, য ইমং যজ্ঞম্ অযজন্ত পূর্ব্বে”—পূর্ব্বে যাঁহারা এই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, এখনও যেন মানস চক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি। বস্তুতই এই সৃষ্টিযজ্ঞ কখনও সমাপ্ত হইবার নহে। কাল ব্যাপিয়া ইহা চলিতেছে। সমস্ত জাগতিক ব্যাপার এই যজ্ঞকর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। দেবগণ, পিতৃগণ এবং নরগণ এই যজ্ঞব্যাপারেই লিপ্ত রহিয়াছেন; এই সৃষ্টিযজ্ঞে সাহায্য করিবার জন্যই তাঁহারা নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের অস্তিত্বের আর কোন সার্থকতাই নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা বিরাট্ পুরুষ স্বয়ং এই যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়াছেন। সেই মুক্ত পুরুষই স্বেচ্ছায় আপনাকে যূপে বদ্ধ করিয়া আপনাকে যজ্ঞীয় পশুতে পরিণত করিয়াছেন; তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্বজগতের নির্ম্মাণ করিতেছেন। সমস্ত বিশ্বজগৎটাই সেই যজ্ঞীয় পশুর দেহ; যাবতীয় জীবের হিতার্থ ইহা যজ্ঞে নিযুক্ত হইয়াছে। যাবতীয় জীবের পক্ষে ইহা ভোগ্যরূপে—অন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যাবতীয় জীব হবিঃশেষরূপে ইহাকে আত্মস্থ এবং আত্মসাৎ করিয়া সেই বিরাট্ পুরুষের শরীরে আপনার শরীর মিশাইতেছে। বিরাট্ পুরুষ কেবলই আপনাকে ত্যাগ করিতেছেন, কেবলই আপনাকে নষ্ট করিতেছেন, কেবলই আপনাকে নিহত করিতেছেন; অথচ তিনি নষ্ট—নিহত হইতেছেন না। তাঁহার এই যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাহা এক দিনের অনুষ্ঠান নহে—মহাকাল ব্যাপিয়া ইহা চলিতেছে। এই যজ্ঞের প্রায়ণও নাই, উদয়নও নাই, আরম্ভও নাই, সমাপ্তিও নাই; কেন না, এই যজ্ঞই ত বিশ্বব্যাপার। বেদপন্থী সমাজে অগ্নিচয়ন বলিয়া একটা সংবৎসরব্যাপী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইত। তৈত্তিরীয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে তাহার তাৎপর্য্য বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে একটি বেদি গাঁথা হইত, তাহার নাম চিতি। ইটের পাশে ইট বসাইয়া, ইটের উপর ইট থাকে থাকে সাজাইয়া এই চিতি নির্ম্মিত হইত। তজ্জন্য বহু ইষ্টকের প্রয়োজন হইত। এই চিতির মধ্যস্থলে উত্তর-বেদি গড়িয়া সেখানে অগ্নির স্থাপনা হইত; এবং সেই অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইত। কোথাও বা সংবৎসর ধরিয়া সত্ররূপে অগ্নিচয়নের অনুষ্ঠান হইত। অনুষ্ঠানভেদে এই অগ্নি নানাবিধ নাম পাইত। কোথাও নাম সাবিত্র অগ্নি; কোথাও বৈশ্বসৃজ অগ্নি; কোথাও বা চাতুর্হোত্র অগ্নি; কোথাও নাম নাচিকেত অগ্নি। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের শেষ ভাগে অন্য অগ্নির সহিত নাচিকেত অগ্নির চয়নের বিস্তৃত বিবরণ আছে। নাচিকেত অগ্নির

প্রসঙ্গ আপনারা কঠোপনিষদে যম-নচিকেতা-সংবাদ মধ্যে পাইয়াছেন। মৃত্যু নচিকেতাকে এই অগ্নিচয়নে ইষ্টকের সংখ্যা ও ইষ্টক স্থাপনের প্রণালী এবং অগ্নির তাৎপর্য্য উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার নামেই এই অগ্নির নাম হইবে ; যে তিন বার এই নাচিকেত অগ্নির চয়ন করিবে, সে জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করিবে ও পরম শান্তি লাভ করিবে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও সেই উপাখ্যানটির উল্লেখ আছে। আর এক অগ্নির নাম আরুণ-কেতুক অগ্নি—তৈত্তিরীয় আরণ্যকের আরম্ভেই ইহার সবিস্তর বিবরণ ও ব্যাখ্যা আছে। উত্তরবেদির স্থানে গর্ত্ত করিয়া জল ঢালা হইত ; তাহার উপর পদ্মের পাতা, পদ্মের ডাঁটা, পদ্মফুল বিছাইয়া একখানা পদ্মপত্রে সোনার পাতের উপরে সোনার পুরুষমূর্ত্তি রাখা হইত ; তাহার পার্শ্বে একটা কূর্ম্ম—কাছিম রাখা হইত। অতঃপর সেখানে অগ্নি রাখিয়া অগ্নির চারি দিকে ইট সাজাইয়া চিতি প্রস্তুত হইত। এই অগ্নির নাম আরুণকেতুক অগ্নি। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ইহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত জলময় ছিল। ঋক্‌সংহিতার দশম মণ্ডলে বিখ্যাত নাসদাসীয় সূক্তে এই জলের কথা আছে—"তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে, অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম ;" সেই জলমধ্যে পদ্মপত্রে একা প্রজাপতি অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার কামনা হইল—আমি সৃষ্টি করিব। এখানেও তৈত্তিরীয় আরণ্যক নাসদাসীয় সূক্তের দোহাই দিয়া বলিতেছেন,—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি, মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ"—অগ্রে কাম উৎপন্ন হইল, উহা মন হইতে বীজরূপে প্রথমে জন্মিল। সৃষ্টিকর্ত্তার এই সৃষ্টিকামনাকেই পৌরাণিকেরা প্রজাপতির মানস পুত্র মনসিজ কামে পরিণত করিয়াছেন। জলমধ্যে পদ্মপত্রস্থ প্রজাপতিতেও আপনারা কারণসলিলশায়ী নারায়ণের নাভিপদ্মে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইবেন। সে কথা যাক। সৃষ্টি কামনা করিয়া প্রজাপতি তপস্যা করিলেন ও আপনার শরীর কম্পন করিলেন। শরীর হইতে কতকগুলি ঋষি জন্মিল—এক দল ঋষির নাম অরুণকেতু। প্রজাপতি দেখিলেন, জলমধ্যে একটি কূর্ম্ম—কচ্ছপ চরিতেছে। প্রজাপতি সেই কূর্ম্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এখনই জন্মিলে ? কূর্ম্ম বলিল, না, আমি আগে হইতেই আছি ; এই বলিয়া কূর্ম্ম সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ পুরুষের মূর্ত্তি ধরিল। এই তিনটি বিশেষণেই আপনারা ইহাকে চিনিতে পারিবেন ; ইনিই পুরুষসূক্তের বিরাট্ পুরুষ। এইখানে নারায়ণের কূর্ম্মাবতারের মূলও

পাইবেন। প্রজাপতি বলিলেন, তাহা হইলে তুমিই জগৎ সৃষ্টি কর। তখন সেই পুরুষ অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া এদিকে ওদিকে ছিটাইতে লাগিলেন। এক এক দিকে এক এক দেবতা জন্মিল—আদিত্য, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা জন্মিল। সেই জলের বিন্দু হইতে পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি জন্মিল। ফলে ঐ যে কূর্ম্মরূপী পুরুষ, তিনি পূর্ব্ব হইতেই প্রজাপতির মধ্যেই ছিলেন, প্রজাপতির সৃষ্টিকামনার পর তিনি বাহিরে আসিলেন মাত্র। প্রজাপতিই জগৎ সৃষ্টি করিয়া সেই জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যক উপসংহারে বলিতেছেন,—"বিধায় ভূতানি বিধায় লোকান্, বিধায় সর্ব্বান্ প্রদিশো দিশশ্চ, প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্য, আত্মনা আত্মানম্ অভিসংবিবেশ"—সত্যস্বরূপ অগ্রজন্মা প্রজাপতি ভূতসকল ও লোকসকল বিধান করিয়া, দিক্‌বিদিকের সৃষ্টি করিয়া নিজেই নিজের সৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন। ইংরেজীতে বলিলে তিনি বিশ্বজগৎকে transcend করিয়াও তাহাতে immanent রহিলেন।

আরুণকেতুক নামক অগ্নি চয়নের অনুষ্ঠান প্রজাপতি কর্ত্তৃক সেই জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপারের অনুকরণ। উত্তরবেদির নীচে যে জল ঢালা হয়, উহাই সেই সৃষ্টির পূর্ব্বতন কারণ-সলিল; পদ্মপত্রস্থ বা সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট হিরণ্ময়বপুঃ পুরুষ কারণসলিলশায়ী নারায়ণ; পার্শ্বে কাছিমটি কূর্ম্মরূপী বিরাট্ পুরুষ। এই বিরাট্ পুরুষ স্বদেহ দিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার অনুষ্ঠিত পুরুষ-যজ্ঞ। চিতির মধ্যে উত্তরবেদিতে যে অগ্নির প্রতিষ্ঠা হয়, ঐ অগ্নিই প্রজাপতির তৈজস রূপ; বৈশ্বানর অগ্নিরূপে তিনি জগতের যাবতীয় কর্ম্মের প্রেরণা করিতেছেন। অগ্নির চারি দিকে ইট বসাইয়া যে চিতি নির্ম্মিত হয়, তাহা প্রজাপতির স্থূল দেহ—বিশ্বজগৎরূপ স্থূল দেহ; ইষ্টকগুলি সেই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ,—কূর্ম্মপুরুষনিক্ষিপ্ত কারণ-সলিলের বিন্দু হইতে উৎপন্ন জাগতিক লোকসকল বা ভূতসকল। অরুণকেতু ঋষিগণের নামানুসারে ঐ অগ্নির নাম আরুণকেতুক অগ্নি। ঐ অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহাতে পুরুষ-যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান ঘটে। শতপথ ব্রাহ্মণ এই অগ্নি চয়নের থিয়োরি আরও ফলাইয়াছেন। ঐ অগ্নি বৈশ্বানর অগ্নি—জগতের যাবতীয় কর্ম্মের বা যাবতীয় ঘটনার প্রেরক। ঐ চিতি প্রজাপতির স্থূল দেহ—উহা প্রজাপতির দেহ বটে; শতপথ বলেন, উহা যজমানের দেহও বটে—কেন না, যজমান প্রজাপতি হইতে অভিন্ন। উহা আবার সংবৎসরের

দেহ, অতএব কালস্বরূপ ; প্রজাপতিই সংবৎসর, সংবৎসরই কাল। অগ্নিচয়নানুষ্ঠান সংবৎসর ধরিয়া চলে। প্রজাপতির সৃষ্টিকর্ম্ম কাল ব্যাপিয়া চলিতেছে ; উহার আদি নাই, অন্ত নাই। চিতিটিকে শ্যেন পাখীর আকার দেওয়া হইত। এই শ্যেন পাখী উর্দ্ধলোকে উঠিতে সমর্থ; আপনাদের মনে থাকিবে, এই শ্যেন পাখী একদা কোন্ উর্দ্ধলোক হইতে সোমরূপী অমৃত আনয়ন করিয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ বুঝাইতেছেন, চিতি-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই যে অগ্নি, ইনি জগৎকর্ম্মের প্রেরক বৈশ্বানর অগ্নি ; ইনিই প্রজাপতির স্বরূপ। শতপথ বলেন, ইনি আবার যজমানেরও স্বরূপ ; কেন না, যজমান প্রজাপতি হইতে অভিন্ন। ইহাতে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা বিশ্বযজ্ঞে প্রজাপতির আত্মাহুতি ; তাহা জীবনযজ্ঞে যজমানেরও আত্মাহুতি। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, এই আত্মাহুতিকে আমরা মৃত্যু বলি ; এই আহুতির বিরাম বা অন্ত নাই ; মৃত্যুরও বিরাম বা অন্ত নাই। প্রজাপতি আপনাকে ত্যাগ দ্বারা নিহত করিতেছেন ; যজমানও আপনাকে ত্যাগ দ্বারা নিহত করিতেছেন। প্রজাপতি মৃত্যুস্বরূপ ; যজমানও মৃত্যুস্বরূপ। এই মৃত্যুর অন্ত নাই ; কেন না, এই মৃত্যু দ্বারাই অমরতা পাওয়া যায়। প্রজাপতি মৃত্যুঞ্জয়—যজমানও মৃত্যুজয়ী। খ্রীষ্ট-যজ্ঞের প্রসঙ্গ আবার মনে করিবেন।

বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞের স্থান আমি আপনাদিগকে দেখাইতে চাহি। ইষ্টিযাগাদি যজ্ঞ বটে ; ঐ সকল অনুষ্ঠান প্রাচীনতর কালের অনুষ্ঠান ; আরও প্রাচীন কালের survival. ঐতিহাসিক কারণে ঐ সকল অনুষ্ঠান সমাজে চলিত হইয়াছিল—যাজ্ঞিকেরা উহাতে নূতন তাৎপর্য্য আরোপ করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদিগকে সেই নূতন তাৎপর্য্যই মানিতে হইবে ; এবং এই তাৎপর্য্য অনুসারে যজ্ঞকে খুব ব্যাপক অর্থে বুঝিতে হইবে। ইহা টাইলার সাহেবও মানিয়াছেন। বেদপন্থী যজ্ঞকে কিরূপ ব্যাপক অর্থে দেখিতেন, তাহা বুঝাইলাম—ঋক্‌মন্ত্র প্রচারের সময়েও কিরূপ ব্যাপক অর্থে দেখিতেন, তাহা বুঝাইলাম। খ্রীষ্ট-যজ্ঞের সহিত পুরুষ-যজ্ঞের সাদৃশ্য তুলনা করিবেন। ওয়েবারের মত বিদেশী ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত দেশী খ্রীষ্টান এই সাদৃশ্য কতকটা দেখিয়া চমকাইয়াছিলেন ; কিন্তু ইহার ব্যাপকতা দেখিতে পান নাই। খ্রীষ্টানের মতে ঈশ্বর স্বয়ং জীবহিতের জন্য যজ্ঞের পশুরূপে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন—সেই যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণে

ইতর জীব ঈশ্বরের সহিত একত্ব লাভ করে। খ্রীষ্টান এই একত্ব শব্দটি ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু সাধারণ খ্রীষ্টানের কাছে এই একত্ব সালোক্য বা সামীপ্য মাত্র; তাহার অধিক কিছু নহে। বেদপন্থীর মতে পুরুষ-যজ্ঞের তাৎপর্য্য আরও ব্যাপক। ঈশ্বর আত্মাহুতি দিয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন; এই সৃষ্টি ব্যাপারে তিনি নিজেই যজ্ঞের পশু হইয়াছিলেন। যিনি মুক্ত, তিনি বদ্ধ হইয়াছেন; যিনি বড়, তিনি ছোট হইয়াছেন; যিনি অমৃত, তিনি মৃত্যু স্বীকার করিয়াছেন। ইতর জীব জানে না যে, সে নিজে সেই ঈশ্বর হইতে অভিন্ন; সে নিজেই ঈশ্বর—তাহার বাহিরে আর কোন ঈশ্বর নাই; অতএব সে চিরমুক্ত; অথচ তাহাকে বদ্ধ সাজিয়া সংসারযাত্রা চালাইতে হইতেছে, অমৃত হইয়াও মৃত্যু স্বীকার করিতে হইতেছে; সেও জীবন ব্যাপিয়া পশুর মত যূপবদ্ধ থাকিয়া পুরুষযাগে আত্মাহুতির জন্য নিযুক্ত আছে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রাটাই যজ্ঞানুষ্ঠান। ছান্দোগ্য উপনিষৎ এই তত্ত্বটি অতি স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতি-বর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনম্, যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্‌বর্ষাণি তৎ মাধ্যন্দিনং সবনম্, অথ যানি অষ্টাচত্বারিংশদ্‌বর্ষাণি তৎ তৃতীয়সবনম্,"—মানুষের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ; তাহার চরম পরমায়ু এক শ ষোল বৎসর ধরিলে প্রথম চব্বিশ বৎসর সেই যজ্ঞের প্রাতঃসবন, মধ্যের চুয়াল্লিশ বৎসর মাধ্যন্দিন সবন, এবং শেষের আটচল্লিশ বৎসর তৃতীয় সবন মনে করা যাইতে পারে। আবার বলা হইতেছে, মানুষ শৈশবে যে পান ভোজন করে, তাহাই এ যজ্ঞে দীক্ষা; বাল্যে যে খেলাধূলা করে, তাহাই উপসদ্; যৌবনে যে সংসারধর্ম্ম করে, তাহাই স্তোত্রগান ও শস্ত্রপাঠ; আর বার্দ্ধক্যে যে তপস্যাদি করে, তাহাই দক্ষিণা; পরিশেষে মৃত্যুই তাহার অবভৃথ স্নান। ছান্দোগ্য বলেন, ঘোর আঙ্গিরস ঋষি তাঁহার শিষ্য দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে মানবজীবন সম্বন্ধে এই উপদেশ দিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন—"অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংহিতমসি"—অহে সূক্ষ্ম প্রাণধারী মানুষ, তুমি অচ্যুত, তুমি অক্ষয়। উত্তর কালে সমস্ত ভারতবর্ষ এই দেবকীনন্দন কৃষ্ণটিকে অচ্যুত এবং অক্ষয় পুরুষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশকেই পল্লবিত করিয়া গীতাশাস্ত্ররূপে তাঁহারই মুখ দিয়া প্রচার করা হইয়াছে। এ-কালের অনেক পণ্ডিতে বলেন, যজ্ঞকে নিন্দা করিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের প্রচার হইয়াছিল; বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্যই আধুনিক কালে

উপনিষদের এবং গীতাশাস্ত্রের জ্ঞানকাণ্ডের প্রচার হইয়াছিল। এ সব বাজে কথায় আপনারা কান দিবেন না। ঋক্‌মন্ত্রের প্রচারকালেই যজ্ঞের তাৎপর্য্য কতটা ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ আমি উপস্থাপিত করিয়াছি—সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আমি তাহা সমর্থন করিলাম। কর্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে কোন মর্ম্মগত বিরোধ নাই; আপনারা আশ্বস্ত হইবেন।

এই দেবকীনন্দন কৃষ্ণ গীতামধ্যেই বলিয়াছেন,—"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ, অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্"—স্বয়ং প্রজাপতি যজ্ঞের সহিতই প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, এই যজ্ঞ দ্বারাই তোমরা বৃদ্ধি পাইবে; ইহাতেই তোমাদের কামনার পূরণ হইবে। "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ"—যাহারা যজ্ঞের হবিঃশেষরূপে সকল ভোগ্য ভোগ করে, তাহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। "যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্"—যজ্ঞের যাহা হবিঃশেষ, তাহাই অমৃত; সেই অমৃতভোজনে সনাতন ব্রহ্মলাভ হয়। অধিক কি বলিব, "তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্"—নিত্য সর্ব্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। এ যজ্ঞ কোন্ যজ্ঞ? এক পক্ষে ইহা বিশ্বকর্ম্মার পুরুষ-যজ্ঞ, অন্য পক্ষে ইহা ইতর মানবের জীবন-যজ্ঞ; একটা অন্যটারই প্রকারভেদ। জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকেই যজ্ঞের কর্ম্মাঙ্গরূপে দেখিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ঘোর আঙ্গিরসেরও এই উপদেশ—তাঁহার ক্ষত্রিয় শিষ্য দেবকীনন্দন কৃষ্ণেরও এই উপদেশ। উপনিষদের মধ্যে ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের বিরোধ কল্পনা করিয়া যাঁহারা পরম তৃপ্তি পান, তাঁহারা এখানে অবধান করিবেন। দেবকীনন্দন বলিতেছেন,—"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ, যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্"—যে কর্ম্ম তুমি করিবে, তোমার দান, তোমার তপস্যা, তোমার পূজা, তোমার পান ভোজন পর্য্যন্ত তুমি যজ্ঞরূপে আমার উদ্দেশে অর্পণ করিবে; আমি অচ্যুতই সেই যজ্ঞের দেবতা। তন্ত্রপন্থীও এই বাক্যকে ঘুরাইয়া বলিয়াছেন, "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।" মনে রাখিবেন, যজ্ঞ ও পূজা উভয়েরই তাৎপর্য্য সমান। যজ্ঞ নানাবিধ—"দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে, স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ"—কাহারও নিকট দ্রব্য ত্যাগই যজ্ঞ, কাহারও বা তপস্যা যজ্ঞ, কাহারও যোগ যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জ্জনই

কাহারও নিকট যজ্ঞ। কেহ বা যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে সংযমাগ্নিতে আহুতি দেন, কেহ বা রূপ-রসাদি ভোগ্য দ্রব্যকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দেন। আবার কেহ বা সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে আত্মসংযম-যোগাগ্নিতে আহুতি দেন। ফলে কর্ম্ম মাত্রই যজ্ঞ—ত্যাগাত্মক কর্ম্ম মাত্রই যজ্ঞ; যজ্ঞ-দেবতার উদ্দেশে সম্পাদিত যজ্ঞ। কে কাহার উদ্দেশে কোন্ দ্রব্য আহুতি দেয়? ইহার উত্তরে আঙ্গিরসশিষ্য কৃষ্ণ গীতার মধ্যেই যজ্ঞতত্ত্বের চরম কথা বলিতেছেন,—"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্, ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা"—এই জীবনযজ্ঞ ব্রহ্মকর্ম্ম; ব্রহ্মই এখানে যজমান বা ঋত্বিক্ সাজিয়া আহুতি দিতেছেন, ব্রহ্মই এখানে অগ্নি, ব্রহ্মই এখানে হোম-দ্রব্য, ব্রহ্মই এখানে দেবতা; এই ব্রহ্মকর্ম্ম-সম্পাদনে ব্রহ্মলাভই ঘটে।

জীবনের কর্ম্ম মাত্রই যজ্ঞ। যজ্ঞের মূল অর্থ ত্যাগ; ত্যাগের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারই ভোগ কর্ত্তব্য—ইহাই হবিঃশেষ-ভোজন, অতএব অমৃতভোজন; "যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।" জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকে এই যজ্ঞরূপে দেখিলে জীবনটাই উঁচু হইয়া পড়ে—নীচের পরদা হইতে উঠিয়া অত্যন্ত উঁচু পরদায় উপনীত হয়; জীবনের অর্থ পর্য্যন্ত বদলাইয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই বেদপন্থী সমাজে কর্ম্মকাণ্ড যখন অত্যন্ত জটিল ও যন্ত্রবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় হইতেই এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এখনও যে আমরা জীবনযজ্ঞের সেই তত্ত্বটি ধরিয়া আছি, দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝিতে পারিবেন।

আপনারা গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা জানেন। মনুষ্য জন্ম মাত্রেই কয়েকটা ঋণে বদ্ধ হইয়া জন্মে, ইহা মানব-জন্ম সম্বন্ধে অতি প্রাচীন থিয়োরি। "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঃ ঋণৈঃ ঋণবান্ জায়তে।" উত্তর কালে এই তিন ঋণ পাঁচ ঋণে দাঁড়াইয়াছে। দেবগণ মানুষের ভাগ্যবিধাতা; পিতৃগণ তাঁহাকে মানবজন্ম দিয়াছেন; ঋষিগণ যে বিদ্যা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই বিদ্যাই তাহাকে উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় জন্মের অধিকারী করিয়াছে; বন্ধু প্রতিবেশী হইতে সমাজের যাবতীয় ব্যক্তি তাহাকে রক্ষা করিতেছে; পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত কোন-না-কোনরূপে তাহার জীবন রক্ষার সাহায্য করিতেছে। অতএব ইহাদের সকলের নিকটেই ঋণ আছে। এই পাঁচটি ঋণ লইয়াই মানুষকে জন্মিতে হয়। ঋণের বোঝা ফেলিয়া রাখিয়া জীবনযাত্রাটা দুষ্কর্ম্ম। জীবন ব্যাপিয়া এই ঋণশোধের চেষ্টা করিতে

হইবে। এক একটা ঋণশোধের চেষ্টার অভ্যাস এক একটা যজ্ঞ। প্রত্যেক যজ্ঞেই কিছু-না-কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিতেছেন,—"যদগ্নৌ জুহোতি অপি সমিধং, তৎ দেবযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—দেবতার উদ্দেশে আগুনে অন্ততঃ একখানা সমিৎ ফেলিয়া দিলেও দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যৎ পিতৃভ্যঃ স্বধা করোতি অপি অপঃ, তৎ পিতৃযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—পিতৃগণের উদ্দেশে অন্ততঃ এক গণ্ডূষ জল দিলেও পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যদ্ ভূতেভ্যো বলিং হরতি, তদ্ভূতযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—ভূতগণের অর্থাৎ পশু পক্ষীর উদ্দেশে কিঞ্চিৎ অন্ন দিলেই ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যদ্ব্রাহ্মণেভ্যো অন্নং দদাতি, তন্মনুষ্যযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—ব্রাহ্মণ অতিথিকে কিছু অন্ন দিলেই মনুষ্যযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যৎ স্বাধ্যায়ং অধীয়ীত একামপি ঋচং, যজুঃ, সাম বা তদ্ব্রহ্মযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে"—বেদাধ্যয়ন করিলে, অন্ততঃ একটি ঋক্, একটি যজুঃ বা একটি সাম অধ্যয়ন করিলে ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। গৃহস্থের এই নিত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কোনরূপ জটিলতা নাই; কার্য্যতঃ বেদপন্থী সমাজের অধিকাংশ গৃহস্থ অদ্যাপি এই পাঁচটি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন।

গৃহস্থ মাত্রেরই এই যজ্ঞ কয়টি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জগতে তিনি যে একাকী আসেন নাই, এবং একা যাইবেন না, সমস্ত জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক বাঁধা আছে, সমস্ত জগৎ যে একযোগে তাঁহাকে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া জগতের যাবতীয় প্রাণীর নিকটে ঋণ স্বীকারে তিনি বাধ্য আছেন, এবং প্রত্যহ কোন-না-কোন অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিয়া, আমি যে ঋণী, এইটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে বাধ্য আছেন। বস্তুতঃ এই ঋণ কেহই শুধিতে পারে না; তবে এই ঋণটা স্বীকার না করিলে জগদ্ব্যবস্থার প্রতি, বিশ্বব্যাপারের প্রতি ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞা দেখান হয়। মানব, বিশ্বব্যাপারকে তুমি প্রণাম কর; এবং এই অভিপ্রায়ে প্রত্যহ কিছু-না-কিছু ত্যাগ স্বীকার অভ্যাস কর। ব্যাপক অর্থে ত্যাগেরই নামান্তর যজ্ঞ। এ স্থলে সমস্ত জগৎটাই দেবতা। জগতে যাহা কিছু আছে, সবই দেবতা। প্রত্যেকের নিকট মানুষ ঋণী এবং সেই ঋণ স্বীকারার্থে প্রত্যেকের উদ্দেশে কিছু-না-কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে। শাস্ত্রে এই পাঁচটি যজ্ঞকে মহাযজ্ঞ বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলেন,—"পঞ্চ বা এতে মহাযজ্ঞাঃ সততি প্রতায়ন্তে, সততি সন্তিষ্ঠন্তে"—এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ সতত

অর্থাৎ দিনে দিনে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সতত অর্থাৎ দিনে দিনে সমাপ্ত করিতে হইবে। কৌতুক এই যে, ঋষিযজ্ঞকে সকল যজ্ঞের উপরে, এমন কি, দেবযজ্ঞের উপরেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই ঋষিযজ্ঞ বেদাধ্যয়ন বা বিদ্যার্জ্জন; ইহার নামান্তর ব্রহ্মযজ্ঞ। এই বিদ্যার যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারাই ঋষি, তাঁহারাই বেদপন্থী সমাজের বিশিষ্ট cultureএর প্রতিষ্ঠাতা; ঐ সমাজের যাহা প্রাণ, তাহারই প্রতিষ্ঠাতা। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিতেছেন,—"সমাজের সেই আদিম প্রতিষ্ঠাতারা তপস্যা করিলে স্বয়ং স্বয়ম্ভু তাঁহাদের সম্মুখে আসিলেন, এবং তাঁহাদিগকে ব্রহ্মযজ্ঞের উপদেশ দিলেন। তদবধি তাঁহারা ঋষি হইলেন।" বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক গৃহস্থ সেই ঋষিগণের নিকট হইতে সেই বেদবিদ্যাকে পাইয়াছেন, এবং তাহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য আছেন। রক্ষার জন্য প্রত্যহ অধ্যয়ন আবশ্যক এবং এই অধ্যয়নই ব্রহ্মযজ্ঞ। যজ্ঞ সম্পাদনে নানা সরঞ্জাম আবশ্যক, নানা অনুষ্ঠান আবশ্যক। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—"এই যে ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্যই এই যজ্ঞের জুহূ, মন ইহার উপভৃৎ, চক্ষু ইহার ধ্রুবা, মেধা ইহার স্রুব, সত্যই ইহার অবভৃথ স্নান, স্বর্গলোক ইহার উদয়ন বা সমাপ্তি। ঋক্‌মন্ত্র এই যজ্ঞের ক্ষীরাহুতি, যজুর্মন্ত্র ইহার আজ্যাহুতি, সামমন্ত্র ইহার সোমাহুতি, অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্র ইহার মেদাহুতি, পুরাণ ইতিহাসাদি ইহার মধু আহুতি। জল চলিতেছে, আদিত্য চলিতেছেন, চন্দ্রমা চলিতেছেন, নক্ষত্রেরা চলিতেছে। ইহাদের গতিক্রিয়া ক্ষান্ত হইলে জগদ্‌যন্ত্রের যে অবস্থা হয়, গৃহস্থ যে দিন অধ্যয়ন না করেন, তাঁহার গৃহেরও সেই অবস্থা ঘটে।" এই শেষের বাক্যটি আমাদের সেনেট হাউসের দরজায় খোদাই করিয়া রাখা উচিত।

মানুষের জীবন এক পক্ষে পশুর জীবন—মানুষ অন্য পশুর মত খায়, লাফায় ও ঘুমায়, এবং অন্যকে বঞ্চনা করিয়া নিজের স্বার্থসাধন করে। আপাততঃ জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য জীবনরক্ষা—পরের জীবন নষ্ট করিয়া আপন জীবনের রক্ষা। প্রাণিবিদ্যা বা biology বিদ্যামতে মানবজীবনের আর কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। কিন্তু এইরূপ জীবনে কোন রস নাই, কোন গৌরব নাই। মানবজীবনকে পশু-জীবনের উপরে রাখিতে হইলে জীবনে সম্পূর্ণ উল্টা তাৎপর্য্য দিতে হইবে। জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কর্ম্মকে বৃহৎ করিয়া দেখিতে হইবে। মানুষের ক্ষুদ্র জীবনকে বিশ্বের জীবনের সহিত মিলাইয়া সমঞ্জস করিয়া দেখিতে হইবে। শাস্ত্রের ভাষায় যে

বৈশ্বানর অগ্নি বিশ্বজগতে সর্ব্বকর্ম্মের প্রেরণা করিতেছেন, সেই অগ্নি মানবের প্রাণকেও জীবনের কর্ম্মে প্রেরণ করিতেছেন, মনে করিতে হইবে। এই বৈশ্বানর অগ্নিকেই অগ্নিচয়নানুষ্ঠানে উত্তরবেদিতে আহরণ করিতে হয়—ইনিই বিরাট্‌পুরুষরূপ প্রজাপতির প্রাণ, অতএব জীবেরও প্রাণ। প্রশ্নোপনিষৎ বলিতেছেন,—"স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ অগ্নিরুদয়তে" —সেই বিশ্বরূপ বৈশ্বানরই জীবদেহে প্রাণাগ্নিরূপে উদিত হন। ইহারই প্রসাদে তুমি "অৎসি অন্নং, পশ্যসি প্রিয়ম্"—তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ ও প্রিয় দর্শন করিতেছ। এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্যই যাবতীয় জীব অন্নের অন্বেষণে, ভোগ্য বস্তুর অন্বেষণে ছুটিতেছে; এবং সেই প্রাণাগ্নিতেই সেই অন্নের, সেই ভোগ্য বস্তুর সমর্পণ করিতেছে। ইহা এক-রকম নিত্য অগ্নিহোত্রের ব্যাপার; প্রাণিমাত্রকেই আপন দেহে এই অগ্নিহোত্র অহরহঃ সম্পাদন করিতে হইতেছে। "যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে, এবং সর্ব্বাণি ভূতানি অগ্নিহোত্রমুপাসতে"—ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেমন স্তন্যের জন্য মাতার নিকট উপস্থিত হয়, সেইরূপ সমস্ত ভূত এই অগ্নিহোত্রের সমীপে উপস্থিত হয়। বিশ্বরূপ প্রজাপতির দেহ ব্যাপিয়া এই অগ্নি সঞ্চরণ করিতেছেন; প্রাণিদেহের অগ্নিতে অন্নাহুতি হইলে সেই বিশ্বরূপী প্রজাপতির উদ্দেশ্যেই আহুতি হয়। "প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে অন্তঃ, ত্বমেব প্রতিজায়সে, তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি, যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি"—অহে প্রাণ, তুমিই প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর, এবং তুমিই জীবরূপে জন্মগ্রহণ কর; সকল প্রাণ তোমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে; সকল প্রজা তোমার উদ্দেশে বলি আনিয়া উৎসর্গ করিতেছে। প্রাণের ভিতরে নিত্য আকাঙ্ক্ষার ও বাসনার আগুন জ্বলিতেছে, তাহার তৃপ্তি আবশ্যক—ইহা তাহার নিত্য অগ্নিহোত্র। পশুধর্ম্মী মানুষ ক্ষুধা নিবারণের জন্য যে অন্ন ভোজন করে, তাহাকে কেবল একটা biological need মনে করিবেন না। তাহা সেই অগ্নিহোত্রের আহুতি—ইহার নাম প্রাণাগ্নিহোত্র। জীবন রক্ষার জন্য শেয়াল কুকুরের মত অন্নের গ্রাস গিলিয়া গলাধঃকরণ করায় কোন বিশিষ্টতা নাই; কিন্তু ঐ পাশ-বিক কর্ম্মকে নিত্য-সম্পাদ্য অগ্নিহোত্ররূপে দেখিলে উহাতে আর পাশবিকতার ক্লেদ থাকে না, উহা মানবিকতার গৌরবে মণ্ডিত হয়। ছান্দোগ্য বলিতেছেন,—"তদ্‌যদ্‌ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেত্তৎ হোমীয়ং, স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহা ইতি, প্রাণস্তৃপ্যতি"—ভাতের যে প্রথম

গ্রাস উপস্থিত হয়, তাহা হোমদ্রব্য ; প্রাণায় স্বাহা বলিয়া সেই ভাতের গ্রাস আহুতি দিবে, প্রাণ তাহাতে তৃপ্ত হইবে। কেবল নিজের প্রাণ কেন, বিশ্বের প্রাণ ইহাতে তৃপ্ত হইবে ; "সর্ব্বেষু-লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু চাত্মসু হুতং ভবতি" ; এইরূপে যে আহুতি দেওয়া যায়, তাহা সর্ব্ব লোকে, সর্ব্ব ভূতে, সর্ব্ব আত্মায় আহুতিরূপে অর্পিত হয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী উপনিষৎ মন্ত্রটিকে আরও স্পষ্ট করিতে চাহেন। অন্নগ্রাস গ্রহণের মন্ত্র হইবে—"প্রাণে নির্বিষ্টঃ অমৃতং জুহোমি, প্রাণায় স্বাহা"—আমি প্রাণে নিবিষ্ট হইয়া প্রাণাগ্নিতে যে আহুতি দিতেছি, ইহা অমৃতাহুতি ; এই যে অন্ন, ইহা অমৃত। প্রাণ অপানাদি পাঁচ প্রাণের উদ্দেশে ঐরূপ পাঁচটি আহুতির পর সমাপ্তিতে বলা হইবে, "ব্রহ্মণি মে আত্মা অমৃতত্বায়"—আমার আত্মা ব্রহ্মে যুক্ত হইয়া অমৃত লাভ করুক। অনুষ্ঠানরত গৃহস্থেরা এখনও ভোজনকালে এইরূপে পঞ্চ গ্রাস লওয়ার প্রথা বজায় রাখিয়াছেন। ক্বচিৎ কখনও ইষ্টিযাগ করিয়া ইড়া ভক্ষণে দরকার কি ? প্রত্যহ উদর পূরণের জন্য অন্ন ভোজনেই আমরা ইড়া ভক্ষণের অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে পারি। অন্নের প্রত্যেক গ্রাসই ইড়া ; অন্ন ভোজনের ব্যাপারটা নিতান্ত উদর পূরণের ব্যাপার মনে না করিয়া উহাকে আমরা প্রজাপতির উদ্দিষ্ট যজ্ঞে বৈশ্বানর অগ্নিতে অর্পিত হবিঃশেষ-ভক্ষণ মনে করিলে, বিশ্বহিতার্থ নিযুক্ত আপনার দেহটাকে পুরুষযজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ রাখিবার উপায়রূপে মনে করিলে, কর্ম্মটা পাশবিকতার স্তর হইতে একবারে মানবিকতার স্তরে উঠিয়া পড়ে।

এ দৃষ্টান্ত একটা ছোট দৃষ্টান্ত মাত্র। আসল কথা এই :—আমার এই যে জীবন, ইহা বৈশ্বানর অগ্নির চয়ন ব্যাপার মাত্র। সারা জীবন ধরিয়া ইটের পাশে ইট গাঁথিয়া, ইটের উপর ইট বসাইয়া আমি পুরুষ-যজ্ঞের চিতি নির্ম্মাণ করিতেছি, তাহার কেন্দ্রস্থলে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে কেবলই আত্মাহুতি দিতেছি। এ কেবল ত্যাগের ব্যাপার ; ভোগের এখানে কোন অবসর নাই। এই ত পুরুষ-যজ্ঞ, এ ত বিশ্বযজ্ঞের অনুকরণ ; কেন না, বিশ্বযজ্ঞে বিশ্বকর্ম্মা আপনাকে ত্যাগই করিয়াছেন। এখানে আমিই যজমান, আমিই ঋত্বিক্ এবং আমিই দেবতা এবং আমার সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ বা আত্মাহুতি। বেদপন্থী এই জীবন-যজ্ঞের তত্ত্বটাকে খুব বড় করিয়া দেখিয়াছেন ; এত বড় করিয়াছেন যে, পশ্চিমের পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁহারা একটু সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহাদের ইহা দৃষ্টি এড়ায় নাই। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা

কৌতূহলী, তাঁহারা Eggeling সাহেবের শতপথ ব্রাহ্মণের এবং Keith সাহেবের তৈত্তিরীয় সংহিতার অগ্নিচয়ন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গের ভূমিকা দেখিবেন। জীবনযজ্ঞ পুরুষ-যজ্ঞেরই প্রকারভেদ, এবং ইহা ভোগের ব্যাপার নহে, ত্যাগের ব্যাপার। প্রত্যেক কর্ম্মকে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু প্রতি অর্পণ করিতে হইবে ; বেদপন্থীর প্রতি তাঁহার শাস্ত্রের এই চূড়ান্ত আদেশ। "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্"—দান ধ্যান হইতে আহার নিদ্রা, নাচা কোঁদা সকল কর্ম্মই কেবল স্বভাব-প্রেরিত জৈব কর্ম্মরূপে না দেখিয়া, সেই এক দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিতে হইবে। তন্ত্রের ভাষায়, যাহা কিছু করিবে, তাহা জগন্মাতার পূজারূপেই করিবে। এইরূপে সর্ব্বকর্ম্ম পূজারূপে অর্পণ করিলে পূজক খাট হন না, ইহাতে তিনি আপনাকে বড়ই করেন ; কেন না, পূজা মাত্রই আত্মপূজা, পূজক নিজেই নিজের দেবতা। তন্ত্রমতে মানস পূজার স্তবটি স্মরণ করুন,—

আত্মা ত্বং, গিরিজা মতিঃ, সহচরাঃ প্রাণাঃ, শরীরং গৃহং,
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা, নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ,
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ, স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরঃ,
যদ্ যৎ কর্ম্ম করোমি তৎ তদখিলং শম্ভো ত্বদারাধনম্।

ওহে শম্ভু, আমিই তুমি, তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নাই। আমার মতিই তোমার পত্নী পার্ব্বতী। আমার প্রাণসকলই তোমার সহচর ভূতগণ ; আমার শরীরই তোমার গৃহ। আমি যে বিষয়োপভোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকি, ইহাই তোমার পূজা। আমি যখন নিদ্রা যাই, তখন তোমাতেই সমাধি লাভ করি। পৃথিবীতে পা ফেলিয়া এ-দিক্ ও-দিক্ যে ভ্রমণ করি, ইহাতে তোমাকেই প্রদক্ষিণ করা হয়। আমি যে কিছু কথা কহি, তাহা তোমারই স্তব। আমি যে যে কর্ম্ম করি, সে সকল ত তোমারই আরাধনা। দেখিবেন, আঙ্গিরস ঘোর ঋষি দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তন্ত্রও তাহারই অন্য ভাষায় পুনরুক্তি করিতেছেন।

আমিই তুমি, এর চেয়ে বড় কথা মানুষের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে না। ফলে আমিই বিশ্বকর্ম্মা ; বিশ্বজগৎ নির্ম্মাণের কাদামাটি আমার হাতেই রহিয়াছে ; সেই মশলা দিয়া আমার জগৎ আমার ইচ্ছামত আমি নির্ম্মাণ করিয়া লইতে পারি। "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"—পৃথিবীর ধূলিকে আমি ইচ্ছামত মধুতে পরিণত করিতে পারি। এই জন্য বেদপন্থী আপনাকে

খুব বড় করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত। জগতের যাবতীয় দ্রব্যকে তিনি বড় করিয়া দেখেন ; প্রত্যেক তুচ্ছ ঘটনাকেই খুব বৃহৎ করিয়া দেখিতে তিনি অভ্যস্ত। তাঁহার হাতে যে পরশ-পাথর আছে, তাহার স্পর্শে মাটি সোনা হইয়া যায়। নাল্পে সুখমস্তি—অল্পে তাঁহার সুখ নাই। এই জন্য লৌকিক ব্যবহারেও যে-কোন অঙ্কের গায়ে দশ বারটা শূন্য বসাইতে তাঁহার কিছু মাত্র সঙ্কোচ হয় না। তাঁহার দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, সর্ব্বত্র তাঁহার এই অভ্যাসের—লোকে বলিবে এই কদভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময়ে লোকে এই জন্য হাসে ; কিন্তু তিনি আপনাকে খুব বড় বলিয়া জানেন, এবং জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই সেই পরিমাণে বড় করিয়া দেখেন। আপনারা Individualism বলিয়া একটা কথা শুনিয়াছেন—পশ্চিম-সমুদ্রের ফেনার সঙ্গে এই বস্তুটা সম্প্রতি আমাদের দেশে ভাসিয়া আসিয়াছে। ইহার অর্থ আপনাকে স্বাধীন ও বড় করা—নৈসর্গিক প্রবৃত্তির মুখে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া আপনাকে বড় করা—যাবতীয় নিয়মের ও সংযমের, আচারের ও নিষ্ঠার বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্তি দিয়া বড় করা। ইউরোপের রাষ্ট্রতন্ত্র রোমান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; রোমান রাষ্ট্রনীতিমতে রাষ্ট্রের নিকটে মনুষ্য-জীবনের স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই। এই রাষ্ট্রনীতি পশ্চিম দেশে মানুষের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনকে পেষণযন্ত্রে নিপীড়িত করিয়া আসিতেছে ; ফলে বিদ্রোহী মানবপ্রকৃতি চীৎকার করিয়া সকল সামাজিক, এমন কি, সকল গার্হস্থ্য বন্ধন পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা লাভে উৎসুক হইয়া পড়িয়াছে। এ এক রকমের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বটে, কিন্তু বেদপন্থীর স্বাতন্ত্র্য বা Individualism সম্পূর্ণ অন্য রকমের। বস্তুতঃ আমার কাছে আমি যত বড়, অন্য কেহ তত বড় নহে—হইতে পারে না। বটেই ত, আমিই ত বিশ্বকর্ম্মা। তুলদাঁড়ির এক পাল্লায় আমাকে রাখিলে ও অন্য পাল্লায় ব্রহ্মাণ্ডকে রাখিলে আমারই গুরুত্ব অধিক হয়। বৃহদারণ্যক স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, আমার কাছে আমার চেয়ে প্রিয় আর কেহ নাই—পুত্রাৎ প্রেয়ঃ, বিত্তাৎ প্রেয়ঃ, অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ম্ আত্মা—আমার অন্তরের ভিতরে এই যে আমি, সেই আমি পুত্র, বিত্ত আর সমস্ত হইতেই প্রিয়। পঞ্চদশী সংক্ষেপে বলিয়াছেন,—"অয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ"—এই যে আমি, ইহার চেয়ে প্রেমাস্পদ আর কেহ নাই, অতএব ইনিই পরম আনন্দস্বরূপ। আপনাকে সকল বন্ধন

হইতে মুক্ত করিয়া স্বতন্ত্র না করিলে ইহার সোয়াস্তি হইতে পারে না। এইরূপ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে হইলে বাহিরে যাহা কিছু আছে, তাহাকে আত্মসাৎ, আত্মগত, আত্মস্থ করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু তার জন্য দুইটা পথ আছে। একটা প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট নৈসর্গিক পথ—উহা বিরোধের পথ এবং বিরোধ দ্বারা ভোগের পথ। প্রাকৃতিক নিয়মে বাহিরে যে কেহ আছে, সকলেই আমার পর, আমার শত্রু। তাহাকে দমন করিয়া চিবাইয়া খাইয়া আত্মসাৎ করিতে হইবে। প্রত্যেক পশু তাহাই করিতেছে—বাহিরে যে জড় জগৎ ভোগের জন্য বিস্তীর্ণ আছে, তাহাকে টানিয়া ছেঁচিয়া নিংড়াইয়া তাহার সমস্ত রস নিঃশেষে পান করিবার চেষ্টায় আছে। আচার্য্য হক্সলী ইহাকে cosmic processএর কোঠায় ফেলিয়াছেন। ইহাতে মানুষের কোন বিশিষ্ট গৌরব নাই। জগৎকে নিংড়াইতে গেলে যে ছিবড়া অবশিষ্ট থাকে, তাহার আবর্জ্জনার ক্লেদে জগৎটা পূর্ণ হয়। এমন জগতে তিষ্ঠিয়া কোন লাভ নাই। হক্সলী যাহাকে ethical process বলিয়াছেন, তাহার সহিত এই cosmic processএর সনাতন বিরোধ। এই নৈসর্গিক cosmic processকে পরাভূত করিয়া ethical processকে প্রতিষ্ঠিত করাই মানুষের বিশিষ্ট কর্ম্ম। ১৮৯৩ সালের শেলডোনিয়ান থিয়েটারে দাঁড়াইয়া হক্সলী স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, "The practice of that which is ethically best involves a course of conduct which, in all respects, is *opposed* to that which leads to success in the cosmic struggle for existence." পুনশ্চ, moral precepts are directed to the end of *curbing* the cosmic process." পুনশ্চ, the ethical progress of society depends, not on imitating the cosmic process, but in *combating* it." চারি বৎসর পরে ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া ঐ cosmic process সম্বন্ধে জন্ মর্লী বলিয়াছিলেন—"Nature does *not* work by moral rules. Nature, red in tooth and claw, does by system all that good men by system avoid." প্রত্যেক মনুষ্য-পশু এইরূপে জগৎকে চিবাইয়া আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে; নিঃশেষে ভোগ করিতে চাহিতেছে; ইহাই তাহার নৈসর্গিক প্রকৃতি। কিন্তু মনুষ্য-পশুর ভিতরে আর একটা মানুষ গোপনে বসিয়া আছে, সে কেবলই না—না—না

—ন বলিতেছে। মানুষ বিরোধের দ্বারা ভোগের পথে চলিতে গেলেই সেই মানুষটা প্রবৃত্তির মুখে লাগাম দিয়া কেবলই বলিতে থাকে, না—না—না—না, ও পথে না—ও পথে না। ইনিই সেই আসল মানুষ প্রজাপতি, যিনি চরতি গর্ভে অন্তঃ। ইনি বলিতেছেন, আমি বিশ্বযজ্ঞে আমাকে দান করিয়া আপনাকে বড় করিয়াছি—জগৎকে চিবাইয়া আত্মসাৎ না করিয়া, আপনাকে ছড়াইয়া জগতে বিলাইয়া দিয়াছি, আপনাকে এইরূপে জগতে সম্প্রসারণ করিয়া বড় হইয়াছি। ইহা ত্যাগের পথ এবং ত্যাগের দ্বারা মিলনের পথ। এইরূপ উল্টা পথে আপনাকে পরে মিশাইয়া পরকে আমি আত্মস্থ ও আত্মসাৎ করিয়াছি—আমার নিকটে পর নাই—এইরূপেই আমি পরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্য পাইয়াছি। ইহাই খাঁটি individualism; কেন না, সমস্ত পর আত্মস্থ হইয়া গেলে পরাধীন পরবশ হইবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত থাকে না। কিন্তু এই মুক্তিলাভের পূর্ব্বে বন্ধন আবশ্যক—বিশ্বজগতের যাবতীয় দ্রব্যের সহিত মিলনের সম্বন্ধ পাতাইয়া সহস্র বন্ধনে আপনাকে জড়াইতে হইবে—যমনিয়মের সহস্র বন্ধনে ভিতরের নৈসর্গিক পশুটাকে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে—সংসারের যূপস্তম্ভে সেই পশুটাকে বদ্ধ করিয়া তাহাকে পুরুষ-যজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে।

মানবজীবনের থিয়োরি সম্পর্কে বেদপন্থীর সহিত খ্রীষ্টপন্থীর গোড়ায় আশ্চর্য্য মিল আছে, আপনাদিগকে দেখাইয়াছি। ইউরোপের খ্রীষ্টানেরা কিন্তু মনুষ্য-জীবনকে দুইটা কুঠরিতে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছেন; একটা secular, temporal, আর একটা religious, spiritual—এবং এই দুই কুঠরির মধ্যে একটা দেওয়াল গাঁথিয়া ফেলিয়াছেন। সাবেক রোমানের জীবন ছিল একটা কুঠরিতে নিবদ্ধ; খ্রীষ্টানের জীবন ছিল অন্য কুঠরিতে। খ্রীষ্টীয় সমাজ আত্মরক্ষার জন্য রোমান রাষ্ট্রতন্ত্রের আশ্রয় লইতে গিয়া এই বিরোধের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন এবং আজি তাহার ফল ভোগ করিতেছেন। ভুবনবিজয়োদ্যত ইসলামের জয়ধ্বজাকে পিরিনীসের ও-পারে ঠেলিয়া দিয়া চার্লস মার্টেল খ্রীষ্টীয় সমাজকে রক্ষা করেন। ইহার ফলে রোমের বাবাজী পোপ যে দিন চার্লস মার্টেলের বংশধর বড় চার্লসের—শার্লমেনের মাথায় রোমের কাইসারের মুকুট পরাইয়া রাষ্ট্রপালের সহিত ধর্ম্মপালের একটা অস্বাভাবিক সন্ধি স্থাপন করিলেন, সেই দিন এই বিরোধের বীজ বপন হয়; উভয়ের মধ্যে সন্ধি টেকে নাই; ফলে কিন্তু ইউরোপের

ইতিহাসে হাজার বৎসর জুড়িয়া একটা মর্ম্মগত বিরোধ খ্রীষ্টপন্থীর জীবনের এক অংশকে অন্য অংশের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া রাখিয়াছে। ইউরোপ আজ বালক বালিকার ও বৃদ্ধ বনিতার রুধিরের হ্রদে স্নান করিয়া সেই বিরোধ মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে। ভোগমত্ত রতিকামের উপর দাঁড়াইয়া ইউরোপের সভ্যতা ছিন্নমস্তা-বেশে আপনার রক্ত আপনি পান করিতেছে। ভারতবর্ষে বেদপন্থীর জীবনে এইরূপ দুইটা বিরোধী কুঠরি থাকিতে পারে না। বেদপন্থীর থিয়োরিতে সমস্ত জীবন একটা ব্যাপার, একটা যজ্ঞ। জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম যজ্ঞাঙ্গ,—কুরুক্ষেত্রের লড়াই হইতে দাঁতনকাঠির নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মকে একই পর্য্যায়ে ফেলাইতে বেদপন্থী বাধ্য আছেন—ইহাতে ক্ষোভ করিলে বা উপহাস করিলে চলিবে না। রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ির ভিতরে ধর্ম্ম আটকান আছে বলিয়া হাসিলে চলিবে না। ফলে ইউরোপের আশ্রিত অবাধ competitionএর পরিণামই ঐরূপ ভয়ঙ্কর। আজকাল competitionএর স্থানে co-operation বসাইবার যে ধুয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কুলাইবে না; ভিতরের পশুটা দাঁত বাহির করিবেই। চাই একবারে ষোল আনা sacrifice—যাহার অর্থ যজ্ঞ বা ত্যাগ বা আত্মসমর্পণ। স্বাধীনভাবে আত্মসমর্পণেই আত্মা চরিতার্থ হইবে; এই বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যলাভেই প্রকৃত individualism. ভারতবর্ষে বেদপন্থীর individualismএর স্বাতন্ত্র্য এই আত্মসমর্পণে।

আপনারা পুরাণে ঋষিগণের বহুবর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী শুনিয়াছেন। ভারতবর্ষের বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসকে আমি একটা বহুসহস্রবর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী বলিয়া জানি। এই ধারণা আমার জীবনযাত্রায় ধ্রুবতারা। ভারতবর্ষের যজ্ঞভূমি জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড চিতি নির্ম্মিত রহিয়াছে; বেদপন্থী সমাজের যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারা সেখানে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—সেই অগ্নির প্রভায় অর্দ্ধ পৃথিবী প্রভান্বিত হইয়াছে। সিংহল হইতে সাইবীরিয়া পর্য্যন্ত, যবদ্বীপ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত, জাপান হইতে কাস্পীয়তট পর্য্যন্ত অর্দ্ধ পৃথিবী সেই অগ্নির প্রভায় প্রভান্বিত হইয়াছে। ভারতমাতা সেই যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন;—মা আমার ভোগ্য অন্নরূপে বুভুক্ষিত পৃথিবীতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। বিশ্বভূতের জন্য আত্মোৎসর্গে মায়ের ব্যথা হয় নাই। তিনি কখন ক্ষুধার্ত্ত পশুর মত পরকে আক্রমণ করিয়া উদরসাৎ

করিবার চেষ্টা করেন নাই ; বরং যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে—ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেমন মাতার সমীপে উপস্থিত হয়,—সেইরূপ পৃথিবীর যে কেহ অন্নার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তাহাকে কোলে লইয়া স্নেহের সহিত স্তন্য দান করিয়াছেন। চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন ;—কেবল স্থূল দেহের স্থূল অন্ন বিলাইয়া তিনি তৃপ্ত হন নাই, যখনই তিনি আপনার যজ্ঞভূমির বাহিরে গিয়াছেন, তখনই তিনি ইড়ারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞানান্ন লইয়া দেশ-বিদেশে বিচরণ করিয়াছেন। জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণার ধারায় দেশ-বিদেশকে ধৌত করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছেন। পৃথিবীতে ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য, নিবৃত্তির পথ দেখাইবার জন্য তিনি আপনার পায়ে সংযমের শিকল পরাইয়া আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন ; পরপীড়নের আশঙ্কায় আপনার সন্তানদের পায়েও নিগড় পরাইয়া বিদ্যালাভের বা লক্ষ্মীলাভের ব্যপদেশে পরদেশ আক্রমণ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। মা আমার স্বয়ং ইড়াদেবী—মনুকন্যা মানবীরূপে তিনি স্বয়ং মনুকর্তৃক যজ্ঞার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন ; সরস্বতীরূপে তিনি ব্রহ্মাবর্ত্তে বেদপন্থী সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতীরূপে তিনি ভারতবর্ষের কুলদেবতা, বাগ্‌দেবীরূপে তিনি ব্রহ্মরূপিণী। তিনি গায়ত্রীরূপে মর্ত্ত্যলোকে অমৃত আনিয়াছিলেন, সাবিত্রীরূপে আমাদের ধীশক্তির অদ্যাপি প্রচোদনা করিতেছেন। অগ্নিপত্নী স্বাহারূপে তিনি আমাদের জীবনযজ্ঞের যাবতীয় কর্ম্মকে আহুতিরূপে গ্রহণ করিতেছেন, ইন্দ্রপত্নী শচীরূপে তিনি সেই যজ্ঞক্রতুর পরিচালনা করিতেছেন। তিনিই দেবমাতা অদিতি—স্বয়ং প্রজাপতি দক্ষ তাঁহাকে জন্ম দিয়াছেন। "অদিতির্হি অজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব, তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ,"—অদিতিই দক্ষ প্রজাপতির দুহিতা হইয়া জন্মিয়াছিলেন ; সেই অদিতি হইতেই ভদ্র ও অমৃতবন্ধু দেবগণ জন্মিয়াছেন। তাঁহারই নামান্তর দক্ষকন্যা সতী—যিনি প্রজাপতির যজ্ঞে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন ; তাঁহার যজ্ঞোৎসৃষ্ট দেহ নারায়ণচক্রে শত খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া কামরূপ হইতে হিঙ্গলাজ, জালন্ধর হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভারতভূমির দেহে পরিণত হইয়াছে। অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা, বিষ্ণুক্রান্তা সেই ভূমি মহাবিষ্ণুর ত্রিপাদচ্ছায়ায় আক্রান্ত রহিয়াছে। ভারতভূমির প্রত্যেক ধূলিকণায় চক্রচ্ছিন্ন সতীদেহের বা হিমবৎকন্যা পার্ব্বতীর দেহের পরমাণু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ; সেই ধূলি-উৎপন্ন প্রত্যেক

ধান্যশীর্ষে ও যবশীর্ষে ইড়ারূপ পরমান্নের অমৃতরস সঞ্চিত আছে। বিষ্ণুরূপী যজ্ঞপুরুষে অর্পণের পর, পঞ্চ মহাযজ্ঞে যাবতীয় ভূতে অর্পণের পর হবিঃশেষরূপে সেই ইড়াভোজন মাত্রে আমরা অধিকারী রহিয়াছি। এই সর্ব্বদেবময়ী মহতী দেবতাকে সম্বোধন করিয়া আমরা অকুতোভয়ে বলিতে পারি ;—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাম্—
বন্দে মাতরম্।